রবীন্দ্রজীবনী



রবীন্দ্রসাহিত্য-প্রবেশক

চতুর্থ খণ্ড

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়



বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়
২ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় স্ট্রীট । কলিকাতা

প্রকাশক শ্রীপুলিনবিহারী সেন
বিশ্বভারতী। ৬।৩ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন
কলিকাতা ৭

প্রকাশ ১৩৬৩ শ্রাবণ

মুদ্রাকর শ্রীবিদ্যুৎরঞ্জন বসু
শান্তিনিকেতন প্রেস। শান্তিনিকেতন। বীরভূম

ভূমিকা

রবীন্দ্রনাথ জীবনস্মৃতির এক পাণ্ডুলিপিতে লিখিয়াছিলেন, "আমার জীবনবৃত্তান্ত লিখিতে অনুরোধ আসিয়াছে। সে অনুরোধ পালন করিব বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়াছি।" তবে তাঁহার প্রশ্ন, "যাঁহারা সাধু এবং যাঁহারা কর্মবীর তাঁহাদের জীবনের ঘটনা ইতিহাসের অভাবে নষ্ট হইলে আক্ষেপের কারণ হয়— কেননা, তাঁহাদের জীবনটাই তাঁহাদের সর্বপ্রধান রচনা। কবির সর্বপ্রধান রচনা কাব্য, তাহা তো সাধারণের অবজ্ঞা বা আদর পাইবার জন্য প্রকাশিত হইয়াই আছে —আবার জীবনের কথা কেন।" কিন্তু নিজ জীবনের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে গিয়া কবির "চোখে পড়িয়াছে যে, কাব্যরচনা ও জীবনরচনা ও-দুটা একই বৃহৎ-রচনার অঙ্গ। জীবনটা যে কাব্যেই আপনার ফুল ফুটাইয়াছে আর কিছুতে নয়, তাহার তত্ত্ব সমগ্র জীবনের অন্তর্গত।" টেনিসনের জীবনী পড়িয়া 'কবিজীবনী' (১৩০৮ আষাঢ়) নামে তিনি যে প্রবন্ধটি লেখেন সেইটিও এখানে স্মরণীয়। এই প্রবন্ধে কবি একস্থানে বলেন "কোনো ক্ষণজন্মা ব্যক্তি কাব্যে এবং জীবনের কর্মে উভয়তই নিজের প্রতিভা বিকাশ করিতে পারেন; কাব্য ও কর্ম উভয়ই তাঁহার এক প্রতিভার ফল। তাঁহাদের কাব্যকে তাঁহাদের জীবনের সহিত একত্র করিয়া দেখিলে তাহার অর্থ বিস্তৃততর, ভাব নিবিড়তর হইয়া উঠে।" এই উক্তি কি রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে প্রযুক্ত হইতে পারে না? রবীন্দ্রনাথ যদি কেবলমাত্র কবি হইতেন তবে হয়তো তাঁহার জীবনচরিত রচনারই প্রয়োজন হইত না, কারণ কাব্যই কবিজীবনের শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য এবং সে-দান তো তিনি প্রচুর পরিমাণেই রাখিয়া গিয়াছেন। বাল্মীকি, ভাস, কালিদাসের নাম সংস্কৃত সাহিত্যে কিম্বদন্তী মাত্র, শেকস্পীয়ারের ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে এখনো সকল পণ্ডিত একমত হন নাই। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের জীবনসত্তায় কবি ও কর্মীর যে যুগ্মরূপ ফুটিয়াছে, তাহা ইতিপূর্বে কোনো কবি বা কর্মীর জীবনে এমন সুষমভাবে পরিস্ফুরণের অবকাশ পায় নাই। রবীন্দ্রনাথের জীবনচরিতে কবি বা কর্মী রূপের কোনো একটিকে বাদ দিয়া অপরটির আলোচনা অসংগত হইবে। কারণ, এই দুইই এক 'বৃহৎ রচনার অঙ্গ।' সেইজন্য চারিখণ্ডে সার্ধসহস্র পৃষ্ঠায় কবির বাণী-বিকাশের ইতিহাস লিখিয়াও মনে হইতেছে, তাঁহার কর্মজীবনের শ্রেষ্ঠ রচনা বিশ্বভারতীর ইতিহাস সম্পূর্ণভাবে বলা হয় নাই। যেখানে তিনি কবি ও মনীষী সেখানে তাঁহার সৃষ্টিকার্যে তিনি নিঃসঙ্গ। কিন্তু যেখানে প্রতিষ্ঠান গড়িয়াছেন, সেখানে শতশত লোকের সহায়তা তাঁহাকে নিত্য যাচ্ঞা করিতে হইয়াছে; জীবনের শেষ পর্যন্ত উদাসীন, শ্রদ্ধাহীন, এমনকি বিদ্রূপকারীদের প্রতিকূলতাকে স্বানুকূলে আনিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তাই সেই বিদ্যাপ্রতিষ্ঠানের দীর্ঘকালের ইতিহাস কবিজীবনের অঙ্গ বলিয়া স্বীকৃত হওয়া উচিত। সেই ইতিহাস রচিত হইলে রবীন্দ্রনাথের পূর্ণাঙ্গ জীবনের কাহিনী সম্পূর্ণ হইবে, কারণ বিশ্বভারতী তাঁহার ব্যক্তিসত্তার 'বৃহৎ রচনারই অঙ্গ।'

কাব্য যাঁহারা উপভোগ করিতে চাহেন তাঁহাদের পক্ষে কাব্যপাঠই যথেষ্ট; অন্তরের আলোকে তাঁহারা কবির ভাবের মধ্যে প্রবেশাধিকার সহজেই পান, রসিকের রস-উপভোগের জন্য রাসায়নিককে ডাকা নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কবিসত্তাই তাঁহার জীবনের একমাত্র পরিচয় নহে, যদিও আত্মপরিচয়দান-কালে তিনি যাহা লিখিয়াছিলেন তাহা তাঁহার কবিজীবনেরই ব্যাখ্যান; জীবনস্মৃতিকেও তিনি সাহিত্যময় করিয়া লিখিয়াছিলেন। সেইজন্য 'সাধারণ পাঠকের সুখপাঠ্য করবার চেষ্টা' করিয়াছিলেন, 'বিশুদ্ধ সাহিত্যের সৌরভ' ফুটাইবার জন্য চেষ্টার ত্রুটি হয় নাই। জীবনস্মৃতিকে আমরা রবীন্দ্রনাথের আত্মজীবনের শেষ কথা বলিয়া মানিয়া লইতে পারি না। আসল কথা রবীন্দ্রনাথ একটি পরিপূর্ণ মানুষের ধর্মের প্রতীক বলিয়া তাঁহার জীবন এমন বিচিত্র এবং তাঁহার জীবনচরিত লেখাও সেই জন্য এমন কঠিন। তাঁহার রসাত্মক কাব্যজীবন রহস্যময়। যে মানুষের চেতন অবচেতন মনের কাছে 'বিশ্বচরাচর গোচর অগোচরের নি[illegible] মিলন[illegible] যাঁহা[illegible] মানুষ সম্পূর্ণ (perfect) না হইতেও পারেন, তবে তিনি আপনার

মাঝে আপনি পূর্ণ বলিয়াই সার্থক। সেই বিচিত্রধর্মী মানুষ রবীন্দ্রনাথকে বুঝিতে হইলে তাহার জীবনের রচনা ও ঘটনা পাশাপাশি বা যুগপৎ দেখিবার প্রয়োজন হয়; সেইখানেই জীবনীকারের প্রয়োজন।

এই বিচিত্রধর্মী মানুষকে নানা লোকের নানাভাবে দেখা খুবই স্বাভাবিক; তাই দেখা যায় নানাশ্রেণীর লোক ও মতবিশ্বাসীরা কবিকে আপন আপন দলের বা মতের গণ্ডীর মধ্যে টানিবার জন্য চেষ্টান্বিত। তাঁহার বিরাট সাহিত্য হইতে বচন ও কবিতা চয়ন করিয়া যে যাহার মতো তাঁহাকে গড়িতেছেন। কেহ তাঁহাকে ভক্ত, কেহ ঋষি, কেহ নাৎসি, কেহ কম্যুনিস্ট, কেহ ফাসিস্ত, কেহ বৈষ্ণব, কেহ ব্রাহ্ম, কেহ য়ুটোপিয়ানরূপে অভিহিত করিতেছেন, কেহ তাঁহার সাহিত্যকে অশ্লীল কেহবা বস্তুতন্ত্রহীন বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। সূর্যের আলো শুভ্র—বর্ণালীতে সে সপ্তবর্ণ।

রবীন্দ্রনাথকে যাঁহারা অধ্যয়ন করিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের কাছে এই কথাটি খুব স্পষ্ট করিয়া বলিতে চাই যে, কবিকে যাঁহারা কোনো গণ্ডী দল বা ismএর মধ্যে ধরিতে চেষ্টা করিবেন তাঁহারা রবীন্দ্রনাথকে পাইবেন না; অন্ধের হস্তীদর্শন হইবে। কবির জীবনদেবতা শতদলবিহারিণী। কবি শতদলের লোক, তাঁহাকে একটি দলের মধ্যে পাইবার চেষ্টা ব্যর্থ হইবে। রবীন্দ্রনাথ দলের ছিলেন না, দল গঠন করেন নাই। শারদোৎসবের একজন বালক ঠাকুরদাকে বলে, 'তুমি আমাদের দলে', দ্বিতীয় জন বলে, 'তুমি আমাদের দলে'। ঠাকুরদা বলেন, "ভাই, আমি ভাগাভাগির খেলায় নেই।... আমি সকল দলের মাঝখানে থাকব, কাউকে বাদ দিতে পারব না।" অন্যত্র বলিয়াছেন, "যখন কোনো অংশকে বাদ দিয়ে তবে সত্যকে সত্য বলি, তখন তাকে অস্বীকার করি। সত্যের লক্ষণই এই যে, সমস্তই তার মধ্যে এসে পড়ে। সেই মেলার মধ্যে আপাতত যতই অসামঞ্জস্য প্রতীয়মান হোক, তার মূলে একটা গভীর সামঞ্জস্য আছে, নইলে সে আপনাকে আপনি হনন করত।... ছাঁট দেওয়া সত্য এবং ঘরগড়া সামঞ্জস্যের প্রতি আমার লোভ নেই। আমার লোভ আরো বেশী, তাই আমি অসামঞ্জস্যকে ভয় করিনে।" (আত্মপরিচয়) মানুষ অপূর্ণ বলিয়াই সে সার্থক ও সুন্দর হইবার সুযোগ পায়।—

কত জয় কত পরাভব
ঐক্যবন্ধে বাঁধি এই সব
ভালোমন্দ সাদায় কালোয়
বস্তু ও ছায়ায় গড়া মূর্তি তুমি দাঁড়ালে আলোয়।

এই সাদায় কালোয় গড়া মানুষকেই কবিরা ভালোবাসিয়াছেন, সাহিত্যে তাহাদের গড়িয়াছেন,—দেবতাকে দূর হইতে প্রণাম করা যায়, মানুষকে বুকে টানা যায়। রবীন্দ্রনাথের সার্থকতা সেইখানেই যেখানে 'অপূর্ণ' মানুষের ধরণীকে 'আরেকটুখানি নবীন আভায় রঙিন' করিবার জন্য প্রার্থনা জাগিয়াছে। অন্তরের দিকে তাকাইয়া আজ আমরা যদি সে-কথায় সায় দিতে না পারি—যদি 'নবীন আভায়' নিজ নিজ জীবনের কোনো একটি অংশও রঙিন করিয়া না থাকি— তবে বুঝিব রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব ব্যর্থ হইয়াছে। কিন্তু তাহা যে হয় নাই, তাহা আজ বাঙালীর জীবন প্রতিদিন সাক্ষ্য দিতেছে। সে নয়নের মাঝখানে নিয়েছে যে ঠাঁই!

আমাদের এই আলোচ্য খণ্ড রবীন্দ্রনাথের জীবনের শেষ সাত বৎসরের ইতিহাস। এই পর্বটির ইতিহাস যেমন জটিল, উপাদানও তেমনই অতি-প্রচুর। এই সময়টি ভারতের স্বাধীনতা লাভের জন্য পূর্ণ-উদ্যমের পর্ব; পশ্চিম য়ুরোপেও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের উদ্যোগপর্ব। দেশের ও বিদেশের বিচিত্র রাজনৈতিক ঘটনাপরম্পরা মানুষের সকলপ্রকার অপমান দুঃখ ও বেদনা রবীন্দ্রনাথের স্পর্শচেতন চিত্তকে তীব্রভাবে আঘাত করে— সাড়া না দিয়া তিনি পারেন না। তাই দেখিতে পাই প্রতিবাদ, মতান্তর, এমনকি বন্ধুবিচ্ছেদের আশঙ্কা থাকা সত্ত্বেও অন্যায়কে অন্যায় বলিয়া ঘোষণা করিতে কবি বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ করেন নাই। বিশেষ দলের বিশেষ সম্প্রদায়ের বিরাগভাজন অথবা ব্রিটিশ ভারতের

কর্তৃপক্ষের অপ্রিয় হইবার ভয়ে, তাঁহার কাছে যাহা সত্য বলিয়া প্রতিভাত হইয়াছে এরূপ বিষয় সম্বন্ধে অকুণ্ঠ ভাষায় মত প্রকাশ করিতে নিরস্ত হন নাই। আত্মদৃষ্টি হইতে কবি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে ইংরাজকে ভারত ছাড়িতেই হইবে এবং তাহাকে কোন্ অবস্থায় ভারতকে রাখিয়া যাইতে হইবে তাহারও আভাস দিয়া গিয়াছিলেন—আজ তাহা বর্ণে বর্ণে সত্য হইতেছে।

আমাদের আলোচ্য পর্বে (১৯৩৫-৪১) রবীন্দ্রনাথের প্রায় চল্লিশখানি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়; ইহার মধ্যে সবগুলি নূতন গ্রন্থ নহে, কয়েকখানি পূর্ব-রচনার নূতন সংস্করণও আছে। এই গ্রন্থসমূহের মধ্যে আছে কবিতা, গান, নৃত্যনাট্য, গল্প, প্রবন্ধ, বিজ্ঞান, ভাষাতত্ত্ব, শিক্ষাবিষয়ক বই। তবে কবিতা ও গানের বই-ই বেশী—সতেরোখানি কাব্য এই পর্বের রচনা। এই সময়ের কবিতাপুস্তকগুলি সম্বন্ধে নানা লেখকের নানা মত, যেমন চিরদিনই হইয়া আসিয়াছে। বলা বাহুল্য, একই কাব্যকে বিভিন্নভাবে দেখা সমালোচকদের স্বভাবধর্ম। এই সব রচনা ছাড়া আছে সাংবাদিকদের সঙ্গে মোলাকাত, সংবাদপত্রে বিবৃতি ও খোলাচিঠি, জন্মদিনের ও বিবাহদিনের জন্য আশীর্বাণী, মৃত্যুর জন্য সান্ত্বনাবাণী, নূতন লেখকদের গ্রন্থপাঠ করিয়া উৎসাহবাণী, শিল্পপতিদের কর্মশালা পরিদর্শন করিয়া প্রশংসাবাণী ইত্যাদি। এই সমস্তের ফাঁকে ফাঁকে দীর্ঘকাল ছিল ছবি আঁকার কাজ।

রবীন্দ্রনাথের জীবনচরিত-রচনার উপাদান প্রচুর। প্রথমত তাঁহার রচনাই তাঁহার জীবনের প্রধান ভাষ্য ও সমালোচনা। নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টিতে আপনাকে দেখিবার অসামান্য ক্ষমতাবলে তিনি স্বয়ং বহুক্ষেত্রে বিচারকের আসনে বসিয়া আপনাকেই বিচার ও বিশ্লেষণ করিয়াছেন। এ ছাড়া কবিজীবনীর শ্রেষ্ঠ উপাদান তাঁহার চিঠিপত্র; তাঁহার জীবিতকালে যে-সব চিঠিপত্র সম্পাদিত ও সংশোধিত হইয়া প্রকাশিত হয় নাই. আমাদের মতে সেই সবই জীবনেতিহাসের প্রধানতম উপাদান। অত্যন্ত ব্যক্তিগত, এমনকি পারিবারিক চিঠিপত্র তাঁহার মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই এমনভাবে মুদ্রিত হইয়া বাহির হইবে, তাহা কবি স্বপ্নেও বোধ হয় ভাবেন নাই। ব্যক্তিগত ও পারিবারিক পত্র ব্যতীত তাঁহার বহুশত পত্র প্রকাশিত হইবার জন্যই লিখিত হয়, এবং সদ্য রচনার অব্যবহিত পরেই সমসাময়িক মাসিকপত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল; সেগুলির মধ্যে তত্ত্ব অনেক, তথ্য কম, তবে মনের ও মতের আবহাওয়াটা ভালো করিয়াই জানা যায়। ইন্দিরা দেবীকে লিখিত পত্রধারা কাটিয়া ছাঁটিয়া কবি 'ছিন্নপত্র' নামে বাহির করেন। ভাবিয়াছিলেন পত্রমধ্যে লিখিত জীবনের ব্যক্তিগত ঘটনাগুলি দিবালোক দেখিবে না। কিন্তু পরবর্তীকালে সাময়িক পত্রিকার অনুসন্ধিৎসু সম্পাদকগণ কৌতূহলী পাঠকদের সম্মুখে সেসবও পূর্ণভাবে পেশ করিয়াছেন। এই বিরাট পত্রধারা যৌবনকালের রবীন্দ্রনাথের জীবনীর শ্রেষ্ঠ উপাদান বলিয়া স্বীকৃত হইবে, কারণ সেগুলি লিখিবার সময় ছাপিবার কথা মনে হয় নাই।

কবির তিরোধানের পরে তাঁহার লিখিত কত শত পত্র যে সাময়িক পত্রিকাদিতে মুদ্রিত হইয়াছে তাহা সঠিক বলা কঠিন। এতদ্ব্যতীত বহু স্মৃতিগ্রন্থ ও আত্মজীবনীর মধ্যে কবি সম্বন্ধে অনেক তথ্য পাওয়া যাইতেছে। এইসব স্মৃতিগ্রন্থের মধ্যে কতকগুলি হইতে মূল্যবান উপাদান পাওয়া গিয়াছে; কিন্তু সকলগুলিই প্রামাণ্য বলিয়া স্বীকার করা যায় কিনা তাহা গভীরভাবে বিচার্য। সমসাময়িক উপাদান হইতে সেসব তথ্যের সমর্থন পাইলেই অবিসম্বাদী বলিয়া সেগুলিকে গ্রহণ করিতে পারা যায়; নতুবা অগ্রাহ্য হওয়া উচিত। সংক্ষেপে এইটুকুমাত্র বলিতে চাই যে, আমরা স্বভাবত ইতিহাসবিমুখ,—হয় সমস্ত বুদ্ধি বিবেচনা বিসর্জন দিয়া অন্ধ গুরুবাদী—নয়, সমস্ত প্রমাণ-প্রয়োগ তুচ্ছ করিয়া অহেতুনিন্দাবাদী; তথ্য নিরূপণ বিষয়ে আমরা স্বভাবতই শিথিল; আমাদের বিশ্বাস অল্পতেই; শোনা কথা বা 'গালগল্প' প্রমাণাভাবে বিশ্বাস করিতে দ্বিধা বোধ করি না; আবার তথ্যানুসন্ধানের জন্য মেহন্নত করিতেও পরাঙ্মুখ। কোনো কোনো লেখক কবির জবানীতে অনেক তথ্য ও তত্ত্ব বলিয়াছেন। তাহা যে রবীন্দ্রনাথের ভাষা নহে, তাহা

রবীন্দ্রসাহিত্যের বিদগ্ধ পাঠক সহজেই ধরিতে পারিবেন। সেইসব রচনার মধ্যে কতখানি রবিচ্ছায়া ও কতখানি লেখকের উপচ্ছায়া পড়িয়াছে নির্ণয় করা কঠিন। এইখানে থুকিডিডেস তাঁহার ইতিহাসের উপাদান সংগ্রহ ও রচনারীতি সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা স্মরণীয়; তিনি লিখিয়াছিলেন "এই যুদ্ধে যে-সব ঘটনা ঘটেছিল কেবল লোকের মুখে গল্প শুনে কি অনুমানে নির্ভর করে তাদের বর্ণনা করিনি। যে ঘটনা আমি নিজে প্রত্যক্ষ করেছি নিজের জ্ঞান থেকে তা লিখেছি। যেখানে তা সম্ভব হয়নি সেখানে প্রত্যক্ষদর্শীদের বিবরণ বহু পরীক্ষার পর গ্রহণ করেছি। এ কাজ কঠিন, কারণ একই ঘটনা যারা দেখে তাদের বিবরণের মধ্যে অনেক অসংগতি। মনের পক্ষপাতিত্ব ও স্মৃতিশক্তির তারতম্য এই অসংগতির কারণ। আমার বিবরণে গল্প ও কল্পনার মিশাল নেই, সেজন্য হয়তো তেমন সুখপাঠ্য নয়। তবে তাদের তৃপ্তি দেবে যারা অতীত ঘটনার অবিকৃত বিবরণ ভালোবাসেন। আমার ইতিহাস সাধারণের স্থায়ী সম্পত্তি, সাময়িক হাততালি লাভের কৌশল নয়।"[১]

রবীন্দ্রনাথের সার্ধ-সহস্রাধিক-পৃষ্ঠাব্যাপী জীবনী লিখিতে আমার জীবনের দীর্ঘকাল গিয়াছে। তরুণ বন্ধুরা মাঝে মাঝে জিজ্ঞাসা করেন কবে এই গ্রন্থরচনা আরম্ভ হয়। সঠিক তারিখ দেওয়া কঠিন। গ্রন্থরচনার পূর্বে রবীন্দ্রসাহিত্য-অধ্যয়ন ও রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে তথ্যাদি-সংগ্রহকে এই গ্রন্থপ্রণয়নেরই অঙ্গ বলিয়া ধরা উচিত। আমি ১৯০৯ সালের শেষভাগে শান্তিনিকেতনে আসি—রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত সংস্পর্শে আসিলাম এই প্রথম— তার পর বত্রিশ বৎসর তাঁহাকে দেখিবার, জানিবার, তাঁহার কথা শুনিবার, তাঁহার অপার স্নেহ পাইবার, তাঁহার সহিত তর্কবিতর্ক—এমন কি সভাসমিতিতে তাঁহার বিরোধিতা করিবার—সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলাম। সেইসব ধৃষ্টতার কথা মনে হইলে অবাক হইয়া ভাবি কী ধৈর্যশীল মহাপুরুষের সঙ্গলাভের সুযোগ পাইয়াছিলাম। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে গ্রন্থ লিখিব এই দুরাকাঙ্ক্ষা কবে হইল তাহার ইতিহাস আমার স্নেহাস্পদ বন্ধু শ্রীমান সুধীরচন্দ্র কর পুরাতন কাগজপত্র হইতে সম্প্রতি উদ্ধার করিয়া আমার কাছে পেশ করিয়াছেন। শান্তিনিকেতনে ১৯২৯ সালে গ্রীষ্মাবকাশের পর অমিয় চক্রবর্তী ও সুধীরচন্দ্র করের সম্পাদকত্বে 'রবীন্দ্র-পরিচয়-সভা' স্থাপিত হয়। সভার পক্ষ হইতে এক আবেদন-পত্র প্রচার করা হয়, তাহাতে ঐ সভার জন্য কে কী কাজ করিবেন সে সম্বন্ধে নিজ নিজ মত লিপিবদ্ধ করিবার অনুরোধ লইয়া সুধীরচন্দ্র হাজির হন। এই পত্রে আশ্রমের তৎকালীন প্রায় সকলেরই নাম-স্বাক্ষর দেখিলাম। সেইখানে আমি লিখিয়াছিলাম যে, "১৯১০ সাল হইতে রবীন্দ্রনাথের 'জীবনী' সংকলন করিবার ভার গ্রহণ করিলাম—২৯. ৭. ২৯।" সেইদিন ছিল ১৩ শ্রাবণ ১৩৩৬। তারপর রবীন্দ্রজীবনীর চতুর্থ খণ্ডের রচনা-সমাপ্তি ও বিশ্বভারতীর সহিত আমার কর্মজীবনের প্রত্যক্ষ সম্বন্ধের অবসান ঘটিল প্রায় সেই সময়েই—১১ শ্রাবণ ১৩৬১ (২৭ জুলাই ১৯৫৪)।

এই দিনের সহিত আমার জীবনের আর একটি সামান্য ঘটনা যুক্ত আছে। ১৩১৭ সালের আষাঢ় মাসে আমি ব্রহ্মচর্যাশ্রমের শিক্ষকরূপে নিযুক্ত হই; সেই বৎসর ১১ শ্রাবণ আমার জন্মদিনে আমার মত অভাজনের কথা দিয়া বুধবারের সন্ধ্যাকালীন মন্দিরের উপাসনা কবি আরম্ভ করেন (পূর্ণ, শান্তিনিকেতন ১২শ খণ্ড)। তিনি বলেন, "আমাদের এই আশ্রমবাসী আমার একজন তরুণ বন্ধু এসে বললেন, 'আজ আমার জন্মদিন, আজ আমি আঠারো পেরিয়ে উনিশ বছরে পড়েছি।' তাঁর এই যৌবনকালের আরম্ভ, আর আমার এই প্রৌঢ়বয়েসের প্রান্ত—এই দুই সীমার মাঝখানকার কালটিকে কত দীর্ঘ বলেই মনে হয়। আমি আজ যেখানে দাঁড়িয়ে তাঁর এই উনিশ বছরকে দেখছি, গণনা ও পরিমাপ করতে গেলে সে কত দূরে। তাঁর এবং আমার বয়সের মাঝখানে কত আবাদ, কত ফসল ফলা, কত ফসল কাটা, কত ফসল নষ্ট হওয়া, কত সুভিক্ষ এবং কত দুর্ভিক্ষ প্রতীক্ষা করে রয়েছে তার ঠিকানা

১ শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত, "ইতিহাসের মুক্তি", বিশ্বভারতী পত্রিকা, শ্রাবণ আশ্বিন ১৩৫২।

নেই।...তাই আমার পরিণত বয়সের সমস্ত অভিজ্ঞতা ও চিত্তবিস্তার সত্ত্বেও আমি আমার উনিশ বছরের বন্ধুটিকে তাঁর তারুণ্য নিয়ে অবজ্ঞা করতে পারিনে। বস্তুত তাঁর এই বয়সে যত অভাব ও অপরিণতি আছে, তারাই সবচেয়ে বড়ো হয়ে আমার চোখে পড়ছে না, এই বয়সের মধ্যে যে একটি সম্পূর্ণতা ও সৌন্দর্য আছে, সেইটেই আমার কাছে উজ্জ্বল হয়ে দেখা দিচ্ছে।"

আজ জীবনের সন্ধ্যায় আসিয়া আমিও পিছন ফিরিয়া অতীত জীবনকে দেখিতেছি। আমার একমাত্র বলিবার কথা এই যে, জীবনে যে মূলধন লইয়া আসিয়াছিলাম, তাহা নষ্ট করি নাই। শান্তিনিকেতনের পরিবেশ, রবীন্দ্রনাথের স্নেহ, রথীন্দ্রনাথের সহায়তা, আশ্রমবন্ধুদের উপদেশ, হিতাকাঙ্ক্ষীদের ভর্ৎসনা, সহকর্মীদের সহযোগিতা সমস্তই আমার অনুকূলে কার্য করিয়া আসিয়াছে। পঁয়তাল্লিশ বৎসর শান্তিনিকেতন হইতে এত আনন্দ, এত আনুকূল্য, এত জ্ঞান লাভ করিয়াছিলাম যে, তাহার হিসাব দেওয়া কঠিন। মানুষ অনেক-কিছুই হয় না, অনেক-কিছুই পায় না—সেই অভাব অপূর্ণতার তো শেষ নাই। কিন্তু যাহা সে পাইয়াছে তাহারই কি শেষ আছে? কবি ১১ শ্রাবণ ১৩১৭ প্রাতে গীতাঞ্জলির একটি যে কবিতা লেখেন, তাহাকেই আমার জন্মদিনের মন্ত্ররূপে গ্রহণ করিয়াছি :

যখন আমায় বাঁধ আগে পিছে,
মনে করি আর পাব না ছাড়া।
যখন আমায় ফেল তুমি নীচে
মনে করি আর হব না খাড়া।
আবার তুমি দাও যে বাঁধন খুলে,
আবার তুমি নাও আমারে তুলে,
চিরজীবন বাহুদোলায় তব
এমনি করে কেবলি দাও নাড়া।
ভয় লাগায়ে তন্দ্রা কর ক্ষয়,
ঘুম ভাঙায়ে তখন ভাঙ ভয়।
দেখা দিয়ে ডাক দিয়ে যাও প্রাণে,
তাহার পরে লুকাও যে কোনখানে,
মনে করি এই হারালেম বুঝি,
কোথা হতে আবার যে দাও সাড়া।

কবির নিকট হইতে আর-একদিন আমার জন্মদিনের জন্য লিখিত তাঁহার আশীর্বাণী পাইয়াছিলাম, সেইটি লিখিয়া দেন ১১ শ্রাবণ ১৩২১ তারিখে; তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া আমার নিবেদন শেষ করিলাম—

প্রভাতের 'পরে দক্ষিণ করে
রবির আশীর্বাদ—
নূতন জনমে নবনব দিন
তোমার জীবন করুক নবীন,
অমল আলোকে দূরে হোক্ লীন
রজনীর অবসাদ।

এই গ্রন্থপ্রণয়নে যাঁহাদের সহায়তা এতাবৎ কাল নানাভাবে লাভ করিয়াছি তাঁহাদের কথা ইতিপূর্বে তিন খণ্ডের ভূমিকায় উল্লেখ করিয়াছি; যদি অনবধানবশত কাহারও নাম করিতে ভুলিয়া গিয়া থাকি তবে তাঁহারা যেন বিশ্বাস করেন যে উহা স্বেচ্ছাকৃত নহে, বার্ধক্যজনিত ভ্রম। আশা করি তাঁহারা ক্ষমা করিবেন। এই খণ্ড-প্রণয়নে শ্রীমতী সাধনা কর ও রবীন্দ্রসদনের শ্রীশোভনলাল গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীচিত্তরঞ্জন দেব ও শ্রীমোহিতকুমার মজুমদার মহাশয়দের সহায়তা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রায় প্রতিদিনই নানাভাবে যাঁহার সহযোগিতা পাইয়াছি তাঁহার নাম অনুল্লিখিত থাকিলেও পাঠক অনুমান করিতে পারিবেন আশা করিয়া নীরব থাকিলাম। এই খণ্ডের শেষাংশে বিস্তারিত সংযোজন ও সংশোধন প্রদত্ত হইয়াছে। যাঁহাদের কাছ হইতে সহায়তা লাভ করিয়াছি তাঁহাদের নাম সংযোজনাদির সঙ্গে প্রদত্ত হইয়াছে। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য সংযোজন হইতেছে দ্বিতীয় পরিশিষ্ট। রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে এযাবৎকাল যেসব গ্রন্থ বাংলায় রচিত হইয়াছে তাহার তালিকা প্রস্তুত করিয়াছেন শ্রীপুলিনবিহারী সেন। এ কাজ তাঁহার স্বেচ্ছাপ্রণোদিত আনন্দকর্ম, তজ্জন্য তিনি ধন্যবাদ বা কৃতজ্ঞতার অপেক্ষা রাখেন না।

এই বৃহৎ গ্রন্থ শেষ করিবার সময় আজ বিশেষভাবে স্মরণ হইতেছে রথীন্দ্রনাথকে। আজ বিশ্বভারতীর সহিত আপাতদৃষ্টিতে তিনি সম্বন্ধশূন্য; কিন্তু শান্তিনিকেতনের সহিত আবাল্যের তাঁহার যে নাড়ির যোগ তাহা ছেদন করিবার শক্তি তাঁহারও নাই, অপরেরও নাই। আমার সহিত তাঁহার সম্বন্ধ সাতচল্লিশ বৎসরের। জীবনে ও কর্মে তাঁহার যে অনুকূলতা পাইয়াছিলাম তাহার প্রধানতম সাক্ষ্য আমার এই গ্রন্থ; পদে পদে তাঁহার সহায়তা না পাইলে এই গ্রন্থ লিখিতে পারিতাম না। অথচ গ্রন্থমধ্যে আমি এমন বহু মতামত ব্যক্ত করিয়াছি যাহা হয়তো সকলে গ্রহণ করিবেন না; কিন্তু কোনোদিন, কি বিশ্বভারতীর পক্ষ হইতে কি ব্যক্তিগত ভাবে, তিনি আমাকে নিবৃত্ত করিবার বা প্রভাবান্বিত করিবার চেষ্টামাত্র করেন নাই। সম্পূর্ণ স্বাধীনতা পাইয়াছিলাম।

বিশ্বভারতীর প্রকাশন-বিভাগের অধিকর্তা শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য মহাশয় সাহসপূর্বক এই গ্রন্থ-প্রকাশের দায়িত্ব গ্রহণ না করিলে এই গ্রন্থ প্রকাশিত হইত কিনা জানি না। গ্রন্থমুদ্রণকালে আমি যেরূপ অত্যাচার করিয়াছি তাহা কোনো ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান সহ্য করিত না; আমি তজ্জন্য বিশ্বভারতীর প্রকাশন-বিভাগের নিকট কৃতজ্ঞ।

বিশেষভাবে ধন্যবাদার্হ শান্তিনিকেতন প্রেসের ম্যানেজার শ্রীযতীন্দ্রনাথ বিশ্বাস। তাঁহার সহকারী শ্রীবিভূতিভূষণ মিত্র, সুদক্ষ হেড কম্পোজিটর শ্রীবলরাম সাহা ও মেশিনম্যান শ্রীভূতনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি সকলেই অশেষ ধৈর্যের সহিত এই কর্ম সমাপ্ত করিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহাদের নিকট আমি কৃতজ্ঞ।

এই দীর্ঘকাল প্রতিষ্ঠান হইতে এত আনুকূল্য, এত করুণা, এত স্নেহ ও শ্রদ্ধা পাইয়াছি যে তাহার বিস্তৃত বিবরণ লিখিতে হইলে ভূমিকা দীর্ঘ হইয়া পড়িবে—

> যাবার দিনে এই কথাটি বলে যেন যাই
> যা দেখেছি, যা পেয়েছি তুলনা তার নাই।

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

১১ শ্রাবণ ১৩৬৩
২৭ জুলাই ১৯৫৬
ভুবননগর। বোলপুর

সূচী

লক্ষ্মীশ্বর সিংহ কর্তৃক সুইডেন হইতে স্লয়ড্ শিক্ষিকাদের আসিবার ব্যবস্থা—লক্ষ্মীশ্বর শ্রীনিকেতনের প্রতিষ্ঠাকালীন ছাত্র—'কাঠের কাজ' গ্রন্থের রবীন্দ্রনাথ লিখিত ভূমিকা—হাতের কাজ সম্বন্ধে রাসকিন্—ব্রহ্মচর্যাশ্রমে কারুশিল্প ও কাঠের কাজ—শ্রীনিকেতনে শিল্পভবন—১৯২৮এ কবির নির্দেশে লক্ষ্মীশ্বরের সুইডেন যাত্রা ও স্লয়ড শিক্ষা—স্লয়ডের ইতিহাস—লক্ষ্মীশ্বরের প্রত্যাবর্তন ও শান্তিনিকেতনে স্লয়ড প্রবর্তন—পুনরায় সুইডেন যাত্রা—রবীন্দ্রনাথের পত্র সোয়েন হেডিন্‌কে—সুইডেনে কাউণ্টেস হ্যামিলটনের সহায়তায় শান্তিনিকেতনে স্লয়ড শিক্ষিকা প্রেরণের ব্যবস্থা—মিস জিয়ানসন প্রথম শিক্ষিকা ১৯৩৪-৩৫—মিস্ সেডারব্লম দ্বিতীয় শিক্ষিকা—লক্ষ্মীশ্বরের বুনিয়াদি শিক্ষাকেন্দ্রে যোগদান—কাউণ্টেস হ্যামিলটন শান্তিনিকেতনে—রবীন্দ্রনাথকে ও ক্ষিতিমোহন সেনকে পত্রধারা—পূজাবকাশের পূর্বে শারদোৎসব অভিনয়—কবি ঠাকুরদার ভূমিকায়—ছুটিতে আশ্রমেই বাস—তাঁহার অধ্যয়নশীলতা—কালিঘাট মন্দিরে জীববলি বন্ধের আন্দোলন ও রামচন্দ্র শর্মা—কবির মত ও কবিতা—জীববলির পক্ষে ও বিপক্ষে আলোচনা—আঁরি বার্বুসের শান্তিবৈঠকের পরিকল্পনা।

পত্রপুটের পর্ব (পৃ ৩৫-৪৫) ব্যাধি ও বার্ধক্যজনিত দুর্বলতা—অভ্যাসমতো সকল কাজ করেন—পত্রপুটের কবিতা—'ছুটি', 'পৃথিবী'—ঈশ্বর সম্বন্ধে ধারণার বিবর্তন—পূজাবকাশের পর শ্রীভবনে মাদাম বস্‌নেক পরিদর্শিকা—শ্রীনিকেতনে 'নবান্ন' উৎসব প্রবর্তন—কবি য়োন্ নোগুচির অভ্যর্থনা—ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের সংবর্ধনার জন্য কবিতা প্রেরণ—রামকৃষ্ণ পরমহংসের শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে ৬ ছত্র কবিতা—বিদ্যালয়ে পূজাবকাশের পর 'অরূপরতন' অভিনয়—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরদার ভূমিকায়—কলিকাতার এম্পায়ার থিএটরে 'অরূপরতন' অভিনয়—কবির শরীর খারাপ হইলে শান্তিনিকেতনে প্রত্যাবর্তন—বিশ্বভারতীর সাম্বৎসরিক সভা—প্রতিষ্ঠানের সংবিধান বা কনষ্টিটিউশনের পরিবর্তন—কলিকাতায় ন্যাশনাল আর্ট গ্যালারি স্থাপন বিষয়ে তাঁহার অভিমত—নিখিল ভারত গ্রাম উদ্যোগ সমিতি—নন্দলাল বসু ও রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে কুমারাপ্পার পরামর্শ—ভবিষ্যৎ সংগ্রহালয় সম্বন্ধে কবির মত—কন্‌গ্রেসের সুবর্ণজয়ন্তীর জন্য বাণী প্রেরণ—কুটির শিল্প চাউল প্রস্তুত সম্বন্ধে কবির মত—গান্ধীজির মত—খাদ্যসমস্যা ও শান্তিনিকেতনে পুষ্টিকর খাদ্য ব্যবস্থার ব্যর্থ চেষ্টা—'বাংলাশব্দতত্ত্ব' প্রকাশ—বিধুশেখর ভট্টাচার্যের মহামহোপাধ্যায় উপাধি লাভ ও কবির পত্র ও কবিতা—ইথেল কাটার—য়েটস্ ব্রাউন—মিসেস মার্গেরেট স্যাংগার কবিসন্দর্শনে—জন্মনিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে কবির মত।

কলিকাতায় শিক্ষাসপ্তাহ (পৃ ৪৫-৪৮) কলিকাতায় শিক্ষাসপ্তাহ—Progressive education আন্দোলনের ইতিহাস—নবশিক্ষাসংঘের সম্মেলন—এলসিনোরে কবি উপস্থিত ছিলেন—কলিকাতায় সিনেট হলে কবির ভাষণ 'শিক্ষার স্বাঙ্গীকরণ'—গান্ধীজি সম্বন্ধে কবির মত—লোকশিক্ষা-প্রসার সম্বন্ধে কবির প্রস্তাব পেশ—কবির 'বাংলাভাষা পরিচয়' কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে লোকশিক্ষা গ্রন্থমালায় প্রকাশিত হয়—কবির শান্তিনিকেতনে প্রত্যাবর্তন—পথে বর্ধমানে সংবর্ধনা—দেবীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়ের আতিথ্য গ্রহণ—'উদাসীন' কবিতায় কাব্যশ্রীর অদর্শন হেতু বিষাদ।

নৃত্যনাট্য চিত্রাঙ্গদা (পৃ ৪৯-৫৩) চিত্রাঙ্গদা নাট্যকাব্য নৃত্যনাট্যে রূপায়ন (১৯৩৬ ফেব্রু)—অভিনয়ের আয়োজন—শান্তিনিকেতন কালের পরিবর্তন—কবি ক্রমেই unconventional ও secular হইতেছেন—আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মহম্মদ হবীবের সুফিবাদ সম্বন্ধে বক্তৃতা—প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক সম্মেলন—কবির সহিত শিক্ষকরা মিলিত হন—বসন্তোৎসবে জবহরলাল নেহেরুর পত্নী কমলার মৃত্যু উপলক্ষ্যে মন্দিরে ভাষণ—কলিকাতায় চিত্রাঙ্গদার অভিনয়—স্টেটসম্যান-এর মত—নাট্যকাব্যের মর্মকথা—ধূর্জটিপ্রসাদ, শান্তিদেব ও প্রতিমা দেবীর মত।

উত্তর-ভারতে সফর ও তারপরে (পৃ ৫৩-৬২) চিত্রাঙ্গদা অভিনয়ের জন্য উত্তর ভারত যাত্রা—পাটনায়—এলাহাবাদে—লাহোরে—দিল্লীতে—মডার্ন ইস্কুলের উপাসনা-গৃহ উন্মোচন—দিল্লী মুন্সিপালিটির রবীন্দ্র-সংবর্ধনায় আপত্তি—গান্ধীজি ও কস্তুরাবাই-এর কবিসাক্ষাৎ—কবিকে ৬২,০০০ টাকার চেক দান—মিরাটে অভিনয়—দিল্লীর হিন্দু কলেজে কবি-সংবর্ধনা—রেডিও স্টেশন হইতে কবিতা আবৃত্তি—শান্তিনিকেতনে প্রত্যাবর্তন—১৩৪৩ নববর্ষে জন্মোৎসবের দিন প্রবর্তন—'শেষ মৌন', 'ব্রাত্য', পত্রপুটের কবিতা—কৃষ্ণকৃপালনীর সহিত নন্দিতা গাঙ্গুলির বিবাহ—কবি কলিকাতায় (৭ মে)—বরাহনগরে বাস—P E N ক্লাবে কবিসংবর্ধনা—আশ্রমিক সংঘের কবি-সংবর্ধনা—শান্তিনিকেতনে প্রত্যাবর্তন—বীরভূমে জলাভাব ও দুর্ভিক্ষ—ভুবনডাঙা বাঁধ সংস্কার—কবির আবেদনপত্র—সমবায়ের শক্তিবলে জলাশয় সংস্কার—বেঙ্গল ট্যাংক ইম্প্রুভমেণ্ট আইন—লোকশিক্ষা সংসদ গঠনের আয়োজন—জবহরলালের পত্র—মোহম্মদী কাগজের 'পূজারিণী' ও 'গান্ধারীর আবেদনে'র সমালোচনা—কবির উত্তর—শ্যামলী কাব্যখণ্ডের কবিতা—'মিলভাঙা', 'কালরাত্রি', 'অমৃত', 'বাঁশিওয়ালা'—ভাষা বিষয়ক আলোচনা—শব্দতত্ত্বের একটি তর্ক—'ছন্দ' প্রকাশিত—দিলীপকুমার রায়কে উৎসর্গ—প্রবোধচন্দ্র সেন কৃত 'ছন্দোগুরু রবীন্দ্রনাথ'—কবির ভাষণ 'বাংলা ছন্দের প্রকৃতি'।

বিচিত্র ঘটনা ১৩৪৩ (পৃ ৬৩-৭৮) কবি শান্তিনিকেতনে—শরৎচন্দ্র প্রমুখদের আগমন ও সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার বিরুদ্ধে সভায় কবিকে সভাপতিত্ব করিবার অনুরোধ—লর্ড জেটল্যানডের নিকটে বাঁটোয়ারার বিরুদ্ধে মেমোরিয়েল—প্রথম স্বাক্ষরকারী রবীন্দ্রনাথ—১৫ জুলাই ১৯৩৬ টাউনহলে সভা—কবি ধর্ম ও সম্প্রদায় নিরপেক্ষ রাষ্ট্রব্যবস্থার পক্ষপাতী—মদনমোহন মালব্যের এই বিষয় টেলিগ্রাম ও পত্র—সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে কবির ভাষণ (অনুবাদ)—শরৎচন্দ্রের গৃহে রবি-বাসরে কবি উপস্থিত—শান্তিনিকেতনে প্রত্যাবর্তন—জবহরলাল নেহেরুর নিকট হইতে ব্যক্তিস্বাধীনতা-সংঘ সম্পর্কে পত্র—কবির উত্তর ও সভাপতিত্ব গ্রহণ—বিশ্বভারতীর নূতন কনষ্টিটিউশন ও কর্মীদের অধিকার সংকোচন—অধ্যাপক-সভায় কবির ভাষণ—পুরাতনকে বজায় রাখিবার ইচ্ছা—'শ্যামলী' গৃহ বর্ষাকালে অব্যবহার্য হইল—'পুনশ্চ' গৃহ নির্মাণ—'শ্যামলী' কাব্যখণ্ড রানী মহলানবীশকে উৎসর্গ—মনের relief—'সে', 'খাপছাড়া', 'প্রহাসিনী', 'ছড়া' প্রভৃতি—'খাপছাড়া' রাজশেখর বসুকে উৎসর্গ—রাজশেখরের 'গড্ডলিকা' পড়িয়া প্রফুল্লচন্দ্র রায়কে পত্র—রাজশেখর বিজ্ঞানসদন—বর্ষামঙ্গল উৎসব—ভুবনডাঙার জলাশয়তীরে উৎসব—স্থানীয় ইতিহাস—ব্রুসেলসের আন্তর্জাতিক শান্তি ও স্বাধীনতাকালীন নারীসংঘের জন্য বাণী প্রেরণ—ভারতের প্রগতিশীল লেখকদের বক্তব্য—জবহরলালের আত্মজীবনী হইতে উদ্ধৃতি—ডাবলিনে সোসাইটি অব্ ফ্রেনডসের নিকট প্রেরিত কবির বাণীতে গবর্মেণ্টের আপত্তি—ভাদ্রমাসের শেষে কবি কলিকাতায়—বরাহনগরে—'বাংলা বানানের নিয়ম' অনুমোদন—যোগেন্দ্রনাথ সরকার সম্পাদিত 'গল্পসঞ্চয়ন' বার্ষিকীর জন্য ভূমিকা—কলিকাতা হইতে ফিরিয়া 'পরিশোধ' নৃত্যনাট্যর মহড়া—'সাহিত্যের পথে' প্রকাশ—পুনরায় কলিকাতায়—আশুতোষ কলেজে 'পরিশোধ' অভিনয়—স্টেটসম্যানের মন্তব্য—শরৎচন্দ্রের জয়ন্তী-উৎসবসভায় কবি—রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—নিখিলবঙ্গ মহিলা কর্মী সম্মেলনে কবির ভাষণ 'নারী'—কলিকাতা হইতে শান্তিনিকেতনে প্রত্যাবর্তন—পূজাবকাশ—জনশূন্য উত্তরায়ণ—শ্রীনিকেতনে একমাস—জবহরলাল নেহেরু সাক্ষাৎ করিতে আসেন—কবির সহিত বিশিষ্ট লোকদের মোলাকাত সম্পর্কে প্রবাসীর মন্তব্য।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন (পৃ ৭৮-৮৩) শ্রীনিকেতন হইতে শান্তিনিকেতনে প্রত্যাবর্তন—পৌষউৎসবাদি—খ্রীষ্টোৎসবের ভাষণ—মাঘোৎসব সম্বন্ধে—নূতন গান—মাঝে প্রহাসিনীর কবিতা—বিন্টারনিটজের মৃত্যুসংবাদ—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাদিবসের জন্য গান রচনা—'চলো যাই,

চলো যাই'—কলিকাতায়—মুসলমান ছাত্রদের উৎসবে বিরোধিতা—'আফ্রিকা' কবিতা—সমাবর্তনে কবির ভাষণ—বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলাভাষা প্রবর্তন চেষ্টার ইতিহাস— চন্দননগরে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলন— কবির ভাষণ—রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের শতবার্ষিকী উৎসব—কবির ভাষণ—বহুকাল পরে অনুবাদ প্রকাশ।

আলমোড়া ১৯৩৭ (পৃ ৮৩-৯২) কলিকাতা হইতে প্রত্যাবর্তন ১৯৩৭ মার্চ ৭—শান্তিনিকেতনে স্যর জন রাসেল—রবিবাসরের সদস্যগণের আশ্রমসফর—কবির ভাষণ—নানা ভাবের কবিতা—'যাবার মুখে', 'স্মরণ', 'হিন্দুস্থান', 'ভাগীরথী', 'পাবনায় বাড়ি হবে'—নববর্ষ ১৩৪৪—চীনাভবনের দ্বার উন্মোচন—চীনাদের দান প্রায় নয়লক্ষ টাকা—গান্ধীজির পত্র—অনুপস্থিত জবহরলাল নেহেরুর ভাষণ—কবির ভাষণ—'বিশ্বপরিচয়ে'র খসড়া—সপরিজন আলমোড়া যাত্রা—সেখানে বিশ্বপরিচয় রচনা—'ছড়ার ছবি' নন্দলাল বসুর স্কেচ অবলম্বনে রচিত—আলমোড়ায় রচিত কবিতার তালিকা—বাংলা বানান সম্বন্ধে দেবপ্রসাদ ঘোষের প্রবন্ধ—কবির উত্তর—আলমোড়ার অতিথি—প্রত্যাবর্তন লখনৌ হইয়া।

পতিসরে (পৃ ৯২-৯২) শান্তিনিকেতনে প্রত্যাবর্তন ১৩৪৪ আষাঢ় ১৬—হুইটম্যান সম্বন্ধে বক্তব্য—পতিসরে—অভ্যর্থনা—জমিদার ও প্রজার সম্বন্ধ।

অন্তরীণাবদ্ধদের অনশন (পৃ ৯৩-৯৬) আন্দামান দ্বীপের বন্দীদের অনশন ধর্মঘট—পটভূমি—মোসলীম্ লীগের শাসন—টাউন হলে প্রতিবাদ সভা—কবি সভাপতি—ভাষণ—বন্দীদের নিকট টেলিগ্রাম—শান্তিনিকেতনে প্রত্যাবর্তন—বর্ষামঙ্গলের আয়োজন—'আন্দামান দিবস'—প্রচলিত দণ্ডনীতি সম্বন্ধে বক্তৃতা—শান্তিনিকেতনকে রাজনীতি হইতে দূরে রাখার ইচ্ছা—হলকর্ষণ ও গণসংযোগ—বীরেশ্বর গোস্বামীর মৃত্যুতে বর্ষামঙ্গল স্থগিত—কলিকাতায় 'ছায়া' প্রেক্ষাগৃহে বর্ষামঙ্গল সেপ্টেম্বর ১৯৩৭—নূতন গান।

প্রান্তিক (পৃ ৯৭-১০০) শান্তিনিকেতনে প্রত্যাবর্তন ১৩৪৪ ভাদ্র ২১—হঠাৎ হতচৈতন্য হন ২৫ ভাদ্র বা ১০ সেপ্টেম্বর ১৯৩৭—গান্ধীজির টেলিগ্রাম ও কবির পত্র—চীনদেশে কবির অসুস্থতার সংবাদে উদ্বেগ—সুস্থ হইয়া বিশ্বপরিচয় ও ছড়ার ছবির ভূমিকা লেখা, ২ আশ্বিন—প্রান্তিকের কবিতা—নববর্ষের সময়ে জ্ঞানহীন অবস্থার অভিজ্ঞতার কথা—জন্মদিনের কবিতায় এই ভাবের পুনরুক্তি—'বিশ্বপরিচয়' উৎসর্গ সত্যেন্দ্রনাথ বসুকে—পঠন পাঠন প্রণালী সম্বন্ধে—বিজ্ঞান সম্বন্ধে মত।

আরোগ্যলাভের পর (পৃ ১০০-০৬) চিকিৎসার জন্য কলিকাতায় তিন সপ্তাহ, অক্টোবর ১৯৩৮—নানা লোকসমাগম— বন্দীসমস্যা লইয়া গান্ধীজির আগমন কলিকাতায় ও হঠাৎ অসুস্থতা—কবি সাক্ষাৎ করিতে যান—বেলঘরিয়াতে কবির সহিত সুভাষচন্দ্রের সাক্ষাৎ—কলিকাতায় নিখিল ভারত কনগ্রেস কমিটির অধিবেশন—'বন্দেমাতরম্' জাতীয় সংগীত হইতে পারে কিনা তৎসম্বন্ধে কবির মত—জবহরলাল কবির সহিত একমত—'জনগণমন' সম্বন্ধে—কলিকাতা হইতে প্রত্যাবর্তন ১৯৩৭ নভেম্বর ৪—বিশ্বভারতীর আভ্যন্তরীণ পরিবর্তন—'বীরভূম জেলা রাষ্ট্রীয় সম্মিলনী'তে কবির বাণী ১৪ নভেম্বর—অন্তরীণাবদ্ধদের মুক্তি সংবাদে কবির বিবৃতি—চিকিৎসার জন্য কলিকাতায়—জগদীশচন্দ্র বসুর মৃত্যুসংবাদ—প্রান্তিকের কবিতা— পৌষ উৎসব (১৩৪৪)—ভাষণ 'প্রলয়ের সৃষ্টি'—খ্রীষ্টদিনের কবিতা।

বুনিয়াদি শিক্ষা ও শিক্ষাসত্র (পৃ ১০৭-২১) নবশিক্ষাসংঘ বা নিউ এডুকেশন ফেলোশিপের সম্মেলনে বুনিয়াদি শিক্ষাসম্বন্ধে কবির ভাষণ—শান্তিনিকেতনে NEFএর সদস্যগণ—লর্ড লোথিয়ান—মহাত্মাজির শিক্ষাদর্শ পেশ—ছয়টি প্রদেশে কনগ্রেস পার্টির শাসন—বুনিয়াদি শিক্ষাসম্পর্কে কমিটি গঠন—আরিয়াম ও আশাদেবী ওয়ার্ধায়—'হরিজন' পত্রিকায় বেসিক্ এডুকেশন বা বুনিয়াদি শিক্ষার খসড়া—কারুকেন্দ্রিক

শিক্ষা সম্বন্ধে কবির মত—অন্যান্য শিক্ষাশাস্ত্রীদের মত—কারুকেন্দ্রিক শিক্ষার ইতিহাস—চার্লস্ পিয়ার্স, উইলিয়াম জেম্‌স, জন্ ডিউই—ফিন্‌ডলের গ্রন্থ 'ফাউন্‌ডেশনস্ অব এডুকেশন' (১৯৩০) রবীন্দ্রনাথকে উৎসর্গিত—ঐ গ্রন্থে ডিউই ও রবীন্দ্রনাথের তুলনা আছে—কিল্‌প্যাট্রিক-এর বক্তৃতাংশ—রবীন্দ্রনাথের সর্বাঙ্গীণ শিক্ষার পরিকল্পনা, সেন্টার অব্ ইন্‌ডিয়ান্ কালচার হইতে উদ্ধৃতি—শান্তিনিকেতনে শিক্ষার বিরোধ—'শিক্ষাসত্র' অনাথবিদ্যার্থীর জন্য—কবির শিক্ষাতত্ত্বের মূলকথা স্বাধীনতা ও সংযম—সংগীত ও কলা—এলমহার্স্টের শিক্ষাপরিকল্পনা—শ্রীনিকেতনের চতুষ্পার্শ্বে হোম্ প্রজেক্ট—সন্তোষচন্দ্র মজুমদার ও শিক্ষাসত্র—এতৎসম্পর্কে প্রেমচাঁদলালের গবেষণা গ্রন্থ—এলমহার্স্টের 'শিক্ষাসত্র' ও কবির 'এ পোএটস্ স্কুল'—জীবন ও জীবিকা।

হিন্দীভবন ১৯৩৮ (পৃ ১২১-২৪) হিন্দীভবনের ভিত্তিস্থাপন ১৯৩৮ জানুয়ারি ১৬—এনড্রুস কর্তৃক নিষ্পন্ন—শান্তিনিকেতনে হিন্দী চর্চার ইতিহাস—ক্ষিতিমোহন সেনের হিন্দীচর্চা—সন্তদের প্রতি কবির শ্রদ্ধা—হিন্দীভবনের জন্য হলবাসিয়া ট্রাস্টের দান—হাজারিপ্রসাদ দ্বিবেদীর নিষ্ঠা।

নৃত্যনাট্য চণ্ডালিকা (পৃ ১২৪-৩০) হেরম্বচন্দ্র মৈত্রের মৃত্যু উপলক্ষ্যে কবিতা—শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মৃত্যু উপলক্ষ্যে কবিতা—চণ্ডালিকাকে গানময় করা—নৃত্যনাট্য চণ্ডালিকা—'বাংলা কাব্য-সঞ্চয়ন'—ভূমিকা—'গীতবিতান' নূতন সংস্করণের জন্য—বিষয়ানুক্রমিক বিভাগ অনুবিভাগ—শান্তিনিকেতনে বাংলার গভর্নর ব্রাবোর্ন ও তদীয় পত্নী—নূতন শাসনবিধি সম্বন্ধে কবির মত—'ম্যানচেস্টার গার্ডিয়ানে' কবির পত্র—চণ্ডালিকা ও নৃত্যনাট্য চণ্ডালিকার অভিনয়—নৃত্যনাট্যের আখ্যানবস্তু ও মনস্তত্ত্ব—গদ্যছন্দে গান—দোলপূর্ণিমার উৎসব (১৩৪৪)—কলিকাতার ছায়া-প্রেক্ষাগৃহে (১৯৩৮ মার্চ) অভিনয়—কন্‌গ্রেস প্রেসিডেন্ট সুভাষচন্দ্র অভিনয় দর্শনে—কবির কলিকাতায় আগমন—গান্ধীজির সহিত সাক্ষাৎ—শান্তিনিকেতনে প্রত্যাবর্তন ৭ দিন পরে—কালিম্পং-যাত্রা—'সাময়িক' পত্রিকার জন্য কবিতা-বাণী।

'**কালিম্পং-মংপু**' (পৃ ১৩০-৩৭) নববর্ষ (১৩৪৫) ও জন্মোৎসব—নূতন মহাযুদ্ধের উদ্যোগপর্ব (১৯৩৮ এপ্রিল)—কবির ভাবনা—কালিম্পং যাত্রা—গৌরীপুর লজে বাস——গ্রেহাম সাহেব—জন্মদিনে কালিম্পং হইতে রেডিও-মারফত নূতন কবিতা আবৃত্তি—প্রবাসীর মন্তব্য (পা-টী)—চারু বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'রবিরশ্মি' সম্বন্ধে কবির মত—বিদ্যাসাগর গ্রন্থাবলী মুদ্রণ সম্বন্ধে পত্র—'বাংলাভাষা পরিচয়' লিখিতেছেন—মৈত্রেয়ী দেবীর 'মংপুতে রবীন্দ্রনাথ' হইতে উদ্ধৃত—মহাভারত লইয়া আলোচনায় রত—সেঁজুতির কবিতা—'রাজপুতানা', 'অধীরা'—অপরাজিতা দেবীকে পত্র—'যক্ষ'—অলডুস হাক্সলির বই সম্বন্ধে মন্তব্যপত্র—বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়ের 'রবীন্দ্রসাহিত্যে পল্লীচিত্র' সম্বন্ধে মন্তব্য পত্র—বঙ্কিম-শতবার্ষিকীতে কবিতা। /

প্রত্যাবর্তনের পর (পৃ ১৩৭-৪৭) কালিম্পঙে দুই মাসের উপর বাস (১৯৩৮ এপ্রিল ২৫-জুলাই ৫)—শান্তিনিকেতনে প্রত্যাবর্তন—মৌলানা জিয়াউদ্দিনের মৃত্যুসংবাদ—ভাষণ ও কবিতা—'ইস্‌টেশন' কবিতা—'সেঁজুতি' প্রকাশ—চীনের উপর জাপানের অত্যাচার—অধ্যাপক তানয়ুন সান মারফত চিয়াংকাইশেককে কবির পত্র—ছাত্রসভায় উপস্থিত—বঙ্কিমশতবার্ষিকীসভায় ভাষণ—প্রমথচৌধুরী 'প্রাচীন হিন্দুস্থান' লিখিতেছেন—গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মৃত্যুসংবাদ—জাপানীকবি যোন নোগুচির পত্র—কবির উত্তর—জাপানপ্রবাসী রাসবিহারী বসুর চীনের উপর জাপানী-হানাদারির সমর্থনে সকলের বিস্ময়—শ্রীনিকেতনে বর্ষামঙ্গল ও বৃক্ষরোপণ উৎসব—'অরণ্য দেবতা' ভাষণ—বনচ্ছেদে সর্বনাশের কথা—শ্রীনিকেতন হইতে বৃক্ষরোপণ প্রচারকার্য—জীবিকার সমস্যা ও সৌন্দর্যসম্ভোগের সমাধান—স্যর সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন শান্তিনিকেতনে—'পরিশোধ' অভিনয়—'আকাশপ্রদীপ'—'স্বর্গে চক্রটেবিল বৈঠক' (প্রাচীন দেবতার নূতন বিবাদ)—'মুক্তির উপায়'—পূজাবকাশের পূর্বে গান্ধী জন্মদিন পালন (২১ সেপ্টেম্বর ১৯৩৮)—

পূজাবকাশে শান্তিনিকেতনে বাস—য়ুরোপে জারমানদের তোষণ-নীতি—লেস্‌নি সাহেবকে পত্র—চেক্‌দের প্রতি সহানুভূতি—'প্রায়শ্চিত্ত' (১৯৩৮ অক্টোবর ৪)—পুরাতনের 'স্মৃতি দিয়ে ঘেরা' কবিতা—'কেন' ও অন্যান্য কবিতা—দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থমালা সম্বন্ধে অভিমত—'বাংলাভাষা পরিচয়'এর ভূমিকা।

পূজার ছুটির পরে ১৯৩৮ (পৃ ১৪৮-৫৫) স্কাউট নায়কদের প্রতি কবির বাণী (never grow old)—বিদ্যালয় খোলার পর নানা কাজের মধ্যে জড়িত—ডাঃ মেঘনাদ সাহা শান্তিনিকেতনে—বক্তৃতা—কেশবচন্দ্র সেন শতবার্ষিকী সম্বন্ধে কবির মন্তব্য—কামাল আতাতুর্কের মৃত্যুসংবাদ—স্মরণ সভায় কবির ভাষণ—অমিয় চক্রবর্তীকে পত্র—বিজ্ঞান ও আত্মতত্ত্ব বিষয়ে—'প্রশ্ন' কবিতা (১৯৩৮ ডিসেম্বর ৭)—শান্তিনিকেতনের আভ্যন্তরীণ পরিবর্তন—রথীন্দ্রনাথের পঞ্চাশৎ জন্মোৎসব (নভেম্বর ২৭)—রবীন্দ্রনাথের আশীর্বাণী কবিতা—কলিকাতায় শ্রীনিকেতন শিল্পভবনের ভাণ্ডার সুভাষচন্দ্র কর্তৃক উন্মোচন—রবীন্দ্রনাথের ভাষণ—সুভাষচন্দ্রের ভাষণ—শান্তিনিকেতনে হ্যাভেল স্মৃতিমন্দির প্রতিষ্ঠা—৭ পৌষ ১৩৪৫-এ কবির ভাষণ—বিশ্বভারতীর বার্ষিক সভায় বক্তৃতা—পৌষউৎসবের দিন এলম্‌হার্স্টের আগমন—তাঁহার—ডার্টিংটন হল শিক্ষায়তন—এনড্রুস সাহেবের আশ্রমে প্রত্যাবর্তন—'আকাশপ্রদীপ' প্রকাশন—অতিথি সমাগম—ত্রিপুরাধিপতি বীরবিক্রম কিশোরমাণিক্য ও সুভাষচন্দ্র শান্তিনিকেতনে—হিন্দীভবনের দ্বার উন্মোচন উপলক্ষ্যে জবহরলাল নেহেরুর আগমন—সুভাষচন্দ্রের শান্তিনিকেতনে আগমন—সুভাষচন্দ্রের কন্‌গ্রেস সভাপতি নির্বাচন সম্পর্কে মহাত্মাজির মত—শ্রীনিকেতনের উৎসবে (১৯৩৯) বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ—লর্ড বিশপের শ্রীনিকেতন সম্বন্ধে মত।

শ্রীতে অভিনয় (পৃ ১৫৫-৬০) কলিকাতায় অভিনয়ের প্রস্তাব—শ্যামা, চণ্ডালিকা ও তাসের দেশ নূতন করিয়া লিখিত—কলিকাতায় বিশ্বভারতী সম্মিলনীর উদ্বোধন-সভায় কবি উপস্থিত—অভিনয় দর্শন—আওয়াগড়ের মহারাজ শান্তিনিকেতনে—শ্যামা পরিশোধের রূপান্তর—উত্তীয়ের হত্যা—শ্যামা জাতকের মূল কাহিনী—উত্তীয়ের প্রেম সম্বন্ধে আলোচনা—'চণ্ডালিকা'র সংক্ষিপ্ত পরিচয়—'তাসের দেশে' বহু নূতন গান সংযোজন—সুভাষচন্দ্রকে উৎসর্গ—'মায়ার খেলা' অভিনয়।

নানা কথা (পৃ ১৬১-৬৯) শান্তিনিকেতনে বসন্ত-উৎসব—রাজকোট রাজ্যে অত্যাচারের প্রতিবাদে মহাত্মাজির অনশন—সুভাষচন্দ্রের সহিত মতভেদের কারণ—ত্রিপুরী কনগ্রেস (১৯৩৯ মার্চ)—কবির পত্র—'হিন্দুস্থান কী হিটলার কী জয়' ঘোষণায় কবির বিরক্তি—অনশন সম্বন্ধে কবির মত—'নামকরণ' কবিতা—মালাআলী কবি ভাল্লাথোল শান্তিনিকেতনে—অমিয়চন্দ্রকে পত্রধারা—সুধীন্দ্র দত্তের 'স্বগত' সম্বন্ধে কবির মত—'প্রজাপতি', 'ঢাকিরা ঢাক বাজায়'—নারীর প্রতি অত্যাচার—কবি কলিকাতায়—এম্‌পায়ার ডে-র জন্য কানাডায় রেডিওর অনুরোধে কবিতা প্রেরণ—নববর্ষ (১৩৪৬)—জন্মদিনের কবিতা অমিয়চন্দ্রকে প্রেরণ—'দিনান্তিকা' বা দিনেন্দ্রনাথের স্মৃতিগৃহ (চা-চক্রের ঘর) উন্মোচন—চা-চক্রের পুরাতন কথা—বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়ের ও কাননবিহারী মুখোপাধ্যায়ের গ্রন্থদ্বয় সম্বন্ধে—'মানুষ রবীন্দ্রনাথে'র সমালোচনা—হিন্দুমুসলমানের চাকুরি বাঁটোয়ারা সম্বন্ধে মত।

পুরীতে ১৩৪৬ (পৃ ১৬৯-৭১) কবি কলিকাতায়—পাইকপাড়ার রাজবাটিতে বিশ্বভারতী সম্মিলনীর পক্ষের নববর্ষ উৎসব—পুরীযাত্রা—উড়িষ্যা ও পুরীর সহিত পূর্ব সম্বন্ধ—রবীন্দ্রনাথের ও গগনেন্দ্রনাথদের বাড়ি ছিল—কবি উড়িষ্যার কন্‌গ্রেস সরকারের অতিথি—জন্মদিন সম্বন্ধে কবিতা—অন্যান্য কবিতা—স্থানিক রাজনীতির অবস্থা—ছাত্রদের রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ সম্বন্ধে মত—পত্রধারা—য়ুরোপে যুদ্ধের উদ্যোগপর্বের আভাস।

২ মংপুতে একমাস (পৃ ১৭২-৭৪) পুরী হইতে ফিরিয়া মংপু যাত্রা—কবিতা রচনা—রাজনৈতিক অবস্থা—কন্‌গ্রেস সম্বন্ধে উদ্বেগ—ত্রিপুরী কন্‌গ্রেসের প্রতিক্রিয়া—সুভাষচন্দ্র সম্বন্ধে মত—চীনদেশ সম্বন্ধে উদ্বেগ।

রবীন্দ্র-রচনাবলী (পৃ ১৭৪-৭৮) মংপু হইতে প্রত্যাবর্তন—শ্রীনিকেতনে কয়েকদিন—রবীন্দ্র-রচনাবলী প্রকাশকের প্রস্তাব—ভূমিকা রচনা—শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে পত্র—শ্রীনিকেতনে কর্মীমণ্ডলীর সভায় ভাষণ—সুকুমার চট্টোপাধ্যায়—বিশ্বভারতীর আভ্যন্তরীণ অদল বদল—শান্তিনিকেতনে প্রত্যাবর্তন—প্রমথ চৌধুরীর 'প্রাচীন হিন্দুস্থান'—ইন্দিরা দেবীর 'ভারতবর্ষ'—আওয়াগড়ের মহারাজা—তাঁহার দান—বৃক্ষরোপণ চীনাভবন প্রাঙ্গণে—'ডাকঘর' অভিনয়ের আয়োজন—তজ্জন্য গান রচনা—'সমুখে শান্তিপারাবার'।

মহাজাতি সদন (পৃ ১৭৯-৮২) মহাজাতি সদন পরিকল্পনার ইতিহাস—সুভাষচন্দ্র সম্বন্ধে 'দেশনায়ক' প্রবন্ধ লেখেন - জীবিতকালে অপ্রকাশিত থাকে—মহাজাতি সদনে সুভাষচন্দ্রের ভাষণ—রবীন্দ্রনাথের উদ্বোধন ভাষণ—জোড়াসাঁকোয় গীত-উৎসব—জবহরলাল উপস্থিত—তিনি চীনে যাইতেছেন—কবির সহিত সাক্ষাৎ।

মংপুতে দুইমাস ১৯৩৯ (পৃ ১৮৩-৯০) কলিকাতা হইতে শান্তিনিকেতনে প্রত্যাবর্তন—'সানাই'-এর কবিতা ও গান—বর্ষামঙ্গল—শ্রীনিকেতনে হলকর্ষণ—গদ্যকাব্য সম্বন্ধে আলোচনা—মহাত্মাজির ৭০ তম জয়ন্তী গ্রন্থের জন্য প্রবন্ধ—য়ুরোপের ২য় মহাযুদ্ধ আরম্ভ (১৯৩৯ সেপ্টেম্বর ৩)—ভারত সরকারের সহিত কন্‌গ্রেস মন্ত্রীদের বিরোধ—যুদ্ধের উদ্দেশ্য কী তৎসম্বন্ধে প্রশ্ন করিয়া বিবৃতি দান—কলিকাতা হইতে মংপু যাত্রা—সেখানে ১১ সেপ্টেম্বর হইতে ৯ নভেম্বর (১৯৩৯) বাস—[১০ নভেম্বর কলিকাতায় নগেন্দ্রভূষণ বিদের নেপিয়ার পেণ্ট ওয়ার্কস দেখিতে যান] 'মংপুতে রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থে সবিস্তার বর্ণনা দ্রষ্টব্য—অমিয় চক্রবর্তীকে পত্রধারা—য়ুরোপীয় রাজনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা—'আমাদের অবস্থা'—জগৎব্যাপী ফ্যাসিজমের বিরোধী মনোভাব—সাহিত্যসৃষ্টি—'শেষ কথা' গল্প—সানাই-এর কবিতা।

মেদিনীপুরে ও পরে (পৃ ১৯০-৯৪) মংপু হইতে প্রত্যাবর্তন—বিদ্যালয়ের আভ্যন্তরীণ অদলবদল—মেদিনীপুরে বিদ্যাসাগর-স্মৃতিমন্দির—উন্মোচন উপলক্ষ্যে আমন্ত্রণ—কলিকাতায় খাদ্য ও পুষ্টি প্রদর্শনী উন্মোচন ও ভাষণ দান—হাওড়ার স্টেশনে সুভাষচন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ—এখন সুভাষ কন্‌গ্রেস হইতে বহিষ্কৃত—মেদিনীপুরে স্মৃতিমন্দিরের দ্বার উদ্‌ঘাটন—প্রত্যাবর্তনের পর সুভাষ সম্বন্ধে গান্ধীজিকে টেলিগ্রাম—গান্ধীজির টেলিগ্রাম ও পত্র—৭ই পৌষ—'অন্তর্দেবতা' ভাষণ—খ্রীষ্টজন্মদিনের কবিতা ও এন্‌ড্রুসের শেষভাষণ—এলমহার্স্টকে পত্র— জুপেয়ঁর চিত্রপ্রদর্শনী।

গান্ধীজি শান্তিনিকেতনে ১৯৪০ (পৃ ১৯৫-২০০) নন্দিনীর বিবাহ—নন্দিনীর পিতার কথা—গান রচনা— ফিন্‌ল্যান্ড সম্বন্ধে প্রবন্ধ—চীন হইতে goodwill mission—তাই-স্যুর সংবর্ধনা—মাঘোৎসবের ভাষণ 'পূর্ণের সাধনা'—শ্রীনিকেতনের বার্ষিক উৎসব (৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৪০)— শিক্ষামন্ত্রী আজিজুল হক্‌—কবির ভাষণ 'পল্লীসেবা'—নেভিনসনকে civil liberty সম্বন্ধে পত্র—কবি কাউন্সিল ফর সিবিল লিবার্টির ভাইস প্রেসিডেণ্ট— ক্রোচে (Croce)-র মত—গান্ধীজি ও কস্তুরাবাঈ-এর শান্তিনিকেতন সফর—এন্‌ড্রুস কলিকাতায় অসুস্থ—গান্ধীজির সংবর্ধনা—'চণ্ডালিকা' অভিনয়—Harijan পত্রিকা হইতে উদ্ধৃতি।

সিউড়ি ও বাঁকুড়ায় (পৃ ২০০-০৩) সিউড়ির প্রদর্শনী উদ্‌ঘাটন (১৯৪০ ফেব্রুয়ারি ২১)—বাঁকুড়ায়—প্রদর্শনী উদ্‌ঘাটন—কবির বক্তৃতা নানা প্রতিষ্ঠানে—ছাত্রদের উদ্দেশে ভাষণ— কলিকাতা হইয়া শান্তিনিকেতনে প্রত্যাবর্তন—দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মশতবার্ষিকী—কবির ভাষণ—দোলপূর্ণিমায় বসন্ত উৎসব—কবিতা (নবজাতক)।

নবজাতক ও সানাই (পৃ ২০৪-০৬) নবজাতক ও সানাই কাব্যখণ্ডদ্বয়ের জন্মকথা

—কাব্যের ঋতুপরিবর্তন—অমিয়চন্দ্রকে পত্রধারা—শান্তিনিকেতনে অতিথির ভিড়—মনের রিলীফ প্রহাসিনীপূর্ণ কবিতা ছড়ায়—'ছড়া'-কাব্যখণ্ড—অবচেতন মনের কাব্য রচনা—'নবযুগের কাব্য'—অমিয়চন্দ্রের কবিতা সম্বন্ধে মত।

এন্ড্রুসের মৃত্যু (পৃ ২০৭-১০) কলিকাতায় ১৯৪০ এপ্রিল ৫ এন্ড্রুসের মৃত্যু—মন্দিরে কবির ভাষণ—কবির প্রতি এন্ড্রুসের ভক্তি—ভারতের স্বাধীনতা সম্বন্ধে ১৯২১ সালে লিখিত প্রবন্ধ—জবহরলাল নেহেরুর 'আত্মজীবনী' হইতে উদ্ধৃতি—'মংপুতে রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থে এন্ড্রুস সম্বন্ধে কবির কথা—সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরও মৃত্যুশয্যায়—কবির পত্র।

কালিম্পঙে (পৃ ২১০-১২) নববর্ষ ১৩৪৭—কবির ভাষণ—জন্মদিনের উৎসব—কলিকাতায় ট্রাস্টহাউস উন্মোচন—কালিম্পঙ যাত্রা—রাজনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে বিবৃতি—সুভাষচন্দ্রের বা ফরওয়ার্ডব্লকের দল এবং 'খাদি' দলের বিরোধ।

পুনরায় পাহাড়ে (পৃ ২১২-১৭) কবি মংপুতে—জন্মোৎসবে পাহাড়িয়ারা—সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মৃত্যুসংবাদ—তদ্‌বিষয়ে ইন্দিরা দেবীকে পত্র—কালিম্পঙে প্রত্যাবর্তন (৭ মে ১৯৪০)—শান্তিনিকেতনে কালীমোহন ঘোষের মৃত্যু—শান্তিদেবকে পত্র—'দুর্দিনের প্রতি স্পর্ধা প্রকাশ'—'ছড়া' রচনা—সমসাময়িক রাজনীতির ব্যঙ্গ—অন্যান্য কবিতা 'দস্তুর সভ্যতা'—নৈতিক বলের প্রতি বিশ্বাস—'অভিশাপ'—রুজভেলট্‌কে পত্র—'ছেলেবেলা'—'ছড়ার ছবি'—Symbolic memory সম্বন্ধে—কাদম্বরী দেবী সম্বন্ধে মৈত্রেয়ী দেবী।

প্রত্যাবর্তনের পর (পৃ ২১৭-২৪) কালিম্পং হইতে প্রত্যাবর্তন—কলিকাতায় 'গীতালি' সমিতির সভায় সংগীত সম্বন্ধে ভাষণ—ঘরোয়া বৈঠকে 'ছেলেবেলা' পাঠ—নারীশিক্ষা সমিতির বাণীভবনে কবি—সুভাষচন্দ্র বসু কবি সকাশে—সুভাষচন্দ্র সম্বন্ধে কাগজে বিবৃতি—আনন্দবাজার পত্রিকার বিবৃতি সম্বন্ধে মন্তব্য—ভূপর্যটক রমানাথ বিশ্বাস কবিসকাশে—গ্রীষ্মাবকাশের পর বিদ্যালয় খুলিলে কবির শান্তিনিকেতনে প্রত্যাবর্তন—ছাত্রদের ক্লাসে 'তপোবন' সম্বন্ধে—মন্দিরে উপদেশ দান—প্রমথনাথ সেনগুপ্ত লিখিত 'পৃথ্বীপরিচয়ে'র ভূমিকা—বিজ্ঞান শিক্ষা সম্বন্ধে মত—জ্ঞানভারতী সম্বন্ধে মত—বোলপুরে টেলিফোন এক্‌সচেঞ্জ অফিস উদ্বোধন—'প্রহাসিনী' কবিতা—ধীরেন্দ্রমোহন সেনের বিশ্বভারতী ত্যাগ—মার্জোরি সাইক্‌স—'সানাই' প্রকাশিত—সানাই-এর অন্তর্গত গান—সাতই অগস্ট ১৯৪০ অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক উপাধি দান—শাপমোচন অভিনয়—তুলসীদাস সম্বন্ধে ভাষণ।

বিবিধ রচনা (পৃ ২২৪-২৯) দুর্বল শরীরে চলাফেরা কঠিন—সুরেন্দ্রমোহন ঘোষ, মনোরঞ্জন গুপ্ত প্রভৃতির কবিসন্দর্শন—সাংস্কৃতিক বিচ্ছিন্নতা লোপ না করিতে পারিলে ভারতের ঐক্য সম্ভব নহে—'আধুনিক কাব্য পরিচয়' সম্বন্ধে মন্তব্য—'শিশুতীর্থ' সম্বন্ধে পত্র—আবুল ফজলএর গল্পের বই সম্বন্ধে পত্র—'ল্যাবরেটরি' গল্প—মীরাদেবীর পত্র—'বদনাম' গল্প—শেষ জীবনে প্রগতিপন্থী মন—বৃক্ষরোপণ ও বর্ষামঙ্গল (১৩৪৭ ভাদ্র ১৮)-এর শেষ গান রচনা—কলিকাতায়—কবির স্বাস্থ্য বিষয়ে বিধানচন্দ্র রায়ের আশঙ্কা—কালিম্পং যাত্রা—'চিত্রলিপি' প্রকাশ—সুনীতি কুমারের সমালোচনা—হিল্‌ডা সেলিগমানের বই-এর-ভূমিকা।

শেষ সফর—১৯৪০ সেপ্টেম্বর (পৃ ২২৯-৪৩) কালিম্পঙে সাতদিন—অকস্মাৎ অসুস্থতা—কলিকাতা হইতে প্রশান্তচন্দ্র প্রমুখ ব্যক্তিগণ আসিয়া লইয়া যান—জোড়াসাঁকোর বাটিতে রোগশয্যায় একমাস—কবিতা 'রোগশয্যায়' সংগৃহীত—শান্তিনিকেতনে প্রত্যাবর্তন (১৮ নভেম্বর ১৯৪০)—সেবক সেবিকা—'আরোগ্য'র কবিতা—সুধাকান্তের উদ্দেশ্যে কবিতা—চীনা শুভেচ্ছা বাহিনীর আগমন—তাই-চি-তাও—প্রাচীন চীনের সহিত যোগসম্বন্ধে কবিতা—পৌষ উৎসবের ভাষণ—'আরোগ্য' মন্দিরে—ক্ষিতিমোহন সেন কর্তৃক পঠিত—অমিয় চক্রবর্তীর সহিত

'মানবিক অভিব্যক্তি' ও মানবসত্তা সম্বন্ধে আলোচনা—খ্রীষ্টজন্মদিনে কবিতা 'প্রচ্ছন্ন পশু'—লোকশিক্ষা গ্রন্থমালায় পশুপতি ভট্টাচার্য কৃত 'আহার ও আহার্যে'র ভূমিকা—'মিলের কাব্য' কবিতার ভূমিকা—কেদার বন্দ্যোপাধ্যায়কে আশীর্বাদ প্রেরণ—'ঐকতান'—মাঘোৎসবে কবির ভাষণ—রামমোহন সম্বন্ধে কবিতা 'চিরস্মরণীয়'—স্বামী বিবেকানন্দের মত রামমোহন সম্বন্ধে—শেষ মাঘোৎসবের কবিতা (জন্মদিনে ও আরোগ্য)—'গল্পসল্প'—শেষ বসন্তউৎসব।

শেষ কয়মাস (পৃ ২৪৩-৪৮) নববর্ষের (১৩৪৮) জন্য শেষ গান 'ঐ মহামানব আসে'—'জন্মদিনে' প্রকাশিত—নববর্ষের ভাষণ 'সভ্যতার সংকট'—'আলাপচারী রবীন্দ্রনাথ'—সাহিত্য সম্বন্ধে আলাপ—পঁচিশে বৈশাখ দিনে কবিতা—ত্রিপুরা দরবার হইতে রাজপ্রতিনিধিদের আগমন ও কবিকে 'ভারতভাস্কর' উপাধি অর্পণ—গ্রীষ্মাবকাশে বুদ্ধদেব বসু প্রভৃতির শান্তিনিকেতনে বাস—'সব পেয়েছির দেশ'—কবির সহিত সাহিত্যবিষয়ক আলোচনা—বীরভূমে সেচনের জলাভাব দরুন ভীষণ গরম—কবি এয়ারকন্‌ডিশনড্‌ ঘরে থাকেন—'বদনাম' গল্প—'ছবির স্বৈরাচার'—যামিনী রায়কে ছবি সম্বন্ধে পত্র—'ঘরোয়া' পড়িয়া পত্র—মিস্ রাথবোনের পত্র—কবির জবাব—শরীরের দ্রুত অবনতি—কলিকাতায় স্থানান্তরিত—জোড়াসাঁকোর বাটিতে শেষ বারো দিন—শেষ কবিতা—অপারেশন—মহাপ্রয়াণ ১৩৪৮, শ্রাবণ ২২ (১৯৪১ অগস্ট ৭)।

উৎসর্গ

রবীন্দ্রসাহিত্য-আলোচনার পথিকৃৎ
বিদেহী বন্ধু
অজিতকুমার চক্রবর্তীর স্মরণে
ও
রবীন্দ্রজীবনী-আলোচনার পথিকৃৎ
কৈশোরের বন্ধু
শ্রীপ্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশের করকমলে
১১ শ্রাবণ ১৩৬৩

ওরা অন্ত্যজ, ওরা মন্ত্রবর্জিত।...
কবি আমি ওদের দলে,
আমি ব্রাত্য, আমি মন্ত্রহীন,
দেবতার বন্দীশালায়
আমার নৈবেদ্য পৌঁছল না।...
আজ আপন মনে ভাবি,—
'কে আমার দেবতা,
কার করেছি পূজা।'..
দলের উপেক্ষিত আমি,
মানুষের মিলন-ক্ষুধায় ফিরেছি,
যে মানুষের অতিথিশালায়
প্রাচীর নেই, পাহারা নেই।...
লোকালয়ের বাইরে পেয়েছি আমার নির্জনের সঙ্গী...
তারা আমার অন্তরঙ্গ, আমার স্ববর্ণ, আমার স্বগোত্র,
তাদের নিত্য শুচিতায় আমি শুচি।
তারা সত্যের পথিক, জ্যোতির সাধক,
অমৃতের অধিকারী।
মানুষকে গণ্ডির মধ্যে হারিয়েছি
মিলেছে তার দেখা
দেশবিদেশের সকল সীমানা পেরিয়ে।
তাকে বলেছি হাতজোড় ক'রে,—
হে চিরকালের মানুষ, হে সকল মানুষের মানুষ,
পরিত্রাণ করো—
ভেদচিহ্নের তিলকপরা
সংকীর্ণতার ঔদ্ধত্য থেকে।
হে মহান্ পুরুষ, ধন্য আমি, দেখেছি তোমাকে
তামসের পরপার হতে
আমি ব্রাত্য, আমি জাতিহারা।

"ভারতের একটা জায়গা থেকে ভূগোলবিভাগের মায়াগণ্ডী সম্পূর্ণ মুছে যাক্,—সেইখানে সমস্ত পৃথিবীর পূর্ণ অধিষ্ঠান হোক—সেই জায়গা হোক শান্তিনিকেতন।...শান্তিনিকেতনের আকাশ আজকের দিনের বিশ্বব্যাপী আঁধির আক্রমণে যেন নিরালোক হয়ে না ওঠে।"

"এখন জগৎ জুড়িয়া সমস্যা এ নহে যে, কী করিয়া ভেদ ঘুচাইয়া এক হইব—কিন্তু কী করিয়া ভেদ রক্ষা করিয়া মিলন হইবে।"

রবীন্দ্রজীবনী

উত্তরভারতে ১৯৩৫

কলিকাতায় প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলন[১] ও নিখিলবঙ্গ সংগীত সম্মেলন[২] উদ্বোধন করিয়া রবীন্দ্রনাথ ১৩৪১ সালের মাঘ মাসে (১৯৩৫ জানুয়ারি) শান্তিনিকেতনে ফিরিলেন। প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনে কবি 'বাংলা সাহিত্যের ক্রমবিকাশ' সম্বন্ধে যে ভাষণ দিয়াছিলেন তাহার একটি কথা আজ আমাদের বিশেষভাবে স্মরণীয়। রবীন্দ্রনাথ বঙ্গদেশকে পশ্চিমবঙ্গ ও পূর্ব-পাকিস্থানে দ্বিখণ্ডিত হইতে দেখিয়া যান নাই। তবে ১৯০৫ সালে বঙ্গদেশ একবার বিভক্ত হইয়াছিল; সেই ঘটনার উল্লেখ করিয়া বলিলেন, "একদা আমাদের রাষ্ট্রপতিরা বাংলাদেশের মাঝখানে বেড়া তুলে দেবার যে-প্রস্তাব করেছিলেন সেটা যদি আরও পঞ্চাশ বছর পূর্বে ঘটত, তবে তার আশঙ্কা আমাদের এত তীব্র আঘাতে বিচলিত করতে পারত না। ইতিমধ্যে বাংলার মর্মস্থলে যে অখণ্ড আত্মবোধ পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে তার প্রধানতম কারণ বাংলাসাহিত্য। বাংলাদেশকে রাষ্ট্রব্যবস্থায় খণ্ডিত করার ফলে তার ভাষা তার সংস্কৃতি খণ্ডিত হবে, এই বিপদের সম্ভাবনায় বাঙালি উদাসীন থাকতে পারে নি। বাঙালিচিত্তের এই ঐক্যবোধ সাহিত্যের যোগে বাঙালির চৈতন্যকে ব্যাপকভাবে গভীরভাবে অধিকার করেছে। সেই কারণেই আজ বাঙালি যতদূরে যেখানেই যাক বাংলাভাষা ও সাহিত্যের বন্ধনে বাংলাদেশের সঙ্গে যুক্ত থাকে।"[৩]

রবীন্দ্রনাথ জানিতেন যে, "ভাষার যোগই নাড়ীর যোগ—সেই যোগ একেবারে বিচ্ছিন্ন হলেই মানুষের পরম্পরাগত বুদ্ধিশক্তি ও হৃদয়বৃত্তির সম্পূর্ণ পরিবর্তন হয়ে যায়।" কবি স্পষ্টভাবেই বলেন, "বাঙালিচিত্তের যে-বিশেষত্ব মানব-সংসারে নিঃসন্দেহ তার একটা বিশেষ মূল্য আছে। যেখানেই তাকে হারাই সেখানেই সমস্ত বাঙালি জাতির পক্ষে বড়ো ক্ষতির কারণ ঘটা সম্ভব।"[৪]

কবির কথা-যে কত সত্য তাহা আজ বাংলাদেশ দ্বিখণ্ডিত হইয়াও বুঝিতেছে। পাকিস্থানের মুসলমান বাঙালি মুক্তকণ্ঠে দাবি জানাইতেছে যে, বাংলাভাষা ও সাহিত্য হিন্দুমুসলমানের যুগ্ম সাধনার ধন। ইংরেজ জাতি পৃথিবীর নানাস্থানে উপনিবেশ ও রাজ্য স্থাপন করিয়াছে; তাহাদের অনেকের রাজনীতিক ও অর্থনীতিক স্বার্থ বিরুদ্ধ, কিন্তু কোথাও ইংরেজি ভাষা অনাদৃত হয় নাই, নূতন নূতন দেশে ইংরেজি সাহিত্যের নূতন ফসল ফলিতেছে। বাংলা খণ্ডিত হইলেও বাঙালির ভাষা ও সাহিত্য খণ্ডিত হইতে পারে না।

রবীন্দ্রনাথ কলিকাতা হইতে শান্তিনিকেতন ফিরিবার অব্যবহিত পরে ভারতীয় বিজ্ঞান পরিষদের (Indian Science Congress) সদস্যগণ কলিকাতা অধিবেশনের পরে শান্তিনিকেতন দেখিতে আসিলেন (৬ জানুয়ারি)। গুণীদের যথোচিত সমাদর যাহাতে হয়, তজ্জন্য কবি কলিকাতা হইতে তাড়াতাড়ি চলিয়া আসিয়াছিলেন। অতিথিপরিচর্যা বিষয়ে তাঁহার কী উৎকণ্ঠা হইত তাহা বাড়ির লোকে ও তাঁহার পার্শ্বে যাঁহারা থাকিতেন, তাঁহারা ভালো করিয়া জানিতেন। উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ও তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্মৃতিকথা যাঁহারা পড়িয়াছেন, তাঁহারা ইহা অবশ্যই লক্ষ্য করিয়াছেন।

কয়েকদিন পরেই আসিলেন নৃত্যশিল্পী গোপীনাথ ও রাগিণী দেবী; গোপীনাথের নাচ দেখিয়া কবি মুগ্ধ,[৫] ইন্দিরা দেবীকে লিখিতেছেন, "দুই একজন বাঙালী মেয়েকে যদি এঁদের কাছে তৈরি করতে দিস তাদের উপকার

১ বাংলা সাহিত্যের ক্রমবিকাশ, বিচিত্রা ১৩৪১ মাঘ পৃ ৩-৯। দ্র সাহিত্যের পথে; সংযোজন, রবীন্দ্র-রচনাবলী ২৩ শ।

২ সুর ও সঙ্গতি, কবির পত্র ৭ জানুয়ারি ১৯৩৫, পৃ ৫-৭।

৩ র-র ২৩শ পৃ ৫২৬।

৪ র-র ২৩শ পৃ ৫২৫।

৫ মাদ্রাসে কলাক্ষেত্র নামে সংগীত বিদ্যালয় তাঁহার দ্বারা পরিচালিত হয়।

হবে।"[১] ইঁহাদের সহিত নৃত্য গীত সম্বন্ধে কবির আলোচনা হয়তো হইয়াছিল, কিন্তু তাহার কোনো প্রতিবেদন প্রকাশিত হয় নাই।

এই সময়ে বড়ো কোনো রচনা চোখে পড়ে না, দুইটি মাত্র কবিতা উল্লেখযোগ্য—'সাঁওতাল মেয়ে' (১৮ জানু ১৯৩৫ বীথিকা) ও 'নুটু' (১ ফেব্রু বীথিকা)। প্রথম কবিতাটির মধ্যে কবিচিত্তের নিগূঢ় সমাজতান্ত্রিক ভাব মূর্ত হইয়াছে, অকুলীন ধনিক সমাজের বণিকবৃত্তি তাঁহাকে ক্লিষ্ট করে, কিন্তু আপনাকে মুক্ত করিবার পথ পান না বলিয়া তিনি অনুশোচনা বোধ করেন—

আমি দেখি চেয়ে,
ঈষৎ সংকোচে ভাবি,— এ কিশোরী মেয়ে
পল্লীকোণে যে ঘরের তরে
করিয়াছে প্রস্ফুটিত দেহে ও অন্তরে
নারীর সহজ শক্তি আত্মনিবেদনপরা
শুশ্রূষার স্নিগ্ধ সুধা ভরা,
আমি তারে লাগিয়েছি কেনা-কাজে করিতে মজুরি,—
মূল্যে যার অসম্মান সেই শক্তি করি চুরি
পয়সার দিয়ে সিঁধকাঠি।
সাঁওতাল মেয়ে ওই ঝুড়ি ভরে নিয়ে যায় মাটি।

কবির মন যে ক্রমেই সংস্কারাবদ্ধ সমাজ ও অর্থনৈতিক মতবাদ হইতে সরিয়া চলিয়াছে এইটি তাহার অন্যতম নিদর্শন। অপর কবিতাটি শোকাঘাতে উদ্রিক্ত। ১৯ জানুয়ারি ১৯৩৫ কলিকাতায় রমার (নুটু) অকস্মাৎ মৃত্যু ঘটে। ইঁহার কথা পূর্বে বলিয়াছি—চারি বৎসর পূর্বে (১৯৩১, ৬ মে) সুরেন্দ্রনাথ করের সহিত রমার বিবাহ হয়; রবীন্দ্র-সংগীতে তাঁহার অসামান্য দক্ষতা ছিল।[২]

সম্পূর্ণ বিভিন্ন সুরের কয়েকটি কবিতা পাই ইহারই সঙ্গে। ইহাকে আমরা বলিয়াছি মনের relief। হালকা কথা, হালকা সুরে চলতি ছন্দে ইহাদের প্রকাশ; কবিচিত্তের পক্ষে ইহা প্রায় অনিবার্য। 'নারী প্রগতি', 'পলাতকা',[৩] 'আধুনিকা', 'পরিণয় মঙ্গল'[৪] প্রভৃতি প্রহাসিনী কবিতা লিখিত হয় জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারির (১৯৩৫) মধ্যে। 'নারী প্রগতি' কবিতা 'বিচিত্রা'য় (১৩৪১ মাঘ) প্রকাশিত হইলে অপরাজিতা দেবী রবীন্দ্রনাথকে অনুরূপ ছন্দে একটি উত্তর লিখিয়া পাঠান। 'আধুনিকা' কবিতাটি তাহারই প্রত্যুত্তরে লাহোরে রচিত।[৫] প্রয়াগে থাকিতে থাকিতে লেখেন 'পরিণয় মঙ্গল' নামে কবিতাটি।[৬] কবিতাটি লিখিত হয় জয়া-মটরু শুভ সম্মিলন উপলক্ষ্যে। জয়া হইতেছে সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের দ্বিতীয়া কন্যা ও মটরু শ্রীমতী স্নেহলতা সেনের পুত্র ও প্রদ্যোৎকুমার সেনের ভাই। মটরুর ভালো নাম কুলদাপ্রসাদ; ১৯২১ সালে অসহযোগ আন্দোলনের সময় ইনি শ্রীনিকেতনে কিছুকাল ছিলেন। বর্তমানে ইনি পোস্টাল বিভাগের বড়ো চাকুরে। এই বিবাহের মধ্যে বৈশিষ্ট্য ছিল; আদি ব্রাহ্মসমাজের যে জাতে-জাতে বা ব্রাহ্মণের সঙ্গে বিবাহ দিবার রীতি ছিল, তাহা ভাঙিল; কুলদাপ্রসাদরা বৈদ্য ও সাধারণ ব্রাহ্মসমাজভুক্ত। এই শ্রেণীর প্রাচীন সমাজ-ভাঙা ব্যাপারে কবির পূর্ণ সমর্থন ছিল।

স্থির হইয়া দীর্ঘকাল এক স্থানে বসিয়া-থাকা না ছিল তাঁহার অদৃষ্টে, না ছিল স্বভাবে। এখন বয়স হইয়াছে চুয়াত্তর—কিন্তু বাহিরের আহ্বান আসিলে সাড়া না দিয়া পারেন না। এবার নিমন্ত্রণ আসিয়াছে কাশী, এলাহাবাদ ও

১ চিঠিপত্র ৫ম, ইন্দিরা দেবীকে লিখিত পত্র ৫৭। V. B. News III 1935 April. p 63।

২ বীথিকা পৃ ১২৪, (১৮ মাঘ ১৩৪১)। দ্র V. B. News III 1935 Feb p 51. 'নুটু' কবিতাটি এইখানে প্রথম প্রকাশিত হয়।

৩ পলাতকার প্রতি (৮ মাঘ, ১৩৪১), বিচিত্রা ৮ম বর্ষ ১৩৪১ চৈত্র, পৃ ২৭৯।

৪ বিচিত্রা ১৩৪২ জ্যৈষ্ঠ, পৃ ৫৬৩।

৫ আধুনিকা (১৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৫. লাহোর)। প্রবাসী ১৩৪১ চৈত্র।

৬ ১০ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৫। ২৭ মাঘ ১৩৪১, প্রহাসিনী।

লাহোর হইতে। কবি যেদিন অপরাহ্নে আশ্রম ত্যাগ করিলেন (৬ ফেব্রুয়ারি) সেদিন প্রাতে আশ্রম দেখিতে আসেন তৎকালীন বঙ্গদেশের গভর্নর স্যর জন আন্ডারসন (Anderson)।

ইতিপূর্বে বাংলাদেশের প্রত্যেক গভর্নর শান্তিনিকেতন পরিদর্শন করিয়া গিয়াছেন ; কিন্তু আন্ডারসনের আশ্রম-পরিদর্শনের মধ্যে বিশেষত্ব ছিল। গভর্নর হিসাবে তিনি এদেশে চিরখ্যাতি অর্জন করিয়া গিয়াছেন! বাংলা দেশের টেররিস্ট (সন্ত্রাসবাদ) আন্দোলন ইঁহার সময়ে প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়। এদেশে আসিবার পূর্বে আয়ারল্যানডের স্বাধীনতা আন্দোলন নষ্ট করিবার চেষ্টায় তাঁহার নিষ্ঠুরতা ইতিহাসের পৃষ্ঠায় অমর (!) স্থান পাইয়াছে। এ-হেন লাট সাহেবের আগমন উপলক্ষ্যে স্থানীয় জেলা-ম্যাজিস্ট্রেট ও বঙ্গীয় পুলিস বিভাগ যেরূপ কড়াকড়ি ও জবরদস্তি করিতে লাগিলেন, তাহা যেমন বিরক্তিকর, তেমনি হাস্যোদ্দীপক। পুলিস বিভাগ হইতে জানানো হয় যে, গভর্নরের নিরাপত্তার জন্য শান্তিনিকেতন-কলেজের কয়েকজন ছাত্রকে তাঁহারা সাময়িকভাবে আটক রাখিবেন। কবি এই কথা জানিতে পারিয়া অত্যন্ত উত্তেজিত হন ; জেলা-ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ কে. এল. মুখার্জীকে জানাইয়া দিলেন যে, এইরূপ ব্যবহার করিলে তিনি আশ্রম ত্যাগ করিয়া অন্যত্র চলিয়া যাইবেন, গভর্নরকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য থাকিবেন না। যাহাই হউক, কবির নির্দেশে আশ্রমবাসী ছাত্র অধ্যাপক সকলেই শ্রীনিকেতন-উৎসবে (৬ ফেব্রুয়ারি) চলিয়া গেলেন ; আশ্রমে থাকিলেন কয়েকজন বিভাগীয় কর্তা মাত্র,—তাঁহারাও, পুলিসের কর্তা ও কর্মসচিবের সহিযুক্ত ছাড়পত্র বা পাস্ লইয়া পুলিস ও গোয়েন্দা বিভাগের লোকদ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া শূন্য পুরীতে রাজপ্রতিনিধির অভ্যর্থনার জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলেন! আনডারসন ছাত্রশূন্য বিদ্যায়তন দেখিয়া গেলেন। 'সামান্য ক্ষতি'র গোড়ার দিকটার কথা সেদিন অনেকেরই মনে হইয়াছিল। আর আমাদের মনে পড়ে, পনেরো বৎসর পূর্বে তৎকালীন গভর্নর আর্ল্ অব্ রোনাল্ডশে (আলোচ্য পর্বে ভারতসচিব লর্ড জেট্ল্যান্ড্ নামে পরিচিত) যখন আশ্রম দর্শনে আসেন, বাঁধের নিকট আশ্রম চোখে পড়া মাত্রই মোটরকার হইতে নামিয়া পদব্রজে শান্তিনিকেতনে প্রবেশ করিয়াছিলেন ; তিনি বলিয়াছিলেন, 'আমি ভারতীয় আশ্রমে যাইতেছি, দেশের রীতি অনুসারে হাঁটিয়াই যাইব।' তখন আশ্রমের ভিতরে গভর্নরের নিরাপত্তার জন্য পুলিসের সহায়তা লওয়া হয় নাই। কিন্তু সময়ের এমনই পরিবর্তন হইয়া গিয়াছে যে কবির পক্ষে গভর্নরের নিরাপত্তার দায় গ্রহণ করা সম্ভব ছিল না। এই ভাবে লাট সাহেবকে আশ্রমে অভ্যর্থনা করিতে রাজি হওয়ায় অনেকেই কবির সমালোচনা করিয়াছিলেন।

গভর্নর প্রাতে আশ্রম পরিদর্শন করিয়া চলিয়া গেলেন, কবি অপরাহ্নে কাশী রওনা হইলেন। হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থগিত সমাবর্তন উৎসব দুই দিন পরে ; ঐ দিন কনভোকেশনে কবিকে 'ডক্টর' উপাধি দান করা হয়। তৎপূর্বে তিনি সমাবর্তনের ভাষণ দান করেন ; বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তনে ইহাই কবির প্রথম ভাষণ। (৮ ফেব্রু ১৯৩৫)

হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্-চানসেলার মদন মোহন মালব্যজির ইচ্ছা ছিল যে দিল্লীতে সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার বিরুদ্ধে যে সভা আহুত হইয়াছিল রবীন্দ্রনাথ তাহার সভাপতিত্ব করেন ; ইতিপূর্বে তিনি কবিকে সে বিষয়ে টেলিগ্রামও করিয়াছিলেন। কবি মালব্যজিকে বলিলেন যে, এ শ্রেণীর রাজনৈতিক বিসম্বাদের মধ্যে তিনি থাকিতে পারিবেন না।

কাশী হইতে মোটর যোগে কবি এলাহাবাদ আসিলেন (৯ ফেব্রুয়ারি)। সেই দিন সন্ধ্যায় পূর্ণিমা বন্দ্যোপাধ্যায়ের[১] (মৃ ১৯৫১ জুন) উদ্যোগে আহুত মহিলা সভায় তাঁহার সংবর্ধনা হইল। কিন্তু শরীর খারাপ হওয়ায় কয়েকটি সভা-সমিতি বাদ দিতে হইল, এমন কি মুন্সিপালিটির স্বাগত সভাও। পরদিন (১০ই) অপরাহ্নে স্যর লালগোপাল ব্যানার্জির ব্যবস্থায় বাঙালিদের উদ্যান-সম্মিলনীতে কবি উপস্থিত হন। তার পরদিন আনি

১ পূর্ণিমা বন্দ্যোপাধ্যায় এলাহাবাদের লালগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্রবধূ ও নগেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলির জ্যেষ্ঠভ্রাতা উপেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলির অন্যতমা কন্যা, অরুণা আসফ আলির সহোদরা।

বেসাণ্ট স্কুলের বার্ষিক সভায় সভাপতিত্ব করিয়া কবি বক্তৃতা করিলেন। অতঃপর ১২ই এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রয়ুনিয়নের উদ্যোগে সিনেট গৃহে কবির আর-একটি বক্তৃতা হইয়াছিল।[১] ছাত্ররা কবির হস্তে একটি টাকার তোড়া উপহার দেয়।

এলাহাবাদে কবির শরীর ভালো যাইতেছে না; অনেকেই লাহোর যাইতে নিষেধ করিলেন। কিন্তু দেহ না চলিলেও মন চলে, এবং মন চলিলে দেহকে যাইতেই হয়। ১৪ ফেব্রুয়ারি কবি লাহোর পৌছিলেন; শ্রীধনীরাম ভল্লার আতিথ্য তিনি গ্রহণ করেন। শুনিয়াছি কবি ইক্‌বল এই সময়ে লাহোরে ছিলেন; কিন্তু রবীন্দ্রনাথ আসিতেছেন শুনিয়া নগর ত্যাগ করিয়া যান; তিনি নাকি বলিয়াছিলেন, একই শহরে দুই কবি একই সময়ে থাকিতে পারে না। কবি লাহোরে আসিয়াছিলেন পঞ্জাব ছাত্র-সমাজের আহ্বানে; তাহাদের পঞ্চম বার্ষিক সম্মেলনে রবীন্দ্রনাথ সভাপতি।

কবি লাহোরে আসিয়া সংবাদপত্র মারফত জানাইয়া দিলেন যে তিনি কাহারও সহিত কোনো মোলাকাত করিবেন না। তৎসত্ত্বেও একদিন পঞ্চাশটি বালিকা কবি সন্দর্শনে আসিয়া হাজির হয়, কবি তাহাদের বিমুখ করিলেন না।

কবি যেদিন লাহোর পৌছিলেন তাহার পরদিন ছাত্রসম্মেলনের উদ্বোধন সভা; সেদিন (১৫ই) কবির প্রথম ভাষণ। দুই দিন পরে (১৭ই) সভার শেষে কবির শেষ বক্তৃতা হয়। ১৯৩৫ সালের গোড়ার দিকে নূতন ভারতশাসন আইন প্রবর্তিত হইবার মুখে বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক বৈরীভাব দেখিয়াছেন; পঞ্জাবে আসিয়া ইহার চরম তীব্ররূপ দেখিলেন, রাজনীতি সম্বন্ধে তাঁহার নূতন অভিজ্ঞতা হইল।

সম্মেলনের দুইটি বক্তৃতার মাঝের দিন কবির সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন পঞ্জাবের জাত-পাত-তোড়ক মণ্ডলের প্রতিনিধিগণ। এই মণ্ডলীর সদস্যগণ উগ্র সমাজ-সংস্কারক, ভেদহীন জাতিহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার পক্ষপাতী। কবি তাহাদের কাছে বলেন ভেদহীন সমাজ গড়িতে হইলে অন্তঃ-প্রাদেশিক বিবাহাদি প্রয়োজন। কবি বলিতেন যে রক্তের মিশ্রণ না হইলে 'নেশন্' গড়া যায় না।

এবার লাহোরে শিখদের সহিত কবির ঘনিষ্ঠতা হয়। 'গুরু গোবিন্দ' কবিতা লইয়া তাহাদের যে ক্ষোভ ছিল, তাহা নিরাকৃত হইল, 'আকালী' পত্রিকায় কবির বক্তব্য প্রকাশিত হইল। রবীন্দ্রনাথের ঋষিকল্প মূর্তি, তাঁহার শিষ্টাচারে শিখরা মুগ্ধ; একদিন গুরুদ্বারে কবিকে তাহারা বিশেষভাবে সম্মানিত করিল। রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে তাহাদের এমনই উৎসাহ দেখা দিল যে, তাহারা শান্তিনিকেতনে গুরুদ্বার স্থাপনার জন্য অর্থসংগ্রহে প্রবৃত্ত হইল। কিন্তু কবি এই প্রস্তাবে রাজি হইতে পারিলেন না; কারণ তিনি জানিতেন এই শ্রেণীর সাম্প্রদায়িক মন্দির বা ধর্মস্থানের পত্তন প্রবর্তিত হইলে, ইহার শেষ কোথায় বলা যায় না।

আর-একদিন কবি দয়ানন্দ এংলো-বেদিক কলেজ পরিদর্শনে যান। বহু বৎসর পূর্বে তিনি দয়ানন্দ সরস্বতীকে বাংলাদেশে দেখিয়াছিলেন, সে-কথা সভায় ব্যক্ত করেন। পঁয়ষট্টি বৎসর পূর্বে বাল্যকালে তিনি তাঁহার পিতার সহিত পঞ্জাব আসেন সেই স্মৃতিকথাও সেদিন বলিলেন।

১৯ ফেব্রুয়ারি লাহোরের বাঙালি সমাজ কবি-সংবর্ধনা করিল। সেইদিন অতিথি-বৎসল শ্রীভল্লার গৃহপ্রাঙ্গণে কবি একটি আম্রতরু রোপণ করেন। ইহার তিন দিন পরে শ্রীভল্লার গৃহে লাহোরের বিশিষ্ট সাংবাদিকগণ কবির সহিত দেখা করিতে আসেন। সেদিন কবি সাম্প্রদায়িক সমস্যা সম্বন্ধে অত্যন্ত আবেগপূর্ণ ভাষণ দিয়াছিলেন। কবি

১ এইদিন 'পরিণয় মঙ্গল' কবিতাটি লেখেন, এ সম্বন্ধে পূর্বেই আলোচনা করিয়াছি। এই লাহোরে বসিয়া অপরাজিতা দেবীকে কবিতায় হালকা ছন্দে এক পত্র লেখেন (বীথিকা)।

চারিদিকের মনোভাব দেখিয়া অত্যন্ত উদ্‌বিগ্ন। হিন্দু, শিখ ও মুসলমান কাহারও সহিত কাহারও সদ্‌ভাব নাই। দেশের এ কী পরিস্থিতি! কবি সাংবাদিকগণের নিকট উদ্বিগ্ন চিত্তে মৈত্রী প্রচারের জন্য আবেদন করিলেন।

কবি লাহোরে ছিলেন প্রায় দুই সপ্তাহে (১৪-২৭ ফেব্রুয়ারি)। এই সময়ে সভাসমিতিতে ভাষণাদি দান ছাড়া তাঁহার অধিকাংশ সময় কাটিত ছবি আঁকিয়া। কবিতাও লেখেন, সব কয়টির তারিখ দেন কিনা জানি না; তারিখ-দেওয়া কবিতার কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে।

লাহোর হইতে ২৭ ফেব্রুয়ারি কবি লখনৌ যাত্রা করেন; লখনৌ বিশ্ববিদ্যালয়ে[১] দুইদিন বক্তৃতা করিয়া ৪ মার্চ কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন। এইবার কবির সঙ্গে ছিলেন অনিলকুমার চন্দ ও সুধাকান্ত রায়চৌধুরী।[২]

কবির লখনৌ বাস সম্বন্ধে একটু আলোচনার ক্ষেত্র আছে। কবি ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক নির্মলকুমার সিদ্ধান্তের অতিথি। সে-সময়ে রবীন্দ্র-সংগীত গাহিবার জন্য নির্মলকুমারের স্ত্রী চিত্রলেখা দেবীর খ্যাতি ছিল। তাঁহার গান কবির খুব ভালো লাগিত। বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম অধ্যাপক ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় রবীন্দ্রভক্তও বটে সমালোচকও বটে। তাঁহার চেষ্টায় একটি সান্ধ্য জলসায় শ্রীকৃষ্ণ রতঞ্জনকারের গানের ব্যবস্থা হয়। জ্বর সত্ত্বেও কবি গভীর রাত্র পর্যন্ত বসিয়া গান শুনিলেন। গান তাঁহার ভালো লাগিলেও তাহা একেবারে সমালোচনা শূন্য হয় নাই। শান্তিনিকেতনে ফিরিয়া কবি এই সংগীতরীতি সম্বন্ধে ধূর্জটিপ্রসাদকে দীর্ঘ এক পত্রে[৩] নিজ মত স্পষ্ট করিয়া ব্যক্ত করেন। খেয়াল শ্রেণীর গানের বিরামহীন দীর্ঘ তান ও রূপান্তর সম্বন্ধে সমালোচনা করিয়া তিনি বলেন যে, এই প্রকার আলাপের মধ্যে exhibition-এর ভাবটাই উগ্র। "Art is never an exhibition but a revelation", একথা ওস্তাদরা ভুলিয়া থাকেন। Exhibitionএর গর্ব তার অপরিমিত বহুলত্বে, revelationএর গৌরব তার পরিপূর্ণ ঐক্যে। সেই ঐক্যে থামা বলে একটা পদার্থ আছে চলার চেয়ে তার মূল্য কম নয়। সে থামা অত্যন্ত জরুরী।" কবি বলেন যে এ শ্রেণীর সংগীতে আর্টের সৌন্দর্য পরিস্ফুট হয় না, বাহুল্য বা অতিরঞ্জনের দ্বারা আর্টের মান থাকে না।

সংগীতের প্রশ্ন লইয়া ধূর্জটিপ্রসাদের সঙ্গে কবির পত্রালাপ চলে। ধূর্জটিপ্রসাদ কবিকে সংগীত সম্বন্ধে নানাভাবে প্রশ্ন করিতে পারিতেন ও তাহারই ফলে কবি দীর্ঘ উত্তর দানে উদ্‌বোধিত হইতেন। ধূর্জটিপ্রসাদের সহিত আলোচনা 'সুর ও সঙ্গতি' গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছে।[৪]

'সুর ও সঙ্গতি' প্রকাশিত হইলে (১৩৪২ চৈত্র) ছদ্মনামী 'শার্ঙ্গধর' যে নাতিদীর্ঘ সমালোচনা[৫] করেন তাহা প্রত্যেক সংগীতরসিকের অবশ্য পাঠ্য। সমালোচক প্রগতির দৃষ্টিতে ভারতীয় সংগীতকে দেখিয়া বলিয়াছেন, "সুরের সঙ্গে সঙ্গতি হয় জীবন্ত সুরের, অসুরের নয়,··· । বাঙালী ভগীরথের সুরের সুরধুনী ছুটে চলল আপন অনিবার্যতার

১ লখনৌ বিশ্ববিদ্যালয় রবীন্দ্রনাথের স্মরণে বিরাট গ্রন্থাগারের নাম দেন Tagore Library।

২ সুধাকান্ত শান্তিনিকেতনের পুরাতন ছাত্র ও পরে কর্মীরূপে আসেন; বিচিত্র কর্মের মধ্য দিয়া তিনি দীর্ঘকাল আশ্রমকে সেবা করিয়া আসিতেছেন। ১৯২৯এ কবির ব্যক্তিগত তদারকের ভার তাঁহার উপর ন্যস্ত হয়। এই সময়ে তিনি বিশ্বভারতীর জন্য অর্থসংগ্রহে বিশেষভাবে নিযুক্ত হন।

৩ ২১ মার্চ ১৯৩৫। সুর ও সঙ্গতি পৃ ৯—১২।

৪ যে পত্রগুলি 'সুর ও সঙ্গতি'তে প্রকাশিত হইয়াছে, আমরা এখানে তাহার তালিকা দিলাম—

কবির পত্র ৭ জানুয়ারি ১৯৩৫ পৃ ৫। [জানুয়ারি ১৯৩১] পৃ ১। ২১ মার্চ ১৯৩৫ পৃ ৯। ৩০ মার্চ ১৯৩৫ পৃ ১৩। ধূর্জটিপ্রসাদের পত্র ২৫ মার্চ ১৯৩৫ পৃ ১৭—৪৯, ৬০। রবীন্দ্রনাথের পত্র ৩০ মার্চ ১৯৩৫ পৃ ১৩। ৯ এপ্রিল ১৯৩৫ পৃ৫০। ১৫ মে ১৯৩৫ পৃ ৫৬। ১৬ মে ১৯৩৫ পৃ ৬৩। ধূর্জটিপ্রসাদের পত্র ৪ জুলাই ১৯৩৫ পৃ ৬৭। রবীন্দ্রনাথের পত্র ৬ই জুলাই ১৯৩৫ পৃ ৭৭। ১১ জুলাই ১৯৩৫ পৃ ৯০। শেষ সপ্তক-এর ১৭ সংখ্যক কবিতা-পত্র, ধূর্জটিপ্রসাদকে লিখিত।

৫ সুর ও সঙ্গতি—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, ভারতীভবন। দ্র প্রবাসী, ১৩৪৩ বৈশাখ, পুস্তক-পরিচয়। দ্র রবীন্দ্রলাল রায়, সুর ও সঙ্গতি (সমালোচনা) পরিচয় পৃ ৮৫, ৫ম বর্ষ ১৩৪২ বৈশাখ পৃ ৩২১-২৭।

বেগে। জাগল অজানা ঝঙ্কার, অচেনা ছন্দ ; কতক মিলল অতীতের সঙ্গে কিন্তু বোঝা গেল তার চরম আলাপ ভবিষ্যৎকে নিয়ে। এ স্রোত যখন বাংলার বুকের উপর দিয়ে চলেছে তখন বাংলার মাটির রঙের ছাপ তার উপর পড়তে বাধ্য ; বাংলা কীর্তন, বাউল, জারি ভাটিয়ালের ছন্দ তাকে নিজস্ব ছন্দে নাচিয়ে তুলবেই। এর বিরুদ্ধে কোন প্রতিবাদই টিকবে না—না পণ্ডিতের না কালোয়াতের। এই মৌলিক তথ্যটি কবি তাঁর নিজস্ব ভাষায় অপূর্ব ব্যঞ্জনায় প্রকাশ করেছেন এই বইয়ের কয়েকটি চিঠিতে।"

সমালোচক কবির নিম্নোদ্ধৃত বাণী উদ্ধৃত করিয়া বক্তব্য শেষ করিয়াছেন—"একদিন বাংলার সংগীতে যখন বড়ো প্রতিভার আবির্ভাব হবে তখন সে বসে বসে পঞ্চদশ শতাব্দীর তানসেনী সংগীতকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে প্রতিধ্বনিত করবে না · ···তার দৃষ্টি অপূর্ব হবে গম্ভীর হবে বর্তমান কালের চিত্তশঙ্খকে সে বাজিয়ে তুলবে নিত্যকালের মহাপ্রাঙ্গণে।"

কবি ভালোরূপেই জানিতেন যে অতীতে ভারতীয় সংগীত বৈদিক, স্থানিক ও ইসলামিক বিচিত্র সুরের মিলনে গড়িয়া উঠিয়াছে এবং ভবিষ্যতেও বিচিত্রের সমাবেশে সে আত্মপ্রকাশ করিবে ; হিন্দুস্থানী সংগীত Indo-Sarasenic art-এর ন্যায় অতীতের জিনিস। কাব্যে শিল্পে যেমন মানুষ অতীতকে আঁকড়াইয়া নাই, কবির মতে সংগীতও অতীতের আঁচলে বাঁধা পড়িয়া থাকিবে না ; সেখানে নূতন ভাব, নূতন ছন্দ, নূতন সুর আসিবেই।

শ্যামলী

উত্তর ভারত ঘুরিয়া (৬ ফেব্রু—৩ মার্চ) কলিকাতায় বরানগরে প্রশান্তচন্দ্রের বাসায় কয়েকদিন থাকিয়া কবি শান্তিনিকেতনে ফিরিলেন (৪ মার্চ ১৯৩৫)। শান্তিনিকেতনে তাঁহার মাটির বাড়ি 'শ্যামলী' নির্মিত হইতেছে। পনের বৎসর পূর্বে যে পর্ণকুটির মাঠের মধ্যে নির্মিত হয় তাহাকে কেন্দ্র করিয়া উত্তরায়ণের বিরাট প্রাসাদোপম গৃহাদি উঠিয়াছে ; তাহার মধ্যে নূতন মাটির বাড়ি কিরূপ হইবে, তাহা লইয়া সুরেন্দ্রনাথ, নন্দলালের সহিত কবির কত রকম পরামর্শ চলিতেছে। মাটির বাড়ি—তার ছাদ মাটির সঙ্গে আলকাতরা মিশাইয়া শক্ত করা হইবে—ঘরের মেঝেও হইবে সেই উপাদানে। এই গৃহ-পরিকল্পনার উদয় হয়, গত বৎসর নন্দলাল-নির্মিত অনুরূপ উপাদানে গঠিত মঞ্চ হইতে। মঞ্চটি আছে ভোজনশালার সম্মুখে রাস্তার মোড়ে। এই উপাদানেই 'শ্যামলী' গৃহ নির্মিত হইতে থাকিল।

শান্তিনিকেতনে কবি তখন একা। মার্চ মাসে (১৯৩৫) রথীন্দ্রনাথ, প্রতিমাদেবী ইংলন্ড গিয়াছেন ; শিক্ষাভবন ও পাঠভবনের অধ্যক্ষ ধীরেন্দ্রমোহনও সঙ্গে আছেন। ইঁহাদের বিলাতযাত্রার প্রধান উদ্দেশ্য মিঃ এলমহার্স্টের সহিত শ্রীনিকেতনের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আলোচনা করা। পাঠকের স্মরণ আছে গত ১৯২২ সাল হইতে শ্রীনিকেতন এলমহার্স্টের প্রদত্ত অর্থে পরিপালিত হইয়া আসিতেছে। রথীন্দ্রনাথের অনুপস্থিত কালে চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য কর্মসচিবের ও সুরেন্দ্রনাথ কর শান্তিনিকেতন-সচিবের কাজ করেন। গৌরগোপাল ঘোষ শ্রীনিকেতন-সচিব ছিলেন। প্রসঙ্গত বলিতে পারি এলমহার্স্টের দান পূর্বের ন্যায় চলিতে লাগিল ; এছাড়াও Dartington Trust হইতে গ্রামের অর্থনৈতিক গবেষণার জন্য অতিরিক্ত অর্থ পাওয়া গেল ; ইহাও এলমহার্স্টের দান।

রথীন্দ্রনাথ ও প্রতিমাদেবী বিলাত চলিয়া গেলে উত্তরায়ণে কবির অভিভাবিকা থাকিলেন বালিকা পুপে বা

নন্দিনী। যে কয় মাস রথীন্দ্রনাথরা বিদেশে ছিলেন, রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতন ত্যাগ করিয়া কোথায়ও যান নাই (৪ মার্চ—৮১২ মে ১৯৩৫)। এই পর্বে তিনি আপন মনে বসিয়া 'শেষ সপ্তকে'র গদ্যছন্দের রচনা লিখিতেছেন ও ছবি আঁকিতেছেন।

মার্চ মাসের শেষের দিকে কবির আমন্ত্রণে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম অধ্যাপক কাজি আবদুল ওদুদ[১] আসিলেন 'হিন্দু মুসলমানের সমস্যা' সম্বন্ধে বক্তৃতা দিবার জন্য। জনাব ওদুদ রবীন্দ্রনাথের কাব্যের 'পরে একখানি সমালোচনা-গ্রন্থ লিখিয়া ইতিমধ্যে সুপরিচিত হইয়াছিলেন। ওদুদ সাহেবের মনের ব্যাপ্তি ও দরদী ভাব কবিকে আকৃষ্ট করে। শান্তিনিকেতনে আসিয়া জনাব ওদুদ যে বক্তৃতাগুলি দেন, তাহাতে কবি উপস্থিত হইতেন (২৬, ২৭, ২৮ মার্চ ১৯৩৫)। এ যুগের জটিলতম সমস্যা হিন্দু মুসলমানের সম্বন্ধ। শিক্ষিত মুসলমান কী ভাবে এইটিকে দেখেন, তাহা জানিবার কৌতূহল কবির। ওদুদ সম্বন্ধে কবির মত তিনি ব্যক্ত করেন অধ্যাপকের গ্রন্থ 'হিন্দু মুসলমানের বিরোধ' এর ভূমিকায়; কবি লেখেন 'এদেশে হিন্দুমুসলমান বিরোধের বিভীষিকায় মন যখন হতাশ্বাস হয়ে পড়ে, এই বর্বরতার অন্ত কোথায় ভেবে পায় না, তখন মাঝে মাঝে দূরে দূরে সহসা দেখতে পাই দুই বিপরীত মূলকে দুই বাহু দিয়ে আপন ক'রে আছে এমন এক-একটি সেতু। আব্দুল ওদুদ সাহেবের চিত্তবৃত্তির ঔদার্য সেই মিলনের একটি প্রশস্ত পথ রূপে যখন আমার কাছে প্রতিভাত হয়েছে তখনি আশান্বিত মনে আমি তাঁকে নমস্কার করেছি। সেই সঙ্গে দেখেছি তাঁর মননশীলতা, তাঁর পক্ষপাতহীন সূক্ষ্ম বিচারশক্তি, বাংলাভাষায় তাঁর প্রকাশশক্তির বিশিষ্টতা।" (ভূমিকা ২১ মাঘ, ১৩৪২) অধ্যাপকের ভাষণ শুনিয়া কবির মনে এই সমস্যা সম্বন্ধে যে ভাবনার উদয় হয়—তাহা তিনি একখানি পত্রে (২৭ মার্চ) অমিয় চক্রবর্তীকে লেখেন। উত্তর-ভারত ভ্রমণ কালে হিন্দুমুসলমানের সমস্যা সম্বন্ধে যে অভিজ্ঞতা আহরণ করেন, তাহারই ভিত্তিতে পত্রখানি লিখিত। কবি লিখিতেছেন—

"শান্তিনিকেতনে যখন আপনাদের ভাবে ও কাজে বেষ্টিত থাকি, তখন সমগ্র ভারতের বর্তমান ঐতিহাসিক রূপটা প্রত্যক্ষ দেখতে পাইনে। এবারে মূর্তিটা দেখা গেল।... সর্বত্রই দেখা গেল হোয়াইট পেপার নিয়ে আলোচনা চলছে।... দেখতে দেখতে হিন্দুমুসলমানের ভেদ অসহ্য হয়ে উঠল, এর মধ্যে ভাবীকালের যে সূচনা দেখা যাচ্ছে তা রক্তপঙ্কিল। লখনৌয়ে একজন মুসলমান ভদ্রলোক আক্ষেপ ক'রে বলেছিলেন, কী করা যায়। আমি বললুম রাষ্ট্রীয় বক্তৃতামঞ্চে নয়, কাজের ভিতর দিয়ে মিলতে হবে।...তিনি বললেন, আগা খাঁ এই কাজে মুসলমানদের স্বতন্ত্র হয়ে চেষ্টা করতে মন্ত্রণা দিচ্ছে। পাছে গান্ধীজির অনুষ্ঠানে পল্লীবাসী হিন্দু মুসলমানের মধ্যে আপনি মিলন ঘটে সেই সম্ভাবনাটাকে দূর করবার অভিপ্রায়ে এই দৌত্য। বর্তমান ভারতের রাষ্ট্রনীতিতে হিন্দুর সঙ্গে পৃথক হওয়াই মুসলমানের স্বার্থরক্ষার প্রধান উপায়। এতকাল ধর্মে যে দুই সম্প্রদায়কে পৃথক করেছিল আজ অর্থেও তাদের পৃথক করে দিল—মিলব কোন শুভবুদ্ধিতে আপীল ক'রে? না মিললে ভারতে স্বায়ত্তশাসন হবে ফুটো কলসীতে জলভরা।...

"পঞ্জাবে হিন্দুমুসলমানের মধ্যে যে বিচ্ছেদের ছবি দেখে এলুম তা অত্যন্ত দুশ্চিন্তাজনক এবং লজ্জাকর রূপে অসভ্য। বাংলার অবস্থা তো জানোই—এখানে উভয় পক্ষের ধিক্কৃত সম্বন্ধের ভিতর দিয়ে প্রায়ই যে সব বীভৎস অত্যাচার ঘটছে তাতে কেবল অসহ্য দুঃখ পাচ্ছি তা নয়, আমাদের মাথা হেঁট ক'রে দিল।"

এই পত্র কবি লেখেন ১৯৩৫ সালের মার্চমাসের শেষভাগে। ১৯৩৫ এর নূতন শাসনতন্ত্র চালু করিবার আয়োজন চলিতেছে, তৎপরবর্তীযুগের ইতিহাস সুপরিচিত। কবির দূরদৃষ্টিতে যাহা প্রতিভাত হইতেছিল—রাষ্ট্রনৈতিকদের ক্ষীণ-দৃষ্টিতে তাহার কোনো আভাস নাই—সেখানে তাঁহাদের আত্মতৃপ্ত ভাব, আশু সিদ্ধিলাভের উত্তেজনায় সকলেই মুগ্ধ।

১ ১৯৫১ জুলাই পর্যন্ত ইনি পশ্চিম বঙ্গ সরকারের শিক্ষা-বিভাগে কাজ করিয়াছেন।

এই পত্রের আরো কয়েকটি পংক্তি প্রণিধানযোগ্য। "কোনো এক সময়ে য়ুরোপে যখন প্রলয় কাণ্ড ঘটবে তখন ইংরেজের শিথিল মুষ্টি থেকে ভারতবর্ষ খসে পড়বেই। কিন্তু ভারতবর্ষের মতো এত বড়ো দেশে দুই প্রতিবেশী জাতির মজ্জায় মজ্জায় এই যে বিষবৃক্ষ আজ বর্ধিত ও শাখায়িত হল কবে তা আমরা উৎপাটিত করতে পারব।"

সমস্যা নানা প্রকারের। এই তো গেল দেশব্যাপী সমস্যা। কিন্তু পৃথিবীব্যাপী যে আর্থিক দুর্গতি ও বেকার সমস্যা সকলকে পিষিয়া মারিতেছে তাহার তরঙ্গও কবিকে অনুভব করিতে হয়, কারণ তাঁহার যোগ বৃহৎ ও বিচিত্রের সঙ্গে। বিশ্বভারতীর দায়ের কথা সুপরিচিত এবং সেখানকার অর্থকৃচ্ছ্রতা সুবিদিত। প্রমথ চৌধুরীকে কবি লিখিতেছেন, "সমস্ত পৃথিবী এখন অর্থাভাবের গ্রহণ লাগা—তার ছায়া এখানেও [শান্তিনিকেতনে] আছে—কিন্তু একটা সুবিধে এই যে, যেহেতু এ জায়গাটা উদ্ধত সহর নয় সেইজন্যে দারিদ্র্যটা অত্যন্ত বেমানান হয়ে মানুষকে প্রতিদিন অপমানিত করে না। অভাবটাকে এখানে স্বভাবের মতোই করে নেওয়া চলে।"[১] এইটি লিখিত হয় ১৯৩২ সালের এপ্রিল মাসে—এখন থেকে বহু বৎসর পূর্বে—অতঃপর কালান্তর ঘটিয়াছে।

তবে কবির কাছে সরল জীবন যাপন ও সৌন্দর্যহীনতা একার্থক নহে। কিন্তু দেশের মধ্যে মহাত্মাজির সরল জীবনাদর্শের অনুকরণে এক শ্রেণীর লোকের মধ্যে কৃত্রিম 'গরিবানা'র ঢং দেখা দিয়াছে; সৌন্দর্যকে অবজ্ঞা করা যেন তাঁহাদের আধ্যাত্মিকতার একটা অঙ্গ। চারিদিকের pseudo-asceticism-এর কথা কবি আলোচনা করিয়া নববর্ষের ভাষণে (১৩৪২) বলিলেন, "সুন্দরকে অবজ্ঞা করার শিক্ষা আজ এদেশে কোনো কোনো ক্ষেত্রে সম্প্রতি দেখা দিয়েছে। যে অসুন্দরে প্রকাশের পূর্ণতা ভ্রষ্ট হয়, তাকে স্পর্ধাপূর্বক বরণ করবার চেষ্টা দেখা যাচ্ছে; দারিদ্র্যের অনুকরণ করাকে কর্তব্য বলে মনে করছি; ভুলে যাচ্ছি দারিদ্র্যের বাহ্য ছদ্মবেশে আত্মার অবমাননা করা হয়। ঐশ্বর্যই বীরের। ঐশ্বর্য মহৎ, ঐশ্বর্য দাস নয়;…ঐশ্বর্যকে প্রকাশ করতে চায় বীর্যশালী…।"

এই সঙ্গে কবির মনে আর-একটি ভাবনা আসে। দেশে কিছুকাল হইতে 'সাধারণ লোকের জন্য' কিছু করিবার উৎসাহ বাড়িয়াছে—যেন যাঁহারা তাহা করিবেন তাঁহারা অ-সাধারণ, তাঁহারা 'দরিদ্রনারায়ণে'র জন্য যেমন অন্নদান করিবেন, তেমনিই তাহাদের মানসিক উন্নতির জন্য তাহাদের উপযোগী ভোজ্য উৎসর্গ করিবেন। রবীন্দ্রনাথ এই শ্রেণীগত সাহিত্য, কলা, আনন্দসৃষ্টির চিরবিরোধী। তিনি এই ভাষণে স্পষ্ট করিয়া বলিলেন,—

"সংখ্যা গণনা করলে পৃথিবীতে অধিকাংশ মানুষই বাক্যদীন, শিক্ষার অভাবে শক্তির অভাবে বাক্যের দ্বারা আপনাকে প্রকাশ করতে জানে না; সেই বাক্যদৈন্যের সাধনাকেই যদি তাদের প্রতি মমতা প্রকাশের উপায় বলে গণ্য করি তবে সেই দীনদেরই সকলের চেয়ে বঞ্চিত করা হবে। যে-ভাষার ঐশ্বর্য কাব্যে মহাকাব্যে মহানাটকে, বাণীর সেই ঐশ্বর্য ক্ষেত্রেই বাক্যদীনদের আনন্দসত্র।…দেবতা যেমন সর্ববর্ণনির্বিশেষে সকল মানুষেরই, শিল্পৈশ্বর্যের প্রকাশও তেমনই সকল মানুষেরই। তাকে বোঝবার স্বীকার করবার শিক্ষা অবস্থানির্বিশেষে সকলেরই হক এই কথাটাই বলবার যোগ্য। শোনা যায় এসকিলস, সফোক্লিস, য়ুরিপিডীস প্রমুখ মহৎ প্রতিভাবান নাট্যকারদের নাটক এথেন্সের সর্বসাধারণের জন্যেই অভিনীত হয়েছে— সর্বসাধারণের প্রতি এই হচ্ছে যথার্থ সম্মান প্রকাশ। তাদের প্রতি দয়া করে নাটকের রচনাকে যদি দরিদ্র করা হত তবে সেই গর্বোদ্ধত দারিদ্র্য সাধনার প্রতি সর্বকালের অভিশাপ বর্ষিত হত।"

কবি চিরদিন সর্বসাধারণের জন্য সর্বোৎকৃষ্ট সামগ্রী দিবার পক্ষপাতী। আধুনিক জগতে প্রগতিশীল জাতির ভাবনা এই দিকেই গিয়াছে। দরিদ্রনারায়ণ বা হরিজনের জন্য বিশেষ ব্যবস্থার তিনি বিরোধী। এই ভাষণের শেষাংশে বেদের একটি অংশ উদ্ধৃত ও অনুবাদ করিয়া কবি বলিলেন, "আমি সমস্ত দ্যুলোক ভূলোক ভ্রমণ ক'রে এসে দাঁড়ালুম প্রথমজাত অমৃতের সম্মুখে। সেই প্রথমজাত অমৃত তো আজও জরাজীর্ণ হয় নি, জলে স্থলে আকাশে তার

১ ` বৈশাখ ১৩৪২ চিঠিপত্র ৫ম পৃ ১১৭।

ঐশ্বর্য তো বিচিত্ররূপে প্রকাশমান। আদিকালের সেই প্রথমজাত অমৃতই তো মানুষের আত্মায় 'অপূর্বেণেষিতা বাচস্', অপূর্বের দ্বারা প্রেরিত বাণী, তার প্রকাশ তো আজও নব নব আনন্দরূপে উদ্ভাবিত হয়ে মানুষকে সর্বোচ্চ গৌরবে মহীয়ান করেছে। এই আবিকে এই সুন্দরকে এই আনন্দকে ঈর্ষা ক'রে আমরা যদি তার প্রতি বিমুখ হই তবে আমাদের জীবন মূঢ় অদৃষ্টের পায়ের তলায় শিকলে বাঁধা হয়ে কাটবে শুধুমাত্র খেয়ে প'রে। আমরা যে সৃষ্টিকর্তার শরিক, আমাদের আত্মা যে প্রকাশস্বরূপ, এই কথাই আজ নববর্ষে আমরা যেন স্বীকার করতে পারি।"[১] কবির মতে যাহাকে আমরা 'সর্বসাধারণ' বলি সেই মানুষমাত্রই সৃষ্টিকর্তার শরিক। তাঁর কাজকে প্রত্যেকে সৃষ্টি করিয়া তুলিতেছি—এই ভাবনার ধ্যানই হইতেছে যথার্থ সাধনা।

এই নববর্ষের দিন যে কবিতাটি লেখেন অথর্ববেদ থেকে উদ্ধৃতি দিয়া, তার ভূমিকা 'পরিত্যাবা পৃথিবী সদ্য আয়ম্ উপাতিষ্ঠে প্রথমজামৃতস্য'। এই প্রথমজাত অমৃতের বন্দনা এই কবিতায়—'কে এই প্রথমজাত অমৃত, কী নাম দেব তাকে? তাকেই বলি নবীন, সে নিত্যকালের'।

এইবার কবির ৭৪তম জন্মোৎসব যথারীতি সমাপ্ত হইল। এই দিন স্মরণে অমিয়চন্দ্র চক্রবর্তীকে গদ্য-কবিতায় লিখিত একখানি পত্র পাই 'শেষ সপ্তকে'র মধ্যে (৪৩ সংখ্যক)—"পঁচিশে বৈশাখ চলেছে জন্মদিনের ধারাকে বহন করে মৃত্যুদিনের দিকে।" এই দীর্ঘ কবিতায় জীবনের অনেক অভিজ্ঞতা, বেদনা, আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা প্রকাশ পাইয়াছে।

এই দিনে উৎসবান্তে 'শ্যামলী'র গৃহপ্রবেশ অনুষ্ঠান হইল।[২] মাটির ঘর করার ফরমাইশ কবির, স্থাপত্য পরিকল্পনা সুরেন্দ্রনাথের, ভাস্কর্য নন্দলালের। কবি, স্থপতি ও ভাস্করের মিলিত প্রয়াস আছে এই গৃহরচনায়। তবে আসলে এই কার্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিবার কৃতিত্ব সুরেন্দ্রনাথ করের। এই গৃহপ্রবেশ অনুষ্ঠানের মধ্যে কবি সে-কথা স্বীকার করিয়া সুরেন্দ্রনাথের উদ্দেশে একটি কবিতা পাঠ করেন।[৩] সেই সন্ধ্যাকালে শান্তিনিকেতনের কর্মীরা পরশুরামের 'বিরিঞ্চি বাবা' অভিনয় করেন। কবি প্রহসনটির স্থানে স্থানে অদল বদল করিয়া দেন; অভিনয়কালে তিনি স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন।

শ্যামলীর গৃহপ্রবেশ হইয়া গেলে কবি রথীন্দ্রনাথকে বিলাতে লিখিতেছেন, "মাটির বাড়িটা খুব সুন্দর দেখতে হয়েছে। নন্দলালের দল দেয়ালে মূর্তি করবার জন্যে কিছুকাল ধরে দিনরাত পরিশ্রম করেছে ......। গ্রামের লোকদের ঔৎসুক্য সব চেয়ে বেশি। মাটির ছাদ হতে পারে এইটেতেই ওদের উৎসাহ। পাড়াগাঁয়ে খড়ের চাল উঠে গেলে সব

১ শান্তিনিকেতনে বর্ষশেষ ও নববর্ষের উৎসব উদ্‌যাপিত হয়; দ্র নববর্ষ (পুলিনবিহারী সেন কর্তৃক অনুলিখিত) প্রবাসী ১৩৪২ জ্যৈষ্ঠ পৃ ১৫৬-৫৮।

২ ধরণী বিদায়বেলা আজ মোরে ডাক দিল পিছু,
কহিল, 'একটু থাম্, তোরে আমি দিতে চাই কিছু
আমার বক্ষের স্নেহ, রাখিব একান্ত কাছে ধরে
যে ক'দিন রয়েছিস হেথা, ঘিরিয়া রাখিব তোরে
স্পর্শ মোর করি মূর্তিমান।'
হে সুরেন্দ্র, গুণী তুমি,
তোমারে আদেশ দিল, ধ্যানে তব, মোর মাতৃভূমি—
অপরূপ রূপ দিতে শ্যাম স্নিগ্ধ তাঁর মমতারে
অপূর্ব নৈপুণ্যবলে। আজ্ঞা তাঁর মোর জন্মবারে
সম্পূর্ণ করেছ তুমি আজি।
তাঁর বাহুর আহ্বান
নিঃশঙ্ক সৌন্দর্যে রচি' আমারে করিলে তুমি দান
ধরণীর দূত হয়ে। মাটির আসনখানি ভরি
রূপের যে প্রতিমারে সম্মুখে তুলিলে তুমি ধরি
আমি তার উপলক্ষ্য, ধরার সন্তান যারা আছে
ধরার মহিমা গান করিবে সে সকলের কাছে।
পঁচিশে বৈশাখে আমি একদিন না রহিব যবে
মোর আমন্ত্রণখানি তোমার কীর্তিতে বাঁধা র'বে,
তোমার বাণীতে পাবে বাণী। সে বাণীতে র'বে গাঁথা,
ধরারে বেসেছি ভালো, ভূমিরে জেনেছি মোর মাতা।

(প্রবাসী ১৩৪২ জ্যৈষ্ঠ পৃ ২৮২-৮৫। শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের জন্মোৎসব। ৯ খানি ফোটোর মুদ্রণ আছে)।

২

দিক দিয়ে ওদের সুবিধে।"[১] কবির ভাবনা শুধু আর্টিস্টের বিলাসিতা নহে, ব্যবহারিকতার সাফল্যের দিকেও তাঁহার দৃষ্টি। এই নূতন মৃৎ কুটীর যখন নির্মিত হইতেছে তখন কবি ইহারই উদ্দেশ্যে লেখেন—

আমার শেষ বেলাকার ঘরখানি
বানিয়ে রেখে যাব মাটিতে,
তার নাম দেব শ্যামলী।
ও যখন পড়বে ভেঙে
সে হবে ঘুমিয়ে পড়ার মতো,
মাটির কোলে মিশবে মাটি ;
ভাঙা থামে নালিশ উঁচু ক'রে
বিরোধ করবে না ধরণীর সঙ্গে ;
ফাটা দেয়ালের পাঁজর বের ক'রে
তার মধ্যে বাঁধতে দেবে না
মৃত দিনের প্রেতের বাসা।

কবিতাটি 'শেষ সপ্তকে'র (৪৪) অন্তর্গত। কবির জন্মদিনে (২৫ বৈশাখ ১৩৪২) শেষসপ্তক প্রকাশিত হইল।

উৎসবান্তে দুইদিন পরে ইন্দিরা দেবীকে লিখিতেছেন, "শরীর ক্লান্তিতে অবসন্ন।···ধুমধাম হয়ে গেল একচোট। জনসাধারণের মাঝে মাঝে খেলা করবার সখ মেটাবার জন্যে জ্যান্ত পুতুলের দরকার করে এই সখের জোগান দিয়েছি আমি—কিন্তু বড়ো ক্লান্তিকর।"[২] পরদিন কবি কলিকাতায় গেলেন।

এইবার (১৯৩৫ মে) Visvabharati Quarterly পুনরায় প্রকাশের ব্যবস্থা হইল ; ১৯২৩ হইতে ১৯৩১ এই আট বৎসর চলিয়া উহা বন্ধ হইয়া যায়। বিশ্বব্যাপী অর্থকৃচ্ছ্রতার অভিঘাতেই ইহাকে বন্ধ করিতে হয়। কৃষ্ণ কৃপালনির[৩] উদ্যোগে ও সম্পাদনে উহা ২৫ বৈশাখ (১৩৪২) প্রকাশিত হইল। কৃষ্ণ কৃপালনি সিন্ধুদেশীয় যুবক ; বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয় হইতে গ্রাজুয়েট হইয়া বিলাত যান ও ব্যারিস্টারি পাশ করিয়া আসেন। কিন্তু বোম্বাই বা করাচির বৈষয়িক জীবন তাঁহার ভালো না লাগায় তিনি শান্তিনিকেতনে আসেন। পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় কবির নিজ কৃত Art and Tradition নামে প্রবন্ধ এবং 'কোপাই' ও 'সাঁওতাল মেয়ে' কবিতা দুটির তর্জমা বাহির হইল। ইহা ছাড়া সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর অনূদিত The Function of Literature ('সাহিত্য' হইতে) প্রকাশিত হইয়াছিল। এই পত্রিকা চালু করিবার জন্য কবি বিশ্বভারতীর 'প্রেসিডেন্ট ফাণ্ড' হইতে একটা মোটা টাকার ব্যবস্থা করেন।

১ চিঠিপত্র ২য় [পত্র ৪৩] পৃ ১০৮ জোড়াসাঁকো ২৯ বৈশাখ ১৩৪২।

২ ২৭ বৈশাখ ১৩৪২ চিঠিপত্র ৫ম পত্র ৫৮ পৃ ১০৩। চিঠিপত্র ২য় [পত্র ৪৩] পৃ ১০৮ জোড়াসাঁকো। ২৯ বৈশাখ ১৩৪২।

৩ কৃষ্ণকৃপালনি বর্তমানে শিক্ষামন্ত্রী মৌলানা আবুলকালাম আজাদের খাস সেক্রেটারি।

শেষসপ্তক

কবির ৭৪তম জন্মদিনে 'শেষসপ্তক' প্রকাশিত হইল (২৫ বৈশাখ ১৩৪২)। কবি মনে করিতেছেন এই যেন তাঁহার শেষ রচনা খণ্ড। উত্তর ভারত হইতে ফিরিবার পর দুই মাসের মধ্যে এইগুলি রচিত। পুরাতন কবিতা ভাঙিয়া গদ্যছন্দে নূতন রূপদানের পরীক্ষা হইয়াছে কয়েকটির মধ্যে। ইতিপূর্বে-গদ্যছন্দে-রচিত 'পুনশ্চ' হইতে 'শেষসপ্তক' সম্পূর্ণ অন্য পরিপ্রেক্ষণীতে আলোচনীয়।[১]

বার্ধক্যজনিত ক্লান্তদেহ, অনবসর জীবন,— তাহার মাঝে মনের মতো অনুকূল পারিপাশ্বিকে মন যখন নিজের দিকে চাহিবার সময় পায়, 'শেষসপ্তকে'র কবিতাগুলি সেই সময়ের লেখা। আমাদের মনে হয় সমসাময়িক একখানি পত্রে কবির অজ্ঞাতসারে তাঁহার মনের কথাটি ব্যক্ত হইয়াছে।

"জীবন আকাশের আলো ম্লান হয়ে এসেচে—এখন মনের বিক্ষিপ্ত ভাবনাগুলো যেন গোষ্ঠে ফেরবার মুখে—বাইরের দিকটা অবরুদ্ধ হয়ে আসচে। এই অবস্থায় নিজেকে একলা মনে হয়। এ জন্মের যাত্রাপথের যারা সঙ্গী ছিল তারা অনেকেই নেই—নতুন যারা কাছে এসেছে জীবনের শেষ প্রান্তের সঙ্গে তাদের যোগ—এই প্রান্তটি সংকীর্ণ এবং ক্রমেই ক্ষীণতর হয়ে আসচে। চেষ্টা করছি অন্তরের দিকে নতুন পালা আরম্ভ করতে—সেটা উত্তর অয়ন পেরিয়ে উত্তরতর অয়ন।"[২]

এই মনোভাবের পরিপ্রেক্ষণীতে শেষসপ্তকের লিরিকগুলিকে দেখিতে হইবে; এবং এইজন্যই ইহাদের মূল

১ শেষসপ্তক সংখ্যা ২, পূর্বরূপ স্মৃতিপাথেয় (প্রবাসী ১৩৪০ শ্রাবণ) রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৮ খণ্ড সংযোজন পৃ ১০৭। শেষসপ্তক সংখ্যা ৩, পূর্বরূপ বাতাবির চারা (বিচিত্রা, ১৩৪০ ফাল্গুন) র-র ১৮ সংযোজন পৃ ১০৮। শেষসপ্তক সংখ্যা ৪, পূর্বরূপ শেষপর্ব (জোড়াসাঁকো ২২ চৈত্র ১৩৪০। প্রবাসী ১৩৪১ কার্তিক) র-র ১৮ সংযোজন পৃ ১০৯। শেষসপ্তক সংখ্যা ১০, পূর্বরূপ 'দুঃখ যেন জাল পেতেছে' (২৮ আষাঢ় ১৩৪১) র-র সংযোজন পৃ ১২৩। শেষসপ্তক সংখ্যা ২৩, পূর্বরূপ শরৎ 'অবরুদ্ধ ছিল বায়ু।' (২৭ ভাদ্র ১৩৪১, বিচিত্রা ১৩৪১ কার্তিক দ্র প্রান্তিক ১৫ সংখ্যক)। শেষসপ্তক সংখ্যা ২৬, পূর্বরূপ মর্মবাণী (পরিচয় ১৩৪১ বৈশাখ) র-র ১৮ সংযোজন পৃ ১১১। শেষসপ্তক সংখ্যা ২৭, পূর্বরূপ ঘটভরা ১১৫ দ্র র-র ১৮ গ্রন্থপরিচয় অংশ পৃ ৫৭১—৭২। শেষসপ্তকে ২৭-সংখ্যক যে, 'কবিতাটি ছন্দোহীন গদ্যে প্রকাশিত হয়েছে, প্রথমে সেটা মিলহীন পদ্যছন্দে লেখা হয়েছিল। তারই পাণ্ডুলিপি প্রবাসীতে পাঠানো হ'ল।' শান্তিনিকেতন ২৪শে আশ্বিন ১৩৪৩। প্রবাসী ১৩৪৩ অগ্রহায়ণ। (১৭৯ পৃষ্ঠায় বিচিত্রিত পাণ্ডুলিপি মুদ্রিত)। শেষসপ্তক সংখ্যা ৩৪, পূর্বরূপ 'পথিক দেখেছি আমি পুরাণে' (৭ বৈশাখ ১৩৪১) প্রান্তিক ১৬ সংখ্যক)। শেষসপ্তক সংখ্যা ৩৫, পূর্বরূপ প্রশ্ন (২৯ কার্তিক ১৩৪১, প্রবাসী ১৩৪১ মাঘ), র-র ১৮ সংযোজন পৃ ১১৬। শেষসপ্তক সংখ্যা ৩৬, পূর্বরূপ আমি, র-র ১৮ সংযোজন পৃ ১১৭। শেষসপ্তক সংখ্যা ৩৭, পূর্বরূপ আষাঢ় (প্রবাসী ১৩৪০ আষাঢ়) র-র ১৮ সংযোজন পৃ ১২০। শেষসপ্তক সংখ্যা ৩৮, পূর্বরূপ যক্ষ, (দার্জিলিং ১৮ জ্যৈষ্ঠ ১৩৪০, প্রবাসী ১৩৪০ আশ্বিন) র-র ১৮ সংযোজন পৃ ১২১।

কতকগুলি পত্রকে গদ্যছন্দে রূপান্তরিত করা হয়—

শেষসপ্তক সংখ্যা ১৫, পূর্বরূপ পথে ও পথের প্রান্তে দ্র রানী মহলানবীশকে লিখিত পত্র ৬ অগ্রহায়ণ ১৩৩৫ ও ১৩ অগ্রহায়ণ ১৩৩৫। শেষের পত্র ভাঙিয়া ২টি কবিতা হয় ১৫ র-র ১৮ সংযোজন পৃ ৬১। শেষসপ্তক সংখ্যা ১৬, পূর্বরূপ সুধীন্দ্রনাথ দত্তকে লিখিত (পত্র ৭ এপ্রিল ১৯৩৪, ২৪ চৈত্র ১৩৪০) শেষসপ্তক সংখ্যা ১৭, পূর্বরূপ ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে পত্র। শেষসপ্তক সংখ্যা ১৮, পূর্বরূপ চারুচন্দ্র ভট্টাচার্যকে পত্র। শেষসপ্তক সংখ্যা ৪২, পূর্বরূপ চারুচন্দ্র দত্তকে পত্র। শেষসপ্তক সংখ্যা ৪৩, পূর্বরূপ অমিয় চক্রবর্তীকে পত্র (২৫ বৈশাখ ১৩৪২)। শেষসপ্তক সংখ্যা ৪৫, পূর্বরূপ প্রমথনাথ চৌধুরীকে পত্র। পুরাতন কবিতা ১২টি ; পত্র ভাঙিয়া গদ্যছন্দে রূপান্তরিত ৭টি। শেষসপ্তকে মোট ৪৬টি কবিতা, তন্মধ্যে ১৯টি বাদ গেলে ২৭টি নূতন কবিতা থাকে। দ্র র-র ১৮ খণ্ড।

২ চিঠিপত্র ৫ম পত্র ৫৭, ৭ এপ্রিল ১৯৩৫। ইন্দিরা দেবীকে লিখিত।

সুরটি "সৌম্য বিষাদের সুর। অতীত যৌবনের করুণ স্মৃতি, মৃত্যুর দুর্জ্ঞেয় রহস্য, প্রাণরসে ভরা চঞ্চল মুহূর্তগুলির গভীরতা, আর অনাগত সার্থকতার জন্য সুবিপুল ঔৎসুক্য ⋯একাব্যের প্রধান উপজীব্য।"[১]

শেষসপ্তকের রচনাগুলি পদ্যে লিখিত না হইলেও ইহাতে ছন্দ আছে, খাঁটি গদ্য কবিতার উদাহরণ স্বরূপ ইহাদের পেশ করা যায়। "এদের মজ্জায় সংযমের বাঁধন আছে, পদ্যের শৃঙ্খলে এরা বাঁধা পড়েনি বলে যে তারা উচ্ছৃঙ্খল তা নয়।"[১] কাব্যের গদ্যভঙ্গি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং কয়েকদিন পরে যাহা বলিলেন তাহা এই কাব্যখণ্ড রচনার কৈফিয়ত বা defence বলিতে পারি। কলিকাতা বিশ্বভারতী সম্মিলনীর অধিবেশনে তাঁহার 'কাব্যের গতি' প্রসঙ্গে এই গদ্যরীতির আলোচনা ওঠে। কবি বলেন, "গদ্য কথাবার্তার ভাষা, কবিতার বক্তব্য তাতে বলবার জো নেই; ভাষার যে একটুখানি আড়াল কাব্যে মাধুর্য জোগায়, গদ্যে তার অভাব; গদ্য হচ্ছে কথার ভাষা, খবর দেবার ভাষা। যে ভাষা সর্বদা প্রচলিত নয় তার মধ্যে যে একটা দূরত্ব আছে তারই প্রয়োগে কাব্যের রস জমে ওঠে। অধুনা 'শেষসপ্তক' প্রভৃতি গ্রন্থে আমি যে ভাষা, ছন্দ প্রয়োগ করেছি তাকে 'গদ্য' বিশেষণে অভিহিত করা হয়েছে। গদ্যের সঙ্গে তার সাদৃশ্য আছে ব'লে কেউ কেউ তাকে বলেছেন গদ্যকাব্য, সোনার পাথরবাটি। আমি বলি, যাকে সচরাচর আমরা গদ্য বলে থাকি সেটা আর আমার আধুনিক কাব্যের ভাষা এক নয়, তার একটা বিশেষত্ব আছে⋯যাকে আমার মন কাব্যের ভাষা ব'লে স্বীকার ক'রে নিয়েছে। এই ভঙ্গীতে আমি যা লিখেছি আমি জানি। তা অন্য কোনো ছন্দে বলতে পারতুম না।⋯অনেকে মনে করেন, কবিতা লেখা এতে সহজ হয়েছে। কিন্তু আমার মনে হয়, বাঁধা ছন্দেই তো রচনা হু হু ক'রে চলে, ছন্দই প্রবাহিত ক'রে নিয়ে যায়; কিন্তু যেখানে বন্ধন নেই অথচ ছন্দ আছে, সেখানে মনকে সর্বদা সতর্ক করে রাখতে হয়।"[২]

পাঠকদের মনে স্বতই এই প্রশ্ন উঠিতে পারে রবীন্দ্রনাথ মিলবদ্ধ কবিতা ভাঙিয়া ও সরল গদ্যরচনা পরিবর্তন করিয়া কেন এই নবতম গদ্যছন্দের প্রবর্তন করিলেন। গীত ও সমিল পদ্যই মানবের আদিতম সাহিত্যিক প্রকাশ; একথা সর্বজনবিদিত যে সাহিত্যক্ষেত্রে গদ্যের প্রবেশ অপেক্ষাকৃত আধুনিক। ভাবের জটিলতার সঙ্গে ভাষার সম্পদ যেমন একদিকে বাড়িতে থাকে, তেমনই প্রকাশভঙ্গীর পরিবর্তন হয়। গদ্য আসিল এই ভাবে। কাব্যের মধ্যে মিলের বাধা দূর হইয়াছিল অমিত্রাক্ষর ছন্দের আবির্ভাবে। রবীন্দ্রনাথ আর-এক ধাপ আগাইয়া গেলেন,— এই পদ্ধতিতে গদ্যের নূতন রূপ আসিল সাহিত্যে। গত কয়েক বৎসর হইতেই কবি এই পরীক্ষা করিতেছেন; 'শেষসপ্তক'-এ আসিয়া ইহা যেন যথার্থ রূপ পাইল। এই ভঙ্গী অবলম্বনের জন্য কবিকে সমালোচনার ভাগী হইতে হয়।[৩]

ভঙ্গীর দিক হইতেও এই কাব্যখানি যেমন রবীন্দ্রসাহিত্যে বিশেষভাবে বিচারণীয়, ভাবের দিক হইতেও এই কাব্যখানি তেমনই আলোচনীয়। কয়েকদিন পরে চন্দননগরের নৌকাবাস হইতে এক পত্রে ধূর্জটিপ্রসাদকে কবি লিখিতেছেন (৩ জুন), "লেখাগুলোর ভিতরে ভিতরে কি স্বাদ নেই, ভঙ্গি নেই⋯চিন্তাগর্ভ কথার মুখে কোনো

১ শেষসপ্তক, অধ্যাপক তারাপদ মুখোপাধ্যায় লিখিত ১ চৈত্র ৩৪২। প্রেসিডেন্সি কলেজ ম্যাগাজিন vol 11, 1935-36.

২ আমার কাব্যের গতি, প্রবাসী ১৩৪৩ আষাঢ় পৃ ৪৫৩। কলিকাতা বিশ্বভারতী সম্মিলনীতে বক্তার আধুনিক কাব্যপাঠের ভূমিকা। পুলিনবিহারী সেন কর্তৃক অনুলিখিত।

৩ শেষসপ্তক প্রকাশিত হইলে সঞ্জয় ভট্টাচার্য কবিকে যে পত্র দেন রবীন্দ্রনাথ তাহার উত্তর দিয়াছিলেন (২২ মে ১৯৩৫)। 'ছন্দ' গ্রন্থের 'মোটকথা'র গদ্যছন্দ অংশটি দ্রষ্টব্য। র র ২১, পৃ ৪৩১-৩২, ৪৪২ চারি বৎসর পর ২৯ অগস্ট ১৯৩৯ কবি শান্তিনিকেতনে ছাত্র-অধ্যাপকদের সম্মুখে 'গদ্যকাব্য' সম্বন্ধে ভাষণ দান করেন। ভাষণটি ক্ষিতীশচন্দ্র রায় কর্তৃক লিখিত ও বক্তা কর্তৃক সংশোধিত হয়। প্রবাসী ১৩৪৬ মাঘ পৃ ৪৪৮-৫০।

খানে অচিন্ত্যের ইঙ্গিত কি লাগল না, এর মধ্যে ছন্দোরাজকতার নিয়ন্ত্রিত শাসন না থাকলেও আত্মরাজকতার অনিয়ন্ত্রিত সংযম নেই কি ?"[১]

এই কাব্যখানি কেবলমাত্র কাব্যরস সম্ভোগের জন্য অধীতব্য নহে; একটি রচনা এক সকালে পড়িলে তার ভাবনার রণন চলে সারাদিনমান। আত্মকাহিনী ও আত্মচিন্তা বিশ্বপ্রবাহের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত; কাব্যখানি যেন 'আত্মজৈবনিক' প্রকাশ—প্রতিদিনের ভাবনার নিবেদন—দার্শনিক, ঐতিহাসিক, বৈজ্ঞানিক তত্ত্বসমন্বিত হইয়া একটি জীবন-দর্শন সৃষ্ট হইয়াছে। এই কাব্যের রচনাগুলি গল্পধর্মী নহে, চিত্রধর্মীও নহে, বলা যাইতে পারে আত্মধর্মী। তবে কতকগুলি গল্পও আছে।

যাকে বলতে পারি আমার সবটা
তার নাম দেওয়া হয়নি,
তার নক্শা শেষ হবে কবে!
তার সঙ্গে প্রত্যক্ষ ব্যবহারের সম্পর্ক হবে কার ?
নামটা রয়েছে যে-পরিচয় টুকু নিয়ে,
টুকরো-জোড়া-দেওয়া তার রূপ,
অনাবিষ্কৃতের প্রান্ত থেকে সংগ্রহ করা।

এই কাব্যখণ্ড হইতে বহু অংশ উদ্ধার করিয়াও ইহার সমগ্র রূপটি দেখানো সম্ভব নহে।[২] শেষসপ্তকের একটি কবিতায় (৪নং) রবীন্দ্রনাথের জীবন-দর্শনের স্বরূপটি ভাষা পাইয়াছে; সেইটি পুরাতন কবিতা ভাঙিয়া পুনর্লিখিত।[৩] কবির এই জীবন-দর্শনের নাম দেওয়া যাইতে পারে 'সহজ সাধনা।' সেই দৃষ্টিতে এই কয়েকটি পঙক্তি বিচারণীয়—

যাব লক্ষ্যহীন পথে,
সহজে দেখব সব দেখা
শুনব সব সুর
চলন্ত দিনরাত্রির
কলরোলের মাঝখান দিয়ে।
আপনাকে মিলিয়ে নেব
শস্যশেষ প্রান্তরের
সুদূর বিস্তীর্ণ বৈরাগ্যে।
ধ্যানকে নিবিষ্ট করব
ঐ নিস্তব্ধ শালগাছের মধ্যে
যেখানে নিমেষের অন্তরালে
সহস্র বৎসরের প্রাণ নীরবে রয়েছে সমাহিত।
...
আলোছায়ার উপর দিয়ে
ভাসতে ভাসতে চলে যাক আমার চেতনা
চিন্তাহীন, তর্কহীন, শাস্ত্রহীন
মৃত্যুমহাসাগর-সংগমে।

১ ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে লিখিত পত্র. ৩ জুন ১৯৩৫ [চন্দননগর], দ্র র-র ২১ পৃ ৪২২।

২ বিস্ময় (২১ বৈশাখ ১৩৪২) প্রবাসী ১৩৪২ কার্তিক। পত্রপুট। এই কবিতাটি 'শেষসপ্তক' গুচ্ছের অন্তর্গত হওয়ার মতো। বোধ হয় যখন লেখা হয়, তখন আর ঐ কাব্যখণ্ডে সংকলিত হওয়ার সময় ছিল না, কারণ ২৫ বৈশাখ ১৩৪২ শেষসপ্তক প্রকাশিত হয়।

৩ শেষ পর্ব ৫ এপ্রিল ১৯৩৪। ২২ চৈত্র ১৩৪০, র-র ১৮ পৃ ১০৯।

নদীবক্ষে

শান্তিনিকেতন গ্রীষ্মাবকাশের জন্য বন্ধ হইল। জন্মোৎসবের কয়েক দিন পরে (২৮ বৈশাখ ১৩৭২) কবি কলিকাতায় আসিলেন। গ্রীষ্মকালটা কোথায় যে কাটাইবেন স্থির করিতে পারিতেছেন না। রথীন্দ্রনাথ ও প্রতিমা দেবী বিলাতে। মংপু, পুরী, শিলং, দার্জিলিং এমন কি সুদূর শিমলা শৈলের ধরমপুরেও যাইবার কথা বা কল্পনা হইতেছে। কখনো ভাবিতেছেন শান্তিনিকেতনই ভালো। কিন্তু নূতন বাড়ি 'শ্যামলী'র খুঁটিনাটি কাজ অনেক বাকি। তাছাড়া বীরভূমে এবার দীর্ঘকাল অনাবৃষ্টি, অসহ্য গরম। কবি প্রতিমাদেবীকে বিলাতে লিখিতেছেন, "আমি চিরদিন গরমকে উপেক্ষা করে এসেছি, এবার আমার অহঙ্কার টিকল না—কোথায় যাই কোথায় যাই করে উঠল প্রাণপুরুষ, অনেক চিন্তা করে করে শেষকালে আশ্রয় নিয়েছি বোটে।"[১]

নৌকায় আশ্রয় লইবার পূর্বে যে-কয়দিন কলিকাতায় ছিলেন, তারই মধ্যে কয়েকটি সামাজিক অনুষ্ঠানে যোগ দান করিতে হইল। কলিকাতায় যেদিন পৌঁছিলেন তারপর দিন বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে কবির চুয়াত্তর বৎসর পূর্তি উপলক্ষ্যে সংবর্ধনা (২৯ বৈশাখ ১৩৪২)। এই সভায় কবি মৌখিক কিছু বলিয়া 'শেষসপ্তক' হইতে একটি কবিতা পাঠ করেন। সেটি জন্মদিন স্মরণে অমিয় চক্রবর্তীকে লিখিত (৪৩ সংখ্যক)।

ইহার কয়েকদিন পরে (৪ জ্যৈষ্ঠ) ভগবান বুদ্ধদেবের জন্মদিন উপলক্ষ্যে কলিকাতাস্থ ধর্মরাজিক চৈত্য-বিহারের সভায় কবিকে সভাপতিত্ব করিতে হয়। এই দিন স্মরণে বুদ্ধদেব সম্বন্ধে একটি কবিতা লিখিয়া ও ইংরেজিতে তাহার অনুবাদ করিয়া কর্তৃপক্ষের হস্তে সমর্পণ করেন। সভায় কবি যে ভাষণ দান করেন সেটিরও ইংরেজি করা হয়। কবিতা ও ভাষণ মুদ্রিত করিয়া মহাবোধি সোসাইটি প্রচার করিয়াছিলেন।[২] এই ভাষণে বুদ্ধদেবের প্রতি কবির অগাধ শ্রদ্ধা প্রকাশ পায়। তিনি বলেন, "আমি যাঁকে অন্তরের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ মানব বলে উপলব্ধি করি আজ এই বৈশাখী পূর্ণিমায় তাঁর জন্মোৎসবে আমার প্রণাম নিবেদন করতে চাই।" এই নাতিদীর্ঘ ভাষণের শেষ দিকে তিনি বলেন, "ভগবান বুদ্ধ বলেছেন, অক্রোধের দ্বারা ক্রোধ জয় করবে। কিছুদিন পূর্বেই পৃথিবীতে এক মহাযুদ্ধ [প্রথম] হয়ে গেল। একপক্ষের জয় হ'ল, সে জয় বাহুবলের। কিন্তু যেহেতু বাহুবল মানুষের চরম বল নয় এই জন্যে মানুষের ইতিহাসে সে-জয় নিষ্ফল হ'ল, সে-জয় নূতন যুদ্ধের বীজ বপন করে চলেছে। মানুষের শক্তি অক্রোধে, ক্ষমাতে,—এই কথা বুঝতে দেয় না সেই পশু যে আজও মানুষের মধ্যে মরে নি। এই পাশবতার সাহায্যে মানুষের সিদ্ধিলাভের দুরাশাকে যিনি নিরস্ত করতে চেয়েছিলেন, যিনি বলেছিলেন 'অক্রোধেন জিনেৎ ক্রোধং'—আজ সেই মহাপুরুষকে স্মরণ করে মনুষ্যত্বের এই জগদ্ব্যাপী অপমানের যুগে বলবার দিন এল 'বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি।'···আজ স্বার্থক্ষুধান্ধ বৈশ্যবৃত্তির নির্মম নিঃসীম লুব্ধতার দিনে সেই বুদ্ধের শরণ কামনা করি, যিনি আপনার মধ্যে বিশ্বমানবের সত্যরূপ প্রকাশ করে আবির্ভূত হয়েছিলেন।"[৩]

কবি গঙ্গাবক্ষে আপনাদের নৌকা-গৃহ 'পদ্মা'য় (হোস্‌ বোটে) আছেন, সঙ্গে অনিলকুমার চন্দ ও তাঁহার স্ত্রী রানী দেবী। উত্তরপাড়া, শ্রীরামপুর প্রভৃতি ঘাটে ঘুরিয়া অবশেষে চন্দননগরে আসিলেন। কৈশোর ও যৌবনের পরিচিত এই নদীঘাটের সঙ্গে কবিজীবনের যে নিবিড় সম্বন্ধ ছিল, তাহা নানা রচনায় প্রকাশ পাইয়াছে। নৌকা

১ চিঠিপত্র ৩য় পত্র ৪৭।

২ প্রবাসী ১৩৪২ আষাঢ়।

৩ প্রবাসী ১৩৪২ আষাঢ় পৃ ৩০৪।

যেখানে বাঁধা হইল তার 'সামনেই সেই দোতলা বাড়ি, যেখানে একদা জ্যোতিদাদার সঙ্গে অনেক দিন' কাটাইয়াছিলেন। 'সে বাড়ি অত্যন্ত বেমেরামতী অবস্থায়', তাই তার 'পাশেই একটা একতলা বাড়ি'[১] ভাড়া নেবেন ভাবিতেছেন।

আজ বৃদ্ধবয়সে সেই নদীঘাটে আসিয়া তাঁহার কবিহৃদয়ে অতীত যুগের নানা স্মৃতি যে জাগিবে—তাহা খুবই স্বাভাবিক। কবির দেহমাত্র জরাক্রান্ত, কিন্তু সে-জরা তাঁহার মনকে এখনো নীরস করিতে পারে নাই; তাই আজ বিস্মৃত-প্রায় অতীত নূতন করিয়া আলোড়িয়া উঠিল। চারিদিকের নূতনের মাঝে মাঝে কখনো স্মৃতির সুখকর দুঃখকে আহ্বান করেন, কখনো তাহাকে লইয়া করেন পরিহাস। 'বাহিরে যবে হাসির ছটা ভিতরে থাকে আঁখির জল।' যখন স্মৃতি-বেদনা অন্তর-নিগূঢ় তখন বেদনা ও বিদ্রূপ চলে সমান্তরালে— বীথিকা ও প্রহাসিনীর অনুরণন চলে পাশাপাশি।

এবার গঙ্গাবক্ষে নৌকাবাস কালে কাব্যশ্রী দেখা দিল বীথিকার সমিল-ছন্দে। ইহাদের রূপ ও সুর শেষসপ্তকের গদ্যছন্দের রচনা হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। বিদ্রোহী (৩ জ্যৈষ্ঠ ১৩৪২), গীতচ্ছবি (৫ জ্যৈষ্ঠ), মিষ্টান্বিতা (১৮ জ্যৈষ্ঠ। প্রহাসিনী), অবজিত (২২ জ্যৈষ্ঠ, নবজাতক), ছুটির লেখা (২৩ জ্যৈষ্ঠ), নিমন্ত্রণ (৩১ জ্যৈষ্ঠ), ছায়াছবি (৩ আষাঢ়), নাট্যশেষ (আষাঢ় ১৩৪২) এই সময়ের লেখা। যেসব পুরাতন স্মৃতি রচনার মধ্যে রূপ লইয়াছে তাহাদের ইতিহাস এইগুলির মধ্যে অস্পষ্ট নহে। চন্দননগরের মোরান সাহেবের বাগানবাড়ির স্মৃতি কাদম্বরী দেবীর ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সহিত জড়িত। মনঃসংযোগ করিয়া কবিতা কয়টি পাঠ করিলে কবির মনোভাব স্পষ্টরূপে পাওয়া যায়। 'নিমন্ত্রণ' কবিতায় আছে—

মনে ছবি আসে—ঝিকিমিকি বেলা হল,
বাগানের ঘাটে গা ধুয়েছ তাড়াতাড়ি,
কচি মুখখানি, বয়স তখন ষোলো;
তনু দেহখানি ঘেরিয়াছে ডুরে শাড়ি।
কুঙ্কুম-ফোঁটা ভুরুসংগমে কিবা,
শ্বেতকরবীর গুচ্ছ কর্ণমূলে;
পিছন হইতে দেখিনু কোমল গ্রীবা
লোভন হয়েছে রেশমচিকন চুলে।
তাম্রথালায় গোড়ে মালাখানি গেঁথে
সিক্ত রুমালে যত্নে রেখেছ ঢাকি;
ছায়া-হেলা ছাদে মাদুর দিয়েছ পেতে,
কার কথা ভেবে বসে আছ জানি না কি।

তুলনীয় 'ছেলেবেলা'র এই অংশটুকু— "দিনের শেষে ছাদের উপর পড়ত মাদুর আর তাকিয়া। একটা রুপার রেকাবিতে বেলফুলের গোড়ে মালা ভিজে রুমালে, পিরিচে একগ্লাস বরফ দেওয়া জল আর বাটাতে ছাঁচিপান। বৌ ঠাকরুন গা ধুয়ে চুল বেঁধে তৈরি হয়ে বসতেন। গায়ে একখানা পাতলা চাদর উড়িয়ে আসতেন জ্যোতিদাদা।"

'ছায়াছবি' কবিতা হইতে কয়েকটি পঙক্তি উদ্ধৃত হইল,—

প্রবল বরিষনে
পাংশু হল দিকের মুখ,
আকাশ যেন নিরুৎসুক,
নদীপারের নীলিমা ছায়
পাণ্ডু আবরণে।
কর্মদিন হারাল সীমা,
হারাল পরিমাণ
বিনা কারণে ব্যথিত হিয়া
উঠিল গাহি গুঞ্জরিয়া
বিদ্যাপতি-রচিত সেই
ভরা-বাদর গান।

কবি জীবনস্মৃতিতে লিখিয়াছেন—"আমার গঙ্গাতীরের সেই সুন্দর দিনগুলি গঙ্গার জলে উৎসর্গ-করা পূর্ণ-বিকশিত

১ চিঠিপত্র ৩য় পত্র ৪৭।

পদ্মফুলের মতো একটি একটি করিয়া ভাসিয়া যাইতে লাগিল। কখনো বা ঘনঘোর বর্ষার দিনে হার্মোনিয়াম যন্ত্রযোগে বিদ্যাপতির 'ভরা বাদর মাহ ভাদর' পদটিতে মনের মতো সুর বসাইয়া বর্ষার রাগিণী গাহিতে গাহিতে বৃষ্টিপাত মুখরিত জলধারাচ্ছন্ন মধ্যাহ্ন খ্যাপার মতো কাটাইয়া দিতাম।" (গঙ্গাতীর) এইসব পুরাতন দিনের কথা ও বিশেষ করিয়া কাদম্বরী দেবীর কথা স্মরণ হইতেছে এই গঙ্গাতীরে আসিয়া। "গিয়েছে তার ছায়ামুরতি কালের খেয়া পারে।" (ছায়াছবি) নাট্যশেষ কবিতায় :

সহসা রাত্রে সে গেল চলি
যে-রাত্রি হয় না কভু ভোর। অদৃষ্টের যে-অঙ্গুলি
এনেছিল সুধা, নিল ফিরে। সেই যুগ হল গত
সে ভাঙা যুগের 'পরে কবিতার অরণ্যলতায়
ফুটিছে ছন্দের ফুল, দোলে তারা গানের কথায়।
সেদিন আজিকে ছবি হৃদয়ের অজন্তাগুহাতে
অন্ধকার ভিত্তিপটে ; ঐক্য তার বিশ্বশিল্প-সাথে।

সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রকারের কবিতা 'অবজ্ঞিত' (৫ জুন ১৯৩৫) ও 'ছুটির লেখা' (৬ জুন),—প্রথমটি নবজাতকের ও দ্বিতীয়টি বীথিকার অন্তর্গত। 'অবজ্ঞিত' লিখিত হয় প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশের উদ্দেশে ; তার কারণ আছে। এই সময়ে রবীন্দ্রনাথের রচনাবলী প্রকাশের কথা উঠে এবং কবির যাবতীয় লেখা সংগ্রহ ও মুদ্রিত করিবার প্রস্তাবও হয়। প্রশান্তচন্দ্র বহু বৎসর হইতে কবির রচনার বিস্তৃত সূচী প্রস্তুত করিতেছিলেন ; তাঁহার সংগ্রহও ছিল ভালো ; তাঁহার ইচ্ছা কবিকর্তৃক বর্জিত রচনাও মুদ্রিত হয়। এই পরিপ্রেক্ষণীতে 'অবজ্ঞিত' কবিতাটি পঠনীয়।

লিখিতে লিখিতে কেবলি গিয়েছি ছেপে,
সময় রাখিনি ওজন দেখিতে মেপে,
কীর্তি এবং কুকীর্তি গেছে মিশে।
ছাপার কালিতে অস্থায়ী হয় স্থায়ী
এ অপরাধের জন্য যে জন দায়ী
তার বোঝা আজ লঘু করা যায় কিসে।
বিপদ ঘটাতে শুধু নেই ছাপাখানা,
বিদ্যানুরাগী বন্ধু রয়েছে নানা—
আবর্জনারে বর্জন করি যদি
চারিদিক হতে গর্জন করি উঠে,
'ঐতিহাসিক সূত্র দিবে কি টুটে,
যা ঘটেছে তারে রাখা চাই নিরবধি।'

ভাবীকালে মোর কী দান শ্রদ্ধা পাবে,
খ্যাতিধারা মোর কত দূর চলে যাবে,
সে লাগি চিন্তা করার অর্থ নাহি।
বর্তমানের ভরি অর্ঘ্যের ডালি
অদেয় যা দিনু মাথায়ে ছাপার কালি
তাহারি লাগিয়া মার্জনা আমি চাহি।

এই কবিতাটির মধ্যেই একস্থলে রহিয়াছে :

যাহা কিছু লেখে সেরা নাহি হয় সবি,
তা নিয়ে লজ্জা না করুক কোনো কবি,
প্রকৃতির কাজে কত হয় ভুলচুক ;
কিন্তু হেয় যা শ্রেয়ের কোঠায় ফেলে
তারেও রক্ষা করিবার ভূতে পেলে
কালের সভায় কেমনে দেখাবে মুখ।
(আবর্জনা, নবজাতক)

এই ভাবনা হইতে পরদিন লেখেন 'ছুটির লেখা' :

এ লেখা মোর শূন্যদ্বীপের সৈকততীর,
তাকিয়ে থাকে দৃষ্টি-অতীত পারের পানে।
উদ্দেশহীন জোয়ার-ভাঁটায় অস্থির নীর
শামুক ঝিনুক যা খুশি তাই ভাসিয়ে আনে।

অন্যান্য হাসিবিদ্রূপপূর্ণ কবিতার ইতিহাস প্রচ্ছন্ন আছে হয়তো তাঁহার পত্রাবলীর মধ্যে ; 'মিষ্টান্বিতা' কবিতাটি বরাহনগরের পারুল দেবীকে পত্রাকারে লিখিত হয়। কবিতার শেষ স্তবকটুকু রহস্যস্থলে প্রথমবারে প্রেরিত হয় নাই (১লা জুন)। কয়েকদিন পরে (৫ই) পারুলদেবীকে লিখিতেছেন, "আমি আশা করেই ছিলুম যে তুমি আমার উপর খুব রাগ করবে, কেননা রাগটা সকল ক্ষেত্রে মন্দ জিনিস নয়—না রাগ করা ঔদাসীন্যের লক্ষণ। তোমাকে রাগাব বলেই কবিতাটির শেষ দুটো শ্লোক তোমাকে পাঠাইনি—উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছে, অতএব এখন পাঠাই। কবিতার প্রথম অংশের সঙ্গে জুড়ে নিয়ে পাঠ করো।"[১]

কবি যেখানেই থাকুন, ডাকযোগে পত্র ও স্থলপথে জলপথে সর্বশ্রেণীর মানুষ তাঁহার কাছে অনায়াসে পৌঁছাইতে পারিত। অনুরোধ আসিয়াছে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের (মৃ ১৬ জুন ১৯২৫) স্মৃতিসৌধ উন্মোচনের জন্য তাঁহার বাণী চাই। কলিকাতার কেওড়াতলার শ্মশানঘাটে যে চৈত্য নির্মিত হইয়াছিল তাহার পরিকল্পনা করেন সুরেন্দ্রনাথ কর। রবীন্দ্রনাথ নিম্নলিখিত পংক্তি-চতুষ্টয় লিখিয়া দিলেন (১৬ জুন ১৯৩৫):

স্বদেশের যে ধূলিরে শেষ স্পর্শ দিয়ে গেলে তুমি
বক্ষের অঞ্চল পাতে সেথায় তোমার জন্মভূমি।
দেশের বন্দনা বাজে শব্দহীন পাষাণের গীতে—
এসো দেহহীন স্মৃতি মৃত্যুহীন প্রেমের বেদিতে।

আর-একটি কবিতা লিখিয়া দেন সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রেরণায়। চন্দননগর নদীঘাটে বাসকালে কবির কাছে তেলিনীপাড়ার জমিদার-পরিবারের কেহ কেহ দেখা করিতে আসিতেন। ইঁহাদের আত্মীয় উত্তরপাড়ার অন্যতম জমিদার অবনীনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পৌত্রী শোভনা দেবীর বিবাহোপলক্ষ্যে কবি এই কবিতাটি লিখিয়া দেন[২] (১৩ আষাঢ় ১৩৪২):

নূতন সংসারখানি সৃষ্টি করো আপন শক্তিতে
হৃদয় সম্পদ দিয়ে, হে শোভনা, স্নেহে ও ভক্তিতে
পুণ্যে ও সেবায় ; থাকো লক্ষ্মীর আসনে শুভব্রতা।
তোমাদের সম্মিলিত প্রাণের যুগল তরুলতা
সুলগ্নে রোপিত হল ; দেবতার প্রসাদ বর্ষণ
নব বর্ষা-ধারা সাথে আজি তারা করুক গ্রহণ,
পূর্ণ হক প্রেমরসে, মাধুর্যের ধরুক মঞ্জরি
চিরসুন্দরের দান, উঠুক সকল শাখা ভরি
বিশ্বের সেবার তরে সরস কল্যাণময় ফল,
বিস্তার করুক শান্তি স্নিগ্ধ তার শ্যামছায়াতল।

১ বিশ্বভারতী পত্রিকা, ১৩৪৯ পৌষ পৃ ৩৭৫। রবীন্দ্র-রচনাবলী ২৩ পৃ ৫৩৭।

২ উত্তরপাড়ার শ্রীঅবনীনাথ মুখোপাধ্যায়ের পৌত্রী শোভনার বিবাহে কবির আশীর্বাদ। কবিতাটি কোথায়ও মুদ্রিত হয় নাই। অবনীনাথ মুখোপাধ্যায় ২৫ জুলাই ১৯৫০ এক পত্রে লেখককে জানাইতেছেন—"আমার পৌত্রীর বিবাহ উপলক্ষ্যে আমার কন্যা উত্তরপাড়ায় আসার সময়ে কবির নিকট ৫।৭ দিনের জন্য বিদায় লইতে যাইলে কবি স্বপ্রবৃত্ত হইয়া ঐ আশীর্বাদটি লিখে দেন।" এই কন্যা তেলিনীপাড়ার জমিদার-বাড়ির বধূ। কবি চন্দননগর ঘাটে থাকিবার সময় ইঁহাদের বাটীতে আসিতেন।

শিক্ষা-সমস্যা

গ্রীষ্মাবকাশের পর বিদ্যালয় খুলিলে কবি তাঁহার নদীবাস হইতে শান্তিনিকেতনে ফিরিয়া আসিলেন (১৯ আষাঢ় ১৩৪২)। এবার উঠিলেন তাঁহার নূতন মাটির বাড়ি শ্যামলীতে। শান্তিনিকেতনে আসিলেই তথাকার বিচিত্র সমস্যার সমাধানে তাঁহার সময় যায়। অথচ তাঁহার যে-বয়স হইয়াছে তাহাতে বিদ্যায়তনের সকল বিভাগের প্রতি দৃষ্টি রাখাও কঠিন; এখন অনেকখানিই নির্ভর করিতে হয় কর্মীদের উপর। ফলে তাঁহার শিক্ষাদর্শ ধীরে ধীরে রূপান্তরিত হইয়া চলিতেছে, অসহায়ভাবে এ সমস্ত মানিয়া লওয়া ছাড়া গত্যন্তর নাই। শিক্ষাবিষয়ে রবীন্দ্রনাথ চিরবিপ্লবী; ব্রহ্মচর্যাশ্রমের প্রতিষ্ঠাকে আমরা শিক্ষার বিপ্লবই বলিব। কিন্তু কবি দেখিতেছেন ক্রমেই শিক্ষা তাঁহার আদর্শচ্যুত হইয়া সহজ ও গতানুগতিকের পথাশ্রয়ী হইতেছে। আমেরিকার সমসাময়িক একখানি পত্রিকাতে শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক একটি প্রবন্ধে তাঁহার শিক্ষাদর্শের সায় পাইয়া মনটা প্রফুল্ল হইল। তিনি বিলাত-প্রবাসী ধীরেন্দ্রমোহন সেনকে এক দীর্ঘ পত্রে তাঁহার মনোভাব সবিস্তারে জানাইলেন (১৫ জুলাই ১৯৩৫)।[১] তিনি এই পত্রে culture বলিতে কী বুঝায় সে-সম্বন্ধে তাঁহার মত সংক্ষেপে বিবৃত করিয়া স্পষ্ট করিয়াই বলিলেন যে, culture আয়ত্ত করিবার উপায় কেবলমাত্র পরীক্ষা পাশ নহে। কবি বুঝিতে পারিতেছেন যে, তাঁহার বিদ্যালয়ে শিক্ষার নানা স্তরে, "রক্তপিপাসু পরীক্ষা-দানবের কাছে শিশুদের বলি" দিবার আয়োজন হইয়াছে। তিনি অনুভব করিতেছেন যে, যে আদর্শ হইতে বিদ্যালয়ের উদ্ভব তাহা হইতে এখন উহা অনেক সরিয়া আসিয়াছে। তিনি জানেন বর্তমানে পরীক্ষার উৎপাতে শিক্ষকদের "শিক্ষার উপরের তলায় ওঠবার সময় থাকে না।" সতেরো বৎসর পূর্বে যখন বিশ্বভারতী স্থাপন করেন তখন মনে করিয়াছিলেন যে শিক্ষকদের মধ্যে প্রত্যেকেই কোনো-না-কোনো বিদ্যা আয়ত্ত করিবেন। সেই অর্থে 'উপরের তলায় ওঠবার' কথা বোধ হয় প্রয়োগ করিয়াছিলেন। পাঠকের স্মরণ আছে ১৯৩০ সালে জারমেনি হইতে কবি অধ্যক্ষ নলিনচন্দ্র গাঙ্গুলিকেও এই পরীক্ষা-সর্বস্ব মনোভাবের জন্য তীব্র মন্তব্য করিয়া এক পত্র দেন।

পাঁচ বৎসর পরেও তাঁহার এ বিষয়ে যে মতের পরিবর্তন হইয়াছে, তাহা নহে। এই সময়ের মধ্যে পরীক্ষার পাশ (ফাঁস) আষ্টেপৃষ্ঠে ছাত্র ও শিক্ষকের মনকে আরও বাঁধিয়াছে। সন্দিগ্ধ চক্ষুর অন্তরালে বসিয়া,—মুক্ত প্রাঙ্গণে নিরালায়, আপন মনে পরীক্ষা-পত্রের উত্তর লিখিবার স্বাধীনতা ছাত্ররা হারাইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ সেইটি অন্তরে অন্তরে অনুভব করিতেছিলেন। যাঁহারা সহকর্মী তাঁহাদের সকলের মধ্যে ছাত্রদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হইবার ক্ষমতা সমান নহে; কবির শিক্ষাপদ্ধতি সম্বন্ধেও তাঁহারা হয় অজ্ঞ, নয় উদাসীন—শ্রদ্ধাহীনেরও অভাব হয় নাই। ফলে তাঁহার শিক্ষাদর্শ পদে পদে প্রতিহত হইয়াছে। উপরি উদ্ধৃত পত্রমধ্যে কবির সেই আপ্‌শোস প্রকাশ পাইয়াছে।[২]

১ শিক্ষা ও সংস্কৃতি, বিচিত্রা, ১৩৪২ শ্রাবণ। দ্র শিক্ষা ২য় সং।

২ প্রসঙ্গক্রমে বলিতে পারি, বিশ্বভারতীর প্রথম পর্বে (১৯১৯) যে প্রস্‌পেক্টাস প্রকাশিত হয় তাহাতে স্পষ্ট করিয়া বলা ছিল যে পরীক্ষা গ্রহণ প্রথা থাকিবে না; জ্ঞানের সাধনা দ্বারা আপনার স্থান গ্রহণ করিতে হইবে, এই ছিল উদ্দেশ্য। প্রস্‌পেক্টাস হইতে প্রথম কয়েকটি নিয়ম উদ্ধৃত হইল:—1. The Visvabharati, is for higher studies. 2. The system of examinations will have no place whatever in the Visvabharati, nor is there any confering of degrees. 3 Students will be encouraged to follow a definite course of study, but there will be no compulsion to adopt it rigidly.

বিশ্বভারতী বলিতে তখন বুঝাইত উচ্চতর বিদ্যালোচনার ক্ষেত্র। কিন্তু কয়েক বৎসরের মধ্যে বিশ্বভারতীর অনেক পরিবর্তন হইয়াছে; স্কুল বা ব্রহ্মচর্যাশ্রম অংশ ক্রমেই দূর যবনিকার মধ্যে গিয়া পড়িতেছে। আমেরিকা হইতে তিনি এক পত্রে (১৯২১) যে আশঙ্কা প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা স্মরণীয়।

কবির ক্রমেই আশঙ্কা হইতেছে যে ভবিষ্যতে বিদ্যালয়ের আদর্শ অক্ষুন্ন থাকিবে না; তিনি এক স্থানে বলিতেছেন[১], "ক্রমে যেটা সহজ পন্থা বিদ্যালয় সেই দিকেই চলেছে বলে মনে হয়—শিক্ষার যেসব প্রণালী সাধারণত প্রচলিত, বিশ্ব-বিদ্যালয়ের দাবি, সেইগুলিই বলবান হয়ে ওঠে, তার নিজের ধারা বদলে গিয়ে হাই-ইস্কুলের চলতি ছাঁচের প্রভাব প্রবল হয়ে ওঠে, কেননা সেই দিকেই ঝোঁক দেওয়া সহজ; সফলতার আদর্শ প্রচলিত আদর্শের দিকে ঝুঁকে পড়ে।..বিদ্যালয় যদি একটা হাই-ইস্কুলে মাত্র পর্যবসিত হয় তবে বলতে হবে ঠকলুম।—এখন হয়তো খুব দক্ষ পরিচালনা হতে পারে কিন্তু তার চেয়ে বড়ো জিনিসের অভাব ঘটতে থাকে।" রবীন্দ্রনাথ তাঁহার শিক্ষাদর্শ ও শিক্ষাপদ্ধতি স্পষ্টভাবে ও সংহতাকারে লিপিবদ্ধ করিয়া দেন 'আশ্রমের শিক্ষা' প্রবন্ধে। (প্রবাসী ১৩৪২ আষাঢ়) ইহা শান্তিনিকেতনের শিক্ষাদর্শের ব্যাখ্যা হইলেও উহাকে শিক্ষাদর্শের কেন্দ্রিক বস্তুরূপে গ্রহণ করিতে বাধা নাই। শিক্ষার মূলতত্ত্ব এখানে আলোচিত হইয়াছে; প্রত্যেক শিক্ষাব্রতীর পক্ষে এই প্রবন্ধটি অবশ্যপাঠ্য বলিয়া আমাদের মনে হয়।[২]

অন্যত্র শিক্ষার আদর্শ সম্বন্ধে কবি যাহা বলিয়াছেন তাহাও এখানে উদ্ধৃত করিলাম। "ছাত্রদের পরস্পরের প্রতি, গুরুজনের প্রতি ব্যবহারে নিয়ম রক্ষা; যাহাতে সামাজিকতা-বৃত্তির বিকাশ হয় সেইরূপ অনুষ্ঠানের প্রবর্তন; আপৎ-কর্মে অভিজ্ঞতা ও প্রতিবেশীর সর্বপ্রকার আনুকূল্যে তৎপরতা; স্বদেশের সকল বিষয় সম্বন্ধে জ্ঞান ও তৎপ্রতি কর্তব্য সম্বন্ধে বোধের উদ্রেক; পরজাতির প্রতি প্রীতিবৃত্তি ও তাহাদের সম্বন্ধে চিন্তায়, বাক্যে ও কর্মে ন্যায়পরতার বিকাশ সাধন; সভ্য সমাজে লোকহিতের জন্য যে-সকল অনুষ্ঠান প্রচলিত আছে ও যে-সকল নূতনপ্রচেষ্টার প্রবর্তন ঘটিতেছে সে-সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ;—এইগুলি আমাদের শিক্ষার অঙ্গ। সংক্ষেপতঃ, মনে হৃদয়ে ও ব্যবহারে যাহাতে ছাত্রেরা মনুষ্যত্বের সকল বিভাগেই সম্পূর্ণ সত্য হইতে পারে ইহাই শিক্ষার উদ্দেশ্য। নিজেদের প্রতিবেশকে সর্বতোভাবে সমর্থ ও আত্মশাসনক্ষম করিয়া তোলাই যে সমস্ত দেশের স্বরাজের ভিত্তি স্থাপন, ছাত্রদিগকে হাতে-কলমে তাহাই বুঝাইতে হইবে (বিশ্বভারতী লোকসংসদ)।"[৩]

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার শিক্ষার আদর্শ সম্বন্ধে বিশ্বভারতী সম্মিলনীর সভায় ছাত্রদের যাহা বলেন তাহা প্রণিধানযোগ্য বলিয়া এখানে উদ্ধৃত হইল,—"জীবনের সার্থকতার জন্যে আমি রসের প্রয়োজনকে মানি কিন্তু রসের প্লাবনকে মানি নে। তার সঙ্গে কঠিন সত্যকে মানতে হবে চিন্তাশক্তির সহযোগে। তোমাদের রচনায় এবং কাজে আমি এই দেখতে চাই যে, নির্মল আনন্দের ক্ষেত্রে যেমন তোমরা বিশ্বের অন্তরঙ্গ মন নিয়ে সৌন্দর্য সম্ভোগ করো তেমনি মানব সমাজের বিচিত্র ব্যাপারের প্রতি ঔৎসুক্য নিয়ে তোমরা বুদ্ধিপূর্বক চিন্তা করো, অন্বেষণ করো, বিচার করো এবং আপন জীবনের লক্ষ্য অবধারণ করো।"[৪]

রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা বিষয়ক আলোচনা যখন হইতেছে, তখন দুই একটি কথা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতে বলা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। কবির স্বাস্থ্য ও সময় যখন অপর্যাপ্ত ছিল তখন তিনি শান্তিনিকেতনের স্কুলে ছাত্রদের দৈনন্দিন

১ ১৩৪২ এর ৮ই পৌষ বিশ্বভারতী বার্ষিক সভায় কবির ভাষণ।

২ বিশ্বভারতী পৃ ১৪৪, ১৪৫। পাঠকরা Homer Lane ও W. B. Curry-র বই এ ক্ষেত্রে তুলনীয়। Meyers তাঁহার Development of Education in the 20 th Century গ্রন্থে আধুনিক প্রায় সকল প্রকার Progressive education-এর আলোচনা করিয়াছেন; এই গ্রন্থখানি পাঠ করিলেও দেখা যায় যে রবীন্দ্রনাথ শিক্ষা বিষয়ে কতদূর আধুনিক ছিলেন।

৩ বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায়: রবীন্দ্রনাথ ও পল্লীসংগঠনের আদর্শ। প্রবাসী ১৩৪৪, ফাল্গুন পৃ ৬৬৫।

৪ প্রবাসী ১৩৪২ অগ্রহায়ণ পৃ ১৭০।

শিক্ষার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। ছাত্রদের ঘরে আসিয়া ইন্দ্রিয়-বোধের পরীক্ষা করিতেন; কয়েকটি উদাহরণ দিতেছি: দর্শকদের অজ্ঞাতে কয়েকটি জিনিস রুমাল চাপা দিতেন; তারপর মুহূর্তের জন্য রুমালখানি উঠাইয়া লইতেন। দর্শকদের লিখিয়া দিতে হইবে কী কী জিনিস ছিল। কতকগুলি শব্দ বলিয়া গেলেন, শ্রোতাদের পারম্পর্য রক্ষা করিয়া সেগুলি লিখিয়া দিতে হইবে। জিনিস হাতে করিয়া ওজন বলিতে হইবে; দূরত্ব আন্দাজ করিয়া বলিতে হইবে। চোখ বন্ধ করিয়া নানা প্রকার শব্দ শুনিয়া বলিতে হইবে, কিসের শব্দ কোন্ দিক হইতে আসিতেছে। শ্রোতাদের যতসব আজগুবি শব্দ দ্বারা বাক্য গড়িয়া দ্রুত বলিতে হইত; সেসব ক্ষেত্রে দেখা যাইত যে অনেকেই বিরুদ্ধ শব্দ বলিতেন, অদ্ভুত অপ্রাসঙ্গিক ও অসংলগ্ন শব্দ বলা কঠিন হইত। কবি মুখে মুখে এইরূপ সব বাক্য অনর্গল বলিয়া যাইতেন।

ব্রহ্মচর্যাশ্রমের আদিযুগে রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং শিক্ষায় সাহায্য করিতেন। যোগেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায় 'বিশ্বভারতীর অঙ্কুর' (প্রবাসী ১৩৪৬ মাঘ পৃ ৫১৮) প্রবন্ধে লিখিতেছেন, "সন্ধ্যার পূর্বে ছাত্রগণ দৌড়াদৌড়ি করিয়া খেলা করিত। সন্ধ্যার পর সংগীত, আবৃত্তি, গল্প প্রভৃতি। ছাত্রগণকে অনুমানে পারদর্শী করিবার জন্য কবিবর অতি সুন্দর উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন। একদিন দেখিলাম, ছোটো বড়ো ভাঙা ইট আনাইয়া এক স্থানে রাখা হইয়াছে। ইটগুলি কী হইবে জিজ্ঞাসা করাতে কবিবর বলিলেন, 'এখনই দেখিতে পাইবে।' খেলিবার ছুটি হইলে কবিবর ছাত্রদের লইয়া একস্থানে উপবেশন করিলেন এবং একজনের পর একজন ছাত্রকে ডাকিয়া এক একখানা ইটের ওজন কত হইবে ছাত্রদিগকে আন্দাজ করিতে বলিলেন। ছাত্রগণ যাহা বলিল, তিনি তাহা একজন শিক্ষককে লিখিতে বলিলেন। তারপর একখানির পর একখানি ইট তৌল দাঁড়িতে ওজন করিয়া ছাত্রগণকে দেখাইয়া দিলেন যে তাহারা যে ওজন অনুমান করিয়াছিল তাহা প্রকৃত ওজন হইতে কত তফাত। অন্য একদিন দেখিলাম, তিনি একটি বল্ দূরে ছুড়িয়া ফেলিয়া সেটা কত গজ দূরে পড়িল তাহা ছাত্রগণকে অনুমান করিতে বলিলেন এবং পরে গজের দ্বারা মাপিয়া দেখাইলেন যে, প্রকৃত দূরত্ব হইতে তাহাদের কথিত আনুমানিক দূরত্বের পার্থক্য কিরূপ। এইরূপে ভারের অনুমান, দূরত্বের অনুমান, সময়ের অনুমান সম্বন্ধে ছাত্রগণের একটা ধারণ হইত।"

আশ্রম প্রতিষ্ঠার পর হইতেই ছাত্রগণের উপর নানারূপ দায়িত্ব দেওয়া হইয়াছিল। গ্রামে গিয়া নিরক্ষরদের শিক্ষা-দান, ম্যাজিকলণ্ঠন দেখানো প্রভৃতি কার্য ছাত্ররা করিত, সঙ্গে দুই একজন অধ্যাপক থাকিতেন। দরিদ্র-ভাণ্ডার বা poor fund রক্ষা করা এবং আহারান্তে শ্রদ্ধার সহিত অনাথ-আতুরদের অন্ন বিতরণের রীতি ছিল। ছাত্র ও অধ্যাপকগণ নিজ নিজ কাজ নিজেরাই করিতেন—একই গৃহে বাস করিতেন। তখন সেখানে we ও they 'আমরা' ও 'ওঁরা' (ছাত্র ও মাস্টার) এ সমস্যা দেখা দেয় নাই; ছাত্র ও অধ্যাপক একই ভোজনাগারে আহার করিতেন। উপাসনার সময় সকাল সন্ধ্যায় সকলকেই শান্ত হইয়া বসিতে হইত; সমবেত উপাসনায় অধ্যাপকগণ যোগদান করিতেন। বলা বাহুল্য তাহার জন্য অধ্যাপকমণ্ডলীতে কোনো 'প্রস্তাব' গ্রহণ করা হইত না এবং সরকারীভাবে নিয়মকানুন চালু করিবার প্রয়োজন হইত না; কারণ আশ্রমজীবন যাপনে অধিকাংশেরই শ্রদ্ধা ছিল। আজকাল ছাত্রদের দ্বারা রাস্তাঘাট প্রভৃতি করানো হইলে সংবাদপত্রে তাহার বিবৃতি প্রকাশিত হয়। আশ্রমে এইসব কার্য ছিল সকলের স্বাভাবিক জীবনধারার অন্তর্গত। মোট কথা, সর্বাঙ্গীণ জীবনযাত্রার মধ্য দিয়া শিক্ষার ধারা চলিত। তাই বলিয়া একথা মনে করিবার কোনো কারণ নাই যে ছাত্রদের শেষ পরীক্ষার প্রতি কাহারও ঔদাসীন্য ছিল। পরীক্ষার ফল যদি শিক্ষার মাপকাঠি হয়, তবে তাহাতেও শান্তিনিকেতনের ছাত্রদের লজ্জিত হইবার কিছু ছিল না।[১]

ছাত্রদের নিয়মনিষ্ঠা প্রভৃতি বিষয় অত্যন্ত কঠোর ছিল। তবে এইসব নিয়ম পালন সম্বন্ধে কর্তৃত্বের ভার ছিল

১ শান্তিনিকেতনের পুরাতন হাতে-লেখা পত্রিকাগুলি হইতে সাধনা কর বহু পরিশ্রম করিয়া অনেক তথ্য উদ্ধার করিয়াছেন। তাঁহার রচিত 'শান্তিনিকেতনের অপ্রকাশিত অধ্যায়' নামক পুস্তিকাখানি পড়িলে পাঠকগণ অতীতের নানা কথা জানিতে পারিবেন।

ছাত্রদের উপর। আজ আমরা ছাত্রদের অধিকার প্রভৃতি সম্বন্ধে যে সব কথা শুনিতেছি, তাহা বিদ্যালয়ের ছাত্ররা কী পরিমাণে লাভ করিয়াছিল, তাহার বিস্তারিত ইতিহাস লিপিবদ্ধ নাই। মোট কথা ছাত্রদের নায়ক, অধিনায়ক ছাত্রদের ভোটের দ্বারা নির্বাচিত হইত; এবং তাহার পর সেই নায়কের কথা শুনিতে সকলে বাধ্য হইত; ছাত্রদের 'বিচার-সভা' ছিল। সেখানেই ছাত্রদের বিরুদ্ধে অভিযোগ ও নিয়ম সম্বন্ধে শৈথিল্যের বিচার হইত।

ছাত্রদের পরীক্ষা সম্বন্ধে কী স্বাধীনতা ছিল, তাহা বর্তমানে কল্পনাতীত। পরীক্ষার স্থানে 'পাহারা' বসানোর রীতি আশ্রমে ছিল না; ছাত্রদের আত্মসম্মানে আঘাত করার অর্থ তাহাদের ব্যক্তিপুরুষকে অপমান করা। ছাত্ররা পরীক্ষা-পত্র লইয়া যেখানে-সেখানে বসিয়া পরীক্ষার উত্তর লিখিত। নীচের ক্লাসের পরীক্ষার প্রশ্নপত্র উপরের ক্লাসের ছাত্রেরা সাইক্লোস্টাইল করিয়াছে কিন্তু প্রশ্নপত্র 'out' হইয়াছে একথা কখনো শোনা যাইত না।[১]

ছাত্রদের উপর রবীন্দ্রনাথের গভীর বিশ্বাস ছিল; কারণ তিনি মানুষকে শ্রদ্ধা করিতেন। তাই শান্তিনিকেতনে ছাত্রদের প্রতি শারীরিক দণ্ডদান বা অপমানকর শাস্তিদান সম্বন্ধে তাঁহার মত অত্যন্ত কঠোর ছিল। ছাত্রদের অপমান করিলে তিনি সুযোগ্য অধ্যাপককেও ক্ষমা করেন নাই।

শান্তিনিকেতনে যে সমবায় ভাণ্ডার স্থাপন করা হয়, কবির বিশেষ ইচ্ছায় ছাত্রদের ইহার সদস্য করা হয়। কিন্তু সরকারী নিয়মতন্ত্রতার জাঁতাকলে পড়িয়া সে আদর্শ কার্যকর হয় নাই। ছাত্রদের টাকাকড়ি সেখানে থাকিবে, তাহারা

১ ENCYCLOPAEDIA AND DICTIONARY OF EDUCATION—Vol. 1, p 199. BOLPUR (in Bengal), about 100 miles from Calcutta, is the village where is placed the school founded by Sir Rabindranath Tagore. The schoolbuildings are known as Shantiniketan, or the House of Peace. The School was founded to afford freedom from educational mistakes which the poet ascribed to his own school-days, viz., a sense of uncompromising civil war between his personality and the outer world. Thus Tagore substantially adopts Rousseau's idea of a return to Nature, but includes human nature, as well as external nature, basing both upon a primal sympathy. Tagore believes in sense-training by experience of outward objects in their natural setting. Thus touch is trained by tree-climbing with bare feet, and along with it is learnt the physiognomy of the tree. "Absolute simplicity, and even poverty, is the best education, since living richly is living mostly by proxy, and thus living in a world of lesser reality." Life is not only physical, mental, moral, but also spiritual; and the spiritual world is not something apart, but the innermost truth of all knowledge. Mysticism is thus implied in education, because it is inseparable from personality. Thus Tagore utilizes the old Hindu institution—the forest colonies or "ashrama", of the great teachers of the past.

Curriculam and Organisation. The education was a kind of life rather than a place of instruction. Instead of the maxim of teaching by "doing", Tagore and his associates hold that education proceeds by "living". They avoid the academic atmosphere and monastic seclusion, but seek to lead a natural life. The teachers are not "mere vehicles of text-books," but find their inspiration in "direct communication of their sensitive minds with the world." Songs of a spontaneous type are written and sung, sometimes in groups by moonlight Lyrical dramas represent season-festivals. Browning and Shakespeare are introduced, translated into Bengali. Plays are written and even improvised by the pupils. They organize literary clubs and illustrated magazines. In drawing and painting they follow their own bent. Music is voluntarily cultivated. Boys are taught to do their own work, and not to rely on servants. In short, the principles are marked by the freedom of self-activity of Dr. Montessori but without any schematic apparatus. They have their own courts of justice.

The School is for 150 boys (from 6 to 17 or 18 years of age, and of all castes), and there are twenty teachers. The head master is elected by the staff yearly. School journeys are organized. All classes are open-air, or on verandahs. The discipline is of a "free" type. Even during examination, boys disperse through the grounds and choose their position for writing answers "even in such inaccessible places as the fork of some high trees." The teaching is bilingual, Bengali and English. The outstanding teaching of the school is the attempt "to combine the best traditions of the old Hindu system of teaching with the healthiest aspects of modern methods."—Prof. Foster Watson,

আপন আপন জিনিস ক্রয় করিয়া চেক্ কাটিয়া দিবে এই ছিল তাঁহার পরিকল্পনা। ব্যবহারিক ব্যাঙ্কিং-এর শিক্ষা হইবে ইহার মাধ্যমে।

রান্নাঘরে প্রতিদিন স্কুলের দুইজন করিয়া ছাত্র পালাক্রমে ম্যানেজারকে সহায়তা করিত। এইভাবে হাতে-কলমে বহু জিনিস তাহারা জানিতে পারিত। ভাঁড়ার বাহির করা, পরিবেশন ব্যবস্থা করা, অতিথি পরিচর্যা করা ছিল এই দুই বালকের অন্যতম কাজ। মোটকথা একটি সর্বাঙ্গীণ শিক্ষার পরিবেশ সৃষ্টি ছিল বিদ্যায়তনের মূল উদ্দেশ্য।

রবীন্দ্রনাথ কবি, প্রকৃতির উপাসক; গাছপালা জীবজন্তুর প্রতি তাঁহার অকৃত্রিম দরদ ছিল; গাছ পোঁতা, তাহাতে জলসেচন করা, তিনি মনে করিতেন প্রত্যেক আশ্রমবাসীর কর্তব্য। গ্রীষ্মকালে পাখিরা জলাভাবে কষ্ট পায়; সেইজন্য নানা স্থানে ঝুরি (প্রপা) করা হয়। বলা বাহুল্য, কোনোটিই দীর্ঘকাল অনুসৃত হইত না; তাহার অন্তরায় ছিলাম আমরাই, যাহারা তাঁহারা বাণীতে শ্রদ্ধাহীন, আদর্শে আস্থাহীন! শিক্ষাব্রতী রবীন্দ্রনাথের সম্যক আলোচনা হইলে জগত জানিতে পারিত যে কবি-খ্যাতি না হইলেও শিক্ষাব্রতীর খ্যাতি তাঁহাকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ শিক্ষকদের সমপর্যায় স্থান দিত।

আমরা এতক্ষণ রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শ ও তাহার প্রয়োগ সম্বন্ধে যে সব কথা বলিলাম তাহা সমসাময়িক ঘটনা না হইলেও তাঁহার শিক্ষাভাবনা কী ভাবে এই দীর্ঘকাল অভিব্যক্ত হইয়া আসিতেছে, তাহার কিঞ্চিৎ আভাস ইহা হইতে বুঝা যাইবে।

শিক্ষা সম্বন্ধে সমসাময়িক পত্রাদি ছাড়া অন্যান্য শ্রেণীর খুচরা লেখাও চোখে পড়ে। ভাষার মধ্যে শব্দের যথাযথ প্রয়োগ সম্বন্ধে কবিরা চিরদিনই শৌখীন। শব্দের অপপ্রয়োগ তাঁহাদের তীব্রভাবেই আঘাত করে। বিশেষ কতকগুলি শব্দ প্রয়োগ সম্বন্ধে কবির খুবই আপত্তি, যেমন সাহিত্যে 'কৃষ্টি' 'স্তম্ভ' 'অবদান' প্রভৃতি শব্দের অপপ্রয়োগ লইয়া রবীন্দ্রনাথ 'তাসের দেশে' যে ব্যঙ্গ করেন তাহার কথা ইতিমধ্যেই আলোচিত হইয়াছে। জ্যৈষ্ঠ (১৩৪২) মাসের প্রবাসীতে ইংরেজি কালচার শব্দের প্রতিশব্দ রূপে 'কৃষ্টি' শব্দের ব্যবহার দেখিয়া কবি বিস্মিত হইয়া লিখিয়া পাঠাইলেন, "বাংলা খবরের কাগজে একদিন হঠাৎ ব্রণের মতো ঐ শব্দটা চোখে পড়ল, তারপর দেখলুম ওটা বেড়েই চলেছে। সংক্রামকতা খবরের কাগজের বস্তি ছাড়িয়ে উপ...মহলেও ছড়িয়ে পড়েছে দেখে ভয় হয়। প্রবাসী পত্রে ইংরেজি অভিধানের এই 'অবদান'টি সংস্কৃত ভাষার মুখোশ পরে প্রবেশ করেছে, এটা নিঃসন্দেহ অনবধানতাবশত। প্রসঙ্গক্রমে বলে রাখি বর্তমান বাংলাসাহিত্যে 'অবদান'[১]* শব্দটির যে প্রয়োগ দেখতে দেখতে ব্যাপ্ত হল সংস্কৃত শব্দকোষে তা খুঁজে পাই নি।" ভাষায় কোন্‌টি চলিতে পারে এবং কোন্‌টি ব্যাকরণসংগত হইলেও চলিতে পারে না, অথবা analogy-র সাহায্যে নূতনভাবে শব্দ সৃষ্টি করিলেও অচল—সে সম্বন্ধে আলোচনা আছে এই প্রবন্ধে।[২]

রচনার সঙ্গে ঘটনার স্রোত বহিয়া চলে, সে সবের উপর তাঁহার কোনো হাত নাই; তাহার ঘাত-প্রতিঘাত তাঁহাকে আঘাত করে, আহত করিতে পারে না। একটি সমসাময়িক ঘটনার উল্লেখ এখানে করিতেছি।

আমাদের আলোচ্য পর্বে (১৯৩৫) জারমানিতে হিটলারের প্রতাপ বাড়িতেছে। হিটলার আদর্শবাদী ভাবুকদের পুস্তকাদি দেশ হইতে নির্বাসিত করিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথের রচনাও নাৎসিদের নিকট অপাঠ্য বলিয়া ঘোষিত হয়। এই সকল ঘটনা কেন্দ্র করিয়া রামানন্দবাবুর এক পত্রের উত্তরে কবি লিখিতেছেন, "আমার পক্ষে হিটলারের প্রয়োজনই হয় না। মনকে এই বলে সান্ত্বনা দিই যে একদা এমন দিন ছিল যখন কালিদাস প্রভৃতি কবি রসজ্ঞ মহলে তাঁদের

১ কৃষ্টি ও সংস্কৃতি। প্রবাসী ১৩৪২ কার্তিক, পৃ ১০৪। ২ বাংলা ভাষাতত্ত্ব পৃ ১৭৮-৮১।* "ওটা বঙ্গভাষা, যাকে হাল আমলের পণ্ডিতেরা বলেছে 'অবদান'।"—সে। র-র ২৬ পৃ ২০৮। "হায় কৃষ্টি, হায় কৃষ্টি", বাংলাভাষা পরিচয় ১৩৪৩ আষাঢ়, র-র ২৬ পৃ ৪৫৬।

কাব্যের প্রচার হলেই খুশি হতেন। আমার দুঃখ এই যে বিক্রমাদিত্যের ঠিকানা পাওয়া যায় না। তখন একজন কোনো অসাধারণের উপর ভার ছিল সর্বসাধারণের হয়ে কবিকে পুরস্কৃত করা। পাই কোথায় তেমন রাজা। এমন যদি হত সাধারণের মধ্যেই শক্তি ও ভক্তি অনুসারে যাঁর যখন খুশি পরিতোষ প্রকাশের জন্য কবিকে পারিতোষিক পাঠাতেন তা হলে কপিরাইট আগলানোর মতো বণিগ্‌বৃত্তি সরস্বতীর মন্দিরে অশুচিতা বিস্তার করত না। রুচিও আছে রৌপ্যও আছে জনসমাজে এমন সমাবেশ দুর্লভ নয় অথচ তাঁরা দুটাকা পাঁচশিকার পরিমাণেই তাঁদের দাক্ষিণ্য প্রকাশ করেন—তার ফলে যাঁদের রুচি আছে অথচ সামর্থ্য নেই দণ্ডটা তাঁদেরই নিষ্ঠুরভাবে ভোগ করতে হয়। বাণীকে সোনার দরে বিক্রির বৈশ্যরীতি বর্বরতা একথা মানতেই হবে।"[১]

বীথিকা

শিক্ষা, ভাষা, সংস্কৃতি সম্বন্ধে গদ্য প্রবন্ধে বা পত্রে যাহাই লিখুন, রবীন্দ্রনাথের অন্তরের রূপটি প্রকাশ পায় কাব্যে ও গানে। চন্দননগর নদীবক্ষে উৎসারিত ক্ষীণ কাব্যধারা শান্তিনিকেতনে ফিরিবার পর কিছুটা বেগবতী হইয়াছে। আষাঢ়ের শেষ দিক হইতে (২৮ আষাঢ়—২৯ ভাদ্র ১৩৪২) বীথিকা কাব্যখণ্ডের এক ঝাঁক কবিতা লিখিত হয়। 'শেষ সপ্তক' হইতে ইহাদের ভাব ও ছন্দ পৃথক। কবিতাগুলির মধ্যে আপাতদৃষ্টিতে আঙ্গিকের যোগ নাই, বিচ্ছিন্ন দিনের কবি-মনের ভাবনা মাত্র। তবে আমাদের কথা,—রবীন্দ্র-কাব্যধারা যাহা আপাতদৃষ্টিতে বিচ্ছিন্ন, স্বতন্ত্র সৃষ্টির মালা, যথার্থত তাহা সে রূপ নহে। ফল্গুনদীর মতোই তাহা অন্তঃসলিলা। এই অন্তর্ধারার সন্ধান মিলিলে কবি দুর্বোধ বা অবোধ্য থাকেন না। 'বীথিকা'র এই পর্বের কবিতাগুলি সেইভাবে পঠনীয়।

এই দুই মাসের মধ্যে বীথিকা কাব্যখণ্ডের ২২টি কবিতা, গান ও 'ভরসা-মঙ্গলে'র জন্য ৪টি গান লিখিত হয়। বীথিকাতে আছে মোট ৭৮টি কবিতা; অর্থাৎ ৫৬টি লিখিত হয় গত দুই বৎসরের মধ্যে—কতকগুলি হয় 'শেষসপ্তক' শেষ হইবার পর প্রধানত চন্দননগর নদীবক্ষে বাসকালে। গত দুই বৎসরের মধ্যে পরিশেষ (১৩৩৯ ভাদ্র) ও বিচিত্রিতা (১৩৪০ শ্রাবণ) কাব্যদ্বয় প্রকাশিত হয়। পরিশেষে ও বিচিত্রিতায় ধরা হয় নাই অথচ ঐ পর্বেরই অন্তর্গত, সেরূপ কবিতা বীথিকার অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। আমাদের মতে বীথিকা কাব্যের খাস দরবারের মধ্যে পড়ে এমন কবিতার সংখ্যা ২২টির বেশি নয়, যেগুলি চন্দননগর হইতে প্রত্যাবর্তনের পর দুইমাসের মধ্যে রচিত।

কবির সব কবিতাই যে আত্মকেন্দ্রিক বা তাহাদের প্রেরণাস্থল অবচেতন মন, তাহা ভাবিবার কারণ নাই। বিষয়ের জন্য তাঁহাকে পূর্বে বৌদ্ধ অবদান গ্রন্থ, রাজস্থানের কাহিনী, মারাঠাগাথা, শিখ ইতিহাস প্রভৃতির সন্ধান করিতে হইয়াছিল। শেষ জীবনে বিষয়ের সন্ধান করিয়াছেন শিল্পীদের এমনকি নিজের অঙ্কিত চিত্রের মধ্যে; মহুয়ার কয়েকটি, বিচিত্রিতার সকলগুলি এবং পরিশেষ, বীথিকার গুটিকয়েক এই শ্রেণীর চিত্রের প্রেরণায় রচিত।

১ মাদ্রাসের Guardian কাগজে (২৭ জুন ১৯৩৫) জারমেনিতে কবির বই বিক্রয় সম্বন্ধে মন্তব্য প্রকাশিত হইলে, রামানন্দবাবু কবির নিকট বিষয়টি জানিতে চান; কবি তাহার উত্তরে যাহা লেখেন, তাহা 'বিবিধ প্রসঙ্গ'-এর মধ্যে উদ্ধৃত হয়।—প্রবাসী ১৩৪২ শ্রাবণ পৃ ৫৯০। পত্রখানি আষাঢ় ১৩৪২-এর কোনো সময়ে লিখিত।

আমরা জানি কবির বহু গ্রন্থ বহু ভাষায় তাঁহার বা প্রকাশকের বিনা অনুমতিতে ও অগোচরে অনূদিত হইয়া মুদ্রিত হইয়াছে। একবার হিন্দীতেই ২৪খানি বই-এর 'চোরাই' তর্জমার সন্ধান পাওয়া যায় (প্রবাসী ১৩৪১ ভাদ্র পৃ ৭৯৮)। উর্দুতেও বহু বই এইভাবে ভাষান্তরিত হয় যাহার খবর কলিকাতায় বা শান্তিনিকেতনে কেহই পাইতেন না। একবার বিশ্বভারতীর অধ্যাপক ডাঃ আসিরি পঞ্জাব হইতে এরূপ বহু তর্জমা আনিয়াছিলেন।

পরিশেষ-এর সঙ্গে সঙ্গে কবির কাব্যসৃষ্টির মধ্যে মিল-ছন্দের প্রতিদ্বন্দ্বী দেখা দিল পুনশ্চের গদ্যকাব্য। অক্ষরবৃত্ত মিল-ছন্দের অভ্যস্ত কবিতা লিখিতে লিখিতে গদ্যছন্দে কবি এক নূতন technique পাইলেন; সেই প্রেরণার আবেগে অনবদ্য রচনা উৎসরিত হইল 'পুনশ্চে'। প্রসঙ্গক্রমে আমরা এখানে বলাকার নূতন ছন্দের কথা বলিতে পারি; 'ছবি' কবিতা দিয়া তাহার আরম্ভ; সেখানেও প্রেরণা (inspiration) ছিল সম্পূর্ণ অতর্কিত আঘাত—নূতন পরিবেশে অত্যন্ত প্রিয়জনের প্রতিকৃতি অভাবনীয়ভাবে দেখা দিয়াছিল।

যাহাই হউক, আমাদের আলোচ্য পর্ব হইতেছে 'শেষ সপ্তকে'র গদ্যছন্দের পরের পর্ব। 'শেষ সপ্তক' শেষ হইয়াছে বৈশাখে। বীথিকার পর্ব শুরু হইয়াছে আষাঢ়ে চন্দননগর হইতে; সেখানেও পুরাতনের বিস্মৃত স্মৃতির আকস্মিক আঘাত এবং তাহার পর হইতেই এই কাব্যধারার উদ্ভব। শান্তিনিকেতনে সেই ধারায় কবিতা চলিতেছে।

আপনার বিচিত্র সৃষ্টি সাধনা ও বিশ্বভারতীর বিবিধ কর্মরচনায় কবি নিমগ্ন। এমন সময়ে একদিন টেলিগ্রাম আসিল কলিকাতায় দিনেন্দ্রনাথের অকস্মাৎ মৃত্যু হইয়াছে (৫ শ্রাবণ ১৩৪২)। এই সংবাদের জন্য কি কবি কি আশ্রমবাসী কেহই প্রস্তুত ছিলেন না। গত বৎসর শ্রাবণ মাসেই দিনেন্দ্রনাথ আশ্রমের সঙ্গে সকল প্রকার বৈষয়িক সম্বন্ধ ছিন্ন করিয়া চলিয়া যান।[১] এই শান্তিনিকেতনেই তিনি জীবন অতিবাহিত করেন। তাঁহার সংগীতের অসামান্য প্রতিভা ছিল; কবি বহু দুঃখের মধ্যেও দিনেন্দ্রনাথকে কোনো দিন ত্যাগ করেন নাই। তাঁহার স্বভাবের মধ্যে যে আরেকটা দিক ছিল, তাহা রাহুর ন্যায় মাঝে মাঝে তাঁহাকে অভিভূত করিত, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তাহা চিরদিন ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখিয়াছিলেন। রবীন্দ্র-সংগীতের তিনি ছিলেন সাধক। 'ফাল্গুনী'র ভূমিকায় কবি যাহা লিখিয়াছেন, তাহা অতিরঞ্জন নহে। আজও দিনেন্দ্রনাথের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য মন্দিরে সকলে সমবেত হইলে কবি যে ভাষণ দান করিলেন, তাহাও সেই ভাবনার স্বীকৃতি। কবি বলিয়াছিলেন:

"আমার কবি-প্রকৃতিতে আমি যে দান করেছি সেই গানের বাহন ছিলেন দিনেন্দ্র। অনেকে এখান থেকে গেছেন সেবাও করেছেন, কিন্তু তার রূপ নেই ব'লে ক্রমশ তাঁরা বিস্মৃত হয়েছেন। কিন্তু দিনেন্দ্রের দান এই যে আনন্দের রূপ এ তো যাবার নয়—যত দিন ছাত্রদের সংগীতে এখানকার শালবন প্রতিধ্বনিত হবে, বর্ষে বর্ষে নানা উপলক্ষ্যে উৎসবের আয়োজন চলবে, ততদিন তাঁর স্মৃতি বিলুপ্ত হতে পারবে না, ততদিন তিনি আশ্রমকে অভিগত করে থাকবেন—আশ্রমের ইতিহাসে তাঁর কথা ভুলবার নয়।"[২]

কবির এখন যে বয়স ও মনের অবস্থা তাহাতে মৃত্যু-আদি ঘটনা তাঁহার কাছে সংবাদ মাত্র; মনকে যদিই বা ইহারা স্পর্শ করে উপরের স্তরকে ভেদ করিতে পারে না। তাই তাঁহার সৃষ্টিসাধনায় ছেদ পড়ে না; তবে বাহিরের এই সব বিচিত্র আঘাত তাঁহার রচনার মধ্যে রেখাপাত করে কিনা, তাহা সূক্ষ্মদৃষ্টি মনস্তাত্ত্বিকরা বিচার করিবেন।

শান্তিনিকেতনে শ্রাবণের শেষ দিকে যথারীতি 'বর্ষামঙ্গল' অনুষ্ঠিত হইল (৩০ শ্রাবণ ১৩৪২)। এই সময়ে চারিটি গান রচিত হয় – ১। আজি বরিষন মুখরিত শ্রাবণ রাতি (২১ শ্রাবণ। প্রতীক্ষা, বীথিকা), ২। মনে হল যেন পেরিয়ে এলেম (২২ শ্রাবণ। অভ্যাগত, বীথিকা), ৩। জানি জানি, তুমি এসেছ এ পথে মনের ভুলে (২৮ শ্রাবণ, বাদল সন্ধ্যা, বীথিকা), ৪। কী বেদনা মোর জান সে কি তুমি জান (২৮ শ্রাবণ ১৩৪২। বাদল রাত্তি, বীথিকা)।

১ এত দীর্ঘকালের সম্বন্ধ দিনেন্দ্রনাথ কেন ছিন্ন করিয়া গেলেন তাহা নানা জটিল বৈষয়িক ঘটনার সহিত যুক্ত; তাহার আলোচনা নিষ্প্রয়োজন।

২ মন্দিরে ৫ই শ্রাবণ ১৩৪২, ভাষণ। প্রবাসী ১৩৪২ ভাদ্র পৃ ৬৫৭। দিনেন্দ্রনাথের প্রিয় শিষ্যা অমিতা সেন এই শিল্পী সম্বন্ধে যে প্রবন্ধ লেখেন তাহা সমসাময়িক ছাত্রছাত্রীদের মনের চিত্র। প্রবাসী ১৩৪২ ভাদ্র, পৃ ৭২৩-২৭; দ্র নির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়: দিনেন্দ্র-স্মৃতি (কবিতা), প্রবাসী ১৩৪২ অগ্রহায়ণ ২, পৃ ১৮৫-৮৬; দ্র সুধীরচন্দ্র কর: গুণী দিনেন্দ্রনাথ (প্রবন্ধ), সংগীত-বিজ্ঞান প্রবেশিকা ১৩৩৬।

কিছুকাল হইতে কবির শরীর খারাপ হইতেছে; এই গানগুলির মধ্যে দুঃখের সুর জাগিতেছে; আপনার 'স্মৃতি-বেদনার মালা একেলা' গাঁথিতেছেন। কিছুকাল হইতে যে নিঃসঙ্গতা তাঁহাকে মাঝে মাঝে বেদনা দিতেছে, তাহারই আভাস পাই গানগুলির মধ্যে।

কবির শরীর অসুস্থ বলিয়া স্থির হয় যে বর্ষা-মঙ্গলের উৎসবক্ষেত্রে তিনি আসিবেন না; কিন্তু জলসার মধ্যে হঠাৎ তিনি উপস্থিত হইলেন দেখিয়া সকলে বিস্মিত হইল—শান্তিনিকেতনে থাকিয়া উৎসবে উপস্থিত না থাকা বা মন্দিরে উপাসনা না করা তাঁহার পক্ষে সম্ভব হইত না। সেদিনের আকর্ষণ ছিল আলাউদ্দীন খাঁর যন্ত্রসংগীত। আমাদের আলোচ্য পর্বে ওস্তাদ আলাউদ্দীন খাঁ মাইহার রাজদরবারের সংগীতাচার্য ছিলেন। কবির আহ্বানে তিনি পুত্র আকবর আলি খাঁর সহিত পক্ষকাল আশ্রমে থাকিয়া যান। এই সময়ে তাঁহার ভ্রাতা আয়াত আলি খাঁ সংগীতভবনের সহিত যুক্ত হন। তখন সংগীতের ক্লাস বসিত প্রাক্তন-ছাত্রদের পুরাতন গৃহে। হেমেন্দ্রলাল রায় ছিলেন সংগীত-বিভাগের অধ্যক্ষ।

'বর্ষামঙ্গল' জলসার কয়েক দিন পরে আশ্রমের যুবক অধ্যাপক ও কর্মীরা 'ভরসা-মঙ্গল' নাম দিয়া এক আনন্দ-কোলাহলের আয়োজন করেন। বর্ধমানের দামোদর-বন্যাক্লিষ্টদের সাহায্যদানের জন্য ইহা অনুষ্ঠিত হয়। ইহার প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন তরুণ অধ্যাপক ও কবির সেক্রেটারি অনিলকুমার চন্দ। 'হৈ হৈ সংঘ' কর্তৃক অনুষ্ঠিত 'ভরসা মঙ্গলে'র খবর পাইয়া উদ্যোক্তাদের অনুরোধে কবি তাহাদেরই উপযুক্ত গান রচনা করিয়া দিলেন।[১] গানগুলি হইতেছে এই,— ১। কাঁটাবনবিহারিনী সুর-কানা দেবী (৪ ভাদ্র), ২। না-গান গাওয়ার দল রে আমরা (৪ ভাদ্র), ৩। পায়ে পড়ি শোনো ভাই গাইয়ে (৬ ভাদ্র), ৪। ও ভাই কানাই, কারে জানাই দুঃসহ মোর দুঃখ (৬ ভাদ্র)।

যুবকের দল গরুর গাড়িতে চড়িয়া গানগুলি গাহিতে গাহিতে আশ্রম প্রদক্ষিণ করিল; সন্ধ্যার পর (৭ ভাদ্র ১৩৪২। ২৪ অগস্ট ১৯৩৫) 'ভরসা মঙ্গলে'র জলসায় রথীন্দ্রনাথ হইতে কবি-সেবক সচ্চিদানন্দ (আলু রায়) সকলেই ভেদাভেদ ভুলিয়া অংশ গ্রহণ করেন। কবি দর্শকদের মধ্যে বসিয়া যুবকদের চপলতা আনন্দস্মিত মুখে উপভোগ করিতে লাগিলেন। শান্তিনিকেতনের এই একটি দিক ছিল যেখানে মেলামেশা ছিল ভেদহীন।

বীথিকার[২] শেষ কবিতা লিখিত হয় ১৫ সেপ্টেম্বর ১৯৩৫ (২৯ ভাদ্র)। উন-শেষ কবিতা 'নিঃস্ব' (২৭ ভাদ্র) লিখিত হয় স্থানিক চাহিদায়।[৩] শান্তিনিকেতনের অর্থনীতির অধ্যাপক প্রভাতচন্দ্র গুপ্ত ও প্রকাশন বিভাগের কর্মী সুধীরচন্দ্র করের দ্বারা পরিচালিত 'রবীন্দ্র-পরিচয় সভা'র মুখপত্র হস্তলিখিত পত্রিকার জন্য এইটি লিখিত হয়।[৪]

১ 'ভরসা মঙ্গল', বিচিত্রা ৯ম বর্ষ, ১৩৪২ আশ্বিন পৃ ২৮১-৮৪। দ্র গীতবিতান নূতন সং পৃ ৫১৫-১৬। গানগুলির রচনার মাঝে একদিন ৫ ভাদ্র 'মিলনযাত্রা' (বীথিকা) কবিতাটি লেখেন। এই কবিতাটি 'পলাতকা' কাব্যের কবিতা স্মরণ করায়।

২ চন্দননগরে রচিত—৩ জ্যৈষ্ঠ ১৩৪২ বিদ্রোহী, বীথিকা পৃ ৫৩। ৫ জ্যৈষ্ঠ গীতচ্ছবি পৃ ৫৬। ১৮ জ্যৈষ্ঠ মিষ্টান্বিতা (প্রহাসিনী)। ২২ জ্যৈষ্ঠ অবর্জিত (নবজাতক)। ২৩ জ্যৈষ্ঠ ছুটির লেখা পৃ ৩২। ৩১ জ্যৈষ্ঠ নিমন্ত্রণ পৃ ২৭। ১লা আষাঢ় [চিত্তরঞ্জন সম্বন্ধে কবিতা]। ৪ আষাঢ় ছায়াছবি পৃ ২৪। ১০ আষাঢ় নাট্যশেষ পৃ ৩৪। ১৩ আষাঢ় [শোভনার বিবাহ উপলক্ষ্যে কবিতা]। [১১ আষাঢ় শান্তিনিকেতনে প্রত্যাবর্তন] ২৮ আষাঢ় অতীতের ছবি পৃ ১০। ২ শ্রাবণ বিরোধ পৃ ৭৮। ৯ শ্রাবণ দুজন পৃ ৭। ১৭ শ্রাবণ মাটি পৃ ৪। ১৮ শ্রাবণ নমস্কার [illegible] ৪৩। ২০ শ্রাবণ মেঘমালা পৃ ৬৯। ২১ শ্রাবণ প্রতীক্ষা (গান) পৃ ১২৩। ২২ শ্রাবণ অভ্যাগত (গান) পৃ ১৩২। ২৩ শ্রাবণ বাদলসন্ধ্যা (গান) পৃ ১২৬। ২৬ শ্রাবণ দেবতা পৃ ১৪৮। ২৮ শ্রাবণ বাদলরাতি (গান) পৃ ১২৯। ২৯ শ্রাবণ জয়ী পৃ ১২৮। [৩০ শ্রাবণ বর্ষামঙ্গল]। [৪ ভাদ্র কাঁটাবনবিহারিনী। ৫ ভাদ্র না-গাওয়ার] ৫ ভাদ্র মিলনযাত্রা পৃ ৯১। [৬ ভাদ্র পায়ে পড়ি শোনো। ৭ ভাদ্র ও ভাই কানাই (ভরসামঙ্গল)]। ৮ ভাদ্র মাটিতে আলোতে পৃ ১৩৩। ১৪ ভাদ্র কলুষিত পৃ ১১৯। ১৯ ভাদ্র ঋতু-অবসান পৃ ১৪০। ২০ ভাদ্র মুক্তি পৃ ১৩৫। ২১ ভাদ্র মূল্য পৃ ১৩৯। ২১ ভাদ্র আশ্বিনে পৃ ১৪৫। ২২ ভাদ্র শেষ পৃ ১৫০। ২৭ ভাদ্র নিঃস্ব পৃ ১৪৭। ২৯ ভাদ্র জাগরণ পৃ ১৫২ [বীথিকার শেষ কবিতা]।

৩ নিঃস্ব, ২৭ ভাদ্র ১৩৪২। ১৩ সেপ্টেম্বর ১৯৩৫। দ্র বিচিত্রা ১৩৪২ কার্তিক পৃ ৪২৩। বীথিকা পৃ ১৪৭।

৪ রবীন্দ্র-পরিচয় সভা বহু দিনের প্রতিষ্ঠান। ১৯৩১ সালে জয়ন্তীর সময় ক্ষিতিমোহন সেন 'জয়ন্তী উৎসর্গ' নামে গ্রন্থখানি উৎসবক্ষেত্রে রবীন্দ্র-পরিচয় সভার পক্ষ হইতে সমর্পণ করেন। এই সভা হইতে 'রবীন্দ্র-পরিচয়-পত্রিকা' (হস্তলিখিত) প্রকাশিত হয়।

বীথিকার পর্ব শেষ হইবার কয়েক দিন পর (১ আশ্বিন। ১৮ সেপ ১৯৩৫) মৈমনসিংহ-গৌরীপুরের জমিদার ব্রজেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরীর পুত্র তরুণ সুরশিল্পী বীরেন্দ্রকিশোর আশ্রমে আসেন। সন্ধ্যায় তিনি সংগীত সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন ও সেতার শোনান। রবীন্দ্রনাথ এই সভায় উপস্থিত ছিলেন; জলসার শেষে তিনি বলেন যে, পারস্যে ও মিশরে তিনি যে-সব গান শুনিয়াছিলেন তাহাতে ভারতীয় সুরের সাদৃশ্য লক্ষ্য করেন। ভারতীয় সংগীতের বিদেশী পটভূমি সম্বন্ধে বীরেন্দ্রকিশোরের মতের কথা উল্লেখ করিয়া কবি বলিলেন যে, ভারত এককালে বাহির হইতে রস সংগ্রহ করিতে লজ্জাবোধ করে নাই; কিন্তু য়ুরোপীয় সংগীত সেভাবে এদেশে প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই। কবি বলেন যে বাংলা দেশ য়ুরোপীয় সাহিত্য বিজ্ঞান কলা শিল্প প্রভৃতিকে যেভাবে আয়ত্ত করিয়াছে, পাশ্চাত্য সংগীতকে সেভাবে আত্মসাৎ করিতে সক্ষম হয় নাই। তাহার কারণ দুই সংগীত-ধারার প্রকাশভঙ্গী সম্পূর্ণ পৃথক্। কবি বলেন, য়ুরোপীয় সংগীতের মধ্যে বহু ভালো জিনিস আছে, ভারতীয় সংগীতকারগণ যদি তাহাকে গ্রহণ করিতে না পারেন তবে তাহা দুঃখের বিষয়।[১] রবীন্দ্রনাথ সংগীতকে প্রাচীন রীতির মধ্যে বন্দী করিয়া রাখিবার বিরোধী; রবীন্দ্র-সংগীত বিশেষজ্ঞগণ অবশ্যই লক্ষ্য করিয়াছেন যে, তিনি কত পাশ্চাত্য সুর তাঁহার গানের মধ্যে আনিয়াছেন। ধূর্জটিপ্রসাদকে সংগীত বিষয়ক যে সব পত্র লেখেন, এখানে সেগুলি স্মরণীয়।

বীথিকার কবিতা লেখার মাঝে মাঝে 'বর্ষামঙ্গল'-এর গান রচনা চলিতেছিল, তাহারই সঙ্গে ছিল উৎসবের জন্য মহড়া। ইহার মধ্যে অনুরোধ আসিয়াছিল 'সিংগী জৈন গ্রন্থমালা'[২] সম্বন্ধে তাঁহার অভিমতের জন্য। কবি ১৬ শ্রাবণ (১ অগস্ট ১৯৩৫) এ বিষয়ে তাঁহার মত ব্যক্ত করিলেন। কবি কেন পত্র লিখিলেন, তাহার ইতিহাস সংক্ষেপে বিবৃত করিতেছি।

১৯৩১ সালে আজিমগঞ্জের (মুর্শিদাবাদ) জৈন ধনিক বাহাদুর সিংগজি সিংগী তাঁহার পিতা দলচাঁদজি সিংগীর (মৃ ১৯২৭) নামে 'সিংগী জৈন গ্রন্থমালা' প্রকাশের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন।[৩] অতঃপর ১৯৩১-এ শান্তিনিকেতনে জিনবিজয় মুনি ও সুখলালজি অধ্যাপকরূপে আসেন। ইঁহাদের সঙ্গে বহু ছাত্র আসে, জৈন ছাত্রাবাস খোলা হয়। তিন বৎসর (১৯৩৩) এই প্রতিষ্ঠানটি চালু ছিল। ইহার পূর্বে ১৯২৭ সালে অমৃতসরের উমেদসিংহ মুচ্ছদিলালের দ্বারা বিশ্বভারতীতে জৈন গ্রন্থাগারের সূচনা হয়। সেই গ্রন্থসংগ্রহের নাম 'কেশরকুমারী জৈন পুস্তক সংগ্রহ' (১৯২৮ জুন)। মুচ্ছদিলালের অর্থ-সাহায্যে ১৯২৮ সালে কয়েক মাসের জন্য পণ্ডিত মথুরানাথজি শান্তিনিকেতনে আসিয়া থাকিয়া যান। ইহার পর ১৯৩১ সালে জিনবিজয় মুনি আসেন, ১৯৩৩ সাল পর্যন্ত এখানে বাস করেন। এই সময়ে যেসব গ্রন্থ তিনি সম্পাদন করেন, তাহা বিশ্বভারতীর কার্য বলিয়া প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রনাথ সেই কথা স্মরণ করিয়া জিনবিজয় মুনির সাহিত্যিক কার্যের প্রশংসা করিয়া পত্র দেন। কবি লিখিতেছেন, "Most of the sacred books of the Jainas are securely locked up in monasteries scattered all over the country and access to them is extremely difficult, if not absolutely impossible. By his work, Prof. Jinavijaya Muni has rendered a considerable service to the cause of scientific research in the field".

১ Visva-Bharati News. Oct, 1935. p 80.

২ Singhi Jaina Series...Founded and patronised by Sriman Bahadur Singhji Singhi of Calcutta...in memory of his late father Sri Dalchandji Singhi...Founded 1931 A. D. General editor—Jinavijaya Muni.

৩ "Babu Bahadur Singhji Singhi incidentally met the Poet Rabindranath Tagore and learnt of his desire to get a Chair of Jaina studies established in the Visvabharati, Santiniketan. Out of his respect for the Poet, Sjt. Bahadur Singhji readily agreed to found the desired Chair for three years and invited me [Jinavijaya Muni] to take charge of the same. I accepted the offer very willingly and felt thankful for the opportunity of spending even a few years in the cultural and inspiring atmosphere of Visvabharati, the grand creation of the great Poet Rabindranath" (p 8).

স্লয়ড্ শিক্ষিকা

শারদাবকাশ (১ অক্টোবর—১ নভেম্বর ১৯৩৫) আরম্ভ হইবার পূর্বে রবীন্দ্রনাথ একদিন শান্তিনিকেতনের কারু (স্লয়ড্) শিক্ষিকা সুইডিশ্ মহিলা মিস্ জিয়ানসন (Jeanson)-এর বিদায় উপলক্ষ্যে এক পার্টি দেন; তাহাতে জিয়ানসনের ছাত্ররা ও আশ্রমের বিশিষ্ট কর্মীরা যোগদান করেন। জিয়ানসন শান্তিনিকেতনে একবৎসর সুইডিস পদ্ধতিতে বয়ন-শিল্প শিক্ষা দিয়া দেশে ফিরিয়া যাইতেছেন। তাঁহার স্থলে সুইডেন হইতে মিস্ সেডারব্লম (Cederblom) স্লয়ড্ শিক্ষিকারূপে অনতিকালের মধ্যে আসিতেছেন।

সুইডেন হইতে এই দুই মহিলার শান্তিনিকেতনে আসিবার ইতিহাস আছে। সেটি এখানে বিবৃত করা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। ইঁহাদের আগমনের সর্ববিধ ব্যবস্থা করেন তৎকালে সুইডেনপ্রবাসী লক্ষ্মীশ্বর সিংহ; ইনি এখন বিশ্বভারতীর বিনয়ভবন বা শিক্ষণ-কলেজের কারু-অধ্যাপক।

অসহযোগ আন্দোলনের প্রথম তরঙ্গে যেসব বালক সরকারী বিদ্যালয় ত্যাগ করিয়া নূতন আদর্শবাদে অনুপ্রাণিত হয় লক্ষ্মীশ্বর সিংহ তাহাদের অন্যতম। শ্রীনিকেতনে এলমহার্স্ট প্রবর্তিত গ্রামসংগঠন কার্য তরুণ লক্ষ্মীশ্বরকে আকর্ষণ করিয়া আনে। গ্রামের কাজের সঙ্গে সঙ্গে অবসর সময়ে কাসাহারা নামে জাপানী কারুদক্ষের নিকট তিনি কাঠের কাজ শিখিতে আরম্ভ করেন, ইতিপূর্বে নিজ গৃহে ও 'জাতীয় বিদ্যালয়ে' তাঁহার কাঠের কাজের হাতেখড়ি হইয়াছিল। শ্রীনিকেতনে তখনো কাঠের কাজ শিক্ষণীয় বিষয় হয় নাই; তাঁতের কাজ ও চামড়া সাফাই (Tannery) ছিল প্রধান; কর্মকর্তারা বীরভূমের তাঁতি, জোলা ও রবিদাসদের সমস্যাকে তখন একান্ত করিয়া দেখিতেছিলেন। অতঃপর রবীন্দ্রনাথের আদেশে লক্ষ্মীশ্বর শান্তিনিকেতনে ছাত্রদের কাঠের কাজ শিখাইবার জন্য নিযুক্ত হন। এই সময়ে তিনি 'কাঠের কাজ' নামে একখানি বই লেখেন (১৯২৫); বাংলাভাষায় হাতে-কলমে কাঠের কাজ শিখিবার ও শিখাইবার বই এই বোধ হয় প্রথম বাহির হয়। কারুশিল্পকে সাধারণ শিক্ষার অন্তর্গত করিবার ইচ্ছা লক্ষ্মীশ্বরের প্রবল; তিনি সিউড়ীতে বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মেলনের অধিবেশনে 'মানব সভ্যতায় হাতের কাজের প্রভাব' নামে এক প্রবন্ধে তাঁহার মতকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা করেন।[১]

লক্ষ্মীশ্বরের বাংলা বইখানি লিখিবার উদ্দেশ্য—ভদ্রলোকের ছেলে লেখাপড়া শিখিয়াও যাহাতে কাঠের কাজ সহজে করিতে পারে। রবীন্দ্রনাথ গ্রন্থখানি দেখিয়া খুশী হন এবং উহার ভূমিকা লিখিয়া দেন। শিক্ষার মধ্যে যে সামাজিক সমস্যা দেখা দিয়াছে, ভূমিকায় কবি সে কথাটি স্পষ্ট করিয়া বলেন। "আমাদের মতে পঙ্গুতাই ভদ্রসমাজের লক্ষণ, হাতপাগুলোকে অপটু করিয়া তুলিলেই ভদ্রতা পাকা হয়। ইহার ক্ষতি যতদিন বুঝিতে পারি নাই ততদিন বাঙালি ভদ্রসন্তানের একমাত্র মোক্ষলাভ ছিল কেরানীতীর্থে। সেখানে জায়গার টানাটানি ঘটিতেই দেখা গেল তাহার মতো অসহায় প্রাণী আর জীবলোকে নাই। সংসার-সমুদ্রে পুঁথিগত বিদ্যাই যাহাদের একমাত্র ভেলা ছিল তাহাদের এবার নৌকাডুবির পালা। সেই সংকটের তাড়নায় ভদ্রলোকের ছেলেকেও আজ হাতে ও কলমে দুই দিকেই শক্ত হইতে হইবে এই তাগিদ আসিয়াছে। এই শুভদিনের প্রারম্ভে শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীশ্বর সিংহ 'কাঠের কাজ' বইখানি লিখিয়াছেন, ভদ্রলোকের ভয়ে 'ছুতারের কাজ' নাম দিতে পারেন নাই। যাহার হাত দুটো কর্মিষ্ঠ নয়, হাতের দিকে সে মূঢ়, তা হোক না সে নামজাদা, বা পণ্ডিত-বংশের কুলতিলক। দেশের এইসব বোকা হাতের মানুষকে শিক্ষিত হাতের মানুষ

১ শান্তিনিকেতন পত্রিকা ৭ম বর্ষ ১৩৩২ ফাল্গুন। ইহার ইংরেজি রূপ 'Educational Value of Manual Training in Human Culture' নামে প্রবন্ধ অশোক চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত অধুনা-লুপ্ত Welfare পত্রিকায় ১৯২৩ সেপ্টেম্বর সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

করিবার অভিপ্রায়ে এই যে বইখানি লেখা, ইহা বাঙালির ঘরে এবং বিদ্যালয়ে আজকাল আদর পাইবে বলিয়া আশা হইতেছে।"[১]

ভদ্রলোকের শিক্ষার পূর্ণতা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ অন্য পটভূমে যাহা বলিয়াছিলেন তাহা স্মরণীয়। তিনি একপত্রে লিখিয়াছিলেন যে ভদ্রলোকর ছেলেদের কিয়ৎ পরিমাণে 'ছোটলোক' ও 'ছোটলোক'কে কিয়ৎ পরিমাণে ভদ্রলোক করার উদ্দেশ্য ছিল ব্রহ্মচর্যাশ্রমের মধ্যে। তথাকথিত 'ভদ্রলোক' ও তথাকথিত 'ছোটলোকে'র মধ্যে তফাত হইতেছে যে একজন নিজ হাতে কাজ করেন না, আর একজন স্বহস্তে নিজের ও ভদ্রলোকদের কাজকর্ম করে। এই বিষয়ে মহামতি রাস্কিন (Ruskin)-এর কয়েকটি পঙক্তি স্মরণীয়—"আমরা আজকাল সবসময়ই বিদ্যাবুদ্ধি ও হাতের কাজকে পৃথক করে দেখে থাকি। একজন কেবল সবসময় চিন্তার কাজ করবে, আর একজন সারাক্ষণ খাটবে; তাদের একজনকে বলব ভদ্রলোক, অন্যজনকে বলব হুকুমের চাকর; কিন্তু উচিত হচ্ছে যে, শ্রমিক-যে সেও কিছুসময় ভাববে এবং যে ভাবুক সেও তেমনি কিছু সময় গায়ে খাটবে। এই করে ঠিক যাকে ভদ্রলোক বলা যায়, দুজনেই তাই হবে। কিন্তু আমরা দুজনকেই অভদ্র করে তুলবার আয়োজন করছি; একজন আর একজনকে হিংসা করছে, অন্যজনও তার ভাইকে ঘৃণা করছে এবং এর দ্বারা মানুষের গোটা সমাজটাই কতকগুলি অসুস্থ মন ভাবুক এবং দুর্গত শ্রমিকে ভরে উঠল।"[২]

বিশ্বভারতী পর্বের পূর্বেও শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মচর্যাশ্রমযুগে ছাত্রদিগকে কারুশিল্প ও বিশেষভাবে কাঠের কাজ শিখাইবার চেষ্টা বহুবারই হয়; সে কথা আমরা যথা-যথাস্থানে আলোচনা করিয়াছি। তবে উপযুক্ত শিক্ষক ও প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম-আদি কিনিবার অর্থাভাবে কারুশিল্প স্থায়ীভাবে চালু হয় নাই। শ্রীনিকেতনে গ্রাম-উদ্যোগের কেন্দ্র স্থাপিত হইলে গ্রামের বেকার বয়স্কদের মধ্যে গৃহশিল্প প্রবর্তনের প্রয়োজন কর্তৃপক্ষ ক্রমশই অনুভব করিতেছিলেন। 'ইন্‌ডাস্ট্রি' বা শিল্প শিক্ষার সূত্রপাত হয় এই তাগিদে; কালে শ্রীনিকেতনে শিল্পভবন গড়িয়া উঠে ইহারই উপর। সাধারণ পঠন-পাঠনরত বালকদের শিক্ষার সঙ্গে কারুশিল্প প্রবর্তনের চেষ্টা হয় শান্তিনিকেতনে; কারুশিল্প-রত বালকদের শিক্ষার সঙ্গে পঠন পাঠন প্রবর্তিত হয় 'শিক্ষাসত্রে'; আমরা গান্ধীজির ওয়ার্ধা-শিক্ষাপ্রণালী আলোচনাকালে 'শিক্ষাসত্র' সম্বন্ধে বিস্তারিতভাবে তথ্যাদি লিপিবদ্ধ করিব।

তিন বৎসর শান্তিনিকেতনে কাজ করিয়া লক্ষ্মীশ্বর সিংহ হস্তশিল্পে পারদর্শী হইবার জন্য বিদেশে যাইতে উৎসুক হন; প্রথমে তিনি জাপান যাইবেন ঠিক করেন। রবীন্দ্রনাথ জানিতে পারিয়া লক্ষ্মীশ্বরকে সুইডেনে যাইবার জন্য উপদেশ দিলেন; কবি তাঁহাকে বলেন বৈজ্ঞানিকভাবে কারুশিল্প আয়ত্ত করিতে হইলে সুইডেনের Sloyd পদ্ধতি শিক্ষা করা উচিত। কবির নির্দেশেই লক্ষ্মীশ্বর ১৯২৮ মার্চ মাসে সুইডেন যাত্রা করেন। এ কথা লক্ষ্মীশ্বরের নিকট হইতে শোনা।

রবীন্দ্রনাথ লক্ষ্মীশ্বরকে যে Sloyd শিক্ষাপদ্ধতি আয়ত্ত করিতে বলিলেন, তাহা কী, তাহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া দরকার।

১ কাঠের কাজ, বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন প্রেস, ১৩৩২। দ্র Laksmiswara Sinha: Education and Reconstruction, Santiniketan Press, 1953.

২ Quoted by Laksmiswara Sinha in his Education and Reconstruction p 21. অনুবাদক, সুধীরচন্দ্র কর: সর্বাঙ্গীণ শিক্ষা, শিক্ষাব্রতী ১৩৭০, শ্রাবণ, পৃ ২৯৮-৯৯। প্রসঙ্গক্রমে, পাঠকগণের মধ্যে যাঁহারা Ruskinএর 'Unto this Last'-এর (1862) প্রবন্ধগুলি পড়েন নাই, তাঁহাদিগকে গ্রন্থ পাঠ করিতে অনুরোধ জানাইয়া রাখিলাম।

শিক্ষাক্ষেত্রে কারিগরী শিক্ষার প্রথম প্রবর্তক ফিন্ল্যান্ডের শিক্ষাব্রতী Cygnaeus[১]। বলা বাহুল্য তৎপূর্বেও শিক্ষাশাস্ত্রীরা শিশুদের শিক্ষার সঙ্গে কারুশিল্প প্রবর্তনের সুপারিশ করিয়াছিলেন। ফিন্ল্যাণ্ডে এই শিক্ষাপদ্ধতি এতই প্রশংশিত হইতে লাগিল যে অবশেষে তথাকার গবর্নমেণ্ট গ্রাম্য বিদ্যালয়ে ছাত্র ও শিক্ষকদের পক্ষে এই শিক্ষা আবশ্যিক বলিয়া ঘোষণা করেন।

ফিন্ল্যান্ড হইতে সুইডেন ও সুইডেন হইতে রাশিয়া এবং সেখান হইতে আমেরিকায় এই কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষাবিধি প্রচারিত হয়। তবে সুইডেনেই স্লয়ড্ যথার্থ বৈজ্ঞানিক রূপ গ্রহণ করে। সামাজিক কারণে সুইডেনে এই পদ্ধতি শিক্ষাক্ষেত্রে জনাদর লাভ করে। যান্ত্রিক শিল্পের প্রভাবে ও প্রতাপে গৃহস্থ ঘরের কারুশিল্প প্রায় ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছিল; শিক্ষার মাধ্যমে এই কারুশিল্পের পুনরুদ্ধারের চেষ্টা আরম্ভ হইল গত শতাব্দীর মধ্যভাগে। এই আন্দোলনের নেতা Otto Salomon (১৮৪৯-১৯০৭) স্লয়ড্[২] স্কুলের প্রথম হেড্মাস্টার।

স্লয়ডের মূল কথা হইতেছে প্রয়োজনীয় সামগ্রীকে সুন্দর করিয়া নির্মাণ করিতে হইবে। সলোমনের আর একটি উদ্দেশ্য ছিল, ছাত্ররা ব্যবহারিক শিল্পসামগ্রী রচনার মধ্য দিয়া শ্রমের মর্যাদা, কর্মকুশলতা ও ব্যক্তিত্ববোধ অর্জন করিবে, সৃষ্টিমূলক কাজে অবসর সময়ের সদ্ব্যবহার করিবে। য়ুরোমেরিকার একদল শিক্ষাব্রতী মনে করেন যে কারুশিল্পের মাধ্যমে ছাত্রদের মানসিক বৃত্তির উৎকর্ষ সাধিত হইবে; অনেকেরই ধারণা স্লয়ড পদ্ধতি শিক্ষাবিধির চরম দান। আধুনিক মনস্তাত্ত্বিকদের মধ্যে এ বিষয়ে মতভেদ আছে।[৩]

এই স্লয়ড শিক্ষাবিধির অন্তর্গত কাঠের কাজ, কার্ডবোর্ড কাজ ও ধাতুর কাজ শিক্ষা করিয়া তিন বৎসর পর লক্ষীশ্বর দেশে ফিরিয়া আসেন; ইনি Nääs Institute-এর শিক্ষক-শিক্ষণ প্রতিষ্ঠান হইতে ডিপ্লোমা গ্রহণ করেন।[৪]

১৯৩২ সালের জুলাই মাসে লক্ষীশ্বর শান্তিনিকেতনে কারুশিল্পের শিক্ষক নিযুক্ত হইলেন। শিক্ষার্থীদের স্লয়ড্ পদ্ধতি (কার্ডবোর্ড) কার্য শিক্ষা দিবার জন্য 'মুকুট' ঘরে আয়োজন হইল। বয়স্কদের লইয়া শিক্ষার প্রথম ব্যবস্থা হয়, উদ্দেশ্য—তাঁহারাই যাহাতে ভবিষ্যতে শিক্ষকতার ভার গ্রহণ করিতে পারেন। নূতনত্বের উৎসাহে আশ্রমবাসীদের কার্ডবোর্ড অনেকেই কাটিয়া নানাপ্রকার সামগ্রী বানাইতে লাগিয়া গেলেন।[৫] আরিয়াম ও আশাদেবী উৎসাহী ছাত্র ছিলেন; ইঁহাদের নাম বিশেষভাবে কেন করিলাম যথাস্থানে পাঠক তাহা জানিতে পারিবেন।

১ The idea of constructive activities formulated by Froebel was taken up by Uno Cygnaeus (1810-88), the father of the Finnish school system. Cygnaeus's advocacy of handwork as a form of educational expression made hosts of friends and in 1866 the Finnish Government gave his idea its official blessing by making some form of manual training compulsory for boys in rural schools as well as in the training of its male teachers. From Finland the movement crossed the border to its Scandanavian neighbour, Sweden.—Meyer. p 28-29.

২ Sloyd, সুইডিশ শব্দ, ইংরেজি sleight দক্ষতা অর্থে। P. E. Lindstrom: Educational Sloyd. See Sweden Historical and Statistical Handbook Edited by T. Guinchard. 2nd Ed. Stockholm 1914. Vol. 1. p 860-64.

৩ Adolph F. Meyer: The Deveolpment of Education in the Twentieth Century. Prentice Hall, 1951. p 28-29.

৪ Naas Sloyd larar seminarium (Naas Sloyd Training College) was founded by August Abrahamson (1817-98) in 1874. Otto Saloman (1849-1907) was the Superintendent of the College from the start and he it was that devised or evolved the Swedish Educational Sloyd System the so-called Naas System and created the Naas Sloyd Training College.—Laksmiswara Sinha: Sloyd in the sphere of Education. Modern Review. 1932, June, also reproduced in his 'Education and Reconstruction' [1952].

৫ আশ্রমের ছাত্র ও অন্যান্য অধিবাসী ও অধিবাসিনীদিগকে তাঁতের কাজ শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা হয় বহু পূর্বে। কবি ১৩২৬ সালের পূজাবকাশে আসাম ভ্রমণে গিয়াছিলেন; সেখানে অসমিয়া মেয়েদের বয়ন শিল্পের প্রতি নিষ্ঠা দেখিয়া তিনি আশ্রমের জন্য একজন অসমিয়া মহিলা শিক্ষিকা আনেন; ইনি মেয়েদের তাঁতের কাজ শিখাইতে আরম্ভ করেন। সেই সময়ে শ্রীরামপুর হইতেও একজন শিক্ষিত তাঁতিকে আনানো হয়। (শান্তিনিকেতন পত্রিকা ১ম বর্ষ ১৩২৬ অগ্রহায়ণ পৃ ৮) কিন্তু দীর্ঘকাল কোনোটিই চালু থাকে নাই।

অনেক সমসাময়িক ব্যক্তি লিখিতেছেন, "Not that we did not have handcrafts before—indeed, Rabindranath has all along insisted on their being included in the Asrama activities—but lately, thanks to our friend Laksmiswara Sinha, a new life has been put in the work of the hands…"[১]

কিন্তু যে কারণেই হউক লক্ষ্মীশ্বর শান্তিনিকেতনে কয়েকমাস মাত্র থাকিয়া পুনরায় সুইডেন যাত্রার আয়োজন করিলেন। শান্তিনিকেতনে ছাত্রছাত্রীদের হাতের কাজ শিক্ষার জন্য অর্থাভাব খুবই। লক্ষ্মীশ্বর স্থির করিলেন সুইডেনে গিয়া তিনি অর্থের ব্যবস্থা ও উপযুক্ত লোক প্রেরণেরও ব্যবস্থা করিবেন। রবীন্দ্রনাথকে তাঁহার মনোগত ভাব বলিলে তিনি লক্ষ্মীশ্বরের হাতে কয়েকখানি পত্র দিলেন; তাহাতে তিনি বলেন যে তাঁহার একান্ত ইচ্ছা শান্তিনিকেতনে নিখিল ভারত স্লয়ড শিক্ষাগার স্থাপিত হয়। বিখ্যাত সুইড পর্যটক সোয়েন হেডিন (Sven Hedin)-কে কবি এ বিষয়ে পত্র দেন (২৬ এপ্রিল ১৯৩৩)।[২] সাধারণভাবে যে পত্রখানি প্রচারের জন্য লিখিয়াছিলেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল :

"I am glad to record that Mr. L. Sinha has been successful in introducing the Sloyd system in our manual work department, Visvabharati, Santiniketan, after having studied this system in Sweden for over two years. His work here is daily gaining ground and has already proved its efficiency both for young students and the men and women workers in our Instituition. It is our idea to open here an All-India Centre for the study of Sloyd but owing to lack of funds we are not able to develop this work according to our expectation.

Mr. Sinha believes that in view of the success already achieved here in introducing the Sloyd and its great usefulness for our country, it will be possible for him to find adequate response in Sweden itself to maintain a work like this which will be of permanent value and link up Sweden and India in ties of closer collaboration. Nothing could be more welcome to me than such beneficial cooperation between these two countries and, I eagerly look forward to gesture of help from a country which I love and honour so much.

Mr. Sinha goes to Sweden with our good wishes and it is my sincere hope that he will be helped in obtaining resources and necessary equipment for establishing this much needed work in India in a permanent work (Mss).

রবীন্দ্রনাথের পত্রাদি লইয়া লক্ষ্মীশ্বর সুইডেনে গিয়া শান্তিনিকেতনে স্লয়ডশিক্ষার কেন্দ্র স্থাপনের জন্য চেষ্টা করিতে আরম্ভ করেন। এই সূত্রে তাঁহার সহিত কাউণ্টেস হ্যামিলটন (Hamilton) নামে এক সম্ভ্রান্ত সুইড্ মহিলার পরিচয় হয়। কয়েক শত বৎসর পূর্বে হ্যামিলটন পরিবার স্কটল্যান্ড হইতে সুইডেনে আসেন এবং এখন ইহারা সর্বতোভাবে সুইড্। ১৯২২ সালে রবীন্দ্রনাথ যখন সুইডেন যান, সে সময়ে কাউণ্টেস হ্যামিলটনের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। রবীন্দ্রনাথের ইচ্ছার কথা জানিতে পারিয়া কাউণ্টেস স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া শান্তিনিকেতনে স্লয়ড্ শিক্ষিকা পাঠাইবার ভার গ্রহণ করিলেন। তাঁহারই ব্যবস্থায় জিয়ানসন ও সেভাররম আশ্রমে আসেন। ইহাদের ব্যয়ভার তিনিই বহন করিয়াছিলেন। এই দুই শিক্ষিকা বয়নশিল্প-পারদর্শী। লক্ষ্মীশ্বর বহু চেষ্টা করিয়া বন্ধুবান্ধব মহল হইতে অর্থ সংগ্রহ করিয়া সুইডিশ লুম (তাঁত) ও বয়নশিল্পের বিবিধ সরঞ্জাম ক্রয় ও সংগ্রহ করেন; এবং এক সুইড্ জাহাজ কোম্পানির পরিচালকের সহায়তায় ঐ সব জিনিসপত্র বিনা মাশুলে ও মিস্ জিয়ান্সনকে বিনা ভাড়ায় কলিকাতা বন্দরে পৌছাইবার ব্যবস্থা করেন।

১ V. B. News. 1932, Nov. p 85. quoted also in Sinha's Education and Reconstruction. p 6.

২ Sven Hedin, Stromān och Kungar.—Fahlcrantz & Gumaelius, Stockholm. 1950. p 857-58.

প্রথম স্লয়ড্ শিক্ষিকা মিস্ জিয়ানসন শান্তিনিকেতনে আসেন ১৯৩৪ এর শেষ দিকে; এক বৎসর থাকিয়া ১৯৩৫-এর শেষ ভাগে দেশে ফিরিয়া যান। ইহার কর্মকেন্দ্র ছিল শান্তিনিকেতনে; নাট্যঘরকে কর্মশালায় রূপান্তরিত করা হয়। ইহার নিকট হইতে শান্তিনিকেতনের অনেকেই বয়নশিল্প শিক্ষা করেন; তাঁহাদের মধ্যে কলাভবনের কয়েকজন ছাত্রী ও বিশেষভাবে সন্তোষচন্দ্র ভঞ্জ এই কারু কলাকে উত্তমরূপে আয়ত্ত করেন। পরে সন্তোষচন্দ্রই সুইডিস বয়নধারা চালনা করিয়া আসিতেছেন।

মিস্ জিয়ানসন শারদাবকাশ আরম্ভ হইলে দেশের দিকে যাত্রা করেন; তৎপূর্বে তাঁহার প্রতি প্রীতিজ্ঞাপনার্থে কবি যে প্রীতি-সম্মেলনের ব্যবস্থা করেন, তাহার কথা দিয়া আমরা এই পরিচ্ছেদের আরম্ভ করিয়াছি। কবি এই সময়ে কাউণ্টেস হ্যামিলটনকে মিস্ জিয়ানসন সম্বন্ধে যে পত্র দিয়াছিলেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি :

"Miss Jeansen would be leaving us soon and I shall be failing in my duty if I did not tell you how much, we have appreciated her quiet, unostentiatious good work. She has already laid the foundation of the department quite well and I am sure it will go on flourishing under the able guidance of Miss Cederblom, whom I understand from a letter from Mr. Sinha—you are sending out to us. Our gratitude to you is immense and it will give you pleasure to know that your kindness and beneficence has been deeply appreciated by my countrymen."

মিস্ জিয়ানসন চলিয়া গেলে তাঁহার স্থলে আসিলেন মিস্ সেডারব্লম। এই মহিলা সম্বন্ধে কাউণ্টেস কবিকে লিখিতেছেন (৩০ সেপ ১৯৩৫)—"This time we have had the great luck to send—what I consider to be—the ideal worker for your school. Miss Cederblom is a great friend of mine, and I am sure you all will like her as she is a Personality and an idealist full of enthusiasm, good ideas and energy" (Mss. Rabindra-Sadan).

সত্যই সেডারব্লমের ন্যায় শীতের দেশের বাসিন্দার স্বাভাবিক কর্মতৎপরতা, উৎসাহাতিশয্য গ্রীষ্মপ্রধান দেশের কর্মী ও কর্মকর্তাদের পক্ষে প্রথম প্রথম সামলানো কঠিন হয়।[১] অদ্ভুতকর্মা এই মহিলা যাহা দিয়া গিয়াছেন, তাহার যথাযথ মূল্য নিরূপিত হয় নাই। ইহাদের শিক্ষাদানের ফল যে কী হইয়াছে, তাহা যাঁহারা গত বিশ বৎসর শ্রীনিকেতনে শিল্পভবনে বয়ন-বিভাগের কার্যকলাপ লক্ষ্য করিয়াছেন, তাঁহারাই জানিবেন। বাংলাদেশের নানাস্থানে এইখানকার শিক্ষিত তন্তুশিল্পীরা ছড়াইয়া গিয়াছে; ইহাই ছিল রবীন্দ্রনাথের অন্তরের আকাঙ্ক্ষা।

শান্তিনিকেতনে কবির নিখিল ভারত স্লয়ড্ শিক্ষাগার স্থাপনার পরিকল্পনা ক্ষণিকের জন্য উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। ১৯৩৭ সালের গোড়ায় লক্ষ্মীশ্বর সিংহ বিদেশ হইতে ফিরিয়া বিশ্বভারতীর কার্যে যোগদান করিলেন; কিন্তু এবার তাঁহার কর্মকেন্দ্র করা হইল শ্রীনিকেতনের শিল্পভবনে। নানা কারণে সেখানে তাঁহার পক্ষে থাকা সম্ভব হইল না। ১৯৩৭-এর শেষভাগে মহাত্মাজি প্রবর্তিত বুনিয়াদি শিক্ষার প্রথম খসড়া বাহির হইলে লক্ষ্মীশ্বর বুঝিলেন এই কর্মকেন্দ্রিক জ্ঞানকে দেশের শিক্ষার অঙ্গীভূত করিতে হইলে মহাত্মাজির শিক্ষা-পরিকল্পনার সহিত সহযোগিতা প্রয়োজন। ১৯৩৮-এর এপ্রিল মাসে তিনি ওয়ার্ধার শিক্ষাকেন্দ্রে চলিয়া গেলেন।

১ ভারতে আসিবার সময় সেডারব্লম কলোম্বো পর্যন্ত জাহাজে আসিয়া নিজের মোটরবোটে বঙ্গোপসাগর দিয়া কলিকাতায় যাত্রা করেন। কিন্তু পথে বহু বিপদে পড়েন; একখানি সমুদ্র-জাহাজ তাঁহাকে উদ্ধার করিয়া মাদ্রাজে পৌঁছাইয়া দেয়। তখনো তাঁহার 'শিক্ষা' হয় নাই, পুনরায় মোটর-বোটে যাত্রা করেন; কিন্তু বিশাখাপত্তন পর্যন্ত আসিয়া আর সম্ভব হয় না দেখিয়া ট্রেনযোগে এখানে আসিলেন। ১৯৩৮ সালে এপ্রিল মাসে দেশে সেই মোটর-বোটে করিয়া ফিরিতে গিয়া পুনরায় বিপদে পড়েন (Statesman. 10 May 1938). দ্র V. B. News. (1938, June). p 95.

কবির নিখিল-ভারত স্লয়ড্ শিক্ষাগারের পরিকল্পনা সরাসরি রূপ না লইলেও, বিশ্বভারতীর কারুশিল্পে ও বিশেষভাবে বয়নশিল্পে এই স্লয়ড্ শিক্ষার ছাপ রহিয়া গিয়াছে; বয়নশিল্পে বিশ্বভারতী নূতন ভাবের পথিকৃৎ হইয়াছে।

মিস্ সেভারস্রম শান্তিনিকেতনে থাকিবার কালেই কাউণ্টেস হ্যামিলটন[১] তাঁহার পুত্রকে লইয়া এখানে আসিলেন (১৯৩৬)। তিনি ভারতভক্ত; একান্ত শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠার সঙ্গে তিনি স্বদেশেই সংস্কৃত ভাষা ও ভারতীয় দর্শনশাস্ত্র কিছু কিছু অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। শান্তিনিকেতনে তিনি আচার্য ক্ষিতিমোহন সেনের নিকট ভারতীয় সাধকদের বাণী শ্রবণ করেন; সংস্কৃত হইতে শাস্ত্রাদির অধ্যয়ন করিলেন দুর্গাপ্রসাদ পাণ্ডে নামক অধ্যাপকের নিকট। তিন মাস আশ্রমে বাস করিয়া তিনি দেশে ফিরিয়া গেলেন। কাউণ্টেস কবি ও ক্ষিতিমোহন সেনকে কী শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন, তাহা তাঁহার পত্রাবলী হইতে জানা যায়। ক্ষিতিমোহনের নিকট হইতে তিনি যে আধ্যাত্মিক বল সংগ্রহ করেন, তাহার কথা তিনি এখনও বিস্মৃত হন নাই।[২] দেশে ফিরিয়া গিয়া কাউণ্টেস কবিকে লিখিয়াছিলেন (২৫ এপ্রিল ১৯৩৬)—"I was so happy in Santiniketan! It was the happiest time in my life and I have left a great part of my heart there. But my longing for you and Kshiti Babu is so great that I can't help crying. To love is to suffer. But it is better to suffer than to be unable to love." (Mss.) অন্যদিন লিখিতেছেন, "I met you in my dream, and I felt happy. A part of my soul is still living in India, and daily my thoughts wander back to you and my teacher." (২৪ জুন ১৯৩৬ Mss.) কবির ৭৯তম জন্মদিনে কাউণ্টেস যে পত্র দেন, তাহা হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল। "Today is your birthday and therefore my thoughts are near you wishing that they could reach you with their warmth and love......Gurudeva, if we can avoid a new war, may I then come to Santiniketan for a few months in your winter time? I have reached that point when all my friends say, that I must go away for a time and take rest and the only place I long for with my whole soul is Santiniketan. There are you and my teacher and you are the only one that could help my empty, dry and tired soul. It is a shame, that I cannot alone help myself back to the realm of peace and bliss—but I cannot......

"But my failure does not depend upon the work and the many sufferings and so on. It depends upon that my heart is so bitterly filled with hatred feelings towards the cruel system that has created those innumerable sufferings. It is impossible to live in peace with feeling of hatred.

"May I come for a little time to rest and recover new strength for my work"?

পূজাবকাশের জন্য বিদ্যালয় বন্ধ হইবার সময় আসিয়া গেল। ছুটির পূর্বে শান্তিনিকেতনে ছাত্র অধ্যাপকে

১ কাউণ্টেস হ্যামিলটন বিশ্বভারতীর আজীবন সদস্য হন ১৯৩৬ সনে।

২ কাউণ্টেস হ্যামিলটন আচার্য ক্ষিতিমোহনের নিকট হইতে যে আধ্যাত্মিক শক্তি আহরণ করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন তাহা দীর্ঘ পনেরো বৎসরে ম্লান হয় নাই। তিনি ক্ষিতিমোহনকে গুরু ও বন্ধু বলিয়া পত্র মধ্যে উল্লেখ করিয়াছেন; ক্ষিতিমোহন সেনকে লিখিত কতকগুলি পত্র আমরা দেখিয়াছি।

মিলিয়া কিছু-না-কিছু অভিনয় করার রেওয়াজ বহুকালের। স্থির হইল 'শারদোৎসবে'র অভিনয় হইবে। মহড়া কবির সম্মুখেই হয়। তাঁহার শরীর অশক্ত, হাঁটিতে চলিতে কষ্ট হয়—তৎসত্ত্বেও স্বয়ং সন্ন্যাসীর ভূমিকায় নামিলেন। অভিনয়কে হাস্যোজ্জ্বল করিবার জন্য জনতার দৃশ্যে 'গেছোবাবা'র কথা অবতারণা করেন। এই অংশ এখন 'সে'-র অন্তর্গত। অভিনয় হইয়াছিল গ্রন্থভবনের সম্মুখে।

বিদ্যালয় বন্ধ হইয়া গেলে (১ অক্টো—১ নভেম্বর ১৯৩৫) কবি কোথায়ও নড়িলেন না। দিন কাটে কবিতা লিখিয়া, ছবি আঁকিয়া, পত্র লিখিয়া, পড়েনও অনেক। একদিন গিয়া দেখি নন্দলাল বসুর সহিত Epstein-এর আর্ট সম্বন্ধে সদ্য-প্রকাশিত একখানি গ্রন্থ লইয়া আলোচনা হইতেছে। আর-একদিন দেখি Architecture of the Universe নামে অতি আধুনিক বিজ্ঞানের বই পড়িতেছেন; অন্যদিন দেখি Eskimo-দের সম্বন্ধে নূতন একখানি গ্রন্থ অভিনিবেশ সহকারে পাঠে রত। কবি যে কত রকমের বই পড়িতেন তাহার সংবাদ বাহিরের লোকের জানা নাই এবং জানাও সম্ভব নহে।[১]

বাংলা বই পড়েন মাঝে মাঝে, দুই-একটির সমালোচনাও লেখেন। বুদ্ধদেব বসুর 'বাসরঘর' পাঠ করিয়া তাঁহার মন্তব্য পত্রযোগে জানান।[২] মহেন্দ্রনাথ সরকারের Eastern Lights পড়িয়া যে পত্র দেন তাহাও বোধ হয় এই সময়ের লেখা।[৩]

রবীন্দ্রনাথের অধ্যয়নশীলতা সম্বন্ধে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় যাহা কিছুকাল পরে রেডিও মারফত ব্যক্ত করেন, তাহা হইতে আমরা অনেক তথ্য জানিতে পারি। তিনি লিখিতেছেন, "তাঁকে সবাই কবি ব'লেই জানে। তিনি যে কিরূপ পণ্ডিত কত রকমের বই তিনি পড়েছিলেন, তা লোকে জানে না। তাঁর কবিত্ব-খ্যাতি না থাকলে পাণ্ডিত্য-খ্যাতি রট্‌ত।" রামানন্দ বাবুর এই উক্তি বর্ণে বর্ণে সত্য। তিনি লিখিতেছেন, "১৯২৬ সালে অক্টোবর মাসে ভিয়েনায় তিনি [কবি] যখন পীড়িত ছিলেন, তখন তাঁকে শুয়ে শুয়ে কত বই-ই যে পড়্‌তে দেখেছিলাম, বল্‌তে পারি না।··· হোমিওপ্যাথির বড় বড় বই তিনি দস্তুরমত অধ্যয়ন করেছিলেন, বায়োকেমিক চিকিৎসাও ভাল জানতেন। চিকিৎসা করতেনও ভাল। কখন কখন রহস্য করে বলতেন, আমি ফী নেই না ব'লে আমার প্রশংসা বা পসার হয়নি।"[৪] কবি কত বিষয় সম্বন্ধে বই পড়িতেন, তাহার তালিকা এই ভাষণে আছে।

আপন মনে লেখাপড়া করেন, বাহিরের কাজকর্মে আহ্বান কম, মনে ভাবেন চুপচাপ থাকিবেন কিন্তু পারেন না—নানারূপ আলোচনার মধ্যে জড়াইয়া পড়েন। এই সময়ে হিন্দুসমাজের একশ্রেণীর লোকের ধর্মবিশ্বাসের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করায় কবিকে তীব্র সমালোচনা সহিতে হয়। পূজাবকাশের পূর্বে রাজস্থান জয়পুর নিবাসী রামচন্দ্র শর্মা নামে এক ব্রাহ্মণ যুবক মন্দিরে জীববলি বন্ধ করিবার জন্য কালীঘাটের কালীমন্দিরে অনশন ধর্মঘট আরম্ভ করেন; কিন্তু কোনো দিক হইতে তিনি কোনো সহানুভূতি পাইলেন না। রবীন্দ্রনাথ যুবকের অনশন পণের কথা জানিতে পারিয়া, তাঁহার উদ্দেশে আশীর্বাদপূর্ণ এক কবিতা লিখিয়া পাঠাইয়া দেন।[৫] হিন্দু-পাব্‌লিকের একাংশ এই বিষয়ে কবির বাণী দানে আদৌ প্রীত হইতে পারে নাই।

১ দ্র জয়ন্তী-উৎসর্গ, অমিয়চন্দ্র চক্রবর্তী: কবি সার্বভৌম।

২ পত্র ২৫ অক্টোবর ১৯৩৫। বিচিত্রা ১৩৪২ অগ্র পৃ ৪৫৬।

৩ প্রবাসী ১৩৪২ অগ্র পৃ ২৯৩।

৪ ২৫ বৈশাখ ১৩৪৫ রেডিও ভাষণ। প্রবাসী ১৩৪৫ জ্যৈষ্ঠ।

৫ প্রবাসী ১৩৪২ আশ্বিন পৃ ৮৭০। কার্তিক পৃ ১২০ দ্রষ্টব্য, এখানে ৪র্থ স্তবক সংযোজিত।

এক শ্রেণীর সাংবাদিক বলিলেন যে, হিন্দুধর্ম বিষয়ে মতামতদানে রবীন্দ্রনাথ অনধিকারী, তিনি চিরদিনই হিন্দুসমাজের ক্রিয়াকর্মবহুল ধর্মের নিন্দা করিয়া আসিয়াছেন। তাছাড়া, তাঁহারা বলিলেন, জয়পুরী ব্রাহ্মণের নৈতিক জুলুম বাঙালি মানিবে না। রবীন্দ্রনাথ তো চিরদিনই নৈতিক চাপের বিরোধী, আজ কেন তিনি তাহা সমর্থন করিতেছেন। আমাদের কথা, রবীন্দ্রনাথ মন্দিরে জীববলির বিরোধী আজ নূতন করিয়া হন নাই,—রাজর্ষি ও পরে বিসর্জন[১]-এর মধ্যে তিনি তাঁহার মত খুব স্পষ্টভাবেই ব্যক্ত করিয়াছিলেন।

কবি প্রবীণ সাহিত্যিক হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষকে জীববলি সম্বন্ধে যে পত্র[২] দেন, তাহা হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিলাম। "শক্তিপূজায় এক সময়ে নরবলি প্রচলন ছিল, এখনও গোপনে কখনও কখনও ঘটে থাকে। এই প্রথা এখন রহিত হয়েছে। পশুহত্যাও হবে এই আশা করা যায়।" অন্য পত্রে লিখিয়াছিলেন, "জনসাধারণের মধ্যে চরিত্রের দুর্বলতা ও ব্যবহারের অন্যায় বহুব্যাপী, সেই জন্যে শ্রেয়ের বিশুদ্ধ আদর্শ ধর্মসাধনার মধ্যে রক্ষা করাই মানুষের পরিত্রাণের উপায়।…নিজের লুব্ধ ও হিংস্র প্রবৃত্তিকে দেবদেবীর প্রতি আরোপ ক'রে তাকে পুণ্য শ্রেণীতে ভুক্ত করাকে দেবনিন্দা বলব। এই আদর্শ-বিকৃতি থেকে দেশকে রক্ষা করার জন্যে যিনি প্রাণ উৎসর্গ করতে প্রবৃত্ত, তিনি তো ধর্মের জন্যেই প্রাণ দিতে প্রস্তুত।…রামচন্দ্র শর্মা আপনার প্রাণ দিয়ে নিরপরাধ পশুর প্রাণ-ঘাতক ধর্মলোভী স্বজাতির কলঙ্ক ক্ষালন করতে বসেছেন এই জন্যে আমি তাঁকে নমস্কার করি।"[৩]

এই সময়ে নানা পত্রিকায় দেবমন্দিরে বলিদানের সপক্ষে ও বিপক্ষে বহু রচনা ও পত্রাদি প্রকাশিত হয়। অধ্যাপক অনিলবরণ রায় এককালে বিশিষ্ট কন্‌গ্রেসকর্মী ছিলেন, পরে পন্দিচেরিবাসী হইয়া শ্রীঅরবিন্দের শিষ্যরূপে খ্যাতিলাভ করেন। তিনি ১৭ অক্টোবর (১৯৩৫) অমৃতবাজার পত্রিকায় এই বলিদান বিষয়ে গভীরভাবে আলোচনা করিয়া বলিয়াছিলেন,—এই আধ্যাত্মিকতা আমাদের দেশে পূজায় যে পশুবলি দেওয়া হয়, তাহাতে আরোপ করা যায় না। এবং পশুবলির সহিত আধ্যাত্মিকতার যখন সম্পর্ক নাই, তখন ইহা পূজা প্রভৃতি আধ্যাত্মিক সাধনা হইতে পরিত্যক্ত হওয়াই উচিত। এই মতকে আমরা শ্রীঅরবিন্দেরও মত বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি; তবে এবিষয়ে তাঁহার প্রত্যক্ষ সমসাময়িক কোনো মত দেখি নাই।

অপর পক্ষে বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় 'পূজায় পশুবলি' (বিচিত্রা ১৩৪২ কার্তিক) সমর্থন করিলেন শাস্ত্রবাক্য দিয়া। আবার 'নৃতত্ত্বের এবং মনস্তত্ত্বের দিক হইতে পশুবলির আলোচনা' করিলেন ডাক্তার সরসীলাল সরকার। তিনি

১ Miss Rachel S. Jeffry, artist and social worker, Scotland শান্তিনিকেতন ঘুরিয়া গিয়া কবিকে যে পত্র দেন, তাহার মধ্যে আছে,—"…you dedicated your English version of 'Sacrifice' to "those heroes who bravely stood for peace when human sacrifice was claimed by the Goddess of War." I particularly welcome this dedication." V. B. News. 1936 Feb. p 61.

২ হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষকে লিখিত পত্র, ১৮ সেপ্টেম্বর ১৯৩৫; প্রবাসী ১৩৪২ কার্তিক পৃ ১২১। অপর একখানি পত্র অন্যকে লেখা, হেমেন্দ্রপ্রসাদকে তাহার প্রতিলিপি পাঠাইয়া দেন; সে পত্রখানি লিখিত হয় ২৪ ভাদ্র (১০ সেপ)। ১৯৫২ সালে রামচন্দ্র শর্মা পুনরায় বলিবন্ধের জন্য অনশন আরম্ভ করেন।

৩ এই পত্র লিখিবার একুশ বৎসর পূর্বে নরেন্দ্রনাথ নন্দীর পত্রের উত্তরে কবি বিলাত হইতে অকারণ পশুবধ সম্বন্ধে তাঁহার মত ব্যক্ত করিয়া এক পত্র দেন। তিনি একথা স্পষ্ট করিয়া বলেন যে, মানুষের কর্মক্ষেত্রের মধ্যে বনের পশুর আবির্ভাব বিষম ব্যাঘাতকর। মশা, ছারপোকা, বাঘ মারিব না বলিলে কেহ মানিবে না; ক্ষেতে পাখি ফসল নষ্ট করে বলিয়া মানুষ পাখিও মারে। সুতরাং এ বিষয়ে কোনো শেষ কথা বলা যায় না। তবে পশুজীবনের সঙ্গে মানবজীবনের একটা পূর্ণতর সামঞ্জস্য সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে ঘটিতে থাকিবে বলিয়া তাঁহার বিশ্বাস। (রবীন্দ্রনাথের চিঠি, ১৫ জ্যৈষ্ঠ ১৩২১। প্রবাসী ১৩৩৪ আষাঢ় পৃ ৩৯৫)। বলা বাহুল্য এখন কবি পশুহত্যা সম্বন্ধে যে-কথা বলিলেন তাহা ধর্মবিষয়ক, অর্থাৎ দেবতার নামে পশুহত্যা—কবি তাহার সম্পূর্ণ বিরোধী।

বলিলেন, "একথা বলিলে ভুল হয় না যে পশুবলি আমাদের আদিম মনোবৃত্তির পুনরাবৃত্তি। অন্যান্য দেশে এই বলিদানের মনোভাব পরিবর্তিত হইয়া উন্নততর মনোবৃত্তিতে বিকাশ হইয়াছে, আমাদের দেশে সাত্ত্বিক পূজাকে শ্রেষ্ঠত্ব দেওয়া হইয়াছে, পশুবলিদান-সংযুক্ত পূজাকে আধ্যাত্মিকজ্ঞানসম্পন্ন কোনো শাস্ত্রকারই প্রশংসা করেন না, বরং ইহা যে আধ্যাত্মিকতার বিরোধী এবং পাপকার্য এমন কি এরূপ পাপকার্য যে তাহাতে নরকগামী হইতে হয় ইহাও মুক্তকণ্ঠে বলিয়া গিয়াছেন।" (বিচিত্রা ১৩৪২ অগ্রহায়ণ) জীববলির নিন্দাবাদে রবীন্দ্রনাথ নিঃসঙ্গ ছিলেন না; কিন্তু যেহেতু তিনি ব্রাহ্মসমাজভুক্ত এবং হিন্দুসমাজের কঠোর সমালোচক, বোধ হয় সেই অপরাধেই লোকে রবীন্দ্রনাথের প্রতিবাদেরই প্রতিবাদী বেশি করিয়া হইয়াছিল।

পূর্বেই বলিয়াছি পূজাবকাশে এবার কবি বাহিরে কোথাও গেলেন না। তবে বাহির হইতে আহ্বান আসে এখনো; কিন্তু শরীর সহজে আর সাড়া দিতে পারে না। আমাদের এই আলোচ্য পর্বে ফরাসি ভাবুক-লেখক আঁরি বারু্স্ (Henri Barbusse)[১] ছিলেন মস্কোতে। তাঁহার ইচ্ছা নভেম্বর মাসে(১৯৩৫) প্যারিসে একটি আন্তর্জাতিক শান্তি-কন্‌গ্রেসের ব্যবস্থা হয়। ভারত হইতে রবীন্দ্রনাথ, গান্ধীজি, সরোজিনী নাইডু ও রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে এই সম্মেলনে যোগদানের জন্য বলা হয়।[২] বলা বাহুল্য কবির শরীরের যেরূপ অবস্থা তাহাতে বিদেশে যাওয়া সম্ভব ছিল না; তাছাড়া বারু্সের মস্কোতে মৃত্যু হইলে বোধ হয় সম্মেলনের কথাও চাপা পড়ে।

'পত্রপুটে'র পর্ব

বার্ধক্যজনিত ব্যাধি ও দুর্বলতা ক্রমেই সুস্পষ্টভাবে দেখা দিতেছে। শ্রবণ ও দর্শনশক্তি ক্ষীণতর হইতেছে; কোমরে ব্যথা, নড়িতে চড়িতে কষ্টবোধ হয়। কোমরে আল্‌ট্রা-ভায়লেট রে বা অতিনীলিম রশ্মিপাতন করিয়া থাকেন—মনে করেন ফল পাইতেছেন। অভ্যাসমতো প্রতিদিন প্রাতে লেখার সরঞ্জাম লইয়া ও দুপুরে ছবি-আঁকার আসবাবপত্র গুছাইয়া বসেন। সন্ধ্যার পর আশ্রমবাসীরা কেহ কেহ আসেন—কখনো কিছু পড়িয়া শোনান, কখনো কথাবার্তা চলে।

পাঠকের স্মরণ আছে, কবির 'বীথিকা' গুচ্ছের শেষ স্তবক রচিত হয় ভাদ্রের শেষ দিকে (১৫ সেপ ১৯৩৫)। প্রায় একমাস পরে 'পত্রপুটে'র নূতন কাব্যধারা দেখা দিল শরতের মাঝামাঝি সময়ে।'···ছুটি চারদিকে ধূ ধূ করছে···আশ্বিনে সবাই গেছে বাড়ি'; আর কবির 'ছুটি ব্যাপ্ত হয়ে গেল দিগন্তপ্রসারী বিরহের জনহীনতায়' নিঃসঙ্গতার মাঝে। এই ছুটিতে হাওয়া-বদলের তত্ত্ব লিখিতেছেন একপত্রে; প্রথমে লেখা হয় পত্রাকারেই, পরে তাহা গদ্যছন্দে রূপায়িত করেন। পত্রখানি লেখেন কালিদাস নাগকে (ছুটি। পত্রপুট নং ২)।

শরতের রৌদ্রছায়াময়ী শোভা দেখিতে দেখিতে বিচিত্র এ ধরণীর অখণ্ড রূপটি মনের মধ্যে বিকসিত হইয়া উঠিল। তিনি লিখিলেন 'পৃথিবী' কবিতাটি (১৬ অক্টোবর ১৯৩৫)।[৩] এই কবিতাটি যেন পৃথিবীর স্তব—গদ্যছন্দে লিখিত বলিয়া

১ Henri Barbusse (1873--1935). "He founded the Clarte group and took the part of a leader in anti-war propaganda coloured with socialism and later with communism."—Columbia Dictionary of Modern European Literature. Ed. Horatio Smith. p 51. "Served in World War [I]; after the war, became a zealous internationalist." (Webster)

২ প্রবাসী ১৩৪২ আশ্বিন পৃ ৯১৪।

৩ প্রবাসী ১৩৪২ অগ্রহায়ণ। দ্র পত্রপুট ৩।

রসগ্রহণে কোনো বাধা হয় না, এমনই তাহার সাবলীল গতিছন্দ। যে সৌন্দর্য-সম্ভোগ কবির আবাল্যের সংস্কার ও সাধনা, তাহারই ভাষাময়ী মূর্তি এই কবিতা; কাব্যের মধ্য দিয়া কবির আধ্যাত্মিক অনুভূতি নূতন রূপ লইতেছে; 'ধ্যানেতে আর গানেতে' ঈশ্বরানুভূতি নূতন নাম পরিগ্রহ করিতেছে কবির সাধনায়। কবির আধুনিক গান ও কবিতার ভাষা ও ভাব গীতাঞ্জলি-গীতিমাল্য-গীতালি পর্বের ভাষা ও ভাব হইতে সরিয়া আসিয়াছে বা বিবর্তিত হইয়াছে। 'বলাকা' ও তদুত্তর কাব্যে ও গীতে রবীন্দ্রনাথের ঈশ্বর 'ধর্ম' ও 'শান্তিনিকেতন'-উপদেশমালার ঈশ্বর হইতে রূপান্তরিত। এই ঈশ্বরবোধ কিভাবে তাঁহার সাহিত্যে নব নব রহস্যলোকে রূপায়িত হইতেছে, তাহা আমরা স্থানে স্থানে নির্দেশ করিবার চেষ্টা করিয়াছি; কিন্তু এ বিষয়টি বিশেষজ্ঞের সম্যকদৃষ্টি-সম্ভূত আলোচনার প্রতীক্ষায় রহিয়াছে। পরিশেষ, শেষসপ্তক, বীথিকা, পত্রপুট, প্রান্তিক প্রভৃতির কবিতাগুলি যদি এই পরিপ্রেক্ষণী হইতে পাঠ করা যায়, তবেই ইহাদের নিগূঢ় অর্থ অন্তরে প্রবেশ করিবে এবং রবীন্দ্রনাথের ধর্মসাধনার নূতন রূপ প্রকাশ পাইবে।

'পৃথিবী'[১] হইতে যাত্রা করিয়া 'দেহাতীত'[২] লোক পর্যন্ত জীবের প্রয়াণ স্বাভাবিক—স্থূল হইতে সূক্ষ্মতর লোকে গতি। দেহাতীতের ভাবনায় পাই সবিতার ধ্যান—কবির গায়ত্রীমন্ত্র সাধনার রূপ। এ ভাবনা নূতন নহে। পূর্বে যাহা ছিল জ্ঞানের ও রসের ক্ষেত্রে সীমায়িত, এখন ক্রমেই তাহা রূপ লইতেছে নূতন রাহস্যিক অজ্ঞেয়তার মধ্যে।

পূজাবকাশের পর[৩] শান্তিনিকেতনের বিদ্যালয় খুলিল কার্তিকের (১৩৪২) মাঝামাঝি (১ নভেম্বর ১৯৩৫)। কবি শ্যামলীর নূতন গৃহে আছেন। ভাবজগৎ ও কর্মজগৎ কবিজীবনে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত; বিশ্বভারতীর বিচিত্র কাজ, ভাঙাগড়া, রদবদল নিরন্তর চলিতেছে—সমস্তের সঙ্গে কবি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যুক্ত—ভালোমন্দ ফলাফলের জন্য প্রশংসা বা নিন্দার ভাগী তিনিই একা—যদিও এমন অনেক কাজ হয়—যাহার প্রবর্তক তিনি নহেন, অথচ শেষ পর্যন্ত দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া সামলাইতে হইয়াছে তাঁহাকেই। পাঠকের স্মরণ আছে শ্রীভবনের পরিদর্শিকা হেমবালা সেন চলিয়া যাইবার পর হইতে সেখানে নানা প্রকার অস্থায়ী ব্যবস্থা চলিতেছে। প্রথম দিকে প্রতিমাদেবীকে নামত 'প্রনেত্রী' করিয়া অমিয় চক্রবর্তীর স্ত্রী হৈমন্তী দেবীকে পরিদর্শিকা নিযুক্ত করা হয়। সে ব্যবস্থা স্থায়ী হইতে পারিল না। অবশেষে পূজাবকাশের মধ্যে Miss Christiana Bossnec নামে এক ফরাসী মহিলাকে এই পদে নিয়োগ করা হইল। মিস্ বস্‌নেক ভালো ইংরেজি জানিতেন না; তৎসত্ত্বেও স্বদেশে ছাত্রী পরিচালনা বিষয়ে অভিজ্ঞতা ছিল বলিয়া তিনি অচিরকালের মধ্যে এই কার্য আয়ত্ত করিয়া লইলেন। তাঁহার এই কার্যে সুধাময়ী দেবী দুই মাস সহায়তা করিলেন;

১ তু 'বিশ্ববীণারবে বিশ্বজন মোহিছে' (গানটি ১৩০১ সালের পূর্বে রচিত)—গীতবিতান-নূ সং পৃ ৪২৭।

২ 'দেহাতীত' (পত্রপুট ১০) কবিতাটি যেদিন লেখেন সেদিন খবর পান যে পূর্বদিন প্যারিসে অধ্যাপক সিলভ্যাঁ লেভির মৃত্যু ঘটিয়াছে (৬ নভেম্বর); এই সংবাদের সঙ্গে কবির 'দেহাতীত' ভাবনার কোনো যোগ আছে কিনা তাহা বিবেচ্য। সিলভ্যাঁ লেভি ১৯২১-২২ সালে বিশ্বভারতীর প্রথম ভিজিটিং প্রোফেসর রূপে শান্তিনিকেতনে আসেন। দ্র মালতী চৌধুরী: সিলভ্যাঁ লেভীর স্মৃতি [হরিপদ রায় অঙ্কিত ২ খানি স্কেচ্ সহ]—প্রবাসী ১৩৪৩ বৈশাখ, পৃ ৩৭-৩৯।

৩ পূজাবকাশের মধ্যে নূতন ধারায় লিখিত এই কয়টি কবিতা—পত্রপুটের অন্তর্ভুক্ত: 'আজ আমার প্রণতি গ্রহণ করো' (পৃথিবী ১৬ অক্টোবর ১৯৩৫)। 'একদিন আষাঢ়ে নামল' (১৯ অক্টোবর)। 'অতিথিবৎসল, ডেকে নাও পথের পথিককে' (পথের মানুষ ২৪ অক্টোবর)। 'সন্ধ্যা এল চুল এলিয়ে' (হাটে ২৫ অক্টোবর)। জন্মদিনে. 'তোমার জন্মদিনে আমার' (সমিল কবিতা। ২৫ অক্টোবর ১৯৩৫। বিচিত্রা ১৩৪২ পৌষ দ্রষ্টব্য)। 'চোখ ঘুমে ভেরে আসে' (সার্থক আলস্য [১৬ কার্তিক] শুক্লাষ্টমী ১৩৪২)। 'আমাকে এনে দিল এই বুনো চারাগাছটি' (পিয়ালী ৫ নভেম্বর)। 'এই দেহখানা বহন করে আসছে দীর্ঘকাল' (দেহাতীত ৭ নভেম্বর)। এবারকার মতো এইখানে কবিতাচক্রের শেষ।

সুধাময়ী দেবী বিদ্যালয়ে দুই বৎসর কার্য করিয়াছিলেন; পূজার পূর্বে (১৯৩৫ অক্টোবর) হঠাৎ তাঁহার কার্যকালের অবসান হয়।[১]

পূজাবকাশের কিছুকাল পরে শ্রীনিকেতনে একটি নূতন উৎসব প্রবর্তিত হয়—'নবান্ন'; কবি তথায় উপস্থিত হইয়া যথাবিধি পৌরোহিত্য করিলেন। আমাদের পল্লী-জীবনের যে-সব উৎসব আচারমাত্রে পর্যবসিত হইয়া অর্থহীন হইয়া গিয়াছে, সেগুলিকে সুন্দরভাবে প্রাণবন্ত করিবার জন্য কবির যে চেষ্টা ছিল তাহা বিশেষভাবে স্মরণীয়। বনমহোৎসব ও হলচালনা বা সীতা যজ্ঞ ইতিপূর্বে প্রবর্তিত হইয়াছিল; এবার 'নবান্ন'। বহু বৎসর পূর্বে[২] কবি এ বিষয়ে যে কবিতা লিখিয়াছিলেন, তাহাকে নূতন রূপ দান করা হইল শ্রীনিকেতনে।[৩]

যে-প্রাতে 'নবান্ন' উৎসব হয়, সেইদিন আশ্রমে কেইও বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি অধ্যাপক জাপানী কবি য়োনে নোগুচি[৪] আসিলেন। পরদিন প্রাতে (৩০ নভেম্বর) আম্রকুঞ্জে নোগুচির সংবর্ধনা হইল। পাঠকের স্মরণ আছে ১৯১৬ সালে জাপানে নোগুচি রবীন্দ্রনাথকে বিশেষ সম্মান প্রদর্শন করেন, ও তাঁহার সম্বন্ধে দীর্ঘ প্রবন্ধ লেখেন। নোগুচির সংবর্ধনা-সভায় রবীন্দ্রনাথ বলিলেন যে, তিনি জাপানে যে অযাচিত সংবর্ধনা ও সমাদর লাভ করেন, তাহা কল্পনাতীত; আজ সেই দেশের কবিকে তাঁহার আশ্রমে সম্মান দান করিবার সুযোগ পাইয়া তিনি কৃতার্থবোধ করিতেছেন।[৫]

নোগুচি যে-ভাষণ দান করেন তাহা কবি-উচিত ভাষণ। পরে Amrita Bazar Patrikaতে (২৭ সেপ ১৯৩৬) তিনি যে একটি প্রবন্ধ লেখেন, তাহাতে রবীন্দ্রনাথের প্রতি তাঁহার গভীর শ্রদ্ধা প্রকাশ পাইয়াছিল; শান্তিনিকেতনের যথার্থ আদর্শ কী, তাহা তাঁহার কবি-দৃষ্টিতে প্রতিভাত হইয়াছিল। Walter Pater-এর একটি বাক্য (Art struggles after the law of music) উদ্ধৃত করিয়া তিনি বলেন যে, রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস করেন মানবাত্মা সম্পূর্ণতা লাভ করিলে "reach the condition which music alone realizes. Apart from music, there would be no mental training for man because rhythmical harmony alone rescues man from artificiality and corruption···If Tagore's is musical education, it means the development of human minds in the most natural way."[৬]

১ ১৯১৫ ডিসেম্বর হইতে সুধাময়ী দেবী বোলপুর বালিকা-বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষয়িত্রী। কবি এই বিদ্যালয়ের বিস্তারিত সংবাদ রাখিতেন।

২ তু জননী তোমার শুভ আহ্বান

গিয়েছে নিখিল ভুবনে,—
নূতন ধান্যে হবে নবান্ন
তোমার ভবনে ভবনে।
অবসর আর নাহিক তোমার,
আঁটি আঁটি ধান চলে ভারে ভার,

গ্রামপথে-পথে গন্ধ তাহার
ভরিয়া উঠিছে পবনে।
জননী তোমার আহ্বান-লিপি
পাঠায়ে দিয়েছ ভুবনে।

—শরৎ, দ্র কল্পনা।

৩ V. B. News. 1935 Dec. p 42.

৪ Yone Noguchhi. Tokyo, Japan. ১৯৩৭ সালে বিশ্বভারতীর যে সাতজন 'প্রধান' (Vice-President)-এর পদ সৃষ্ট হয় নোগুচি তাঁহাদের অন্যতম। তিনি ১৯৩৭, ১৯৩৮, ১৯৩৯, ১৯৪০ পর্যন্ত ঐ পদে ছিলেন। দ্র Annual Reports of the Visvabharati.

৫ V. B. News. 1935 Dec. p 44.

৬ Quoted in V. B. News. 1936 Oct. p 27. দ্র কালীচরণ মিত্র: জাপানী কবি নোগুচি—বিচিত্রা, ১৩৪২ অগ্রহায়ণ পৃ ৬৭৫-৭৭। দ্রষ্টব্য সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত কৃত 'মণিমঞ্জুষা', ইহাতে নোগুচির কয়েকটি ইংরেজি কবিতার তর্জমা আছে।

শান্তিনিকেতনে নোগুচির সংবর্ধনা হইল, কলিকাতায় দার্শনিক ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের সংবর্ধনা হইতেছে। উদ্যোক্তাদের অনুরোধ কবির উপস্থিতির জন্য; শরীরের জন্য তিনি কলিকাতায় যাইতে পারিলেন না—একটি কবিতা[১] লিখিয়া পাঠাইয়া দিলেন (১ ডিসেম্বর ১৯৩৫)।

রবীন্দ্রনাথের সহিত ব্রজেন্দ্রনাথের সম্বন্ধ বহু কালের। কবি ও দার্শনিকের বন্ধুত্বের একটি ধারাবাহিক আলোচনার বিশেষ প্রয়োজন আছে। রবীন্দ্রনাথ কবিতার শেষাংশে বলিতেছেন—

—মোরে তুমি জানো বন্ধু বলি ; স্বদেশের আশীর্বাদ, বিদায় কালের অর্ঘ্য মোর
আমি কবি আনিলাম ভ'রে মোর ছন্দের অঞ্জলি বাহুতে বাঁধিনু তব সপ্রেম শ্রদ্ধার রাখীডোর।

এই সময়ে কবিকে আর-একজন মহাপুরুষের জন্য একটি বাণী লিখিয়া দিতে হয়। দেশময় রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের শতবার্ষিকী উৎসবের আয়োজন হইতেছে। পরমহংসদেবের ভক্তদের দ্বারা অনুরুদ্ধ হইয়া কবি Prabuddha Bharat পত্রিকার জন্য নিম্নলিখিত বাণীটি ইংরেজিতে লিখিয়া পাঠাইয়া দিলেন।[২]

Divers courses of worship from varied springs of fulfilment have mingled in your meditation.

The manifold revealation of the joy of the Infinite has given form to a shrine of unity in your life.

Where from afar and near arrive salutations to which I join mine own.

কবি ইহার নিম্নলিখিত বাংলা মর্মানুবাদ করিয়া দেন :

বহু সাধকের বহু সাধনার ধারা ধেয়ানে তোমার মিলিত হয়েছে তারা।
তোমার জীবনে অসীমের লীলাপথে নূতন তীর্থ দেখা দিল এ জগতে।
দেশবিদেশের প্রণাম আনিল টানি, সেথায় আমার প্রণতি দিলাম আনি।

বিদ্যালয় খুলিবার কিছুকাল পরে অধ্যাপক ও ছাত্রছাত্রীরা মিলিয়া 'অরূপরতন' অভিনয় করেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরদার ভূমিকা গ্রহণ করেন। শান্তিনিকেতনে অভিনয় করিলে সকলের মন ভরে, কিন্তু কর্তৃপক্ষের ধনাগম হয় না; অথচ ইহারই প্রয়োজন উত্তরোত্তর বাড়িতেছে। তাই স্থির হইল কলিকাতায় সাধারণ রঙ্গমঞ্চে অভিনয় করিয়া অর্থসংগ্রহ করা হইবে। ৯ ডিসেম্বর কবি ও অভিনয়ের দল কলিকাতায় গেলেন। নিউ এম্পায়ার থিএটরে দুই দিন পরপর অরূপরতনের অভিনয় হইল।[৩] কবি ঠাকুরদার অংশ গ্রহণ করেন। কিন্তু পঁচাত্তর বৎসর বয়সে এই পরিশ্রম, উদ্বেগ ও উত্তেজনা সহ্য হইবে কেন! অভিনয়ান্তে অসুস্থ হইয়া পড়িলেন। কলিকাতায় দশদিন থাকিয়া ১৯ ডিসেম্বর শান্তিনিকেতনে ফিরিয়া আসিলেন; মাঝে হইতে উৎকল সংগীত-সম্মেলনে যাওয়া হইল না।

কলিকাতা হইতে আসিয়া কবি শান্তিনিকেতনের পৌষউৎসবের প্রথম দিন মন্দিরে উপাসনা[৪] করেন, বিশ্বভারতীর অন্যান্য উৎসব বা কর্ম-সভায় যোগদান করিতে পারেন নাই।

১ প্রবাসী ১৩৪২ মাঘ, পৃ ৫৮২।

২ প্রবাসী ১৩৪২ ফাল্গুন পৃ ৭২৫।

৩ V. B. News. 1936 Jan. p 50. (১১, ১২ ডিসেম্বর ১৯৩৫। ২৫, ২৬ অগ্র ১৩৪২)। রবীন্দ্রনাথের 'রাজা' অভিনয়। বিবিধপ্রসঙ্গ, প্রবাসী ১৩৪২ পৌষ পৃ ৪৪৪।

৪ উদ্বোধন। যাত্রী ৭ পৌষ ১৩৪২ ('প্রবাসীর পক্ষ হইতে অনুলিখিত ও বক্তা কর্তৃক সংশোধিত') প্রবাসী ১৩৪২ মাঘ, পৃ ৫০০, ৫০১-০২।

বিশ্বভারতীর বার্ষিক সভায় এবার গুরুত্বপূর্ণ কাজ ছিল; সভাপতিত্ব করেন সুধীরচন্দ্র লাহিড়ী।[১] পাঠকের স্মরণ আছে ১৯২২ সালে বিশ্বভারতীর কনস্টিটিউশন প্রথম প্রস্তুত হয়। তাহার পর প্রয়োজনের তাগিদে মাঝে মাঝে নিয়মাবলীর রদবদল হইয়াছিল। গত বারো বৎসরের মধ্যে বিশ্বভারতী বড়ো ও বিচিত্র হইয়া পড়িয়াছে; নানা লোক নানা অভিপ্রায়ে ও কর্মোপলক্ষ্যে সেখানে আসা-যাওয়া আরম্ভ করিয়াছে; পুরাতন যুগের বা tradition-এর দোহাই দিয়া সকল প্রকার অধিকার ও দাবি-দাওয়াকে সকল শ্রেণীর কর্মীর পক্ষে সুগম করা ভবিষ্যতের নিরাপত্তার পক্ষে অনুকূল না হইতে পারে এই আশঙ্কা অনেকের মনেই সেদিন দেখা গিয়াছিল; এই ভাবনা হইতে নূতন কনস্টিটিউশন গড়া হইল। যে democratic আদর্শে শান্তিনিকেতনের বিদ্যালয়ের সূত্রপাত তাহা ক্রমশই ক্ষীণ হইয়া আসিতেছিল। নূতন কনস্টিটিউশনে অধ্যাপকমণ্ডলীর অনেকখানি ক্ষমতা ও দায়িত্ব সংকুচিত হইল; সংসদ ও বিশেষভাবে কর্মসমিতির উপর শাসন-দায়িত্ব গিয়া বর্তাইল। বলা বাহুল্য, রবীন্দ্রনাথ এই সকল বিস্তারিত আইন-কানুন প্রণয়নের মধ্যে থাকিতেন না; এখন তাঁহার যে বয়স তাহাতে কোনো বিষয় জোর করিয়া প্রতিবাদ বা সমর্থন করিবার শক্তি পান না—তিনি ভালো করিয়াই জানেন, অন্যের উপর নির্ভর তাঁহাকে করিতেই হইবে। যাহাই হউক বার্ষিক সভায় নূতন বিধান পেশ হইল এবং নিয়মানুসারে দ্বিতীয় অধিবেশন হইল শ্রীনিকেতনের উৎসবের সময় (৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৬)।[২]

ডিসেম্বর মাসে কলিকাতায় নানারূপ প্রদর্শনী, সভা, সম্মেলন বহুকাল হইতে হইয়া আসিতেছে। কলিকাতা আর্টস্কুলের অধ্যক্ষ মুকুলচন্দ্র দে তাঁহার ছাত্রদের এবং অন্যান্য শিল্পীদের কাজের প্রদর্শনী মধ্যে মধ্যে করেন। তাঁহার ইচ্ছা যে বাংলাদেশে একটি স্থায়ী জাতীয় মিউজিয়ম্ বা National Art Gallery শ্রেণীর কোনো প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়। আমাদের আলোচ্য পর্বে তিনি এই সাধু পরিকল্পনা পাবলিকের কাছে পেশ করেন। বিষয়টি কবির খুবই ভালো লাগে, তিনি মুকুলচন্দ্রকে উৎসাহ দিয়া লিখিয়াছিলেন:

"I have read with great interest your scheme for a Bengal National Museum I agree with you that an organised centre such as you suggest could do much to educate our public in the value of indigenous arts and crafts of this province and create a genuine interest in their promotion. It is an object very dear to my heart and I cannot help welcoming any endeavour towards its realization. You have my best wishes."[৩]

দুঃখের বিষয়, মুকুলচন্দ্র তাঁহার অধ্যক্ষতা-পর্বে ইহা কার্যকর করিয়া তুলিতে পারেন নাই; কবির dear to my heart প্রতিষ্ঠানও তাঁহার জীবিতকালে রূপ লয় নাই এবং এখন পর্যন্ত দেশবাসীর বা গবর্মেণ্টের এদিকে দৃষ্টি তেমনভাবে পড়ে নাই।[৪] গুরুসদয় দত্তের অতি মূল্যবান শিল্পসংগ্রহ লইয়া একটি স্থায়ী প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইবার প্রস্তাব হইতেছে। নিখিল ভারত গ্রাম উদ্যোগ কেন্দ্রে যে সংগ্রহালয়ের প্রস্তাব হইয়াছে, কয়েকমাস পূর্বে কুমারাপ্পাকে কবি তৎসম্পর্কে যাহা বলিয়াছিলেন এই প্রসঙ্গে তাহা স্মরণীয়। গান্ধীজির প্রেরণায় কিছুকাল পূর্বে (১৯৩৪ ডিসেম্বর ১৪) ওয়ার্ধার আশ্রমে

১ ইনি বিশ্বভারতীর অকৃত্রিম বন্ধু ছিলেন। ইঁহার সংগৃহীত গ্রন্থরাজি বিশ্বভারতী গ্রন্থাগারে আসিয়াছে।

২ প্রবাসী ১৩৪২ চৈত্র, বিবিধ প্রসঙ্গ, পৃ ৮৯-৯২।

৩ V. B. News. 1936 Feb. p 63.

৪ আমাদের ভরসা 'গান্ধীঘর' প্রভৃতি যে সব পরিকল্পনা চলিতেছে তাহাতে স্থানিক শিল্পকলার নিদর্শন রক্ষিত হইবে। রবীন্দ্রনাথের নামে নানাস্থানে পাঠাগার ও স্মৃতিমন্দির আছে; ঐ সব প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষও এ বিষয়ে দৃষ্টি দিতে পারেন, কারণ রবীন্দ্রনাথের জীবন-দর্শনের মধ্যে মানুষের শিল্প ও কলার সাধনা বড়ো স্থান জুড়িয়া ছিল। কলিকাতায় প্রস্তাবিত 'রবীন্দ্রভারতী'র সহিত একটি সংগ্রহালয় সংযুক্ত করিলে অবান্তর হইবে না বলিয়া মনে হয়।

All India Village Industries Association বা গ্রামউদ্যোগ সমিতির জন্ম হয়। যমুনালাল বাজাজ সংগ্রহালয়ের জন্য গৃহ ও জমি দান করেন। 'Its object was defined as Village reorganization and Village reconstruction.' জে. সি. কুমারাপ্পা হইলেন সম্পাদক, পরিচালক মণ্ডলীতে থাকিলেন ডক্টর প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ, শঙ্করলাল ব্যাংকার ও ডক্টর খান সাহেব। পরামর্শদাতাদের মধ্যে ছিলেন রবীন্দ্রনাথ,[১] স্যর প্রফুল্লচন্দ্র রায়, জগদীশচন্দ্র বসু, সি. ভি. রমন, ডক্টর আনসারি প্রভৃতি। সেই সূত্রে কুমারাপ্পা শান্তিনিকেতনে আসেন (১৯৩৫ মে.)। নন্দলাল বসু প্রভৃতির সহিত আলোচনা করিয়া কুমারাপ্পা কবির সহিতও এই বিষয়ে আলোচনার জন্য দেখা করিলেন; কবি তাঁহাকে বলিয়াছিলেন যে, মহাত্মাজি সমস্ত জাতির জন্য যে সংগ্রহালয় (ম্যুজিয়াম) স্থাপন করিতে চাহিতেছেন,— "not to limit it to crafts as crafts. Crafts have been the media of artists in all ages, and our artists, as painters, as architects, as decorators, have helped our folks to get finer satisfaction out of the same material. The economic life of a nation is not such an isolated fact as Mahatamaji imagines and, today, side by side with economic poverty, we are faced with a cultural poverty which puts us to shame...Our art treasures today are found in museums outside India...Perhaps one day we will have no art treasures left; we will have to go visiting museums in foreign lands...Please tell Mahatmaji to consider that art is not a luxury of the well-to-do. The poor man needs it as much and employs it as much in his cottage-building, his pots, his floor-decorations, his clay deities and in many other ways. If Mahatmaji's men go round collecting specimens of village industries, why may they not also look for and collect specimens of the various indigenous arts spread all over our land and waiting to be recherished?...I would do it myself, but I know only too well that I donot command the resources nor the necessary popular confidence that Mahatmaji commands."[২]

এবার কন্‌গ্রেসের স্বর্ণ-জয়ন্তী। পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে ১৮৮৫ সালে অতি দীন ভাবে ইহার আরম্ভ হয়। জয়ন্তী উপলক্ষ্যে কবি (২৭ ডিসেম্বর ১৯৩৫) অবসরগ্রাহী (retiring) প্রেসিডেণ্ট বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদকে নিম্নলিখিত বাণী প্রেরণ করিলেন: "My warmest greetings on the occasion of the Golden Jubilee celebrations. The destiny of India has chosen as its ally the power of soul and not that of muscle. And she is to raise the history of man from the muddy level of physical conflicts to a higher moral altitude."

কন্‌গ্রেসের অধিবেশন হইবে লখনৌ নগরীতে[৩]—জওহরলাল নেহেরু নূতন প্রেসিডেণ্ট হইবেন। এবার লখনৌ-এ কন্‌গ্রেসের অধিবেশনের সঙ্গে নিখিল ভারত গ্রাম উদ্যোগ সমিতির প্রদর্শনী হইতেছে। প্রদর্শনীর পরিকল্পনা ও সাজসজ্জার

১ Mahatma. Vol. IV. p 10.

২ V. B. Q. 1935 May. p 112.

৩ ১৯৩৬ এপ্রিল মাসে লখনৌ কন্‌গ্রেসের সঙ্গে A.I.V.I.A এর প্রদর্শনী হয়। নন্দলাল বসু তাঁহার ছাত্রদের সহায়তায় প্রদর্শনী সজ্জিত করিবার ভার গ্রহণ করেন। দ্র Mahatma. Vol. IV. p 82-88.

ভার পড়িয়াছিল নন্দলাল বসুর উপর। তাহার আয়োজন চলিতেছে। নন্দলাল রবীন্দ্রনাথের সহিত কথাবার্তা বলিয়াই এই কার্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। গ্রাম উদ্যোগ পরিকল্পনার আলোচনা প্রসঙ্গে কবির মনে বাংলার গ্রামের সমস্যার কথা জাগিতেছে। তিনি কন্‌গ্রেসের বাণী পাঠাইবার পরদিন বাংলার কুটীরশিল্পের সমস্যা সম্বন্ধে এক বিবৃতি প্রদান করিলেন। কবি দেখিতেছেন, বাংলাদেশের বুনিয়াদি industry—ধান হইতে চাউল তৈয়ারি। আজ সে-শিল্প মুমূর্ষু। দেশের অর্ধেক জনশক্তি নারী। সেই নারীসমাজের উপজীবিকা ছিল ধান ভানা বা চাউল তৈয়ারি। জনসংখ্যার অর্ধেক এখন সেই শিল্প হইতে বিচ্যুত। গ্রামের ঢেঁকি চরকার ন্যায়ই লোপ পাইতে বসিয়াছে। কবি দেখিতেছেন যে, যে-শিল্প ছিল গ্রামের সর্বজন মধ্যে পরিব্যাপ্ত, তাহা ক্রমেই গ্রাম ছাড়িয়া শহরে ধনিক শ্রেণীর হস্তগত হইতেছে; কবির আশঙ্কা এই শিল্পকে কেন্দ্র করিয়া শ্রেণীগত বিরোধ সমাজে দেখা দিবে। কবি লিখিলেন (১৯৩৫ ডিসেম্বর ২৮):

"When a people's diet takes a vicious path of its own impoverishment, it causes a graver mischief than any act of cruelty inflicted by an alien power. Rice mills are menacingly spreading fast extending throughout the province an unholy alliance with malaria and other flag-bearers of death robbing the whole people of its vitality through a constant weakening of its nourishment.

"We have to take into account the immense importance of our rural economic life whose course has been cruelly obstructed by the iron-monster robbing our village women of some of their natural means of livelihood and the labouring class of its right to gather its simple living out of the gleanings from the peoples own green field of life."[১]

কিছুকাল পূর্বে Harijan পত্রিকায় (১৯৩৪ নভেম্বর ১৬) Village Industries প্রবন্ধে গান্ধীজি এই সমস্যা সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন—"Rice-mills and flour-mills not only displace thousands of poor women workers, but damage the health of whole population. It is time when medical men and others combined to instruct the people on the danger attendant upon the use of white flour and polished rice." এই সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ লিখিত 'আহারের অভ্যাস' (শান্তিনিকেতন পত্রিকা ১৩২৬) স্মরণীয়। ১৯১৯ সালে তিনি খাদ্যসমস্যা লইয়া লেখেন। ঐ পত্রিকায় 'খাদ্য চাই' বলিয়া একটি প্রবন্ধ আছে; তাহাতে পর্যাপ্ত খাদ্য প্রস্তুত করিবার জন্য উপদেশ আছে।

প্রসঙ্গত বলিতে পারি খাদ্য-সমস্যা লইয়া রবীন্দ্রনাথ বহু স্থানে তাঁহার মত ব্যক্ত করিয়াছেন। বাঙালী ভাতের মাড় বা ফেন ফেলিয়া দেয়—এই লইয়া কবি বহু প্রতিবাদ করেন। শান্তিনিকেতনের রান্নাঘরে বড়ো বড়ো 'কুকার' কিনিয়া দেন। কয়েক মাস সে-সব ভালোই চলিয়াছিল, তারপর—তাঁহার বহু প্রচেষ্টা যেভাবে কার্যকর হয় নাই এ প্রচেষ্টাও তেমনইভাবে ব্যর্থ হয়। ডাক্তার চুনীলাল বসু, ডাক্তার অমূল্যচন্দ্র উকিল প্রভৃতি আসিয়া খাদ্য সংস্কারের জন্য বলিয়া গিয়াছিলেন, কিন্তু কিছু স্থায়ী হয় নাই; আমরা সহজ পথ অনুসরণ করিয়াছি। কবি অন্যত্র

১ V. B. News. 1936 Jan. p 51. প্রবাসী ১৩৪২ মাঘ, 'রবীন্দ্রনাথ ঢেঁকির চালের পক্ষপাতী' পৃ ৫৯৬। কয়েক বৎসর পূর্বে শ্রীনিকেতন হইতে 'রবীন্দ্র ধান্য কল' নাম দিয়া এক ধানভাঙা কল স্থাপনের পরিকল্পনা করা হয়: তজ্জন্য হ্যান্ডবিল ছাপানো হয়। পরিকল্পকদের ইচ্ছা ছিল যে সমবায় নীতিতে এই কল স্থাপিত হইবে। বর্তমানে সমস্ত কলই ধনিকদের সম্পত্তি। বিশ্বভারতী কেন্দ্রীয় সমবায় কোষ (V. B. Central Co-operative Bank)-কে কেন্দ্র করিয়া এই কল স্থাপনের কথা ওঠে। সে পরিকল্পনা কার্যে পরিণত হয় নাই।

বলিয়াছেন— "রান্নাঘরে চুলার যে সাবেক ব্যবস্থা আছে সকলেই জানেন তাহাতে যেমন দুঃখ বেশি তেমনি ব্যয়ও বেশি এবং তাহাতে রান্নাঘর যথোচিত পরিষ্কার রাখা দুঃসাধ্য। আধুনিক প্রণালীতে চুলা নির্মাণ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল, কেবলমাত্র অভ্যাসের জড়তাবশত পাচকদের তাহা ভালো লাগে নাই। তাহারা নানা ছুতা করিয়া সেই চুলা বর্জন করিল। ইহাতে রান্নাঘরের দুঃখ তাপ পূর্ববৎ প্রবল হইয়া উঠিল আমরাও ইহা সহিয়াই গেলাম; নূতন প্রণালীর দায় কেহ গ্রহণ করিলাম না, নূতন করিয়া চিন্তা করিলাম না।"[১]

আমাদের আলোচ্যপর্বে রবীন্দ্রনাথের 'শব্দতত্ত্ব' নূতন কলেবরে 'বাংলা শব্দতত্ত্ব' নামে প্রকাশিত হইল (১৩৪২ অগ্রহায়ণ)। শব্দতত্ত্ব প্রথম প্রকাশিত হয় ১৩১৮ সালে গদ্য গ্রন্থাবলীর পঞ্চদশ খণ্ডরূপে (১৯০৯ ফেব্রুয়ারি)। ভাষা বিষয়ক যেসব আলোচনা এই কয় বৎসরের মধ্যে হইয়াছিল, তাহা এই নূতন সংস্করণে সংযোজিত হয়। গ্রন্থখানি কবি উৎসর্গ করেন পণ্ডিত বিধুশেখর ভট্টাচার্যকে[২]; পাঠকের স্মরণ আছে গত বৎসর বিধুশেখর শান্তিনিকেতন ত্যাগ করিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করেন।

অচিরকালের মধ্যে বিধুশেখর কবি কর্তৃক পুনরভিনন্দিত হইলেন। ১৯৩৬ সালের নববর্ষদিন সরকারী উপাধি বা খেতাব বিতরণের সময় বিধুশেখর মহামহোপাধ্যায় উপাধিতে ভূষিত হন। রবীন্দ্রনাথ এই সংবাদে প্রীত হইয়া প্রথমে বিধুশেখরকে পত্র দ্বারা (১৯৩৬ জানু ১৮) ও কয়েকদিন পরে একটি কবিতা লিখিয়া (২৬ শে) আনন্দজ্ঞাপন করিলেন।[৩]

কয়েক বৎসর পূর্বে (১৯২১) বিধুশেখর শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের সহিত সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সামান্য সম্বন্ধ রক্ষার বিরোধী ছিলেন; আর, রবীন্দ্রনাথ একদা 'রাজটীকা' গল্প লিখিয়া খেতাবধারীদের বিদ্রূপ করেন, পরে স্বয়ং রাজসম্মান গ্রহণ করিয়াও তাহা পরিত্যাগ করেন। আজ বিধুশেখর সরকারী উপাধি-ভূষিত এবং তজ্জন্য রবীন্দ্রনাথের হর্ষ প্রকাশ উভয়ই কালান্তরের সূচক।

মাঘোৎসবের সময় কবি শান্তিনিকেতন মন্দিরে যথানিয়মে উপাসনা করিলেন ও তৎপূর্বে (৬ মাঘ) মহর্ষির মৃত্যু-বার্ষিকীদিনেও উপদেশ দিলেন।[৪] ইতিমধ্যে আর-একটি আনন্দ-জ্ঞাপন উপলক্ষ্যে অপরূপ একটি সংগীত রচিত হইল। মাঘ মাসে (৫ই) শান্তিনিকেতনের অধ্যাপক প্রভাতচন্দ্র গুপ্তর বিবাহের পর কবি নিম্নলিখিত গানটি উপহার দেন "কেটেছে একেলা বিরহের বেলা"।[৫] গানটি 'নৃত্যনাট্য চিত্রাঙ্গদা'র অন্তর্গত।

শীতকালে শান্তিনিকেতনে দেশবিদেশের অতিথি সমাগম হয়; নোগুচির কথা ইতিপূর্বেই বলা হইয়াছে। অন্যান্যদের মধ্যে কয়েকজনের নাম করা যায়, যাঁহারা কবির সহিত সাক্ষাৎ করেন। Young Women's Christian Association-এর আমেরিকা শাখার সেক্রেটারি Miss Ethel Cutler আসেন ১৬-১৭ নভেম্বর (১৯৩৫)। তিনি

১ উদ্যোগ শিক্ষা, শান্তিনিকেতন-পত্রিকা ১৩২৬ আশ্বিন, কার্তিক পৃ ৫।

২ শান্তিনিকেতনে কার্যকালে নন্দলাল বসু ও সুরেন্দ্রনাথ কর ব্যতীত আর কেহই কবির নিকট হইতে গ্রন্থ-উৎসর্গ পাইবার সৌভাগ্য লাভ করেন নাই।

৩ ১২ মাঘ ১৩৪২। দ্র প্রবাসী ১৩৪২ ফাল্গুন পৃ ৬৫১।

৪ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর—শ্রীক্ষিতীশচন্দ্ররায় কর্তৃক অনুলিখিত। প্রবাসী ১৩৪২ ফাল্গুন পৃ ৬৭১। মাঘোৎসব, উদ্বোধন ও উপদেশ, শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র রায় অনুলিখিত, প্রবাসী ১৩৪২ বৈশাখ পৃ ২।

৫ বিচিত্রা ১৩৪২ চৈত্র। 'আঁখি-সংগম'। প্রভাতচন্দ্র গুপ্ত ও রেণু দেবীকে তাঁহাদের শুভপরিণয় উপলক্ষে কবিগুরুর আশীর্বাদ। গানটির তলায় ৫ই মাঘ ১৩৪২ তারিখ দেওয়া আছে। দ্রষ্টব্য, V. B. News, 1936 March, p 66. দ্র গীতবিতান নু-সং পৃ ৩০০, ৬৯৮।

একখানি সুন্দর পত্রে তাঁহার ভাবগুলি ব্যক্ত করেন ; তিনি লিখিয়াছেন, "In and through all I have beheld the dreams of a poet coming alive, not only in the Poet's own most kindly and gracious greeting to me who come from a far land, but in the very lives of those who share his purposes for this place and seek to live them out. I came a stranger with great expectations. I leave a friend with deep satisfaction in all that Visvabharati means."[১]

আর-একজন বিশিষ্ট অতিথি হইতেছেন য়েটস্-ব্রাউন (Lt. Col. F. B. Yeats-Brown), 'Bengal Lancer' নামক গ্রন্থের লেখক। তিনি কবির সহিত সাক্ষাৎ করিতে ও বিশেষভাবে শ্রীনিকেতনের গ্রাম-উদ্যোগ দেখিতে আসেন (১৯৩৬ জানু ২৮)। Yeats-Brown পনেরো বৎসর পূর্বে একবার শান্তিনিকেতনে আসিয়াছিলেন। তিনি লিখিতেছেন, "Santiniketan still seems to me one of the most spiritually stimulating places in the world, looking beyond our day to a world-harmony which will come through no synthetic super-state, but through beauty, born in many forms and many lands, in the soil and soul of nationhood. Tagore has been described by his enemies as a *poseur*, and his University as a place where students spend their time in the blissful beatitude of communicating with the incommunicable. That is easy to say. Santiniketan does not always show results that can be measured by the world's coarse thumb and finger : but it is exactly as a protest against such material standards of success that its founder will be remembered by posterity, not only in India, but throughout the world. He is ahead of the ruck and run of us."

প্রবন্ধ শেষে তিনি দুঃখ করিয়া বলেন যে আশ্রমত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলে তাঁহার মনে হইল "Tagore remains in my mind as a beautiful but somewhat tragic figure....behind Santiniketan there is not yet the driving force of a great popular movement, but only a great man : a man who makes the arc of the sky seem bigger after one has met him."[২]

ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে (১৯৩৫) মিসেস মার্গেরেট স্যাংগার কবির সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য আসিলেন। জন্মনিয়ন্ত্রণ আন্দোলনের ইনি অন্যতম নেত্রী। প্রথম মহাযুদ্ধের পর সমাজে জন্মনিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে প্রশ্ন দেখা দেয়। যুদ্ধান্তে অসংখ্য বেকারদের সমস্যা সকল দেশকেই ভাবিত করিয়া তোলে। কিন্তু এ সমস্যা প্রথম দৃষ্টি আকর্ষণ করে নারীদের। ইংলন্ডের ডক্টর মেরি স্টোপস্ (Stopes 1880), সুইডেনের Ellen Key (Karoliva Sofia 1849-1926), আমেরিকার মিসেস মার্গারেট স্যাংগার (Margaret Sanger 1883) এই সমস্যা লইয়া আলোচনা ও আন্দোলনে প্রবৃত্ত হন। জীবতত্ত্ব, আয়ুর্বেদ বা medicine, মনস্তত্ত্ব, নীতিধর্ম, মোক্ষধর্ম, অর্থনীতি প্রভৃতি বিচিত্র বিষয় এই সমস্যার সঙ্গে জড়িত। বর্তমানে রাজনীতিকরাও এই বিষয় সম্বন্ধে উদাসীন থাকিতে পারিতেছেন না ; কারণ ক্রমবর্ধমান উদ্‌বৃত্ত জনসংখ্যার স্থান ও আহারদানের সমস্যা উত্তরোত্তর জটিল হইয়া উঠিতেছে। শ্রীমতী স্যাংগার (Sangar) ভারতে আসিয়াছেন নিখিল ভারত মহিলা সম্মেলনের আমন্ত্রণে ; দক্ষিণ ভারতে ত্রিবাঙ্কুরে

১ Of my visit to Santiniketan. Nov. 16-17, 1935. [Ethel Cutlar B. A., B. D. Secretary to the National Board of the Young Women's Christian Association, U. S. A.—V. B. News. 1936 Jan. p 58.

২ V. B. News. 1936 Nov-Dec. The Bengal-Lancer on Santiniketan. p 39-41.

ডিসেম্বরের শেষ দিকে সম্মেলন বসিবে। তৎপূর্বে তিনি ওয়ার্ধায় গিয়া মহত্মাজির সঙ্গে মোলাকাত করেন। উভয়ের মধ্যে যে আলোচনা হয় তাহার বিস্তারিত প্রতিবেদন গান্ধীজির জীবনীতে প্রদত্ত হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের সহিত মিসেস স্যাংগারের যে আলোচনা হয়, তাহার কোনো বিবৃতি আমরা পাই নাই। তবে দশ বৎসর পূর্বে শ্রীমতী স্যাংগার সম্পাদিত Birth Control Review পত্রিকায় জন্মনিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার যে-মত অকুণ্ঠিত চিত্তে বিবৃত করেন (১৯২৫ সেপ ৩০), তাহাকেই আমরা তাঁহার এখানকারও মত বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি। দশ বৎসর পূর্বে জন্মনিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে আন্দোলন আরম্ভ হইলে গান্ধিজি তীব্র প্রতিবাদপূর্ণ বিবৃতি প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাহা পাঠ করিয়া মিসেস্ স্যাংগার রবীন্দ্রনাথকে (১৯২৫ অগস্ট ১২) লিখিয়াছিলেন : "The Indian Papers just received report that Mahatma Gandhi has been visiting you at Shantiniketan. Perhaps you have seen his recent statement in opposition to Birth Control. You have travelled all over the earth, and you have observed the joys and sorrows and miseries of the world, and we take it for granted that with your international outlook on life and human society you cannot but feel friendly towards Birth Control."

এই পত্র পাইবার পর রবীন্দ্রনাথ তাঁহার মত ব্যক্ত করিয়া এক দীর্ঘ পত্র মিসেস্ স্যাংগারকে লিখিয়া পাঠান, তাহাই Birth Control Reviewতে প্রকাশিত হয়। কবি লিখিয়াছিলেন :

"I am of opinion that Birth Control movement is a great movement not only because it will save women from enforced and undesirable maternity, but because it will help the cause of peace by lessening the number of surplus population of a country scrambling for food and space outside its own rightful limits. In a hunger-stricken country like India it is a cruel crime thoughtlessly to bring more children into existence than could properly be taken care of, causing endless suffering to them and imposing a degrading condition upon the whole family. It is evident that the utter helplessness of a growing poverty very rarely acts as a check controlling the burden of over-population. It proves that in this case nature's urging gets better of the severe warning that comes from the providence of civilised social life. Therefore, I believe, that to wait till the moral sense of man becomes a great deal more powerful than it is now and till then to allow countless generations of children to suffer privations and untimely death for no fault of their own, is a great social injustice which should not be tolerated. I feel grateful for the cause you have made your own and for which you have suffered.…"

গান্ধীজি জন্মনিয়ন্ত্রণের পক্ষপাতী; তবে তাঁহার পথ কঠোর ব্রহ্মচর্য ও সংযমের পথ। অর্থাৎ ধর্মনীতির উপর তাঁহার নির্ভর।[১] এইখানে গান্ধীজির সহিত রবীন্দ্রনাথের একটি বড়ো রকম পার্থক্য; রবীন্দ্রনাথ রক্তে-মাংসে-গড়া মানুষের দুর্বলতার প্রতিষেধ করিবার জন্য উৎসুক,— বাস্তব সত্যের দিক হইতে তিনি মানুষকে দেখিতেছেন; গান্ধীজি সেইখানে ধর্মনীতির কঠোর নির্দেশে জীবনকে সার্থক করিবার জন্য উপদেশ দিতেছেন।

১ দ্র Mahatma by Tendulkar. Vol 7.

অন্যান্য বিদেশী যাঁহারা এই শীতকালে আশ্রমে আসেন, তাঁহাদের অন্যতম Miss Lousie Wallace Hackney। ইনি আমেরিকার একজন কবি সাহিত্যিক—চীনা চিত্র সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ; তিনি বলেন, "To spend a few days here [Santiniketan] has been a privilege. For it is art made concrete in life.··· To talk with the Poet is to enter into a realm of serenity,"[১]

কলিকাতায় শিক্ষা-সপ্তাহ ১৯৩৬

ফেব্রুয়ারি মাসের (১৯৩৬) প্রথমদিকেই রবীন্দ্রনাথকে কলিকাতায় যাইতে হইতেছে—সেখানে 'শিক্ষাসপ্তাহে'র ও 'নবশিক্ষাসংঘে'র (New Education Fellowship) উদ্বোধন-সভায় তাঁহার বক্তৃতা দিবার কথা। এদিকে শ্রীনিকেতনের বার্ষিক উৎসব। উৎসবের পূর্বেই কলিকাতায় যাইতে হইতেছে বলিয়া কবি ৫ই তারিখে শ্রীনিকেতনের কর্মীদের সহিত মিলিত হন। ৭ ফেব্রুয়ারি কবি কলিকাতায় গেলেন—পরদিন 'শিক্ষাসপ্তাহে' তাঁহার ভাষণ।

এখানে শিক্ষাসপ্তাহ ব্যাপারটি কী, তাহা সংক্ষেপে বলা প্রয়োজন। আমাদের আলোচ্য পর্বে অখণ্ড বাংলার শিক্ষামন্ত্রী আজিজুল হক। শিক্ষার উন্নতির জন্য তাঁহার খুবই উৎসাহ ছিল। তাঁহারই সময় মাধ্যমিক শিক্ষাবিষয়ক সংস্কারের কথা উঠে। আজিজুল হক কিছুকাল পূর্বে শান্তিনিকেতনে আসিয়াছিলেন (১৯৩৫ অগস্ট ১০)। কিন্তু ইহারও পূর্বে ১৯৩০ সালে যখন তিনি কৃষ্ণনগরের উকিল, তখন শ্রীনিকেতন দেখিতে আসেন।[২] যাহাই হউক এখনকার শিক্ষামন্ত্রী আজিজুলের প্রেরণায় ও চেষ্টায় এই শিক্ষা-উৎসবের আয়োজন হইয়াছে। শিক্ষাবিষয়ক প্রদর্শনী, বক্তৃতা প্রভৃতির বিশেষ ব্যবস্থা হয়; এই প্রদর্শনীতে শ্রীনিকেতন-শিক্ষাসত্রের ছাত্রদের হাতের কাজের নমুনা প্রেরিত হয়।

এই অধিবেশনের সঙ্গেই নব শিক্ষাসংঘের ভারতীয় শাখার সম্মেলন আহূত হইয়াছে। এই আন্তর্জাতিক শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস লিপিবদ্ধ করা প্রয়োজন, কারণ ভারতীয় শাখার সভাপতি রবীন্দ্রনাথ ও ইহার দুই জন সম্পাদক শান্তিনিকেতনের অধ্যাপক—ধীরেন্দ্রমোহন সেন ও অনিলকুমার চন্দ।

বিংশ শতকের শুরু হইতে ও বিশেষভাবে প্রথম মহাযুদ্ধের পর হইতে সভ্য জগতের সর্বত্রই শিক্ষা সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে একদল লোক সজাগ হইয়া উঠেন। আমেরিকায় জন্ ডিউই ও ভারতে রবীন্দ্রনাথ নবশিক্ষাবিধি প্রবর্তনের গুরু। পশ্চিমে ডিউই Progressive Education-এর জনক; তাঁহার শিষ্য ও সহকর্মী কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষণ কলেজের অধ্যাপক কিলপ্যাটিক ইহার অন্যতম প্রচারক। প্রসঙ্গত বলিতে পারি, ১৯২৬ সালে কিলপ্যাট্রিক ভারত ভ্রমণে আসিয়া শান্তিনিকেতন দেখিয়া যান এবং তথাকার শিক্ষাবিধি দেখিয়া মুগ্ধ হন। আমেরিকায় এই দুই শিক্ষাশাস্ত্রীর চেষ্টায় Progressive শিক্ষাবিধির সম্বন্ধে লোকে সচেতন হইয়া উঠে, ইংলন্ডে এবং অন্যত্রও শিক্ষা সংস্কারের জন্য মনীষী ও মনস্বিনীর অভাব হয় নাই। প্রথম মহাযুদ্ধের দুই বৎসর পরে (১৯২১) ফ্রান্সে ক্যালে (Calais) নগরীতে নবশিক্ষার ভাবুক দলের প্রথম সম্মেলন হয়। লনডনের স্কুল-ইন্‌স্‌পেকট্রেস শ্রীমতী

১ V. B. News. 1936 Feb. p 62.

২ Annual Report, Visvabharati 1930, p 25. Non-official visitors-এর তালিকা দ্রষ্টব্য।

বিএট্রিস্ এসনোর (Esnor)-এর উৎসাহে New Eduction Fellowship[১] নামে সংঘ গঠিত হইল। এই আন্তর্জাতিক সংঘের প্রথম অধিবেশন হয় সুইস দেশের Montreux শহরে। অতঃপর হাইডেলবার্গ (১৯২৫), লোকার্নো (১৯২৭), এলসিনোর (১৯৩০), নিস্ (১৯৩৩), চেলটেনহাম (১৯৩৬)-এ সম্মেলন বসে। এলসিনোর-এর অধিবেশনে রবীন্দ্রনাথ উপস্থিত হইয়াছিলেন (দ্র র-জী ৩য় পৃ ২৮০)। এই নবশিক্ষা সংঘের শাখা নানা দেশে ইতিপূর্বে গঠিত হইয়াছিল, ভারতে প্রতিষ্ঠিত হইল এই বৎসরে।

শিক্ষা-সপ্তাহের[২] আঙ্গিক রূপেই নব শিক্ষসংঘের সম্মেলন আহূত হয়। এই যৌথ সম্মেলনের ব্যবস্থায় প্রথম দিন কবি 'শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে সংগীতের স্থান' ও শেষ দিন 'শিক্ষার স্বাঙ্গীকরণ' নামে প্রবন্ধ পাঠ করেন।[৩] শেষ প্রবন্ধ পাঠের দিন সিনেট হলে রবীন্দ্রনাথকে দেখিবার জন্য জনতার যে আগ্রহ দেখিয়াছিলাম, তাহা বর্ণনা করা কঠিন।

শিক্ষার মধ্যে সংগীতের স্থান আজ দেশ মানিয়া লইয়াছে ; কিন্তু আলোচ্যপর্বে তখনো শিক্ষাশাস্ত্রী ও শিক্ষা-বিভাগের অধিকর্তাগণ এ তত্ত্বটিকে অন্তর হইতে গ্রহণ করিতে পারেন নাই। রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাস অতঃপর "শিক্ষা-বিভাগ কলা-বিদ্যার সম্মানকে শিক্ষিত মনে স্বাভাবিক ক'রে দেবেন।"

দ্বিতীয় ভাষণ বা শিক্ষার স্বাঙ্গীকরণ প্রবন্ধে নূতন কথা কিছু ছিল না। গত অর্ধশতাব্দী ধরিয়া বাংলার মাধ্যমে শিক্ষা প্রচার ও প্রসারের জন্য কবি যে যুক্তি দিয়া আসিতেছেন, এবারও তাহাই বলিলেন—তবে বলিবার ভাষা ও ভঙ্গীই ছিল নূতন। কবি এখানে একটি কথা স্পষ্ট করিয়া বলিলেন,—য়ুরোপের ন্যায় ভারতও বহু ভাষাভাষীর দেশ ; রাজনৈতিক মিলনের অভিপ্রায়ে সেইসব ভাষাকে সংকুচিত করিয়া অন্য কোনো ভাষার মাধ্যমে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান-বিজ্ঞান বণ্টনের চেষ্টা ব্যর্থ হইবে। যেখানে ভেদ সুস্পষ্ট, সেখানে তাহাকে স্বীকার করিয়া লইয়া মিলনের পথ আবিষ্কার করিতে হইবে ; এই জন্যই রবীন্দ্রনাথ প্রত্যেক প্রাদেশিক ভাষাকে পূর্ণ বিকাশের সুযোগ দেওয়ার পক্ষপাতী ছিলেন।

১ "Founded in 1921,...the New Education Fellowship had operated internationally for the furtherance of progressive education in every part of the world.

"...Europe's leading Progressives found it desirable to band together, and for this purpose they organised in 1921 the *Ligue internationale pour l' education nouvelle* at Calais. The new organization was international with many branches in many countries,...In England the society. became the New Education fellowship. Its first president was Beatrice Esnor, school-inspectress at London."—Meyer, Development of Education in the Twentieth century. p 108.

২ Proceedings of the Bengal Education Week, 1936, Edited by Dr. Muhammad Qudrat-i-Khuda Calcutta 1636. শান্তিনিকেতন হইতে নিম্নলিখিত বক্তৃতাগুলি প্রদত্ত হয়—রবীন্দ্রনাথ, Ideals of Education পৃ ৭৮। রবীন্দ্রনাথ, শিক্ষার স্বাঙ্গীকরণ পৃ ৮৪। রবীন্দ্রনাথ, শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে সংগীতের স্থান পৃ ৪১৫। ডক্টর প্রেমচাঁদ লাল, Rural Education পৃ ২০৭। ডক্টর ধীরেন্দ্রমোহন সেন, Extra curriculum work in Schools and Colleges পৃ ২২৯। তনয়েন্দ্রনাথ ঘোষ, Freedom and Discipline পৃ ৪০২। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, স্কুল-লাইব্রেরি পৃ ৩২৮। ক্ষিতিমোহন সেন, শিক্ষার স্বদেশী রূপ পৃ ৪১২। নন্দলাল বসু, শিক্ষাক্ষেত্রে শিল্পের স্থান পৃ ৪২০।

৩ Education Naturalised. V. B. Bulletin No. 20. শিক্ষার ধারা : The New Education Fellowship Santiniketan, Bengal. প্রকাশক—শ্রীধীরেন্দ্রমোহন সেন এম, এ, পি-এইচ-ডি। সেক্রেটারী নিউ এডুকেশন ফেলোশিপ্। বঙ্গীয় শাখা—শান্তিনিকেতন, (বীরভূম)। প্রথম সংস্করণ— ভাদ্র ১৩৪৩ সাল পৃ ৮৯। সূচী—১। শিক্ষার স্বাঙ্গীকরণ : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ২। শিক্ষার স্বদেশী রূপ : ক্ষিতিমোহন সেন ৩। শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে সংগীতের স্থান : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ৪। শিক্ষাক্ষেত্রে শিল্পের স্থান : নন্দলাল বসু ৫। আশ্রমের শিক্ষা : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর [এই প্রবন্ধটি প্রবাসী ১৩৪২ আষাঢ়ে প্রকাশিত হয়]

এই শিক্ষাসপ্তাহে রবীন্দ্রনাথ ইংরেজিতে এক ভাষণ প্রদান করেন[১]। বিশ্বভারতী কেন স্থাপন করেন ও উহার অন্তর্নিহিত বাণী কী, তাহাই ছিল বক্তৃতার মর্মকথা; প্রসঙ্গত শিক্ষা ও সংস্কৃতির কথা আসিয়াছে এবং তাহারই অনুক্রমণে গান্ধীজি সম্বন্ধে তাঁহার মত ব্যক্ত করেন। কবি যাহা বলিয়াছেন তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল।

"We have been waiting for the Person. Such a personality as we see in Mahatma Gandhi. It is only possible in the East for such a man to find recognition. This man has neither physical nor material power, but his humanity reveals itself in its simple majesty and invokes within us a strong assurance of Man the indomitable: and the people downtrodden for centuries, their backs bent down under loads of indignity suddenly stand up ready to suffer, and through suffering, conquer.

"Not an association, not an organisation, not a politician, but a Man! And his message goes deep into our veins. He attacks the enemies that are within us…The people believe in him.…

"When times are dark, there came a man in other days to people who needed salvation, emancipation from the fetters of materialism. He came to their door. The babe born in obscurity, brought exaltation to man.…And when all the machinery will be rusted, he will live.

"I have felt that the civilisation of the West today has its law and order, but no personality. It has come to the perfection of a mechanical order but what is there to humanize it! It is the person who is in the heart of all beings. We have seen, we have known him within us, in the depth of our consciousness. Only when West comes to him will there be peace. And I who belong to an unrecognized corner of the world have been cherishing the hope for long years that Visva-Bharati will find voice to proclaim that peace is not waiting to be concocted out of their cleverness by men who do not believe in it, to be constructed through political manoeuvering performed by nations boasting of their power, but peace can only be realised in the spiritual revelation of man whose inexhaustible wealth is in his own fulfilment."[২]

বঙ্গের শিক্ষাসপ্তাহে রবীন্দ্রনাথ যে প্রবন্ধ (শিক্ষার স্বাঙ্গীকরণ) পাঠ করেন, তাহা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়; প্রবন্ধটির শেষপৃষ্ঠায় একটি 'পুনশ্চ' আছে। তাহার দ্বিতীয় প্রস্তাবটি হইতে নিম্নে আমরা কয়েকটি পংক্তি উদ্ধৃত করিলাম; প্রস্তাবটি কবি বাংলার শিক্ষা-মন্ত্রীকে পাঠাইয়া দেন। প্রস্তাবটি এই:

"দেশের যে-সকল পুরুষ ও স্ত্রীলোকেরা নানা কারণে বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভের সুযোগ থেকে বঞ্চিত, তাদের জন্যে ছোটোবড়ো প্রাদেশিক শহরগুলিতে যদি পরীক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করা যায় তবে অনেকেই অবসরমতো ঘরে বসে নিজেকে

১ সভায় কলিকাতার Lord Bishop and Metropoliton of India সভাপতি ছিলেন। V. B. News. 1936 Feb. p 68.

২ Proceedings of the Bengal Education Week, 1936. p 78-88. The ideal of Visvabharati: Address by Dr. Rabindranath Tagore.

শিক্ষিত করতে উৎসাহিত হবে। নিম্নতন থেকে উচ্চতন পর্ব পর্যন্ত তাদের পাঠ্যবিষয় নির্দিষ্ট করে তাদের পাঠ্যপুস্তক বেঁধে দিলে সুবিহিতভাবে তাদের শিক্ষা নিয়ন্ত্রিত হতে পারবে। এই পরীক্ষার যোগে যে-সকল উপাধির অধিকার পাওয়া যাবে, সমাজের দিক থেকে তার সম্মান ও জীবিকার দিক থেকে তার প্রয়োজনীয়তার মূল্য আছে। তাই আশা করা যায়, দেশব্যাপী পরীক্ষার্থীর দেয় অর্থ থেকে অনায়াসে এর ব্যয় নির্বাহ হবে। এই উপলক্ষে পাঠ্যপুস্তক রচনার ক্ষেত্র প্রসারিত হয়ে জনসাধারণের মধ্যে বিদ্যা বিস্তারের উপাদান বেড়ে যাবে এবং এতে করে বিস্তর লেখকের জীবিকার উপায় নির্ধারিত হবে। একদা বিশ্বভারতী থেকে এই কর্তব্য গ্রহণ করবার সংকল্প মনে উদয় হয়েছিল কিন্তু দরিদ্রের মনোরথ মনের বাইরে অচল। তাছাড়া রাজসরকারের উপাধিই জীবনযাত্রার কর্ণধার।"[১]

শিক্ষাসপ্তাহের ভাষণে রবীন্দ্রনাথ যে প্রস্তাব[২] পেশ করেন অর্থাৎ বাংলাভাষার মাধ্যমে যে সকল জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রচারিত হইবে—এই প্রস্তাব বাংলার লীগ্ গবর্মেণ্ট সর্বান্তঃ করণে অনুমোদন ও গ্রহণ করিতে পারিলেন না। তবে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এ বিষয়ে কিছুটা উৎসাহ দেখাইলেন; শ্যামাপ্রসাদ তখন ভাইস-চানসেলর। বিশ্ববিদ্যালয়ের লোকশিক্ষা গ্রন্থমালায় রবীন্দ্রনাথের 'বাংলাভাষা পরিচয়' নামে গ্রন্থ প্রকাশিত হইল। দুঃখের বিষয় এই 'লোকশিক্ষা' গ্রন্থমালায় খুব বেশি বই বাহির হয় নাই।

বাংলায় গ্রন্থ রচনার প্রধান অন্তরায় তাহার পরিভাষার দীনতা; এই বিষয়ে এই সময়ে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বানান সংস্কার এবং বৈজ্ঞানিক পারিভাষিক শব্দ সংকলন করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছিলেন; রবীন্দ্রনাথ উভয়টিতেই অংশ গ্রহণ করেন।[৩]

কলিকাতায় নবশিক্ষা সংঘের সভায় বক্তৃতাদি শেষ করিয়া কবি শান্তিনিকেতনে ফিরিলেন; পথে অল্প সময়ের জন্য বর্ধমানের উকিল ও ধনিকোত্তম দেবীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের আতিথ্য গ্রহণ করেন। অপরাহ্নে বর্ধমানের মহারাজ উদয়চাঁদ প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিরা এক সভায় কবি সংবর্ধনা করিলেন। বর্ধমানে কবির এই প্রথম ও শেষ সংবর্ধনা।[৪]

বসন্তকাল; কিন্তু ঋতুরাজ এবার যেন কবিচিত্তকে উদ্বুদ্ধ করিতেছে না। 'দেহাতীত' কবিতা (৭ নভেম্বর ১৯৩৫) লিখিবার পর প্রায় তিন মাস গিয়াছে কাব্যশ্রীর সহিত কচিৎ সাক্ষাৎ হয়; তাই বসন্ত সমাগমে বড়ো দুঃখে বলিতেছেন—

একদিন আপন হাতে আমার চোখে বিছিয়েছিলে বিহ্বলতা,
রক্তে দিয়েছিলে দোল,
চিত্ত ভরেছিল নেশায়, হে আমার সাকী,
পাত্র উজাড় ক'রে
জাদুরসধারা আজ ঢেলে দিয়েছ ধুলায়।
আজ উপেক্ষা করেছ আমার স্তুতিকে
আমার দুই চক্ষুর বিস্ময়কে ডাক দিতে ভুলে গেলে;
আজ তোমার সাজের মধ্যে কোনো আকুতি নেই।…
একদিন নিজেকে নূতন নূতন ক'রে সৃষ্টি করেছিলে মায়াবিনী,
আমারি ভালোলাগার রঙে রঙিয়ে।
আজ তারি উপর তুমি টেনে দিলে
যুগান্তের কালো যবনিকা
বর্ণহীন, ভাষাবিহীন।[৫]

১ প্রবাসী ১৩৪৩ বৈশাখ পৃ ১৪৩-৪৪।

২ রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় লিখিতেছেন যে ১৩২৪ সালে (প্রবাসী, শ্রাবণ) এই ভাবনা রবীন্দ্রনাথের মনে প্রথম উদয় হয়। পাটনার অধ্যাপক যদুনাথ সরকারের উপর কাজের ভার পড়ে।—প্রবাসী ১৩৪৩ কার্তিক। কবির তিরোধানের দুই বৎসর পর বিশ্বভারতী প্রকাশন বিভাগ 'বিশ্ববিদ্যা-সংগ্রহ' নামে গ্রন্থমালা প্রকাশের ব্যবস্থা করেন।

৩ দ্রষ্টব্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত 'বাংলা বানানের নিয়ম' পুস্তিকায় শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় লিখিত ভূমিকা, ৮ মে ১৯৩৬।

৪ দেবীপ্রসন্ন বাবু বিশ্বভারতীর জন্য কবিকে পাঁচ শত টাকা দান করেন। Annual Report, Visva-Bharati, 1936. p 89.

৫ উদাসীন, ১৬ ফেব্রু ১৯৩৬। ৩ ফাল্গুন ১৩৪২। পত্রপুট ১১।

নৃত্যনাট্য চিত্রাঙ্গদা

পাঠকের স্মরণ আছে, গত কয়েক বৎসর হইতে শান্তিনিকেতনে নৃত্যের বহুবিধ পরীক্ষা হইতেছে। অবশেষে কবি বুঝিলেন, নাট্যকাব্যই নৃত্যনাট্য হইবার পক্ষে সর্বতোভাবে উপযুক্ত; শিশুতীর্থ ও শাপমোচনে নৃত্যনাট্যের শ্রেষ্ঠরূপ প্রকাশ পায় নাই, কারণ উভয় ক্ষেত্রেই নাটকীয় বিষয়বস্তুর বিস্তার ছিল সংকীর্ণ। তাই এবার নৃত্যছন্দে সংগীতকে রূপ দিবার জন্য তিনি 'চিত্রাঙ্গদা' নাট্যকাব্যকে নৃত্যনাট্যে রূপায়িত করিলেন। বোধ হয় সাতদিনের মধ্যে এইটি লিখিত হয় (১৯৩৬ ফেব্রু ২১। ১৩৪২ ফাল্গুন ৮)।

স্থির হইল কলিকাতায় 'নৃত্যনাট্য চিত্রাঙ্গদা'র অভিনয় হইবে। তজ্জন্য মহড়া চলিতে লাগিল; মহড়ার সময় ছোটোখাটো কত যে পরিবর্তন হইতে লাগিল, তাহার হিসাব নাই; স্রষ্টা ও শিল্পীর (artist ও technician) যুগ্মরূপের সাধনায় নৃত্যনাট্য রচিত হইয়া চলিল। অভিনয়কে সুন্দর করিবার জন্য রূপদক্ষ রবীন্দ্রনাথের অশেষ দান সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন। আশা করি ভবিষ্যতে কোনো কৃতিমান এই গবেষণা কার্য করিবেন।

চিত্রাঙ্গদা গীতময় নৃত্যনাট্য, তবে ইহার কয়েকটি গান পুরাতন যেমন, 'ওরে ঝড় নেমে আয়', 'বধূ কোন্ আলো (মায়া) লাগল চোখে', 'সন্ন্যাসের (সংকোচের) বিহ্বলতা', 'এস এস বসন্ত ধরাতলে'। এছাড়া 'কেটেছে একেলা বিরহের বেলা' গানটি কয়েকদিন পূর্বে রচিত বলিয়া শোনা যায়। কবির স্বহস্ত লিখিত আশীর্বাদ পত্রে লিখিত আছে— "কল্যাণীয়া শ্রীমতী রেণুর সঙ্গে শ্রীযুক্ত প্রভাতচন্দ্র গুপ্তের শুভপরিণয় উপলক্ষ্যে উৎসর্গ-করা গান।" প্রভাতচন্দ্র গুপ্ত ২৪-১২-৫৩ তারিখে লেখককে লিখিতেছেন, "আমাদের আশীর্বাদ দেওয়ার উদ্দেশ্যেই গানটি রচনা করেছিলেন আমাদের বিয়ের তারিখেই, অর্থাৎ, ৫ই মাঘ ১৩৪২।" তবে, শান্তিদেব লিখিতেছেন, "চিত্রাঙ্গদা রচিত হবার কয়েক বৎসর পূর্বে 'সেদিন দুজনে' গানের সঙ্গে একটি যুগ্মনৃত্য রচনা করা হয়। গানের সঙ্গে নাচটি বেশ মানিয়েছিল। এই নাচটি চিত্রাঙ্গদায় রাখবার জন্য যখন প্রস্তাব এলো, তখন গুরুদেব 'চিত্রাঙ্গদা'র সঙ্গে কথা মিলিয়ে 'কেটেছে একেলা' গানটি লিখলেন।" (রবীন্দ্রসংগীত পৃ ২৩৬)

কবির আজিকার এই অনুভূতির কী সংজ্ঞা দিব? মানসিক না বৈ-দেহিক? এ যেন সেই শক্তি, যাহার মধ্যে আলো আছে, তাপ নাই,—তেজ আছে দাহ নাই। বার্ধক্যে যৌবনের প্রেমকে মানসিকভাবে অনুভব করার মধ্যে অসাধারণত্ব নিশ্চয়ই আছে। আপনার শুষ্ক মনের উপর যৌবনের প্রেমলীলার তরঙ্গ উচ্ছলিত করিয়া, তাহাকে উপভোগ করিবার দৃষ্টান্ত কবিজীবনে অসংখ্য,—'মহুয়া' শেষ বয়সের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।

'নৃত্যনাট্য চিত্রাঙ্গদা' লিখিয়া অভিনয়ের জন্য প্রস্তুত করিলেন; অথবা বলিতে পারি নৃত্যের সঙ্গে সুরের সঙ্গে সংগতি রক্ষা করিয়া অভিনয়ের জন্যই পুরাতন নাট্যকাব্যখানিকে নৃত্যনাট্যে নূতন রূপ দান করিলেন। মূল নাট্যকাব্য লিখিবার সময় মন ছিল ভাব, ভাষা ও ছন্দের 'পরে নিবিষ্ট—অপরূপ সে সৃষ্টি। চিত্রাঙ্গার অভিনয় বিশেষভাবেই উল্লেখ-যোগ্য।

যুগের পরিবর্তন হইয়াছে। শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মচর্যাশ্রম পর্বে অর্থাৎ কবির বিলাত যাইবার পূর্বে, 'কথা ও কাহিনী'র 'পরিশোধ' ও নাট্যকাব্যের 'চিত্রাঙ্গদা' ছাত্ররা পড়িতে পারিত না। সেইজন্য ছেলেদের বই-এর ঐ অংশগুলি অধ্যাপকরা সেলাই করিয়া দিতেন। মাঝে 'কথা ও কাহিনী'র এক সংস্করণে 'পরিশোধ' কবিতার পরিবর্তে 'ভাষা ও ছন্দ' কবিতা সংযোজিত হয়; এইটি ঘটে বিশ্বভারতী প্রকাশন বিভাগের আদিপর্বে। এই সব ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথের প্রত্যক্ষ যোগ না থাকিলেও তাঁহার অজ্ঞাতে যে এ-সব হইত তাহাও নহে।

পূর্বেই বলা হইয়াছে শান্তিনিকেতনে এমন একদিন ছিল, যখন পৌষের একদিনের সামান্য মেলায় আশ্রমের মেয়েরা যাইতে পাইত না। শান্তিনিকেতনের অতিথিশালার দ্বিতল গৃহে 'লক্ষ্মীর পরীক্ষা' নাটিকায় মেয়েরা অভিনয় করে, কোনো অধ্যাপক বা ছাত্র দেখিতে যাইতে পায় নাই। এখন রুচি ও দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন সর্বত্র সুস্পষ্ট। নহিলে সেই শান্তিনিকেতনে ছাত্রছাত্রী অধ্যাপকে মিলিতভাবে চিত্রাঙ্গদা, পরিশোধের (শ্যামা) অভিনয় করা সম্ভব হইত না। এখানে একটি কথা স্পষ্ট করিয়া বলা যাইতে পারে। জীবন-দর্শন সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের কোনো প্রকার obscurantist মনোভাব ছিল না, সমাজ-জীবনের অনিবার্য পরিবর্তনকে সহজ প্রাকৃতিক অভিব্যক্তি রূপেই তিনি গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার জীবন একদিকে যেমন গভীর আধ্যাত্মিক হইতে ছিল, তেমনই বাহিরের দিকে unconventional ও secular হইয়া বিস্তৃতক্ষেত্রে বিচিত্রভাবে রূপ লইতেছিল। তা না হইলে 'ল্যাবরেটরি' লিখিতে পারিতেন না, 'জন্মদিনে'র পাশাপাশি।

চিত্রাঙ্গদা অভিনয়ের মহড়া চলিতেছে, কবির সম্মুখেই রিহর্শল হয়। শন্তিনিকেতনের বিচিত্র কাজ চলিতেছে যুগপৎ, সমস্তের সঙ্গেই কবির অক্ষুণ্ণ যোগ। এই সময়ে বিশ্বভারতীর বিদ্যাভবনের আহ্বানে আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মহম্মদ হবীব 'সুফিবাদ' সম্বন্ধে বক্তৃতা করিতে আসেন। কবি একদিন সভায় উপস্থিত হন (১৯:৬ ফেব্রু ২৮)। শ্রীনিকেতন ও New Education Fellowship-এর যৌথ ব্যবস্থায় বোলপুর ও ইলামবাজার থানার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সম্মেলন আহূত হয়। একদিন সন্ধ্যায় কবির নিকট তাঁহারা উপস্থিত হইলে তিনি তাঁহাদের দায়িত্ব সম্বন্ধে সংক্ষেপে বলেন। কথা প্রসঙ্গে তিনি সোভিএট রুশিয়ার কথা উত্থাপন করেন।[১]

শান্তিনিকেতনে বসন্তোৎসব বা হোলি প্রতিবৎসর অতি সুন্দরভাবে নিষ্পন্ন হয়; এখানকার এই উৎসব যাঁহারা দেখিয়াছেন, তাঁহারা অবশ্যই লক্ষ্য করিয়াছেন যে সৌন্দর্য ও শালীনতা রক্ষা করিয়া এই দিনে পরিপূর্ণ আনন্দ উপভোগ করা যায়। ৮ মার্চ (১৯৩৬) দোলের দিন জবহরলাল নেহেরুর পত্নী কমলা নেহেরুর মৃত্যু-সংবাদ আসিলে মন্দিরে কবি উপাসনা করেন। এই ঘটনা উপলক্ষে তিনি জবহরলাল সম্বন্ধে যে কথা বলিয়াছিলেন, তাহা বিশেষভাবে স্মরণীয়।[২] কবি বলেন, 'আজ হোলির দিন, আজ সমস্ত ভারতে বসন্তোৎসব। চারিদিকে শুষ্ক পত্র ঝরে পড়বে তার মধ্যে নব কিশলয়ের অভিনন্দন। আজ জরাবিজয়ী নূতন প্রাণের অভ্যর্থনা জলে স্থলে আকাশে। এই উৎসবের সঙ্গে আমাদের দেশের নবজীবনের উৎসবকে মিলিয়ে দেখতে চাই। আজ অনুভব করব যুগসন্ধির নির্মম শীতের দিন শেষ হল, এল নবযুগের ঋতুরাজ জবহরলাল। আর আছেন বসন্তলক্ষ্মী কমলা তাঁর সঙ্গে অদৃশ্য সত্তায় সম্মিলিত। তাঁদের সমস্ত জীবন দিয়ে ভারতে যে বসন্ত সমাগম তাঁরা ঘোষণা করেছেন, সে তো অনায়াস আরামের দিক দিয়ে করেন নি। সাংঘাতিক বিরুদ্ধতার প্রতিবাদের ভিতর দিয়েই তাঁরা দেশের শুভ সূচনা করেছেন। এই জন্যে আমাদের আশ্রমে এই বসন্তোৎসবের দিনকেই সেই সাধ্বীর স্মরণের দিন রূপে গ্রহণ করছি। তাঁরা আপন নির্ভীক বীর্যের দ্বারা ভারতে নবজীবনের বসন্তের প্রতীক।"

পরদিন অভিনয়ের দল লইয়া কবি কলিকাতায় গেলেন। এম্পায়ার থিএটরে পরপর তিন দিন 'চিত্রাঙ্গদা'র অভিনয় হইল (১৯৩৬ মার্চ ১১, ১২, ১৩)। সমসাময়িক Statesman ১৯৩৬ মার্চ ১৭ তারিখে চিত্রাঙ্গদা অভিনয় সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন, "The form of the dance-drama 'Chitra,' makes it embarrasing to label it by a class-name. It is a ballet yet rebelling against its accepted conventions; it is a pageant of dances, yet its theme, dramatic elements and continuous 'story' carry it on a

১ V. B. News. 1986 March, p 71.

২ V. B. News. 1986 March, p 75-76. অনুবাদ সমসাময়িক দৈনিক, ১৩৪৩ ফাল্গুন ২৪।

plane higher than recitals of thematic dances; it is a drama, but the dialogue is reduced in a minimum, and its monuments are expressed not through events and happenings but through songs and dances.…

"One cannot leave out of the picture and relegate below the foot-lights—the musicians who offer such valuable co-oparation to the dancers and the actors. Their musical threads help to hold the bits of fragrances in their places and sew them into a garland of colour, song and gestures. The orchestra represented by a single Esraj and some cymbals and with a variegated group of voices, are skilfully selected, the voice of the leading lady providing the 'high lights'.

"A word of commendation is due to the designer of the costumes. He borrows ideas from the repertories of the continental Asiatic stage from the Javanese and Cambodian dancers, from the Burmese Pwe, as well as the Indian nautch girl and exploits old models with effctive innovations.

"In the style of the dances which make up the warp and woof of the play, the same tendency was apparent. The production has the dash and colour of the ballet, the piquancy of a drama, the fragnance of a lyric, the symbolism of a Tibetan mystery-play, and the pageantry of lavishly staged dance-recitals." (Quoted from V. B. News. 1936 April, p 74)

অভিনয় আরম্ভ হইবার পূর্বে 'চিত্রাঙ্গদা নৃত্যনাট্যে'র মর্মকথাটি রবীন্দ্রনাথ নিম্নলিখিত রূপে ব্যক্ত করেন :

প্রভাতের প্রথম আভাস অরুণ বর্ণ আভার আবরণে,
অর্ধলুপ্ত চক্ষুর 'পরে লাগে তারি আঘাত।
অবশেষে সেই আবরণ ভেদ ক'রে সে আপন নিরঞ্জন শুভ্রতায়
সমুজ্জ্বল হয়ে ওঠে জাগ্রত জগতে,
তেমনি সত্যের প্রথম আবির্ভাব সাজসজ্জার বহিরঙ্গে বর্ণ বৈচিত্র্যে,
তাই দিয়ে অসংস্কৃত চিত্তকে সে করে মুগ্ধ।
অবশেষে নিজের সেই আচ্ছাদন যখন সে মোচন করে
তখন প্রবুদ্ধ মনের কাছে নির্মল মহিমায় তার বিকাশ।
এই কথাটিই চিত্রাঙ্গদা নাট্যের মর্মকথা।
এই নাট্যকাহিনীর মধ্যে আছে, প্রথমে প্রেমের বন্ধন মোহাবেশে,
পরে তার মুক্তি সেই কুহক হতে
নিরলংকার সত্যের সহজ মহিমায়।[১]

১ দ্র প্রবাসী ১৩৪২ চৈত্র পৃ ৮৮৯। শান্তিনিকেতনের ছাত্রছাত্রীগণ কর্তৃক 'চিত্রাঙ্গদা' নৃত্যনাট্য অভিনয় [সচিত্র]।

বাংলা সাময়িক সাহিত্যে একদিন 'চিত্রাঙ্গদা' অশ্লীল রচনা বলিয়া অপাংক্তেয় ছিল। লোকের রুচির পরিবর্তন হইয়াছে। এই নৃত্যনাট্যের উপর অধ্যাপক ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় যে দীর্ঘ সমালোচনা করিয়াছেন, তাহা প্রত্যেক রবীন্দ্রসাহিত্যামোদীর পাঠ করা আবশ্যক। তিনি আলোচনার এক স্থলে বলিতেছেন, "রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা সর্বতোমুখী, তাই তাঁর সৃষ্টিকে স্থাপত্য বলতে ইচ্ছা হয়—যেখানে মন্দিরের সঙ্গে পরিবেশের মিলন অঙ্গাঙ্গী, যার মধ্যকার ভাস্কর্য স্থাপত্যের অন্তরঙ্গ, যার দেওয়ালের চিত্র ভাস্কর্যের অনুরূপ, যার পূজারি, উপাসক সম্প্রদায়ের গঠন, আচার-ব্যবহার, গতিভঙ্গিটিও অত্যন্ত সুসদৃশ, যার নৃত্য গীত যেন সেই মন্দিরের পাথরগলা স্রোত, যার নৃত্য নিষ্ঠাচারের অঙ্গ। কল্পনা-কৈবল্যর জন্যই চিত্রাঙ্গদা নৃত্য-নাট্য একটি শ্রেষ্ঠ কীর্তি।" (কথা ও সুর পৃ ৮৭) গ্রন্থের অধিকাংশই গান এবং সে গান নাচের উপযোগী করিয়াই রচিত; সেইজন্য ভূমিকায় কবি লেখেন, "একথা মনে রাখা কর্তব্য যে, এই জাতীয় রচনায় স্বভাবতই সুর ভাষাকে বহু দূর অতিক্রম ক'রে থাকে, এই কারণে সুরের সঙ্গ না পেলে এর বাক্য এবং ছন্দ পঙ্গু হয়ে থাকে। কাব্য আবৃত্তির আদর্শে এই শ্রেণীর রচনা বিচার্য নয়। যে প্রাণীর প্রধান বাহন পাখা, মাটির উপর চলার সময় তার অপটুতা অনেক সময় হাস্যকর বোধ হয়।"

কবিতা বা ছন্দোবদ্ধ পদ্য চিরদিনই 'গীত' (গাথা) হইয়া আসিয়াছে, কি এদেশে, কি বিদেশে কবিতা যন্ত্রাদি সংযোগে গীত হইলে তাহা হয় 'সংগীত'। সংগীত সহজেই মনে ছন্দের দোলা ও দেহে নৃত্যের আবেগ আনে। মানবের আদিযুগ হইতে সংগীত ও নৃত্য যমজের ন্যায় সমাজের মধ্যে লালিত হইয়া আসিতেছে। কিন্তু নৃত্য, সংগীত ও সংলাপপূর্ণ অভিনয়ের ত্রিধারা সংযোগে যে রস সৃষ্টি হইতে পারে তাহার পরীক্ষা বাংলায় করিলেন রবীন্দ্রনাথ। চিত্রাঙ্গদা নৃত্যনাট্যে সমস্ত রস সমভাবে বণ্টিত হইয়াছে কি না, তাহার বিচারক সুরশিল্পী ও রূপদক্ষরা। তবে সংক্ষেপে এই কথাটি বলা যাইতে পারে যে, নাটকীয় ঘটনায় স্বচ্ছন্দগতি রক্ষার জন্য কবিকে এমন সব বস্তুর আমদানি করিতে হইয়াছে, যাহা হয়তো এই নাটকের অঙ্গ নহে। নৃত্যনাট্য চিত্রাঙ্গদা বিষয়ে দুই-একজন সমালোচকের মত এই যে, "কোনো কোনো স্থানে নাটকের গতি সম্পূর্ণ অব্যাহত থাকে নি, হয় বাধাপ্রাপ্ত, নয় গতি মন্থর হয়েছে।" কেন এইটি ঘটিয়াছে সে বিষয়ে শান্তিদেবের মত এই যে, "চিত্রাঙ্গদা ও তৎশ্রেণীর নাটকগুলি সব সময়েই নাচের তাগিদে লেখা"। তিনি বলেন, "অনেক সময়ে এইসব নাটকের কতক অংশ কেবলমাত্র নাচের প্রয়োজনে লিখিত, মহড়ার সময় এখানে সেখানে নতুন কথা সংযোজিত হয়। রঙ্গমঞ্চে অভিনয়ের সময় বাড়াবার জন্যেও এখানে সেখানে তিনি গান জুড়েছেন। সাজবদলের জন্যে সময়ের দরকার, তখনো গান বসিয়েছেন। তা ছাড়া 'চিত্রাঙ্গদা'তে এমন কতকগুলি নাচ আছে, যা এটির বহুপূর্বে রচিত। সেগুলি তখনকার যুগে শান্তিনিকেতনে ভালো নাচ হিসেবে পরিচিত ছিল। কেবলমাত্র ভালো নাচ বলে 'চিত্রাঙ্গদা'য় যখন সেগুলি রাখার কথা হয়, তখন তিনি তাতে আপত্তি করেন নি, কিন্তু নাটকের যে যে জায়গায় সেগুলিকে বসান হয়েছে, তার সঙ্গে মিলিয়ে গানের কথা বদলে দিয়েছেন, যাতে ভারসাম্য থাকে। সুর ও ছন্দ বদলে তিনি হাত দেন নি। 'চিত্রাঙ্গদা'য় এই ধরনের গান ও নাচ অনেক বসেছে।" (রবীন্দ্রসংগীত পৃ ২৬৮)

রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক অনুমোদিত 'চিত্রাঙ্গদা নৃত্যনাট্য' প্রবন্ধে প্রতিমাদেবী (প্রবাসী ১৩৪৩ চৈত্র) যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা কবির মত ও বিশ্লেষণ রূপেই উদ্ধৃত করা যাইতে পারে।

"চিত্রাঙ্গদা সম্বন্ধে আলোচনার সময় মনে রাখতে হবে নৃত্যনাট্যে কলা কৌশল কথার ভাষা নিয়ে কারবার করে না, তার ভাষা হল সুর ও তাল; ভাব খেলে তার দেহরেখায়। এই রেখার খেলা মাত্রেই ছবির বিষয় এসে পড়ে, তাই তার জন্যে পটভূমির দরকার হয় রঙ ও আলো। এই রঙ আলো ছাড়া নৃত্যকলার পরিপ্রেক্ষিত ফুটিয়ে তোলা শক্ত, বিশেষত, যখন সে নাটকীয় রাজ্যে গিয়ে পৌছয়। নাচেতে দেহের রেখা খুব নিখুঁত হওয়া চাই, কোথাও তার কোনো অবান্তর ভঙ্গী হলে তালের সঙ্গে ভঙ্গীর সংগতি রক্ষা করা দুরূহ ব্যাপার হয়ে পড়ে। রেখা ও তালের মিলন

ছাড়া নৃত্যকলা পূর্ণতা লাভ করতে পারে না। কবিতা ও গদ্যে যে তফাত, নৃত্যনাট্যের সঙ্গে বিশুদ্ধ নাটকের সেই রকমই পার্থক্য।" প্রতিমাদেবী এই প্রবন্ধে শান্তিনিকেতনে নৃত্য কিভাবে ধীরে ধীরে অভিব্যক্ত হয় তাহার ইতিহাস বলিয়াছেন। তিনি আরও লিখিয়াছেন যে, ভারতীয় নৃত্যকলার মণিপুরী ও দক্ষিণী শৈলী ছাড়া য়ুরোপের নৃত্যভঙ্গিও তিনি ইংলণ্ডে ডার্টিংটন হলে ভালোভাবেই দেখিবার সুযোগ পান; এবং সেটি 'চিত্রাঙ্গদা'র নৃত্য শিখাইবার সময় কাজে লাগে (প্রবাসী ১৩৪৩ চৈত্র পৃ ৭৯০)।

উত্তর-ভারতে শফর ও তারপরে

কলিকাতার চিত্রাঙ্গদার অভিনয় সর্ববিষয়ে সফল হইল। ইহার পর বিশ্বভারতীর কর্তৃপক্ষ স্থির করিলেন যে, উত্তর-ভারতের প্রধান প্রধান নগরে এই অভিনয় দেখানো হইবে; শান্তিনিকেতনের কলাচর্চার আদর্শ প্রচার ও বিশ্বভারতীর শূন্য তহবিল আংশিকভাবে পূর্ণ করা—এই শফরের উদ্দেশ্য।

কলিকাতায় অভিনয়ের পর একদিন মাত্র বিশ্রাম করিয়া রবীন্দ্রনাথ পঁচাত্তর বৎসর বয়সে অভিনয়ের বিরাট বাহিনী লইয়া উত্তর-ভারত যাত্রা করিলেন; ছাত্রছাত্রীদের পরিদর্শন করিবার জন্য যথোপযুক্ত লোক ছিলেন।

১৬ মার্চ কবি পাটনা পৌছিলেন। "The Poet was received by a large and enthusiastic, though unmanagable crowd on his arrival at the Patna station and practically every one of note was there to welcome him on behalf of the city."[১]

পাটনায় দুই রাত্রি অভিনয় হইল (১৯৩৬ মার্চ ১৬ ও ১৭)।[২] দ্বিতীয় দিন হুইলার হলে কবি-সংবর্ধনা। পাটনা হাইকোর্টের চীফ জাস্টিস সভাপতি। নাগরিকগণ কবির হস্তে বিশ্বভারতীর জন্য একটি টাকার তোড়া উপঢৌকন দেন; বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ সভায় উপস্থিত ছিলেন।

সেই রাত্রেই কবি ও তাঁহার সঙ্গীরা এলাহাবাদ যাত্রা করেন; সেখানে ১৯শে চিত্রাঙ্গদার অভিনয় হইল।[৩] পর দিন তাঁহাদের লাহোর যাত্রা করিতে হইল, সেখানে ২২ ও ২৩ মার্চ অভিনয়ের দিন ধার্য ছিল। লাহোরে দুই দিন থাকিয়া কবি দিল্লী ফিরিলেন (২৫ মার্চ)।

দিল্লী পৌছিবার দিন অপরাহ্ণেই লালা রঘুবীর সিংহের[৪] বাটীতে পার্টি; কবি ইতিপূর্বে রঘুবীর-পরিচালিত মডার্ন স্কুল-এর উপাসনা-গৃহের দ্বার উন্মোচন করিয়াছিলেন। পূর্বের ব্যবস্থামতো রিগ্যাল থিএটরে দুইদিন (মার্চ ২৬, ২৭) 'চিত্রাঙ্গদা' অভিনয় হয়।[৫] ইতিমধ্যে দিল্লীতে একটি কৌতুকপ্রদ ঘটনা ঘটিয়া যায়; দিল্লী মুনিসিপালিটির তরফ হইতে

১ Annual Report Visvabharati. 1936, p 6.

২ The Searchlight. Patna, 1936 March 18, Quoted in V. B. News, Vol. IV, 1936 May-June Birthday Number, p 63.

৩ The Leader. Allahabad, 1936 March 20.

৪ প্রায় ২৫ বৎসর পূর্বে পিয়ার্সন সাহেব এই রঘুবীরের গৃহশিক্ষক ছিলেন; পিয়ার্সন শান্তিনিকেতনে আসিবার জন্য ব্যাকুল হইলে রঘুবীরের পিতা সুলতান সিংহ পিয়ার্সনকে বলিয়াছিলেন, আপনি শান্তিনিকেতনকে সাহায্য করিতে চান অর্থ দিয়া করুন। কিন্তু পিয়ার্সন আশ্রমের জন্য আত্মত্যাগ করিতে চাহিয়াছিলেন—অর্থমাত্র নহে। সামান্য একশত টাকা বেতন লইয়া পিয়ার্সন আশ্রমের কাজ গ্রহণ করেন।

৫ The Statesman. Delhi, 1948 March 27.

কবিকে সংবর্ধনা করিবার প্রস্তাব উত্থাপিত হইলে সরকারী সাহেব চেয়ারম্যান আপত্তি করেন। ইহাতে কয়েকজন ভারতীয় সদস্য শ্রীমতী অরুণা আসফ আলি ও দেশবন্ধু গুপ্তের নেতৃত্বে সভাগৃহ ত্যাগ করিয়া যান ও কুইনস গার্ডেনে জনসভা করিয়া কবির সংবর্ধনা করেন। সভায় স্বাগত সম্ভাষণের প্রত্যুত্তরে কবি এই ঘটনাটির সংক্ষিপ্ত প্রচ্ছন্ন উল্লেখ করিয়া দিল্লীর নাগরিকগণকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিয়া বলেন, "In this busy season when numerous important functions crowd your days, you have against some obvious difficulties created the opportunity to receive me on behalf of the citizens of Delhi."[১]

কবি যেদিন দিল্লীতে পৌছিয়াছিলেন, সেইদিনই সন্ধ্যায় গান্ধীজি ও কস্তুরাবাঈ কবির সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসেন। গান্ধীজি[২] তাঁহার হস্তে ষাট হাজার টাকার একখানি চেক্ দিয়া বলেন যে, কবির যে-বয়স তাহাতে তাঁহার পক্ষে এভাবে অর্থের জন্য ঘুরিয়া বেড়ানো সমীচীন হইবে না; এই টাকায় বিশ্বভারতীর ঋণভার শোধ হইবে। এই অপ্রত্যাশিত দান মহাত্মাজির মারফত পাইয়া কবি যে কী পরিমাণ সুখী ও নিশ্চিন্ত হইলেন তাহা বলা যায় না।[৩] অভিনয়ের দল লইয়া অন্যান্য শহরে যাইবার যে-ব্যবস্থা হইয়াছিল, তাহা নাকচ করিয়া দেওয়া হইল; কেবল মিরাটে অভিনয়ের ও কবি সংবর্ধনার সকল ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হইয়াছিল বলিয়া সেখানে একদিনের জন্য কবিকে যাইতে হইল (১৯৩৬ মার্চ ২৯)।

মিরাট হইতে ফিরিবার পরদিন দিল্লীর হিন্দু-কলেজে কবির সংবর্ধনা হইল; সেইদিন অপরাহ্নে নয়াদিল্লীর বাঙালি সমাজ কবিকে এক উদ্যান-সম্মিলনীতে আপ্যায়িত করিলেন। সেই সন্ধ্যায় দিল্লী রেডিও স্টেশন হইতে কবি কয়েকটি আবৃত্তি করেন।

অতঃপর ১ এপ্রিল (১৯৩৬) কবি দিল্লী ত্যাগ করিয়া শান্তিনিকেতনে প্রত্যাবর্তন করিলেন। শান্তিনিকেতনে এক সপ্তাহ থাকিয়া কবি কলিকাতায় যান (৯ এপ্রিল); কিন্তু নববর্ষের (১৩৪৩। এপ্রিল ১৫) পূর্বেই আশ্রমে ফিরিয়া আসিলেন। সেইদিন হইতে আবার শুরু হইল গদ্যছন্দের কবিতা লেখা। নববর্ষের দিন লিখিলেন, 'বসেছি অপরাহ্নে পারের খেয়া ঘাটে'।[৪] এই কবিতাটিকে আমরা বলিতে পারি তাঁহার জন্মদিনের কবিতা। কারণ সেদিন আশ্রমে তাঁহার জন্মদিনের উৎসব প্রবর্তিত হয়। 'পঁচিশে বৈশাখ' গ্রীষ্মাবকাশের মধ্যে পড়ে বলিয়া এই বৎসর হইতে এই নববর্ষের দিন জন্মোৎসবের ব্যবস্থা হইল। নববর্ষের প্রাতে মন্দিরে কবি যে ভাষণ

১ সমগ্র ভাষণ দ্র Reply to the public address in Delhi. V. B. News. 1936 May-June, p 90-91.

২ কাগাওয়া জাপানের একজন বিখ্যাত জনহিতকর্মী ও শান্তিকামী। তিনি কয়েকবাস পূর্বে যখন ভারতবর্ষে আসেন, তখন গান্ধীজির সহিত দেখা করিতে গিয়াছিলেন। কথাপ্রসঙ্গে কাগাওয়া বলেন, বাংলাদেশে তিনি গোসাবা দেখিতে যাইবেন। গান্ধীজি প্রশ্ন করেন, শান্তিনিকেতন যাইবেন না? তিনি 'না' বলায়, মহাত্মাজি বলেন,—'গোসাবা গোসাবা, কিন্তু শান্তিনিকেতন ভারতবর্ষ' (Well, Gosaba is Gosaba, but Santiniketan is India)। (প্রবাসী ১৩৪৬ আষাঢ়, বিবিধ প্রসঙ্গ পৃ ৪২১-২২)

৩ "The donation of Rs,. 60,000 from an anonymous friend...relieved the Founder President of a havy constant source of anxiety and apprehension." "Mainly owing to this gift and the strict methods of economy in the working of the various department, we have been *able to clear off all our past accumulated debts* and have had pleasure of seeing the financial year end this September (1936) *without any deficit in the balance*". Annual Report, Visvabharati 1936. p 1. (*Italics* are ours)

৪ প্রবাসী ১৩৪৩ জ্যৈষ্ঠ। পত্রপুট ১২।

দান করিলেন (জন্মদিন, প্রবাসী ১৩৪৩ জ্যৈষ্ঠ) তাহার মধ্যে এই কবিতাটির মর্মকথা পাই, দুইটি রচনা পাশাপাশি পড়িলেই তাহা স্পষ্ট হইবে। পাঁচ বৎসর পরে মহামানবের আবাহন-সংগীতে যে বাণী নির্ঘোষিত হয়, তাহার আভাস পাই এই কবিতার মধ্যে। এই কবিতায় অনেক কথা, অনেক অভিযোগ, অনেক তত্ত্ব আছে—যাহাকে তিরস্কৃত করিলেন কয়েক দিন পরে লেখা 'শেষ মৌন' (১৩৪৩ বৈশাখ ৫) কবিতায় (পত্রপুট ১৮)।

কথার উপরে কথা চলেছ সাজিয়ে দিনরাতি,
এইবার থামো তুমি। বাক্যের মন্দিরচূড়া গাঁথি'
যত উর্ধ্বে তোলো তা'রে তা'র চেয়ে আরো উর্ধ্বে ধায়
গাঁথুনির অন্তহীন উন্মত্ততা। থামিতে না চায়
রচনার স্পর্ধা তব। ভুলে গেছ, থামার পূর্ণতা
রচনার পরিত্রাণ;

পত্রপুটের শেষ দুইটি কবিতা (নং ১৪, ১৫ ; ১৩৪৩ বৈশাখ ১৮ ও ১৯) গভীরভাবে অধ্যয়নের উপযোগী, বিশেষভাবে 'ব্রাত্য' সম্বন্ধে রচনাটি। এখানে নিজের জীবনের কথাই যেন কহিয়াছেন—নিজ অন্তরের চিরদিনের আকাঙ্ক্ষার কথা, আদর্শের কথা :

আমি ব্রাত্য আমি পংক্তিহারা।
বিধান-বাঁধা মানুষ আমাকে মানুষ মানেনি ; ..
দলের উপেক্ষিত আমি,
মানুষের মিলন-ক্ষুধায় ফিরেছি,
যে-মানুষের অতিথিশালায়
প্রাচীর নেই, পাহারা নেই।

Convention বা সংস্কারহীন কবিমনের এই কথা ; ধর্মীয় সামাজিক সকল প্রকার সংস্কার ও বন্ধনের বিরোধী মন। রবীন্দ্রনাথ দল গড়েন নাই, দলের উপেক্ষিত তিনি চিরদিনই।

যুগযুগান্ত হইতে কবি ও শিল্পীর ধ্যানের ও রূপায়নের বিষয় নারী ; চিরদিনই সে তথাকথিত সংসার-অনাসক্ত বীতকাম বৈরাগীর উপেক্ষার পাত্রী, 'নেতি' নেতি'র দ্বারা অস্বীকৃত ; তৎসত্ত্বেও মনের মধ্যে সেই মোহিনীশক্তি আসা-যাওয়া করে। কবির জীবনে ও সাহিত্যে নারী যে কতখানি স্থান জুড়িয়া আছে তাহা এই কবিতায় অতি স্পষ্ট ভাষায় উদ্‌গীত হইয়াছে ; এখানেও সেই 'দুই নারী', বারে বারে যাহার কথা বলিয়াছেন নানাভাবে, নানা সুরে—

সেই ভালোবাসার একটা ধারা
ঘিরেছে তাকে স্নিগ্ধ বেষ্টনে
গ্রামের চিরপরিচিত অগভীর নদীটুকুর মতো
জ্বেলে রেখেছে আমার চেতনার নিভৃত গভীরে
চিরবিরহের প্রদীপশিখা।
সেই আলোকে দেখেছি তাকে অসীম শ্রীলোকে·

...

আমার ভালোবাসার আর-একটা ধারা
মহাসমুদ্রের বিরাট ইঙ্গিত বাহিনী।
মহীয়সী নারী স্নান করে উঠেছে
তারি অতল থেকে।
সে এসেছে অপরিসীম ধ্যানরূপে
আমার সর্বদেহমনে,
পূর্ণতর করেছে আমাকে, আমার বাণীকে।
আমার গানের মধ্যে সঞ্চিত হয়েছে দিনে দিনে
সৃষ্টির প্রথম রহস্য, আলোকের প্রকাশ,
আর সৃষ্টির শেষ রহস্য,—ভালোবাসার অমৃত।[১]

১ পত্রপুট ২য় সং, ১৫ নং, ১৩৪৩ বৈশাখ ১৮।

সেই 'অপরিসীম ধ্যানরূপে'র তরুণীকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন—

ওগো তরুণী,
ছিল অনেক দিনের পুরানো বছরে
এমনি একদিন নতুন কাল,
দখিন হাওয়ায় দোলায়িত,
সেই কালেরই আমি।...

ওগো চিরন্তনী,
আজ আমার বাঁশি তোমাকে বলতে এল,—
যখন তুমি থাকবে না তখনো তুমি থাকবে আমার গানে।
ডাকতে এলেম আমার হারিয়ে-যাওয়া পুরানোকে
তার খুঁজে-পাওয়া নতুন নামে।[১]

কাব্যের ধারা চলে অন্তরে, ঘটনার ধারা চলে বিশ্বসংসারে। ঘটনার ধারায় কবি সাধারণ মানুষের মতোই—সেখানে পরিবারের, সমাজের, দেশের লোকে টানাটানি করে—মানুষ রবীন্দ্রনাথকে সাড়া দিতে হয়। পারিবারিক ঘটনা হইতেছে দৌহিত্রী নন্দিতা গাঙ্গুলির বিবাহ; নন্দিতা তাঁহার কনিষ্ঠা কন্যা মীরাদেবীর একমাত্র সন্তান। মীরাদেবীর পুত্র নীতীন্দ্রনাথের ইতিপূর্বে মৃত্যু ঘটিয়াছিল; মীরাদেবীর স্বামী নগেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলি বহুকাল হইতে এই পরিবারের সহিত বন্ধনহীন। নন্দিতার বিবাহাদির সকল ব্যবস্থা মাতুল রথীন্দ্রনাথকেই করিতে হইয়াছিল। নন্দিতার বিবাহ হইল কৃষ্ণ কৃপালনীর সহিত। ইঁহার কথা পূর্বে বলিয়াছি। এই বিবাহ অসবর্ণ বিবাহ; তজ্জন্য যথাযথ ভাবে সিউড়ীতে ১৮৭২ সালের ৩ আইন বা সিবিল বিবাহ আইন মতে বিবাহ রেজিস্টারি করা হয়। আবার পারিবারিক রীতি অনুসারে 'শুভ দিন' দেখিয়াও বিবাহের দিন ধার্য হয় (১৩৪৩ বৈশাখ ১২)। আশ্চর্যের বিষয়, যে-রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং 'তিন আইন' অনুসারে বিবাহের বিরোধী ছিলেন এবং 'দিন-দেখা' প্রভৃতি পঞ্জিকা-দেখা ধর্মকে কঠোর ভাষায় তিরস্কার করিয়া আসিয়াছেন, আজও তাঁহাকে অসহায়ভাবে এ সব মানিয়া লইতে হইল।

এই বিবাহ উপলক্ষ্যে কবি 'পত্রপুট' কাব্যখণ্ড নবদম্পতির নামে উপহার দিলেন। অতঃপর কবির জন্মদিনে কাব্যখণ্ড প্রকাশিত হয়।

গ্রীষ্মাবকাশের জন্য বিদ্যালয় বন্ধ। শান্তিনিকেতনে পঁচিশে বৈশাখে জন্মদিন অত্যন্ত ঘরোয়াভাবে উদ্‌যাপিত হইল। পরদিন কবি কলিকাতায় গেলেন (১৯৩৬ মে ৭); উঠিলেন বরাহনগরে প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশের বাটীতে। বরাহনগর বাসকালে কবির নূতন কাব্যগুচ্ছের সূত্রপাত হইল 'দ্বৈত'[২] ও 'শেষ পহরে'[৩] কবিতা দুইটিতে (১৩৪৩ জ্যৈষ্ঠ ৯),—একই দিনে লিখিত। এবার কলিকাতায় আসার প্রত্যক্ষ কারণ P. E. N. ক্লাবের বঙ্গীয় শাখা কর্তৃক কবির জন্মদিন উপলক্ষ্যে সংবর্ধনা। প্রশান্তচন্দ্রের বাটীতেই এই সভা হইয়াছিল। অতঃপর কলিকাতার আশ্রমিক সংঘের দ্বারা কবির জন্মোৎসব পালিত হইল; কবি সেখানে যে ভাষণ দান করেন, তাহা 'প্রাক্তনী' গ্রন্থে সংকলিত হইয়াছে। ভাষণের শেষাংশ উদ্ধৃত হইল: "আমার ভাগ্যক্রমে আমি পৃথিবীতে প্রশস্ত আসন পেয়েছি, সেই আসন আমি পেতেছি শান্তিনিকেতনে। নিঃসন্দেহ সেই যোগ শ্লাঘ্য, তার মূল্য আছে। শান্তিনিকেতনের সে গৌরব রক্ষা করবার ভার তোমাদের উপর—তোমরা যদি অনুভব কর যে তোমরা এক সময় এই বিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলে, তোমাদের প্রীতি ও নিষ্ঠা যদি অটুট থাকে তাহলে আমি তোমাদের কাছে থেকে আর কোনো প্রতিদান চাইনে। যদি কখনো এই বিদ্যালয়ের আদর্শের বিশুদ্ধতা রক্ষা সম্বন্ধে সংশয় উপস্থিত হয়, যদি বাধাবিপত্তি আত্মদ্রোহ আসে, তাহলে তোমাদের নিষ্ঠা যেন অবিচলিত থেকে এ'কে রক্ষা করে।"[৪] পুরাতন

১ পত্রপুট পৃ ৫৩, ১৩৪৩ বৈশাখ ১৯।
২ দ্বৈত, প্রবাসী ১৩৪৩ আষাঢ়, র-র ২০ পৃ ৬১। উভয় পাঠ বিভিন্ন।
৩ শেষ পহরে, বিচিত্রা ১৩৪৩ আষাঢ়।
৪ প্রাক্তনী পৃ ১৮-১৯, কলিকাতা ১৩৪৩ বৈশাখ ২৭।

ছাত্রদের উপর তাঁহার অগাধ বিশ্বাস ও ভরসা; বিশ্বভারতী 'বিশ্ববিদ্যালয়ে' পরিণত হইয়া গেলেও তাঁহাদের স্থান অ্যাক্টে সুনির্দিষ্টভাবে স্বীকৃত হইয়াছে।

কবি যখন শান্তিনিকেতনে ফিরিলেন, তখন সেখানে দারুণ গরম। সে বৎসর বীরভূমে যেমন জলাভাব, তেমনই অন্নাভাব। রবীন্দ্রনাথ আপনার সাহিত্যসাধনায় মগ্ন থাকিলেও চারিদিকের অন্নকষ্ট কিভাবে শমিত করা যাইতে পারে তজ্জন্য ভাবিতেছেন। এই সময়ে দুর্ভিক্ষ-পীড়িত স্থানিক লোকদের সাহায্যকল্পে জীবনীলেখক শান্তিনিকেতনের উপকণ্ঠস্থিত একটি সুবৃহৎ জলাশয়ের সংস্কারকার্যে ব্রতী হন। তাঁহার এই কার্যে শ্রীনিকেতনের একনিষ্ঠ কর্মী শ্রদ্ধেয় কালীমোহন ঘোষ ও তাঁহার অন্যতম সহকারী নিশাপতি মাঝির সহায়তা স্মরণীয়। নন্দিতার বিবাহ উপলক্ষ্য করিয়া কবি কয়েকশত টাকা দান করেন[১] এবং সাধারণের নিকট হইতে অর্থসংগ্রহ করিবার জন্য একখানি পত্র লিখিয়া দেন। কবির পত্রের সাহায্যে সংগৃহীত ভিক্ষালব্ধ অর্থ, বিশ্বভারতী সমবায় ব্যাংক হইতে ঋণকৃত অর্থ ও জেলাবোর্ডের সভাপতি জিতেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের দান সাহায্যে বাঁধের পঙ্কোদ্ধার হইল। বলা বাহুল্য, একাজে ভুবনডাঙা গ্রামের হিন্দু-মুসলমান সকলেই সাধ্যমতো আর্থিক ও কায়িক সহায়তা দান করিয়াছিলেন। কবি প্রায়ই লেখকের নিকট হইতে পুষ্করিণীর খবর লইতেন। কাজ শেষ হইয়া গেলে বাঁধের তীরে বর্ষামঙ্গল উৎসবে উপস্থিত হইয়া তিনি স্বয়ং বৃক্ষরোপণ করেন।

কবি যে পত্রখানি লেখকের হাতে দেন, তাহা উদ্ধৃত হইল: "যে সময়ে দাতার অভাব ছিল না ব'লে বাংলাদেশের গ্রামে জলের অভাব ছিল না সেই সময়ে ভুবনডাঙার জলাশয়ের সৃষ্টি। এরই জলসঞ্চয়ের উপর চারিদিকের পাঁচখানি গ্রামের তৃষ্ণা নিবারণ ও ফসল ক্ষেতে জল সেচন নির্ভর করে। ক্রমশই এর জল এসেছে শুকিয়ে, জলাশয়ের পরিধি এসেছে সঙ্কীর্ণ হয়ে, অসহায় গ্রামের লোকের দুঃখের অন্ত নেই। পঙ্কোদ্ধার ক'রে এই জলাশয়কে যথাসম্ভব ব্যবহারযোগ্য করবার চেষ্টায় দরিদ্র গ্রামবাসীরা ঋণযোগে কিছু অর্থ সংগ্রহ করেছে। তাদের পক্ষে এই দুঃসাধ্য অধ্যবসায়ে সাহায্য করার জন্য আমরা সকলকে আহ্বান করি। এ কথাও স্মরণ করা কর্তব্য দারুণ দুর্ভিক্ষের দিনে প্রত্যহ তিন শত লোক এই কর্ম উপলক্ষ্যে অন্ন উপার্জন করতে পারচে, এমন অবস্থায় অতি সামান্য দানও মূল্যবান হয়ে উঠবে। ইতি ১লা বৈশাখ ১৩৪৩।"[২]

ভুবননগরের এই পুষ্করিণী খনন ব্যাপারে বিশ্বভারতীর কর্মীগণ যে আদর্শ দেখাইলেন তাহার ফল দূরব্যাপী হইয়াছিল। সমবায়ের শক্তিবলে কী হইতে পারে, এই কাজটি তাহার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।[৩] এই ঘটনাটি অল্পকাল পরে স্থানীয় রাজপুরুষদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। তৎকালীন মহকুমা-ম্যাজিস্ট্রেট বিনোদবিহারী সরকার ও তদীয় বন্ধু সুকুমার চট্টোপাধ্যায় এই বিষয়ে গবর্মেন্টের মনোযোগ আকর্ষণ করেন বলিয়া শুনিয়াছি; ১৯৩৯ সালের অক্টোবর মাসে বঙ্গীয় সরকার Bengal Tank Improvement Act পাশ করেন

১ এই টাকা দিয়া বাঁধের মধ্যে জমিদারদের বন্দোবস্তী কিয়ৎপরিমাণ জমি বোলপুরের জনাব গনি মিঞার নিকট হইতে ক্রয় করা হয়।

২ দ্র সুধীরচন্দ্র কর, প্রতিবেশী রবীন্দ্রনাথ, মাসিক বসুমতী ১৩৫৭ ফাল্গুন পৃ ৬৩৭, লোকসেবক রবীন্দ্রনাথ ১৩৬০ অগ্রহায়ণ পৃ ১৯৪। এই পত্রখানি গ্রামের অন্যতম কর্মী জনাব রোস্তম আলির নিকট হইতে পাওয়া গিয়াছে। তিনি সেখানি সযত্নে রক্ষা করিয়াছেন।

৩ লাবপুরের জমিদার সাহিত্যিক ও নাট্যরসিক রায় বাহাদুর নির্মলশিব বন্দ্যোপাধ্যায় প্রথমে এই বাঁধটিকে ভুবনডাঙা জলসরবরাহ সমিতির সভাপতি প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের অনুরোধে তাঁহাকে জমা দেন; পরে অন্য শরিকরা দেন। প্রায় একশত বৎসর পূর্বে রায়পুরের ভুবনমোহন সিংহ যখন এই গ্রাম পত্তন করেন, তখন এই বাঁধটিও তৈয়ারি হয়। তারপর দীর্ঘকালের অযত্নে জলাশয় মজিয়া আসে; এবং যে জলাশয় এককালে প্রায় আশি বিঘা ছিল বলিয়া শোনা যায়, তাহা সেটেলমেণ্টের সময় (১৯২৭-২৮) মাত্র ২৬ বিঘায় পরিণত হইয়াছিল। জলসরবরাহ সমিতি যখন বন্দোবস্ত পায় তখন উহা ২০ বিঘা মাত্র। দশ বৎসর পর বাংলা সরকার এই জলাশয় শান্তিনিকেতনের জল সরবরাহের জন্য acquire করেন।

(Act XV of 1939)। পর বৎসর (১৯৪০) বীরভূম, বাঁকুড়া, বর্ধমান ও মেদিনীপুরে এই আইন চালু হইল।[১]

এই গ্রীষ্মাবকাশের (১৩৪৩) আর-একটি ঘটনা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। পাঠকের স্মরণ আছে গত মাঘ মাসে (১৩৪২) বঙ্গীয় শিক্ষাসপ্তাহে কবি যে ভাষণ দান করেন, তাহার অনুক্রমণিকা-অংশে বাংলাদেশে লোকশিক্ষা প্রবর্তনের জন্য গবর্মেণ্টকে অনুরোধ করিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য, কবিদের নির্দেশে গবর্মেণ্টের নীতির বা রীতির পরিবর্তন হয় না। অতঃপর বিশ্বভারতীর কর্তৃপক্ষের নিকট কবি তাঁহার প্রস্তাব পেশ করিলে তাঁহারা সানন্দে উহা গ্রহণ করিলেন। স্থির হইল বিশ্বভারতী লোকশিক্ষার আয়োজন করিবেন।

লোকশিক্ষার পাঠক্রম ও পরীক্ষাদির ব্যাবস্থার ভার পড়ে জীবনীলেখকের উপর; তিনি কবির পরামর্শ ও উপদেশমতো 'লোকশিক্ষা সংসদ' গঠন কার্যে ব্রতী হন ও পাঠক্রম পাঠ্যসূচী প্রভৃতি প্রস্তুত করেন।[২]

কবি শ্যামলীতে আছেন; আপন মনে ছবি আঁকেন, পড়াশুনা করেন। এবার ছুটির নিরালায় জবহরলালের Autobiography খানি পড়িয়া শেষ করিলেন; জবহরলালকে লিখিলেন, "I feel intensely impressed and proud of your achievment. Through all its details there runs a deep current of humanity which overpasses the tangles of facts and leads us to the person who is greater than his deeds and truer than his surroundings." (1936 May 31)[৩] এই পত্র পাইয়া জবহরলাল খুবই প্রীত হইয়া কবিকে এলাহাবাদ হইতে লিখিলেন (১৯৩৬ জুন ১০), "Need I say how proud and grateful I feel to have your commendation in such generous language? Many friends have used words of praise for my book, some have critisized it. But what you have written goes to my heart and cheers and strengthens me. With your blessings and goodwill I feel I can face a world of opposition. The burden becomes lighter and the road straighter...."

পড়া, ছবি-আঁকা, পত্রালাপ—তাহার ফাঁকে ফাঁকে চলে কবিতা লেখা; এবারকার রচনাগুলি গদ্য-কবিতা, 'শ্যামলী' খণ্ডে (১৩৪৩ ভাদ্র) প্রকাশিত হয়। কিন্তু সাহিত্যসৃষ্টি করিয়াই নিষ্কৃতি নাই, কেন লিখিলেন তাহারও কৈফিয়ত দিতে হয়। ইতিপূর্বে কাব্য লিখিয়া তাহার 'মানে' লইয়া জবাবদিহি করিয়াছেন অরসিকদের কাছে। 'ঘরে-বাইরে'র মধ্যে সীতাসম্বন্ধে সন্দীপের কোনো উক্তি লইয়া কবিকে এককালে লেখকরা কিভাবে বিড়ম্বিত করেন তাহার কথা পূর্বেই বলিয়াছি।[৪] এবার বিড়ম্বনা শুরু হইয়াছে মুসলমান লেখকদের রচনায়। তাঁহাদের চোখে রবীন্দ্রনাথের কাব্য অধর্ম ও পাপাচরণের সমর্থক।

১ অ্যাক্ট সম্বন্ধে তথ্যগুলি বি. কে. গুহ মহাশয় কলিকাতায় লিখিয়া আনাইয়া দেন (৬-১০-৫৩)।

২ লোকশিক্ষা-সংসদের পরিচালকদের মধ্যে বাংলাদেশের বিশিষ্ট শিক্ষিতদের নাম ছিল। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিশ্বভারতীর কর্মসচিব তিনি ইহার সম্পাদক ছিলেন। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপক ও গ্রন্থাগারিক, সহকারী সম্পাদক। দ্র Visvabharati Bulletin No. 28. 1937 August.

৩ V. B. News. 1936 July p 4.

৪ প্রবাসী লিখিতেছেন, "কবির উল্লিখিত সাহিত্যিক দুর্ঘটনা মনে পড়িতেছে। যিনি রবীন্দ্রনাথকে আসামী খাড়া করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁহারই পিতার কোন নাটক থেকে সীতা সম্বন্ধীয় কিছু দুর্বাক্য উদ্ধৃত করিয়া সমুচিত উত্তর দিয়াছিলেন।" ১৩৪৩ আষাঢ় পৃ ৪৫৭।

কিছুকাল হইতে মুসলমানদের একদল লোক বাংলা সাহিত্যের মধ্যে হিন্দু পৌত্তলিকতার ছায়া দেখিয়া আতঙ্কিত হইতেছেন। মুসলমান ছাত্রদের সেইসব রচনা স্কুলে কলেজে পড়িতে হয় বলিয়া এইশ্রেণীর ঘোর আপত্তি। বাংলা ভাষা অতি সংস্কৃত ঘেঁষা, এ লইয়া আলোচনা চলিতেছে। সম্প্রতি 'মোহম্মদী' নামে সুপ্রতিষ্ঠিত সাহিত্যিক মাসিকপত্র রবীন্দ্র-সাহিত্যের মধ্যে নীতি ও ধর্ম-বিরোধী কথা আবিষ্কার করিয়াছেন 'পূজারিণী' কবিতায় ও 'গান্ধারীর আবেদন' নাট্যকাব্যে।

মোহম্মদীর লেখকের মতে (১৩৪৩ জ্যৈষ্ঠ) "বেদ ব্রাহ্মণ রাজা ছাড়া আর কিছু নাই ভবে পূজা করিবার" ও "এক কালে ধর্মাধর্ম দুই তরী 'পরে পা দিয়ে বাঁচে না কেহ। বারেক যখন নেমেছে পাপের স্রোতে কুরু পুত্রগণ, তখন ধর্মের সাথে সন্ধি করা মিছে"—এই সকল ইসলাম-নীতিবিগর্হিত কথা রবীন্দ্রনাথ প্রচার করিতেছেন! এই সব লেখা মুসলমান ছাত্রদের পক্ষে পড়া অনুচিত।[১]

এই মূঢ়তা নীরবে সহ্য করা ধৈর্যশীল কবির পক্ষেও সম্ভব হইল না। তিনি জবাবের একস্থানে লিখিলেন, "লেখক পাপ প্রবৃত্তি সম্বন্ধে সাবধান ক'রে দিয়ে আমাকে অনেক উপদেশ দিয়েছেন; আমি সাহিত্যবিচার সম্বন্ধে সাবধান ক'রে দিয়ে তাঁকে এই উপদেশটুকু দেব যে, কাব্যে নাটকে পাত্রদের মুখে যেসব কথা বলানো হয়, সে কথাগুলিতে কবির কল্পনা প্রকাশ পায়, অধিকাংশ সময়েই কবির মত প্রকাশ পায় না। প্যারাডাইস লস্টে The Arch-fiend বলছেন, "To do ought good never will be our task, But ever to do ill our sole delight." সন্দেহ নেই, কথা-গুলো উদ্ধতভাবে সুনীতিবিরুদ্ধ। কিন্তু আজ পর্যন্ত কোনো ছাত্র বা অধ্যাপক, কোনো মাসিকপত্রের সম্পাদক বা পাঠক মিল্‌টনকে এ বলে অনুযোগ করেনি যে, পাঠকের মনে দুর্নীতি ও ঈশ্বরবিদ্রোহ বদ্ধমূল করা কবির অভিপ্রেত ছিল। স্কুল কলেজের পাঠ্যপুস্তকের তালিকা থেকে প্যারাডাইস লস্টকে উচ্ছেদ করার প্রস্তাব এখনো শোনা যায়নি; কিন্তু বাংলা দেশে কখনই শোনা সম্ভব হতে পারে না, জোর ক'রে এমন কথা বলার মুখ আজ আর রইল না।...

"হোমারের ইলিয়ড বা মিলটনের প্যারাডাইস লস্ট মুখ্যতঃ পৌত্তলিকও নয় অপৌত্তলিকও নয়— ওরা সাহিত্য। ওদের গ্রহণ বর্জন সম্বন্ধে বিচার করবার সময় একমাত্র রসের দিক থেকেই বিচার কর্তব্য, ধর্মমতের দিক দিয়ে নয়। লজ্জা হয় এই সাদা কথাটারও ব্যাখ্যা করতে।"[২]

রবীন্দ্রনাথ ইতিপূর্বে 'বিচারক' (কথা ও কাহিনী) কবিতাটির জন্য শিক্ষাবিভাগীয় পাঠ্য নির্বাচন সমিতির নিকট হইতে লাঞ্ছিত হইয়াছিলেন। কবি এই প্রবন্ধের একস্থানে অতিদুঃখে বলিয়াছিলেন, "সাম্প্রদায়িক বিরোধ নিয়ে ভাঙা-কপাল আমরা পরস্পরের মাথা ভাঙাভাঙি করছি, অবশেষে কি সাহিত্যের ললাটে বাড়ি পড়তে শুরু হবে?" কিছুকাল পূর্বে শিখদের হস্তেও তাঁহার লাঞ্ছনা হয় গুরুগোবিন্দ সম্বন্ধে 'শেষ শিক্ষা' (কথা ও কাহিনী) কবিতার জন্য।[৩]

বাহিরের ঘটনার ধারা যেমনই চলুক, কবির কাব্যধারা পথ কাটিয়া আপন পথে বহিয়া চলে। বরাহনগরে বাসকালে যে কাব্যখণ্ডের পত্তন হয় (১৯৩৬ মে ২৩), তাহা ধীর মন্দ গতিতে চলিতেছে শান্তিনিকেতনের এই দারুণ গ্রীষ্মের মধ্যেও। জুলাই-এর গোড়াতেই 'শ্যামলী'র প্রায় সব কবিতাই লেখা শেষ হয়; কেবল শেষটি

১ ইতিপূর্বে 'পূজারিণী' সুনীতিমূলক নয় বলিয়াও কথা উঠিয়াছিল।

২ দ্র প্রবাসী ১৩৪৩ আষাঢ়, বিবিধ প্রসঙ্গ পৃ ৪৫৫-৫৭।

৩ জনাব রেজাউল করিম 'হিন্দু প্রভাবিত বাংলা-সাহিত্য' শীর্ষক প্রবন্ধে (প্রবাসী ১৩৪৩ বৈশাখ পৃ ৭৫) এই সমস্যাটিকে অতি বিশদভাবে আলোচনা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, "নিজ ধর্মের আদর্শ অনুরূপ নহে বলিয়া যদি মুসলমানকে কোন সাহিত্য পরিত্যাগ করিতে হয়, তবে সারা বিশ্বে পড়িবার মত সাহিত্য তাহার জন্য একটিও পাওয়া যাইবে না।"

লেখেন একমাস পরে (৬ অগস্ট) আর উৎসর্গটি লেখেন আরও পরে (১ ভাদ্র)। কাব্যখণ্ড প্রকাশিত হয় ভাদ্র মাসে (১৩৪৩)।

শ্যামলীর কবিতাগুলি গদ্যছন্দে লেখা, সাম্প্রতিক রচনা হইতে পৃথক সুরে বাঁধা ; কতকগুলি কথিকা-ধর্মী। শেষসপ্তক, পত্রপুট প্রভৃতির অত্যন্ত নিবিড় (intense) অনুভূতি প্রকাশের পরে যেন একটু relief খুঁজিতেছেন ; পত্রপুটের শেষ কবিতায় দুই নারীর অন্যতমা প্রিয়া নারী—কবি জীবনে 'অপরিসীম ধ্যানরূপে' 'চিরবিরহের প্রদীপ শিখা'র ন্যায় বিরাজমান ; একথা ও এভাব বারেবারে তাঁহার কাব্যে আসিয়াছে, আমরাও তাহার কথা বলিয়াছি। চির-পুরাতন, চির-নবীনা সেই উর্বশীর উদ্দেশ্যেই কবিতাগুলি মুক্তি পাইয়াছে—কখনো নিছক গদ্য লিরিক্ রূপে কখনো কথিকা রূপে।

যতসব ভাবনার আবছায়া
উড়ছে ঝাঁক বেঁধে মনের চারিদিকে
হালকা বেদনার রঙ মেলে দিয়ে।
এ কান্না নয় হাসি নয়, চিন্তা নয়, তত্ত্ব নয়,
যত কিছু ঝাপসা-হয়ে-যাওয়া রূপ,
ফিকে-হয়ে-যাওয়া গন্ধ,
কথা-হারিয়ে-যাওয়া গান,
তাপহারা স্মৃতিবিস্মৃতির ধূপছায়া—
সব নিয়ে একটি মুখ-ফিরিয়ে-চলা স্বপ্নছবি—[১]

'তাপহারা স্মৃতিবিস্মৃতির ধূপছায়া'য় কয়েকটি কবিতা রচিত ; 'মিল ভাঙা' নিজ জীবনের কৈশোর স্মৃতি—

শেষে একদিন দুজনের নৌকো-বাওয়া থেকে
কখন একলা গেছ নেমে ;
আমি ভেসে চলেছি স্রোতে,
তুমি বসে রইলে ওপারের ডাঙায়।···
যখন তোমাকে দেখি মনে মনে,
দেখতে পাই তুমি আছ
সেই দিনকার কচি যৌবনের মায়া দিয়ে ঘেরা।
তোমার বয়স গেছে থেমে।···
এই তরীটিকে প্রথম দিয়েছিলে ঠেলে
কিশোর বয়সের শ্যামল পারের থেকে ;
এর মধ্যে আছে তার বেগ।···

কবির শেষ জীবনের কয়েক বৎসরের বহু কবিতা ও গানের মধ্যে এই কৈশোরের 'যত কিছু ঝাপসা-হয়ে-যাওয়া রূপ' নানাভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। 'মিল ভাঙা'র দুইদিন পরে লেখা 'কালরাত্রে' (১৯৩৬ জুন ২৩) নিজ জীবনের কথা রূপক স্থলে বলিয়াছেন। প্রথম জীবনে 'জড়ত্বে ছিলুম পরাভূত', ' 'চাই চাই' বলে শূন্য হাতড়ে বেড়িয়েছিল রাতকানা।' যাহাকে ধরা যায় না, তাহাকে না পাইয়া মন হইয়াছিল নাস্তিত্বের শিকলবাঁধা ভৃত্য। তারপর—

ভোর হল রাত্রি···
মন দাঁড়িয়ে উঠল,
বললে, আমি পূর্ণ।
তার অভিষেক হল আপনারি উদ্বেল তরঙ্গে।···
উপচে উঠে মিলতে চলল চারিদিকের সব কিছুর সঙ্গে।
চেতনার সঙ্গে আলোর রইল না কোনো ব্যবধান।··
ডিঙিয়ে গেলেম দেহের বেড়া,
পেরিয়ে গেলেম কালের সীমা
গান গাইলেম, 'চাইনে কিছু চাইনে'।

জীবন শুরু হইয়াছিল 'চাই চাই' দিয়া ; মাঝে না-পাওয়ার অভিমানে সমস্তকে সে অস্বীকার করিয়া বলিয়াছিল—'নাই নাই'। যেদিন প্রভাতসূর্যের অন্তরে আপনাকে দেখিতে পাওয়া গেল হিরণ্ময় পুরুষ রূপে, সেদিন মন বলিল 'চাই না চাই না।' যখন মানুষ অনুভব করে 'আমি পূর্ণ' তখনই সে ঘোষণা করিতে পারে—'চাই না, কিছু চাই না।'

১ শ্যামলী, বিদায় বরণ, ১৯৩৬ জুন ৩।

শ্যামলীর কতকগুলি রচনা স্মরণ করায় 'পলাতকা'র কাহিনী—যেমন 'কনি', 'দুর্বোধ' 'পাত্রপাত্রী' (বঞ্চিত ও অপর পক্ষ), 'অমৃত'। ধনী-কন্যা অমিয়ার জীবনে কবি কিসের আদর্শ দেখাইয়াছেন? অমিয়া গ্রামে মহীভূষণের কাজ করিতেছে; মহীভূষণের 'বুদ্ধির কাঁচা ফলে ঠোকর দিয়েছে রাশিয়ার লক্ষ্মী-খেদানো বাদুড়টা'। অমিয়ার শেষ কথা এই,—

এসেছি তাঁরি কাজে। আমি শুধালেম, 'কোথায় আছেন তিনি।'
উপকরণের দুর্গ থেকে তিনি করেছেন আমাকে উদ্ধার। অমিয়া বললে 'জেলখানায়।'

কবির সহানুভূতি কোন্ দিকে চলিয়াছে—তাই ভাবি।

এই কাব্যখণ্ডের মধ্যে কবির অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবিতা 'বাঁশিওয়ালা'। এ-যেন বাংলার ব্যথাতুর নারীর অন্তর্বেদনা। স্মরণ হয় সবুজপত্র-যুগের 'স্ত্রীর-পত্র' নামক ছোটো-গল্পটির মর্মকথা।

সাহিত্যসৃষ্টির সঙ্গে ভাষাসৃষ্টির সম্বন্ধ অত্যন্ত নিবিড়; ভাষার রহস্য রবীন্দ্রনাথকে চিরদিনই আনন্দ দিয়াছে। এই সময়ে তিনি 'শব্দতত্ত্বের একটি তর্ক' (প্রবাসী ১৩৪৩ শ্রাবণ) ও বাংলার বানান সমস্যা সম্বন্ধে কথা তুলিয়া সমসাময়িক কয়েকজন ভাষানবীশকে আলোচনায় যোগদান করিতে উদ্‌বুদ্ধ করেন। ডক্টর শহীদুল্লাহ, অধ্যাপক আশুতোষ ভট্টাচার্য ও অধ্যাপক বিজনবিহারী ভট্টাচার্য অংশ গ্রহণ করেন।[১]

গদ্য রচনার সঙ্গে যেমন গভীরভাবে যুক্ত ব্যাকরণের শাসন ও পারিভাষিক শব্দের সৃজন, কবিতা লেখার সঙ্গে তেমনই অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত ছন্দ-বন্ধন। আমাদের এই আলোচ্য পর্বে কবির 'ছন্দ' নামে গ্রন্থ প্রকাশিত হয় (১৩৪৩ আষাঢ়)। গ্রন্থখানি উৎসর্গ করেন দিলীপকুমার রায়কে। কবিকে পত্রালাপের দ্বারা যে কয়জন নানা ভাবনায় ও রচনায় উদ্‌বুদ্ধ করিয়াছিলেন তাঁহাদের অন্যতম দিলীপকুমার; ইংরেজিতে যাহাকে বলে provoke করা তাহা করিতে পারিলে অনেক সময় রবীন্দ্রনাথের নিকট হইতে তাঁহার শ্রেষ্ঠ ভাবনাগুলি পাওয়া যাইত। দিলীপকুমারের সেই ক্ষমতা ছিল।

ছন্দ গ্রন্থের অনেক আলোচনার প্রত্যক্ষ উদ্‌বোধক দৌলতপুর কলেজের বাংলাসাহিত্য ও ইতিহাসের অধ্যাপক প্রবোধচন্দ্র সেন ও রংপুর কলেজের ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপক অমূল্যধন মুখোপাধ্যায়। ইঁহাদের সঙ্গে ছন্দ-বিষয়ক যেসব বাদপ্রতিবাদ হইয়াছিল তাহাও গ্রন্থমধ্যে সন্নিবেশিত হইয়াছে। বিজ্ঞপ্তি শেষে কবি লিখিতেছেন, "তাঁদের সঙ্গে আমার কিছু কিছু মতভেদ সত্ত্বেও ছন্দের বিচারে তাঁদের প্রবীণতা আমি শ্রদ্ধার সঙ্গেই স্বীকার করে থাকি।" (১৩৪৩ আষাঢ় ২০)

বাংলা ছন্দ সম্বন্ধে কবির প্রবন্ধ বেশি নয়[২]; কবি লিখিতেছেন, "বাংলা ছন্দ সম্বন্ধে যতকিছু আলোচনা করেছি এই গ্রন্থে প্রকাশ করা হল।" কিন্তু পত্রের মধ্যে আলোচনা করিয়াছেন বিস্তর। কয়েকখানি চিঠি 'ছন্দে'র পরিশিষ্টরূপে সংযোজিত হওয়ায় গ্রন্থখানির মূল্য বৃদ্ধি পাইয়াছে।

রবীন্দ্রনাথের ছন্দ সম্বন্ধে বাংলায় কয়েকখানি গ্রন্থ ও অসংখ্য প্রবন্ধ লিখিত হইয়াছে; এ বিষয়ে অগ্রণী অধ্যাপক প্রবোধচন্দ্র সেন। তাঁহার 'ছন্দোগুরু রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থখানি কবির ছন্দ সম্বন্ধীয় ব্যাপক আলোচনার গ্রন্থ। অমূল্যধন, মোহিতলাল, দিলীপকুমার ও তারাপদ ভট্টাচার্য প্রভৃতি লেখকদের দান এ ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য।

১ রবীন্দ্রনাথ, কালচার, প্রবাসী ১৩৪২ ভাদ্র। শব্দতত্ত্বে একটি তর্ক, প্রবাসী ১৩৪৩ শ্রাবণ। বাংলা বানান, প্রবাসী ১৩৪৩ কার্তিক। শহীদুল্লাহ, বাংলা বানান, প্রবাসী ১৩৪৩ ফাল্গুন। আশুতোষ ভট্টাচার্য, 'শব্দতত্ত্বের একটি তর্ক', প্রবাসী ১৩৪৩ ফাল্গুন। বিজনবিহারী ভট্টাচার্য, 'শব্দতত্ত্বের একটি তর্ক', প্রবাসী ১৩৪৩ ফাল্গুন। কবির 'বাংলা শব্দতত্ত্ব' ১৩৪২ অগ্রহায়ণে প্রকাশিত হইয়াছিল।

২ 'বাংলাভাষা-পরিচয়' গ্রন্থে ছন্দ সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা আছে। দ্র র-র ২৬ পৃ ৪০১।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে (১৩৪১ বৈশাখ) কবি 'বাংলা ছন্দের প্রকৃতি' শীর্ষক যে প্রবন্ধ পাঠ করেন তাহার দীর্ঘ ভূমিকা-অংশে ছন্দ ও নৃত্য সম্বন্ধে তিনি যে বিশ্লেষণ করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার জীবনজিজ্ঞাসার অন্যতম কথা। কৈশোরে তিনি বাল্মীকি-প্রতিভায় গাহিয়াছিলেন—"ছন্দে উঠিছে চন্দ্রমা, ছন্দে কনক রবি উদিছে, ছন্দে জগ-মণ্ডল চলিছে, জ্বলন্ত কবিতা তারকা সবে।" তখন কবির বয়স কুড়িরও কম; সেই হইতে অসংখ্য কবিতায় গানে ছন্দ সম্বন্ধে কত কথাই বলিয়াছেন। প্রৌঢ়ত্বের অন্তে বিজ্ঞানের তথ্যরাজিকে ছন্দে নূতন রূপ দান করিয়াছেন। সেটি হইয়াছে 'নটরাজ'-এর কবিতা ও গানে অপরূপ সংশ্লেষণে। পূর্বোল্লিখিত বক্তৃতার প্রারম্ভে কবি বলেন, "আমাদের দেহ বহন করে অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ভার, আর তাকে চালন করে অঙ্গপ্রত্যঙ্গের গতিবেগ; এই দুই বিপরীত পদার্থ যখন পরস্পর মিলনে লীলায়িত হয়, তখন জাগে নাচ। দেহের ভারটাকে দেহের গতি নানা ভঙ্গিতে বিচিত্র করে, জীবিকার প্রয়োজনে নয়, সৃষ্টির অভিপ্রায়ে; দেহটিকে দেয় চলমান শিল্পরূপ। তাকে বলি নৃত্য।" এই কথাটিকে পরবর্তী অনুচ্ছেদে বিস্তারিত করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের জীবনদর্শন ভালোরূপে বুঝিবার পক্ষে ছন্দ সম্বন্ধে তাঁহার আলোচনাগুলি অবশ্য পঠনীয়— কেবল প্রকাশের শৈলী বা টেক্‌নিকের জন্য তাহাদের মূল্য নহে—মূলগত তত্ত্বের জন্যই তাহাদের প্রয়োজন।

রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং ছান্দসিক, বহু ছন্দের উদ্‌ভাবক; শব্দ ও ধ্বনি লইয়া তিনি যত পরীক্ষা করিয়াছেন, মনে হয় আর কোনো কবি ইতিপূর্বে কখনো কোথাও তাহা করেন নাই। 'মুক্তক' ছন্দের ভাবটি য়ুরোপ হইতে গৃহীত, কিন্তু বলা বাহুল্য ইংরেজি ও বাংলাছন্দের আন্তর-প্রকৃতি যে বিভিন্ন এ তত্ত্বটি রবীন্দ্রনাথের নিকট তাঁহার কাব্যজীবনের প্রত্যূষেই ধরা পড়ে; সেইজন্য তাঁহার ভাব বা ছন্দ কোনোটিই অনুকরণের কোঠায় পড়িয়া থাকে নাই। প্রবোধচন্দ্র সেন লিখিয়াছেন, "তাঁর কবিজীবনের সূচনাতেই দেখতে পাই ছন্দের বাধাগুলোকে অতিক্রম করবার একটা দুর্বার আকাঙ্ক্ষা। 'সন্ধ্যাসংগীত', 'প্রভাতসংগীত' এবং 'ছবি ও গান'-এ তার প্রচুর নিদর্শন রয়েছে। এমনকি 'শৈশব সংগীত'এও বালক কবির নবছন্দ উদ্‌ভাবনের প্রয়াস ও সাফল্য দেখে বিস্মিত হতে হয়।...'মানসী'র যুগ থেকেই বিশেষভাবে দেখতে পাই, প্রচলিত রীতির ছন্দের বন্ধনকে অস্বীকার করে কবির ছন্দপ্রতিভার বহুমুখী ধারা যুগপৎ বহু বিচিত্র পথে প্রবলবেগে প্রবাহিত হয়ে চলেছে।" (ছন্দোগুরু রবীন্দ্রনাথ পৃ ১২১)

'ছন্দ' গ্রন্থে একজন মহাকবি ছন্দশাস্ত্রকে কিভাবে দেখিয়াছেন এবং নবনব ছন্দ নিজ প্রতিভাবলে রচিয়াছেন, তাহার ইতিহাস পাই; সংক্ষেপে বলা যাইতে পারে এ যেন কবির আত্মকাহিনী যাহা ছন্দোরূপে প্রতিভাত হইয়াছে তাঁহার কবিমানসে।

বিচিত্র ঘটনা ১৩৪৩

আষাঢ়ের (১৩৪৩) শেষভাগে কবির সাহিত্য-সৃষ্টিতে হঠাৎ বাধা পড়িল। কলিকাতা হইতে কবির কাছে আসিলেন সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, অধ্যাপক রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় ও তুলসীচরণ গোস্বামী। তাঁহাদের আসিবার কারণ হইতেছে এই,—বাংলাদেশের বর্ণহিন্দুদের মতে পুণাচুক্তি মানিয়া লওয়ায় তাঁহাদের স্বার্থ ও সংস্কৃতি বিপন্ন। মুসলমান-প্রধান বাংলাদেশের শাসন ব্যাপারে সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে এক দীর্ঘ আবেদন বা মেমোরিয়াল ১৯৩৬ সালের গোড়ায় ভারতসচিবের নিকট পাঠানো হইয়াছিল; স্বাক্ষরকারীদের পুরোভাগে ছিল রবীন্দ্রনাথের নাম। এই মেমোরিয়ালের উত্তরে আর্ল অব্ জেটল্যানড্ (রোনালড্‌সে) ১৯৩৬ জুন ২৫ বড়লাটকে জানাইয়া দেন যে, ১৯৩৫ সালে যে-অ্যাক্ট পাশ হইয়াছে, তাহার পরিবর্তনের কোনো কারণ তিনি খুঁজিয়া পাইতেছেন না। (প্রবাসী ১৩৪৩ ভাদ্র পৃ ৭৫৬)।[১]

ভারত-সচিবের নিকট যে মেমোরিয়াল পাঠানো হইয়াছিল, তাহাতে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির দাবি জানানো হয়। (১) বাংলাদেশে হিন্দুরা একটি সংখ্যালঘু (minority) সম্প্রদায়; অন্যান্য প্রদেশের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের স্বার্থরক্ষার্থে যে-সকল বিশেষ ব্যবস্থা করা হইয়াছে, বাংলার হিন্দুদের জন্যও এইসকল ব্যবস্থা হউক। (২) হিন্দুরা যৌথ বা সম্মিলিত নির্বাচনে বিশ্বাসী। পৃথক নির্বাচনপ্রথা আত্মকর্তৃত্বশীল শাসনতন্ত্রের বিরোধী; গণতন্ত্র ও রাজনীতির ইতিহাসে পৃথক্ নির্বাচনপ্রথার নজির নাই। (৩) যতদিন পর্যন্ত না বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে একটা নূতন চুক্তি হয়, ততদিন লখনৌ চুক্তি অনুসারেই ব্যবস্থা করা হউক। সাইমন কমিশন এই মতের সমর্থক। (৪) যাঁহারা আসন-সংরক্ষণের পক্ষপাতী, তাঁহারা সংখ্যালঘুদের জন্যই তাহার সমর্থন করেন। সংখ্যাগরিষ্ঠদের জন্য আসন-সংরক্ষণ ব্যবস্থা অনাবশ্যক ও অন্যায়। যদি আসন-সংরক্ষণ করিতেই হয়, তবে সংখ্যালঘু হিন্দুদের জন্যই করা উচিত, সংখ্যাগরিষ্ঠদের জন্য নহে। (৫) হিন্দুদের দাবি সম্পর্কে যতদিন পর্যন্ত একটা সিদ্ধান্ত না হয়, ততদিন যেন বর্তমান ব্যবস্থাপক সভায় বাংলার হিন্দুদের সদস্যসংখ্যার অনুপাতেই ভবিষ্যতে তাঁহাদের আসনসংখ্যা নির্দিষ্ট করা হয়। (দ্র প্রবাসী ১৩৪৩ শ্রাবণ পৃ ৬০৭)

ভারত-সচিবের উত্তরের প্রত্যুত্তরের জন্য ১৫ জুলাই (১৯৩৬) কলিকাতায় প্রতিবাদ সভা আহূত হইয়াছে, তদুদ্দেশে শরৎচন্দ্র প্রমুখ নেতারা আসিয়াছিলেন কবিকে লইবার জন্য।

রবীন্দ্রনাথ চিরদিনই সাম্প্রদায়িকতার বিরোধী। ১৯৩৫-এর অ্যাক্ট অনুসারে ভারতে যে নূতন শাসননীতি প্রবর্তিত হইতে চলিয়াছে, তাহার মূল ভিত্তি সাম্প্রদায়িকতা। তাহারই প্রতিবাদে আহূত সভায় কবি যোগদান করিলেন, হিন্দুসমাজের জন্য বিশেষভাবে ওকালতি বা মুসলমান সমাজের অন্যায় দাবির নিন্দা করিতে তিনি চাহেন নাই; ধর্ম তথা সম্প্রদায়-নিরপেক্ষ রাষ্ট্রর আদর্শই ভারতের গ্রহণীয়, এই ছিল কবির কথা।

রবীন্দ্রনাথের ভাষণ সাম্প্রদায়িকতার বিরোধী বলিয়া মুসলমান পত্রিকাওয়ালারা কবির উপর খুবই বিরক্ত হইল; আর-এক দল ক্ষুণ্ণ এই ভাবিয়া যে, রবীন্দ্রনাথ চিরদিনই আবেদন ও নিবেদনের বিরোধী, তিনি কেন ভারত-সচিবের

১ ভারত-সচিব জেটল্যানড (আর্ল অব্ রোনালড্‌সে) বড়লাট লিনলিথগোকে লিখিয়া পাঠাইলেন, "I made it abundantly clear that H. M.'s Government would not propose any alteration of the communal award under the section except with the assent of the communities affected." তিনি গতবৎসরের তাঁহার আর-একটি বিবৃতি (১৯৩৫ জুলাই ৮) উদ্ধৃত করেন, "Now let me say once more, and I hope once and for all that not only is it not the intention of the Govt....to make any alteration in the communal award unless it is desired by the communities themselves, but that no such alteration could be made under this clause without the specific consent of Parliament."

মেমোরিয়লে সহি করিতে গেলেন। কিন্তু আমরা জানি দেশের ও দশের ডাকে কবি চিরদিনই সাড়া দিয়াছেন; এবারও তাহাই করেন।

দুই বৎসর পূর্বেও যখন দিল্লীতে মদনমোহন মালব্য সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা-বিরোধী সম্মেলন আহ্বান করেন, তাহাতে রবীন্দ্রনাথকে নিমন্ত্রণ করা হয়। রবীন্দ্রনাথ মালব্যজিকে টেলিগ্রাম করিয়া জানান[১], "You all know, that I have always disapproved of the communal award. I hope our leaders will join their forces to save from its paralysing grip the political integrity of the nation."

এই টেলিগ্রাম পাঠাইয়াই কবি এই পত্রখানি মালব্যজিকে লিখিয়াছিলেন,—"I address the Mahomedans as well as Hindus with the most sincere desire for the good of all sections of the community. I urge that Hiudus and Mahomedans should sit together dispassionately to consider the communal award and the implications to arrive at an agreed solution of the communal problen. It is needless to point out that self-government cannot be based on communal divisions, and separate electorate. No responsible system of government can be possible without mutual understanding of our communities and united representations at legislature. Wo must concentrate all our forcos to evolve a better understanding and co-oparation between different sections of our people and thus lay a solid foundation of our Motherland. I depreciate all expressions of angry feelings and most strongly appeal to Hindus and Musalmans to avoid saying and doing anything that may increase communal tension and further postpone the understanding between our communities without which there can be no peaceful progress of the country"[২]

বলা বাহুল্য, কবির কথা শুনিবার জন্য রাষ্ট্রনীতিকদের আদৌ ব্যাকুলতা ছিল না; কিভাবে ধর্মের জিগির তুলিয়া দলপুষ্ট করা যায় ও ব্যক্তিগত বা দলগত আধিপত্য কায়েম করা যায়, তাহাই ছিল সাম্প্রদায়িক-ভিত্তিমূলক-শাসন-ব্যবস্থা-সমর্থনকারীদের প্রধান ভাবনা। রবীন্দ্রনাথ এই মনোভাবের নিন্দা করেন এবারকার সভাতেও। রবীন্দ্রনাথ এই সভায় যে-ভাষণ দান করেন তাহার মর্মানুবাদ নিম্নে দেওয়া গেল:

আমি রাজনীতির লোক নহি। আজিকার আলোচনার বিষয়—সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা—মুখ্যতঃ রাজনীতিরই প্রশ্ন। স্বভাবগত কুণ্ঠা সত্ত্বেও এ-আলোচনায় আমি যোগদান না করিয়া থাকিতে পারিলাম না, কারণ আমাদের জাতীয় ঐক্যবোধকে বিচূর্ণ করিবার জন্য যে-শক্তি আজ উদ্যত হইয়াছে তাহার প্রতিরোধকল্পে দেশব্যাপী সুদৃঢ় সংকল্পের প্রয়োজন।

য়ুরোপ এখন এক তমসাচ্ছন্ন পরিস্থিতির মধ্য দিয়া চলিতেছে। নবযুগের যে আদর্শ একদিন সে সর্বসমক্ষে তুলিয়া ধরিয়াছিল আজ তাহাকে সে নিজেই অস্বীকার করিতেছে। প্রতারিত পক্ষকে চিরপঙ্গু করিয়া দিবার উদ্দেশ্যে য়ুরোপীয় সংবাদপত্রগুলিও আজ প্রভুশক্তির পক্ষ হইতে বিদ্বেষবিষ উদ্‌গার করিতেছে। আমাদের সংবেদনশীল জাতীয় চেতনার মূলোচ্ছেদকল্পে উদ্‌ভাবিত যে অভিনব পরিকল্পনা আজ আমাদের গভীর আশঙ্কার সৃষ্টি করিয়াছে তাহার সহিত পূর্বোক্ত কোনো ঘটনার তুলনা করিতে আমি সংকোচ বোধ করি। বৃহত্তর জগতের পক্ষে আপাতদৃষ্টিতে এ

১ **Rabindranath Tagore on the communal problem, Mod. Rev. 1934 Sep. p 847.**

২ **Mod. Rev. 1934 Sep. p 847-48.**

ঘটনার গুরুত্ব উপলব্ধি করা কঠিন; যাহারা প্রত্যক্ষভাবে এ নির্দয় অপমানের ভুক্তভোগী তাহাদের কাছেই ইহা গভীরভাবে অর্থবহ। আমাদের কাছে ইহা আজ এত বড়ো সমস্যারূপে দেখা দিয়াছে যে বার্ধক্য ও অস্বাস্থ্য সত্ত্বেও আমি এ সভায় অনুপস্থিত থাকা লজ্জাজনক মনে করিলাম।

এই সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার প্রস্তাব আমাদের রাজনৈতিক জীবনে বিভেদ ও ব্যবচ্ছেদের যে দুর্বহ অভিশাপ বহন করিয়া আনিল, দেশ তাহা চাহে নাই। ভারতের রাষ্ট্রীয় সত্তাকে যে আঠারো শাখায় বিভক্ত করার প্রস্তাব হইয়াছে, মহাত্মা গান্ধী তাহাকে যথার্থ ই রাষ্ট্রের শবব্যবচ্ছেদ-রূপে অভিহিত করিয়াছেন। পৃথক্ নির্বাচনব্যবস্থার কুফল আরো প্রকট হইয়া উঠিয়াছে সম্প্রদায়সমূহের গুরুত্ব-নিরূপণে (weightage) বৈষম্য থাকায়; ইহা সরকারের বর্তমান মনোভাবেরই উপযোগী, দেশবাসীর নহে। প্রস্তাবিত বিধানে হিন্দুসম্প্রদায়কে সহজবোধ্য কারণেই বিশেষভাবে অসুবিধাগ্রস্ত হইতে হইবে; বাঙালী হিন্দুরা তো উনজনসম্প্রদায়ভুক্ত (minority) হওয়ায় নিরাপত্তার পরিবর্তে সর্বাধিক অসুবিধার সম্মুখীন হইবে,—তাহাদের স্বাভাবিক সংখ্যা-শক্তির উপযোগী প্রতিনিধিত্বটুকুও হারাইবে। এই অভিনব রাজনৈতিক ব্যবস্থা উভয় সম্প্রদায়ের পক্ষেই অপমানকর, কারণ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও সহযোগিতার ভিত্তিকে ইহা চিরকালের জন্য শিথিল করিয়া দিতে পারে,—সহযোগের স্থানে উৎপীড়নই ডাকিয়া আনিতে পারে। মুসলমান-সম্প্রদায় তাহাদের সংখ্যাগুরুত্বের সুযোগসুবিধা হইতে বঞ্চিত হউক ইহা আমরা কখনোই চাহি না;—তবে ভবিষ্যতে পারস্পরিক সহযোগিতার সমস্ত সম্ভাবনা তিরোহিত হউক ইহাও কাহারো পক্ষে বাঞ্ছনীয় নহে। আলোচ্য ব্যবস্থায় বিশ্বাসের পরিবর্তে সন্দেহই ডাকিয়া আনিবে, ধর্মান্ধ নেতারা এই সাম্প্রদায়িক উন্মাদনাকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে নিয়োজিত করিবে। জাতির রক্ত এভাবে কূট রাজনীতির বিষে জর্জরিত করিলে চরম অশুভক্ষণ উপস্থিত হইবে; একথা আজ শাসকবৃন্দকে স্মরণ করাইয়া দিই।

দেখা যাইতেছে এ প্রস্তাবের সূচনামাত্র এই প্রদেশের পরিস্থিতি জটিল হইয়া পড়িয়াছে; পারস্পরিক সহনশীলতা, সহযোগ ও সৌভ্রাত্রের ভিত্তিতে যে সভ্য জীবনের প্রতিষ্ঠা, তাহা একান্তই বিচলিত হইয়াছে। এমনকি আমাদের ভাষা ও সাহিত্যের ক্ষেত্রেও অসংযত ও ধ্বংসাত্মক মনোবৃত্তি দেখা দিয়াছে। স্কটল্যাণ্ড যদি তাহার মাতৃভাষার সহিত পার্থক্য-হেতু ইংরাজি ভাষার বিরুদ্ধে হঠাৎ বিদ্রোহী হইয়া উঠিত এবং পরস্পর সাংস্কৃতিক আদান-প্রদান হইতে বিরত হইত তবে এ ঘটনার একটা তুলনাস্থল মিলিত। এটি নিঃসন্দেহে আসন্ন বিপদেরই সংকেত, প্রতিবেশী সম্প্রদায়দ্বয়ের মধ্যে সংঘাত বাধিবার পূর্বসূচনা। সাধারণ জনকল্যাণের ভিত্তি যদি এভাবে বিচলিত হয় তবে আমাদের রাজনৈতিক শক্তিই যে শুধু খর্ব হইবে তাহা নহে, অর্থনৈতিক উন্নতির পথও প্রতিরুদ্ধ হইবে।

সরকারী চাকুরিতে নিয়োগ ব্যাপারেও যে-অনুপাতে বণ্টনব্যবস্থা শুরু হইয়াছে তাহাতে শাসনযন্ত্র অযোগ্য হস্তে পড়িয়া দুর্বল হইবারই সম্ভাবনা। নানাকারণে অবশ্য এতদিন মুসলমানসম্প্রদায় সুযোগসুবিধার অগাম্য হেতু নানারূপ কষ্ট পাইয়াছে। এ বৈষম্য হইতে তাহারা যাহাতে মুক্ত হয়, সর্বান্তঃকরণে তাহাই আমি চাই। কিন্তু যে ব্যবস্থা দেখা যাইতেছে তাহা এ সমস্যার যথার্থ সমাধান নহে; তাহা আমাদের সর্বজনীন মঙ্গলের পরিপন্থী, অতএব অস্বাস্থ্যকর। এভাবে অনুগ্রহ প্রদর্শন করিয়া কাহারও উন্নতি সাধন করা যায় না; পক্ষান্তরে এ-ব্যবস্থা চারিত্রিক দৈন্যেরই পরিপোষক হইয়া পড়ে। মুসলমানসম্প্রদায়ের মধ্যে বহু দুর্লভ ও প্রশংসনীয় গুণের সমাবেশ আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে; বিশেষতঃ তাহাদের সহজাত গণতান্ত্রিক মনোবৃত্তি তাহাদিগকে স্বভাবতঃই বিশেষ যোগ্যতার অধিকারী করিয়াছে। আমার অন্তরঙ্গ বন্ধুদের মধ্যে মুসলমান-ধর্মাবলম্বীর সংখ্যা অল্প নহে; আমি তাঁহাদের মনেপ্রাণে ভালোবাসিয়াছি, তাঁহাদের গুণে মুগ্ধ হইয়াছি। আমি সবসময়েই আশা করিয়াছি, যে-মূঢ়তা ও অসংস্কৃত যুক্তিহীনতা

আমাদের উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে বিচ্ছেদের সৃষ্টি করিয়াছে, তাহা এই ব্যক্তিগত নৈকট্যবোধ ও মৈত্রীবুদ্ধির কাছে পরাজিত হইবে। সহানুভূতিশূন্য স্বার্থপর বিদেশী রাজশক্তির পক্ষপাত-প্রবণতা এই সাম্প্রদায়িক বিচ্ছেদকে অবশ্য বাড়াইয়া তুলিতেই চেষ্টা করিবে। পরিণামদর্শী সরকারের এজাতীয় আনুকূল্য দুর্নীতির পরিমাণ বাড়াইবে; অনুগৃহীত ও বঞ্চিত উভয় পক্ষই শেষপর্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। আমাদের যখন একই ভূমিতে বাস ও বিচরণ করিতে হইবে, তখন সভ্যজনোচিত অস্তিত্ব রক্ষার জন্যও অন্ততঃ পারস্পরিক মৈত্রীর শরণাপন্ন হইতে হইবে,— উভয় পক্ষকেই এ-সব সাময়িক প্রলোভন ও উত্তেজনার ঊর্ধ্বে উঠিতে হইবে। আমাদের মৈত্রী ও শান্তির পথ যাহারা কণ্টকাকীর্ণ করিতেছে তাহাদের উপর আস্থা রাখিলে চলিবে না। অপর সম্প্রদায়ের আকস্মিক রাজকীয় আনুকূল্য লাভে হিন্দুদেরও ঈর্ষ্যান্বিত হওয়া সমীচীন হইবে না। এই পক্ষপাতিত্ব ও প্রশ্রয়দান যখন নিরঙ্কুশ রাজ্যশাসনেও শোভনতার সীমা অতিক্রম করিবে তখন এক বিশ্রী প্রতিক্রিয়া দেখা দিবে। ইহাই প্রধান আশঙ্কার বিষয়। এ সমস্যার আলোচনায় যুক্তিতর্কের অবতারণা একান্তই নিরর্থক; কারণ রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানে সাম্প্রদায়িক বিচ্ছেদ যে কতদূর আত্মঘাতী তাহা পার্লামেণ্টী আদবকায়দায় সুশিক্ষিত ইংরাজ শাসক ভালোই জানে। তাহাদের এ মনোবৃত্তি এক আসন্ন অমঙ্গলেরই সূচনা করিতেছে।

সর্বাপেক্ষা দুর্ভাগ্যের কথা,—এ ব্যাপারে যে-মুসলমানসম্প্রদায়ের উপর আজ আমাদের প্রচণ্ড ক্রোধ উদ্রিক্ত হইয়াছে তাহাদিগকেও এই ধ্বংসাত্মক নীতির কুফল সমপরিমাণেই ভোগ করিতে হইবে। তাহারা হয়তো এ প্রস্তাবের মাদকতায় প্রথমটা মুগ্ধ হইবে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত ইহা তাহাদের স্বার্থসিদ্ধির অন্তরায়ই হইবে, আমাদেরও শান্তিভঙ্গের কারণ হইবে। ঘটনাপ্রবাহে যখন অপর-পক্ষও বুঝিতে পারিবে এ-ভাবে কত শুভসম্ভাবনা বিনষ্ট হইতেছে, তখন তাহাদেরও শুভবুদ্ধির সূচনা হইবে। ইতিমধ্যে আমি হিন্দু-সম্প্রদায়কে মতি স্থির রাখিতে অনুরোধ করি, তাহারা যেন এ আঘাতে দিশাহারা না হইয়া পড়ে। যাহারা এই নীতি রচনা করিল, তাহাদের রাজনৈতিক মতিভ্রংশের বিরুদ্ধে সতর্কবাণী উচ্চারণ করা আমার পক্ষে ধৃষ্টতা মাত্র, কারণ তাহাদের এই একতরফা অনুগ্রহ একান্তই উদ্দেশ্য-প্রণোদিত।

য়ুরোপের আধুনিক পরিস্থিতি যাঁহারা পর্যবেক্ষণ করিয়াছেন তাঁহারা এ শিক্ষা নিশ্চয় পাইয়াছেন যে, অসহায় কোনো জাতিকে তাহার অনিচ্ছাতে সাময়িকভাবে অন্যায় সহ্য করানো চলে, কিন্তু সে অন্যায়কে জোর করিয়া গ্রহণ করানো চলে না। যাহারা ভাবিয়াছে যে এই অনুগ্রহলাভে তাহারা চিরন্তন সৌভাগ্যের অধিকারী হইল তাহারা প্রচণ্ড ভুল করিতেছে। আমাদের ইতিহাসের বর্তমান পর্ব এক গুরুত্বপূর্ণ সন্ধিক্ষণ; এখন এ ধরনের ভ্রান্ত ধারণা আমাদের স্বরাজসাধনার পথে বিপুল বাধার সৃষ্টি করিবে। শুধুমাত্র সুযোগসুবিধার বৈষম্যটুকুই আশঙ্কার মূল কারণ নহে— এই বৈষম্য উভয়-সম্প্রদায়ের মধ্যে যে বিরোধী মনোবৃত্তির সৃষ্টি করিবে তাহাই বিপজ্জনক। ইহা উভয় পক্ষকেই জাতিদ্বেষে উৎসাহিত করিবে, প্রতিবেশী সম্প্রদায়দ্বয়ের সৌহার্দ্যের ভিত্তি আক্রমণ করিবে।

যুদ্ধোত্তর হতাশার যুগের বহুপূর্বেই আমার জন্ম। বহুনিন্দিত ভিক্টোরীয় যুগের সাহিত্য ও মানবতা-সাধনা সমুদ্রপার হইতেই আমার চিৎপ্রকর্ষের খোরাক জুটাইয়াছিল। আজ আবার দেখিতেছি সেই পশ্চিমের সভ্যতাই স্বাধীনতার কণ্ঠরোধ করিতেও কুণ্ঠিত নহে, অন্যায় ও অবিচারের প্রচারেও তাহার সংকোচ নাই। তবু, মানবতার আদর্শের প্রতি যে শ্রদ্ধাবোধ পাশ্চাত্যমানসের বিশিষ্ট লক্ষণ, তাহার সম্বন্ধে আস্থা হারাইব না। আমাদের ভবিষ্যৎকে নির্জীব করিয়া দিবার উদ্দেশ্যে যে কূটনৈতিক চক্রান্ত চলিতেছে তাহা প্রত্যক্ষ করিয়া সত্যই মর্মাহত হইয়াছি। তবু ইংরাজের মধ্যে পাশ্চাত্য সভ্যতার শ্রেষ্ঠ আদর্শগুলির যে এখনো স্থান আছে তাহা অবিশ্বাস করিব না। আমি বিশ্বাস করি ইংরাজের মধ্যে যে আদর্শচ্যুতি দেখা দিতেছে তাহা হইতে সে যদি এখনো নিজেকে বাঁচায়, ভারতবাসীর মন

আবার জয় করিতে পারে, তবে তাহা শুধু তাহার সভ্যতারই মর্যাদাবৃদ্ধি করিবে না—অন্যভাবেও নিজেকে উপকৃত করিবে। এ বিশ্বাস না থাকিলে আজিকার এ সভা ডাকা নিরর্থক হইত।[১]

টাউন-হলের সাম্প্রদায়িকতা-বিরোধী সভার পর কবিকে আর-একটি বিশেষ অনুষ্ঠানে উপস্থিত দেখি। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের গৃহে রবি-বাসরের সপ্তম বর্ষের সপ্তম অধিবেশনে কবি নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন (১৩৪৩ শ্রাবণ ৩) ১৯৩৬ জুলাই ১৯। রবি-বাসরের সর্বাধ্যক্ষ জলধর সেন শ্রদ্ধানিবেদন করিলে কবি কিছু বলেন।[২]

কবি আজকাল সাধারণের নিকট দুর্লভ হইয়াছেন বলিয়া কেহ কেহ তাঁহার অপবাদ করেন; কবি এই বিষয় সম্বন্ধে কিছু বলিবার অবসর পাইলেন। বক্তৃতা শেষে তিনি বলেন, "সাহিত্য সাধনা বড়ো কঠোর সাধনা। রস-রচনায় প্রবৃত্ত হতে হলে, সাহিত্যের সেবায় আপনাকে নিয়োজিত করতে হলে কঠিন আবরণের ভিতর দিয়ে চলতে হবে। অঙ্কুর যেমন কঠিন আঁঠির ভিতর থেকে আপনাকে সরস ক'রে, সুন্দর ক'রে ধরণীর বুকে আত্মপ্রকাশ করে, তেমনি কঠোর সাধনা…করতে হবে, তবে তো সে সাধনা সার্থক ও সুন্দর হয়ে উঠবে, পুষ্পপল্লবে বিকশিত হবে।"

কলিকাতার বিবিধ উত্তেজনা হইতে মুক্তি পাইয়া এক সপ্তাহ পরে কবি শান্তিনিকেতনে ফিরিলেন (জুলাই ২০)। ফিরিয়া জবহরলাল নেহেরুর নিকট হইতে এক পত্র পাইলেন।[২] জবহরলাল তখন কন্‌গ্রেসের সভাপতি; সিন্ধু লর্‌কানা হইতে (১৯৩৬ জুলাই ২১) তিনি কবিকে ব্যক্তি-স্বাধীনতা সংঘের (Indian Civil Liberties Union) সম্মানার্হ সভাপতি হইবার জন্য অনুরোধ জ্ঞাপন করিয়াছেন। কবি তদুত্তরে (জুলাই ২৮)[৩] তাঁহার স্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন।[৩]

১ লেখকের অনুরোধক্রমে নিমাই চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক অনূদিত।

২ যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত অনুলিখিত। বিচিত্রা ১৩৪৩ শ্রাবণ পৃ ১-৫।

২ Pandit Jawaharlal Nehru sent a circular letter to Gurudeva from Allahabad on 24 April, 1936 in which the urgent need of starting an Indian Civil Liberties Union was discussed and the co-operation of the addressee was invited for forming such a union. In another circular letter dated July 8, 1936, Pandit Nehru asked for Gurudeva's permission to include his name in the list of the foundation members of National Council of the Indian Civil Liberties Union. This circular letter had also a proposal that Mrs. Sarojini Naidu should be the President of the Union. Replying on July 18, 1936 Gurudeva gave his consent to serve as a foundation member of the National Council of the Civil Liberties Union and also his approval of Mrs. Naidu's election as the President of the Union.

In a personal letter dated camp Larkana, July 21, 1936. Pandit Nehru requested Gurudeva to agree to be the Honorary President of the Civil Liberties Union : "I had not suggested this before as I did not wish to add, in any way, to your burdens. But an honorary work of this kind would in no way put any burden on you and it would add to the prestige of our union very greatly. There is obviously no other person in India who could better fill that place. As you know some of us have suggested Mrs. Sarojini Naidu's name for the Presidentship or Chairmanship of the National Council. The idea is that she could be the active head of the Council, looking after its general direction, and that you would be the honorary head of the whole organisation. We do not want it to be in any way a Congress organisation or to be political in any narrow sense of the word. Fortunately many prominent non-Congressmen and some people who are not politically inclined are agreeing to join the Union. This will give it a broad basis. But with you at the head this would be still more assured. There is a general consensus of opinion on this subject. I do hope that you will be good enough to agree."

Giving his consent to be the Honorary President of the Union Gurudeva wrote to Panditji on July 28, 1936 : "If my name gives you any help in the cause for which I have every sympathy, you should most certainly have it."

(Note Supplied by Mahit K. Mazumder of the Ravindra Sadan. ধীরচন্দ্র কর এ বিষয়ে প্রথম আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন; দৈনিক বসুমতী ১৩৫৮ মাঘ ১২ দ্রষ্টব্য।)

৩ এই সময়ে রবীন্দ্রনাথের ঢাকায় যাওয়ার কথা ছিল, কিন্তু শরীরের জন্য যাওয়া হয় নাই। তাঁহার অনুপস্থিতিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে ডি. লিট্ (Honoris causa) উপাধি প্রদান করেন (১৯৩৬ জুলাই ২৯)। শ্রীনিকেতনের ডক্টর প্রেমচাঁদ লাল ১৪ বৎসর পরে কাজ ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন ১৯৩৬ জুলাই ৩১। ইঁহার রচিত The Rural Reconstruction গ্রন্থ কবির ভূমিকা সমেত ১৯৩২ সালে প্রকাশিত হয়।

জগতের মহত্তর ভাবের ক্ষেত্রে আহ্বান আসে—সাড়া দেন, পত্র লেখেন, বাণী পাঠান; এ সবই খানিকটা নৈর্ব্যক্তিক। কিন্তু শান্তিনিকেতনের দৈনন্দিন সমস্যা অত্যন্ত বাস্তব। কবির কাছে সকলেরই দ্বার মুক্ত, প্রত্যেকেই ইচ্ছা করিলে অভাব অভিযোগ ত্রুটি লইয়া সরাসরি হাজির হইতে পারিতেন। কিন্তু শান্তিনিকেতন এখন বড়ো হইয়া গিয়াছে, বহু বিভাগে বহু কর্তা; সুষ্ঠুভাবে কর্ম পরিচালনার জন্য ও ভবিষ্যতে অবাঞ্ছিতদের উপদ্রব হইতে বিশ্বভারতীকে রক্ষা করিবার জন্য এই সময়ে বিশ্বভারতীর কনস্টিটিউশন বা বিধানপত্রের যেসব পরিবর্তন সাধিত হয় তাহার কথা পূর্বে বলিয়াছি।

নূতন ব্যবস্থায় পুরাতন অধ্যাপক-মণ্ডলীর স্থান বিশেষভাবে সংকুচিত হইয়া গিয়া শাসনভার বহুল পরিমাণে গিয়া বর্তাইল মুষ্টিমেয় লোকের উপর। এ আদর্শে শান্তিনিকেতন প্রতিষ্ঠিত হয় নাই; পুরাতন tradition ও নূতন পরিস্থিতির সামঞ্জস্য আছে কিনা তাহাই ছিল সেদিনের প্রশ্ন। কবি ভালো করিয়া জানিতেন দায়িত্ব দিয়া, সম্মান দিয়া কর্মীদের নিকট হইতে যে-কাজ পাওয়া যায়, তাহা কেবলমাত্র বর্ধিত হারে বেতন দিলে পাওয়া যায় না। অথচ সময়ের পরিবর্তনে নূতন ব্যবস্থারও একান্ত প্রয়োজন। তাই কবি একদিন শান্তিনিকেতনের অধ্যাপকদের আহ্বান করিয়া যে ভাষণ দিলেন তাহাতে কবির এই দোটানা মনের ভাবটি প্রকাশ পাইয়াছে। 'হেথা হতে যাও পুরাতন হেথায় নূতন খেলা আরম্ভ হয়েছে' বলিয়াও পূর্বস্মৃতিকে মুছিয়া ফেলিতে পারিতেছেন না, আবার নূতনের প্রতি আকর্ষণও তাঁহার কম নহে।

কবি সভায় অধ্যাপকদের আহ্বান করিয়া বলিলেন, "আজকে তোমাদের ডেকেছি কোনো কিছু নতুন করবার বা বলবার জন্যে নয়। আগে আমাদের এখানে যে অধ্যাপকদের মিলনসমিতি ছিল তারই স্মৃতি মনে আনবার জন্যে। আগে ছাত্রদের এবং অধ্যাপকদের সামাজিকভাবে মেলামেশার ব্যবস্থা ছিল, তারই পুনরুদ্ধার করা আমি বাঞ্ছনীয় মনে করি। এখন কর্মবিভাগ উপলক্ষ্যে নিজেদের মধ্যে পার্থক্য ঘটার দরুন ভুল বোঝা বা না বোঝার সম্ভাবনা এসেছে—এ আমি অনুভব করি।...

"কোনো একটা বিশেষ দিনে অধ্যাপকরা সমবেত হয়ে পরস্পর খোলাখুলিভাবে বলবার কইবার সুযোগ যাতে পান, সেটা আমার ইচ্ছা। আমিও এই রকম মিলনসভা হলে তাতে যোগ দিতে পারব। যদি কারও মনে কোনো গ্লানি থাকে, তবে সেটা স্পষ্ট করে বলবার সুযোগ থাকবে। অপ্রিয় হলেও যা অকৃত্রিম সত্য—তাকে স্বীকার করার মতো ধৈর্য ও ঔদার্য যেন আমাদের থাকে। যেসব জায়গায় স্বার্থ বা ক্ষমতা নিয়ে কাড়াকাড়ি, সেখানে হয়তো এটা সহজ নয়। কিন্তু এই আশ্রমে এটা প্রত্যাশা করবারই বিষয়। কেবল কর্তাদের মন জুগিয়ে যে মিলন আমি সেই রকম মিলনের কথা বলছি না।...চক্ষুলজ্জা বা মিথ্যা মিষ্টতার চর্চা করা যেন আমাদের না হয়। যদি অধ্যাপক সভা পুনর্বার প্রতিষ্ঠিত হয় তবে সেখানে আমি থাকতে চাই এইজন্যে যে, কোনো অসামঞ্জস্য ঘটলে আমি সমন্বয়ের চেষ্টা করতে পারি।"

গত পঁয়ত্রিশ বৎসরের মধ্যে বিদ্যালয়ে যে আত্মশাসন ও আত্মকর্তৃত্বের tradition গড়িয়া উঠে নাই, তাহা পরিতাপের বিষয় নিঃসন্দেহ। একথা স্বীকার করিতে হইবে যে, দায়িত্ব ও স্বাধীনতা লাভ করিয়া সকল সময়ে আমরা তাহার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করি নাই। রবীন্দ্রনাথ যথেষ্ট সুযোগ দিয়াছিলেন, কিন্তু কেন যে সেসব রক্ষিত হয় নাই, তাহার ইতিহাস সম্যক্‌ভাবে আলোচিত হওয়া প্রয়োজন। যাহাই হউক, কবি নূতন কনস্টিটিউশনের সমর্থনকল্পে বলিতেছেন, "ঢিলেমির প্রশ্রয় ঘটেছিল ডিমোক্রেসির নামে।...আমরা পরের শাসনে বাঁধা কাজ চালাতে পারি কিন্তু নিজের প্রবর্তনায় পারিনে। এই কারণে আমাদের এখানে উচ্ছৃঙ্খলতা এসেছিল।...তাই এখানে চারদিকে পরস্পর সম্বন্ধের অবাধ উদারতার মাঝখানে কর্মচালনার কর্তৃত্বপদ সৃষ্টি করতে হয়েছে।" এইভাবে নূতনকে সমর্থন করিয়া কবি পুরাতনের ভাবটিকে রক্ষা করিবার আশায় অধ্যাপকগণকে তাঁহার চারিপার্শ্বে কেন্দ্রিত হইবার জন্য

অসহায়ভাবে আহ্বান করিতেছেন। তিনি বলিলেন, "আমি সেজন্য ঠিক করেছি যে তোমাদের যা বলবার তা আমার সমক্ষে বলবে, সাহস ক'রে। পৌরুষের অভাবে আমরা ঠিক সময়ে ঠিক কথাটা বলতে পারি না ;···পৌরুষের অভাবে আমাদের এই মেরুদণ্ডহীন দেশে আড়ালে লুকিয়ে কত যে গোলমাল, কত চক্রান্ত, কত বিদ্বেষ— এ যেন আমাদের জাতিগত। ···দেশে বাইরে বড়ো বড়ো কর্মক্ষেত্রে তো ক্রমাগত দলাদলি মারামারি হচ্ছে। যদি আমাদের এ আশ্রম তারই একটা ক্ষুদ্র সংস্করণ হয় তবে সেটা তো বাঞ্ছনীয় হবে না, অথচ মন জুগিয়ে সত্য গোপন করার মতো প্রবৃত্তি যেন আমাদের না হয়। কারণ চিত্তের দুর্বলতা থাকলে সত্যকার মিলন হবে না— হতে পারে না।"[১]

কবির ইচ্ছা[২] সরকারীভাবে যেসব অধিকার হইতে অধ্যাপকগণ নববিধান মতে বঞ্চিত, ব্যক্তিগতভাবে কবি তাহা পূরণ করিবেন ; বলা বাহুল্য কবির বয়স ও স্বাস্থ্য ইহার অনুকূল নহে, তাঁহার ইচ্ছার আগ্রহ যতই থাকুক না কেন।

কবি গ্রীষ্মকালে 'শ্যামলী' নামে মাটির বাড়িতে ছিলেন ; কিন্তু বর্ষা আরম্ভ হইলে বুঝা গেল বারিহীন ইরান, মিশরে মাটির ছাদ টিকিতে পারে, এদেশে যেখানে পঞ্চাশ-ষাট ইঞ্চি বারিপাত হয়, সেখানে উহা অচল। সেইজন্য শ্যামলীর পাশেই আর-একখানি বাড়ির পত্তন হইল—ইহার প্রাচীরাদি মাটির, তবে ছাদ কন্‌ক্রীটের ; ইহার নামকরণ হয় 'পুনশ্চ'।[৩]

'শ্যামলী' কাব্য উৎসর্গ করেন 'কল্যাণীয়া শ্রীমতী রানী মহলানবীশ'কে (১৩৪৩ ভাদ্র ১)। গত কয়েক বৎসর রবীন্দ্রনাথ যখন কলিকাতায় আসিতেন তখন প্রায়ই উঠিতেন বরাহনগরে অধ্যাপক মহলানবীশের বাসা-বাটীতে।[৪] 'পথে ও পথের প্রান্তে'র ভূমিকায় কবি রানী দেবী সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন তাহা স্মরণীয়। দীর্ঘকালের আসা-যাওয়ায় এই বরাহনগরের বাড়িটির সঙ্গে কবির মনের একটা বিশেষ যোগ হইয়াছিল, সেই কথাটি 'শ্যামলী'র উৎসর্গে বলেন মিল-ছন্দের কবিতায়।

বাংলা দেশের বনপ্রকৃতির মন।
শহর এড়িয়ে রচিল এখানে ছায়া দিয়ে ঘেরা কোণ।
বাংলাদেশের গৃহিণী তাহার সাথে আপন স্নিগ্ধ হাতে
সেবার অর্ঘ্য করেছে রচনা নীরব প্রণতি-ভরা,
তারি আনন্দ কবিতায় দিল ধরা।

রবীন্দ্রনাথের জীবনের সবটা কাব্যও নহে, কর্মও নহে। অত্যন্ত জটিল মনস্তত্ত্ব ও ভাবনাপূর্ণ কবিতা লেখার মাঝে মাঝে মন সম্পূর্ণ দায়িত্বহীন রচনায় আপনাকে ভাসাইয়া দিতে চায়,—বাণীদান ও গুরু গম্ভীর কর্মসাধন— তাহারই ফাঁকে ফাঁকে হাসির পাথেয় পান ক্ষণে ক্ষণে, জীবন সরল হয়, মধুর হয়—সকল পার্থিব প্রতিকূলতার মাঝে মাঝে

১ ১৯৩৬ অগস্ট ২। বিশ্বভারতী পত্রিকা ১৩৫৯ মাঘ-চৈত্র পৃ ১৫৮-৫৯।

২ Under the order of the Founder-President the Adhyapaka Mandali has been revived at Santiniketan and Shishir Coomer Mitra [now of Pondichery] has been elected as the Secretary .. the first meeting will take place on ...the 4th October (1986]. V. B. News. 1936 Oct. p 26. উত্তরায়ণে কবির সম্মুখে অধ্যাপক ও কর্মীগণ মিলিত হইয়া জলযোগ করিতেন। খাওয়াইতে ও খাওয়াদাওয়া দেখিতে তাঁহার যে কী আনন্দ ছিল তাহা উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'স্মৃতিকথা' ও 'বিগতদিন' (গল্পভারতী) পাঠ করিলে জানা যায়। দ্র সুধীরচন্দ্র কর, কবিকথা. পৃ ৫।

৩ শ্যামলীর উদ্দেশে (১৩৪৩ শ্রাবণ ২১) কবি লিখিলেন—

এই ক'টা দিন তোমায় আমায় কথা হল কানে কানে,
আজ কানে কানে বলছ আমায়,—
"আর নয়, এবার তোলো বাসা।"
আমি পাকা করে গাঁথিনি ভিত,
আমার মিনতি ফাঁদিনি পাথর দিয়ে তোমার দরজায় ;
বাসা বেঁধেছি আলগা মাটিতে—
যে চলতি মাটি নদীর জলে এসেছিল ভেসে,
যে মাটি পড়বে গ'লে শ্রাবণধারায়।

৪ গিরিধিতে প্রশান্তচন্দ্রের বাড়ির নাম 'মহুয়া'।

পাওয়া এইসব পুরস্কার। খাপছাড়া, সে, প্রহাসিনী, ছড়ার ছবি, ছড়া, গল্পসল্প—সেই মুক্তিকামী মনের সৃষ্টি ; অবচেতন মনের কৌতুক দেখিবার জন্য আপনাকে সহজ করিয়া দেন ; relaxation, relief না থাকিলে সৃষ্টির পূর্ণতা হয় না। প্রকৃতির সৃষ্টির মধ্যে কত যে অদ্ভুত কিম্ভূত আছে তাহার ইয়ত্তা নাই ; দেখিয়া মনে হয় ভগবানও কী রসিক।

রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যিক জীবনে পূর্বেও এইটি দেখিয়াছি এখনো দেখিতেছি। হালকা মনের বল্‌গাহীন লেখনীর সঙ্গে যোগ দিয়াছে তুলির লিখন, রেখার অঙ্কন। কতকগুলি খাপছাড়া কবিতা ও তার সঙ্গে জমা হইয়াছে ছবি। 'খাপছাড়া' কবিতাগুলি উৎসর্গ করিলেন রাজশেখর বসুকে (১৩৪৩ ভাদ্র ৩)।[১] বসু মহাশয়কে রবীন্দ্রনাথ অতিশয় স্নেহ ও শ্রদ্ধা করিতেন। রাজশেখরের 'গড্‌ডালিকা' প্রকাশিত হইলে রবীন্দ্রনাথ তাহা পাঠ করিয়া আচার্য প্রফুল্ল-চন্দ্রকে লিখিয়াছিলেন, "আমি রস যাচাইয়ের নিকষে আঁচড় দিয়ে দেখলেম আপনার বেঙ্গল কেমিক্যালের এই মানুষটি একেবারেই কেমিক্যাল গোল্‌ড্‌ নন, ইনি খাঁটি খনিজ সোনা।" (১৩৩২ অগ্রহায়ণ ১৮)[২] খাপছাড়া রাজশেখরকে উৎসর্গ করিয়া কবি লিখিলেন (১৩৪৩ ভাদ্র ৩):

যদি দেখো খোলসটা খসিয়াছে বৃদ্ধের
যদি দেখো চপলতা প্রলাপেতে সফলতা
ফলেছে জীবনে সেই ছেলেমিতে-সিদ্ধের
যদি ধরা পড়ে সে যে নয় ঐকান্তিক, ঘোর বৈদান্তিক।
দেখো গম্ভীরতায় নয় অতলান্তিক,
যদি দেখো কথা তার
কোনো মানে মোদ্দার
হয়তো ধারে না ধার, মাথা উদ্‌ভ্রান্তিক,
মনখানা পৌঁছয় খ্যাপামির প্রান্তিক,
তবে তার শিক্ষার দাও যদি ধিক্কার
সুধাব, বিধির মুখ চারিটা কী কারণে।
একটাতে দর্শন করে বাণী বর্ষণ,
একটা ধ্বনিত হয় বেদ উচ্চারণে।
একটাতে কবিতা রসে হয় দ্রবিতা,
কাজে লাগে মনটারে উচাটনে মারণে।
নিশ্চিত জেনো তবে, একটাতে হো হো রবে
পাগলামি বেড়া ভেঙে উঠে উচ্ছ্বাসিয়া।
তাই তারি ধাক্কায় বাজে কথা পাক খায়,
আওড় পাকাতে থাকে মগজেতে আসিয়া।
চতুর্মুখের চেলা কবিটিরে বলিলে
তোমরা যতই হাস, রবে সেটা দলিলে।
দেখাবে সৃষ্টি নিয়ে খেলে বটে কল্পনা,
অনাসৃষ্টিতে তবু ঝোঁকটাও অল্প না।

রাজশেখরকে কবি যে 'খাপছাড়া' উৎসর্গ করিলেন তাহা অর্থপূর্ণ; কারণ রাজশেখর গল্পসাহিত্যে এই খাপছাড়ারই প্রবর্তক। শান্তিনিকেতনের সঙ্গেও কবি রাজশেখরের নাম যুক্ত করিলেন, কলেজ-ল্যাবরেটরির নাম দেওয়া হইল 'রাজশেখর বিজ্ঞান-সদন'। ছাপাখানার হাতার মধ্যে যে টিনের ঘরগুলি আছে, তাহাদেরই সম্মুখে এই অর্থহীন ফলক এখনো বিদ্যমান। বর্তমানের ল্যাবরেটরির সহিত কাহারও নাম জড়িত নহে।

ইতিমধ্যে শান্তিনিকেতনে বাৎসরিক বর্ষামঙ্গল উৎসব আসিল। "এবারকার বর্ষামঙ্গলের একটু নূতনত্ব ছিল। চিরপ্রচলিত প্রথাকে লঙ্ঘন ক'রে এবার উৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছিল ভুবনডাঙা গ্রামে। সেখানকার একমাত্র সম্বল একটি বৃহৎ জলাশয় বহুকাল যাবৎ পঙ্কোদ্ধারের অভাবে লুপ্তপ্রায় হয়ে এসেছিল। গ্রামবাসীদের জলাভাবের অন্ত ছিল না। বিশ্বভারতীর শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় প্রমুখ কর্মীদের উদ্যোগে এবং গ্রামবাসীদের সহযোগে অধুনা এই পুকুরটি খনন ক'রে নির্মল জলের সম্বল ফিরিয়ে আনা হয়েছে। এই জলাশয়ের প্রতিষ্ঠা এবার আমাদের বর্ষামঙ্গল-উৎসবের

১ বই ছাপা হয় পৌষমাসে ১৩৪৩।
২ দ্র সুশীল রায়, মনীষী জীবনকথা পৃ ৭২।

একটি অঙ্গরূপে পরিগণিত হয়। তাই এই ভুবনডাঙা গ্রামের প্রান্তে এই জলাশয়ের তীরেই উৎসবের মণ্ডপ রচিত হয়েছিল।"[১]

কবি বর্ষামঙ্গল অনুষ্ঠানে যে অভিভাষণ দেন, তাহাতে বলেন, "আমাদের বিশ্বভারতীর সেবাব্রতীগণ নিজেদের ক্ষুদ্র সামর্থ্য অনুসারে নিকটবর্তী পল্লীগ্রামের অভাব দূর করবার চেষ্টা করছেন। এদের মধ্যে একজনের নাম করতে পারি প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়। তিনি এই সম্মুখের বিস্তীর্ণ জলাশয়ের পঙ্কোদ্ধার করতে কী অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন, অনেকেই তা জানেন। বহুকাল পূর্বে রায়পুরের জমিদার ভুবনমোহন সিংহ[২] ভুবনডাঙার এই জলাশয় প্রতিষ্ঠা ক'রে গ্রামবাসীদের জলদান করেছিলেন। তখনকার দিনে এই জলদানের প্রসার কী রকম ছিল তা অনুমান করতে পারি যখন জানি এই বাঁধ ছিল পঁচাশি বিঘে জমি নিয়ে।" অতঃপর 'বৃক্ষরোপণ' অনুষ্ঠান হয়। কবি স্বহস্তে জলাশয় তীরে কৃষ্ণচূড়া রোপণ করিলেন। এবারকার বর্ষামঙ্গলে যেসব গান গীত হয়, তার মধ্যে এই তিনটি নূতন— (১) চলে ছলছল নদীধারা নিবিড় ছায়ায়, (২) আঁধার অম্বরে প্রচণ্ড ডম্বরু, (৩) ঐ মালতীলতা দোলে।

ভাদ্রের শেষভাগে কবি দিন দশেকের জন্য (৫-১৫ সেপ) কলিকাতায় যান; তাহার পূর্বে দুইটি বিষয় সম্বন্ধে তাঁহার মত ব্যক্ত করেন। লেখকের 'বঙ্গপরিচয়' নামে গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া কবি লিখিলেন (৪ সেপ্টেম্বর ১৯৩৬)— "বাংলাদেশকে আমরা অনেকেই যথোচিত চিনিনে। এই দুঃখে প্রভাতকুমারকে অনুরোধ করেছিলেম বঙ্গপরিচয় বইখানি লিখতে। তিনি সেইটি পালন করেছেন এবং উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছে।" কবি গ্রন্থখানি পাঠ করেন এবং লেখককে অনেক উপদেশ দেন।[৩]

পরদিন Women's International League for Peace and Freedom নামক আন্তর্জাতিক শান্তি ও স্বাধীনতাকামী নারী সংঘের জন্য কবি যে বাণী লিখিয়া দেন তাহার শেষ বাক্যটি এই,—"We cannot have peace until we deserve it by paying it full price—which is, that the strong must cease to be greedy and the weak must learn to be bold". দুর্বলের শক্তিহীনতার সুযোগে বলবান পাপিষ্ঠ হইয়া উঠে। রবীন্দ্রনাথ 'আত্মশক্তি' সাধনায় বিশ্বাসী। এই শান্তিকামী বিশ্বনারী প্রতিষ্ঠানের বহুশাখা আছে; মার্কিন রাষ্ট্রের বাহিরে ৬৯৭টি ও ভারতের মধ্যে ১১টি শাখা। ইহারা পাঁচ কোটি স্বাক্ষর সংগ্রহ করিয়া যুদ্ধকামী জাতিদের মনোভাব পরিবর্তনের আশা করিয়াছিলেন! হায়রে, আদর্শবাদীদের দুরাশা!

১ প্রভাতচন্দ্র গুপ্ত, শান্তিনিকেতনে বর্ষামঙ্গল, প্রবাসী ১৩৪৩ কার্তিক পৃ ৭৮-৮১। বর্ষামঙ্গল ৬ ভাদ্র ১৩৪৩।২২ অগস্ট ১৯৩৬।

২ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মজীবনী হইতে জানা যায় তাঁহার ৪১ বৎসর বয়সে তিনি হিমালয় ত্যাগ করিয়া কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন করেন (১৮৫৮ নভেম্বর ১৫। ১২৬৫ অগ্রহায়ণ ১) অতঃপর রেলের লুপ লাইন খোলা হইলে দেবেন্দ্রনাথ গুসকরা স্টেশনের নিকটবর্তী আম বাগানে তাঁবুতে বাস করেন। বোধ হয় এই সময়ে বা ইহার পূর্বে বোলপুরের নিকটবর্তী রায়পুরের জমিদার ভুবনমোহন সিংহের সহিত তাঁহার পরিচয় হয়। এই ভুবনমোহন সিংহ বোলপুরের উত্তরে প্রান্তরের মাঝে একখানি গ্রাম পত্তন করেন। ঐ গ্রাম বা ডাঙার উত্তর দিয়া একটি খাদ বা এদেশের ভাষায় কাঁদড় ছিল। এই কাঁদড়ের পশ্চিম দিকটা ঢালু। খাদের মাটি কাটাইয়া পশ্চিম দিকে একটি বাঁধ দেওয়া হয়। ইহাতে গ্রামবাসীদের জল সরবরাহের ও চাষবাসের সুবিধা হয়। ইহাই ভুবনডাঙার বাঁধ। (দ্র. শান্তিনিকেতন আশ্রম, জ্ঞানেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়) ১২৬৮ সালের ১৮ চৈত্র দেবেন্দ্রনাথ রায়পুরে ভুবনমোহনের গৃহে ব্রহ্মোপাসনা করেন; ইতিপূর্বে ফাল্গুন মাসেও তিনি সেখানে আসেন। ভুবন মোহনের জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রতাপনারায়ণ সিংহ দেবেন্দ্রনাথকে ভুবনডাঙার উত্তরে বিশ বিঘা জমি ৫৲ টাকা খাজনায় মৌরসী পাট্টা করিয়া দান করেন (১২৬৯, ফাল্গুন ১৮) ইহাই শান্তিনিকেতন। প্রতাপনারায়ণের পুত্র হেমেন্দ্রনাথ সিংহ 'প্রেম প্রভৃতি গ্রন্থের লেখক রূপে এককালে খ্যাতি লাভ করেন। হেমেন্দ্রনাথের পুত্র প্রেমানন্দ শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রমের আদি যুগের ছাত্র। এই প্রেমানন্দ পরযুগে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার শেষ অবস্থায় উহাকে পুনর্জীবিত করিবার ব্যর্থ চেষ্টা করেন। ভুবনডাঙার যথার্থ নাম ভুবননগর, মহর্ষির ট্রাস্টডীডে ও অন্যান্য জমিদারী কাগজে এই গ্রাম ভুবননগর রূপেই উল্লিখিত আছে।

৩ তাঁহার চিহ্নিত কপি বোধ হয় রবীন্দ্রসদনে আছে। বঙ্গপরিচয় ১ম খণ্ড, হৃষীকেশ সিরিজ নং ১৯, ১৩৩৩।

ভারতের প্রগতিশীল লেখকরা ব্রুসলসের এই শান্তিকামীদের বৈঠকে যে মন্তব্যটি পাঠান তাহাও স্মরণীয়। তাহাতে তাঁহারা বলেন : "ভারতের নাগরিক অধিকার হইতে যে সাংঘাতিক ভাবে সর্বসাধারণকে বঞ্চিত করা হইয়াছে, উহা কেবল রাজনীতির দিক হইতে অনর্থপাত নহে, কিন্তু উহা দ্বারা সংস্কৃতি ও তাহার বিস্তারচেষ্টাকে খোলাখুলিভাবে আক্রমণ করা হইতেছে। নানা প্রকার পুস্তকের মধ্যে…ওয়েব্ দম্পতির (Sidney and Beatrice Webb, Soviet Communism) পুস্তক নিষিদ্ধ হইয়াছে ; এমনকি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'রাশিয়ার চিঠি'র ইংরেজি অনুবাদও নিষিদ্ধ হইয়াছে।"[১] এতদ্ সম্পর্কে জবহরলাল নেহেরু তাঁহার আত্মজীবনীতে লিখিয়াছেন, "কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রুশিয়া দেখিয়া ফিরিয়া আসিবার পর রুশিয়া সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ লেখেন ; ঐ প্রবন্ধটি প্রকাশ করার জন্য বাঙ্গলা গবর্নমেণ্ট 'মডার্ন-রিভিউ' পত্রিকাকে সাবধান করিয়া দিয়াছিলেন। পার্লামেণ্টে সহকারী ভারত-সচিব আমাদের সংবাদ দিয়াছিলেন যে, 'ঐ প্রবন্ধে ভারতে ব্রিটিশ শাসনের সাফল্যগুলি সম্পর্কে বিকৃত মত প্রচার করা হইয়াছে' বলিয়াই ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছিল। সাফল্যগুলির একমাত্র বিচারক 'সেন্সর', আমাদের ভিন্নমত থাকাও উচিত নহে, তাহা প্রকাশ করাও উচিত নহে। ডাবলিনে 'সোসাইটি অব্ ফ্রেণ্ডস'-এর নিকট রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রেরিত একটি সংক্ষিপ্ত বার্তাও সংবাদপত্রে প্রকাশিত হওয়ায় গবর্নমেণ্ট আপত্তি প্রকাশ করিয়াছিলেন। ঠাকুরের মত ঋষিতুল্য ব্যক্তি, যিনি রাজনীতি হইতে ইচ্ছা করিয়া দূরে থাকিয়া শিক্ষা ও সংস্কৃতিগত ব্যাপার লইয়া আছেন, যিনি জগদ্বিখ্যাত এবং ভারতের সর্বত্র সম্মানিত, তাঁহার লেখাই যখন বন্ধ করিবার চেষ্টা হয়, তখন সাধারণ লোকের কি কথা!"[২]

কবি যে বাণীটুকু আয়রল্যানডের কোয়েকার খ্রীষ্টানদের নিকট পাঠাইয়াছিলেন, আমরা নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিতেছি ; যদিও ইহা দুই বৎসর পূর্বে লিখিত, তৎসত্ত্বেও এই সম্পর্কে তাহা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

"By segregating ethics to the Kingdom of Heaven and depriving the Kingdom of Earth from its use man has up to now never seriously acknowledged the need of higher ideals in politics or in practical affairs. That is why when disagreements occur between individuals, violence is not encouraged but punished ; but when the combatants are nations, barbaric methods are not only not condemned but glorified. The greatest men like Buddha or Christ have from the dawn of human history stood for the ideal of non-violence, they have dared to love their enemies and defied tyrannism by peace, but we have not yet claimed the responsibility they have offered us.

"Fight is necessary in this world, combat we must and relentlessly against the evils that threaten us, for by tolerating untruth we admit their claim to exit. But war on the human plane must be what in India we call Dharma-Yuddha—moral warfare, in it we must array our spiritual powers against the cowardly violence of evils. This is the great ideal which Mahatma Gandhi represents, challenging his people to fearlessly apply man's highest strength not only in the individual dealings, but in the clash of nation and nation.

১ দ্র প্রবাসী ১৩৪৩ আশ্বিন পৃ ৯৪১।

২ জওহরলাল নেহেরু আত্মচরিত, সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার কর্তৃক অনূদিত। ৩য় সং ১৩৫৫ পৃ ৬২৮। রবীন্দ্রনাথের 'রাশিয়ার চিঠি'র এক কিস্তি মডার্ন রিভিউ ১৯৩৪ জুন সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। অনুবাদক ডক্টর শশধর সিংহ।

"In the barbaric age man's hunger did not impose any limits on its range of food which included even human flesh but with the evolution of society this has been banished from extreme possibility ; in a like manner, we await the time when nothing may supposedly justify the use of violence whatever consequences we are led to face. Because, success in a conflict may be terrible defeat from the human point of view, and material gain is not worth the price we pay at spiritual cost. Much rather should we lose all than barter our soul for an evil victory. We honour Mahatma Gandhi, because he has brought this ideal into the sphere of politics and under his lead India is proving everyday how aggressive power pitifully fails when human nature in its wakeful majesty bears insult and pain without retaliating. India today inspired by her great leader opens the new chapter of human history, which has just begun."

রবীন্দ্রনাথ যাহাকে moral warfare বলিয়াছিলেন, আজ তাহাই moral armament নামে ভাবুকের দল প্রচার করিতেছেন।

ভাদ্র মাসের (১৩৪৩) শেষে কবি কলিকাতায় আসিয়াছেন ; এবার কোনো বিশেষ কাজের আহ্বানে সেখানে আসেন নাই ; বরাহনগরে প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশদের নূতন গৃহ নির্মিত হইয়াছে—কবি ভাবিলেন সেখানে কয়েকদিন বিশ্রাম করিবেন। বলা বাহুল্য কলিকাতায় গেলে সেইটিই হয় না।

আমাদের আলোচ্যপর্বে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে 'বাংলা বানানের নিয়ম' স্থির করিবার জন্য একটি কমিটি (১৯৩৫ নভেম্বর) গঠিত হয় ; উহার সভাপতি রাজশেখর বসু ও সম্পাদক চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্-চানসেলর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ১৩৪৩ বৈশাখ ২৫ 'বাংলা বানানের নিয়ম' নামে পুস্তিকার ভূমিকায় লেখেন, "কিছুকাল পূর্বে রবীন্দ্রনাথ চলিত বাংলা ভাষার বানানের রীতি নির্দিষ্ট করিয়া দিবার জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে অনুরোধ করেন।…দুই শত বিশিষ্ট লেখক ও অধ্যাপকের অভিমত আলোচনা করিয়া সমিতি বানানের নিয়ম সংকলন করিয়াছেন।" কবি কলিকাতায় আসিলে তাঁহার সহিত আলোচনাদি শেষ করিয়া উক্ত সমিতি ১০ সেপ্টেম্বর প্রতিবেদন সহি করেন ও পর দিন কবির নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহার অভিমত গ্রহণ করেন। কবি লিখিয়া দেন, "বাংলা বানান সম্বন্ধে যে নিয়ম বিশ্ববিদ্যালয় নির্দিষ্ট করিয়া দিলেন আমি তাহা পালন করিতে সম্মত আছি।" কবির স্বাক্ষরের নিচেই শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁহার সহি দেন (১৩৪৩ আশ্বিন ১)।

বরাহনগর বাসকালে যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত আসিয়া কবিকে গল্পসঞ্চয়নের ভূমিকা লিখিয়া দিবার জন্য অনুরোধ জানান। পূজার পূর্বে শিশুদের উপযোগী গল্প সংগ্রহ করিয়া তিনি একটি বার্ষিকী প্রকাশ করিতেছেন। রবীন্দ্রনাথ ঐ গ্রন্থের জন্য একটি সুন্দর ভূমিকা লিখিয়া দিলেন (১৯৩৬ সেপ্টেম্বর ১৫) :

"ছেলেদের যেমন চাই দুধভাত, তেমনি চাই গল্প। যে মা মাসিরা তাদের খাইয়ে পরিয়ে মানুষ করেছে, এতকাল তারাই তাদের মিষ্টি গলায় গল্প জুগিয়ে এসেছে। ছেলেদের সেই সত্যযুগ আজ এসে ঠেকেছে কলিযুগে—আজকের দিনের মা মাসিরা গেছেন গল্প ভুলে—কিন্তু ছেলেরা তাদের ফরমাশ ভোলে নি। ছেলেরা আজো বলচে, গপ্‌প বলো। কিন্তু তাদের ঘরের মধ্যে গপ্‌প নেই। এই গল্পের দুর্ভিক্ষ নিবারণের জন্যে যাঁরা কোমর বেঁধেছেন, তাঁদের মধ্যে অগ্রগণ্য যোগীন্দ্রনাথ [যোগেন্দ্রনাথ]। তিনি নিজের সম্বল থেকেও কিছু দিচ্ছেন, ভিক্ষে করেও কিছু সংগ্রহ করচেন। ছেলেরা তো আশীর্বাদ করতে জানে না। সেই আশীর্বাদ করবার ভার নিলেন তাদের বন্ধু রবীন্দ্রনাথ।"

কবি-যে এবার কলিকাতায় গিয়াছিলেন সে-সম্বন্ধে বিশ্বভারতী নিউজ (১৯৩৬ অক্টোবর) লিখিতেছেন যে, "It was a private visit and there were no public engagements." কিন্তু কবির মন—বোধ হয় দেবতাদেরও অগম্য। শান্তিনিকেতনে ফিরিয়া প্রতিমা দেবীকে কবি লিখিলেন, "রাজধানীর উৎপীড়নে হাঁপিয়ে উঠল প্রাণ, পালিয়ে এলেম।"[১] কথা ছিল কবি 'পুনশ্চ'র নূতন বাড়িতে উঠিবেন। "নতুন বাড়িতে মিস্ত্রির আক্রমণ। অবশেষে উদয়নে আশ্রয় নিতে হোলো—বৃহৎ পুরী শূন্য।" প্রতিমা দেবী অসুস্থতার জন্য কলিকাতায় গিয়াছেন।

কলিকাতা হইতে ফিরিয়া কবি 'পরিশোধ' নৃত্যনাট্যর মহড়া লইয়া পড়িয়াছেন। পরিশোধ 'কথা ও কাহিনী'র সুপরিচিত কবিতা,—সেই আখ্যান অবলম্বনে নৃত্যনাট্য রচিত হইয়াছে। কলিকাতা যাইবার পূর্বে তাহার মহড়া শুরু হয় প্রতিমা দেবীর পরিচালনায়। এখন কবিকেই মহড়ার জন্য ভাবিতে হইতেছে, তজ্জন্য অত্যন্ত বিব্রত হইয়া পড়িতেছেন। একদিন প্রতিমা দেবীকে অতিদুঃখে লিখিতেছেন, "এখান থেকে যখন বেরিয়েছিলুম তখন প্রতি সন্ধ্যাবেলা তোমার সূর্যাস্ত প্রাঙ্গণ নূপুরে মুখরিত ছিল, এখন 'নীরব রবাববীণা মুরজ মুরলী'। কেবল মনে হচ্ছে দুঃসাধ্য সাধনে প্রবৃত্ত হয়েছিলুম, ভুল করেছি। আমার নৃত্যসাধনা গীতছন্দে উর্বশীদের মহলে কোনোদিন আসন পাব না। অতএব এখন থেকে তাঁদের সেলাম জানিয়ে বিদায় নিচ্ছি।" (চিঠিপত্র ৩য়, পত্র ৪৯) একটা অভিনয়কে খাড়া করিয়া তুলিতে কী পরিমাণ দুঃখ তাঁহাকে পাইতে হইত, এই কয়ছত্র তাহারই প্রমাণ।

আমাদের আলোচ্য পর্বে কবির 'সাহিত্যের পথে' গ্রন্থখানি প্রকাশনের জন্য প্রস্তুত হইতেছে। 'সবুজপত্রে'র যুগ হইতে গত বিশবৎসরের মধ্যে রচিত সাহিত্য-বিষয়ক প্রবন্ধের সংগ্রহ-গ্রন্থ এইটি। কয়েকটি প্রবন্ধের কথা স্থানে স্থানে উল্লিখিত হইয়াছে। কোন্ প্রবন্ধ গ্রন্থ মধ্যে যাইবে, কোন্ প্রবন্ধের কোন্‌খানটার রদবদল হইবে ইত্যাদির পুঙ্খানুপুঙ্খরূপ বিচার কবি একাই করেন। বলা বাহুল্য, পাঁচমিশালি কাজের মধ্যে এই কাটাছাটা চলে। বইখানি উৎসর্গ করিলেন অমিয়চন্দ্র চক্রবর্তীকে (১৩৪৩ আশ্বিন ৮)। উৎসর্গ-পত্রখানি সাহিত্য-বিচারপূর্ণ একটি প্রবন্ধ,—সাহিত্য সম্বন্ধে কবির মতের চুম্বক।

এদিকে কলিকাতা হইতে ফিরিয়া আসিবার কয়েকদিনের মধ্যেই 'বিচিত্রা'র সম্পাদক উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের নিকট হইতে (১৩৪৩ আশ্বিন ৯) পুনরায় কলিকাতা যাইবার জন্য নিমন্ত্রণ আসিয়াছে,—শরৎচন্দ্রের জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে আহুত সভায় কবির উপস্থিত হইবার জন্য অনুরোধ। রবীন্দ্রনাথ পত্র পাইয়া সেইদিনই জবাবে লিখিলেন, "আজ তোমার চিঠি পেলুম, পশু [১১ই আশ্বিন, রবিবার] তোমাদের অনুষ্ঠান।" কবি জানাইলেন পরবর্তী রবিবারে [২৫ আশ্বিন] শরৎচন্দ্রের ৬১তম সাম্বৎসরিক উৎসব নিষ্পন্ন করিলে 'রবীন্দ্রের সমাগম অসম্ভব হবে না।'[২] কারণ কবিকে অবিলম্বে কলিকাতায় যাইতে হইতেছে—সেখানে 'পরিশোধ' নাটিকার অভিনয়; তাহা ছাড়া নিখিল-বঙ্গ মহিলা সম্মিলনের উদ্বোধন তাঁহাকে করিতে হইবে।[৩]

কবি যথাসময়ে শান্তিনিকেতনের ছাত্রছাত্রীর দল লইয়া কলিকাতায় গেলেন—ভবানীপুরে আশুতোষ কলেজ হলে 'পরিশোধ' নৃত্যনাট্যর অভিনয় হইবে। 'পরিশোধ' নৃত্যনাট্যে রূপান্তরিত করিয়া ভূমিকায় কবি লিখিতেছেন "প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত এর সমস্তই সুরে বসানো। বলা বাহুল্য, ছাপার অক্ষরে সুরের সঙ্গ দেওয়া অসম্ভব ব'লে

১ চিঠিপত্র ৩য়, পত্র ৪৯, ১৩৪৩ আশ্বিন ১৩ (১৯৩৬ সেপ্টেম্বর ২৯)।

২ বিচিত্রা ১৩৪৩ কার্তিক পৃ ৪২৬।

৩ ১৩৪৩ আশ্বিন ১১। ১৯৩৬ সেপ্টেম্বর ২৭। রামমোহন মৃত্যুবার্ষিকীতে কবি মন্দিরে যথাবিধি উপদেশ দান করিয়াছিলেন। প্রভাতচন্দ্র গুপ্ত কর্তৃক অনুলিখিত ও বক্তাকর্তৃক সংশোধিত, প্রবাসী ১৩৪৩ ফাল্গুন, পৃ৬৩৫-৩৭।

কথাগুলির শ্রীহীন বৈধব্য অপরিহার্য।"[১] পরিশোধের[২] এই নৃত্যনাট্যরূপ বহুল পরিমাণে বহুবার পরিবর্তিত হইয়া 'শ্যামা' নামে পরে প্রকাশিত হয়। আমরা ইহার আলোচনা যথাস্থানে করিব। মূল কাহিনী লিখিত হয় ১৩০৬ আশ্বিন ২৩ (১৮৯৯ অক্টোবর ৯) তারিখে।

পরিশোধ নৃত্যনাট্য ও মূল পরিশোধের গল্পাংশ প্রায় অবিকল একই আছে; স্থলে স্থলে কবিতার অংশবিশেষের উপরই গানের সুর দেওয়া হইয়াছে; নূতন গান যাহা উল্লেখযোগ্য সেইটি হইতেছে "ক্ষমিতে পরিলাম না যে ক্ষমো হে মম দীনতা পাপীজনশরণ প্রভু।" পুরাতন কয়েকটি গান শ্যামার মুখে দেওয়া হইয়াছে; যেমন—'চরণ ধরিতে দিয়ো গো আমারে' (গীতিমাল্য ১৩২১ জ্যৈষ্ঠ ৩), 'এবার ভাসিয়ে দিতে হবে আমার এই তরী' (গীতিমাল্য ১৩১৮ চৈত্র ২৬), 'ওই রে তরী দিল খুলে' (গীতাঞ্জলি ১৩১৭ জ্যেষ্ঠ ১৮)। গীতাঞ্জলি-গীতিমাল্য পর্বের গান যে ভাব হইতে লিখিত ও সকলের কাছে পরিচিত, তাহাতে শ্যামার মুখে উহাদের প্রয়োগ বিসদৃশ ঠেকিতে পারে। কিন্তু মনে রাখা উচিত, রবীন্দ্রনাথ মুখ্যত কবি, তাঁহার কবিচিত্ত একই রচনাকে বিভিন্নভাবে গ্রহণ করিতে দ্বিধা বোধ করিত না। এবং সে অধিকার তাঁহার ছিল। পরযুগে রবীন্দ্রনাথের গান সিনেমায় অসংগতভাবে প্রযুক্ত হওয়ায় সমালোচনার কারণ হইয়াছে।

কলিকাতায় আশুতোষ কলেজ হলে দুই সন্ধ্যায় পরিশোধের অভিনয় হয়।[৩] Statesman দৈনিকের সমালোচক নাটিকার মর্মকথাটি প্রকাশ করিয়া যে দীর্ঘ সমালোচনা লেখেন, তাহা লেখকের রসজ্ঞতার পরিচায়ক। তিনি লেখেন, "He (Tagore) makes the stage human. Everyone else on the stage may be acting but he is not. He is reality. Moreover he gives a dignity to the performance—*nautch* is transformed into dance. The dancers are no longer to be exploited for our pleasure but are brothers and sisters, as the winds and the stars are our brothers and sisters, joyously dancing and shining around us." রবীন্দ্রনাথ লিখিতেছেন, 'স্টেটস্‌ম্যানে পরিশোধের যে বড়ো সমালোচনা করেছে সেটা পড়ে মন কতকটা আশ্বস্ত হোলো।"[৪]

'পরিশোধ' অভিনয়ের শেষদিন (১১ অক্টোবর) অপরাহ্নে শরৎচন্দ্রের জয়ন্তী-উৎসব-সভায় কবি তাঁহার কথামতো উপস্থিত হইলেন (১৩৪৩ আশ্বিন ২৫)। সেখানে যে ভাষণ পাঠ করেন তাহাতে শরৎচন্দ্রের প্রতি কবির স্নেহ প্রতি পংক্তিতে ব্যক্ত হইয়াছে। তিনি বলেন, "শরৎচন্দ্রের দৃষ্টি ডুব দিয়েছে বাঙালির হৃদয়রহস্যে।...অন্য লেখকেরা অনেকে প্রশংসা পেয়েছে কিন্তু সর্বজনীন হৃদয়ের এমন আতিথ্য পায় নি। এ বিস্ময়ের চমক নয়, এ প্রীতি।...তিনি বাঙালির বেদনার কেন্দ্রে আপন বাণীর স্পর্শ দিয়েছেন।"[৫]

শরৎচন্দ্র রবীন্দ্রনাথকে কী যে শ্রদ্ধা করিতেন তাহার কথা বাঙালিপাঠকের সুবিদিত নহে। দুই একটি ঘটনার উল্লেখ অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। অমল হোমের বিবাহসভায় রবীন্দ্রনাথকে বহুকাল পরে দেখিয়া তিনি অমলকে

১ গীতবিতান নূ সং ৩য় খণ্ড পরিশিষ্ট ২, পৃ ৯২৫-৩৫, শ্যামা ঐ পৃ ৭৩৩-৫০।

২ পরিশোধের আখ্যানবস্তু রাজেন্দ্রলাল মিত্র সম্পাদিত The Sanskrit Buddhist Literature of Nepal (Asiatic Socity of Bengal 1885), p 182 হইতে গৃহীত। মূল আখ্যানটি মহাবস্তু অবদান-এর অংশ।

৩ ১৯৩৬ অক্টোবর ১০, ১১ [১৩৪৩ আশ্বিন ২৪, ২৫]।

৪ চিঠিপত্র ৩য়, পত্র ৫০, দ্র The Statesman, Calcutta 1936 Oct. 14, V. B. News. 1936 Nov-Dec. p 87-88-এ উদ্ধৃত।

৫ শরৎচন্দ্রের প্রতি, ১৩৪৩ আশ্বিন ১৫। বিচিত্রা ১৩৪৩ অগ্রহায়ণ পৃ ৫৬৩—৬৪। দ্র ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শরৎ-পরিচয় ১৩৫৭ মাঘ, পৃ ৬৩-৬৫।

লিখিয়াছিলেন, "অনেক দিন পরে রবীন্দ্রনাথকে দেখলাম। কী আশ্চর্য সুন্দর,—চোখ ফেরানো যায় না। বয়স যত বাড়ছে রূপ যেন তত ফেটে পড়ছে। না, রূপ নয়—সৌন্দর্য। জগতে এত বড়ো বিস্ময় জানি না।" এইটি লেখেন ১৯২৭ সালের শেষে। জয়ন্তী উৎসবের পর (১৯৩১) তিনি লিখিয়াছিলেন, "কবির সম্বন্ধে মন্দ কথা বলেছি রাগের মাথায়, এ যেমন সত্যি,—এও তেমনি সত্যি যে, আমার চাইতে তাঁর বড়ো ভক্ত কেউ নেই,—আমার চাইতে তাঁকে কেউ বেশী মানেনি গুরু ব'লে,—আমার চাইতে কেউ মক্‌শো করে নি তাঁর লেখা। ··আমার চাইতে বেশী করে কেউ প'ড়ে নি তাঁর উপন্যাস, আজকের দিনে যে এত লোক আমার লেখা প'ড়ে ভালো বলে, সে তাঁর জন্য। এ সত্য, পরম সত্য আমি জানি!"[১] এই সম্পর্কে আর-একটি ঘটনার উল্লেখ করিতেছি। ১৯১৭ সালে কলিকাতার বিচিত্রাভবনে শরৎচন্দ্র প্রায়ই আসিতেন; লেখক তখন কলিকাতায় থাকিতেন। একদিন নবীন সাহিত্যিকের দল নানা প্রশ্নের মধ্যে শরৎচন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করে, কবির 'গোরা' তিনি পড়িয়াছেন কিনা। শরৎচন্দ্র তাঁহার স্বভাবচঞ্চল ভঙ্গিতে বলিলেন, 'গোরা! চৌষট্টি বার— চৌষট্টি বার পড়েছি।'

চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় শরৎচন্দ্রের বিশেষ বন্ধু ছিলেন এবং রবীন্দ্রভক্ত বলিয়া তাঁহার খ্যাতি সর্বজনবিদিত। তিনি লিখিতেছেন, "রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে শরৎচন্দ্রের হৃদয়ে একটা গভীর শ্রদ্ধা ছিল এবং রবীন্দ্র-সাহিত্য সে খুব মনোযোগ দিয়াও পড়িয়াছিল। দ্বিতীয়বার ঢাকা গিয়া সে অসুস্থ হইয়া পড়ে। সেই সময়ে দেখিয়াছি দু-একদিন জ্বরের ঘোরে অনর্গল সে 'বলাকা'র কবিতার পর কবিতা আবৃত্তি করিয়া চলিয়াছে, প্রত্যেকটি কবিতা তার সম্পূর্ণ মুখস্থ।···কেউ রবীন্দ্রনাথের লেখার নিন্দা করিলে সে বড়ো ব্যথিত হইত।"[২]

আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, কবির এবার কলিকাতায় আসিবার অন্যতম কারণ নিখিলবঙ্গ মহিলা কর্মীসম্মেলনের উদ্বোধন। কলেজ স্ট্রীটে আলবার্ট হলে এই সভা; অভ্যর্থনাসমিতির সভানেত্রী ছিলেন শ্রীমোহিনী দেবী ও সম্মেলনের সভানেত্রী শ্রীনির্মলনলিনী ঘোষ; কন্‌গ্রেস-কর্মী শ্রীলাবণ্যলতা চন্দ ছিলেন উদ্‌যোক্তাদের অন্যতমা। এই সম্মেলনের জন্য কবি পূর্বেই ভাষণ লিখিয়াছিলেন (১৯৩৬ অক্টোবর ২); কিন্তু সভায় (১২ই) তিনি সেটি পড়েন নাই, তাঁহার বক্তব্য মুখেমুখেই বলেন।[৩]

'নারী' শীর্ষক প্রবন্ধে কবি ভাবী সমাজে নারীর স্থান কী রূপ গ্রহণ করিবে বা গ্রহণ করা উচিত সে সম্বন্ধে রেখাঙ্কন করিয়া দেন। কবি বলেন যে, সভ্যতাসৃষ্টির নূতন কল্প যদি আসে, তবে সেই "সৃষ্টিতে মেয়েদের কাজ পূর্ণ পরিমাণে নিযুক্ত হবে সন্দেহ নেই। নবযুগের এই আহ্বান আমাদের মেয়েদের মনে যদি পৌঁছে থাকে তবে তাঁদের রক্ষণশীল মন যেন বহুযুগের অস্বাস্থ্যকর আবর্জনাকে একান্ত আসক্তির সঙ্গে বুকে চেপে না ধরে। তাঁরা যেন মুক্ত করেন হৃদয়কে, উজ্জ্বল করেন বুদ্ধিকে। নিষ্ঠা প্রয়োগ করেন জ্ঞানের তপস্যায়। মনে রাখেন, নির্বিচার অন্ধরক্ষণশীলতা সৃষ্টিশীলতার বিরোধী। সামনে আসছে নূতন সৃষ্টির যুগ।"[৪]

দিন পনেরো কলিকাতায় থাকিয়া কবি শান্তিনিকেতন ফিরিলেন (১৯৩৬ অক্টোবর ১৩)। পূজাবকাশের জন্য বিদ্যালয় বন্ধ হইল, ১৭ই খুলিবে। ছাত্র-ছাত্রীরা যে-যার আপন বাড়িতে ২০ নভেম্বর চলিয়া গেল। উত্তরায়ণের বৃহৎ

১ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, [১৮৯১-১৯৫২], শরৎ-পরিচয় পৃ ১০৫-০৭।

২ চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শরৎস্মৃতি, প্রবাসী ১৩৪৫, কার্তিক পৃ ৬৭। দ্র উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্রের পথের দাবী ও রবীন্দ্রনাথ, ভারতবর্ষ ১৩৬০ কার্তিক পৃ ৪৭০-৭৬।

৩ প্রবাসী ১৩৪৩ অগ্রহায়ণ পৃ ১৮০-৮৪, দ্র কালান্তর।

৪ "Many strange things happened in those days, [of 1930-31 Civil Disobedience Movement] but undoubtedly the most striking was the part of the women in the national struggle"—Jawaharlal Neheru, Autobiography, p 214.

পুরী প্রায় জনশূন্য। প্রতিমা দেবী আছেন পুরীতে স্বাস্থ্যের জন্য; রথীন্দ্রনাথ নৌকায় ভ্রমণ করিতেছেন।[১] ইন্দিরা দেবী রাঁচি হইতে কবিকে আহ্বানলিপি পাঠাইয়াছেন; কবি কিন্তু যাইতে নারাজ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবিতকালেও তিনি সেখানে কখনো যান নাই; শুনিয়াছি সেজন্য মনে মনে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের একটু অভিমান ছিল। প্রতিমা দেবীকে কবি লিখিতেছেন যে হাওয়া বদল করিবার জন্য, "আমি যাচ্চি বাস্‌-এ চড়ে লেনর্ড-রোড্‌ বেয়ে সুরুলে শ্রীনিকেতনের তেতলার ঘরে। সেখানে চারিদিকে পরিপুষ্ট ধানের ক্ষেতে সবুজ রঙের সমুদ্র। পুরীর সমুদ্রের চেয়ে কম নয়।"[২]

সুরুলের বাড়ির তেতলায় কবি ছিলেন ২৭ অক্টোবর হইতে ২৭ নভেম্বর (১৯৩৬) পর্যন্ত বা ১২ কার্তিক হইতে ১১ অগ্রহায়ণ ১৩৪৩। এখানে "ভালো লাগচে—আকাশ খুব কাছে এসেছে, আলোর বাধা নেই কোথাও, লোকজন সর্বদা ঘাড়ের উপর এসে পড়চে না।"[৩] এই তিনটি কথা অতি সত্য তাই মন বেশ প্রসন্ন। 'সে' লেখেন, ছবি আঁকেন, খুচরো কবিতা রচেন। 'মাসপয়লা' নামে ছোটোদের মাসিকের সম্পাদক শ্রীহট্টবাসী ক্ষিতীশচন্দ্র ভট্টাচার্যের অনুরোধে ১৫ কার্তিক (১ নভেম্বর) একটি কবিতা লিখিয়া পাঠান।[৪] এইদিন লেখেন 'প্রহাসিনী'র 'ভাইদ্বিতীয়া'[৫] (১৩৪৩ ভ্রাতৃদ্বিতীয়া)। এই কবিতার ইতিহাস আছে; বরাহনগরের শ্রীমতী পারুল দেবী রবীন্দ্রনাথকে নাতনিরূপে কয়েকবার ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার ফোঁটা ও শ্রদ্ধার্ঘ্য পাঠাইয়াছিলেন; এই কবিতাটি তাহারই স্বীকৃতি। ইহারই অনুক্রমণে ১৯৩৭ জানুয়ারি ১৪ শান্তিনিকেতন হইতে কবি পারুল দেবীকে লেখেন, "বাংলাদেশের সমস্ত দিদি-জাতীয়ার স্তবগানকে তোমার বন্দনাগানের সঙ্গে জড়িয়ে দিয়েছি। এটা তোমার পছন্দ হয়নি। তবু বরানাগরিকাই অগ্রগণ্যা হয়ে রইল, এটা তুমি উপলব্ধি করলে না কেন। দেবীর কোপ দূর হোক, প্রসন্ন হয়ে তিনি বরদান স্বরূপে বড়িদান করুন, এই আমার প্রত্যাশা।"[৬]

কবি যখন শ্রীনিকেতনে, সেই সময়ে একদিনের জন্য কলিকাতা হইতে জবহরলাল নেহেরু কবির সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন। এই সম্বন্ধে সমসাময়িক প্রবাসী লিখিতেছেন (১৩৪৩ অগ্রহায়ণ পৃ ৩০৭), "ভারতবর্ষের সর্বতোমুখী প্রতিভাশালী মনস্বীর সহিত কংগ্রেস অধিনায়কের কী কথা হইয়াছিল, জানিতে শুধু যে অলস ও বৃথা-কৌতূহল হয় তাহা নহে, জানিতে পারিলে সর্বসাধারণ উপকৃত হইতেন।"

"মহাত্মাগান্ধীর সহিত যেমন বিখ্যাত অবিখ্যাত দেশীবিদেশী বহু ব্যক্তি দেখা সাক্ষাৎ করেন, রবীন্দ্রনাথের সহিত সেইরূপ বহু বৎসর হইতে বিস্তর লোক দেখা করিয়াছেন, কথা বলিয়াছেন এবং তাঁহার কথা শুনিয়াছেন। কিন্তু গান্ধীজির সহিত এইসব সাক্ষাৎকারের ও কথোপকথনের বৃত্তান্ত ও অনুলেখন রক্ষিত ও প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রনাথের কথোপকথন লিখিয়া রাখিবার এইরূপ ব্যবস্থা থাকিলে ভাল হইত।" দুঃখের বিষয় সন্ধান করিতে গিয়া এইসব তথ্য আমরা বেশি

১ চিঠিপত্র ৪র্থ, পত্র ৬৩, বিজয়া দশমী [১৩৪৩ কার্তিক ৮।১৯৩৬ অক্টোবর ২৫]।

২ চিঠিপত্র ৩য়, পত্র ৫১, ১৩৪৩ কার্তিক ৯। লেনর্ড রোডের অর্থ শান্তিনিকেতন-শ্রীনিকেতনের পথ; এলমহার্স্টের নামের প্রথমভাগ হইতেছে লেনর্ড।

৩ চিঠিপত্র ৩য়, পত্র ৫৩।

৪ দ্র মাসপয়লা ২১শ বর্ষ, ১৩৫৫ বৈশাখ ৫।

৫ 'ভাইদ্বিতীয়া' কবিতাটির মধ্যে বাংলাদেশে বোন হইয়া জন্মগ্রহণ করার মধ্যে যে সামাজিক দীর্ঘনিশ্বাস শোনা যায়, তাহাই বিদ্রূপিত হইয়াছে। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রবাসীতে 'নিখিলভারত কংগ্রেস কমীটিতে বঙ্গমহিলা অনাবশ্যক?' শীর্ষক বিবিধ প্রসঙ্গে এই কবিতাটিকে অন্যভাবে দেখিয়াছেন। ১৩৪৫ ফাল্গুন পৃ ৭৪৬।

৬ দেশ ১৩৪৯ মাঘ ৯ পৃ ৩৬১। ইঁহাকে লিখিত অন্যান্য পত্র দেশ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। ১৩৪৯ পৌষ ২৪ ও মাঘ ৯। দ্র র-র ২৩শ গ্রন্থপরিচয় অংশ পৃ ৫৩০—৩১। শ্রীনিকেতন বাসকালে 'ঘরছাড়া' (১৯৩৬ নভেম্বর ২২, সেঁজুতি) ছাড়া আর বেশি কবিতা চোখে পড়ে না; যদি লিখিয়াও থাকেন তারিখ না-দেওয়ার জন্য সনাক্ত করা কঠিন। 'ঘরছাড়া' অসম ছন্দে সমিল কবিতা।

কিছু পাই না। যদিই বা কেহ রাখিয়া থাকেন, তাহা হয়তো পরে প্রকাশিত হইতেছে; এবং আমাদের আশঙ্কা, ভবিষ্যতে তাহা মুদ্রিত হইবে। তবে সেই ভাবী রবীন্দ্রোক্তির মধ্যে কতখানি রবীন্দ্রনাথ, এবং কতখানি লেখক-ব্যক্তি আছেন বা থাকিবেন, তাহা নির্ণয় করিবার কোনো উপায় নাই। আমাদের মতে, সেসব 'কথাবার্তা' অত্যন্ত সাবধানতার সহিত গ্রহণ করিতে হইবে। কারণ একদিকে আমরা 'গুরুবাদী', অন্যদিকে অনৈতিহাসিক,—অতিরঞ্জন ও অপরঞ্জন দুইই আমাদের স্বভাবসিদ্ধ। সেইজন্য এই শ্রেণীর রচনা সম্বন্ধে ভবিষ্যৎ পাঠকদের বিশেষ critical হইতে হইবে। কোনো কোনো লেখক তাঁহাদের গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের মুখে যে ভাষা দিয়াছেন, তাহা যে রবীন্দ্রনাথের ভাষা হইতেই পারে না তাহা তাঁহার সাহিত্য-পাঠক মাত্রই বুঝিতে পারিবেন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন

পূজাবকাশের পর বিদ্যালয় খুলিবার কয়েকদিন পরে কবি শ্রীনিকেতন হইতে শান্তিনিকেতন ফিরিয়া আসিলেন (১৯৩৬ নভে ২৭॥১৩৪৩ অগ্র ১১)। 'পুনশ্চ' নামে নূতন বাড়িতে কয়েকদিন থাকিবার চেষ্টা করিলেন; কিন্তু সেখানকার কাজকর্ম এখনো শেষ হয় নাই, তাই 'উদয়নে'র তেতলায় আশ্রয় লইলেন। সেখানে খুপরি-খুপরি ঘর, উচুতে নীচুতে; সম্মুখে খোলা ছাদ; নূতন পারিপার্শ্বিক। এবার দীর্ঘকাল কবি এইখানে বাস করিলেন।

শ্রীনিকেতন হইতে শান্তিনিকেতনে ফিরিবার দুইদিন পরে (১৩ অগ্র) লিখিলেন 'পুপুদির জন্মদিনে' কবিতাটি; কবিতাটির মধ্যে কবির শিশুভোলানো মনের ভাবখানি পাই যাহা হইতে 'সে'র উদ্ভব। আজ যাহা লিখিতেছেন তাহা 'বয়স-চোরার কাজ' বলিয়াই জানেন। তবে 'সে'র সবটাই নূতনও নহে, এই সময়ে লিখিতও নহে। পূর্বে লেখা কয়েকটি আখ্যায়িকা সমসাময়িক মাসিক পত্রে প্রকাশিত হয়; সেগুলি অবলম্বন করিয়া এখন লিখিলেন 'সে'।[১] 'সে' লেখার প্রত্যক্ষ কারণ, রথীন্দ্রনাথের পালিতা কন্যা নন্দিনীর চিত্তবিনোদন। সেই প্রেরণায় এই অদ্ভুত গল্পগুলির সৃষ্টি। চারুচন্দ্র ভট্টাচার্যকে উৎসর্গ করিয়া লিখিলেন:

> আমারও খেয়াল-ছবি মনের গহন হতে ভেসে আসে বায়ুস্রোতে।...
> যেমন-তেমন এরা বাঁকা বাঁকা কিছু ভাষা দিয়ে কিছু তুলি দিয়ে আঁকা...।

হয়তো এইগুলির কথা মনে রাখিয়াই তিনি বলিয়াছেন—

> ফসল কাটার পরে শূন্য মাঠে তুচ্ছ ফুল ফোটে অগোচরে আগাছার সাথে। এমন কি আছে কেউ
> যেতে যেতে তুলে নেবে হাতে যার কোনো দাম নেই নাম নেই, অধিকারী নাই যার কোনো,
> বনশ্রী মর্যাদা যারে দেয়নি কখনো।

এই কবিতাটি ও খাপছাড়ার ভূমিকা কাছাকাছি সময়ে লিখিত।[২]

১ 'সন্দেশ' নবপর্যায় ১৩৩৮, আশ্বিন, কার্তিক এবং অগ্রহায়ণ সংখ্যায় 'সে' র প্রথম, দ্বিতীয় এবং চতুর্থ অধ্যায়ের কোনো কোনো অংশের পূর্বতন পাঠ প্রকাশিত হয়। 'রংমশাল' ১৩৪৩ কার্তিক (১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা পৃ ১-৬) সংখ্যায় যাহা মুদ্রিত হয় তাহা 'সে'র পঞ্চম অধ্যায়ে সংকলিত হইয়াছে। ভূমিকা অংশটি (রংমশালের পাঠ) 'সে' র প্রথম অধ্যায়ে ঈষৎ রূপান্তরিত ভাবে গ্রথিত হইয়াছে। 'মুকুল' নবপর্যায় ১৩৪১, বৈশাখ সংখ্যায় 'বাঘের শুচিতা'—এই গ্রন্থের 'একছিল মোটা কেঁদো বাঘ'। দ্র র-র ২৬ গ্রন্থপরিচয় পৃ ৬৫২।

২ খাপছাড়া, ভূমিকা ১৩৪৩ পৌষ ১৩। সে-এর উৎসর্গ পৌষ মাসেই লিখিত হয়।

'পরিশোধ' নাটক অভিনয়ের পর ১৩ অক্টোবর কবি বোলপুর ফেরেন; তারপর একাদিক্রমে ১১ ফেব্রুয়ারি (১৯৩৭) পর্যন্ত চারিমাস শ্রীনিকেতনে ও শান্তিনিকেতনে অতিবাহিত করেন। এই পর্বের মধ্যে 'সে' ও খাপছাড়া' প্রকাশিত হয়। সামাজিক অনুষ্ঠানের মধ্যে পৌষউৎসব[১], মাঘোৎসব, শ্রীনিকেতনের উৎসব এই পর্বের অন্তর্গত।

এই সব ভাষণের মধ্যে আমরা বিশেষভাবে খ্রীষ্টোৎসব সম্বন্ধে তাঁহার ভাষণের প্রতি পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। রবীন্দ্রনাথের জীবনী-পাঠকের স্মরণ আছে যে, ১৯১০ হইতে বরাবর খ্রীষ্টের জন্মদিন আশ্রমে পালিত হইয়া আসিতেছে এবং কবি উপস্থিত থাকিলে খ্রীষ্টমাস দিনে তিনি উপাসনা করিতেন। অধুনা (১৯৩৬) পৃথিবীর নানাস্থানে ঘনায়মান যুদ্ধায়োজনের মহোৎসবের মধ্যে খ্রীষ্টের অহিংস মন্ত্র গ্রহণেই মানবের মুক্তি, এই কথা কবির মনে জাগিতেছে।

"খ্রীস্টের প্রেরণা মানবসমাজে আজ ছোটো বড়ো কত প্রদীপ জ্বালিয়েছে, অনাথ পীড়িতদের দুঃখ দূর করবার জন্যে তাঁরা অপরিসীম ভালোবাসা ঢেলে দিয়েছেন।...শাস্ত্রবাক্যকে তো আমরা ভালোবাসতে পারিনে...মহাপুরুষেরা... আপন জীবনের প্রদীপ জ্বালান, তাঁরা কেবল তর্ক করেন না, মত প্রচার করেন না। তাঁরা আমাদের দিয়ে যান মানুষরূপে আপনাকে। ......এই বিরাট কলুষ-নিবিড়তার মধ্যে দেখা যায় না তাঁদের যাঁরা মানবসমাজের পুণ্যের আকর। কিন্তু তাঁরা নিশ্চয়ই আছেন, নইলে পৃথিবী অভিশপ্ত হত, সমস্ত সৌন্দর্য ম্লান হয়ে যেত, সমস্ত মানবলোক অন্ধকারে অবলুপ্ত হত।"

মাঘোৎসবের সময় কলিকাতায় যাইবার জন্য অনুরোধ আসিয়াছিল; কবি প্রত্যাখ্যান করিয়া ইন্দিরা দেবীকে লিখিলেন, "আমার এখানে ১১ই মাঘ উৎসব আছে, এখানকার অনুষ্ঠান আমাকেই সম্পন্ন করতে হয়।"[২] রবীন্দ্রনাথ মাঘোৎসবকে ব্রাহ্মসমাজের অনুষ্ঠান বলিয়া 'সাম্প্রদায়িক' জ্ঞান করিতেন না। জীবনের শেষ বৎসর পর্যন্ত যথারীতি মাঘোৎসবকে বিশেষভাবে স্মরণ করিয়াছেন। ইতিপূর্বেও ইন্দিরা দেবীকে লিখিয়াছিলেন, "শান্তিনিকেতনে ১১ই মাঘের উৎসব করতে আমার একটুও সংকোচ বোধ হয় না কিন্তু আমাদের বাড়িতে অর্থহীন অনুষ্ঠানের আড়ম্বর আমাকে বড়ো লজ্জা দেয়।" (১৩৩৮ বৈশাখ ১)

এবারকার শান্তিনিকেতনের মাঘোৎসবের দিনে কবির তিনটি নূতন গান পাই: ১ হৃদয়ে হৃদয় আসি মিলে যায় যেথা (গী-বি ১৯৮), ২ দুঃখের তিমিরে যদি জ্বলে তব মঙ্গল আলোক (গী-বি ৮৭), ৩ শুভ কর্মপথে ধরো নির্ভয় গান (গী-বি ২৬৪)।[৩] এই গানগুলির সহিত তুলনীয় কয়দিন পরে লিখিত সেঁজুতির কবিতা 'পরিচয়' (১৩৪৩ মাঘ ১৩) ও 'যাবার মুখে' (২২ মাঘ)।

কিন্তু জীবনের সবটাই তত্ত্ব নয়, এবং উদয়-অস্ত কোনো মহাপুরুষই একটি তুরীয়তার মধ্যে থাকিতে পারেন না; রবীন্দ্রনাথ তত্ত্বদর্শী কবি হইলেও বিচিত্রের সাধক; তাই তাঁহার জীবনে উষায় ও সন্ধ্যায় বিচিত্র রসের উৎস উৎসরিত হয় রচনায়, বাক্যে ও কর্মে। তাই দেখি মাঘোৎসবের গান ও সেঁজুতির কবিতার সঙ্গে আছে প্রহাসিনীর 'অনাদৃতা লেখনী।'[৪]

১ ৭ই পৌষ [১৩৪৩], প্রদোতকুমার সেনগুপ্ত কর্তৃক অনুলিখিত, প্রবাসী ১৩৪৩ মাঘ পৃ ৫৫০-৫২। খ্রীষ্ট উৎসব (১৯৩৬ ডিসেম্বর ২৫), শান্তিনিকেতন মন্দিরে বড়দিন উপলক্ষে কথিত, পুলিনবিহারী সেন কর্তৃক অনুলিখিত ও বক্তা কর্তৃক সংশোধিত, প্রবাসী ১৩৪৩ চৈত্র পৃ ৭৮৭-৮৮।

২ চিঠিপত্র ৫ম, পত্র ৬৪, ৮ জানুয়ারি ১৯৩৭।

৩ দ্র প্রবাসী ১৩৪৩ ফাল্গুন পৃ ৬০৩-০৪।

৪ ১৩৪৩ মাঘ ১৪ 'অনাদৃতা লেখনী'র কয়েকটি পংক্তির খসড়া দেখা যায়; কবিতাটি ছাপা হয় বিচিত্রায়, ১৩৪৪ বৈশাখ মাসে। দ্র র-র ২৬ গ্রন্থপরিচয় পৃ ৫৩১।

জানুয়ারি (১৯৩৭) মাসের শেষ দিনে কবি সংবাদ পাইলেন প্রাগ-এ (Prague) অধ্যাপক Winternitz-এর মৃত্যু হইয়াছে; বিন্টারনিট্জ ১৯২৩-২৪ সালে বিশ্বভারতীর অধ্যাপকরূপে আসিয়াছিলেন; কবির সহিত তাঁহার একটি প্রগাঢ় প্রীতির সম্বন্ধ হইয়াছিল। তাঁহার মৃত্যুসংবাদে কবি গভীর বেদনা বোধ করেন; তিনি অধ্যাপকের ভগিনীকে যে পত্র দেন, তাহাতে বলেন, "During my long life and extensive travels, I never met a savant more worthy of respect than the learned doctor. In him I have lost a faithful comrade, India has lost one of its truest Pandits and best friends and humanity one of its sincere champions."[১]

ইতিমধ্যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চানসেলর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের নিকট হইতে কবির কাছে অনুরোধ আসিয়াছে আগামী 'বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা দিবস'-এর (২৭ জানুয়ারি) জন্য একটি বিশেষ গান লিখিয়া দিতে হইবে। সেই অনুরোধে কবি প্রথমে লেখেন 'শুভ কর্মপথে ধরো নির্ভয় গান' ও পরে লেখেন 'চলো যাই, চলো যাই' (গী-বি ২৬৩), শেষ গানটি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক নির্বাচিত হয়। শান্তিনিকেতনে কয়েকদিন এই গানের মহড়া চলে; ছাত্ররা এই গানটি শিখিয়া শ্রেণীবদ্ধভাবে শিক্ষকদের সঙ্গে অধ্যক্ষ ধীরেন্দ্রমোহন সেনের নেতৃত্বে মন্দিরে যাইত। কিন্তু এ গানটি চালু হইল না। কিন্তু 'শুভকর্মপথে' গানটি নানা অনুষ্ঠানে গীত হইতে দেখা যায়।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাদিবসে ছাত্ররা গানটি গাহিয়াছিল। দুঃখের বিষয় শ্যামাপ্রসাদের আন্তরিক চেষ্টা সত্ত্বেও প্রতিষ্ঠাদিবসের উৎসব সর্বাঙ্গীণ সুন্দর হয় নাই; কারণ মুসলমান ছাত্ররা উৎসবে যোগদান করে নাই। বিশ্ববিদ্যালয়ের সীল্ (seal)-এ 'পদ্ম' ও 'শ্রী' পৌত্তলিকতার প্রতীক বলিয়া তাহা উঠাইয়া দিবার জন্য মুসলমানরা কিছুকাল হইতে জিদ্ করিতেছিল; সেই আন্দোলনের অভিঘাতে প্রতিষ্ঠাদিবসের উৎসব অসম্পূর্ণ রহিয়া গেল।[২]

কবি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন বা কনভোকেশন-এ পৌরোহিত্য করিবার আহ্বান পাইয়াছেন, তজ্জন্য ভাষণ লিখিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ইতিমধ্যে অমিয় চক্রবর্তীর নিকট হইতে 'আফ্রিকা'[৩] সম্বন্ধে একটি কবিতা লিখিয়া পাঠাইবার জন্য অনুরোধে আসিয়াছে। কবি সেটি লেখেন ২৮ মাঘ, কলিকাতায় যাইবার আগের দিন। আফ্রিকার ইতিহাস কবি ভালোরূপই জানিতেন; মোরেল (E. D. Morel) প্রভৃতির বই তাঁহার পড়া ছিল। এই হতভাগ্য মহাদেশের কৃষ্ণকায় মানুষের প্রতি শ্বেতকায় তথাকথিত সভ্যমানুষের অত্যাচার সুবিদিত। কবি লিখিতেছেন :

সভ্যের বর্বর লোভ
নগ্ন করল আপন নির্লজ্জ অমানুষতা।
তোমার ভাষাহীন ক্রন্দনে বাষ্পাকুল অরণ্য পথে
পঙ্কিল হ'ল ধূলি তোমার রক্তে অশ্রুতে মিশে।

সমুদ্রপারে সেই মুহূর্তেই তাদের পাড়ায় পাড়ায়
মন্দিরে বাজছিল পুজার ঘণ্টা
সকালে সন্ধ্যায় দয়াময় দেবতার নামে;
শিশুরা খেলছিল মায়ের কোলে;
কবির সংগীতে বেজে উঠেছিল সুন্দরের আরাধনা

১ V. B. News. 1937-Feb. p 58.

২ ১৯৩৮ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের Convocationএ মিঃ এনড্রুস ভাষণ দান করেন সে সভায় মুসলমান মন্ত্রীদের ছয় জনের মধ্যে একজন এমন কি প্রধান তথা শিক্ষামন্ত্রী ফজলুল হক সাহেবও উপস্থিত হন নাই। প্রবাসী ১৩৪৪ চৈত্র পৃ ৮৮৪।

৩ পত্রপুট ২য় সং ষোলো সংখ্যক। ইহার আরও দুইটি পাঠ মুদ্রিত আছে 'আফ্রিকা', কবিতা ১৩৪৪ আশ্বিন। অন্যপাঠ 'আফ্রিকা' বিশ্বভারতী পত্রিকা, ১৩৫১ শ্রাবণ-আশ্বিন সংখ্যা। দ্র র-র ২০, পৃ ৪৯-৫০, ৪৩৪-৩৬। এই সময়ে ইথিওপিয়ার উপর ইতালির উৎপাত শুরু হইয়াছে।

১১ ফেব্রুয়ারি (১৯৩৭ ॥ ১৩৪৩ মাঘ ২৯) কবি কলিকাতায় গিয়া উঠিলেন বরাহনগরে মহলানবীশদের বাড়ি। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবে রবীন্দ্রনাথ উদ্বোধক। বিশ্ববিদ্যালয়ের ৮০ বৎসরের ইতিহাসে (১৮৫৭-১৯৩৭) তথাকার কর্তৃপক্ষের নিঃসম্পৃক্ত ব্যক্তি বা বেসরকারী কোনো লোক কখনো কন্‌ভোকেশন বা সমাবর্তনের পৌরোহিত্য করেন নাই। এই অঘটন ঘটাইবার কৃতিত্ব তৎকালীন ভাইস-চানসেলর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের (১৯০১-১৯৫৩ জুন ২৩)। সিনেট হলে স্থান সংকুলান হইবে না জানিয়া কর্তৃপক্ষ সার্কুলার রোডস্থ বিজ্ঞানকলেজের প্রাঙ্গণে বিশেষ মণ্ডপ নির্মাণ করিয়াছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'কন্‌ভোকেশন অ্যাড্রেস' বাংলায়[১] পাঠ করেন (১৭ ফেব্রুয়ারি ॥ ৫ ফাল্গুন); ইহাও অভূতপূর্ব ঘটনা; ইতিপূর্বে কেহ বাংলাভাষায় বা কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে মাতৃভাষায় কনভোকেশনের বক্তৃতা করেন নাই। এ দেশের ভাষা-বিভ্রাট বহু দিনের; এবং সে-সমস্যা যে আজও নিরাকৃত হইয়াছে তাহা নহে। "ভারতবর্ষ ছাড়া পৃথিবীর অন্য কোনো দেশেই শিক্ষার ভাষা এবং শিক্ষার্থীর ভাষার মধ্যে আত্মীয়তা-বিচ্ছেদের অস্বাভাবিকতা দেখা যায় না।···সকলের চেয়ে অনর্থকর কৃপণতা বিদ্যাকে বিদেশী ভাষার অন্তরালে দূরত্ব দান করা···। দীর্ঘকাল ধ'রে আমাদের প্রতি ভাগ্যের এই অবজ্ঞা আমরা সহজেই স্বীকার ক'রে এসেছি।"[২] কবি বলেন, "আমাদের দেশে শিক্ষা অশিক্ষার মধ্যে যে প্রভেদ সে ঐ সাহারা ও ওয়েসিসেরই মতো, অর্থাৎ পরিমাণগত ভেদ এবং জাতিগত ভেদ।" বক্তৃতাশেষে কবি প্রার্থনা আবৃত্তি করেন :

হে বিধাতা, দাও দাও মোদের গৌরব দাও
দুঃসাধ্যের নিমন্ত্রণে
দুঃসহ দুঃখের গর্বে।
টেনে তোলো রসাক্ত ভাবের মোহ হতে
সবলে ধিক্‌কৃত করো দীনতার ধূলায় লুণ্ঠন।
দূর করো চিত্তের দাসত্ববন্ধ,
ভাগ্যের নিয়ত অক্ষমতা,
দূর করো মূঢ়তায় অযোগ্যের পদে
মানবমর্যাদা-বিসর্জন,
চূর্ণ করো যুগে যুগে স্তূপীকৃত লজ্জারাশি নিষ্ঠুর আঘাতে
নিঃসংকোচে
মস্তক তুলিতে দাও
অনন্ত আকাশে,
উদাত্ত আলোকে,
মুক্তির বাতাসে।

কবির এই বাংলা ভাষণ ও সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর কৃত ইহার ইংরেজি তর্জমা বিশ্ববিদ্যালয় দ্বারা প্রকাশিত হয়।

১ প্রবাসী ১৩৪৩ চৈত্র পৃ ৯১১-১১

২ চন্দননগরে বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মেলনের বিংশ অধিবেশনে (১৩৪৪ ফাল্গুন) হীরেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁহার ভাষণের একস্থানে বলেন,—"১৩০১ বঙ্গাব্দে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যাহাতে বাংলার জন্য যোগ্য স্থান নির্দিষ্ট হয় এবং প্রবেশিকা ও এফ-এ পরীক্ষায় [Entrance ও First Arts নাম তখন ছিল, Matriculation ও Intermediate in Arts, I. A. র স্থলে] যাহাতে ইতিহাস প্রভৃতির জ্ঞান বাংলার বাহনে বিতরিত হয়—তজ্জন্য স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতিকে লইয়া (আমিও কমিটির একজন সদস্য ছিলাম) একটি কমিটি গঠিত করেন। ঐ কমিটি সসংকোচে প্রস্তাব করেন—'That the University be moved to adopt a regulation to the effect that in History, Geography and Mathematics at the Entrance examination, the answer may be given in any of the living languages recognized by the Senate.' ঐ প্রস্তাব বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রেরিত হইলে বিবেচনার অযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল।··· সিনেট এইরূপ বিধান করেন যে, 'An optional examination be held in original composition in Bengali and other vernaculars for the F. A. and B. A. candidates, proficiency in it entitling candidates to a special certificate.'" দ্র প্রবাসী ১৩৪৩ চৈত্র পৃ ৯০১-০২। এণ্ট্রান্স বা প্রবেশিকা পরীক্ষায় ১৯১০ পর্যন্ত ছাত্রদিগকে বাংলায় পরীক্ষা দিতে হইত না। থার্ডক্লাস (class VIII) পর্যন্ত বাংলা পড়ানো হইত। মেয়েরা বাংলা লইতে পারিত। মনে আছে আমাদের স্কুলে আমাদের উপরের ক্লাসে একটি ছেলে বাংলায় পরীক্ষা দিবার জন্য প্রস্তুত হয়, এই সংবাদ পাইয়া আমাদের ক্লাসে কী হাস্য! সে ছেলেটি যেন অদ্ভুত কিছু করিয়াছে! এই ছিল বাংলার দশা।

সমাবর্তন উৎসবের চারি দিন পরে কবি একদিনের জন্য চন্দননগর যান। সেখানে বঙ্গীয় সাহিত্যসম্মেলনের ২০তম অধিবেশন; এই সম্মেলন ছয় বৎসর পরে আহূত হইয়াছে। মূল সভাপতি হীরেন্দ্রনাথ দত্ত। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি চন্দননগরের সর্বজনপরিচিত দানবীর হরিহর শেঠ। রবীন্দ্রনাথ কলিকাতা-বরাহনগর হইতে নৌকা-যোগে চন্দননগর যান ও সাহিত্যসম্মেলনের উদ্বোধন করিয়া সেই রাত্রেই ফিরিয়া আসেন (১৩৪৩ ফাল্গুন ৯ ॥ ১৯৩৭ ফেব্রুয়ারি ২১)।[১]

বরাহনগরে কবি ১১ ফেব্রুয়ারি হইতে ৭ মার্চ পর্যন্ত ছিলেন। ইতিমধ্যে ৩ মার্চ (১৩৪৩ ফাল্গুন ১৯) রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের শতবার্ষিকী উৎসব উপলক্ষে সর্বধর্ম সম্মেলন হইল। মূল সভাপতি ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, তিনি অসুস্থ হওয়ায়, অন্যে তাঁহার ভাষণ পাঠ করিয়া দেন; সভায় উপস্থিত হইয়া রবীন্দ্রনাথ নিজের ভাষণ পড়িয়াছিলেন। বক্তৃতা শেষে কবিকে ধন্যবাদ দিতে উঠিয়া স্যর ফ্রান্সিস ইয়ংহাজব্যান্ড বলেন, যদি এই ধর্মসম্মেলনে কেবল এই অভিভাষণটিই পঠিত হইত, তাহা হইলেও অধিবেশন সার্থক মনে করা যাইতে পারিত।[২]

এই ভাষণে রবীন্দ্রনাথ পরমহংসদেব সম্বন্ধে যাহা বলেন তাহা সংক্ষিপ্ত; ধর্মের মূলতত্ত্ব ও ধর্মের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতার বিচারই ছিল ভাষণের মূল কথা। কবি বলেন, "ভগবান বুদ্ধ প্রচার করেন মৈত্রী—অর্থাৎ বিশ্বশান্তির সম্বন্ধ—জীবে জীবে—তথা নিখিল সৃষ্টিতে। এ জগতকে আমরা অসত্য সম্বন্ধে বাঁধি যখন তাকে শুধু আমাদের ব্যক্তিগত প্রয়োজন মেটাবার উপাদান করতে চেষ্টা করি। বুদ্ধ কি এইটি বুঝাতে চাননি যে সৃষ্টির আসল অর্থবোধ হয় প্রেমে?... সে মুক্তি নেতিবাচক নয়, কারণ প্রেম কখনো শূন্যতায় নিয়ে যায় না। শুধু বন্ধন ছিন্ন করায় নয়—সম্বন্ধের পরিপূর্ণ সামঞ্জস্যেই মুক্তি। যেখানে মুক্তি শুধু ফাঁকা ও বস্তুবর্জিত সেখানে তার কোনো মানে নেই।"

কবি বলিতেছেন, "যে ধর্ম আমাদের মুক্তি দিতেই এসেছিল সেই হয়ে ওঠে মুক্তি ও স্বাধীনতার প্রচণ্ড শত্রু। সব বাঁধনের মধ্যে ধর্মনামাঙ্কিত বাঁধনই ভাঙা সব চেয়ে কঠিন। সব গারদের মধ্যে জঘন্যতম সেটা যা অদৃশ্য, যেখানে মানুষের আত্মা মোহজনিত আত্মপ্রবঞ্চনায় বন্দী।......নির্লজ্জ অহমিকার ধর্ম মরে গিয়ে জড় সাম্প্রদায়িকতা ও ঘৃণ্য বিষয়বুদ্ধি ধর্মের মুখোশ হয়ে দাঁড়ায়। এ জগতে অর্থনৈতিক হিসেবী মন মানুষকে যেমন সংকীর্ণ করে, তার চেয়েও মানুষের হৃদয়টা সংকীর্ণ হয়ে পড়ে সাম্প্রদায়িকতার চাপে।...ধর্মের পবিত্র উৎসমূল থেকে যতই আমরা দূরে যাই ততই দেখি আমরা ক্রমশ হারাই সেই প্রাথমিক গতিবেগ, আর সেই সঙ্গে দেখা দেয় যুক্তিহীন অভ্যাস ও যান্ত্রিক আচার-অনুষ্ঠানের শূন্যতা ও ধার্মিকতার অহংকার।"[৩]

এই দীর্ঘ ভাষণে কবি সম্প্রদায়-অতীত ধর্মবোধের কথাই বলেন। সর্বধর্ম মহাসম্মেলনের বাণীই হইতেছে সম্প্রদায়-নিরপেক্ষ ধর্মের বাণী। "When...religions travel from their sacred sources, they lose their

১ তদুপলক্ষে কবি যাহা বলেন, তাহার তাৎপর্য তাঁহার দ্বারা সংশোধিত ও অনুমোদিত হইয়া প্রবাসীতে প্রকাশিত হয় ১৩৪৩ চৈত্র, পৃ ৮৯৬-৯০১।

২ [Sri Ramkrishna Centenary Parliament of Religions. Address by Rabindranath Tagore, Town Hall, Calcutta 3rd March 1937, Pages 9. Art Press, Calcutta] Rabindranath Tagore, Religion of the Spirit and Sectarianism (Address at Sri Ramkrishna Centenary Parliament of Religions)—Modern Review 1937 April. সভায় পড়িবার পূর্বে রবীন্দ্রনাথ মুদ্রিত পুস্তিকাটি অল্প কিছু সংশোধন করেন। এই সংশোধিত পাঠ মডার্ন রিভিউ-এ প্রকাশিত হয়। দ্র প্রবাসী ১৩৪৩ চৈত্র পৃ ৯১০। কবির ভাষণের বাংলা তর্জমা পাই নাই, উদ্বোধন অফিসে লিখি, তাঁহারাও হদিস দিতে পারেন নাই। ষোলো বৎসর পরে ১৩৫৯ সালে ডাঃ কালিদাস নাগ অনুবাদ করেন।

৩ দ্র দৈনিক বসুমতী, শারদীয় সংখ্যা ১৩৫৯, অনুবাদক ডাঃ কালিদাস নাগ, পৃ ১৮-২০, ১৬৯।

original dynamic vigour, and degenerete into the arrogance of piety, into an utter emptiness crammed with irrational habits and mechanical practices ; then is their spiritual inspiration befogged in the turbidity of sectarianism, then do they become the most obstinate obstruction that darkens our vision of human unity, piling up out of their accretions and refuse deadweights of unreason across our path of progress,—till at length civilised life compelled to free its education from the stifling coils of religious creeds." মহাপুরুষদের প্রতি কবির আন্তরিক শ্রদ্ধা আছে, তাঁহার ভয় শিষ্যদের লইয়া—কারণ তাহারাই obscure and distort the ideas originating from the higher source. কবি এই ভাবটির উপর খুবই জোর দিয়া বলেন, "The history of great men ··ever runs the risk of being projected on to a wrong background of memory where it gets mixed up with elements that are crudely customary and therefore inertly accepted by the multitude."

আলমোড়া ১৯৩৭

কলিকাতার বিচিত্র কার্য শেষ করিয়া প্রায় মাসেক কাল পরে কবি শান্তিনিকেতনে ফিরিলেন (১৯৩৭ মার্চ ৭)। পরদিন আশ্রমে আসেন স্যর জন্ রাসেল সস্ত্রীক। স্যর জন ইংলণ্ডের প্রসিদ্ধ বিজ্ঞানী, কৃষি-রসায়নবিদ্ বলিয়া জগৎ-খ্যাতি। তিনি বিশ্বভারতীর উভয় প্রতিষ্ঠান—বিশেষভাবে শ্রীনিকেতন পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখিলেন। শ্রীনিকেতনের গ্রাম-উদ্যোগ ও শান্তিনিকেতনের কলা ও জ্ঞানযোগ উভয়ই-যে জাতীয় জীবনের পক্ষে অপরিহার্য অঙ্গ এই তত্ত্বটি স্যর জন্ স্বল্পকাল অবস্থানের মধ্যে বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তিনি লেখেন, 'it is rare to find so much of the University ideal realized within so small a compass.'[১] বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিপূর্ণ আদর্শ এই ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বিদ্যমান এইটি তিনি বুঝিয়া যান।[২]

এক সপ্তাহ পরে শান্তিনিকেতনে "রবি-বাসরের অধিনায়ক কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের আহ্বানে···৩০শে ফাল্গুন রবিবাসরের অধিবেশন" হইল। রবিবাসরের সদস্যগণের শান্তিনিকেতনে আসিবার ইচ্ছা বহু দিনের। বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উপলক্ষে কবি যখন কলিকাতায়, সেই সময়ে তিনি তাঁহাদিগকে জানাইয়াছিলেন (১৩৪৩ ফাল্গুন ৯) যে ফাল্গুন মাসের শেষ দিকে রবিবাসরকে শান্তিনিকেতনে আহ্বান করা সম্ভব হইবে। তদনুযায়ী তাঁহারা (৪০ জন) আসিলেন। অতিথিদের মধ্যে জনৈক লিখিতেছেন, "কবির আদর, অভ্যর্থনা ও আতিথেয়তায় ও তাঁর অমৃতময়ী বাণীর মধ্য দিয়া তাঁহার অভিজাত ও উদার হৃদয়ের যে অপূর্ব পরিচয় পাইয়াছি, তাহাতে বিশেষ অভিভূত হইয়া পড়িয়াছি।"

১ V. B. News 1937 April, p 74, 78. Sir John Russell F. R. S. Director of Rothamstead Experiment Station.

২ "বিশ্ববিখ্যাত Sir John Russell সম্প্রতি এসেছিলেন। তিনি এই অনুষ্ঠান দেখে সত্যিকার অভাব কোথায় তা বুঝতে পেরেছিলেন, তাঁকে বোঝাবার কোনো প্রয়োজন হয় নি।" রবিবাসরে অভিভাষণ, বিচিত্রা ১৩৪৩ চৈত্র পৃ ৩৩১।

ইতিপূর্বে সাহিত্যিকরা সংঘবদ্ধ ভাবে কখনো শান্তিনিকেতনে আসেন নাই—অবশ্য ব্যক্তিগতভাবে বহু লেখক লেখিকা কবির সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন। রবিবাসরের যেসব সদস্য শান্তিনিকেতনে আসেন তাঁহাদের নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল।[১]

উত্তরায়ণে রবি-বাসরের সভা হয়। জলধর সেন উদ্বোধনে বলেন, "কলকাতা থেকে কয়লা নিয়ে রানীগঞ্জে বিক্রয় করতে আমরা আসিনি। আমরা এসেছি এই পবিত্র তীর্থে, এই পুণ্য আশ্রমে, এই পবিত্র স্বর্গে নিজেদের পবিত্র করতে, সার্থক করতে, আর আপনার শ্রীমুখনিঃসৃত বাণী শুনতে।"

কবির ভাষণ যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত সাংকেতিক অক্ষরে লিপিবদ্ধ করিয়া লইলেন। কবি বলেন, "আপনাদের আমি এখানে আহ্বান করেছি, দেখবার জন্য বোঝবার জন্য আমি কিভাবে এখানে দিন কাটাই। আমি এখানে কবি নই। এ কবির ক্ষেত্র নয়। সাহিত্য নিয়ে আমি এখানে কারবার করিনে। আমার এই কার্যক্ষেত্রের ভিতর দিয়ে যে বাণী এখানে প্রকাশ পেয়েছে, যে আলোকপ্রভা এখানে দীপ্তি দিয়েছে, তার ভিতর সমস্ত দেশের অভাব ও ভাবনার উত্তর রয়েছে। এখানে আমার সাহিত্যের সহিত ঘনিষ্ঠতা নয়, এখানে আমার কর্মই রূপ পেয়েছে। এখানে আমার এই কর্মের ক্ষেত্রে আমি এতদিন কী করেছি না করেছি তারই পরিচয় আপনারা পাবেন।"[২] সাহিত্যিকগণ শান্তিনিকেতন ও শ্রীনিকেতনের বিচিত্র কর্ম-অনুষ্ঠান দেখিয়া কলিকাতায় ফিরিয়া গেলেন।[৩]

বাহিরের লোকজনের আসা-যাওয়া, নানা বিষয়ের মৌখিক আলাপআলোচনা, কখনো আলোচনার উপর চলে লেখনী চালনা—এইভাবে দিন যায়। সমস্তের সঙ্গে আছে নিত্যপ্রাতের কাব্যসাধনা। তবে সেখানে বেগ বা আবেগ কোনোটাই তীব্র নহে। সেঁজুতি, নবজাতক, প্রহাসিনীর মধ্যে এই সময়ের রচিত কবিতাগুলি[৪] ছড়াইয়া আছে, কালানুক্রমে একস্থানে পাইবার উপায় নাই। এই কবিতাগুলি ফাল্গুন ২৭ হইতে ১৩৪৪ বৈশাখ ১৩ এর মধ্যে লিখিত।

একমাস পূর্বে লিখিত 'যাবার মুখে' (১৩৪৩ মাঘ ২২, সেঁজুতি) হইতে 'স্মরণ' (১৩৪৩ চৈত্র ২৫) কবিতা কয়টির মধ্যে মনের একটি বিশেষ ভাব দেখা যায়, সর্বানুভূতি, সর্বত্যাগের বাসনা ও সর্বক্ষণিকতার অনুভাব।

১ এই নামের তালিকা বঙ্গীয় গ্রন্থাগার-আন্দোলনের অন্যতম নেতা শ্রীতিনকড়ি দত্ত মহাশয় লেখককে ১৯৫৩ ডিসেম্বর ২৩ তারিখে পাঠাইয়া দেন: অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, আনন্দলাল মুখোপাধ্যায়, উপেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, কালীকৃষ্ণ রায়, খগেন্দ্রনাথ সেন, গিরিজাকুমার বসু, গৌরীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, জলধর সেন, জ্ঞানেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, তিনকড়ি দত্ত, দিব্যেন্দু লাহা, ননীমাধব চৌধুরী, নরেন্দ্র দেব, নরেন্দ্রনাথ বসু, নরেশচন্দ্র মিত্র, নিধিরাজ হালদার, পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তী, প্রফুল্লকুমার সরকার, প্রেমোৎপল বন্দ্যোপাধ্যায়, ফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ফণীভূষণ গুপ্ত, বিজনবিহারী ভট্টাচার্য, বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়, বিভাস রায় চৌধুরী, বৈষ্ণবদাস সেন, ব্রজমোহন দাস, ভূতনাথ দে, মন্মথনাথ ঘোষ, মুনীন্দ্রদেব রায়মহাশয়, মুরারীমোহন রায়, যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, যোগেশচন্দ্র রায়, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, শৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা, সলিলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র, সন্তোষকুমার মুখোপাধ্যায়, সুনির্মল বসু।

২ রবিবাসরে অভিভাষণ, শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ১৩৪৩ ফাল্গুন ৩০, শান্তিনিকেতন। যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত কর্তৃক অনুলিখিত।—বিচিত্রা ১৩৪৩ চৈত্র পৃ ৩২৮-২৯।

৩ শান্তিনিকেতনে রবিবাসর (সচিত্র), নরেন্দ্রনাথ বসু, বিচিত্রা ১৩৪৩ চৈত্র পৃ ৩৭২-৭৮। অর্চনা, বাংলার কবি রবীন্দ্রনাথের প্রতি রবিবাসর, সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র, বিচিত্রা ১৩৪৩ চৈত্র পৃ ২৮১-৮২।

৪ অমর্ত্য (১৯৩৭ মার্চ ১১। ১৩৪৩ ফাল্গুন ২৭), পলায়নী (১৯ চৈত্র), স্মরণ (২৫ চৈত্র, সেঁজুতি), হিন্দুস্থান (নবজাতক ১৩৪৪ বৈশাখ ৪), খাপছাড়া (৫ বৈশাখ, প্রহাসিনী), সন্ধ্যা (১০ বৈশাখ), ভাগীরথী (১৩৪৪ বৈশাখ ১৩, সেঁজুতি)।

'যে-আমি রয়েছে তোমার আমায়
সে-আমি আমারি আমি'।
সে আমি সকল কালে,
সে আমি সকল খানে,
প্রেমের পরশে সে অসীম আমি
বেজে ওঠে মোর গানে। (যাবার মুখে)

অন্যত্র—

যে-দেহেতে মিলিয়ে আছে অনেক ভোরের আলো,
নাম-না-জানা অপূর্বেরে যার লেগেছে ভালো,
যে-দেহেতে রূপ নিয়েছে অনির্বচনীয়
সকল প্রিয়ের মাঝখানে যে প্রিয়—
পেরিয়ে মরণ সে মোর সঙ্গে যাবে
কেবল রসে, কেবল সুরে, কেবল অনুভাবে। (অমর্ত্য)

১৩৪৩ চৈত্র ২৫ 'স্মরণ' কবিতাটি লেখেন। মনে হয় নববর্ষের দিন যে জন্মোৎসব হইবে এইটি তাহারই স্মরণে লেখা :

যখন রব না আমি মর্তকায়ায় তখন স্মরিতে যদি হয় মন
তবে তুমি এসো হেথা নিভৃত ছায়ায় যেথা এই চৈত্রের শালবন।

...

বাসা যার ছিল ঢাকা জনতার পারে,
ভাষাহারাদের সাথে মিল যার,
যে-আমি চায়নি কারে ঋণী করিবারে,
রাখিয়া যে যায় নাই ঋণভার,
সে-আমারে কে চিনেছ মর্তকায়ায়,
কখনো স্মরিতে যদি হয় মন,
ডেকো না ডেকো না সভা, এসো এ ছায়ায়
যেথা এই চৈত্রের শালবন।

এদিকে সংসারের মধ্যে আলমোড়া যাত্রার আয়োজন চলিতেছে ; চলার নামেই কবির মন উৎসুক হয়। উত্তর-ভারতের মধ্য দিয়া যাইতে হইবে—হিন্দুস্থান ও ভাগীরথী মনে নানা রূপ ও রসের খোরাক জোগাইতেছে।

মোরে হিন্দুস্থান
বারবার করেছে আহ্বান
কোন্ শিশুকাল হতে পশ্চিম দিগন্ত পানে,
ভারতের ভাগ্য যেথা নৃত্যলীলা করেছে শ্মশানে।
ভগ্নজানু প্রতাপের ছায়া সেথা শীর্ণ যমুনায়
প্রেতের আহ্বান বহি চলে যায়,
বলে যায়—
আরো ছায়া ঘনাইছে অস্ত দিগন্তের জীর্ণ যুগান্তের।

উত্তর-ভারতের সম্পদের উৎস গঙ্গা স্রোতস্বিনী ; 'ভাগীরথী' কবিতায় তাহারই স্তব ধ্বনিয়াছে। বালককালে হিমালয়যাত্রা, যৌবনে গাজিপুর বাস ও প্রৌঢ়ারম্ভে আলমোড়ায় দুই মাস আসা-যাওয়ার স্মৃতি কি আজ জাগিতেছে? মাঝখানে একদিন 'খাপছাড়া'[১] কবিতা (১৩৪৪ বৈশাখ ৫)—'পাবনায় বাড়ি হবে, গাড়ি গাড়ি ইট কিনি' লিখিলেন। কবিমনের

১ খাপছাড়া, সংযোজন পৃ ৫৭। র-র ২১ খণ্ড।

এই আকস্মিক ঋতুপরিবর্তনের কারণ খুঁজিয়া পাওয়া কঠিন। তবে আলমোড়া যাত্রার আয়োজনের বাহুল্য-ব্যবস্থাকে ব্যঙ্গ করিলেন কিনা জানি না।

গ্রীষ্মাবকাশের জন্য শান্তিনিকেতন বিদ্যায়তন বন্ধ হইবার পূর্বে নববর্ষের (১৩৪৪) দিন যথারীতি মন্দিরে উপাসনা ও তৎপরে কবির জন্মদিনের উৎসব উদ্‌যাপিত হইল। সেইদিনই অপরাহ্ণে (১৯৩৭ এপ্রিল ১৪) চীনাভবনের দ্বার-উদ্‌ঘাটন উৎসব নিষ্পন্ন হয়।

এইখানে চীনাভবনের ইতিহাস সংক্ষেপে বলা প্রয়োজন। পাঠকের স্মরণ আছে ১৯২৩ সালে কবি চীনদেশে গিয়াছিলেন, সঙ্গে ছিলেন ক্ষিতিমোহন সেন, নন্দলাল বসু, কালিদাস নাগ ও এলমহার্স্ট। তৎপূর্বে ১৯২১-২২ সালে সিলভ্যাঁ লেভি সাহেব শান্তিনিকেতনে চীনা ভাষা ও বৌদ্ধশাস্ত্র আলোচনার সূত্রপাত করিয়াছিলেন। কান্টনের শ্রীমতী হারদুন বিশ্বভারতীর জন্য বহু শত চীনা গ্রন্থ (চীনা ত্রিপিটক ও পরে চতুর্বিংশ রাজবংশের ইতিহাস গ্রন্থমালা) শান্তিনিকেতন দান করেন; চীনা গ্রন্থ সংগ্রহের সেই সূত্রপাত।

তার পর ইতালীয় অধ্যাপক জোসেপ তুচ্চি (Tucci) ও চীনা অধ্যাপক ঙো লিম্‌ (Ngo Lim) চীনাভাষা শিক্ষা দেন (১৯২৫-২৬)। দুই বৎসর পর তান্‌ য়ুন-সান নামে এক তরুণ চীনা শান্তিনিকেতনে আসেন; ইনি ১৯২৮ হইতে ১৯৩১ পর্যন্ত সেখানে বাস করেন। এই সময়ে তিনি ইংরেজি ভাষা ও ভারতীয় ধর্ম বিশেষভাবে অধ্যয়ন করেন। অতঃপর ১৯৩১ সালে দেশে ফিরিয়া যান ও দুই বৎসর নানাস্থানে ঘোরাঘুরি করিয়া নান্‌কিঙে ১৯৩৩-এ Sino-Indian Cultural Societyর পত্তন করেন। পর বৎসর তান য়ুন-সান শান্তিনিকেতনে ফিরিয়া রবীন্দ্রনাথকে তাঁহার চীনা-ভারত সাংস্কৃতিক কেন্দ্র স্থাপনের পরিকল্পনার কথা বলেন। কবি এই সংবাদে খুবই আনন্দিত হইয়া নিম্নলিখিত বাণীটুকু লিখিয়া দিলেন (১৯৩৪ সেপ্টেম্বর ২২):

"I gladly offer hospitality to the Sino-Indian Cultural Society to use my university at Santiniketan as the centre of its activity in India. It is my hope that my Chinese friends will heartily welcome the Society and give generous help to my friend Prof. Tan Yun-Shan to realize this scheme of making a permanent organisation for facilitating closer cultural contact between China and India." অধ্যাপক তান য়ুন-শান ১৯৩৪ অক্টোবর মাসে চীনদেশে ফিরিয়া গিয়া পুনরায় অর্থ ও গ্রন্থ সংগ্রহে মনোনিবেশ করিলেন। তাঁহার অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে শান্তিনিকেতনে Sino-Indian Cultural Society-র কেন্দ্রগৃহ প্রতিষ্ঠার জন্য পঞ্চাশ হাজার টাকার প্রতিশ্রুতি পাইলেন; তাইচি তাও-এর উইল হইতেও দশ হাজার টাকার উপর পাওয়া গেল। অধ্যাপক তান্‌ প্রথম বিশ হাজার টাকা গৃহ নির্মাণের জন্য রবীন্দ্রনাথের নামে পাঠাইয়া দিলেন।[১] চীনাদের প্রদত্ত সেইঅর্থে চীনাভবনের গৃহ নির্মিত হইয়াছে।

এই নববর্ষে তাহারই উদ্বোধন; কথা ছিল কন্‌গ্রেসের সভাপতি জবহরলাল নেহেরু দ্বার উদ্‌ঘাটন করিবেন। কিন্তু তিনি অকস্মাৎ অসুস্থ হইয়া পড়ায় আসিতে পারিলেন না, তাঁহার কন্যা শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন ছাত্রী ইন্দিরা মারফত তাঁহার ভাষণ পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। মহাত্মাজির আসিবার ইচ্ছা ছিল। তিনিও আসিতে পারিলেন

১ V. B News III 1935 June p 99. The Visvabharati Cheena-Bhavana and the Sino-Indian Cultural Society by Prof. Tan Yun-Shan. The Sino-Indian Cultural Society, Chunking and Santiniketan. Pamphlet No. 10. December 1944. Also Bulletin No. 1. পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য। মোট এ পর্যন্ত ৮,৮৫,৪৫৭।৹ টাকা পাওয়া গিয়াছে।

না; বেলগাঁও-এ জরুরী কাজে তাঁহাকে যাইতে হইতেছে। সেখানে যাইতে না হইলে তিনি নিশ্চয়ই আসিতেন। তিনি কবিকে লিখিয়া পাঠাইলেন :

"Had I not to go to Belgaum on the very date you will have the opening ceremony, I would most certainly have come, not only for the ceremony but also to see you and Santiniketan, which I have not seen now for years. As it is, I shall be with you in spirit. May the Chinese Hall be a symbol of living contact between China and India."[১]

জবহরলাল যে ভাষণ লিখিয়া পাঠান তাহা হইতে একটি মাত্র অংশ উদ্ধৃত করিলাম,—"China and India, sister nations from the dawn of history...have to play a leading part in the world drama, in which they themselves are so deeply involved."[২]

রবীন্দ্রনাথ China and India নামে এক নাতিদীর্ঘ ভাষণ দান করেন। তেরো বৎসর পূর্বে চীনদেশে কবি যে ভাষণ দিয়াছিলেন, তাহা হইতে কিয়দংশ এই বক্তৃতায় উদ্ধৃত হয়। তিনি সেদিন বলিয়াছিলেন, "Its one object is to let India welcome the world to its heart···let us unite·· inspite of our differences...For differences can never be wiped away, and life would be so much the poor without them. Let all human races keep their own personalities, and yet come together, not in a uniformity that is dead, but in a unity that is living."

আজিকার ভাষণে কবি বলিতেছেন, "That has happened and friends are here from China with their gift of friendship and co-operation. The Hall which is to be opened today will serve both as the nucleus and as a symbol of that larger understanding that is to grow with time. Here students and scholars will come from China and live as part of ourselves, sharing our life and letting us share theirs, and by offering their labours in common cause, help in slowly re-building the great course of fruitful contact between our peoples, that has been interrupted for ten centuries.

"For this Visvabharati, is, and will, I hope, remain a meeting place for individuals from all countries, East or West, who believe in the unity of mankind and are prepared to suffer for their faith. I believe in such individuals even though their efforts may appear to be insignificant to be recorded in history"[৩]

আমাদের আলোচ্য পর্বে রবীন্দ্রনাথকে আর-একটি বিষয়ের সম্বন্ধে আলোচনা করিতে দেখিতেছি; সেটি হইতেছে লোকশিক্ষার ক্ষেত্রে। পাঠকের স্মরণ আছে বহু বৎসর পূর্বে Home University Library-র অনুরূপ গ্রন্থমালা বাংলাভাষায় প্রকাশনের কথা কবির মনে আসিয়াছিল। এতকাল পরে বিশ্বভারতী প্রকাশন-বিভাগের অধ্যক্ষ চারুচন্দ্র ভট্টাচার্যের উদ্যোগে বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ গ্রন্থমালা প্রকাশের পরিকল্পনা গৃহীত হইল। কবির মতে 'সাধারণ জ্ঞানের

১ Annual Report Visvabharati 1937, p 7.

২ Message of Jawharlal Nehru.—V. B. News Vol. V. 1937 p 88.

৩ V. B. Quarterly 1937, p 29-32.

সহজবোধ ভূমিকা'র আরম্ভ হইবে বিজ্ঞান চর্চায়। তদুদ্দেশ্যে কবির ইচ্ছা যে, এই বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ গ্রন্থমালার প্রথম গ্রন্থ হইবে বিজ্ঞানবিষয়ক বিশ্বপরিচয়। কবি বলেন, "বুদ্ধিকে মোহমুক্ত ও সতর্ক করবার জন্য প্রধান প্রয়োজন বিজ্ঞান চর্চার।...জ্ঞানের এই পরিবেষণ কার্যে পাণ্ডিত্য (Pedantary) যথাসাধ্য বর্জনীয় মনে করি।" এই প্রথম গ্রন্থখানি লিখিবার ভার অর্পণ করা হইয়াছিল প্রমথনাথ সেনগুপ্তর উপর। প্রমথনাথ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতি ছাত্র, সত্যেন্দ্রনাথ বসুর প্রিয় শিষ্য, শিক্ষাভবনে পদার্থবিজ্ঞানের অধ্যাপক। তিনি বিশ্বপরিচয়ের খসড়া প্রস্তুত করিয়া কবির হাতে না দিলে কবির লেখনী হইতে এই অপরূপ রচনা আমরা আশা করিতে পারিতাম না। আদ্যন্ত পাঠ করিয়া কবির মনে হইল ভাষার দিক হইতে জটিল বিষয়গুলিকে আরও সরল করা প্রয়োজন। তজ্জন্য স্থির করিলেন পাণ্ডুলিপিকে নূতন রূপ দিবেন। কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞান সহজবোধ্য নহে, তদ্‌বিষয়ক গ্রন্থগুলিও সহজ ও সুখপাঠ্য নহে। কবি পশ্চাৎপদ না হইয়া স্বয়ং আধুনিক বিজ্ঞানবিষয়ক গ্রন্থসমূহ পাঠে প্রবৃত্ত হইলেন। জটিল তত্ত্বসমূহ প্রমথনাথের সহিত আলোচনা করিতেন। অতঃপর স্থির করিলেন আলমোড়া বাসকালে স্বয়ং বিশ্বপরিচয় নূতন করিয়া লিখিবেন। পাঠকের স্মরণ আছে বহু বৎসর পূর্বে (১৯০৩) কবি এখানে তাঁহার রুগ্না কন্যা রেণুকার বায়ু পরিবর্তনের জন্য আসিয়াছিলেন। সেই সময়ে এখানে বসিয়া লেখেন 'শিশু'র কবিতাগুচ্ছ। এবার আসিয়া লেখেন 'ছড়ার ছবি' ও 'বিশ্বপরিচয়'।

বিদ্যালয় বন্ধ হইয়া গেলে কবি সপরিবারে আলমোড়া চলিলেন (১৯৩৭ এপ্রিল ২৯); সঙ্গে রথীন্দ্রনাথ, প্রতিমাদেবী, নন্দিনী ও নন্দিতা। অধ্যাপক অনিলকুমার চন্দ কবির সেক্রেটারি রূপে সঙ্গে আছেন। অনিলকুমার দুইখানি পত্রে কবির আলমোড়া যাত্রা ও তথায় বাসের যে বর্ণনা দিয়াছেন, তাহা উপভোগ্য।[১] তিনি লিখিতেছেন যে, গত চারি বৎসর তিনি রবীন্দ্রনাথের কাছে আছেন, তিনি কবিকে কখনো 'বিশ্রাম' করিবার জন্য 'ছুটি' লইতে দেখেন নাই। তাই আলমোড়া গিয়া কবি বিশ্রাম করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলে সকলেই সুখী হইয়াছিলেন। কবির বয়স এখন সাতাত্তর বৎসর। কিন্তু কবি সঙ্গে লইলেন রাশিকৃত পুস্তক—তার অধিকাংশই বিজ্ঞানের গ্রন্থ। আর লইলেন নন্দলাল বসুর কতকগুলি স্কেচ, এছাড়া ছবি আঁকিবার সরঞ্জাম। অনিলকুমার লিখিতেছেন, "Rest is a mere illusion so far as our Gurudeva is concerned."

বৈশাখের (১৩৪৪) দারুণ গরমে পথে খুবই কষ্ট পান; বিশেষত বেরিলি পৌঁছিয়া জানিতে পারা যায় যে, সেখানে সাতঘণ্টা অপর ট্রেনের জন্য অপেক্ষা করিতে হইবে। তারপর কাঠগোদামে নামিয়া আলমোড়া পৌঁছাইতে আরও ৯০ মাইল মোটরের পথ। যাহা হউক, ক্লান্তদেহে আলমোড়ায় পৌঁছিয়া দেখেন ডক্টর বশী সেন ও তাঁহার আমেরিকান পত্নী সুলেখিকা Gertrude Emerson[২] কবির আরাম ও বিরামের সর্ববিধ ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছেন। বশী সেন জগদীশচন্দ্র বসুর বিজ্ঞানমন্দিরের সহিত বহুকাল সংযুক্ত ছিলেন।

আলমোড়া ক্যাণ্টনমেণ্টের একটা উচ্চ শৈলশিখরে সেণ্টমার্কস্ নামে একটি সুবৃহৎ বাটী কবির জন্য ভাড়া করা হইয়াছিল। বাড়ির আশেপাশে ভিড় নাই দেখিয়া কবি খুবই খুশী। "বাড়িটা বড়ো, জায়গাটা নির্জন, অভিনন্দনের বালাই নেই।"

আলমোড়া আসিতে গিয়া 'দুঃখকর পথে জীবনীশক্তির অনেকখানিই অপব্যয় হয়েছিল।' কিন্তু কয়েকদিনের মধ্যেই জীবনীশক্তির 'উদ্‌বৃত্ত জমা হয়েছে ব'লে বোধ' করিতেছেন। তাই পত্রে লিখিতেছেন, 'এখানে আমি যে শুধু

১ V. B. News V. 1937 p 93-95 ; VI. p.3-4.

২ বহু বৎসর পূর্বে আমেরিকার বিখ্যাত মাসিকপত্র ASIA-র প্রতিনিধিরূপে ভারতে আসেন; সেই সময়ে ইনি শান্তিনিকেতনে আসিয়াছিলেন। কবির নির্দেশে জীবনী-লেখক মিস্ এমার্সনকে ভারত সম্বন্ধে তথ্যাদি সরবরাহ করেন।

বিশ্রাম করচি তা নয়। বস্তুত বিশ্রামের অংশটাই সবচেয়ে কম। নানাবিধ কাজ চেপে বসে যখন পাওয়া যায় অবসর, হাওয়া হালকা হলেই চারদিক থেকে ধেয়ে আসে ঝড়।··· লেখা চলছে পুরো দমে।"[১] এইটি লিখিতেছেন আলমোড়া পৌঁছিবার একমাস পরে। পত্রে 'পুরো দমে' যে লেখার কথা বলিতেছেন সে হইতেছে বিশ্বপরিচয়ের খসড়া।

'বিশ্বপরিচয়' নূতন করিয়া লিখিবার জন্য বহু গ্রন্থ পাঠ করিতেছেন ; বিশ্বতত্ত্বর আধুনিকতম মতাদি আয়ত্তে আনিয়া যতদূর সরল করিয়া সেই কথাগুলিকে লেখা সম্ভব তাহার চেষ্টা হইতেছে। বশী সেন কাছে থাকায় কবির খুব সুবিধা হইয়াছে ; তিনি বিজ্ঞানের লোক, অনেক দুরূহ বিষয়ের মীমাংসা হয় তাঁহার সহিত আলোচনায়। কবির দৃষ্টি শুধু বিষয়ের প্রতি নিবদ্ধ নহে ; তাঁহার উদ্দেশ্য 'শিক্ষণীয় বিষয় মাত্রই বাংলাদেশের সর্বসাধারণের মধ্যে ব্যাপ্ত করে দেওয়া।' অথচ 'জলো' করিবেন না—এ বিষয়েও তিনি দৃঢ়সংকল্প। তাই লেখার মুনশীয়ানায় মেহনত হইতেছে বেশি।

বিজ্ঞান সম্বন্ধে বই লেখা ছাড়া কবিতা লিখিতেছেন প্রায় প্রতিদিনই। আলমোড়া পৌঁছিবার পর 'জন্মদিন' স্মরণে লিখিলেন (১৩৪৪ বৈশাখ ২২, সেঁজুতি) :

দৃষ্টিজালে জড়ায় ওকে হাজারখানা চোখ,
ধ্বনির ঝড়ে বিপন্ন ঐ লোক।
জন্মদিনের মুখর তিথি যারা ভুলে থাকে,
দোহাই ওগো, তাদের দলে লও এ মানুষটাকে।

কবির এই সময়ের অন্য কবিতা যাহা 'ছড়ার ছবি'র অন্তর্গত হইয়াছে তাহাদেরই অনুরূপ ছন্দে আপাত-হালকা সুরে এইটি লিখিত—লঘুগতি তার ছন্দে।

আমরা পূর্বেই বলিয়াছি আলমোড়া আসিবার সময় নন্দলাল বসু অঙ্কিত কতকগুলি স্কেচ্ কবি সঙ্গে করিয়া আনিয়াছিলেন ; সেইগুলিকে কেন্দ্র করিয়া 'ছড়ার ছবি' একটির পর একটি লিখিয়া যান। 'ছবি-আঁকিয়ে' কবিতাটির মধ্যে এই ঋণ স্বীকৃত ; আর্টিস্টের দৃষ্টিশক্তির অপরূপ রহস্যের কথা ব্যক্ত হইয়াছে ছোটো এই কবিতাটির মধ্যে। সাধারণ লোকের দৃষ্টি যাহাদের উপর পড়ে না, সেই অভাজনের দল জীবন্ত, অর্থপূর্ণ হইয়া উঠে শিল্পীর তুলির লিখনে। শিল্পীর রূপসৃষ্টিকে কবি আজ শব্দের প্রতীকদ্বারা ছন্দের সাহায্যে প্রাণবন্ত করিয়া তুলিতেছেন।

তুমি বললে, দেখার ওরা অযোগ্য নয় মোটে, সেই কথাটিই তুলির রেখায় তক্ষুনি যায় রটে।···
অনেক খরচ করে রাজা আপন ছবি আঁকায়, তার পানে কি রসিক লোক কেউ কখনো তাকায়।
সে সব ছবি সাজে সজ্জায় বোকার লাগায় ধাঁধা আর এরা সব সত্যি মানুষ সহজ রূপেই বাঁধা।

আলমোড়ায় লেখা কবিতার মধ্যে কবির বিজ্ঞানী মনের ছাপ পাই যাহা পাওয়া গিয়াছিল 'বসুন্ধরা' প্রভৃতি যৌবনের কবিতায়। সেঁজুতির 'চলতি ছবি' কবিতায় আছে :

এই পৃথিবীর প্রান্ত হতে বিজ্ঞানীদের দৃষ্টি ভেদেছে আজ তারার বক্ষে উজ্জ্বলিত সৃষ্টি
উন্মথিত বহ্নিসিন্ধু প্লাবননির্ঝরে কোটি যোজন দূরত্বেরে নিত্য লেহন করে। ইত্যাদি

'ছড়ার ছবি'র 'পাথরপিণ্ড' কবিতাটি তুলনীয় :

অনেক যুগের আগে
একটা সে কোন্ পাগলা বাষ্প আগুন-ভরা রাগে
মা ধরণীর বক্ষ হতে ছিনিয়ে বাঁধন-পাশ জ্যোতিষ্কদের ঊর্ধ্বপাড়ায় করতে গেল বাস।
বিদ্রোহী সেই দুরাশা তার প্রবল শাসন-টানে আছাড় খেয়ে পড়ল ধরার পানে। ইত্যাদি

১ চিঠিপত্র ৫ম, পত্র ৬৭, St. Marks. Almora ৩০ মে ১৯৩৭।

আলমোড়া বাসকালে জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় (১৩৪৪) মাসে যে কবিতাগুলি লিখিলেন, তাহার সব কয়টিই যে 'ছড়ার ছবি'তে সংগৃহীত হইয়াছে, তাহা নহে। নন্দলালের ছবিগুলি কবিতা লিখিতে তাঁহাকে প্রেরণা দিয়াছিল নিঃসন্দেহেই, কিন্তু কাগজে-আঁকা ছবির বাহিরে বৃহত্তর জগতের চল্‌তি ছবিও তাঁহাকে কয়েকটি কবিতা লিখিতে উদ্বুদ্ধ করে। আবার ছবি দেখিয়া লিখিত অথচ 'ছড়ার ছবি'তে ভাবের অন-অনুসঙ্গতার জন্য অন্যত্র স্থান পাইয়াছে এমন কবিতাও আছে। আমরা নিম্নে পাদটীকায় এই পর্বের কবিতাগুলির তালিকা দিলাম।[১]

'ছড়ার ছবি'র অনেকগুলি কবিতাই গল্প; স্বল্পপরিসর কাহিনীর কোনোটির মধ্যে করুণ, কোনোটির মধ্যে হাস্যরস উছলিয়া উঠিয়াছে। 'শনির দশা' পড়িলে আমাদের অনেকের মধ্যে যে সুপ্ত ডন্ কুইক্‌সট আছে—সে লজ্জিত হয়। 'যোগীন দা', 'কাশী' ও 'মাকাল'[২] পড়িলে হাসির খোরাক যথেষ্ট পাই।

'এই ছড়াগুলি ছেলেদের জন্যে লেখা।' চৌত্রিশ বৎসর পূর্বে আলমোড়া বাসকালে যে 'শিশু' কাব্যখণ্ড লেখেন তাহাও ছেলেদের জন্য লেখা। উভয় কাব্যের মধ্যে কালের দূরত্ব থাকা সত্ত্বেও রচনার উদ্দেশ্যের মধ্যে নৈকট্য খুঁজিয়া পাওয়া যায়। কতকগুলি কবিতা 'স্মৃতি দিয়ে আঁকা', যেমন—কাঠের সিঙ্গি, প্রবাসে, পদ্মায়, বালক, আতার বিচি। এই ছড়াগুলি সম্বন্ধে কবি লিখিতেছেন যে এগুলি ছেলেদের জন্য রচিত হইলেও "সবগুলো মাথায় এক নয়; রোলার চালিয়ে প্রত্যেকটি সমান সুগম করা হয় নি। এর মধ্যে অপেক্ষাকৃত জটিল যদি কোনোটা থাকে, তবে তার অর্থ হবে কিছু দুরূহ, তবু তার ধ্বনিতে থাকবে সুর। ছেলেমেয়েরা অর্থ নিয়ে নালিশ করবে না, খেলা করবে ধ্বনি নিয়ে। ওরা অর্থলোভী জাত নয়।

"ছড়ার ছন্দ প্রাকৃত ভাষার ঘরোয়া ছন্দ। এ ছন্দ মেয়েদের মেয়েলি আলাপ, ছেলেদের ছেলেমি প্রলাপের বাহনগিরি করে এসেছে। ভদ্র সমাজে সভাযোগ্য হবার কোনো খেয়াল এর মধ্যে নেই। এর ভঙ্গিতে এর সজ্জায় কাব্যসৌন্দর্য সহজে প্রবেশ করে, কিন্তু সে অজ্ঞাতসারে। এই ছড়ায় গভীর কথা হাল্‌কা চালে পায়ে নূপুর বাজিয়ে চলে, গাম্ভীর্যের গুমর রাখে না। অথচ এই ছড়ার সঙ্গে ব্যবহার করতে গিয়ে দেখা গেল যেটাকে মনে হয় সহজ সেটাই সবচেয়ে কম সহজ। ছড়ার ছন্দকে চেহারা দিয়েছে প্রাকৃত বাংলা শব্দের চেহারা।"[৩]

১ আলমোড়া বাসকালে লিখিত কবিতা: জন্মদিন (সেঁজুতি) ২২ বৈশাখ ১৩৪৪—জ্যৈষ্ঠ (১৯৩৭ মে-জুন) মাসে লিখিত, তারিখ নাই: জলযাত্রা, ভজহরি, কাঠের সিঙ্গি, খাটুলি, যোগীনদা, বুধু, পাথরপিণ্ড, খেলা, ছবি-আঁকিয়ে, অজয় নদ, পিছু ডাকা (ছড়ার ছবি), চলাচল, (সেঁজুতি), ক্যাণ্ডীয় নাচ (নবজাতক)। ২ জ্যৈষ্ঠ (১৯৩৭ মে ১৬), ভাগ্যরাজ্য (নবজাতক)। ৩ জ্যৈষ্ঠ পিস্‌নি (ছড়ার ছবি)। ৮ জ্যৈষ্ঠ তীর্থযাত্রিনী (সেঁজুতি)। ১১ জ্যৈষ্ঠ নতুন কাল (সেঁজুতি)। ৩ জ্যৈষ্ঠ হঠাৎ মিলন (সানাই)। ১৪ জ্যৈষ্ঠ ঘরের:খেয়া (ছড়ার ছবি)। ১৫ জ্যৈষ্ঠ ইসটিশনে (নবজাতক; র-র ২৪ পৃ ৪৭৩। পুনরায় লিখিত ৭ জুলাই ১৯৩৮)। মে ১৯৩৭ চলাচল (সেঁজুতি)। ২১ জ্যৈষ্ঠ শনির দশা (ছড়ার ছবি)। ২৩ জ্যৈষ্ঠ পদ্মায় (ছড়ার ছবি)। ২৫ জ্যৈষ্ঠ পালের নৌকা (সেঁজুতি)। ২৬ জ্যৈষ্ঠ যাত্রাপথ (আকাশপ্রদীপ)। ২৬ জ্যৈষ্ঠ বাসাবাড়ি, আকাশ (ছড়ার ছবি)। ২৭ জ্যৈষ্ঠ কাশী, রিক্ত (ছ-ছ)। ২৯ জ্যৈষ্ঠ ঝড় (ছ-ছ)। ৩০ জ্যৈষ্ঠ তালগাছ (ছ-ছ)। জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় চলতি ছবি (সেঁজুতি)। আষাঢ় মাসে লিখিত। চড়িভাতি, প্রবাসে (ছ-ছ)। ৬ আষাঢ় ভক্তী (ছ-ছ)। এইখানে আলমোড়া পর্ব শেষ। শান্তিনিকেতনে আষাঢ় মাসে লিখিত—বালক, দেশান্তরী, অচলাবুড়ি, সুধিয়া (ছড়ার ছবি)। শ্রাবণে লিখিত মাধো, আতার বিচি (ছ-ছ)। পতিসরে লিখিত ১৩৪৪ শ্রাবণ ৮ আকাশপ্রদীপ (ছ-ছ)।

২ 'মাকাল' পুরাতন কবিতা, ১৯৩১ ডিসেম্বর ৮ এ রচিত।

৩ এই ভূমিকা লিখিত হয় ১৩৪৪ আশ্বিন ২। দ্র নূতন কবিতা, প্রবাসী ১৩৪৭ বৈশাখ পৃ ৫৭-৫৮ [ছড়া-ছন্দে নূতন কবিতা পাঠের ভূমিকা স্বরূপে বিশ্বভারতীর ছাত্রদের উদ্দেশে কথিত]. শ্রীরথীন্দ্রনাথ ঘটক চৌধুরী কর্তৃক অনুলিখিত। এই ভাষণটি প্রদত্ত হয় ১৩৪৬ সালের শেষ ভাগে; তখন কবির 'ছড়া' কাব্য মুদ্রিত হয় নাই; সেটি প্রকাশিত হয় তাঁহার মৃত্যুর পর ১৩৪৮ ভাদ্র। কিন্তু আলোচনাটি অপ্রকাশিত 'ছড়া'র উপরই হয়।

আলমোড়া বাসকালে লেখাপড়ার বাহিরে ছবি আঁকা ছিল অন্যতম কাজ। এইটি তাঁহার চিত্তবিনোদন, সমস্ত ভাবনা ও কাজ হইতে মুক্তি বা relief। ছবি আঁকা বিষয়ে কবি বহু প্রকারের পরীক্ষা করিয়াছেন; এখানে আসিয়া কুমায়ুনের চিত্রীরা যেসব দেশীয় রঙ ব্যবহার করে, তাহা জোগাড় করিয়া ছবির পরীক্ষা করিতেছেন।

বাহিরের লোকজন এই সুদূর শৈলাবাসে কমই আসিয়া পৌছায়। কিন্তু পত্রিকা ও পুস্তক মারফত বৃহত্তর জগৎ আসিয়া মনের দ্বারে হানা দেয়। বাংলা ভাষায় বানান সংস্কার বিষয়ক একটি আলোচনার তরঙ্গ আসিয়া কবিকে স্পর্শ করিল।

আমাদের আলোচ্য পর্বে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও বিশ্বভারতী প্রকাশন বিভাগ বাংলা বানানের সরলীকরণের জন্য একটি পরিকল্পনা সাধারণ্যে পেশ করেন। এই সংস্কার-প্রস্তাবকে কেন্দ্র করিয়া অধ্যাপক দেবপ্রসাদ ঘোষ একটি দীর্ঘ পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনায় প্রবৃত্ত হন। প্রবন্ধে তিনি রবীন্দ্রনাথের মতের সমালোচনা করেন। উহা পাঠ করিয়া কবি আলমোড়া হইতে এক দীর্ঘ পত্র-প্রবন্ধে অধ্যাপক ঘোষের বক্তব্যের জবাব দেন। এই রচনার ভাষা যেমন সংযত, প্রয়োজনমত তেমনই তীব্র। রবীন্দ্রনাথ বাংলা বানানকে সংস্কৃতের অনুগত করিবার পক্ষপাতী নহেন—এই মতটাই ব্যক্ত করেন স্পষ্ট ভাষায়; তারপর উপসংহারে এই কথাটি বলেন যে, "বানানের বিধিপালনে আপাতত হয়তো মোটের উপরে আমরা 'বাধ্যতামূলক' নীতি অনুসরণ করে একান্ত উচ্ছৃঙ্খলতা দমনে যোগ দেব। কিন্তু এই দ্বিধাগ্রস্ত মধ্যপথে ব্যাপারটা থামবে না। অচিরে এমন সাহসিকের সমাগম হবে যাঁরা নিঃসংকোচে বানানকে দিয়ে সম্পূর্ণভাবেই উচ্চারণের সত্য রক্ষা করবেন।" বাংলাদেশে—কী স্টেট্ হইতে, কী সর্বদল-স্বীকৃত বিশিষ্ট সাহিত্য পরিষদ হইতে বানান-বিধি সম্বন্ধে কোনো নির্দেশ সর্বজন-অবশ্য-পালনীয় না হওয়ায় এক্ষেত্রে অরাজকতা চলিতেছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও বিশ্বভারতী এবিষয়ে পথনির্দেশ করিবার চেষ্টা করিলে রবীন্দ্রনাথ সর্বান্তঃকরণে তাহার সহিত সহযোগিতা করিয়াছিলেন এবং বিশ্বভারতী হইতে তাঁহার প্রকাশিত গ্রন্থে নব বানান-বিধির প্রয়োগ অনুমোদন করেন।[১]

আলমোড়ায় ভ্রমণবিলাসী আগন্তুকের সংখ্যা স্বভাবতই কম। কবির সঙ্গে যাঁহারা দেখা করিতে আসেন, তাঁহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য নাম হইতেছে, মিঃ মাসানি, মিঃ য়ুসুফ মেহের আলি ও অধ্যাপক বীরবল সাহানী। অধ্যাপক সাহানী সপরিবারে নিকটেই এক বাসায় থাকিতেন। তিনি কুটিরশিল্প পুনরুত্থানের পক্ষপাতী; কবিকে বিশেষভাবে অনুরোধ করিয়া বলেন যে, তাঁহার গ্রন্থের কয়েকটি খণ্ডও যেন হাতে-তৈয়ারী-কাগজে মুদ্রিত হয়; তাহা হইলে কুটিরশিল্প সমাদর পাইবে। বিশ্বভারতী প্রকাশন বিভাগ কবির শেষদিককার কয়েকখানি কাব্য 'দেশী' কাগজে মুদ্রিত করেন।

প্রায় দুই মাস কাল কবি আলমোড়ায় ছিলেন; তাঁহার ৭৭তম জন্মদিনের উৎসব এখানে বিনাআড়ম্বরে সম্পন্ন হয়। এই দিনের স্মরণে 'জন্মদিন' (১৩৪৭ বৈশাখ ২২, সেঁজুতি) নামে যে কবিতা লেখেন, তাহার কথা পূর্বে বলিয়াছি। এখানে এবার বাহিরের উৎসব সংবর্ধনা বেশি ছিল না; তবে কয়েকটি বিদ্যালয় পরিদর্শন করিতে তাঁহাকে যাইতে হয়, যেমন আমেরিকান মেথডিস্ট মিশন-পরিচালিত বালিকাবিদ্যালয় ও ছেলেদের র‍্যামসে স্কুল। শেষোক্ত প্রতিষ্ঠানে কবি এক লিখিত ভাষণ দেন।

কবি আলমোড়া ছাড়িলেন ২৭ জুন (১৯৩৭); এবার বেরেলির পথে নয়। পথে রানীখেতের ছাত্ররা কবিকে

১ আলমোড়া ১৯৩৭ জুন ১২। বানান-বিধি, প্রবাসী ১৩৪৪ আষাঢ় পৃ ৪২২-২৫। প্রবাসী ১৩৪৪ শ্রাবণ পৃ ৫৬১-৬৪, ৫৬৪-৬৯। দেবপ্রসাদ ঘোষের পত্র ও কবির উত্তর। দ্র মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, বাঙ্গালা বানান সম্পর্কে কয়েকটি কথা, প্রবাসী ১৩৪৬ বৈশাখ পৃ ৬৭-৭০।

স্বাগত করিল ; অনিলকুমার লিখিয়াছেন যে এই স্থানের পরিপাটি উৎসবক্ষেত্রের কথা তাঁহার চিরদিন মনে থাকিবে। লখনৌতে ট্রেন বদলের জন্য কয়েক ঘণ্টা অপেক্ষা করিতে হয় ; সকলে কাসমণ্ডার যুবরাজের আতিথ্য গ্রহণ করেন। অতঃপর ২৯জুন (১৩৪৪ আষাঢ় ১৬) কবি ও তাঁহার সঙ্গীরা কলিকাতায় পৌঁছিলেন। বিদ্যালয় খুলিবে ১ জুলাই, কবি বিদ্যালয় খোলার সময়ে বরাবর আশ্রমে থাকিতে চাহিতেন।

পতিসরে ও তৎপরে

দুই মাস পরে আলমোড়া হইতে কবি শান্তিনিকেতন ফিরিলেন (১৩৪৪ আষাঢ় ১৬)। বিদ্যালয় খুলিলে যথাবিধি কাজেকর্মে কবি মগ্ন হইলেন। 'বিশ্বপরিচয়' কাটা-ছাঁটা চলিতেছে। 'ছড়ার ছবি'র সুর এখনো মিলাইয়া যায় নাই ; বালক, দেশান্তরী, অচলা বুড়ি, সুধিয়া, মাধো, আতার বীচি প্রভৃতি এই সময়ের লেখা।

এমন সময়ে তাগিদ আসিল হুইটম্যান সম্বন্ধে কিছু লেখার জন্য। কলিকাতা সিটি কলেজের ছাত্র ও অধ্যাপকেরা হুইটম্যানের (১৮১৯-১৮৯২) স্মৃতিসভার উদ্যোক্তা ; তাহাদের উদ্দেশ্যে কবি সংক্ষেপে হুইটম্যান সম্বন্ধে তাঁহার মত লিখিয়া পাঠাইলেন (৩০ আষাঢ়)। সংক্ষিপ্ত হইলেও এই সমালোচনাটি মূল্যবান, কারণ স্বল্প কথার মধ্য দিয়া হুইটম্যানের স্বরূপটি প্রকাশ পাইয়াছে। কবি লিখিতেছেন, "তোমাদের হুইটম্যানের কাব্যালোচনার প্রচেষ্টা জয়যুক্ত হোক, এই ইচ্ছা করি। প্রকাণ্ড একটা খনি, ওর মধ্যে নানান কিছুর নির্বিচারে মিশাল আছে, এ রকম সর্বগ্রাসী বিমিশ্রণে প্রচুর শক্তি ও সাহসের প্রয়োজন—আদিম কালের বসুন্ধরার সেটা ছিল—তার কারণ তখন তার মধ্যে আগুন ছিল প্রচণ্ড—এই আগুনে নানা মূল্যের জিনিস গলে মিশে যায়। হুইটম্যানের চিত্তে সেই আগুন যা-তা কাণ্ড করে বসেছে। জাগতিক সৃষ্টিতে যে রকম নির্বাচন নেই, সংঘটন আছে, এ সেই রকম, ছন্দোবদ্ধ সব লণ্ডভণ্ড— মাঝে মাঝে এক-একটা সুসংলগ্ন রূপ ফুটে ওঠে আবার যায় মিলিয়ে। যেখানে কোনো যাচাই নেই, সেখানে আবর্জনাও নেই, সেখানে সকলের সব স্থানই স্বস্থান। এক দৌড়ে সাহিত্যকে লঙ্ঘন করে গিয়েছে এই জন্যে সাহিত্যে এর জুড়ি নেই— মুখরতা অপরিমেয়,— তার মধ্যে সাহিত্য অসাহিত্য দুই সঞ্চরণ করছে আদিম যুগের মহাকায় জন্তুদের মতো। এই অরণ্যে ভ্রমণ করতে হলে মরিয়া হওয়ার দরকার।"[১]

প্রসঙ্গত বলিয়া রাখি আমেরিকান যে কয়জন সাহিত্যিক কবির প্রিয় ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে থরো, এমার্সন ও হুইটমান উল্লেখযোগ্য। হুইটম্যানের শিষ্য এডোয়ার্ড কার্পেন্টারের কবিতা কবির খুব ভালো লাগিত। হুইটম্যানের কবিতা কবি আমাদের কাছে পড়িয়া শুনাইতেন।

(আলমোড়া হইতে ফিরিবার সপ্তাহ দুই-এর মধ্যে কবির জমিদারিতে যাওয়া স্থির হইল। প্রজাদের ইচ্ছা 'পুণ্যাহ' দিনে সেখানে 'বাবু মশায়' উপস্থিত হন। কবিরও ইচ্ছা শেষবারের মতো বহুদিনের সুখদুঃখের স্মৃতিজড়িত

১ প্রবাসী ১৩৪৪ ভাদ্র পৃ ৭৪৯। সাহিত্যিক বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় উদ্যোক্তাদের অন্যতম ছিলেন। "Revolt against all convention was in fact his self-proclaimed mission. In his versification he discards rhyme almost entirely, and metre as generally understood." Dict. English Lit. (Everyman) p 405.

স্থান দেখিয়া আসেন। তদুদ্দেশ্যে ২০ জুলাই (১৯৩৭)[১] কবি কলিকাতায় গেলেন; বেলঘরিয়াতে প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশের বাড়িতে কয়েকদিন থাকিয়া ২৬শে সুধাকান্ত রায় চৌধুরীকে সঙ্গে লইয়া কবি পতিসর যাত্রা করিলেন।[২]

১০ শ্রাবণ রাত্রি এগারটার সময় শিয়ালদহ হইতে ট্রেনে রওনা হইয়া পরদিন মধ্যরাত্রিতে পতিসর পৌঁছিলেন।[৩] ১২ শ্রাবণ পুণ্যাহ। রবীন্দ্রনাথ আসিতেছেন—সেজন্য প্রজারা পুণ্যাহক্ষেত্রে কী আয়োজনই না করিয়াছে। উৎসবস্থলে কবি উপস্থিত হইলে দলে দলে প্রজারা তাঁহাকে দেখিতে আসিল। কবির সঙ্গী সুধাকান্ত লিখিতেছেন, "সাম্প্রদায়িক এই দুর্দিনে পতিসরে মুসলমানবহুল প্রজামণ্ডলীর মধ্যে রবীন্দ্রনাথের আসন কোথায় সেটা চোখে যাঁরা দেখেছেন তাঁরা যতটা বুঝবেন—চোখে যাঁরা দেখেন নি তাঁদের সে-কথা লিখে বুঝিয়ে বলা খুবই শক্ত।"

কবি নৌকায় ছিলেন; যাঁহারা সেখানে তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে আসেন, তাঁহাদের অনেকেরই অবস্থা ভালো, কোনো প্রকার আর্থিক উপকারের প্রার্থী তাঁহারা ছিলেন না। প্রজাদের পক্ষ হইতে মোঃ কাফিল উদ্দীন আকন্দ কবিকে মুদ্রিত যে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেন, তাহার মধ্যে আছে:

"প্রভুরূপে হেথা আস নাই তুমি দেবরূপে এসে দিলে দেখা, দেবতার দান অক্ষয় হউক হৃদিপটে থাক্ স্মৃতিরেখা।"

একজন বৃদ্ধ মুসলমান কবিকে বলিলেন, "আমরা তো হুজুর বুড়ো হয়েছি, আমরাও চল্‌তি পথে, আপনিও চল্‌তি পথে; বড়ই দুঃখ হয়, প্রজা-মনিবের এমন মধুর সম্বন্ধের ধারা বুঝি ভবিষ্যতে বন্ধ হয়ে যায়। ছেলেপিলেদের মতিগতি বদলে যাচ্ছে, তারা আমাদের সব নাদান মনে করে—এমন জমিদারের জমিদারিতে বাস করবার সৌভাগ্যবোধ তাদের বুঝি হবে না।" মুসলমানদের সহিত কবির হৃদ্যতা দেখিয়া সুধাকান্ত আশ্চর্য হইয়া লিখিতেছেন, "অতীতের পুরানো কথা বলতে বলতে কবি এবং প্রজাদের চোখ ছল ছল ক'রে উঠেছে—আনন্দের অশ্রুবাষ্প। এ-দৃশ্য দেখতে পাব কোনোদিন ভাবতে পারিনি।"[৪])

অন্তরীণাবদ্ধদের অনশন

পতিসর হইতে কলিকাতা ফিরিয়া আসিবার অব্যবহিত পরেই কবিকে টাউনহলের এক জনসভায় সভাপতিত্ব করিতে হইল (১৯৩৭ অগস্ট ২ ॥ ১৩৪৪ শ্রাবণ ২৭)। এই সভার উদ্দেশ্য, আন্দামানে দ্বীপান্তরিত রাজনৈতিক বন্দীরা অনশন ধর্মঘট করায় জনগণের সহানুভূতি প্রদর্শন ও গবর্মেণ্টের আচরণের প্রতিবাদ জ্ঞাপন।

আমাদের আলোচ্য পর্বে আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ ছিল ভারত গবর্মেণ্টের পেনাল সেট্‌লমেণ্ট, অর্থাৎ যেসব অপরাধী যাবজ্জীবন বা দীর্ঘকালের জন্য কারাবাসের শাস্তি পাইত, তাহারা ঐ দ্বীপে স্থানান্তরিত হইত। সাধারণ অপরাধী ছাড়া বহু রাজনৈতিক বন্দীও এইখানে দ্বীপান্তরিত হয়। এই বন্দীদের মধ্যে অধিকাংশই বাঙালি মধ্যবিত্ত ঘরের যুবক; দেশের স্বাধীনতা আনিবার জন্য তাহারা উৎসর্গ-প্রাণ; সেই অপরাধে গবর্মেণ্টের রোষনয়নে পড়িয়া তাহারা অন্তরায়িত ও দেশ হইতে নির্বাসিত।

১ ১৯৩৭ জুলাই ২৪, অন্ধ্র দেশীয় ভারতীতীর্থ নামে প্রতিষ্ঠান কবিকে 'কবি-সম্রাট' উপাধি দান্ করেন। জয়পুরের রাজা সভাপতি; অনিল কুমার চন্দ কবির পক্ষে উপাধি গ্রহণ করেন। V. B. News 1937 Aug. p 10.

২ V. B. News VI p 10. পতিসর যাত্রার তারিখ ১৯৩৭ জুলাই ২৬। 'ছড়ার ছবি'র আকাশপ্রদীপ নামে কবিতাটি পতিসরে লিখিত; তারিখ আছে ৮ শ্রাবণ ১৩৪৪ অর্থাৎ ইংরেজি ১৯৩৭ জুলাই ২৪—অর্থাৎ যাত্রার দুই দিন পূর্বে রচিত। কোথাও একটা তারিখের গোলমাল আছে।

৩ প্রবাসী ১৩৪৪ অগ্রহায়ণ পৃ ২০৭-১০।

৪ দ্র প্রতিমা দেবীকে লিখিত পত্র, চিঠিপত্র ৩য় (৫৩)।

বহু কাল বহু প্রকারে নির্যাতিত হইয়া অতঃপর বন্দীগণ ভারত গবর্মেন্টের নিকট তাহাদের অভাবঅভিযোগ যথাযথভাবে পেশ করিয়াছিল। সেখান হইতে কোনো সহানুভূতিপূর্ণ সাড়া তাহারা পাইল না; অবশেষে রুদ্ধদ্বারে ব্যর্থ করাঘাতে ক্লান্ত হইয়া তাহারা মৃত্যুপণে অনশনব্রত গ্রহণ করিল। কিন্তু এই অনশন গ্রহণের সংবাদটিও এদেশে সরকার বাহাদুর কয়েকদিন চাপিয়া রাখেন।[১]

তৎকালীন বাংলাদেশের শাসকশ্রেণীর এইরূপ মনোভাব কেন হইল, তাহার সংক্ষিপ্ত আলোচনা সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। ১৯২১ সালে প্রবর্তিত দ্বৈরাজ্য বা ডাইআর্কির অবসানে ১৯৩৫ সালে যে ভারতশাসন আইন চালু হইল, তাহার নাম দেওয়া হয় প্রাদেশিক আত্মকর্তৃত্বমূলক শাসনতন্ত্র বা প্রভিন্সিএল অটোনমি। এই আইনঅনুসারে ১৯৩৭ এপ্রিল হইতে নূতন শাসনবিধি সর্বপ্রদেশে প্রবর্তিত হইয়াছিল। কন্‌গ্রেস তখন রাজনীতিক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বীহীন গবর্মেণ্ট-প্রতিরোধী দল। সকল প্রদেশেই তাঁহারা নির্বাচনে নামেন। ছয়টি প্রদেশে বিহার, যুক্তপ্রদেশ, বোম্বাই, মধ্যপ্রদেশ, মাদ্রাজ, উড়িষ্যা পরে আসাম ও সীমান্ত প্রদেশে কনগ্রেস এবং মুসলমানপ্রধান সিন্ধু, পাঞ্জাব ও বঙ্গদেশে মুসলীম লীগ জয়যুক্ত হন। তখন অখণ্ড বাংলার প্রধান মন্ত্রী ফজলুল হক্‌; তাঁহার ইচ্ছা ছিল কন্‌গ্রেস ও লীগ যৌথভাবে বা কোআলিশন করিয়া রাষ্ট্র পরিচালনা করেন। কিন্তু কন্‌গ্রেস হাইকমাণ্ড লীগ-প্রস্তাবিত কোআলিশনে রাজি হইলেন না। বাংলাদেশে লীগের প্রাধান্যই কায়েম হইল এবং হিন্দু মুসলমানের মধ্যে যে বৈরীভাব ধূমায়িত হইতেছিল তাহা অল্প কয়েক বৎসরের মধ্যে অগ্নিকাণ্ডে পরিণত হইল। আশ্চর্যের বিষয় ইহার অনতিকালের মধ্যে কন্‌গ্রেস পক্ষীয় নেতৃস্থানীয়রা বহু টাল-বাহানা করিয়া, হাঁ-না, না-হাঁ করিয়া প্রত্যেক প্রদেশে মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করিলেন—গবর্মেণ্টকে অচল করিবার যে উদ্দেশ্য লইয়া তাঁহারা নির্বাচনে নামেন, তাহা ত্যাগ করিয়া গঠনমূলক কার্যে মনোনিবেশ করিলেন। মধ্য হইতে বঙ্গদেশে তাঁহারা কোআলিশন মন্ত্রিত্ব হইতে দিলেন না; এবং সেইদিন হইতে বাংলার শাসন ও সংস্কৃতির মধ্যে হিন্দুমুসলমান ভেদটি স্পষ্ট ও উগ্রতর হইয়া চলিল। এই পরিস্থিতির মধ্যে বাংলদেশের আন্দামান-বন্দীশালার বন্দীদের ধর্মঘট বিচারণীয়।

বঙ্গীয় গবর্মেন্টের এই ব্যবহারের বিরুদ্ধে ও অনশনকারী অন্তরায়িতদের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শনের জন্য (১৯৩৭ অগস্ট ২)[২] কলিকাতা টাউনহলে সভা আহূত হয়; রবীন্দ্রনাথ এই সভায় সভাপতি। তিনি তাঁহার মৌখিক ভাষণে যাহা বলেন তাঁহার মর্মার্থ এইরূপ:

সপ্তাহকাল অতীত হইতে চলিল প্রায় দুইশত বন্দী আন্দামানে অনশন-ধর্মঘট গ্রহণ করিয়াছে; এই সংবাদ আমাদের কাছ হইতে গবর্মেণ্ট দীর্ঘকাল গোপন রাখেন। জনসমাজের sentiment-এর প্রতি গবর্মেন্টের এই নিষ্ঠুর ঔদাসীন্য আমাদের জাতীয় অসহায়তারই স্মারকমাত্র। ইংলণ্ড বা অন্য কোনো ডিমক্রেটিক দেশে গবর্মেন্টের পক্ষে জাতীয় জীবনের এমন বিশেষ ঘটনাকে লোকসমাজের নিকট হইতে অবিদিত রাখা সম্ভব হইত না। বন্দীদের দাবি ন্যায়সংগত ও সামান্যই। শাসনকর্তারা দেশের লোকের কাছে দায়ী নহে; সে-অবস্থায় লোকের এ আশঙ্কা খুবই স্বাভাবিক যে ভারত হইতে সহস্র মাইল দূরে দ্বীপের মধ্যে এই বন্দীরা ন্যায্য ব্যবহার হইতে বঞ্চিত হইতেছে; জনসমাজের দাবি এই যে, রাজনৈতিক বন্দীদিগকে ভারতেই রাখা হউক; সেখানে জনমত আর কিছু না পারে, কারাগারের অমানুষিক রূঢ়তাকে কিয়দ্‌পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত ও শমিত করিতে পারিবে।

১ আন্দামানে:বন্দীদের প্রায়োপবেশন, প্রবাসী ১৩৪৪ ভাদ্র পৃ ৭৩৬-৪২।

২ এইদিন অমিয়চন্দ্র চক্রবর্তী চারি বৎসর পর ইংলণ্ড হইতে অক্সফোর্ডের ডক্টরেট লাভ করিয়া দেশে ফিরিলেন (১৯৩৭ অগস্ট ২)। শান্তিনিকেতনে তিনি কিছুদিন থাকেন। এখান হইতে তিনি লাহোর যান (সেপ)। সেখানে তিনি Humanism in Modern Indian thought সম্বন্ধে গবেষণার্থে নিযুক্ত হন।

শাস্তিদানের হৃদয়হীন পদ্ধতি এখনো যাহা পৃথিবীর বেশির ভাগ স্থানে চলিতেছে, তাহা আধুনিক সভ্যতাকে লজ্জিত করিবার পক্ষে যথেষ্ট। অধুনা পাশ্চাত্য জগতে রাজনৈতিক মতবিরোধীদের বিরুদ্ধে প্রতিহিংসাপরায়ণ মনোভাব অনেক রাষ্ট্রেই দেখা দিতেছে। দেশের বিধিবদ্ধ আইন ও মানুষের স্বাধীনতার বিধিসংগত দাবির প্রতি শ্রদ্ধাহীন এই ফাসিস্ট মনোভাব হইতে ভারত সরকারও আজ মুক্ত নহে।

এই হতভাগ্য প্রদেশের শত শত উৎপীড়িত ঘরে নিরাশার অন্ধকার আজ পরিব্যাপ্ত; এখানে অপরিণত বয়সের নরনারী অনির্দিষ্ট কালের জন্য বিনাবিচারে, নানাপ্রকার দৈহিক ও মানসিক শাস্তিভোগ করিতেছে।

বর্তমান পরিস্থিতিতে দেশবাসী কর্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া আমি আমাদের শাসকসম্প্রদায়ের নিকট শাসনব্যাপারে কোনো আমূল সংস্কারের দাবি—যদিও তাহার বিশেষ প্রয়োজন হইয়াছে,—তাহা পেশ করিতেছি না, কেবলমাত্র বন্দীদের প্রতি যে কঠোর ব্যবহার চলিতেছে, তাহাই শমিত করিবার জন্য অনুরোধ জ্ঞাপন করিতেছি।

রবীন্দ্রনাথ আন্দামানের বন্দীদের নিকট টেলিগ্রামে জানাইলেন, 'বঙ্গদেশ তাহার অনশন ধর্মঘটী নির্বাসিত সন্তানদের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে জানিবার জন্য ব্যাকুল। দেশ তোমাদের পশ্চাতে আছে।'[১]

টাউনহলের সভার পর কবি শান্তিনিকেতনে ফিরিয়া আসিলেন। এবার পতিসর ভ্রমণের ফলে পদ্মা আবার তাঁহার মনকে গানের সুরে উদ্‌বোধিত করিয়াছে। ১৫ অগস্ট বর্ষামঙ্গল অনুষ্ঠিত হইবে—কবি সুরলক্ষ্মীর সাধনায় বসিয়াছেন।

এদিকে ১৭ অগস্ট বাংলাদেশে 'আন্দামান দিবস' বলিয়া ঘোষিত হইয়াছে। শান্তিনিকেতনের ছাত্র-ছাত্রী ও কর্মীগণ এই দিন উদ্‌যাপন করিবার জন্য সভা আহ্বান করেন; রবীন্দ্রনাথ সভাপতি রূপে যে ভাষণ দিলেন, তাহা বিশেষভাবে আলোচনীয়; কারণ তাহার সুর কলিকাতায় প্রদত্ত বক্তৃতা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্‌।

কবি ছাত্র ও কর্মীদের উদ্দেশ করিয়া বলিলেন, "আজ একটি বিশেষ নির্দিষ্ট দিনে বন্দীদের দুঃখে দরদ জানাবার জন্যে তোমরা সভা আহ্বান করেছ। সম্প্রতি আমাদের দেশে বিশেষ উপলক্ষ্যে বিশেষ দিনে দল বেঁধে আন্দোলন করবার একটা রীতি দাঁড়িয়ে যাচ্ছে। তাতে কিছুক্ষণের জন্যে নিজেদের নালিশ উপভোগ করবার একটা নেশায় আমাদের পেয়ে বসে। সেটার রাষ্ট্রীয় সার্থকতা যদি কিছু থাকে তো থাক্‌ কিন্তু ক্ষণে ক্ষণে এই রকম পোলিটিক্যাল দশা-পাওয়ার উত্তেজনা উদ্রেক করা আমাদের এখানকার কাজের ও ভাবের সঙ্গে সংগত হয় ব'লে আমি মনে করিনে।

"দেশের বিশেষ অনুরোধে ও প্রয়োজনে আমার যা বলবার সে আমি আশ্রমের বাইরে যথোচিত জায়গায় বলেছি, আজ আমার এখানে যদি কিছু বলতে হয় তবে আমি বলব প্রচলিত দণ্ডনীতি সম্বন্ধে আমার সাধারণ মন্তব্য।"

এই ভাষণে কবি, আধুনিক দণ্ডনীতির মধ্যে যে প্রচ্ছন্ন বর্বরতা রহিয়াছে, তাহার বিশ্লেষণ করেন ও সাম্প্রতিক রাজনীতির ক্ষেত্রে দণ্ডিতদের প্রতি দণ্ডনীতির অপপ্রয়োগের কথা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেন।[২]

রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং রাজনীতি সম্বন্ধে মতামত দান ও প্রয়োজনবোধে অংশও গ্রহণ করিয়াছেন; কিন্তু তিনি শান্তিনিকেতনকে সকল শ্রেণীর রাজনীতি ও উত্তেজনা হইতে দূরে রাখিবার পক্ষপাতী ছিলেন। ১৯২১ সালে বিদেশ হইতে এন্ড্রুসকে যে পত্রধারা লেখেন, তাহা এখানে স্মরণীয়। তবে কালের দ্রুত পরিবর্তন হইতেছে এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে। কবির একান্ত ইচ্ছা সত্ত্বেও শান্তিনিকেতনের কর্মী ও বিদ্যার্থীরা সে আদর্শ সর্বদা মনে রাখিতে পারেন নাই। দেশসেবার গঠনমূলক স্থায়ী কর্মের মধ্যে মন উদ্‌বুদ্ধ হইতে চাহে না।

১ রবীন্দ্রসদন হইতে মোহিতকুমার মজুমদার তথ্যগুলি লেখককে সরবরাহ করেন।

২ গত ১৩৪৪ শ্রাবণ ২৯শে বিশ্বভারতীর অধ্যাপক এবং ছাত্রছাত্রীদের কবি যাহা বলিয়াছিলেন তাহা তিনি প্রবাসীর জন্য লিখিয়া দেন। প্রবাসী ১৩৪৪ আশ্বিন পৃ ৭৬৪-৬৬।

উত্তেজনাকে সাময়িকভাবে উপভোগ করিবার নিরতিশয় লোভ সংবরণ করা নেতাদের পক্ষে কঠিন। তাঁহাদের প্ররোচনায় স্বল্পমতি ছাত্রসমাজ উত্তেজিত হয়; অথচ দেশের স্থায়ী কর্মের স্থলে সে ঔৎসুক্য দীর্ঘকাল থাকে না। উত্তেজনার অবসানে আসে অবশ্যম্ভাবী অবসাদগ্রস্ত ক্লান্তি। রবীন্দ্রনাথ সেই সাময়িক প্লাবনকে স্থায়ী জলধারায় পরিবাহিত করিবার জন্য চিরদিন পথনির্দেশ করিয়া আসিতেছেন; আজিকার সভায় সেই কথাই বলেন।

এই 'আন্দামান দিবসে' (১৪ অগস্ট) প্রাতঃকালে শান্তিনিকেতনের নিকটবর্তী সাঁওতাল গ্রামে হলকর্ষণ ও বৃক্ষরোপণ উৎসব হয়, কবিই পৌরোহিত্য করেন।[১] ঘটনাটি বিশেষভাবে লক্ষণীয়। বর্তমানে Community Project প্রভৃতির আয়োজন হইতেছে; ইহার মূলকথা গণসংযোগ (mass contact)। কিভাবে এই গণসংযোগ হইতে পারে তদুদ্দেশ্যে শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষাশিবির স্থাপিত হইয়াছে। শ্রীনিকেতনে এই গণসংযোগ প্রচেষ্টা বহু বৎসর হইতে চলিতেছে।

সাঁওতাল গ্রামে (পিয়ার্সন-পল্লী) হলকর্ষণ'দি উৎসবের পরদিন (১৯৩৭ অগস্ট ১৫) আশ্রমে বর্ষামঙ্গলের উৎসব। কিন্তু সেইরাত্রে অধ্যাপক পণ্ডিত নিত্যানন্দবিনোদ গোস্বামী বা গোঁসাইজির একমাত্র পুত্র বীরেশ্বর বা বীরুর মৃত্যু ঘটায় তাহা স্থগিত হইল। শিশুকাল হইতে এই মাতৃহীন বালককে গোঁসাইজি আশ্রমে লালন করেন; বীরু বিদ্যালয়ের সকল কাজে, বিশেষভাবে মন্দিরের উপাসনাদির ব্যবস্থায় উৎসাহী ছিল। রবীন্দ্রনাথ এই বালককে খুবই স্নেহ করিতেন। মৃত্যুর পর ছাত্রদের সভায় কবি বীরেশ্বরের প্রতি তাঁহার স্নেহের কথা বলেন।[২]

শান্তিনিকেতনে বর্ষামঙ্গল উৎসব স্থগিত হইল। অতঃপর স্থির হইল এই উৎসব অনুষ্ঠিত হইবে কলিকাতায় 'ছায়া' প্রেক্ষাগৃহে। কবি লিখিতেছেন, 'রবির সম্মিলনে সেটা হবে রবিচ্ছায়া।'[৩]

কবি ছাত্রছাত্রীদের লইয়া ২৬ অগস্ট কলিকাতায় গেলেন। তিনি উঠিলেন বেলঘরিয়ায় প্রশান্তচন্দ্রের বাটীতে, অন্যেরা জোড়াসাঁকোর বাটীতে। আপার সার্কুলার রোডের উপর ছায়া প্রেক্ষাগৃহে ৪ ও ৫ সেপ্টেম্বর (১৩৪৪ ভাদ্র ১৯, ২০) বর্ষামঙ্গল উৎসব হইল। এবার উৎসবে যে গানগুলি গীত হইল তাহার প্রায় সবই নূতন—তবে সবগুলিই বর্ষাসংগীত নহে। কবি 'গীতবিতানে' প্রেম পরিচ্ছেদের মধ্যে কয়েকটিকে শ্রেণীত করিয়াছেন। প্রেমের রহস্য বিরহে ও প্রতীক্ষায়; এইবার কয়েকটি গানের মধ্যে সেই সুর ধ্বনিয়াছে, যাহা চিরকাল প্রেমিক হৃদয়কে মধুময় করিয়াছে। গানগুলি আলমোড়া হইতে ফিরিয়া আসিবার পর শ্রাবণ মাসের মধ্যে রচিত বলিয়া মনে হয়। বহুকাল শুষ্ক বিজ্ঞান ও অপরের চিত্র-অনুপ্রেরিত কবিতা লেখার মধ্যে মন আবদ্ধ ছিল। সেই পর্বকে অতিক্রম করিয়া কবি পুনরায় 'গীত-সুধারসে' প্রবেশ করিয়াছেন। বর্ষামঙ্গল উৎসবে এই গানগুলি গীত হয়:[৪]

১ "শ্রীনিকেতন হলকর্ষণ অনুষ্ঠানে যোগ দিতে যাবার মুখে কে একজন বললে গোঁসাইজির ঘরে দুশ্চিন্তাজনক রোগ দেখা দিয়েছে।"—প্রবাসী ১৩৪৪ কার্তিক।

২ ১৩৪৪ ভাদ্র ৮ই বীরেশ্বরের শ্রাদ্ধবাসরে অপরাহ্নে সিংহসদনে শোকসভায় আচার্যদেবের অভিভাষণ, প্রবাসী ১৩৪৪ কার্তিক প ৫৭। দ্র মঞ্জরী, বীরেশ্বর গোস্বামী. আশ্রম-সম্মিলনীর উদ্যোগে সংকলিত ১৩৪৬।

৩ চিঠিপত্র ৫ম, পত্র ৬৮ পৃ ১১২-১৩, শান্তিনিকেতন ১৯৩৭ অগস্ট ২৪।

৪ ১ এসো শ্যামল সুন্দর গীতবিতান নূ-সং পৃ ৪৩৭। ২ আমি শ্রাবণ আকাশে ঐ দিয়েছি পাতি পৃ ৪৬৭। ৩ চিনিলে না আমারে কি পৃ ৪০৪। ৪ মনে কী দ্বিধা রেখে গেলে চলে পৃ ৩৮২। ৫ আজি গোধূলি লগনে, এই বাদল গগনে পৃ ২৯৩। ৬ থামাও রিমিকি ঝিমিকি পৃ ৪৬৯। ৭ বর্ষণ-মন্দ্রিত অন্ধকারে পৃ ৩.৩। ৮ আমি তখন ছিলেম মগন গহন পৃ ৪৬৬। ৯ ওগো আমার চির-অচেনা পরদেশী পৃ ৩৪৮। ১০ মেঘছায়ে সজল বায়ে মন আমার পৃ ৩১৪। ১১ গোধূলি গগনে মেঘে ঢেকেছিল তারা পৃ ৩১৪। ১২ মধুগন্ধে ভরা মৃদু স্নিগ্ধ ছায়া পৃ ৪৬৬। ১৩ আমার প্রাণের মাঝে সুধা আছে পৃ ৩১৪। ১৪ আজি পল্লিবালিকা অলকগুচ্ছ সাজালো পৃ ৪৬৯। ১৫ শ্রাবণের পবনে আকুল বিষণ্ণ সন্ধ্যায় পৃ ৩৭৮। ১৬ আমার যে দিন ভেসে গেছে পৃ ৩৭৯। (প্রবাসী ১৩৪৪ কার্তিক পৃ ১-৮)

প্রান্তিক

কলিকাতা হইতে উৎসবান্তে কবি শান্তিনিকেতনে ফিরিলেন (১৩৪৪ ভাদ্র ২১) ; কথা ছিল গবালিয়র-মহারাজার আমন্ত্রণে সেখানে যাইবেন। এমন সময় একদিন সন্ধ্যার পর সকলের সহিত কথাবার্তার মধ্যে কবি হঠাৎ হতচৈতন্য হইলেন (২৫ ভাদ্র। ১০ সেপ)।[১] কবির অসুস্থতার কথা তড়িতবার্তায় প্রচারিত হইল। কত-যে পত্র, টেলিগ্রাম আসিতে লাগিল তাহার সংখ্যা নাই। পরদিন ডাক্তার নীলরতন সরকার আসিয়া কবির রোগ নির্ণয় করিলেন ও তাঁহার চিকিৎসায় অচিরকালের মধ্যে কবি সুস্থ হইয়া উঠিলেন।

মহাত্মাজি নিয়মিতভাবে তারযোগে কবির সংবাদ লইতেছেন। সুস্থ হইয়া কবি গান্ধীজিকে লিখিলেন, "The first thing which welcomed me into the world of life after the period of stupor I passed through was your affectionate anxiety and it was fully worth the cost of sufferings which were unremitting in their long persistence." কিন্তু নিজ হাতে কবি প্রথম যে পত্র লেখেন সেটি হইতেছে দুইটি শিশুর পত্রের জবাব। তাঁহার অসুস্থতার সংবাদে আগত বহু শত পত্র ও তারের মধ্যে হইতে বাছিয়া তিনি শিশুদের পত্রের উত্তর আগে লেখেন।[২]

কবির অসুস্থতার সংবাদ চীন দেশে পৌঁছিলে, Dr. Tsai Yuan-Pei ও Hon. Tai-Chi Tao কবির স্বাস্থ্য সম্বন্ধে তথ্য জানিবার জন্য cable করেন। কবি তাহার উত্তরে জানাইলেন যে তাঁহাদের দেশের এই জীবন-মৃত্যুর কঠোর সংগ্রামের মধ্যেও তাঁহারা যে তাঁহার স্বাস্থ্যের সংবাদ লইবার জন্য উৎসুক, তজ্জন্য তিনি কৃতজ্ঞ। চীনের উপর জাপানের আক্রমণ চলিয়াছে তাহারই কথা উল্লেখ করিয়া লিখিলেন, "My sympathy and the sympathy of our people is wholly with your country...I who have many friends in Japan feel grievously hurt that the brave people of Japan should be misled by their rulers into betraying the best ideals of the East and that we who should be loving them, should now invoke their defeat that they may wake to their wrong"[৩] গত বৎসর হইতে জাপান চীন আক্রমণ করিতেছে ; শাংহাই, নানকিঙ প্রভৃতি মহানগরী অচিরকালের মধ্যে তাহাদের করায়ত্ত হইবার মতো হইয়াছে।

কবির আশ্চর্য জীবনীশক্তি। দুইদিন হতচৈতন্য থাকিবার পর এক সপ্তাহের মধ্যে সুস্থ হইয়া উঠিলেন ও আপনার কাজেকর্মে পুনরায় নিমগ্ন হইলেন। সপ্তাহান্তে অক্লান্তকর্মী কবি (১৩৪৪ আশ্বিন ২) বিশ্বপরিচয় ও ছড়ার ছবির ভূমিকা লিখিয়া দিলেন। দুইখানি বই মুদ্রিত হইয়া গিয়াছিল তাঁহার ভূমিকার অভাবে প্রকাশিত হয় নাই। উভয় গ্রন্থই পূজার পূর্বে আশ্বিন মাসে প্রকাশিত হইল।

এই অকস্মাৎ হতচৈতন্য লোক হইতে প্রত্যাবর্তনকে কবি নবজীবন লাভের সহিত তুলনা করিয়াছেন ; মনে হইতেছে অধ্যাত্মলোকের নবতম-রহস্য উদ্‌ঘাটিত হইতেছে। মৃত্যুযবনিকার তোরণ হইতে অজ্ঞানার যেটুকু আভাস

১ কবি যখন অজ্ঞান হইয়া যান, তখনই কলিকাতায় টেলিগ্রাম করা হয়। কিন্তু টেলিগ্রামে সব কথা ঠিক বুঝানো যায় না। তাই ধীরেন্দ্রমোহন সেন রাত্রে বোলপুর হইতে এক মালগাড়িতে করিয়া খানাজংশন পর্যন্ত চলিয়া গেলেন। সেখান হইতে হাঁটিয়া রাত্রে বর্ধমান যান ও সেখান হইতে টেলিফোন যোগে কলিকাতায় সংবাদ পাঠান। সেই টেলিফোন পাইয়াই স্যর নীলরতন প্রথম ট্রেনে চলিয়া আসেন। এই ঘটনার পর শান্তিনিকেতনে টেলিফোন-এর ব্যবস্থা হয়।

২ দ্র সুধীরচন্দ্র কর, কবিকথা পৃ ৯।

৩ V. B. News 1937 Oct. p 28.

পাইয়াছিলেন বলিয়া অনুভব করিতেছেন, তাহাই ভাষার মধ্য দিয়া প্রকাশের চেষ্টা করিলেন নূতন কবিতায়, যেগুলি পরে 'প্রান্তিকে'র অন্তর্গত হইয়াছে। বলা বাহুল্য, মানুষ এখনো সে-ভাষা ও সে শব্দ সম্পদ খুঁজিয়া পায় নাই, যাহার সাহায্যে সে তাহার সকল অনুভবকে মুক্তি দিতে পারে।

যাহাই হউক সুস্থ হইয়া উঠিবার দশ-বারো দিন পর হইতে তিনি প্রান্তিকের কয়েকটি কবিতা লিখিলেন (২৫ সেপ্টেম্বর হইতে ৯ অক্টোবর ১৯৩৭)। অভিজ্ঞতা ও প্রকাশের মধ্যে কালের সামান্য ব্যবধান থাকাতেই কবিতাগুলি নানা তত্ত্বে পূর্ণ হইয়াছে—যাহা হয়তো সম্ভব হইত না কালের দূরত্বে; যদিও কবি অন্যত্র লিখিয়াছেন, "কোনো সদ্য আবেগে মন যখন কানায় কানায় ভরিয়া উঠে তখন যে লেখা ভালো হইতে হইবে এমন কথা নাই। তখন গদ্‌গদ বাক্যের পালা। ভাবের সঙ্গে ভাবুকের সম্পূর্ণ ব্যবধান ঘটিলেও যেমন চলে না তেমনি একেবারে অব্যবধান ঘটিলেও কাব্যরচনার পক্ষে তাহা অনুকূল হয় না। স্মরণের তুলিতেই কবিত্বের রং ফোটে ভালো।" (জীবনস্মৃতি)

প্রান্তিকের কবিতাগুলি লিখিবার প্রায় আট মাস পরে নববর্ষের (১৩৪৫) ভাষণে কবি তাঁহার অভাবনীয় অনুভূতির বিশ্লেষণ করিয়া বলিয়াছিলেন, "কিছুকাল পূর্বে আমি মৃত্যুগুহা থেকে জীবনলোকে ফিরে এসেছি। যে-মূলধন নিয়ে সংসারে এসেছিলাম, কর্মপরিচালনার জন্য শরীর মনের যে শক্তির আবশ্যক তা যেন আজ পূর্ণ পরিমাণে নেই, অনেকটা তার লুপ্ত হয়েছে অতলস্পর্শে। আমার নিজের কাছে আমার প্রশ্ন এই, জীবনে এই-যে রিক্ততার পর্ব নিয়ে এসেছি একি একটা নূতন পূর্ণতার ভূমিকা? যে-জীবনকে নানা দিক থেকে নানা অভিজ্ঞতায় বিচিত্র ক'রে সার্থক করেছি, যাত্রার শেষ প্রান্তে সে আমাকে সহসা একান্ত শূন্যতার মধ্যে পৌঁছিয়ে দিয়ে তার সমস্ত উপলব্ধিকে নিঃশেষে ব্যর্থ করে মিলিয়ে যাবে একথা ধারণা করা যায় না। আমার মনে হয় ক্রমে ক্রমে এই বোঝা ঘুচিয়ে দেবার রিক্ততাই সবচেয়ে আশ্বাসের বিষয়।…

"জীবনে অনেক কর্ম করেছি সুখ দুঃখ ভোগ অনেক হয়েছে; এখন যদি ইন্দ্রিয়শক্তি ক্লান্ত হয়ে থাকে তবে অধ্যাত্মলোক বাকি আছে; আমাদের যে-শক্তি ক্ষুধাতৃষ্ণার দিকে আসক্তির দিকে আমাদের গুহাবাসী জন্তুটাকে তাড়না করে তা যদি ম্লান হয় তবেই আশা করি অন্তরের দিক থেকে মনুষ্যত্বের সিংহদ্বার খোলা সহজ হবে। রিক্ততার পথ দিয়েই পূর্ণতার মধ্যে পৌঁছানো যাবে। বোঁটার বাঁধন থেকে ফল খসে যায়, তাতে তাদের ভয় নেই, তাই শাখার আসক্তি তাদের পিছনের দিকে টানে না, নবজীবনের নব পর্যায়ে তাদের বন্ধন মোচন হয়। তেমনি দেহতন্ত্রে প্রাণের আসক্তি যদি শিথিল হয় তবে তাকে নবজীবনের ভূমিকা বলেই জানব।"[১]

ইহারও কয়েকদিন পরে কালিম্পং বাসকালে 'জন্মদিন' উপলক্ষে যে কবিতা লেখেন (১৩৪৫ বৈশাখ ২৫, সেঁজুতি) তাহার মধ্যে এই ভাবেরই পুনরুক্তি পাই—কালের ব্যবধানে এখন তাহা ক্রমেই আরো কাব্যময় অনুভূতির প্রকাশ হইয়া উঠিতেছে।

আমরা পূর্বেই বলিয়াছি 'বিশ্বপরিচয়' ভাদ্রমাসের মধ্যে মুদ্রিত হইয়া গিয়াছিল; ২ আশ্বিন (১৩৪৪) কবি ভূমিকা লিখিয়া দিলে উহা প্রকাশিত হইল। 'বিশ্বপরিচয়' উৎসর্গ করা হয় অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসুর নামে। সত্যেন্দ্রনাথ তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থ বিজ্ঞানের অধ্যাপক।

দীর্ঘ উৎসর্গপত্রে কবি, বিশ্বপরিচয় কেন লিখিতে আরম্ভ করেন তাহার কারণ বলিয়াছেন। তাঁহার মতে 'শিক্ষা যারা আরম্ভ করেছে, গোড়া থেকেই, বিজ্ঞানের ভাণ্ডারে না হোক বিজ্ঞানের আঙিনায় তাদের প্রবেশ করা

১ নববর্ষ ১৩৪৫ জ্যৈষ্ঠ পৃ ১৭৬-৭৮।

অত্যাবশ্যক।' রবীন্দ্রনাথ তাঁহার শিক্ষায়তনে শুরু হইতেই এই বিষয়ের উপর জোর দিয়াছিলেন। আর তাঁহার নিজ জীবনে জ্যোতিষ ও জীবতত্ত্ব অধ্যয়নের প্রভাব যে কী গভীর তাহা তাঁহার গদ্য পদ্য রচনা সাক্ষ্য দিতেছে। এই পত্র-ভূমিকায় বলিতেছেন, "জ্যোতির্বিজ্ঞান ও প্রাণিবিজ্ঞান কেবলি এই দুটি বিষয় নিয়ে আমার মন নাড়াচাড়া করেছে। তাকে পাকা শিক্ষা বলে না, অর্থাৎ তাতে পাণ্ডিত্যের শক্ত গাঁথুনি নেই। কিন্তু ক্রমাগত পড়তে পড়তে মনের মধ্যে বৈজ্ঞানিক একটা মেজাজ স্বাভাবিক হয়ে উঠেছিল। অন্ধ বিশ্বাসের মূঢ়তার প্রতি অশ্রদ্ধা আমাকে বুদ্ধির উচ্ছৃঙ্খলতা থেকে আশা করি অনেক পরিমাণে রক্ষা করেছে। অথচ কবিত্বের এলেকায় কল্পনার মহলে বিশেষ যে লোকসান ঘটিয়েছে সে তো অনুভব করিনে।"

বিশ্বপরিচয়ের পত্র-ভূমিকায় শিক্ষাপদ্ধতি সম্বন্ধে কবি কয়েকটি মত প্রকাশ করেন, তাহা প্রণিধানযোগ্য। কবির মতে শিশুদের বা বালকদের শিক্ষার প্রথম যুগে সমস্ত কিছুকেই স্পষ্ট করার চেষ্টা ব্যর্থ হয়। কারণ "জীবনে প্রথম অভিজ্ঞতার পথে সবই যে আমরা বুঝি তাও নয় আর সবই সুস্পষ্ট না বুঝলে আমাদের পথ এগোয় না একথাও বলা চলে না।…কতক পরিমাণে না বোঝাটাও আমাদের এগোবার দিকে ঠেলে দেয়।" কবি নিজেও এখানে বলিতেছেন এবং আমরাও জানি যে তিনি স্কুলের ছেলেদের জন্য বড়ো-বয়সের সাহিত্য পড়াইতেন—রাসকিন্ পাঠ্য ছিল (থার্ডক্লাস) অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রদের! অজিতকুমার চক্রবর্তী স্কুলের বড়ো ছেলেদের এমার্সন শেকসপিয়র পড়াইতেন, আমিএলের জার্নাল থেকে অংশ তর্জমা করিতে দিতেন, ব্রাউনিং বুঝাইতেন। বলা বাহুল্য এসব তিনি কবির আদর্শানুযায়ী করিতেন। এগুলি আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতে লিখিতেছি।

রবীন্দ্রনাথ এই পত্র-ভূমিকায় শিক্ষাপদ্ধতি সম্বন্ধে আরও বলিতেছেন যে ছেলেদের বই-এ 'মাল খুব বেশি কমিয়ে দিয়ে হালকা করা কর্তব্য' নয়। তিনি বলেন 'দয়া করে বঞ্চিত করাকে দয়া বলে না।' তাঁহার মত "যাদের মন কাঁচা তারা যতটা স্বভাবত পারে নেবে, না পারে আপনি ছেড়ে দিয়ে যাবে, তাই বলে তাদের পাতটাকে প্রায় ভোজ্যশূন্য করে দেওয়া সদ্ব্যবহার নয়।…অবাধে চোখ বুলিয়ে যাওয়াকে পড়া বলা যায় না। মন দেওয়া ও চেষ্টা করে বোঝাটাও শিক্ষার অঙ্গ, সেটা আনন্দেরই সহচর। ছেলেবেলা থেকে মূল্য ফাঁকি দেওয়া অভ্যাস হতে থাকলে যথার্থ আনন্দের অধিকারকে ফাঁকি দেওয়া হয়।" সেইজন্য স্কুলের বাংলা পড়াইবার সময় শব্দসৃষ্টির রহস্য, বাক্যরচনার রীতি প্রভৃতি ব্যাকরণের পরিভাষা ব্যবহার না করিয়াও বলিয়া যাইতেন, শক্ত হইবে বলিয়া ছাড়িয়া দিতেন না। তিনি বলিয়াছেন, "চিবিয়ে খাওয়াতেই একদিকে দাঁত শক্ত হয় আর একদিকে খাওয়ার পুরো স্বাদ পাওয়া যায়।"

বিশ্বপরিচয় প্রকাশিত হইলে অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র ইহার একটি মনোজ্ঞ সমালোচনা লেখেন।[১] অধ্যাপক মৈত্র সাহিত্যিক মহলে কবি রূপে পরিচিত, কিন্তু আসলে তিনি পদার্থবিজ্ঞানের অধ্যাপক। তিনি দীর্ঘ সমালোচনা করিয়া গ্রন্থ হইতে যে দুইটি অংশ উদ্ধৃত করেন, নিম্নে তাহাই সংকলিত হইল :

"নাক্ষত্র জগতের দেশকাল পরিমাণ গতিবেগ দূরত্ব ও তার অগ্নি-আবর্তের চিন্তনাতীত প্রচণ্ডতা দেখে যতই বিস্ময় বোধ করি একথা মানতে হবে বিশ্বে সবচেয়ে বড়ো আশ্চর্যের বিষয় এই যে, মানুষ তাদের জেনেছে, এবং নিজের আশু জীবিকার প্রয়োজন অতিক্রম করে তাদের জানতে চাচ্ছে। ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র ক্ষণভঙ্গুর তার দেহ, বিশ্ব-ইতিহাসের কণামাত্র সময়টুকুতে সে বর্তমান, বিরাট বিশ্বসংস্থিতির অণুমাত্র স্থানে তার অবস্থান, অথচ অসীমের কাছ-ঘেঁষা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের দুষ্পরিমেয় বৃহৎ ও দুরধিগম্য সূক্ষ্মের হিসাব সে রাখছে—এর চেয়ে আশ্চর্য মহিমা বিশ্বে আর কিছুই নেই, কিংবা বিপুল সৃষ্টিতে নিরবধি কালে কী জানি আর কোনো লোকে আর কোনো চিত্তকে অধিকার

১ প্রবাসী ১৩৪৫ জ্যৈষ্ঠ পৃ ২৪৪-৪৬।

ক'রে আর কোনো ভাবে প্রকাশ পাচ্ছে কি না। কিন্তু একথা মানুষ প্রমাণ করেছে যে, ভূমা বাহিরের আয়তনে নয়, পরিমাণে নয়, আন্তরিক পরিপূর্ণতায়।"

গ্রন্থের উপসংহার অংশে কবি লিখিয়াছেন, "আমরা জড়বিশ্বের সঙ্গে মনোবিশ্বের মূলগত ঐক্য কল্পনা করতে পারি সর্বব্যাপী তেজ বা জ্যোতিঃ পদার্থের মধ্যে। অনেক কাল পরে বিজ্ঞান আবিষ্কার করেছে যে আপাতদৃষ্টিতে যে সকল স্থূল পদার্থ জ্যোতির্হীন, তাদের মধ্যে প্রচ্ছন্ন আকারে নিত্যই জ্যোতির ক্রিয়া চলছে। এই মহাজ্যোতিরই সূক্ষ্ম বিকাশ প্রাণে এবং আরও সূক্ষ্মতম বিকাশ চৈতন্যে ও মনে। বিশ্বসৃষ্টির আদিতে মহাজ্যোতি ছাড়া আর কিছুই যখন পাওয়া যায় না, তখন বলা যেতে পারে চৈতন্যে তারই প্রকাশ। জড় থেকে জীবে একে একে পর্দা উঠে মানুষের মধ্যে এই মহা চৈতন্যের আবরণ ঘোচাবার সাধনা চলেছে। চৈতন্যের এই মুক্তির অভিব্যক্তিই বোধ করি সৃষ্টির শেষ পরিণাম।" এইস্থলে 'শ্যামলী' কাব্যের বিদায়-বরণ কবিতাটির এই পংক্তিটি স্মরণীয়—"চেতনার সঙ্গে আলোর রইল না কোনো ব্যবধান।"

রবীন্দ্রনাথ কবি ও দ্রষ্টা ; তাই, তাঁহার কাছে জড় ও জীববিজ্ঞানের তথ্যরাজি অন্তরের রসের সঙ্গে মিশিয়া অনুভূতির মধ্যে নূতন ভাবে রূপ লইয়াছে। বিশ্বপরিচয় পড়িতে গিয়া সীমার মধ্যে সীমাতীতের কবিকে আমরা পাই।[১]

আরোগ্যলাভের পর

কবি অসুস্থ হন ১০ সেপ্টেম্বর (১৯৩৭); তাহার একমাস পরে ১২ অক্টোবর তিনি চিকিৎসার জন্য কলিকাতায় যান। সেখানে প্রায় তিন সপ্তাহ (৪ নভেম্বর পর্যন্ত) প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশের বেলঘরিয়ার বাড়িতে রানীদেবীর স্নেহময় তত্ত্বাবধানে থাকিলেন।

কবি কলিকাতায় আসিয়াছেন সংবাদ পাইয়া নানা লোক তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসেন। সেখানে তখন নিখিল ভারত কন্‌গ্রেস কমিটির বিশেষ অধিবেশন, তদুপলক্ষ্যে ভারতের নেতৃস্থানীয় সকলেই উপস্থিত। জবহরলাল নেহেরু, আচার্য কৃপালনী, সরোজিনী নাইডু প্রভৃতি অনেকেই কবিকে দেখিতে আসিলেন।

মহাত্মাজিও[২] কবির সহিত দেখা করিতে আসিতেছিলেন, কিন্তু মোটরগাড়িতে উঠিতে গিয়া হঠাৎ অজ্ঞান হইয়া যান। শরৎচন্দ্র বসু টেলিফোন যোগে কবিকে এই সংবাদ দিলে কবি অবিলম্বে স্বয়ং সেখানে উপস্থিত হইলেন ; সন্ধ্যার উপাসনায় যোগদান করিয়া তিনি ফিরিলেন। কন্‌গ্রেস কমিটির কাজ ব্যতীত মহাত্মাজির এবার কলিকাতায় আসিবার প্রধান কারণ ছিল রাজবন্দী-সমস্যা সমাধান। বাংলাদেশে এখনো সহস্রাধিক যুবক কারারুদ্ধ, অন্তরায়িত অথবা দ্বীপান্তরিত। এইসব কার্য ব্যপদেশে তাঁহাকে অমানুষিক পরিশ্রম করিতে হইতেছিল। তাঁহার শরীর যে

১ বিশ্বপরিচয়ের মধ্যে কয়েকটি বৈজ্ঞানিক ভুল ছিল। কৃষ্ণনগর কলেজের অধ্যাপক বিভূতিভূষণ সেন এবং বোম্বাই থেকে ইন্দ্রমোহন সোম 'বিশেষ যত্ন করে ভুলগুলি দেখিয়ে দেওয়াতে সেগুলি সংশোধন করবার সুযোগ হল।' তৃতীয় সংস্করণের ভূমিকা। কালিম্পঙ্ ১৯৩৮ জুন ২১। দ্র রবীন্দ্র-রচনাবলী ২৫ খণ্ড পৃ ৪:৬।

২ কলিকাতার বিশিষ্ট বাঙালি সাহিত্যিকরা সমবেত হইয়া বন্দেমাতরম সম্বন্ধে তাঁহাদের মত গান্ধীজির নিকট জ্ঞাপন করিবার জন্য রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের উপর ভার দেন। রামানন্দবাবু দীর্ঘ এক পত্রে বাংলাদেশের মুসলমানদের বাংলাভাষা ও সংস্কৃতির প্রতি মনোভাব কিরূপ তাহা বিবৃত করেন। এই পত্রে তিনি বন্দেমাতরমকে জাতীয় সংগীত রূপে গ্রহণের সুপারিশ করেন। দ্র Mod. Rev. 1938 Dec. p 711-18.

অতিরিক্ত শ্রমে ভিতরে ভিতরে দুর্বল হইয়া পড়িয়াছিল, তাহা তিনি বুঝিতে পারেন নাই; অথবা বুঝিয়াও প্রতিকার করিবার অবসর পাইতেছিলেন না। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করা নিতান্ত প্রয়োজন, বাংলাদেশের রাজবন্দী-সমস্যা লইয়া কবিও চিন্তান্বিত, তাহা তিনি জানেন; সেই উদ্দেশ্যেই কবির কাছে আসিতেছিলেন—তা ছাড়া কবির কঠিন পীড়ার পর তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করা কর্তব্য।

প্রশান্তচন্দ্রের বাড়িতে একদিন সুভাষচন্দ্র বসু কবির সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন। তিনি য়ুরোপ হইতে সদ্য ফিরিয়াছেন, সেখানকার রাজনীতি সমাজনীতি সম্বন্ধে অনেক কথাই তাঁহার সঙ্গে হইয়াছিল কিন্তু তাহার কোনো বিবৃতি আমরা পাই নাই।

এবার কলিকাতায় নিখিল ভারত কন্‌গ্রেস কমিটির সম্মুখে নানা সমস্যার মধ্যে একটি ছিল 'বন্দেমাতরম্' জাতীয় সংগীত রূপে গৃহীত হইতে পারে কিনা সেই প্রশ্নের সমাধান। এই আলোচনার সহিত রবীন্দ্রনাথ বিশেষভাবে জড়িত হইয়া পড়েন।

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় (১৯০৪) হইতে গত ত্রিশ বৎসরের উপর 'বন্দেমাতরম্'[১] ধ্বনি বাংলার দেশসেবী যুবকদের মন্ত্ররূপে ব্যবহৃত হইতেছে। কালে উহা সর্বভারতের জাতীয় মুক্তিসংগ্রামের ধ্বনি হইয়া উঠে। কিন্তু কিছুকাল হইতে বাংলার শিক্ষিত মুসলমান সমাজের মধ্যে বন্দেমাতরম্-এর বিরুদ্ধে মত দেখা দিতেছে। কোনো কোনো সার্বজনিক সভায় মুসলমান ছাত্র ও জনতার আপত্তির ফলে এই গান গাওয়াই দুঃসাধ্য হইয়া উঠে—মুসলমানদের মতে 'বন্দেমাতরম্' গান পৌত্তলিকতার পরিপোষক; 'ত্বং হি দুর্গা দশপ্রহরণধারিণী' প্রভৃতি ভাবকে কোনো মুসলমানের পক্ষে জাতীয় সংগীতের অজুহাতেও মানিয়া লওয়া সম্ভব নহে, এমন কি মহা-জাতীয়তাবাদী মুসলমানের পক্ষেও নহে। উগ্র মুসলমানরা বঙ্কিমচন্দ্রের উপর খড়্গহস্ত—তাঁহার আনন্দমঠ, রাজসিংহ ও দুর্গেশনন্দিনী গ্রন্থত্রয় তাহাদের অপাঠ্য। কোনো কোনো উগ্রপন্থী মুসলমান প্রকাশ্যভাবে 'আনন্দমঠ'-এর বহ্নি-উৎসব করিয়াছে।[২]

রবীন্দ্রনাথ বেলঘরিয়া হইতে ২৬ অক্টোবর (১৯৩৭) বন্দেমাতরম্ সম্বন্ধে তাঁহার মত লিখিয়া কন্‌গ্রেস প্রেসিডেন্ট জবহরলালের নিকট তাঁহার সেক্রেটারি মারফত পাঠাইয়া দিয়াছিলেন।* তিনি লেখেন—"An unfortunate controversy is raging round the question of suitability of 'Bande Mataram' as national song. In offering my own opinion about it I am reminded that the privilege of originally setting its first stanza to the tune was mine when the author was still alive and I was the first person to sing it before a gathering of the Calcutta Congress. To me the spirit of tenderness and devotion expressed in its first portion, the emphasis it gave to beautiful and beneficient aspects of our motherland made special appeal so much so that I found no

১ ১৮৯০ সালে যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ ম্যাটসিনী ও গ্যারিবল্ডীর জীবনচরিত লেখেন। গ্যারিবল্ডীর জীবনবৃত্তের 'উদ্বোধনা'র উপসংহারে তিনি লিখিয়াছিলেন, "সকলে গগন বিদারিয়া গাও 'বন্দে মাতরম্' 'বন্দে হরিচরণারবিন্দম্'। স্বদেশানুরাগ ভগবদ্ভক্তির সহিত মিশ্রিত হইয়া নবযুগের উৎপত্তি করুক।" আমাদের মনে হয় বাংলা ভাষায় 'আনন্দমঠে'র বাহিরে 'বন্দেমাতরম্'কে জাতীয় ধ্বনিরূপে স্বীকৃতি এই প্রথম। 'আনন্দমঠ' গ্রন্থাকারে মুদ্রিত হয় ১২৮৯ পৌষ (১৮৮৩)।

২ প্রবাসী ১৩৪৪ অগ্রহায়ণ বিবিধ প্রসঙ্গ পৃ ২৯০। এক মুসলমান লেখক 'দুর্গেশনন্দিনী'র পাল্টা জবাব রূপে 'বঙ্কিম দুহিতা' নামে এক কদর্য উপন্যাস লেখেন।

* **Pandit Jawaharlal Neheru had been to see Gurudeva on the previous day and had a long talk with him about the various problems which are receiving the attention of the Congress leaders.—V. B. News 1987 Nov. p 84.**

difficulty in dissociating it from the rest of the poem and from those portions of the book of which it is a part, with all sentiments of which, brought up as I was in the monotheistic ideals of my father, I could have no sympathy.

"It first caught on as an appropriate national anthem at the poignant period of our strenuous struggle for asserting the people's will against the decree of separation hurled upon our province by the ruling powor. The subsequent developments during which 'Bande Mataram' became a national slogan can not in view of the stupendous sacrifices of some of the best of our youths, be likely ignored at a moment when it has once again become necessary to give expression to our triumphant confidence in the victory of our cause.

"I freely concede that the whole of Bankim's 'Bande Mataram' poem read together with its context is liable to be interpreted in ways that might wound Moslem suceptibilities, but a national song though derived from it which has spontaneously come to consist only of the first two stanzas of the original poem, need not remind us every time of the whole of it, much less of the story with which it was accidentally associated. It has acquired a separate individuality and an inspiring significance of its own in which I see nothing to offend any sect or community."[১]

রবীন্দ্রনাথের এই পত্র নিখিলভারত কন্‌গ্রেস কমিটির মতকে সমর্থন করিয়াছিল। জবহরলাল ঐখানে বক্তৃতা প্রসঙ্গে বন্দেমাতরম্ সম্বন্ধে বলেন, "...the first too stanzas are such that it is impossible for anyone to take objection to, unless he is maliciously inclined. Remember, we are thinking in terms of a national song for all India"...

কন্‌গ্রেসের বন্দেমাতরম্ সম্বন্ধে গৃহীত প্রস্তাব প্রকাশিত হইবার পূর্বেই রবীন্দ্রনাথের পত্র প্রকাশিত হইয়াছিল। ইতিপূর্বে Visvabharati News (1937 Oct.)-এ কৃষ্ণ কৃপালনী[২] Bande Mataram and Indian nationalism নামে যে প্রবন্ধ লেখেন, তাহা কবির মতের সমার্থক।[৩]

১ Amrita Bazar Patrika 2 Nov. 1937.

২ Hindusthan Standard-এ (1937, Oct. 24) নিম্নলিখিত তথ্যটি প্রকাশিত হয়: "*Pending his discussions with the leaders the Poet is not issuing any statement to the Press.* Correspondance, however is going on between the Poet and different leaders on this question. Mr. Rathindranath Tagore, the Poet's son told a reporter of the Hindusthan Standard that the first stanza of the 'Bande Mataram' song was first set to tune by the Poet himself and also sung by him for the first time at the Indian National Congress at its Calcutta Session in the nineties of the last Century.

"Mr. Rathindranath Tagore further told the reporter that the *views on 'Bande Mataram' that had found expression in Prof. Krishna Kripalani's article in the 'Visvabharati' magazine published from Santiniketan, did not represent the official view of Visvabharati or of the Poet*".

৩ রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের ব্রাহ্ম, নিষ্ঠাবান, ধার্মিক বলিয়া পরিচিত। তিনি ব্রাহ্ম হইবার পর কখনো প্রতিমাদি পূজা করেন নাই। তিনি রবীন্দ্র-ভক্ত, কিন্তু 'বন্দেমাতরম্' সম্বন্ধে তিনি ভিন্ন মত পোষণ করিতেন। তাঁহার মতে গানটি 'পৌত্তলিকতাব্যঞ্জক বা পৌত্তলিকতা-প্রণোদক নহে...মুসলমানবিদ্বেষ-প্রসূত বা মুসলমানবিদ্বেষ-জনক নহে।' (প্রবাসী ১৩৪৪ অগ্রহায়ণ বিবিধপ্রসঙ্গ পৃ ২৯২)

জবহরলালকে লিখিত জাতীয় সংগীত সম্বন্ধে পত্র প্রকাশিত হইলে কোনো কোনো 'জাতীয়তাবাদী' পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের উপর ব্যক্তিগত আক্রমণ ও হীন অভিসন্ধি আরোপ পর্যন্ত হইল। কোনো কোনো অতি-উৎসাহী স্বাদেশিক ঘোষণা করিলেন যে, রবীন্দ্রনাথের জাতীয় সংগীতগুলির মধ্যে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা নাই, স্বাধীনতা লাভের জন্য সংগ্রামে রবীন্দ্রনাথের গান কোনো প্রেরণা দেয় নাই![১] বলা বাহুল্য, কবি এসব বাদানুবাদে কোনো অংশ গ্রহণ করেন নাই। জবহরলাল গোড়া হইতেই রবীন্দ্রনাথের মতবিশ্বাসী। প্রায় ২৬ বৎসর পূর্বে রচিত 'জনগণমন' আজ স্বাধীন ভারতের জাতীয় সংগীত রূপে স্বীকৃত হইয়াছে;[২] বন্দেমাতরমের যে প্রথম অংশ অসাম্প্রদায়িক সেইটুকুই অন্যতম জাতীয় সংগীতরূপে গৃহীত হইয়াছে।

তিন সপ্তাহ পরে কবি কলিকাতা হইতে শান্তিনিকেতনে ফিরিলেন (৪ নভেম্বর। ১৩৪৪ কার্তিক ১৪)। এবার পূজাবকাশের পর বিশ্বভারতীর আভ্যন্তরীণ ব্যবস্থাপনে কিছু কিছু পরিবর্তন সংঘটিত হইল। শিক্ষাভবন বা কলেজ বিভাগের অধ্যক্ষ ধীরেন্দ্রমোহন সেন ১৯৩৭এর অক্টোবরে বিলাত চলিয়া গেলে প্রমদারঞ্জন ঘোষ অধ্যক্ষ নিযুক্ত হইলেন। ধীরেন্দ্রমোহন ১৯৩২ নভেম্বর হইতে ১৯৩৭ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত অধ্যক্ষতা করিয়াছিলেন। বিলাতে এলমহার্স্ট-প্রবর্তিত ডার্টিংটন হল ট্রাস্ট হইতে রিসার্চ-ফিলোশীপ বা গবেষণাবৃত্তি লাভ করিয়া তিনি ইংলণ্ড যাত্রা করিলেন। পুঁথিগত বিদ্যার সহিত বৃত্তি-কেন্দ্রিক বিদ্যা বা শিল্পশিক্ষার সম্বন্ধ বিষয়ে তিনি যে অভিজ্ঞতা শ্রীনিকেতন ও শান্তিনিকেতনে অর্জন করেন, তাহারই আলোকে গবেষণা করিবার জন্য তাঁহার বিলাত যাত্রা।

এই সময়ে বোলপুরে 'বীরভূম জেলা রাষ্ট্রীয় সম্মিলনী'র প্রথম অধিবেশন আহূত হয় (৪-৫ অগ্রহায়ণ ১৩৪৪॥২০-২১ নভেম্বর)। তজ্জন্য রবীন্দ্রনাথ নিম্নলিখিত বাণীটি পূর্বাহ্ণে ১৯৩৭ নভে ১৪ লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন, "বোলপুরে এই প্রথম রাষ্ট্রসভা অধিবেশনে আমি আমার অভিনন্দন জ্ঞাপন করি। মহাত্মা গান্ধী ও পণ্ডিত জওয়াহরলালের নেতৃত্বাধীনে কন্‌গ্রেস জনহিতকর যে উদ্যোগ গ্রহণ করিয়াছেন এই সভার যোগে এখানকার জনসাধারণের সহিত তাহার সম্বন্ধ স্থাপিত হইতেছে এই কথা স্মরণ করিয়া আনন্দিত হইলাম। সভার উদ্দেশ্য সার্থক হউক।"

সম্মিলনীতে বহু লোক গ্রাম হইতে আসে; কলিকাতা হইতে শিবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সস্ত্রীক ও ডাঃ সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি শ্রমিক আন্দোলনের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদেরও সমাগম হয়। সভায় যে সব বক্তৃতা হয় তাহার রিপোর্ট মুখেমুখে রবীন্দ্রনাথ পান। নেতাদের বক্তৃতাগুলি জনসাধারণের উপযুক্ত আদৌ হয় নাই। স্থানীয় কর্মীরা রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করিতে আসিলে (৫ অগ্রহায়ণ) তিনি বলেন যে লোকসাধারণের কাছে লোকের ভাষায় কথা বলাই উচিত; তাহাদের বোধের ও জ্ঞানের বাহিরের কথা বলিলে তাহাদের মন সাড়া দেয় না। কবির এ কথা অতি সত্য; আমরা সভায় উপস্থিত ছিলাম, বক্তাদের সংস্কৃতবহুল অলংকারপূর্ণ ভাষা ও বিশ্বসমস্যা প্রভৃতির গুরুগম্ভীর আলোচনা জনতার কর্ণে শব্দমাত্ররূপে প্রতিভাত হইতেছিল।[৩]

কবি শান্তিনিকেতনে আছেন। ইতিমধ্যে তিনি সংবাদ পাইলেন যে বাংলা গবর্মেণ্ট ১,১০০ জন অন্তরীণাবদ্ধ যুবককে মুক্তি দিয়াছেন। কবি কিরূপ আনন্দিত হইয়াছিলেন তাহা তাঁহার বিবৃতি হইতে প্রকাশ পায়। এই মুক্তি আন্দোলনে মহাত্মাজির চেষ্টা ভুলিবার নহে; গবর্মেণ্ট ও বন্দীদের মধ্যে বোঝাপড়া তাঁহারই মাধ্যমে হইয়াছিল। কবি বলিলেন, "The only way our people can truly acknowledge our gratitude is to strive

১ দ্র প্রবাসী ১৩৪৬ অগ্রহায়ণ বিবিধ প্রসঙ্গ পৃ ২৯১।

২ দ্র প্রবোধচন্দ্র সেন, ভারতবর্ষের জাতীয় সংগীত ১৩৫৬।

৩ দ্র Mod. Rev. 1937 Dec. p 714. Note, Birbhum District Conference.

honestly to create that moral atmosphere of non-violence, which is the only true means of attaining our final emancipation. Mahatmaji has given such assurance on our behalf and if we fail to carry it out we shall have betrayed the trust of our greatest benefactor."[১]

কবি কলিকাতা হইতে ৪ নভেম্বর ফিরিয়াছিলেন; এবার একাদিক্রমে দীর্ঘকাল শান্তিনিকেতনে থাকেন, মাঝে দিন সাতের জন্য কলিকাতায় যাইতে হয় (২৭ নভেম্বর) ডাক্তারদের তাগিদে। ৪ ডিসেম্বর আশ্রমে ফিরিয়া আসেন।

ইতিমধ্যে সংবাদ আসিল গিরিধিতে স্যর জগদীশচন্দ্রের হঠাৎ মৃত্যু হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের সহিত জগদীশচন্দ্রের যে নিবিড় যোগ এককালে ছিল, তাহার কথা আমরা এই জীবনীমধ্যে আলোচনা করিয়াছি। ক্রমে কালের ব্যবধানে, কর্মক্ষেত্রের বিভিন্নতা হেতু দুইজনের মধ্যে পূর্বের সে নিবিড়বন্ধন শিথিল হইয়া যায়; তৎসত্ত্বেও পরস্পর পরস্পরকে গভীর শ্রদ্ধা করিতেন। আচার্যের মৃত্যুসংবাদ পাইয়া কবি যাহা লিখিয়া পাঠাইলেন তাহার মধ্যে তিনি একস্থানে বলেন—"তরুণ বয়সে জগদীশচন্দ্র যখন কীর্তির দুর্গম পথে সংসারে অপরিচিতরূপে প্রথম যাত্রা আরম্ভ করেছিলেন;······ সেই সময়ে আমি তাঁর ভাবী সাফল্যের প্রতি নিঃসংশয় শ্রদ্ধাদৃষ্টি রেখে বারে বারে গদ্যে পদ্যে তাঁকে যেমন করে অভিনন্দন জানিয়েছি, জয়লাভের পূর্বেই তাঁর জয়ধ্বনি ঘোষণা করেছি, আজ চিরবিচ্ছেদের দিনে তেমন প্রবল কণ্ঠে তাঁকে সম্মান নিবেদন করতে পারি সে শক্তি আমার নেই। আর কিছুদিন আগেই অজানা লোকে আমার ডাক পড়েছিল। ফিরে এসেছি। কিন্তু সেখানকার কুহেলিকা এখনও আমার শরীর মনকে ঘিরে রয়েছে। মনে হচ্ছে আমাকে তিনি তাঁর অন্তিমপথের আসন্ন অনুবর্তন নির্দেশ করে গেছেন।"[২]

জগদীশচন্দ্রের মৃত্যুর পর কবির সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠতার যে কয়টি সংবাদ প্রকাশ পাইয়াছিল তাহা আমরা নিম্নে উল্লেখ করিতেছি। তাঁহার 'অব্যক্ত' নামে গ্রন্থ প্রকাশিত হইলে তিনি নিম্নলিখিত পত্রখানি কবিকে পাঠান (৩ অগ্রহায়ণ ১৩২৮): "বন্ধু সুখে দুঃখে কত বৎসরের স্মৃতি তোমার সহিত জড়িত। অনেক সময় সে সব কথা মনে পড়ে। আজ জোনাকির আলো রবির প্রখর আলোর নিকট পাঠাইলাম। তোমার জগদীশ।" আচার্য-পত্নী অবলাদেবী প্রবাসীর সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে জানাইয়াছিলেন যে জীবনের শেষ বৎসরও জগদীশচন্দ্র প্রত্যহ গ্রামোফোনে কবির স্বর—

আজি হতে শতবর্ষ পরে
কে তুমি পড়িছ বসি আমার কবিতাখানি
কৌতূহল ভরে
আজি হতে শত বর্ষ পরে ···

শুনিয়া শয়ন করিতে যাইতেন। "উনি আজীবন কবির গুণগ্রাহী ছিলেন, এবং সর্বদাই বলিতেন যে, কবির মতন সর্বতোমুখী প্রতিভা বিরল, প্রায় দেখা যায় না।"[৩]

১ V. B. News 1937 Dec. p 42.

২ জগদীশচন্দ্র, প্রবাসী ১৩৪৪ পৌষ পৃ ৩৩০-৩৬। "আচার্য জগদীশচন্দ্রের জন্মদিন ৩০শে নভেম্বর। বসু-বিজ্ঞানমন্দির প্রতিষ্ঠাও তিনি করেন ৩০শে নভেম্বর। তাঁহার জীবিতকালে ঐদিন তাঁহার জন্মদিনের উৎসব হইত, বসু-বিজ্ঞানমন্দির প্রতিষ্ঠার উৎসবও ঐদিন হইত। তাঁহার দেহত্যাগের পর গত ৩০শে নভেম্বর প্রথম বসু বিজ্ঞানমন্দিরের বার্ষিক উৎসব হইয়া গিয়াছে। ঐদিন রবীন্দ্রনাথের স্বরচিত বক্তৃতা পড়িবার কথা ছিল। তিনি আসিতে না পারায় উহা আচার্য মহাশয়ের এক বৃদ্ধপ্রাক্তন ছাত্র কর্তৃক পঠিত হয়।" প্রবাসী ১৩৪৫ পৌষ পৃ ৪৭২।

৩ শ্রীযুক্তা অবলা বসুর নিকট হইতে 'অব্যক্ত' সম্বন্ধে যে পত্রখানি প্রবাসী সম্পাদক পান, সেটি প্রদ্যোতকুমার সেনগুপ্তর নিকট ছিল। দ্র প্রবাসী ১৩৪৫ পৌষ পৃ ৪৭২।

আচার্য জগদীশচন্দ্রের মৃত্যুসংবাদ পাইবার পর কবির প্রান্তিক-চেতনা যেন পুনরায় সাড়া দিয়া উঠিল; আর একবার মৃত্যুপারের কথা স্মরণ হইল। প্রান্তিকের ৯-১৩ ও ১৭ সংখ্যক কবিতা ৮ ডিসেম্বর হইতে ২৫ ডিসেম্বরের (১৯৩৭) মধ্যে লিখিত হয়।

আধ্যাত্মিক জীবনের গূঢ় অন্তঃলোকে আলোক ও অন্ধকার জানা ও অজানার দ্বন্দ্ব চলে; কবির জীবনে তাহার প্রকাশ হয় কাব্যে, অথবা গদ্য রচনায় বা ভাষণে। সেই ভাবনার ধারা প্রকাশ লাভ করিলেই মন একটা সমে আসিয়া স্তব্ধ হয়; নূতন অনুভূতি ও আবেগের অপেক্ষায় থাকে। অনুকূল পরিবেশ বা অভিঘাতে নূতন ঋতুউৎসবের আয়োজন চলে—পুরাতনকে অতিক্রম করিয়া নূতন কাব্যধারার প্লাবন আসে। চিত্তলোকে প্রান্তিকের কবিতা রচনার পালা এখানেই শেষ হইল।[১]

কিন্তু রবীন্দ্র-সত্তার সবটাই আধ্যাত্মিক তুরীয়তা নহে, কাব্যও নহে, সাময়িক ও স্থানিক ঘটনা ও অপঘটনা তাঁহার স্পর্শচেতন মনকে উত্তেজিত করে—বিশ্বমানবের দুঃখ আপনারই দুঃখরূপে বরণ করেন। দেশের মধ্যে পরাধীনতার দুঃখ ও অপমান তো আছেই; বিদেশে কোথায়ও শান্তি নাই, সুখ নাই। কোথায় ইথিওপিয়া, কোথায় স্পেন, কোথায় চীন—স্বাধীনতা-সংগ্রামে ক্ষতবিক্ষত হইতেছে—এসবের জন্য বাঙালি কবির কী বেদনা।

সাতই পৌষ উৎসবের দিন (১৩৪৪) কবির মনে এই বিশ্বব্যাপী দুঃখের কথাই উদিত হইতেছে। তিনি বলিতেছেন, "চীনের প্রতি [জাপানের] নিষ্ঠুর অত্যাচারে[২] আমাদের হৃদয় উৎপীড়িত, কিন্তু আমাদের কী করবার আছে, আমরা কী করতে পারি? · এই দুঃখবোধের দ্বারা দানবের বিরুদ্ধে ঘৃণা প্রকাশ ক'রে আমরাও সেই সৃষ্টির পক্ষে কাজ করছি; এর শক্তি যতই ক্ষীণ হোক এও সৃষ্টির কাজ। আমাদের অস্ত্র নেই, কিন্তু মন আছে; আমরা লড়াই না করতে পারি, কিন্তু এ-কথা যদি আমাদের মনে জাগ্রত রাখি যে অধর্মের দ্বারা আপাতত যতই উন্নতি হোক তার মূলে আছে বিনাশ, যদি এ-কথা বিস্মৃত না হই যে মানব-ইতিহাসের মূলে কল্যাণের শক্তি কাজ করছে—একথা মনে রেখে সেই কল্যাণের পক্ষে আমাদের কর্মকে চেষ্টাকে যেন প্রয়োগ করি। আমাদের মেশিন-গান্ নেই। কিন্তু আমাদের চিন্তা আছে—তার মূল্য যতটুকুই হোক তাকে আমরা মহত্তের দিকে প্রয়োগ করব।"[৩] এই আদর্শই ভারত গ্রহণ করিয়াছে; এই সর্বজীব মঙ্গল চিন্তার জন্য ভারত আজ সর্বজাতির শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছে।

এই ভাষণের সঙ্গে পঠনীয় খ্রীষ্টমাস দিনে (১৯৩৭ ডিসেম্বর ২৫) লিখিত প্রান্তিকের দুইটি কবিতা (১৭ ও ১৮ সংখ্যক)।

দেখিলাম একালের
আত্মঘাতী মূঢ় উন্মত্ততা, দেখিনু সর্বাঙ্গে তার
বিকৃতির কদর্য বিদ্রূপ। একদিকে
স্পর্ধিত ক্রূরতা,

১ রবীন্দ্রনাথের 'প্রান্তিক' প্রকাশিত হইলে দিলীপ রায় এই কয়টি পংক্তি লেখেন:

O Bird of Fire, enskied above,
Whose voice is a dream, a song :
Pilgrim of loveliness and love,
A guest of the starry throng :

You warble of our ancient quest
Of bloom and bell and musk,
In the dark of sleep you cannot nest :
Your flame-wings burn the dusk.

Dilipkumar Ray, To Rabindranath on reading 'Prantika'. Mod.Rev. 1938 March p 818.

২ শাংহাই, নানকিঙ জাপানীরা অধিকার করিয়াছে ১৯৩৭এর শেষভাগে।

৩ প্রলয়ের সৃষ্টি, ৭ পৌষ ১৩৪৪, প্রবাসী ১৩৪৪ মাঘ পৃ ৬৬-৬৭।

মত্ততার নির্লজ্জ হুংকার, অন্যদিকে
ভীরুতার
দ্বিধাগ্রস্ত চরণবিক্ষেপ……।
রাষ্ট্রপতি যত আছে
প্রৌঢ় প্রতাপের, মন্ত্রসভাতলে আদেশ-নির্দেশ
রেখেছে নিষ্পিষ্ট করি রুদ্ধ ওষ্ঠ-অধরের চাপে
সংশয়ে সংকোচে।

জাগতিক রাজনৈতিক পরিস্থিতির কথা পৌষ উৎসবের ভাষণে ছিল : "অপর দিকে আছে আপন সাম্রাজ্যলোভী ভীরুর দল, তারা এই দানবের কোনো প্রতিবাদ করতে সাহস করে না। ক্ষীণ এরা, ইতিহাসে এদের সাক্ষ্য লুপ্ত। চীনকে যখন জাপান অপমান করেছে···তখন এই প্রতাপশালীর দল কোনো বাধা দেয় নি।"

খ্রীষ্টের জন্মদিনে দেশে দেশে দেবতার মন্দিরে মন্দিরে ধার্মিকদের দল শান্তির জন্য প্রার্থনা করে। কিন্তু কোথায় সে শান্তির প্রয়াস—

নাগিনীরা চারিদিকে ফেলিতেছে বিষাক্ত নিঃশ্বাস
শান্তির ললিত বাণী শোনাইবে ব্যর্থ পরিহাস।[১]

চীনাদের উপর জয়ী হইবার জন্য জাপানী সৈন্যদল বুদ্ধমন্দিরে বর প্রার্থনা করিয়াছিল—এই সংবাদ সংবাদপত্রে পড়িয়া বড়ো বেদনায় লিখিলেন 'বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি' (প্রবাসী ১৩৪৪ মাঘ) :

যুদ্ধের দামামা উঠল বেজে।···
মানুষের কাঁচা মাংসে যমের ভোজ ভরতি করতে বেরোলো দলে দলে।
সবার আগে চলল দয়াময় বুদ্ধের মন্দিরে তাঁর পবিত্র আশীর্বাদের আশায়।

মহতের নামে, দেবতার নামে এত বড়ো ব্যঙ্গ কবির পক্ষে দুঃসহ।[২]

১ দ্র Maxim Gorky, Reply to an intellectual (1931), Arcticles and Pamphlets, Moscow 1951 p 255 ff.

২ প্রায় দশ মাস পরে (১৯৩৮ অক্টোবর) য়োন্ নোগুচিকে পত্রে লিখিতেছেন সমসাময়িক আর-একটি ঘটনা উল্লেখ করিয়া, "I saw in a recent issue of the Osaka Mainichi and the Tokyo Nichi Nichi (1938 Sep. 16) a picture of a new colossal image of Buddha erected to bless the massacre of your neighbours." Tagore and China p 61.

বুনিয়াদি শিক্ষা ও শিক্ষাসত্র

কলিকাতায় নব শিক্ষাসংঘ বা New Education Fellowship-এর সম্মেলন ডিসেম্বরের (১৯৩৭) শেষভাগে। রবীন্দ্রনাথ ভারতীয় শাখার সভাপতি; শরীর অসুস্থ বলিয়া তিনি সভায় উপস্থিত হইতে পারিলেন না, তাঁহার ভাষণ লিখিয়া পাঠাইয়া দিলেন; এই ভাষণের বিষয়বস্তু লইয়া আমরা পরে আলোচনা করিব।

সম্মেলনে যেসব বিদেশী সদস্য আসিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে কয়েকজন শান্তিনিকেতনে আসিয়া কবির সহিত দেখা করেন। NEFএর সভাপতি ফিন্‌ল্যানডের Tolo Svenska Samkola প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ Rector Lavrin Zilliacus, ইংলণ্ডের কেণ্ট কাউণ্টির শিক্ষা-পরিচালক Salter Davies, সুইস NEF এর সহকারী সভাপতি ও জেনেভা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাবিজ্ঞানের অধ্যাপক Pierre Bovet এই দলে ছিলেন। সঙ্গে আসেন বুনিয়াদি শিক্ষার সম্পাদক আর্যনায়কম্।

NEF এর সদস্যগণ অস্ট্রেলিয়া ঘুরিয়া ভারতে আসেন। বরধায় অক্টোবর মাসে (১৯৩৭) মহাত্মাজির আহ্বানে যে শিক্ষাসম্মেলন হয়, সেখানে Dr. Zilliacus প্রভৃতি কয়েকজন উপস্থিত ছিলেন। এই শিক্ষাসম্মেলনের কথা আমরা পরে বলিব।

নবশিক্ষাসংঘের সদস্যগণ শান্তিনিকেতনে তিনদিন ছিলেন; তাঁহারা থাকিতে থাকিতে লর্ড লোথিয়ান[১] কবির সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য আসেন। একদিন সন্ধ্যায় একটি সভায় বরধা-শিক্ষাপরিকল্পনা লইয়া আলোচনা হয়; আর্যনায়কম্ এই পরিকল্পনা কমিটির আহ্বায়ক ও সম্পাদক; তিনি সভায় মহাত্মাজির শিক্ষাদর্শ সম্বন্ধে বলিলেন।

আমাদের আলোচ্য পর্বে ভারতে সর্বত্র মহাত্মাজির পরিকল্পিত নূতন শিক্ষাদর্শ লইয়া আলোচনা হইতেছে। রবীন্দ্রনাথ নবশিক্ষা সংঘের জন্য যে প্রবন্ধটি লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন এবং যাহা ইতিপূর্বে সেখানে পঠিত হইয়াছে, তাহাতে গান্ধীজির শিক্ষাবিধির সমালোচনা ছিল। শান্তিনিকেতনের এই ঘরোয়া সভায় যেসব আলোচনা হইয়াছিল তাহার বিস্তারিত বর্ণনা আমরা পাই নাই। রবীন্দ্রনাথের সহিত ডক্টর জিলিকাস প্রমুখ পণ্ডিতদের যদি কোনো আলোচনা হইয়া থাকে, তাহাও সমসাময়িক কোনো পত্রিকাদিতে প্রকাশিত হয় নাই।

গান্ধীজির শিক্ষাপরিকল্পনা দেশের কী অবস্থায় পেশ হইয়াছিল, তাহার পটভূমি সংক্ষেপে প্রথমেই বলা প্রয়োজন। শিক্ষাবিধি সম্বন্ধে গান্ধীজি বহু বৎসর হইতে ভাবিতেছেন। জীবনে স্বাবলম্বী হইবার শিক্ষাই যে শিক্ষার চরম উদ্দেশ্য, একথা গান্ধীজি দক্ষিণ আফ্রিকা বাসকালে স্বীকার করিয়া লন এবং টলস্টয় ফার্ম স্থাপন করিয়া নিজ পুত্রদের ও বন্ধুপুত্রদের আপন আদর্শ অনুযায়ী শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। তাঁহার ছাত্ররা শারীরিক কঠিন শ্রমে অভ্যস্ত হইত; তাহারা নিজ বস্ত্র বয়ন করিত, আপনার সর্ববিধ কার্য করিত; এমনকি নিজের জুতা পর্যন্ত নিজেরা প্রস্তুত করিত। এ বিষয়ে গান্ধীজিকে শিক্ষা দেন, তাঁহার প্রধান শিষ্য, সঙ্গী ও বন্ধু Kallenbach। ১৯১৬ সালে শান্তিনিকেতনে গান্ধীজির ফিনিক্স

১ লর্ড লোথিয়ান সে-যুগের সেরা কূটনীতিজ্ঞ রাজপুরুষ; যুদ্ধের সময় ভারতের মনোভাব দেখিয়া গেলেন; ভারত হইতেই বোধ হয় মার্কিন দেশে যান। Lothian, (Philip Henry Kerr) 11th Marquess of, K. T., C. H. (1882-1940); Asst Sec. of International Council of Transval and Orange River Colony (1905-08); editor of *The State*, South Africa (1908-09), and *The Round Table* (1910-16); Sec. to Lloyd George, when Prime Minister (1916-21); Sec. of Rhodes Trust (1925-29); Chancellor of the Duchy of Lancaster; Parliamentary Under-Secretary of State for India (1931-32); Chairman of Indian Franchise Committee (1932); British ambassador to U. S. A. charged with obtaining supplies and support of Britain's war effort 1939-40: died in office.

বিদ্যালয়ের ছাত্ররা আসিয়া কয়েকমাস থাকিয়া যায়; সেই দলের ছাত্র ও শিক্ষকদের সকলকেই কঠিন শ্রমসাপেক্ষ কার্যকলাপ করিতে হইত—বলা বাহুল্য স্বাবলম্বন ছিল শিক্ষার মূল কথা।

ভারতবর্ষে ফিরিয়া আসিয়া গান্ধীজিকে একের পর এক বিচিত্র সমস্যার সম্মুখীন হইতে হয়। সমস্ত ব্যর্থতার মূলে দেখিলেন অশিক্ষা, কুশিক্ষা—অস্বাস্থ্য, অপরিচ্ছন্নতা—চিত্তদৈন্য, অর্থদৈন্য। ভারতের সেই 'মূক মূঢ় মুখে' ভাষা বা শিক্ষা দান করিতে গেলে যে ব্যয়—তাহা তদানীন্তন বৃটিশ রাজপ্রতিনিধি মঞ্জুর করিতে পারেন না; কারণ সমরবিভাগের ব্যয় সংকোচন তাঁহাদের স্বার্থের পরিপন্থী। অথচ শিক্ষা ব্যতীত যে স্বরাজ প্রতিষ্ঠিত হইবে, তাহার ভিত্তি কখনো দৃঢ় হইতে পারে না।

শিক্ষাসংস্কার সম্বন্ধে চিন্তা গান্ধীজিকে দীর্ঘকাল পীড়িত করে সত্য, কিন্তু কোনো সুষ্ঠু পরিকল্পনা তিনি দিতে পারেন নাই। দেশে প্রত্যাবর্তনের বিশ বৎসর পরে ১৯৩৭ সালের মধ্যভাগে ভারতের ছয়টি (পরে আটটি) প্রদেশে কন্‌গ্রেস পক্ষীয়রা জয়ী হইয়া মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করিলে পরে গান্ধীজি ভাবিলেন এই সুবর্ণ সুযোগে তিনি তাঁহার শিক্ষা-পরিকল্পনা দেশবাসী সমক্ষে পেশ করিবেন। Harijanএ লিখিত হইয়াছে (৩০ অক্টোবর ৩৭), "But the thing in its present shape came to him under the changed circumstances of the country." দেশের এই নূতন অনুকূল পরিস্থিতিতে তাঁহার শিক্ষাদর্শ গৃহীত হওয়া সম্ভব হইল। Harijan পত্রিকায় (১৯৩৭ অক্টোবর ২, গান্ধীজির জন্মদিন) তিনি ঘোষণা করিলেন যে বরধায় অচিরে তিনি একটি শিক্ষাসম্মেলন আহ্বান করিবেন। বরধা মারবাড়ি হাইস্কুলের পঞ্চবিংশতি উৎসব উপলক্ষে এই সম্মেলন আহূত হইল। ২২-২৩ অক্টোবর বরধায় কন্‌গ্রেস প্রদেশের মন্ত্রীরা উপস্থিত হইলেন। সেখানে গান্ধীজি তাঁহার শিক্ষাদর্শ পেশ করিলেন। বরধায় শিক্ষা-পরিকল্পনা রচনার জন্য যে সমিতি গঠিত হইল, তাহার সভাপতি ডক্টর জাকীর হোসেন এবং সম্পাদক ও আহ্বায়ক আর্যনায়কম্ (আরিয়াম)। আরিয়ামের কর্মের সঙ্গে যুক্ত তাঁহার পত্নী আশাদেবী।[১]

পাঠকদের স্মরণ আছে আরিয়াম ও আশা দেবী দীর্ঘকাল রবীন্দ্রনাথ ও তাঁহার শিক্ষায়তনের সঙ্গে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। আরিয়াম ১৯২৪ সালে শান্তিনিকেতনে আসেন ও ১৯৩৪ সালে বিদ্যালয় ত্যাগ করেন। আশা দেবী কিছুকাল পাঠভবনের অধ্যক্ষতা করেন। তিনি দীর্ঘকাল শান্তিনিকেতনে বাস করিয়া কবিকে জানিবার সুযোগ লাভ করিয়াছিলেন, তৎপূর্বে আরিয়াম অধ্যক্ষ ছিলেন। ইঁহারা উভয়েই শান্তিনিকেতনের পঠন পাঠন বিধি এবং শিক্ষাসত্রের আদর্শ ও কর্মধারার সহিত সুপরিচিত হন। লক্ষীশ্বর সিংহের স্লয়ড্ কর্মশালায় আরিয়াম ও আশা দেবী ছিলেন উৎসাহী ছাত্র। মোট কথা রবীন্দ্রনাথ ও এলমহার্স্টের শিক্ষাদর্শন ও শিক্ষাবিধি সম্বন্ধে আরিয়াম ভালোরকমে ওয়াকিবহাল থাকায় তাঁহার পক্ষে বুনিয়াদি শিক্ষার প্রথম খসড়া প্রণয়ন করা সহজ হয়।

আরিয়াম ও আশাদেবী ১৯৩৪ জুনমাসে শান্তিনিকেতনের কাজ ছাড়িয়া চলিয়া যান; আদর্শের সঙ্গে বাস্তবের সম্বন্ধ তাঁহাদের মতে সেখানে ক্রমশই ক্ষীণ হইয়া আসিতেছিল। তাঁহারা বেনারস, মাদ্রাস প্রভৃতি স্থান ঘুরিয়া অবশেষে বরধায় গিয়া যমুনালাল বাজাজের মাড়বারি বিদ্যালয়ে (নবভারত বিদ্যালয়) যোগদান করেন। এই সময় হইতে আর্যনায়কম ও আশা দেবী গান্ধীজি, বিনোবা ভাবে প্রভৃতির সহিত ঘনিষ্ঠ হন এবং শিক্ষাবিষয়ে উভয়ের উৎসাহ, আন্তরিকতা ও দীর্ঘকালের অভিজ্ঞতা দেখিয়া গান্ধীজিও আকৃষ্ট হন। বুনিয়াদি শিক্ষার মূল খসড়া ইঁহাদেরই দ্বারা রচিত বলিতে পারি। আমাদের মতে জন্ ডিউই (Dewey) উদ্ভাবিত Project method,

১ Being a born teacher he [Vinoba] has been of the utmost assistance to Asha Devi in her development of the scheme of education through handicrafts.—*Vinoba and Gandhi by Birendranath Guha, Hindusthan Standard Puja Issue 1958* p 45.

রবীন্দ্রনাথ ও এলমহার্স্ট প্রবর্তিত শিক্ষাসত্রের পাঠক্রম ও পদ্ধতি এবং গান্ধীজির কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষা-পরিকল্পনার সমন্বয়ে বুনিয়াদি শিক্ষার খসড়া প্রস্তুত হয়।

Harijan পত্রিকায় Basic National Educationএর প্রথম খসড়া প্রকাশিত হইল (১৯৩৭ ডিসেম্বর ১১)। ইহা সমসাময়িক শিক্ষাপদ্ধতি ও শিক্ষাদর্শনের সমালোচনা ও গান্ধীজির গঠনমূলক পরিকল্পনার বুনিয়াদ্। উক্ত প্রতিবেদনে ইহাকে বলা হয় activity curriculum। বলা বাহুল্য, শিশুদের শিক্ষা কর্মকেন্দ্রিক[১] হইবে এই তত্ত্ব জগতের শিক্ষাভাবনায় নূতন নহে। গান্ধীজি তাঁহার নূতন শিক্ষাপদ্ধতির ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছিলেন অর্থনীতির উপর, অর্থাৎ শিক্ষা স্বাবলম্বী হইবে, বাহিরের সাহায্যনিরপেক্ষ হইবে। ছাত্ররা আপনাদের প্রয়োজনীয় খাদ্য উৎপাদন ও বস্ত্রাদি প্রস্তুত করিবে এবং উদ্‌বৃত্ত সামগ্রী বিক্রয় করিবে; তাহাদের বৃত্তি হইবে 'profit-yielding vocation'। সেই অর্থ দ্বারা বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বেতনাদি চলিবে; তবে ঘরবাড়ি আসবাবপত্রের ব্যয় অন্যত্র হইতে আনিতে হইবে। গান্ধীজির মতে বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য বিদ্যাপ্রতিষ্ঠান গবর্মেণ্টের সাহায্যনিরপেক্ষ হওয়া উচিত, তাহারা self-supporting হইবে through the fees charged for examinations অর্থাৎ পরীক্ষার ফীর উপর বিশ্ববিদ্যালয় ও উচ্চতম শিক্ষার নির্ভর হওয়া উচিত। ধনপতি ও শিল্পনায়কগণ এই শ্রেণীর বিদ্যাপ্রতিষ্ঠান স্থাপন ও উহার ব্যয় বহন করিবেন। তাঁহার মতে সাত হইতে চৌদ্দ বৎসর বয়স পর্যন্ত সকল শ্রেণীর বালকবালিকার শিক্ষা আবশ্যিক ও অবৈতনিক হওয়া বাঞ্ছনীয়; এ ছাড়া স্বাবলম্বী হইবার জন্য তাহাদের চেষ্টা থাকিবে শুরু হইতে। তিনি আরও বলেন যে সকল শ্রেণীর শিক্ষিত নরনারীর পক্ষেই জনশিক্ষাদানে কিছু সময় অতিবাহন আবশ্যিক হওয়া প্রয়োজন। এইভাবে সর্বশ্রেণীর শিক্ষা সরকারী অর্থসাহায্যনিরপেক্ষ হইতে পারিবে এবং বিশ বৎসরের মধ্যে ভারতে নিরক্ষরতার সমস্যা ও বেকারসমস্যা দূরীভূত হইবে। ভারতের সাত লক্ষ গ্রামের নিরক্ষরতা ও জীবিকাসমস্যা দূর করিবার জন্য তাঁহার ভাবনা এবং আশু প্রতীকারের জন্য তিনি উদ্‌গ্রীব। সেজন্য তিনি তাঁহার পরিকল্পনাকে Basic National Education না বলিয়া Rural National Education বলিবারই পক্ষপাতী।[২] গান্ধীজি তাঁহার পরিকল্পিত শিক্ষাবিধি সম্বন্ধে বলেন, "this education ought to be for them a kind of insurance against unemployment'.[৩] (Mahatma Vol. IV. p 228)

অসহযোগ আন্দোলনের সময় গান্ধীজি দেশবাসীকে চরকায় সুতা কাটিয়া দেশের বস্ত্রসমস্যা ও দারিদ্র্যদুঃখ শমিত করিবার জন্য উপদেশ দিয়াছিলেন। আজ ভাবিতেছেন দেশব্যাপী নিরক্ষরতা, মানসিক জড়তা, বেকারসমস্যা দূর করিবার একমাত্র উপায় কন্‌গ্রেস গবর্মেণ্টের সহায়তায় দেশের মধ্যে বুনিয়াদিশিক্ষার পত্তন ও প্রচলন। গান্ধীজির বিশ্বাস কর্ম বা কারুকেন্দ্রিক শিক্ষার মাধ্যমে ছাত্রদের মনোবিকাশও হইবে। তিনি বলিতেছেন, "Let us cry a halt and concentrate on educating the child properly through manual work, not as a side activity, but as the prime means of intellectual training." (Harijan 1937 Sep. 18) তিনি

১ Harijan 1937 Oct. 2. Question before the educational conference.

২ Segaon, 1938 May 28, Forword to the 2nd Ed of the Basic National Education.

৩ তু রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাসত্র। সেখানে ছাত্ররা স্বাবলম্বী হইবে, এ পরিকল্পনা রবীন্দ্রনাথেরও ছিল; তবে বিদ্যালয়ের ব্যয় তাহাদের উপার্জিত অর্থে চলিবে একথা তিনি কখনো ভাবেন নাই। কিন্তু ছাত্ররা ৬ হইতে ১২ বৎসর পর্যন্ত শিক্ষাসত্রে থাকিয়া যে সব কারুশিল্প শিখিবে তাহারই অনুশীলনে তাহাদের জীবিকা না হউক উপজীবিকা হিসাবে কিছু অর্থাগম হইতে পারে একথা বলেন। শিক্ষাসত্রের মূলকথা ছিল ভবিষ্যতে স্বাবলম্বন এবং ছাত্রাবস্থায় যতটা পারা যায় করা, তাহাদের আয়ের উপর বিদ্যালয়ের নির্ভর হইতে পারে না।

অন্যত্র বলিতেছেন যে, বুদ্ধিকে প্রখর করিবার জন্য কারুশিক্ষা অপরিহার্য। "I am afraid you have not sufficiently grasped the principle that spinning, carding etc., should be means of intellctual training. What is being done there is that it is a supplementary course to the intellectual course ..... I must confess that all I have up to now said is that manual training must be given side by side with intellectual education. But now I say that the ***principal means of stimulating the intellect should be manual training***... (Mahatma Vol. IV. p228)

হরিজন পত্রিকায় গান্ধীজির শিক্ষাপরিকল্পনা প্রকাশিত হইলে (১৯৩৭ ডিসেম্বর ১১), রবীন্দ্রনাথ সে সম্বন্ধে যে মন্তব্য করেন, তাহা বৎসরের শেষভাগে কলিকাতার NEFএর যে সম্মেলন হয় তাহাতে পঠিত হয় এবং বিশ্বভারতী নিউজে ও অন্যত্র প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছিলেন :

"Now that Mahatma Gandhi has taken up the cause of mass education in earnest we may be sure of great results in the near future. Already great interest has been roused in the country and controversy provoked over the question whether education can be made self-supporting. Before you too are likewise provoked to violent agreement or disagreement with the proposal, I would remind you that Gandhiji's genius is essentially practical, which means that his practice is immeasurably superior to his theory. As the scheme [Wardha] stands on paper, it seems to assume that material utility, rather than development of personality, is the end of education, that while education in the true sense of the word may be still available for a chosen few who can afford to pay for it, the utmost that the masses can have is to be trained to view the world they live in the perspective of the particular craft they are to employ for their livelihood. It is true that as things are even that is much more than what the masses are actually getting but it is nevertheless unfortunate that even in our ideal scheme, education should be doled out in insufficient rations to the poor, while the feast remains reserved for the rich. I cannot congratulate a society or a nation that calmly excludes play from the curriculum of the majority of its children's education and gives in its stead a vested interest to the teachers in the market value of the pupil's labour. But these defects seem such only on paper, for no man loves the children of the poor more than the Mahatma, and we may be sure that when the scheme is actually worked out by him we shall discover in it only one more testimony to the genius of this practical sage whose deeds surpass his words."[১]

অতঃপর দুই মাস পরে হরিপুরার কনগ্রেসে সুভাষচন্দ্র বসুর সভাপতিত্বে National Education সম্বন্ধে দীর্ঘ এক প্রস্তাব পেশ ও গৃহীত হয় (১৯৩৮ ফেব্রুয়ারি)। বরধার শিক্ষাসম্মেলনে যে সব প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছিল সেগুলিই

১ V. B. News VI 1938 Junuary p 51-53. দ্র An aspect of the Basic Education Scheme by Tanayendranath Ghose, V. B. News 1938 p 83-86.

কন্‌গ্রেস কর্তৃক এখন স্বীকৃত হইল। কন্‌ফারেন্সে গান্ধীজির self-supporting ও profit-yielding প্রস্তাব সম্পূর্ণভাবে গৃহীত না হইয়া নিম্নলিখিত প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছিল। (3) That the conference endorses the proposal made by Mahatma Gandhi that the process of education throughout this period [Ages 7-14] should centre around some form of manual and productive work, and that all the other abilities to be developed or training given should, as far as possible, be integrally related to the central handicraft chosen with due regard to the environment of the child.

(4) That this Conference expects that this system of education will be gradually able to cover the remuneration of the teachers.

কন্‌গ্রেস এই শেষ প্রস্তাব গ্রহণ করেন নাই। কন্‌গ্রেস অধিবেশনের মাসেক কালের মধ্যেই (১৯৩৮ মার্চ)[১] Basic National Education এর Syllabus বরধা হইতে প্রকাশিত। হইল এই পাঠক্রম রচনায় জাকীর হোসেন কমিটির সদস্যগণ কয়েকজন বিশেষজ্ঞের সহায়তা গ্রহণ করেন; তাহার মধ্যে বিশ্বভারতীর লক্ষ্মীশ্বর সিংহ কার্ডবোর্ড, কাঠের কাজ ও ধাতুশিল্প শিক্ষার পাঠক্রম প্রস্তুত করিয়া দেন। নন্দলাল বসু ড্রয়িং বা চিত্রবিদ্যার পাঠক্রম লিখিয়া দেন। লক্ষ্মীশ্বর যে খসড়া পেশ করেন তাহা স্লয়ড্ কারু শিক্ষাপদ্ধতির উপর রচিত পাঠ বা কার্যক্রম। আমরা পূর্বে স্লয়ড সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছি।

Basic Education সম্বন্ধে যে গ্রন্থ এইবার প্রকাশিত হইল, তাহাতে রবীন্দ্রনাথের এতদ্‌সম্পর্কে মতামতের পরোক্ষ সমালোচনা ছিল। কবি বলিয়াছিলেন যে শিক্ষার মধ্যে ক্রীড়ার স্থান বড়ো, সেইটি এই শিক্ষাপরিকল্পনায় বাদ পড়িয়াছে। তাহার উত্তরে বলা হয় যে, ক্রীড়া curriculum এর বিষয় নহে, তাহা extra-curriculer activityর অন্তর্গত। মনে হয় NEFএর অধিবেশনে কবির যে সমালোচনা পঠিত হয় ইহা তাহারই উত্তরে লিখিত।

গান্ধীজির স্বাবলম্বনমূলক শিক্ষার ভিত্তি অহিংসা। তাঁহার নবশিক্ষা পরিকল্পনায় 'অহিংসা'র অর্থ অন্যকে শোষণ ও পেষণ না করিয়া জীবিকা অর্জন; তাহাই মানবধর্ম। উপনিষদের বাণী উদ্ধৃত করিয়া রবীন্দ্রনাথ বহু স্থলে তাঁহার ভাষণে এই মানবধর্ম উদ্রিক্ত করিবার জন্য বলিয়াছেন 'মাগৃধঃ' অর্থাৎ অন্যের ধনে লোভ করিবে না, অন্যকে পীড়ন করিয়া পুষ্ট হইবার সাধনা করিবে না। মানুষের মনে যে idyllic স্বপ্ন আছে এ ভাবনাও তাদৃশ। আদর্শবাদী মানুষ সর্বদেশে সর্বকালে সত্যযুগ বা রামরাজ্যের কথা কল্পনা করিয়া আসিতেছেন। কেহ ভাবেন এই utopia মূর্ত হইবে আত্মিক দিক হইতে; আবার কেহ ভাবেন আর্থিক দিক হইতে সমস্যার সমাধান হইবে; কেহ বা উভয়কে মিশাইয়া শ্রেণীহীন সমাজে সাম্যবাদের স্বপ্ন দেখেন।

এই কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষাপদ্ধতি কতদূর বিজ্ঞানসম্মত তাহার শেষ বিচার হয় নাই; আধুনিক বিজ্ঞানীরা ক্রমশই কর্মসর্বস্ব শিক্ষাপদ্ধতির ফল সম্বন্ধে সন্দিহান হইতেছেন। "Under the scrutiny of modern psychology such claims [that through the use of tools one would acquire not only some specific skills, but also a 'general skill' which would be useful in all circumstances in later life],—

১ Harijan (11 Dec. 1937) এ Basic Educationএর প্রথম খসড়া বাহির হয়। তৎপূর্বে ১৯৩৭ ডিসেম্বর-এর Modern Reviewতে লক্ষ্মীশ্বর সিংহের 'Some practical and important aspects of mass education and vocational training' প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল। এই প্রবন্ধ পাঠ করিয়া বুনিয়াদি শিক্ষার পক্ষ হইতে লক্ষ্মীশ্বর সিংহকে কারুশিল্পের পাঠক্রম রচনার জন্য বলা হয়। লক্ষ্মীশ্বর সিংহ তখন শ্রীনিকেতনের কর্মী। অতঃপর ১৯৩৮ এপ্রিল মাসে তিনি বরধায় কাজ গ্রহণ করিয়া চলিয়া যান। বর্তমানে তিনি 'বিনয়ভবনে'র অধ্যাপক।

which rest largely on the theory of the transfer of training, have been found substantially invalid. But these views were once quite fashionable and as such they contributed in no small way to the wide and rapid acceptance of manual training as an integrate part of general education." Meyers, p 29.

বুনিয়াদি শিক্ষার আলোচনা প্রসঙ্গে বিশ্বভারতীর 'শিক্ষাসত্র' প্রতিষ্ঠানের কথা স্বভাবতই আসিয়া পড়ে। যেখান হইতে শিক্ষা বিনাব্যয়ে পাওয়া যায় তাহাকে 'শিক্ষাসত্র' বলা হইয়াছে, যেমন অন্নসত্র। বুনিয়াদি শিক্ষা-পরিকল্পনা পেশ (১৯৩৭ ডিসেম্বর) হইবার প্রায় চৌদ্দ বৎসর পূর্বে রবীন্দ্রনাথের অনুপ্রেরণায় গ্রামের দরিদ্রদের শিক্ষাদানের জন্য শান্তিনিকেতনের এক প্রান্তে 'শিক্ষাসত্র' স্থাপিত হয়। (১৯২৪ জুলাই) বলিতে গেলে বুনিয়াদি শিক্ষার প্রথম হাতেনাতে পরীক্ষার সূত্রপাত এখানেই হয়। প্রসঙ্গত বলিতে পারি ১৯২৫ মে মাসে যখন গান্ধীজি শান্তিনিকেতনে আসেন, তখন তিনি এই গ্রাম-বিদ্যালয় নিশ্চয়ই দেখিয়াছিলেন এবং তথাকার কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষাও লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন।

যাহাই হউক, শিক্ষাসত্র স্থাপনের বহুপূর্ব হইতেই শিক্ষাকে activity বা কর্মভিত্তিমূলক করিবার জন্য কবির ইচ্ছা ও প্রয়াস দেখা যায়। ব্রহ্মচর্যাশ্রম স্থাপনের সময় হইতেই ছাত্ররা নিজ নিজ কর্ম করিতে অভ্যস্ত হয়; কবি যে কর্মভিত্তিক শিক্ষাবিধির পক্ষপাতী হইয়াছিলেন তাহার একধারা প্রাচীন তপোবনের গুরুগৃহ বাসের আদর্শ হইতে গৃহীত, আরেক ধারা পাশ্চাত্য নূতন শিক্ষাদান বা প্রয়োগমূলক শিক্ষাপদ্ধতি হইতে গৃহীত। আধুনিক যুগে উইলিয়াম জেম্‌স শিক্ষাতত্ত্বে যে নূতন কথা বলেন, তাহা তাঁহার *Talks to Teachers and Students* (1899) নামক বিখ্যাত গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে। এই গ্রন্থখানি কবি জগদীশচন্দ্র বসুর নিকট হইতে পান; জগদীশচন্দ্রকে সিস্টার নিবেদিতা উহা উপহার দেন। কবি সেই কপি পাঠ করেন এবং আমাদের নিকট বহুবার এই গ্রন্থ সম্বন্ধে বলেন।[১]

শিক্ষাব্রতীরা জানেন কিভাবে জেম্‌স (১৮৪২-১৯১৪) ও চার্লস পিয়ার্স (১৮৩৯-১৯১০)-এর pragmatic মতবাদ জন্ ডিউই (১৮৫৯-১৯৫২) প্রমুখ আধুনিক দার্শনিক ও শিক্ষাশাস্ত্রীদের প্রভাবান্বিত করে। জন্ ডিউই বিংশ শতকের সর্ববাদীসম্মত শ্রেষ্ঠ শিক্ষাশাস্ত্রী; Findlay [1860] বলেন আর-একজন শিক্ষাশাস্ত্রী জগতে আছেন— তিনি হইতেছেন রবীন্দ্রনাথ। শিক্ষাপদ্ধতি ও শিক্ষার ইতিহাস লইয়া যাঁহারা আলোচনা করেন, তাঁহাদের নিকট জেম্‌স ফিন্‌ড্‌লে-র নাম অজ্ঞাত নহে; তিনি ইংরেজ, ম্যানচেস্টার বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানার্হ অধ্যাপক, বহু গ্রন্থের লেখক। তাঁহার *The Foundation of Education* (1930) গ্রন্থে বলিতেছেন, "There are two great men in our epoch, John Dewey in the West and Rabindranath Tagore in the East, whose wisdom not only illumines the general mind, but has stooped to the level of the children. Both men are now passing into old age, but it was in the prime of life, during the closing years of the last century, that both of them resolved to keep school. (Vol. II. p 237)

"With Tagore, the environment, the *Ashram*, the star and the sky, friends and neighbours, are the means whereby an inner happiness is fostered. Dewey seems to leave such influences to the subconscious; his 'means whereby' the American boy and girl

১ বইখানি রবীন্দ্রসদনে আছে।

are to solve the riddle of life spring from impulses of curiosity and intelligence : significance is found in relating the materials and tools of to-day with the unfurnished equipment of society in earlier epochs : pursuing the occupations presented in kitchen, garden and workshop, his children learned to enjoy the fellowship of their group, to be humane and considerate, without relating such sentiments either to the transcendental or to the sense of fellowship. You could not transplant the Shantiniketan school song, 'She is our own ; the darling of our hearts' to Chicago, for the forms of art in which the Bengalee gives voice to his emotion are the outcome of ages of culture : American culture is by comparison rough and ready : the people, even of 'the best' families, are exiles of recent date from all quarters of Europe and life had to begin again, making over afresh the constituent values of livelihood and art···Yet the teachers in Chicago and the teachers in Bolpur were united both in their negations, in their rejection, e. g., of the vulgar pursuit of wealth and ostentation, and in their positive sentiments towards the young. Both seek freedom from the sordid, fleeting desires of a materialistic age ; but the one escapes from the entanglements of a jungle where ancient truths have rotted in decay ; the other, dumped on a naked shore, has to refashion the arts of life from the materials that lie to hand. 'Here and, now is my America' is the motto of the West, for the past has been severed by the wide seas : the boys of Bolpur chant a Sanskrit verse, *Om, Shanti, Shanti, Shanti,* on the soil their fathers trod. When Tagore delivered his lecture on *My School* to an American audience, we may be sure that it was felt and understood best by those who had grasped the pedagogies of *School and Society* and of *Human Nature and Conduct*" (p 239-40)

Findlay তাঁহার গ্রন্থ রবীন্দ্রনাথকে উৎসর্গ করিয়াছিলেন—"Dedicated to Rabindranath Tagore, poet, philosopher and teacher of school boys in Bolpur".

জন্ ডিউই-এর পরেই শিক্ষাশাস্ত্রীদের মধ্যে নামজাদা অধ্যাপক হইতেছেন কিলপ্যাট্রিক ; ইনি ডিউই-এর শিষ্য। ইনি ১৯২৬ সালে ভারতে আসেন ; মোগা স্কুল সম্বন্ধে বিশেষভাবে উপদেশ দিবার জন্য আমন্ত্রিত হন। সেইসময়ে তিনি শান্তিনিকেতন বিদ্যালয় দেখিয়া যান। চারি বৎসর পর ১৯৩০ নভেম্বর ৪ নিউইয়র্কের International House-এ তিনি Educational situation in India and Tagore's School সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন। সেই সভায় আরিয়াম উইলিয়ামস [আর্যনায়কম্] শান্তিনিকেতন সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়াছিলেন।

কিলপ্যাট্রিক শান্তিনিকেতনের শিশুবিভাগের ছাত্রদের দ্বারা নির্মিত 'মুকুট' ঘরখানি দেখিয়া খুবই প্রীত হন। তিনি বক্তৃতায় বলেন যে শিশুবিভাগে যে আদর্শ তিনি দেখিয়াছিলেন, তাহাই যথার্থভাবে শিক্ষার মূল কথা অর্থাৎ activity। স্কুলবিভাগে যে পাঠক্রম ও পদ্ধতি পরীক্ষায় পাশের জন্য শান্তিনিকেতনে অনুসরণ করিতে হয়, সে সম্বন্ধে Kilpatrik দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলিতেছেন, "I regret myself that he has to do it. I hope the day will come when India can give up this type of education—which has split the soul of its

youth. I hope that day may come, and I am sure the poet will be the first one, in his own school, to herald that day."[১]

বিগত প্রথম মহাযুদ্ধের পর রবীন্দ্রনাথ শিক্ষাসম্বন্ধে যে সব ভাষণ দেন, তাহাতে সর্বাঙ্গীণ শিক্ষার যে কাঠামো খাড়া করেন তাহা শিক্ষার মূলগত সমস্যারই আলোচনা। ১৯১৯ সালে মাদ্রাসে জাতীয় শিক্ষা উন্নয়ন সমিতির উদ্যোগে তিনি যে ভাষণ দান করেন, তাহা The Centre of Indian Culture নামে সুপরিচিত। এই ভাষণের মধ্যে তিনি স্পষ্ট করিয়াই বলেন যে, ভাবীকালের শিক্ষা ও সংস্কৃতির কেন্দ্র কেবলমাত্র মানসিক বা পুঁথিগত বিদ্যার কেন্দ্র হইবে না,—সেই কেন্দ্র হইবে অর্থনৈতিক জীবনেরও কেন্দ্র।

"Our centre of culture should not only be centre of the intellectual life of India, but the centre of economic life also. It must cultivate land, breed cattle to feed itself and its students ; it must produce all necessaries, devising the best means and using the best materials, calling science to its aid. Its very existence should depend upon the success of its industrial ventures carried out on the co-operative principal, which will unite the teachers and students in a living and active bond of necessity. This will give us also practical industrial training, whose motive force is not the greed of profit (p 47)". অতি স্পষ্ট ভাষায় কবি তাঁহার শিক্ষাদর্শ ব্যক্ত করিলেন। তবে ইহা হইল broad principle.

সমসাময়িক এক রচনায় আমরা পাই, "যাহাতে হাতের ও চোখের দক্ষতা ও বস্তু পরিচয় ঘটে আমাদের আশ্রমে ছেলেদের সেইরকম শিক্ষা দিবার জন্য বহুকাল হইতে ইচ্ছা করিয়াছি। সেজন্য প্রায় মাঝে মাঝে অর্থসাধ্য আয়োজন করা গিয়াছে। সফলতা লাভ করিতে পারি নাই তাহার একমাত্র কারণ পুঁথিগত বিদ্যায় আমাদিগকে কেবল যে অকর্মণ্য করিয়া দিয়াছে তাহা নহে, পুঁথির বাহিরে যাহা কিছু আছে তাহার প্রতি আমাদের ঔৎসুক্য চলিয়া গেছে। বই পড়াইবার ক্লাস আমরা সহজে চালাইতে পারি কিন্তু কেজো শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা কী করিয়া করা যায় আমরা ভাবিয়া পাই না এবং সে সম্বন্ধে আমাদের ভাবনা যায় না।"[২] 'মানুষের শারীরিক ও মানসিক সকল প্রকার শক্তির মধ্যে একটি অখণ্ড' যোগ যে আছে একথা রবীন্দ্রনাথ স্বীকার করেন এবং বলেন যে 'পরস্পরের সহযোগিতায় তারা বল লাভ করে।' তিনি বলেন "দেহের শিক্ষা যদি সঙ্গে সঙ্গে না চলে তাহলে মনের শিক্ষারও প্রবাহ বেগ পায় না। অনেক ছেলেকে ক্লাসে জড়বুদ্ধি দেখি তার কারণই এই যে, শিক্ষার ব্যাপারে তাদের দেহের দাবি কোনোই আমল পায় না। সেই অনাদরে তাদের মনের দৈন্য ঘটে।

"দেহের চর্চা বলতে আমি ব্যায়াম বা খেলার চর্চা বলছিনে। দেহের দ্বারা আমরা যে সব কাজ করতে পারি সেইসব কাজের চর্চা—সেই চর্চাতে দেহ সুশিক্ষিত হয়, তার জড়তা দূর হয়। সেই সব কাজের প্রণালীর ভিতর দিয়ে দেহের সঙ্গে মনের যোগ হয়—সেই যোগেই উভয়ের বিকাশের সহায়তা ঘটে।

১ আরিয়াম যখন শান্তিনিকেতনে শিশুদের শিক্ষার ভারপ্রাপ্ত সেই সময়ে শিক্ষাশাস্ত্রী কিলপ্যাট্রিক শান্তিনিকেতনে আসিয়াছিলেন। প্রেমচাঁদ লাল তাঁহার গ্রন্থে বলিতেছেন, "Professor William H. Kilpatrick of Columbia University, who visited the school [at Santiniketan], has spoken of the active life, particularly of the elementary school [Sisu-Vibhaga] with appreciation while Professor Findlay has ranked Tagore with John Dewey as an educator." P. C. Lal, Reconstruction and Education in Rural India, 1932 p 117 ; also see page 28. কিলপ্যাট্রিকের বক্তৃতাটি আমি তনয়েন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয়ের নিকট পাই। তজ্জন্য আমি কৃতজ্ঞ।

২ উদ্যোগশিক্ষা, শান্তিনিকেতন পত্রিকা ১৩২৬ আশ্বিন-কার্তিক পৃ ৫।

"আমার মত এই যে, আমাদের আশ্রমের প্রত্যেক ছাত্রকেই বিশেষভাবে কোনো না কোনো হাতের কাজে যথাসম্ভব সুদক্ষ ক'রে দেওয়া চাই। হাতের কাজ শিক্ষাই তার মুখ্য উদ্দেশ্য নয়, আসল কথা, এইরকম দৈহিক কৃতিত্ব চর্চায় মনও সজীব সতেজ হয়ে ওঠে।[১] দেহের অশিক্ষা মনের শিক্ষার বল হরণ ক'রে নেয়।...সে অসম্পূর্ণ মানুষ। এই অসম্পূর্ণতা থেকে আমাদের প্রত্যেক ছাত্রকেই বাঁচাতে হবে।...দেহের শিক্ষার সঙ্গে মনের শিক্ষার, দেহের সচলতার সঙ্গে মনের সচলতার যোগ আছে—এই আমার দৃঢ় বিশ্বাস। উভয়ের মধ্যে ভালো রকম মিল করতে না পারলে আমাদের জীবনের ছন্দ ভাঙা হয়ে যায়।"[২]

শিক্ষা সর্বাঙ্গীণ করিতে হইলে তাহা যে কর্মপ্রতিষ্ঠ হওয়া উচিত এ ভাবনা রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাজিজ্ঞাসায় বহুকালের। ১৯০৪ সালে মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়কে একপত্রে লিখিয়াছিলেন, 'এণ্ট্রেন্স পরীক্ষার দিকে না তাকাইয়া রীতিমত শিক্ষা দিবার চেষ্টা করা যাইবে।' (স্মৃতি পৃ ৪৩) কিন্তু দেশের পরিস্থিতিতে এই ভাবনা কার্যকরী করিবার সুযোগ পান নাই। শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রমের শিক্ষকগণ ও ছাত্রদের অভিভাবকগণই ছিলেন ইহার বাধা; কারণ বাঁধা রাস্তায় চলিতে ও চালনা করিতে পারিলে শিক্ষকরা খুশী, মামুলিধারায় সন্তানদের শিক্ষিত করিতে পারিলে অভিভাবকগণ নিশ্চিন্ত। অভিভাবকগণের মধ্যে বেশির ভাগই শান্তিনিকেতনে ছেলে পাঠান তথাকার কতকগুলি সুবিধা সুযোগের জন্য। বাহিরের এই সব বাধা ও বাধ্যবাধকতা হইতে দূরে থাকিয়া কবি তাঁহার পরিকল্পনামতে শিক্ষাদানের পরিবেশ সৃষ্টি করিবার জন্য শিক্ষাসত্রের পত্তন করেন। এই শ্রেণীর special school কেন স্থাপন করেন, সোভিয়েট রাশিয়ায় মোলাকাতে তৎসম্বন্ধে কবি বলেন যে, শান্তিনিকেতনে ছাত্ররা অধিকাংশই আসে ধনীঘর হইতে, সকলেই পরীক্ষা পাশ ও ডিগ্রী লাভ করিয়া জীবিকা অর্জন করিবে এই মাত্র আকাঙ্ক্ষা। সেইজন্য সেখানে সর্বাঙ্গীণ আদর্শ শিক্ষাদান করা সম্ভব হয় না। "Therefore it is not possible to give them the ideal kind of education."[৩] তিনি অন্যত্র বলিয়াছেন, "The tradition of the community which calls itself educated, the parent's expectations, the up-bringing of the teachers themselves, the claim and the constitution of the official University, were all over-whelmingly arrayed against the idea I had cherished."[৪]

কবি আদর্শবাদী হইলেও প্রত্যক্ষবাদী; বাস্তবতা সম্বন্ধে তাঁহার কোনো অস্পষ্ট ধারণা ছিল না; তাই তিনি বলিয়াছিলেন, "I had to submit to this because otherwise there would be no chance of having a single student in my school."[৫] একথা অতি সত্য। গবর্মেণ্ট প্রথমদিকে এ বিদ্যালয়ের প্রতি আদৌ সহানুভূতিপূর্ণ ছিলেন না। তৎকালীন গবর্মেণ্টের মন ও সমাজের মান রক্ষা করিয়া যতদূর চলা সম্ভব তাহাই কবি করিতেন। গবর্মেণ্টের সহায়তা ও সহানুভূতি-নিরপেক্ষ সর্বব্যাপী শিক্ষাপরিকল্পনা কর্মে রূপায়িত করা অসম্ভব জানিয়া তাঁহাকে দীর্ঘকাল অপেক্ষা করিতে হয় এবং ক্ষুদ্র পরিসরের মধ্যে নিজ সামর্থ্য অনুসারে তাহা সীমায়িত রাখেন। কিন্তু তাঁহার আদর্শ প্রচার করিতে তিনি বিরত হন নাই—১৯১৯ সালের বক্তৃতা হইতে উদ্ধৃতাংশ তাহার প্রমাণ।

১ তু মহাত্মাজির কথা—"the principal means of stimulating the intellect should be manual training" (1937).

২ আলোচনা, শিক্ষা ২য় সং পৃ ২৫৯-৬০, দ্র শান্তিনিকেতন পত্রিকা।

৩ Visvabharati Bulletin No. 15 p 33. Rabindranath Tagore in Russia, an account of the Poet's visit to Moscow Edited by P. C. Mahalanobis.

৪ A Poet's School by Rabindranath Tagore, Visvabharati Bulletin No. 9 p 14.

৫ Bulletin No. 10 p 54.

Special schools অর্থাৎ গ্রামের বালকদের জন্য বিদ্যালয় বা সত্র স্থাপনের কথা কেন উঠিয়াছিল, কেন তিনি 'such a distinction' বা পার্থক্য করিতে চাহিয়াছিলেন তাহার উত্তর তো তিনি দিয়াছেন। তাঁহার ধারণা যে class বা বিশেষ শ্রেণী বা বিশেষভাবে ধনী ও মধ্যবিত্তর জন্য যে শিক্ষা প্রদত্ত হইতেছে, তাহা ক্রমেই পিছাইয়া পড়িবে, ও class এর স্থলে massএর জন্য এই গ্রাম্য শিক্ষালয় দেশব্যাপী হইবে।

১৯২২ সালে এলমহার্স্ট বিশ্বভারতীতে যোগদান করিলে কবির বহুকাল-ইপ্সিত সাধারণের উপযোগী শিক্ষাদর্শকে প্রকাশ করিবার সুযোগ মিলিল। এলমহার্স্ট আদর্শবাদী হইলেও বাস্তববাদী; তিনি অর্থ আনিলেন বিদেশ হইতে বিশ্বভারতীর জন্য, নিজে কর্মে ব্রতী হইলেন কবির আদর্শকে রূপদান করিবার জন্য। কবি লিখিতেছেন যে এলমহার্স্ট "believes, as I do, in an education which takes count of the organic wholeness of human individuality that needs for its health a general stimulation to all faculties, bodily and mental". পূর্বের আলোচনা ইহারই সমর্থক কথা।

বিশ বৎসর যাবৎ শান্তিনিকেতনের ছাত্রদের লইয়া তিনি তাঁহার সর্বাঙ্গীণ শিক্ষার আদর্শ রূপ দান করিতে পারেন নাই; তাই লিখিতেছেন, "I had to start a parallel school where the villagers who do not have ambitions for finding Government employment or employment in marchant's offices, come and join. There I am trying to introduce all my methods which I consider to be absolutely necessary for a perfect education. Before long, the village school, will be the real school, the ideal school, and the other one will be neglected."[১] কবি ভাবিতেছেন, এই গ্রাম-বিদ্যালয়ই একদিন আদর্শ বিদ্যালয় হইবে এবং শান্তিনিকেতনের অভিজাতশ্রেণীর ছাত্রদের বিদ্যালয় পিছাইয়া পড়িবে।

বলা বাহুল্য এ উক্তিকে আমরা শিক্ষাসম্বন্ধে কবির চরম মত বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি না। তিনি সত্যের দ্রষ্টা, কর্মের স্রষ্টা হইলেও মূলত তিনি কবি। তাই যখন যে বিষয়টির উপর মনের ঝোঁক গিয়া পড়ে, তখন সেইটিই সাময়িকভাবে একান্ত হইয়া উঠে। কিন্তু সেভাব হইতে মুক্ত হইয়া আসিতেও যে তাঁহার বিলম্ব হয় না,[২] এ তথ্য আমরা বহুবার তাঁহার জীবনে লক্ষ্য করিয়াছি। আসলে যেটি normal সেই স্থানেই ফিরিয়া আসেন। তাই সমস্ত শিক্ষাকেই এক ছাঁচে ঢালিবার ইচ্ছা সাময়িকভাবে মনে উদিত হইলেও, তাহাকে কখনো শিক্ষা সম্বন্ধে কবির শেষ কথা বলিয়া আমরা স্বীকার করিতে পারি না। 'বহুধাশক্তি যোগে'ই জাতীয় জীবন বিচিত্র হয়, সুন্দর হয়, বলিষ্ঠ হয়—এই তত্ত্বই কবি বিশ্বাস করিতেন। শিক্ষামাত্রকেই সর্বতোভাবে কর্মপ্রতিষ্ঠ ও গ্রামমুখীন করিবার ও সর্বশ্রেণীর পক্ষে একই ধরনের বিশেষ শিক্ষাকে অনিবার্য করিয়া তুলিবার কল্পনা যে স্বাভাবিক বা normal হইতে পারে না, তাহা কবি বুঝিতেন; নহিলে বিশ্বভারতীতে বিচিত্র জ্ঞান-সাধনার ক্ষেত্র উন্মুক্ত ও প্রসারিত না হইয়া উহা 'শিক্ষাসত্র' বা বুনিয়াদি বিদ্যালয়ে পর্যবসিত হইয়াই থাকিত। সুতরাং রবীন্দ্রনাথকে যাঁহারা একটি কোনো বিশেষ মত—তাহা যতই মনোরম

১ Rabindranath in Russia, Ed. by P. C. Mahalanobis, V. B. Bull. No. 15 p 84.

২ আমাদের এই মতের সমর্থনে রোদেনস্টাইনকে লিখিত একখানি পত্র হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি: "I know that during my contact with you I occasionally displayed moods that must have caused you pain, but I hope you realise that they never represented my deeper normality, that they were provoked by some jerks of time which for the moment was passing over a road badly out of repairs." The force of friendship (Radio talk), by Francis Watson on Rabindranath Tagore and Sir William Rothenstein The Listner July 12, 1951 p 66.

হউক—তাহার মধ্যে সীমিত করিয়া দেখিতে চাহেন, তাঁহারা কবির সমগ্র সত্তাটির সন্ধান পাইবেন না ; আবার সেটিকে বাদ দিলে তাহা অসম্পূর্ণ হইবে। সুতরাং এই জটিল মনীষী ও কবিকে বুঝিতে হইলে, তাঁহার সমগ্র ব্যক্তিসত্তার ঐক্যমূর্তির সন্ধান করিতে হইবে।

রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাতত্ত্বের মূল কথা ছিল স্বাধীনতা ও সংযম—'opportunity for continuous initiative' (Graham Wallas)। আপনা হইতে সর্বদা কিছু সৃষ্টি করিবার উন্মুখতার মধ্যে এই আপাতবিরুদ্ধ স্বাধীনতা ও সংযম রহিয়াছে। এই initiative গৃহীত হইতে পারে freedom এর মধ্যে—'the keynote of modern education is freedom।' শান্তিনিকেতনের শিক্ষাবিধির মধ্যে ছিল এই স্বাধীনতা এবং তারই সঙ্গে ছিল সংযম ; সংযম discipline নহে—সংযম আত্মপ্রতিষ্ঠ, discipline বহিরাগত। আত্মপ্রতিষ্ঠ আত্মস্বীকৃত সংযমকেই রবীন্দ্রনাথ গ্রহণীয় মনে করিতেন। উচ্ছৃঙ্খলতা যেমন স্বাধীনতা নহে, কৃচ্ছ্রসাধনও সংযম নহে, উভয়ই নেতি ধর্মী। শিশু ও বালকের দেহে ও মনে যে উদ্দাম আনন্দ-আবেগ ক্ষণে ক্ষণে সৃষ্ট হয়, তাহাকে কবি উচ্ছৃঙ্খলতা বলিয়া অভিহিত করিয়া কঠোর শাসন প্রবর্তন করিতে চাহিতেন না। ছাত্রদের boistsrousnessকে তিনি সহ্য করিতে পারিতেন, তাঁহার অসহ্য হইত তাহাদের নীচতা, অশুচিতা। তাঁহার শিক্ষাদর্শে স্বাধীনতার মধ্যে সংযম, আনন্দের মধ্যেও সংযম, জীবনের প্রতি কর্মে, ভাবনায় সংযম, অর্থাৎ কোনো বিষয়ে মাত্রা জ্ঞান হারাইলে ছন্দ ভঙ্গ হয়। কবির কাছে সৌসম্য বা সুষমাই সৌন্দর্য তথা পরিপূর্ণ জীবনবেদ।

এই সৌসম্য সংগীতেই পরিপূর্ণরূপে প্রকাশ লাভ করে। সেইজন্য রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শে music বা সংগীতের স্থান এত বড়ো। Walter Pater যথার্থই বলিয়াছিলেন, 'Art struggles after the law of music. এই পূর্ণপ্রজ্ঞ শিক্ষা বা জীবনের সর্বোদয়ের জন্য সংগীত জীবনে একান্ত প্রয়োজনীয় এবং তজ্জন্য রবীন্দ্রনাথ শিক্ষা হইতে সংস্কৃতিকে ও বিশেষভাবে সংগীতকে বাদ দিতে পারেন নাই।

কবি একস্থলে বলিয়াছেন, "ভারতবর্ষে যখন তার নিজের সংস্কৃতি ছিল পরিপূর্ণ, তখন ধনলাঘবকে সে ভয় করত না, লজ্জা করত না, কেননা তার প্রধান লক্ষ্য ছিল অন্তরের দিকে।... তারই এক সীমানায় বৈষয়িক শিক্ষাকে স্থান দেওয়া চাই, কেননা মানুষের সত্তা ব্যবহারিক পারমার্থিকে মিলিয়ে।... কৃতিত্ব শিক্ষা [Manual Training] অত্যাবশ্যক হলেও এই যে যথেষ্ট নয় সে-কথা মানতে হবে। ..চিত্তের ঐশ্বর্যকে অবজ্ঞা করে আমরা জীবনযাত্রার সিদ্ধিলাভকেই একমাত্র প্রাধান্য দিয়েছি। কিন্তু সংস্কৃতিকে বাদ দিয়ে এই সিদ্ধিলাভ কি কখনো যথার্থভাবে সম্পূর্ণ হতে পারে।"

এক্ষণে দেখা যাক্ কবি কিভাবে তাঁহার শিক্ষাদর্শকে রূপায়িত করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন। এলমহার্স্ট শ্রীনিকেতনে তাঁহার কার্যকালের প্রথম দিকে পার্শ্বস্থ গ্রামঅঞ্চলে Home project বা গৃহশিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। স্থানীয় পাঠশালাসমূহের শিক্ষক ও ছাত্রদের মারফত পল্লীবাসীর উপযোগী গৃহশিক্ষার আদর্শ প্রচার করিয়া দুইবৎসর পর স্থির হইল যে, একটি স্থায়ী শিক্ষাসত্র দরিদ্র ও অনাথ বালকদের জন্য স্থাপন করিতে পারিলে সেখানে শিক্ষার নূতন পরীক্ষা হইতে পারে। এই নূতন বিদ্যালয়ের শিক্ষাবিধি সম্বন্ধে প্রথম খসড়া করিলেন এলমহার্স্ট। দীর্ঘকাল আমেরিকায় বাস ও শিক্ষালাভ করিয়া এলমহার্স্ট তদ্দেশীয় শিক্ষাশাস্ত্রীদের পদ্ধতি সম্বন্ধে ভালোরূপে ওয়াকিবহাল হইয়াছিলেন। তারপর রবীন্দ্রনাথের সহিত পরিচয়ের পর হইতে তাঁহার শিক্ষাদর্শ ও গ্রামউন্নয়ন সম্বন্ধে তাঁহার ভাবনাগুলি ক্রমশই দানা বাঁধিতে আরম্ভ করে। গত দুই বৎসর শ্রীনিকেতনের চতুর্পার্শ্বস্থ গ্রামের সমস্যা সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়া তিনি কবির পরিকল্পিত 'শিক্ষাসত্রে'র জন্য শিক্ষাবিধি লিপিবদ্ধ করিয়া দিলেন। রবীন্দ্রনাথের ন্যায় idealist ও practical লোকের অনুপ্রেরণায় ও এলমহার্স্টের ন্যায় parctical-

'idealist-এর সংযোগে শিক্ষাসত্রর খসড়া প্রস্তুত হইল। এলমহার্স্টের প্রবন্ধের নাম ছিল Siksa-Satra, a Home for orphans.[১]

এলমহার্স্ট ১৯২৪এর মার্চ মাসে রবীন্দ্রনাথের সেক্রেটারিরূপে চীনযাত্রা করেন, তাহার পূর্বেই শিক্ষাসত্র সম্বন্ধে তাঁহার প্রবন্ধটি লিখিয়া গিয়াছিলেন। এলমহার্স্টের সহিত দীর্ঘ আলোচনা করিয়া ও গ্রামের শিক্ষাসমস্যার সম্মুখীন হইয়া কবি ভাবিতেছেন সর্বসাধারণের শিক্ষাদানের যথোপযুক্ত পরিবেশ এই শ্রেণীর বিদ্যালয়েই সম্ভব। ইংরেজি স্কুল, কলেজ প্রভৃতি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান মুষ্টিমেয় বিশিষ্টদের জন্য। কবির মন ক্রমশই বিশেষ হইতে সাধারণের মধ্যে যাইবার জন্য ব্যাকুল হইতেছে। সোভিএট রাশিয়া ভ্রমণের পর এইসব ভাবনা আরও স্পষ্ট হয়। কিন্তু কোনো ভাবনাই দীর্ঘকাল তাঁহাকে বাঁধিয়া রাখিতে পারিত না, এ ভাবনারাজিকেও অতিক্রম করিয়া তিনি চলিয়া যান।

যাহা হউক, এই পরীক্ষা-পাশ-নিরপেক্ষ তথাকথিত সর্বাঙ্গীণ শিক্ষাদানের জন্য ১৯২৪ সালের জুলাই মাসে শান্তিনিকেতনের উপকণ্ঠে 'শিক্ষাসত্র' নামে প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইল। শ্রীনিকেতনের গ্রামোন্নয়ন পরিকল্পনার সঙ্গে এই শিক্ষাসত্রর আদর্শ অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত। কবি ভালো করিয়া জানিতেন যে গ্রামবাসীদের স্বাস্থ্যহীনতাজাত দুর্বলতার অবশ্যম্ভাবী পরিণাম আত্মশক্তির প্রতি অবিশ্বাস, পরস্পরের প্রতি অশ্রদ্ধা, মনের অসাড়তা। ইহারই সহিত দারিদ্র্য ও অশিক্ষা জড়াইয়া আছে; কবির মতে সকলগুলিকে যুগপৎ আক্রমণে নির্মূল না করিলে গ্রামকে ধ্বংস হইতে বাঁচানো যাইবে না। তাই গ্রামের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ কল্পনা লইয়া শ্রীনিকেতনের কর্মীরা গ্রামউদ্যোগ কর্মে ব্রতী হন। কিন্তু পথ সম্বন্ধে কোনো স্পষ্ট ধারণা তখনো কাহারো ছিল না। শিক্ষাসত্রের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে এলমহার্স্ট তাঁহার প্রবন্ধের একস্থানে লিখিতেছেন: "The aim of the Siksa Satra is ··to provide the utmost liberty within surroundings that are filled with creative possibilities, with opportunities for the joy of play that is work,—the work of exploration, and of work that is play,—the reaching of a succession of novel experiences; to give the child that freedom of growth which the young tree demands for its tender shoot, that field for self-expression in which all young life finds both training and happiness". (p 24) এই উক্তি জন্ ডিউই-এর বাণী, রবীন্দ্রনাথেরই

আমাদের মতে বুনিয়াদি শিক্ষার ইহাই সর্বপ্রথম খসড়া। ইহার মূল কথা "প্রথম হইতেই শিশু কারুশিল্প ও গৃহশিল্পে শিক্ষানবীসরূপে শিক্ষাসত্রে প্রবেশ করিবে। শিল্পশালায় সে শিক্ষিত উৎপাদক ও সম্ভাব্য স্রষ্টারূপে দক্ষতা অর্জন এবং নিজের হাত দুটির স্বাধীনতা লাভ করিবে; আবার, যে বাসগৃহ ও তাহার আসবাব প্রস্তুত করিতে ও তাহার ঘরকন্না চালাইতে সে সাহায্য করিবে, তাহার অধিবাসীরূপে সে চিত্তের প্রসার এবং শিক্ষাসত্ররূপ ক্ষুদ্র পুরীর পৌরজনের অধিকার অর্জন করিবে।"[২]

ডক্টর প্রেমচাঁদ লাল[৩] তাঁহার *Reconstruction and Education in Rural India* (Allen 1932) গ্রন্থে শিক্ষাসত্রর গোড়ার ইতিহাস বর্ণনা করিয়াছেন (পৃ ৯৪-১০৯)। তিনি বলিতেছেন, "Besides the Poet the two

১ Visvabharati Quarterly II, 1924 July. দ্রষ্টব্য V. B. Bulletin No. 9.

২ প্রবাসী ১৩৪৪ জ্যৈষ্ঠ পৃ ৩১২, রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাসত্র।

৩ প্রেমচাঁদ লাল ১৯২২ সালে শ্রীনিকেতনে যোগদান করেন। ১৯২৯এ বিদেশে যান ১৯৩২ অক্টোবর মাসে Doctorate লইয়া ফিরিয়া আসেন। ১৯৩৬ জুলাই মাসে তিনি শ্রীনিকেতন ত্যাগ করেন। দীর্ঘ চৌদ্দ বৎসর তাঁহার সহিত বিশ্বভারতীর যোগ ছিল।

people who were most directly responsible for the starting of this experiment in rural education were Mr. L. K. Elmhirst, the first Director of the institute, and Mr. Santosh Chandra Mazumdar." (p 94).. সন্তোষচন্দ্রকে এই কাজ গ্রহণের ভার দেন কবি। কারণ সন্তোষচন্দ্র ছিলেন 'not only a born teacher, he had love for children.' শিশুদের প্রতি তাঁহার অকৃত্রিম দরদ তাঁহাকে এই কাজের উপযুক্ত করিয়াছিল।

ছয়টি মাত্র বালক লইয়া সন্তোষচন্দ্র শিক্ষাসত্র আরম্ভ করেন। বালকদের রন্ধনাদি গৃহস্থালি হইতে বাগান করা, তাঁতবোনা প্রভৃতি যাবতীয় কাজ করিতে হইত। পড়াশুনা হইতে হাতের কাজ, সুকুমার কলা চর্চা হইতে ঘরদুয়ারের কাজ, নৃত্যগীতাদি হইতে শরীরকে কর্মঠ করিবার শিক্ষা দেওয়া হইত।

সন্তোষচন্দ্র দুই বৎসরের মধ্যে যে-কাজ করিয়া গিয়াছিলেন (জুলাই ১৯২৪ সেপ—১৯২৬), তাহা রবীন্দ্রনাথ ও এলমহার্স্টের যুক্ত পরিকল্পনার আদর্শেই সম্পাদিত হয়। নিষ্ঠার সহিত সন্তোষচন্দ্র কাজ করিয়াছিলেন। তিনি এই সময়ের যে বিস্তারিত প্রতিবেদন (ইংরেজি) লিখিয়া গিয়াছিলেন, তাহা পাঠ করিলে বুনিয়াদি শিক্ষারত শিক্ষকদের কাজে লাগিবে কারণ ভারতীয় সমাজের সমস্যা সর্বত্রই প্রায় সমান।

সন্তোষচন্দ্র শিক্ষাসত্রে দুই বৎসর পরীক্ষার পর লিখিয়াছিলেন, ছাত্রদের প্রাণশক্তি উজ্জীবিত করাই ছিল আমাদের প্রথম কাজ। "Physical vitality was our first concern. The gain of the boys in height, weight and strength has been very remarkable ..The boys have made considerable progress in gardening, weaving and construction ; they cut and sew, and make their own garments, their own tables and boxes, can cook well, as well as paint, write a neat hand in Benagli, recite poems, know addition, subtraction, multiplication and division, not mechanically but in relation to life situations. They have began to feel in their own little way that the individual's effort is not purely individual but invariably has social reactions. They are realising the value of mutual aid and have acquired the social habits of kindliness and brotherliness."[১]

কবির আদর্শ ছিল শিক্ষাসত্রে ছাত্ররা যে সর্বাঙ্গীণ শিক্ষা পাইবে, তাহার দ্বারা তাহারা যে কেবল আপনাদের জীবিকা অর্জন করিবে তাহা নহে, তাহারা গ্রামে গিয়া গ্রামের উন্নতি করিতে পারিবে, তাহারা হইবে Village Leaders.[২]

১৯২৬ অক্টোবরে সন্তোষচন্দ্রের অকাল মৃত্যুর পর শিক্ষাসত্রের ভার অর্পিত হয় আরিয়ামের উপর। আরিয়াম তখন শিশুবিভাগের অধ্যক্ষ। অতঃপর ১৯২৭ সালের জুলাই মাসে শিক্ষাসত্র শ্রীনিকেতনে স্থানান্তরিত হয়। শান্তিনিকেতন হইতে উহা কেন সরাইয়া লওয়া হইল—তাহা ভাবিবার বিষয়। শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের ছাত্ররা ধনী বা উচ্চ মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে; তাহারা সকলেই প্রচুর অর্থ ব্যয় করিয়া থাকে, উদ্দেশ্য ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করা। তাহাদের পক্ষে রন্ধনকরা, জলতোলা, বাগানকরা, হাটবাজার করা সম্ভব নহে। শিক্ষাসত্রের ছাত্ররা দরিদ্রঘরের ছেলে—

১ Manuscript Typed copy হইতে উদ্ধৃত।

২ Our educational work at Sriniketan, Krishnaprasanna Mukherji M. A. Ph. D., V. B. News 1938 Feb. 60-62

পরীক্ষা পাশ করার কথা তাহাদের মনে আসে না। "'Leaving by doing' had been more of a theory at Santiniketan ; it was going to be an actuality with those children". (p 95) P. C. Lal.

শ্রীনিকেতনে প্রেমচাঁদ লাল এই নূতন প্রতিষ্ঠানের ভার গ্রহণ করিলেন। নূতন পরিবেশে শিক্ষাসত্রে নূতন জীবন দেখা দিল। সৎপথে থাকিয়া জীবিকা অর্জনের শিক্ষা লাভ করিতে হইলে হস্তশিল্প আয়ত্ত করার প্রয়োজন,—সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি শুরু হইতেই দেওয়া হইল। ১৯২৭ সালের বিশ্বভারতীর বার্ষিক প্রতিবেদনে আছে—"While great stress is laid upon manual work by which they *learn to earn an honest livelihood* ; in fact, the children take as much interest in reading writing etc., as in other activities. Great care is taken to present everything before them in the form of concrete projects".

বয়নশিক্ষা, সবজি উৎপাদনের জন্য বাগান করা প্রভৃতি নানা প্রকার হাতের কাজের সঙ্গে পড়াশুনা চলিত। বাগান করার মধ্য দিয়া উদ্ভিদতত্ত্ব ও রসায়ন শাস্ত্রর আলোচনা চলে। ছাত্রদের নিজেদের কাজ নিজেদের করিতে হয় ; এমনকি পালাক্রমে রন্ধনাদির কাজও। বাগানের জন্য জলতোলা প্রভৃতি পরিশ্রমের কাজ বাদ যায় না। মোটকথা সাধারণ ঘরের সাধারণ ছেলেকে সর্ব বিষয়ে স্বাবলম্বী করিবার জন্য প্রথম হইতেই প্রয়াস দেখা দিয়াছিল। আপনাদের ব্যয়ের কতখানি উঠাইতে পারে, তাহার দিকে দৃষ্টিও দেওয়া হয় ; তবে সম্পূর্ণরূপে অর্থ উপার্জন দ্বারা প্রতিষ্ঠান পরিচালনার পরিকল্পনা কোনো সময়ে ছিল না। বিদ্যালয়কে সকল প্রকার আর্থিক-সহায়-নিরপেক্ষ প্রতিষ্ঠান করা যে দুঃসাধ্য, দীর্ঘকাল বিদ্যায়তন চালাইয়া রবীন্দ্রনাথ তাহার অসম্ভাব্যতা ভালো করিয়া জানিতেন ও সেজন্য শিক্ষাসত্রে সে চেষ্টা কখনও করেন নাই।

'শিক্ষাসত্র' প্রবন্ধ হইতে নিম্নে যে কয়টি পঙ্‌ক্তি উদ্ধৃত হইতেছে, তাহা গান্ধীজির বুনিয়াদি শিক্ষার আদর্শের সহিত বিশেষভাবে তুলনীয়। "It is only through the fullest development of all his capacities that man is likely to achieve his real freedom" মানুষের সকল বৃত্তির পরিপূর্ণ বিকাশ হইলে সে তাহার যথার্থ স্বাধীনতা পায়। সর্বাঙ্গীণ বিকাশ হইলেই জীবনযাত্রার সমস্যাজনিত উদ্বেগ থাকিবে না। "He must be so equipped as no longer to be anxious about his own self-preservation". গান্ধীজি বলিয়াছিলেন তাঁহার শিক্ষা 'insurance against unemployment'—উভয় আদর্শের মধ্যে পার্থক্য কমই।[১]

রবীন্দ্রনাথের ও এলমহার্স্টের প্রবন্ধদ্বয় পাঠ করিলে পাঠক দেখিবেন দশ বৎসর পর মহাত্মাজি যে বুনিয়াদি শিক্ষার কথা বলেন, তাহার অনেকখানিই শান্তিনিকেতনে ও শ্রীনিকেতনে আরম্ভ হইয়াছিল। সমসাময়িক প্রবাসী (১৩৪৪ কার্তিক পৃ ১৬৬) বরধা শিক্ষাপ্রণালী বা বুনিয়াদি শিক্ষা সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে লিখিয়াছিলেন—'এই প্রণালীটির দুটি দিক আছে। একটি শিক্ষাতত্ত্বের অন্যটি অর্থনীতির দিক। শিক্ষাতত্ত্বের সহিত যে দিকটির সম্বন্ধ, তাহা মূলতঃ ও সারতঃ ষোল বৎসর পূর্বে শান্তিনিকেতনে প্রতিষ্ঠিত (এক্ষণে শ্রীনিকেতনে স্থানান্তরিত) 'শিক্ষাসত্র' নামক বিদ্যালয়ে অনুসৃত প্রণালীর মত।…যাঁহারা বরধা প্রণালীর আলোচনা করিবেন, তাঁহাদের 'শিক্ষাসত্রে'র প্রণালীটিও দেখা উচিত।"

রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শনের মধ্যে মানুষের জীবনকে তাহার জীবিকার থেকে বড়ো করিয়া দেখা হয় নাই। তাই বলিয়া জীবিকার সমস্যাকেও শিক্ষাদর্শ থেকে বাদ দিয়া কোনো তুরীয় আদর্শবাদের দোহাই তিনি পাড়েন নাই। জীবনের

১ শান্তিদেব ঘোষ লিখিত 'রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাসত্র ও মহাত্মাজির বুনিয়াদি শিক্ষা' প্রবন্ধ হইতে অনেক সহায়তা পাইয়াছি। দেশ পত্রিকা ১৩৫৭ বৈশাখ ২৩ পৃ ৩০-৩৫।

আনন্দ, স্বজনপ্রীতি, ক্রীড়াকৌতুক, এমন কি অপব্যয়কেও তিনি শিক্ষা হইতে নির্বাসিত করেন নাই। নীতি ব্যতীত জীবন আদর্শে পৌঁছাইতে পারে না, যদি পৌঁছানো বলিয়া কোনো কিছু থাকে; কিন্তু নীতির থেকে বড়ো কথা ধর্ম; রবীন্দ্রনাথ 'মানুষের ধর্ম'কেই মানিয়াছিলেন। তাই তাঁহার শিক্ষাদর্শে জীবনের শাশ্বত ধর্ম এত বড়ো স্থান পাইয়াছে। বিচিত্র মানুষের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে বিবিধভাবে রূপায়িত হইবার সুযোগ দানই শিক্ষার উদ্দেশ্য; বিশেষ-মতকেন্দ্রিক সাফল্যে উত্তীর্ণ হইবার আদর্শ শিক্ষিত ও শিক্ষকের পক্ষে গৌরবের নহে।

মহাত্মাজি জীবনকে পবিত্র বলিয়া শ্রদ্ধা করিতেন; তবে দেশের পরিস্থিতিতে জীবন হইতে জীবিকার উপর অধিক মনোযোগ দিয়াছিলেন। কোটি কোটি নিরক্ষর শিশুর শিক্ষাসমস্যা অচিরকালের মধ্যে তাহাদের জীবনে দেখা দিবে জীবিকার সমস্যারূপে। কিভাবে সেই সমস্যার আশু প্রতীকার করা যায়, তাহাই ছিল মহাত্মাজির শিক্ষা-জিজ্ঞাসা।

রবীন্দ্রনাথের আদর্শে জীবিকা হইতে জীবন মহাত্মাজির আদর্শে জীবন হইতে জীবিকা প্রাধান্য পাইয়াছিল। দুইজনের দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে আপাতদৃষ্টিতে পার্থক্য থাকিলেও উভয়ের উদ্দেশ্যের মধ্যে পার্থক্য হয়তো দুরপনেয় নহে। ভবিষ্যতের শিক্ষাবিধি এই দুই ধারার যুক্তবন্ধনে নূতনরূপে দেখা দিতে পারে।

হিন্দীভবন ১৯৩৮

নবশিক্ষাসংঘের সদস্যগণ ও লর্ড লোথিয়ান প্রভৃতি অতিথিরা জানুয়ারি মাসের (১৯৩৮) গোড়াতেই চলিয়া গিয়াছেন। কবির বিচিত্র কাজ চলিতেছে যথাপূর্ব; শরীরে ভাঙন ধরিয়াছে—তবুও মনের জোরে সব কিছু করিতে চান। জানুয়ারির মাঝামাঝি (১৬ই) সময়ে শান্তিনিকেতনে হিন্দীভবনের ভিত্তিস্থাপন অনুষ্ঠান; কবি সভায় উপস্থিত হইতে পারিলেন না। এনড্রুস সাহেব তাঁহার স্থলে পৌরোহিত্য করিলেন। সভায় এনড্রুস বলিলেন, "If our Gurudeva's health had been such as to enable him to perform such a duty, the place I now occupy would then have been filled by him."[১]

এই ভাষণে এনড্রুস ভারতের ধনীদের নিকট একটি বিশেষ আবেদন করেন। তিনি বলেন, অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে যেমন পারসিক, সংস্কৃত, ভারতীয় তত্ত্বজ্ঞান প্রভৃতি বিষয় অধ্যাপনার জন্য ব্যবস্থা হইয়াছে (Chair), বিশ্বভারতীতে হিন্দির জন্য তদ্রূপ 'চেয়ার' হওয়া বাঞ্ছনীয়। "May there not be some generous hearted giver...who can realise the necessity for a Chair of Hindi literature at Santiniketan". এনড্রুসের মৃত্যুর প্রায় পনেরো বৎসর পর পণ্ডিত জবহরলাল নেহেরুর আবেদন প্রকাশিত হইলে বল্লভদাস আগরবাল হিন্দী অধ্যাপকের পদ সৃষ্টির জন্য অর্থ দান করিলেন (১৯৫৩)।

হিন্দীভবনের ভিত্তিস্থাপন প্রতিষ্ঠার ইতিহাস বলিবার পূর্বে শান্তিনিকেতনে দীর্ঘকাল ধরিয়া যে হিন্দির চর্চা হইতেছে, তাহার কথা বলা অপ্রাসঙ্গিক হইবে বলিয়া মনে হয় না। রাজনৈতিক কারণহেতু আজ ভারতে হিন্দিকে রাষ্ট্রভাষা রূপে আবশ্যিক করিবার জন্য চেষ্টা চলিতেছে; কিন্তু এইসব আন্দোলনের বহু বৎসর পূর্বে সাংস্কৃতিক দিক হইতে হিন্দীচর্চার যে সবিশেষ প্রয়োজন আছে, একথা রবীন্দ্রনাথ স্বীকার করিয়াছিলেন।

১ C. F. Andrews, The Hindi-Bhavana at Santiniketan. Modern Review 1938 Feb. p 127-29. এতদ্‌সম্পর্কে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের 'The Bhavanas of Visvabharati' শীর্ষক সম্পাদকীয় মন্তব্য স্মরণীয়। তিনি বলেন যে প্রত্যেক অ-বাঙালী বিদ্যার্থীর পক্ষে বাংলা শিক্ষা আবশ্যিক হওয়া উচিত (পৃ ২২৯)।

এখন (১৯৫৮) হইতে প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্বে ক্ষিতিমোহন সেন ব্রহ্মচর্যাশ্রমের অধ্যাপকরূপে আসিয়াছিলেন।[১] ক্ষিতিমোহন কাশীতে মানুষ। সেখানকার সংস্কৃত কলেজের এম. এ. পাশ। কিন্তু অল্প বয়স হইতে উত্তর ভারতের সাধু ও সন্তদের বাণী সংগ্রহ ও সাধনতত্ত্ব বুঝিবার আগ্রহে তিনি বহু তীর্থস্থান ও সাধুদের আখড়ায় ঘুরিয়া বেড়ান। শান্তিনিকেতনে আসিলে অল্পকালের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার এই বিদ্যার সন্ধান পান। এতদ্‌সম্পর্কে ক্ষিতিমোহন লিখিতেছেন, "তখন তিনি [রবীন্দ্রনাথ] ক্রমাগত আমাকে এইসব বিষয়ে লিখিবার জন্য তাগিদ দিতে লাগিলেন।... রবীন্দ্রনাথের কাছে অশেষ উৎসাহ ও সহায়তা পাইয়াছি।...তিনি বিশ্বভারতীতে এই কাজের অবসরও রচনা করিয়া দিয়াছেন। [মধ্য] যুগের সাধকদের গম্ভীর বাণীর রসসম্ভোগে রসানুভব-নিপুণ তাঁহার যে সশ্রদ্ধ প্রতিভা দেখিয়াছি এমন আর কাহারও দেখি নাই।"[২]

ভারতীয় সন্তদের সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখিতেছেন, "ভারতের এই আন্তরিক সাধনার ধারাবাহিক রূপ যদি আমরা স্পষ্ট ক'রে দেখতে পেতুম তাহলে ভারতের প্রাণবান্ ইতিহাস যে কোন্‌খানে তা আমাদের গোচর হতে পারত।... সুহৃদ্বর ক্ষিতিমোহন [ভারতীয় মধ্যযুগে সাধনার ধারা] গ্রন্থে ভারতবর্ষের সুদীর্ঘ কালের সেই চিত্তপ্রবাহের পথটিকে তার ভিন্ন ভিন্ন শাখায় প্রশাখায় অনুসরণ ক'রে এসেছেন।"[৩]

শান্তিনিকেতনে আসিবার কয়েক বৎসরের মধ্যে কবির আগ্রহে ক্ষিতিমোহন কবীরের দোহা প্রভৃতির মূল ও বঙ্গানুবাদ চারি খণ্ডে প্রকাশ করেন (ইণ্ডিয়া প্রেস)। এই গ্রন্থ হইতে একশতটি দোহা One Hundred Poems of Kabir নামে রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক সম্পাদিত হয়; ইংরেজি হইতে য়ুরোপের প্রায় সকল ভাষাতেই এই গ্রন্থের তর্জমা হইয়া যায়। এই গ্রন্থ সম্বন্ধে আমরা ইতিপূর্বে আলোচনা করিয়াছি।

বাংলায় হিন্দীসাহিত্য সম্পদ সরবরাহের কাজে আধুনিক যুগে ক্ষিতিমোহন পথিকৃৎ। তাঁহার যৌবনের এই প্রথম সাহিত্যিক প্রচেষ্টা সমালোচনার উর্ধ্বে হয় নাই সত্য, কিন্তু একথা স্বীকার করিতেই হইবে যে বাঙালী পাঠক গভীর শ্রদ্ধার সহিত এই তর্জমা পাঠ করিয়াছে। তদবধি ক্ষিতিমোহন মধ্যযুগীয় সন্তদের সম্বন্ধে অসংখ্য প্রবন্ধ ও 'দাদূ' নামে বিরাট গ্রন্থ বাংলায় লিখিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ 'দাদূ'র ভূমিকায় লিখিয়াছিলেন, "ক্ষিতিবাবুর কল্যাণে ক্রমে হিন্দুস্থানের আরো কোনো কোনো সাধক কবির সঙ্গে আমার কিছু কিছু পরিচয় হল। আজ আমার সন্দেহ নেই যে, হিন্দী ভাষায় একদা যে গীত-সাহিত্যের আবির্ভাব হয়েচে তার গলায় অমর সভার বরমাল্য। অনাদরের আড়ালে আজ তার অনেকটা আচ্ছন্ন; উদ্ধার করা চাই, আর এমন ব্যবস্থা হওয়া চাই যাতে ভারতবর্ষের যারা হিন্দী ভাষা জানে না তারাও যেন এই চিরকালের সাহিত্যে আপন উত্তরাধিকার-গৌরব ভোগ করতে পারে।" রবীন্দ্রনাথ তাঁহার কয়েকটি রচনাতেই ক্ষিতিমোহনের নিকট তাঁহার ঋণ[৪] স্বীকার করিয়াছেন। উত্তরাপথের সন্তদের[৫] কথা ও বাংলাদেশের বাউল প্রভৃতি ব্রাত্যদের বাণীর সন্ধান তিনি পান ক্ষিতিমোহনের নিকট হইতে। কবির দাদূ সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখিবার তেরো বৎসর পর শান্তিনিকেতনে হিন্দীভাষা ও সাহিত্য আলোচনার কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হইল।

১ দ্র বিশ্বভারতীর প্রথম কুল-স্থবির, যুগান্তর ১৯৫২ জুন ৮। সুশীল রায়, মনীষী জীবনকথা ১ম খণ্ড।

২ ভারতীয় মধ্যযুগে সাধনার ধারা, পৌষপূর্ণিমা ১৩৩৬ সাল।

৩ ১২ই পৌষ, ১৩৩৬ সাল, শান্তিনিকেতন, ভূমিকা, ভারতীয় মধ্যযুগে সাধনার ধারা, (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দের 'অধর মুখার্জি' লেক্‌চর ক্ষিতিমোহন সেন কর্তৃক প্রদত্ত হয়) ১৯৩০।

৪ পরশুরাম চতুর্বেদী হিন্দির নামকরা লেখক; তিনি তাঁহার 'উত্তরী ভারত কী সংত-সম্প্রদায়' গ্রন্থে দাদূ পংথ আলোচনাকালে ক্ষিতিমোহনের গ্রন্থের উল্লেখ বহুবার করিয়াছেন (পৃ ৪১১)। বহু সম্মেলনে ক্ষিতিমোহন সম্মানিত হইয়াছেন। তিনি রাষ্ট্রভাষা প্রচার সমিতি, ওয়ার্ধা হইতে ১৯৫১ সালে 'মহাত্মা গান্ধী' পুরস্কার লাভ করেন। মুরারকা পারিতোষিক—হিন্দিসাহিত্য সম্মেলন, প্রয়াগ ১৯৫৩ জুলাই।

৫ *Toward the Rising Sun* by William Gayley Simpson with a Biographical sketch by Jerome Davies—The Vanguard Press, New York 1935. [Bill Simpson] "had a long talk with the poet Tagore, and for four days at the

শান্তিনিকেতনে হিন্দীভবন স্থাপনের প্রথম প্রয়াস হয় ১৯৩৪-৩৫ সালে; পণ্ডিত বানারসীদাস চতুর্বেদী[১] ও সীতারাম সাকসেরিয়া এ বিষয়ে উদ্যোক্তা হন। সীতারামজি কবিকে এই কার্য আরম্ভের জন্য ৫০০ টাকা দেন ও সেই হইতে দীনবন্ধু এনড্রুসও হিন্দীভবন প্রতিষ্ঠার জন্য অর্থ সংগ্রহে মন দিলেন; কিন্তু প্রথম দিকে অর্থ সংগ্রহ ব্যাপারে বিশেষ সাফল্য লাভ হয় নাই। অতঃপর তাঁহার চেষ্টায় রামদেব চোখানী প্রমুখ মারোয়াড়বাসীরা জোড়াসাঁকোয় কবির সহিত সাক্ষাৎ করিয়া হিন্দীভবন প্রতিষ্ঠার জন্য সচেষ্ট হইবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিয়া গেলেন। আপনাদের মধ্যে অর্থ সংগ্রহ করিয়া তাঁহারা বিশ্বভারতীকে অর্থ সাহায্য করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে বিশ্বেশ্বরলাল মতিলাল হলবাসিয়া ট্রাস্টের রিসীভার ভাগীরথ কানোড়িয়া উক্ত ট্রাস্ট হইতে ১৬,০০০ টাকা দিবার ব্যবস্থা করায় 'হিন্দীভবনে'র গৃহ নির্মাণ করা সম্ভব হইল।

বিশ্বেশ্বরলাল হলবাসিয়া ও তাঁহার ভ্রাতা মতিলাল হলবাসিয়া সুদূর পঞ্জাবে হিসার জিলা হইতে বাংলাদেশে আসেন ও আপনাদের প্রতিভাবলে কারবার করিয়া বিরাট ধনের অধীশ্বর হন। কিন্তু সে ধন তাঁহারা কেবলমাত্র ব্যক্তিগত বা পরিবারগত ব্যবহারে নিঃশেষিত করেন নাই, সৎকর্মের জন্য বহু লক্ষ টাকা দান করিয়া গেলেন। কনিষ্ঠ মতিলালের মৃত্যু পূর্বেই হয়; ১৯২৫ সালে উইল করিবার পর বিশ্বেশ্বরলালেরও মৃত্যু হয়। তাহার পর দীর্ঘকাল সম্পত্তি লইয়া পোষ্যপুত্রদের সহিত ট্রাস্টিদের মামলা চলে। ১৯৩৪ সালে ভাগীরথ কানোড়িয়া ইহার রিসীভার নিযুক্ত হইলে তাঁহার মধ্যস্থতায় হলবাসিয়া ট্রাস্টের টাকা বিশ্বভারতী পাইয়াছিল—কেবল গৃহনির্মাণের জন্য নহে, এই ভবনের বাৎসরিক ব্যয় নির্বাহের অর্থ বহু বৎসর ঐ তহবিল হইতে আসে।[২]

হলবাসিয়া ট্রাস্ট ছাড়া বহু মারবাড়ী ধনিক বিশ্বভারতী হিন্দীভবনের জন্য অর্থদান করিয়াছিলেন। এই অর্থসংগ্রহ ব্যাপারে এনড্রুসের প্রধান সহায় হইয়াছিলেন শান্তিনিকেতনের হিন্দীসাহিত্যের অধ্যাপক হাজারিপ্রসাদ দ্বিবেদী। প্রত্যক্ষভাবে এই প্রতিষ্ঠানকে সর্বদিক হইতে গড়িয়া তুলিবার কৃতিত্ব তাঁহারই।

প্রায় বিশবৎসর পূর্বে হাজারিপ্রসাদ শান্তিনিকেতনের পাঠভবনে সংস্কৃত ও হিন্দি শিক্ষা দিবার জন্য নিযুক্ত হন। কাশী হইতে আশা দেবী সুপারিশ করিয়া ইঁহাকে পাঠাইয়াছিলেন। কাশী হিন্দুবিশ্ববিদ্যালয় হইতে হাজারিপ্রসাদ সংস্কৃত শাস্ত্রাদি ও বিশেষভাবে জ্যোতিষ অধ্যয়ন করিয়া আই. এ. পাশ করেন। শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের সংস্পর্শ

feet of Kshiti Mohan Sen, one of those great souls who sometimes hide themselves in a mantle of obscurity, who opened to him the treasure of Kabir and the songs of the other Sufi-like mystics who succeeded him, as probably no one else in the world could have done. Contact with this man, whose sprit is all light, helped to precipitate in Bill a spiritual crisis the exaltation of which brought him to a heightened and deepened realization of that which, more than her rivers or mountains, more than her temples or greatmen, India is—the realization that every man's Guru is within himself....And this, accordingly, after taking four days to make sure, he finally did, his soul singing the while, 'Thy Guru is within thee', and his spirit dancing in joy to the music of it. And in making this decision he always has felt that he did right." (p 22-23)

১ বানারসী দাস শান্তিনিকেতনে দীর্ঘকাল ছিলেন। প্রবাসী ভারতীয়দের সমস্যা আলোচনায় ইনি এনড্রুসের সহায়তা করিতেন। 'ভারতীয় হৃদয়' নাম লইয়া তিনি প্রবাসী ভারতবাসীদের সম্বন্ধে একখানি গ্রন্থ হিন্দিতে লিখিয়াছিলেন। মিস্ মার্জোরি সাইক্স এনড্রুসের যে জীবনী ইংরেজিতে লিখিয়াছেন তাহাও ইঁহার সহায়তায়।

২ Rai Bahadur Bissessurlal Motilal Halwasiya Trust: Report and Accounts for the two years ended 31st March 1949 & 1950 and also for the year ended 31st March 1951. Published 1953. হিন্দীভবন সম্বন্ধে এই তথ্যগুলি মোহনলাল বাজপেয়ীর নিকট হইতে পাই।

ও বিশ্বভারতীর অনুকূল পরিবেশ তাঁহার সুপ্ত প্রতিভাকে উদ্দীপ্ত করে। শান্তিনিকেতনে অধ্যাপনা করিয়াও তিনি বহু গ্রন্থ লিখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন; হিন্দীসমাজে আজ তিনি সুপ্রতিষ্ঠিত; রবীন্দ্রনাথের বহু প্রবন্ধ ও গল্পের তিনি হিন্দীঅনুবাদক।[১]

নৃত্যনাট্য চণ্ডালিকা

রবীন্দ্রনাথ হিন্দীভবন-প্রতিষ্ঠা সভায় আসিতে পারিলেন না বটে, কিন্তু ঘরে বসিয়া অনেকগুলি ফরমাইশী কাজ করিতেছেন। হিন্দীভবন-প্রতিষ্ঠার দিনে (১৩৪৪ মাঘ ২) তাঁহাকে একটি কবিতা লিখিতে দেখি; সেইটি সম্পূর্ণ সামাজিক কর্তব্য হিসাবে লিখিত বলিয়া মনে হয়। সম্প্রতি সিটি কলেজের অধ্যক্ষ হেরম্বচন্দ্র মৈত্রের মৃত্যু হইয়াছে; হেরম্বচন্দ্র ছিলেন সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রাচীনপন্থী নিষ্ঠাবান ব্রাহ্ম, রবীন্দ্রনাথের সহিত তাঁহার তেমন কোনো ঘনিষ্ঠতা ছিল না, মতানৈক্য ছিল বহু বিষয়ে। তাঁহার কন্যা রানী দেবী (নির্মলকুমারী মহলানবীশ) প্রশান্তচন্দ্রের স্ত্রী কবির বিশেষ স্নেহের পাত্রী; তাঁহারই সান্ত্বনার জন্য এইটি লিখিত হয় (১৯৩৮ জানুয়ারি ১৬)। ইতিপূর্বে হেরম্বচন্দ্রের জ্যেষ্ঠা কন্যার মৃত্যুর পর (১৯২৬ ডিসেম্বর ২৩) রবীন্দ্রনাথ জীবনীলেখকের মারফতে একখানি পত্র লিখিয়া অধ্যাপককে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন।[২] সেই পত্র অধ্যাপককে গভীর সান্ত্বনা দেয়। এই শ্রেণীর সামাজিক কর্তব্যপালনে রবীন্দ্রনাথের কোনোদিন শৈথিল্য দেখা যায় নাই।

আমাদের আলোচ্যপর্বে ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মৃত্যু হয় (১৩৪৪ মাঘ ২)। তখন তাঁহার বয়স মাত্র ৬২ বৎসর; দেশবাসী এই ঘটনার জন্য প্রস্তুত ছিল না। রবীন্দ্রনাথ এই সংবাদ পাইয়া চারিটি পঙ্‌ক্তিতে তাঁহার বেদনা প্রকাশ করিলেন:

যাহার অমর স্থান প্রেমের আসনে, দেশের মাটির থেকে নিল যারে হরি',
ক্ষতি তার ক্ষতি নয় মৃত্যুর শাসনে, দেশের হৃদয় তারে রাখিয়াছে ধরি।[৩]

সামাজিক শিষ্টতা ও কর্তব্যপালনের জন্য যাহাই করুন না কেন, আসলে রবীন্দ্রনাথের কবিমানস আছে অন্য লোকে। "আজ আমার মন যে ঋতুকে আশ্রয় করে আছে, সে দক্ষিণ হাওয়ার ঋতু, অন্তরের দিকে তার প্রবাহ, কিছুকালের জন্যে ফুল ফুটিয়ে ফুল ঝরিয়ে দেবে দৌড়। সেই মাতালটা বড়ো হাটের জন্যে ফসল-ফলানো কেয়ার করে না। কিছুদিন থেকে সমস্ত চণ্ডালিকাকে গানময় করে তুলতে ব্যস্ত আছি। খ্যাতির দিক থেকে এর দাম নেই বললেই হয়।...অথচ দিনরাত্রি এত পরিপূর্ণ হয়ে আছে আমার মন যে, সমস্ত সামাজিক কর্তব্য তুচ্ছ ব'লে মনে হয়। অর্থাৎ আছি আমি অজন্তা-গুহায়—তার বাইরের সংসারটা সম্পূর্ণ মুলতবি বিভাগে রয়ে গেছে।" পত্রখানি কবি লেখেন অমিয় চক্রবর্তীকে ৭ মাঘ।[৪]

১ হিন্দীভাষা ও সাহিত্যে হাজারিপ্রসাদের পাণ্ডিত্যের জন্য লখনৌ বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৫০ সালে তাঁহাকে সম্মানার্হ 'ডক্টর' উপাধি দান করেন। অতঃপর ১৯৫০ সালে কাশী বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে হিন্দী ভাষার অধ্যাপক (প্রোফেসার) নিযুক্ত করিলে তিনি শান্তিনিকেতন ত্যাগ করিয়া যান।

২ এই কন্যার সহিত স্যর নীলরতন সরকারের ভ্রাতুষ্পুত্র ডাক্তার জ্যোতিঃপ্রকাশ সরকারের বিবাহ হয়। জ্যোতিঃপ্রকাশ বিশিষ্ট রবীন্দ্রভক্ত ও বিশ্বভারতীর সুহৃৎ। ইনি বসুবিজ্ঞানমন্দিরের সহিত যুক্ত। দ্র কবিকথা পৃ ১২৬-২৮।

৩ শরৎপরিচয় পৃ ৬৬।

৪ প্রবাসী ১৩৪৪ ফাল্গুন, পত্র ২১ জানুয়ারি ১৯৩৮ [১৩৪৪ মাঘ ৭], দ্র র-র ২৫ পৃ ৪২৯।

মাঘ মাসের মাঝামাঝি সময়ের মধ্যে বোধ হয় নৃত্যনাট্য চণ্ডালিকার প্রথম খসড়া শেষ হয়। তারপর আরম্ভ হয় অভিনয়ের জন্য মহড়া, তখন রদবদল চলে নানাভাবে। সে সম্বন্ধে আমরা আলোচনা করিব পরে।

আমাদের এই আলোচ্যপর্বে রবীন্দ্রনাথের তত্ত্বাবধানে একখানি বাংলা কাব্যসঞ্চয়ন সম্পাদিত ও তাঁহার নিজ গীতবিতানের নূতন সংস্করণ প্রকাশিত হইতেছে। বাংলা কাব্য-পরিচয় সম্পাদন করিতে গিয়া কবিকে এইবার বহু কাব্য ও 'অনেক ইংরেজি কাব্যসংকলন' পড়িতে হইতেছে। কাব্যসঞ্চয়ন সম্পাদনে তাঁহার প্রধান সহায় ছিলেন কাননবিহারী মুখোপাধ্যায় (শান্তিনিকেতনে ১৯৩৭-১৯৩৮ জুলাই)। কাননবিহারী যেসব কাব্য কবির গোচর করিতেন, তাহা হইতেই প্রধানত বাছাই চলিত। কবি আজকাল বাংলাসাহিত্যের বিরাট গতির সর্বধারার সহিত সম্যক্ পরিচিত নহেন—বয়সের জন্যও বটে, সময়ের অভাবেও বটে। সেইজন্য গ্রন্থখানি প্রকাশিত হইলে (১৩৪৫ শ্রাবণ) সমাদৃত হয় নাই। কবি 'নিবেদনে' নিজেই বলিয়াছিলেন, "অনেক কবিতা চোখে পড়েনি। অনেক নির্বাচন যোগ্যতর হতে পারত। যে সংকলনে রচয়িতারা স্বয়ং তৃপ্ত হননি তাঁদের নির্দেশ পালন করলে হয়তো তা সন্তোষজনক হবার সম্ভাবনা থাকত।" কাব্যসংকলন হিসাবে গ্রন্থখানি সন্তোষজনক না হইলেও বাংলাসাহিত্য সম্পদ্‌বান হইল ইহার ভূমিকা হইতে; প্রত্যেক সাহিত্যিকের এইটি অবশ্যপাঠ্য বলিয়া মনে করি। দীর্ঘ ভূমিকা হইতে কয়েকটি পঙ্‌ক্তি উদ্ধৃত হইল: "যাঁরা বাংলা কাব্যসাহিত্যের ইতিহাস অনুসরণ করেছেন তাঁরা নিঃসন্দেহ একটা কথা লক্ষ্য করে থাকবেন যে, এই সাহিত্য দুই ভাগে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। এর দুই ধারা দুই উৎস থেকে নিঃসৃত। আধুনিক বাংলা কবিতার উৎপত্তি য়ুরোপীয় সাহিত্যের অনুপ্রেরণায় তাতে সন্দেহ নেই। এই নিয়ে অপবাদ দেওয়া হয় যে, এসব জিনিস ন্যাশন্যাল নয়। তার মানে যদি এই হয় যে এসব কাব্য স্বভাবতই বাঙালি জাতির রুচিবিরুদ্ধ, তাহলে তো এ জমিতে স্বতই উঠত না এর অঙ্কুর, উঠলেও শিকড়সুদ্ধ দুদিনে যেত শুকিয়ে, বলা বাহুল্য তার কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না।...ন্যাশন্যাল কুলশীলের দোহাই দিয়ে সেকালের পাঁচালি কবিতার যতই গুণকীর্তন করি না কেন কোনো দেশাত্মবোধী সব ছাড়িয়ে বিশেষভাবে এই পাঁচালিই ন্যাশন্যাল বিদ্যালয়ে চালাবার হুকুম করেন না। নদীর স্রোত আপনার পথ আপনিই কেটে নেয়, রাজকীয় বিভাগের খাল কাটা পথ তার পথ নয়। আধুনিক কাব্য আপন বেগেই দেশের চিত্তে আপনার পথ গভীর ও প্রশস্ত করে নিচ্ছে।..." (গ্রন্থ প্রকাশিত ১৩৪৫ শ্রাবণ)

ইহার সঙ্গে চলিতেছে গীতবিতানের নূতন সংস্করণ প্রকাশনের কাজ। কবি ভূমিকায় লিখিয়াছেন, "গীতবিতান যখন প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল তখন সংকলনকর্তারা সত্বরতার তাড়নায় গানগুলির মধ্যে বিষয়ানুক্রমিক শৃঙ্খলা বিধান করতে পারেন নি; তাতে যে কেবল ব্যবহারের পক্ষে বিঘ্ন হয়েছিল তা নয়, সাহিত্যের দিক থেকে রসবোধেরও ক্ষতি করেছিল। সেইজন্যে এই সংস্করণে ভাবের অনুষঙ্গ রক্ষা করে গানগুলো সাজানো হয়েছে। এই উপায়ে সুরের সহযোগিতা না পেলেও, পাঠকেরা গীতিকাব্যরূপে এই গানগুলির অনুসরণ করতে পারবেন।" এই বিষয়ে প্রত্যক্ষদর্শী ও সম্পাদনকর্মের অন্যতম সহায়ক সুধীরচন্দ্র কর তাঁহার 'কবিকথা' গ্রন্থে (পৃ ৫৬) লিখিতেছেন, "গানগুলোর বিষয় ভাগ করা এবং বিষয়ানুসারে অনুবিভাগ করা নিয়ে বারবার-দু-হাজার গানের খুঁটিনাটি বিচার করে কত রকম ঢালাই-সাজাই করে দেখা,—এতে যে কী পরিশ্রম! দিনের পর দিন সকালবেলায় বাঁধা সময় করে সব ঝক্কিটা একরকম তিনি নিজেই পুইয়ে গেলেন।" কবি একপত্রে তাঁহাকে লিখিয়াছিলেন, "অন্য সকল বইয়ের মধ্যে 'গীতবিতানে'র দিকেই আমার মনটা সবচেয়ে বেশি তাড়া লাগাচ্ছে—নতুন ধারায় ও একটা নতুন সৃষ্টিরূপেই প্রকাশ পাবে।"[১]

১ কালিম্পং ২৩ বৈশাখ ১৩৪৫, দ্র কবিকথা পৃ ৫৫।

কবি কিভাবে তাঁহার দেড় হাজার গান বিষয়ানুক্রমিক সাজাইয়াছিলেন, তাহা গীতবিতান হইতে নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি। পূজা, পরিণয়, স্বদেশ, প্রেম, প্রকৃতি, বিচিত্র, আনুষ্ঠানিক এইগুলি হইতেছে প্রথম বিভাগ। ইহার প্রত্যেকটি পুনরায় বিভক্ত হইয়াছে।[১]

গীতবিতানের এই নূতন সংস্করণ দুই খণ্ডে মুদ্রিত হইলে কবিকে মুদ্রিত গ্রন্থ একখণ্ড দেওয়া হয়; কিন্তু উহা প্রকাশিত হয় ১৩৪৮ সালের মাঘ মাসে, অর্থাৎ কবির মৃত্যুর ছয় মাস পরে।[২]

কবি শান্তিনিকেতনে থাকিলে অতিথি অভ্যাগত প্রায়ই আসেন। এবার আসিলেন তৎকালীন বাংলাদেশের গভর্নর লর্ড ব্রাবোর্ন ও তাঁহার পত্নী (১৯৩৮ ফেব্রুয়ারি ১৬)। এবার লাটসাহেবের আশ্রমপরিক্রমার মধ্যে বিশেষত্ব ছিল। তিনি সস্ত্রীক সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে সর্বত্র বিচরণ করিলেন, পুলিশ পাহারা থাকিলেও তাহা এমন প্রচ্ছন্ন ছিল যে কাহাকেও তাহা পীড়া দেয় নাই। ব্রাবোর্নের সৌজন্য সকলকে মুগ্ধ করে। অপরাহ্ণে তাঁহারা কবির সহিত চা-পান করিয়া কলিকাতায় ফিরিয়া যান। সেদিন সকলেরই মনে আন্ডারসনের আশ্রমপরিদর্শনের কথা মনে হইয়াছিল। এখন নূতন ভারতশাসনবিধি অনুসারে প্রদেশে স্বায়ত্তশাসন প্রবর্তিত হইয়াছে, প্রদেশের শাসনভার মন্ত্রীমণ্ডলের উপর। গভর্নররা এখন constitutional head—শাসনদায়িত্ব মন্ত্রীমণ্ডলের।

দেশেবিদেশে শত্রুমিত্র সকলেরই ঔৎসুক্য ভারতে এই নূতন শাসনবিধি কিভাবে চলিতেছে তাহা জানিবার। এই সময়ে কবির ইংরেজ বন্ধুরা এতদ্‌সম্পর্কে তাঁহার মতামত জানিবার জন্য অনুরোধ জ্ঞাপন করেন। কবি ম্যানচেস্টার গার্ডিয়ানের সম্পাদককে এই বিষয় একখানি পত্র লেখেন (১৯৩৮ ফেব্রুয়ারি ২৮)।[৩] রবীন্দ্রনাথ পত্রের প্রথমেই বলিলেন, নিরস্ত্র জাতির পক্ষে আত্মকর্তৃত্ব বা autonomy নিরর্থক। ইংরেজের দূতরা ভারতের স্বাধীনতা দিবার পূর্বে দরকষাকষির সময়েও 'মিলিটারি' ও বৈদেশিকনীতির দপ্তর ভারতীয়দের হাতে ছাড়িয়া দিতে রাজি হন নাই। ১৯৩৫ সালের নূতন আইন প্রণয়ন ও প্রয়োগ কালে এই মনোভাব ছিল আরও স্পষ্ট। কবি লিখিতেছেন, ভারতকে যে-স্বরাজ দেওয়া হইয়াছে তজ্জাতীয় স্বাধীনতার ভ্যাঙচানি যদি কোনো কৃপণ দাতার নিকট হইতে বৃটিশকে নিজের দেশে বসিয়া পাইতে হইত, তবে "I am sure the British would despise themselves।" কবি নূতন শাসনবিধি সম্বন্ধে বলিলেন যে, এই আইন সম্বন্ধে মাথা ঘামানোই সময় নষ্ট মাত্র। ইহা ইংরেজ রাজনৈতিক ও আমলাদের সৃষ্টি; সংকীর্ণ সতর্কতা ও কৃপণ অবিশ্বাসের উপর ইহার প্রতিষ্ঠা। সাম্রাজ্যলাভে ও সাম্রাজ্যলোভে ইংরেজের কী দশা হইয়াছে তাহা তিনি পত্রমধ্যে

১ পূজা [৬২৭]; [গান (৩২); বন্ধু (৫৯); প্রার্থনা (৩১); বিরহ (৪৭); সাধনা ও সংকল্প (১৭); দুঃখ (৪৯), আশ্বাস (১২); অন্তর্মুখে (৬); আত্মবোধন (৫); জাগরণ (২৬); নিঃসংশয় (১০); সাধক (২); উৎসব (৭); আনন্দ (১৫); বিশ্ব (৩৯); বিবিধ (১৪৩); সুন্দর (৩০); বাউল (১২); পথ (২৫); শেষ (৩৪)। পরিণয় ৯।] স্বদেশ [৪৬]; প্রেম [৩৯৫]: [গান (২৭); প্রেম-বৈচিত্র্য (৩৬৮)]; প্রকৃতি [২৮৩], [সাধারণ (৯); গ্রীষ্ম (১৬); বর্ষা (১১৫); শরৎ (৩০); হেমন্ত (৫); শীত (১২); বসন্ত (৯৬)], বিচিত্র [১৩৮]: আনুষ্ঠানিক [৯] পরিশিষ্ট [১] মোট ১৫০০ গান কবি কর্তৃক নির্বাচিত হয়।

২ বর্তমানের চলিত সংস্করণের পুনর্মুদ্রণ আরম্ভ হয় ১৩১২ পৌষ মাস হইতে। এই সংস্করণ সম্পাদন করেন বিশ্বভারতী প্রকাশন বিভাগের কর্মী কানাই সামন্ত। উহা ৩ খণ্ডে বাহির হয়। ১ম খণ্ড ১৩৫১ পৌষ; ২য় খণ্ড ১৩৫৪ আশ্বিন; ৩য় খণ্ড ১৩৫৭ আশ্বিন। অখণ্ড সূচী ১৩৫৭ ফাল্গুন। গীতবিতান ১ম সংস্করণ ১ম ও ২য় ভাগ ১৩৩৮, আশ্বিন ও ৩য় খণ্ড ১৩৩৯ শ্রাবণে প্রকাশিত হয়। ১ম সংস্করণে গানের সংখ্যা ১ম ও ২য়—১১২৮; ৩য়—৩৫৭, মোট ১৪৮৫। পরে নূতন গীতবিতানে কবির যাবতীয় গান সংগৃহীত হইলে (নৃত্যনাট্যাদি সমেত) উহার সংখ্যা হয় দুই হাজারের উপর। সূচীতে অনেক গান একাধিকবার আছে—প্রথম শব্দের পাঠভেদ হেতু।

৩ Manchester Guardian 1988 March 10 also V. B. News 1988 April p 75-76 [১ মার্চ ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয় কবিকে তাঁহার অনুপস্থিতিতেই সম্মানার্থ D. Litt. উপাধি দান করেন।]

বিবৃত করেন। তিনি বলেন, যতদিন ইংরেজ ভারতকে তাহার মুষ্টির মধ্যে রাখিবে, ততদিন আমাদের শ্রদ্ধা বা বন্ধুত্বের আশা করা বৃথা। সাম্রাজ্যের অধিকারে মানুষ হীন হয়, আজ ইংরেজের সেই দশা।

কবির মত…"it is really not worth troubling about as it stands. It was made by politicians and bureaucrats. It therefore embodies all their narrow caution and miserly mistrust." আরও বলেন,—"So long as you hold us in your grip, you can never have either our trust or our friendship…Possession of empire always corrupts and it has corrupted you…You have gained your imperial prestige at too heavy a price.. the burden of surfeited empire has dragged you down to that degree of weakness which makes you too timid to be ready adequately to deal with miscreants…"

য়ুরোপের মহাযুদ্ধের তখনো কোনো কথা শোনা যায় নাই; রবীন্দ্রনাথ এই পত্রে য়ুরোপের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে যাহা বলিলেন তাহা ভবিষ্যৎবাণী: "If you ask my personal opinion, I hardly imagine that the catastrophe can now be avoided, since the only event in which all the powers of Europe are engaged with furious and frenzied zeal, seems to be that of paving the path for mutual annihilation".

ভারতের ভবিষ্যৎ কী তৎসম্বন্ধে বলিলেন, "The future lies in our learning to ally ourselves with those humane forces in the world, wherever found, which are seeking to end altogether the exploitation of man by man, and of nation by nation." আমরা তাহাদের সাথেই মিতালি করিব যাহারা শান্তিকামী, যাহারা মানুষের শোষণনীতির বিরোধী ও কোনো জাতির উপর কোনো জাতির আধিপত্য বিস্তারের বিরুদ্ধবাদী। পরভৃতিক মানুষ বা পরাশ্রয়ী জাতি পৃথিবীতে চিরদিন আধিপত্য করিতে পারিবে না, সে যুগের অবসানে মানবের নূতন সভ্যতা যে আসিতেছে, সে বিষয়ে কবির মন আজ দ্বিধাশূন্য।

১৩৪০ সালে রবীন্দ্রনাথ 'চণ্ডালিকা' নাটিকা লেখেন; তখনো সেটি অভিনয় হয় কলিকাতায়।[১] এবার সেই চণ্ডালিকাকে গানময়, নৃত্যময় করিয়া নূতন রূপ দিলেন। স্থির হইয়াছে কলিকাতার রঙ্গমঞ্চে দোলপূর্ণিমার পর অভিনয় হইবে। দীর্ঘকাল ধরিয়া মহড়া চলিল; মূল আখ্যানের সঙ্গে এবারকার আখ্যানবস্তুর কিছু তফাত হইয়া গিয়াছে। শান্তিদেবের মতে "নাটকীয় সংঘাতকে ফুটিয়ে তোলবার জন্যে এবং রঙ্গমঞ্চের আঙ্গিকে উৎকর্ষ দেবার নিমিত্ত কবি এরূপ করতে বাধ্য হয়েছেন।" অভিনয়ের সময় দীর্ঘ করিবার জন্য অবান্তর ঘটনা, বিবিধ নৃত্যকলা, পুরাতন গান সংযোজন করিতে হইল।

'চণ্ডালিকা'র দুইটি দিক—একটি তাহার সাহিত্যিক বা মনস্তাত্ত্বিক দিক, অপরটি আর্টের। কবি প্রথম যখন এইটি লেখেন, তখন মনস্তত্ত্ব বা প্রকৃতি ও আনন্দের মানসিক সংগ্রাম ছিল রচনার মূলে। এখন সেই মনস্তত্ত্বমূলক কথোপকথনকে নৃত্যনাট্যে রূপায়িত করিতে গিয়া অনেক কিছুই যোজনা করিতে হইল। দুইটি মাত্র চরিত্রকে কেন্দ্র করিয়া এই নাটকের গতি; আর 'একটি মানুষের মানসিক ক্রমবিকাশের পটভূমির উপর তার রচনা।'

সাহিত্যের দিক হইতে ইহার বিচার চলিবে অন্য পরিপ্রেক্ষণী হইতে। "মানুষের মধ্যে যা আদিম আকর্ষণ

১ রবীন্দ্রজীবনী ৩য় খণ্ড পৃ ৩৫।

তারই আবেগ দিয়ে শুরু হয়েছে চণ্ডালিকার নৃত্যকলা। দেহের যে আকর্ষণী মন্ত্র, যা শিবের তপস্যাকেও টলাতে পেরেছিল, প্রকৃতি-পুরুষের অন্তরের সেই চিরন্তন দ্বন্দ্ব পৌঁছল চণ্ডালিকার প্রাণে।...

"প্রথম দৃশ্যে চণ্ডালিকা সাধারণ মেয়েদের দৈনন্দিন কাজের এবং পথের গতানুগতিক স্রোতে গা ভাসিয়ে দিয়েছে। সেখানে তার সখী আছে, মা আছে, কর্ম আছে। সেই পথের জীবনের মধ্যে একদিন তার প্রাণে এসে পৌঁছল কোন্ প্রেমের ডাক, প্রথম সাড়া দিয়ে উঠল তার দেহ, তার কামনা, তারপর অসীম ছন্দের মধ্যে দিয়ে টানা-ছেঁড়ার অপরিমেয় অভিজ্ঞতার সাধনায় তার মন বিকশিত হল প্রেমের গভীর আনন্দে।

"মূল উপাখ্যানের মধ্যে আনন্দ স্বপ্রকাশ নয়, চণ্ডালিকার মুখের বাণী থেকেই তাঁর দ্বন্দ্বের আভাস পাওয়া যায়। কিন্তু নাটকীয় রসকে জমিয়ে তোলবার জন্যে এবং চণ্ডালিকার দুরূহ মানসিক দ্বন্দ্ব থেকে দর্শকের চিত্তকে বিরাম দেবার জন্যে বৌদ্ধভিক্ষু আনন্দের মনোজগতের দ্বন্দ্বকে ছায়ানৃত্যে দেখানো হয়েছে। চণ্ডালিকার মায়াদর্পণে সন্ন্যাসীর যে অন্তর্দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছিল, তারই ছায়া জেগে উঠল দর্শকের চোখে।

"আনন্দের যে-দ্বন্দ্ব সে চণ্ডালিকার চেয়ে কিছু কম নয়। একদিকে তার সুগভীর জ্ঞানের সাধনা, আর একদিকে তার দেহের কামনা; এই বস্তুজগতের আকর্ষণ জ্ঞানীকেও টেনে আনলে মাটির পৃথিবীতে, কিন্তু অবশেষে মানুষই জিতল। জীবধর্মের আদিমতাকে ছাপিয়ে উঠল তার আত্মার শক্তি।

"এই-যে প্রকৃতি-পুরুষের স্বভাবের মধ্যে মূলগত বিরুদ্ধতা, চণ্ডালিকার সাহিত্য ও নৃত্যনাট্য সেই মানসিক জটিলতাকে সুর ও তালের ছন্দে প্রকাশ করতে চেয়েছে।"...[১]

চণ্ডালিকার মূল নাটিকা ছিল গদ্যে—নৃত্যনাট্যরূপে সবই হইল গান। এই গানের ভাষা গদ্যছন্দে কবিতার আকারে লেখা,—কোনো কোনো স্থলে নিছক গদ্য—পঙ্‌ক্তিতে পঙ্‌ক্তিতে ভাগ করা মাত্র। দুইখানি বই-এর দুইটি অংশ নিয়ে তুলনার জন্য উদ্ধৃত হইল: চণ্ডালিকায় আছে—

"সেদিন রাজবাড়িতে বাজল বেলা দুপুরের ঘণ্টা, ঝাঁ ঝাঁ করছে রোদ্দুর। মা-মরা বাছুরটাকে নাওয়াচ্ছিলুম কুয়োর জলে। কখন্ সামনে দাঁড়ালেন বৌদ্ধ ভিক্ষু, পীতবসন তাঁর। বললেন, জল দাও। প্রাণটা উঠল চমকে, শিউরে উঠে প্রণাম করলেম দূর থেকে।...সমস্ত শ্রাবস্তীনগরে আর কি কোথাও জল ছিল না মা? এলেন কেন এই কুয়োরই ধারে? এ'কেই তো বলি নতুন জন্মের পালা। আমাকে দান করতে এলেন মানুষের তৃষ্ণা মেটাবার শিরোপা।" এই অংশগুলিই 'নৃত্যনাট্য চণ্ডালিকা'য় এইভাবে গানের মতো করিয়া লেখা:

এ নতুন জন্ম, নতুন জন্ম
নতুন জন্ম আমার।
সেদিন বাজল দুপুরের ঘণ্টা,
ঝাঁ ঝাঁ করে রোদ্দুর,
স্নান করাতেছিলেম কুয়োতলায়
মা-মরা বাছুরটিকে।
সামনে এসে দাঁড়ালেন
বৌদ্ধভিক্ষু আমার—

বললেন, জল দাও, জল দাও, জল দাও।
শিউরে উঠল দেহ আমার,
চমকে উঠল প্রাণ।
বল্ দেখি মা,
সারা নগরে কি কোথাও নেই জল!
কেন এলেন আমার কুয়োর ধারে,
আমাকে দিলেন সহসা
মানুষের তৃষ্ণা-মেটানো সম্মান।

১ প্রতিমা দেবী কর্তৃক লিখিত ও রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক অনুমোদিত 'চণ্ডালিকা' প্রবন্ধ হইতে গৃহীত, প্রবাসী ১৩৪৫ আশ্বিন।

গদ্যকে গানে পরিণত করা যায় কিনা এ প্রশ্ন বহুকালের। আট বৎসর পূর্বে রানী দেবী (মহলানবীশ)কে এক পত্রে লেখেন, 'কখনো কখনো গদ্য রচনায় সুর সংযোগ করবার ইচ্ছা হয়। লিপিকা কি গানে গাওয়া যায় না ভাবছ।' (পথে ও পথের প্রান্তে, পত্র ৩৯)। লিপিকার কোনো লেখায় সুর দেওয়া হয় বলিয়া জানা নাই; তবে 'শাপমোচনে'র বিভিন্ন অভিনয়ে একটি স্থলে সুর দেওয়া যে হয়, তাহার কথা পূর্বেই আমরা বলিয়াছি। এবার সমগ্র নৃত্যনাট্য চণ্ডালিকার 'গদ্য এবং পদ্য অংশে সুর দেওয়া হয়েছে।' সমগ্র নাটিকার গদ্য অংশে সুর দিয়া গানে পরিণত করিবার চেষ্টা যে সফল হইয়াছে, তাহা চণ্ডালিকার অভিনয় দেখিলেই বুঝা যায়।[১]

দোলপূর্ণিমার দিন শান্তিনিকেতনে যথাবিধি বসন্তোৎসব উদ্‌যাপিত হইল।[২] পরদিন চণ্ডালিকার অভিনয়কারীর দল কলিকাতায় চলিয়া গেল। 'ছায়া' প্রেক্ষাগৃহে অভিনয়।[৩]

রবীন্দ্রনাথের শরীর জীর্ণ, তিনি যে কলিকাতায় যান এ-ইচ্ছা কাহারও নয়। ইন্দিরা দেবীকে লিখিতেছেন ২ চৈত্র, "আমার পথ রোধ করেছে ডাক্তারের দল, যে কারণ দেখিয়ে সেটা সম্পূর্ণ আজগবি।...আসল কথা তারা কিছুই জানে না কি জন্যে আমার অকস্মাৎ এই ব্যাধির উপসর্গ—চিকিৎসা বিদ্যার মানরক্ষার জন্যে যা তা এমন একটা হেতু খাড়া করলে যার স্বপক্ষে বিপক্ষে কোনো প্রমাণই নেই—একমাত্র প্রমাণ নামজাদা ডাক্তারদের নাম।... কিন্তু মূঢ়ের মতো বিশ্বাস করতে পারি নি। মোট কথা, কলকাতায় যাব না।" এইটি লিখিলেন দোলপূর্ণিমার দিন—১৬ মার্চ। আত্মীয় ও সেবকদের সন্দেহ—কবি তাঁহার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতে পারিবেন না।

অভিনয়ের প্রথম রজনীতে নবনির্বাচিত (১৯৩৮ ফেব্রুয়ারি) কন্‌গ্রেস প্রেসিডেণ্ট সুভাষচন্দ্র বসু উপস্থিত ছিলেন। ১৯ মার্চ সন্ধ্যায় কবি কলিকাতায় আসিলেন—শেষ পর্যন্ত কাহারও কথা শুনিলেন না, নিজের সাহিত্যসৃষ্টিকে চোখে দেখিতে চান। পরদিন সন্ধ্যায় 'ছায়া'য় উপস্থিত হইয়া অভিনয় দেখিলেন।

কলিকাতায় দিন সাত থাকিলেন; মাঝে একদিন (১৯৩৮ মার্চ ২২) গান্ধীজির সহিত সাক্ষাৎ করেন। গত বৎসর হইতে বাংলার রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তির জন্য গান্ধীজি যে চেষ্টা করিতেছিলেন, সেই সম্পর্কেই কবি তাঁহার সহিত দেখা করেন।[৪] কবি শান্তিনিকেতনে ফিরিলেন ২৬ মার্চ। একমাস পরে ২৫ এপ্রিল কালিম্পং যাত্রা করেন। পূর্বেই বলিয়াছি কবি এই সময়ে 'গীতবিতান' সম্পাদনে ব্যস্ত। তবে মাঝে মাঝে বাহিরের ফরমাইশে ভাষণ, বাণী, কবিতা লিখিতে হয়।[৫] রবীন্দ্রনাথের স্বভাবের এই একটি দিক; সে সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা প্রয়োজন।

১ কানাই সামন্ত গীতবিতান-এর (নূতন সং) গ্রন্থপরিচয় অংশে কবির এই গদ্যগানের সুর সংযোগের দীর্ঘকালের ইতিহাস দিয়াছেন (গীতবিতান পৃ ১০১৬-১৮)। অধ্যাপক বুদ্ধদেব বসুও 'রবীন্দ্রনাথের গদ্য গান' সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন (গীতবিতান-বার্ষিকী ১৩৫০ পৃ ৭৪-৭৮)।

২ কয়েকদিন পূর্বে অনুষ্ঠিত গ্রন্থাগারের প্রাঙ্গণে চণ্ডালিকার অভিনয় দেখে বোঝা গেল ওর নাটকীয় নিবিড়তা অনেকখানি নষ্ট হয়েছে। বাহুল্য নাচ গান বর্জন করা দরকার বোধ হোলো· সেগুলি স্বতন্ত্রভাবে যতই ভালো হোক সমগ্রভাবে বাধাজনক। এ সম্বন্ধে তোমার সঙ্গে আলাপ করব।" চিঠিপত্র ৩য়, পত্র ৫৬, ১৯৩৮ মার্চ ৫।

৩ ১৯৩৮ মার্চ ১৮, ১৯, ২০। ১৩৪৪ চৈত্র ৪, ৫, ৬।

৪ "In the middle of March [1938], Gandhi left for Calcutta to negotiate for further release of political prisoners—the task he had undertaken in November last. It proved very strenous and on March 24, before leaving for Orissa, he made an appeal to workers and the public to be patient while negotiations were going on." —Mahatmaji Vol. IV. p 282.

৫ ১৩৪৪ চৈত্র ২৭ (১৯৩৮ এপ্রিল ১০) সাময়িক ম বর্ষ ৩৮শ সংখ্যা ১৩৪৫ বৈশাখ ৩১—১৯৩৮ মে ১৪, সম্পাদক শ্রীসুধাংশু মোহন চৌধুরী। এই সাপ্তাহিক পত্রিকার জন্য নিম্নলিখিত কয়েকটি পঙ্‌ক্তি লিখিয়া দেন:

সাময়িক কলরোলে আনো শান্তি শাশ্বত সুরের,
সময়ের সীমা ছাড়ি দৃষ্টি তব হোক্ সুদূরের।
বিশ্বের গভীর মর্মে উৎসারিত মৃত্যুঞ্জয়ী বাণী
সেথা হতে অন্তরের অক্লান্তের মন্ত্র দেহ আনি।

কবিরা কবিতা লিখিয়া আত্মপ্রকাশ করেন, তাঁহাদের আনন্দ এই প্রকাশেই। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ কবি ও রূপদক্ষ; তিনি তাঁহার মানস সৃষ্টিকে চাক্ষুষ করিতে চান। এই স্বভাব আবাল্যের। নাটক, গীতিনাট্য, নৃত্যনাট্য লিখিয়া নিবৃত্ত হইতে পারেন নাই, সেগুলিকে অভিনেয় করিয়াছেন, স্বয়ং বহুক্ষেত্রে অভিনয়ে অংশ লইয়াছেন।

শিল্পীর মন চায়, যে আনন্দ তিনি তাঁহার গানে ও নাটকে প্রকাশ করিয়াছেন, আর-সকলেও সেই আনন্দের অংশ গ্রহণ করুক। সৃষ্টির পূর্ণতা ইহাতেই। রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনের ছাত্রছাত্রীদের লইয়া এই প্রেরণা হইতে নৃত্যগীত, অভিনয় করিতেন ও দেশে দেশে তাহাদের লইয়া ঘুরিতেন। বৃদ্ধবয়সে যখন তাঁহার বিশ্রামের বিশেষ প্রয়োজন, সে সময়েও তিনি স্থির থাকিতে পারিতেন না। এবারও অন্তরের সেই তাগিদেই কোনো বাধা না মানিয়া কলিকাতায় যান।[১]

কালিম্পং—মংপু

এবার গ্রীষ্মকালে কবি কালিম্পং যাইবেন। নববর্ষের উপাসনার পর আম্রকুঞ্জে তাঁহার জন্মোৎসব হইল। মন্দিরের ভাষণে আমরা 'নববর্ষ' উৎসব কেন পালন করি সে সম্বন্ধে যাহা বলেন, তাহা হইতে কয়েক পঙ্ক্তি উদ্ধৃত হইল: "আমাদের যে সংকল্প ব্যবহারের দ্বারা ক্লান্ত হয়ে পড়ে, আমাদের যে-বিশ্বাসের ধারা কর্মকে বেগ জোগায় তা যখন দৈনিক অন্ধ অভ্যাসের বাধায় স্রোত হারিয়ে ফেলে, তখন এই সকল জরার তামসিকতা সরিয়ে দিয়ে সত্যের প্রথমতম নবীনতার সঙ্গে নূতন পরিচয়ের প্রয়োজন হয়, নইলে জীবনের উপর কেবলি ম্লানতার স্তর বিস্তীর্ণ হতে থাকে। আমাদের কর্মসাধনার অন্তর্নিহিত সত্যের ধূলিমুক্ত উজ্জ্বল রূপ দেখবার জন্যে আমরা বৎসরে বৎসরে এই আশ্রমে নববর্ষের উৎসব করে থাকি। যে উৎসাহের উৎস আমাদের উদ্যমের মূলে তার গতিপথে কালের আবর্জনা যা কিছু জমে ওঠে এই উপলক্ষ্যে তাকে সরিয়ে দিতে চেষ্টা করি।"[২]

নববর্ষের দিনে কবির মন আন্তর্জাতিক ঘনায়মান জটিলতার জন্য অত্যন্ত ভারাক্রান্ত। সময়টা (১৯৩৮ এপ্রিল) দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের উদ্যোগপর্ব; হিট্‌লার ও মুসোলিনীর ঔদ্ধত্য ও অত্যাচার শমিত করিবার জন্য চলিতেছে তোষণ নীতি। সেইদিন অমিয় চক্রবর্তীকে লিখিতেছেন, "আমার জীবনের শেষ পর্বে মানুষের ইতিহাসে এ কী মহামারীর বিভীষিকা দেখতে দেখতে প্রবল দ্রুত গতিতে সংক্রামিত হয়ে চলেছে, দেখে মন বীভৎসতায় অভিভূত হোলো। একদিকে কী অমানুষিক স্পর্ধা, আর একদিকে কী অমানুষিক কাপুরুষতা। মনুষ্যত্বের দোহাই দেবার কোনো বড়ো আদালত কোথাও দেখতে পাইনে।...পৃথিবীর তিন মহাদেশে—এই বিশ্বব্যাপী আশঙ্কার মধ্যে আমরা আছি ক্লীব নিষ্ক্রিয়ভাবে দৈবের দিকে তাকিয়ে—এমন অপমান আর কিছু হতে পারে না—মনুষ্যত্বের এই দারুণ ধিক্কারের মধ্যে আমি পড়লুম আজ ৭৮ বছরের জন্মবৎসরে।[৩]

১ এ বিষয়ে শান্তিদেব ঘোষ তাঁহার 'রবীন্দ্রসংগীত' গ্রন্থে মনোজ্ঞ আলোচনা করিয়াছেন। (পৃ ১৪-১৬) 'ছায়া'র অভিনয়ের পর শান্তিনিকেতনের ছাত্রছাত্রীরা কালীমোহন ঘোষ ও সুরেন্দ্রনাথ করের নেতৃত্বে পূর্ববঙ্গে 'চিত্রাঙ্গদা' অভিনয়ের জন্য বাহির হন। খুলনা, চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, সিলেট, মৈমনসিংহ ও শিলঙে অভিনয় করিয়া প্রায় একমাস কাল পরে তাঁহারা ফেরেন।

২ নববর্ষ, প্রবাসী ১৩৪৫ জ্যৈষ্ঠ পৃ ১৭৬।

৩ দ্র কবিতা, ১৩৫০ আশ্বিন। তু প্রান্তিক (১৭ সংখ্যক)।

শান্তিনিকেতনের বিদ্যালয় বন্ধ হইবার (১৯৩৮ এপ্রিল ১০) কয়েক দিন পূর্বে কবি কালিম্পং যাত্রা করিলেন (২৪ এপ্রিল), সঙ্গে কবির সেক্রেটারি অধ্যাপক অনিলকুমার চন্দ।[১] রথীন্দ্রনাথরা পূর্বদিন যাত্রা করিয়া যান। কালিম্পং নূতন জায়গা ; পূর্বাহ্নে সেখানে ব্যবস্থা করিবার প্রয়োজন। শিলিগুড়ি হইতে ৫০ মাইল মোটরের পথ। কবির থাকিবার জন্য গৌরীপুরের জমিদার ব্রজেন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী তাঁহার গৌরীপুর লজ ছাড়িয়া দেন। বাড়িখানি প্রকাণ্ড, চারিদিকে বিস্তৃত বনভূমি, বারান্দা হইতে হিমালয়ের তুষার শৃঙ্গ চোখে পড়ে। জায়গাটি কবির খুব পছন্দ হইয়াছে। দার্জিলিঙের মতো বৃষ্টি এখানে নাই, আলমোড়ার ন্যায় শুকনো স্থানও এটি নয়। সর্বোপরি লোকের ভিড় কম—পথ দুর্গম বলিয়া ভ্রমণবিলাসীদের যাতায়াত সহজ নহে। এই স্থানটি ডাক্তার গ্রেহামের অনাথাশ্রমের জন্য (St. Andrews' Colonial House) বিখ্যাত। গ্রেহাম বৃদ্ধ, প্রায় কবির বয়সী ; পাঁচ মাইল দূরে তাঁহার শিক্ষা-আয়তন। সেখান হইতে ঘোড়ায় চড়িয়া তিনি কবির সহিত দেখা করিতে আসিলেন।[২] তত্ত্বদর্শী হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এইখানে আসিয়াছিলেন, তিনি প্রায়ই কবির সহিত দেখা করিতে আসেন ; তাঁহার সহিত কথাবার্তা কহিতে কবির খুব ভালো লাগে।

কালিম্পং ক্ষুদ্র শহর। অধিবাসীরা রবীন্দ্রনাথকে সংবর্ধনা করিবার জন্য ১ মে গৌরীপুর লজে সমবেত হয়। কয়েকদিন পরেই কবির জন্মদিন ; সকলেই ভাবিয়াছিলেন আলমোড়ার গত বৎসরের ন্যায় এবারও শান্তভাবে দিনটি এখানে উদ্‌যাপিত হইবে। কিন্তু তাহা হইল না। অল্-ইন্ডিয়া-রেডিয়োর কলিকাতা শাখার অধ্যক্ষ নিরঞ্জন মজুমদার মহাশয় কালিম্পঙে আসিয়া পঁচিশে বৈশাখ কবিকে কিছু আবৃত্তি করিবার জন্য বিশেষ অনুরোধ জ্ঞাপন করিয়া যান। যথানির্দিষ্ট দিনে ও সময়ে 'জন্মদিন' কবিতাটি (সেঁজুতি) কালিম্পং হইতে টেলিফোনযোগে, কলিকাতার ব্রডকাস্টিং স্টেশনে প্রেরিত হইলে কবির কণ্ঠ সর্বত্র প্রচারিত হইল। 'জন্মদিন' কবিতাটি কাব্যের ও তত্ত্বের দিক হইতে অনবদ্য—সমস্ত জীবনের অভিজ্ঞতা ও বেদনা হইতে উৎসরিত। নববর্ষের দিন মন্দিরে যে কথা বলিয়াছিলেন তাহার ধ্বনি পাই এই কবিতার মধ্যে—মৃত্যুদূতের ইঙ্গিতে অন্তরে যে সাড়া পড়িয়াছিল, এ যেন তাহারই কথা ; আর ইহাতে ব্যক্ত হইয়াছে বিশ্বমানবের দুঃখে উদ্‌গীত রুদ্ধকণ্ঠের বাণী।[৩]

শুনি তাই আজি
মানুষ-জন্তুর হুহুংকার দিকে দিকে উঠে বাজি।
তবু যেন হেসে যাই যেমন হেসেছি বারে বারে
পণ্ডিতের মূঢ়তায়, ধনীর দৈন্যের অত্যাচারে,
সজ্জিতের রূপের বিদ্রূপে। মানুষের দেবতারে
ব্যঙ্গ করে যে অপদেবতা বর্বর মুখবিকারে
তারে হাস্য হেনে যাব, বলে যাব, 'এ প্রহসনের
মধ্যঅঙ্কে অকস্মাৎ হবে লোপ দুষ্ট স্বপনের ;

১ জন্মোৎসব ১৪ এপ্রিল ১৯৩৮। দ্র Visvabharati News 1938 May p 42.

২ A letter from Kalimpong by A. K. C. Visvabharati News 1938 June p 91-93.

৩ প্রবাসী ১৩৪৫ জ্যৈষ্ঠ পৃ ৮৭-৮৮ ; কবিতাটি জন্মদিনের পূর্বেই রচিত। "এই কবিতাটি শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় গত ২৫শে বৈশাখ তাঁহার জন্মবাসর উপলক্ষ্যে রেডিয়োতে পাঠ করিয়াছিলেন। আমরা তাহার কিছুদিন পূর্বে প্রবাসীতে মুদ্রণের জন্য কবিতাটি তাঁহার নিকট হইতে পাইয়াছি। রেডিয়োতে পঠিত হইবার পর কবিতাটি অসম্পূর্ণ ভাবে কোনো কোনো সংবাদপত্রে মুদ্রিত হইয়াছে। এক্ষণে কবিকর্তৃক সংশোধিত ও পরিবর্তিত হইয়া সম্পূর্ণ কবিতাটি প্রবাসীতে মুদ্রিত হইল।"—প্রবাসী। ১৩৪৫ জ্যৈষ্ঠ পৃ ১২৮। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ প্রবাসী-সম্পাদককে এই পত্রখানি লেখেন [১৩৪৫ বৈশাখ ২৭] : "সম্প্রতি আমার নববর্ষের বাচন ও জন্মদিনের কবিতা নিয়ে যে অন্যায় হয়ে গেছে সেটা আমার অজ্ঞাত ও অপ্রত্যাশিত। যখনি আমার নজরে পড়ল আমি অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়েছিলুম কিন্তু আকস্মিক দুর্যোগের ত্রুটি সংশোধনের সময় থাকে না। কবিতাটি অল্প পরিমাণে সংশোধিত হয়ে প্রবাসীতে গেছে—সেইটিকেই আমার অনুমোদিত পাঠ বলে গণ্য করবেন। এই সকল কারণেই মাঝে মাঝে আমার খ্যাতি নিয়ে আন্দোলনের উত্তাল তরঙ্গমালা দেখলে আমি নিরতিশয় কুণ্ঠা বোধ করি।" পত্রখানি প্রবাসী প্রাপ্ত হন ১২ মে বা ২৯ বৈশাখ। দ্র প্রবাসী ১৩৪৫ জ্যৈষ্ঠ পৃ ৩১৬।

নাট্যের কবররূপে বাকি শুধু রবে ভস্মরাশি
দগ্ধশেষ মশালের, আর অদৃষ্টের অট্টহাসি।'
বলে যাব, 'দ্যূতচ্ছলে দানবের মূঢ় অপব্যয়
গ্রন্থিতে পারে না কভু ইতিবৃত্তে শাশ্বত অধ্যায়।'[১]

যে মহাযুদ্ধ এখনো আরম্ভ হয় নাই, অথচ সকলেই জানেন অনিবার্য, সেই যুদ্ধের পরিণাম কী, তাহা কবি যেন দেখিতে পাইতেছেন।

আসলে জন্মদিনে যে কবিতাটি লেখেন (১৩৪৫ বৈশাখ ২৫) সেটি 'উদ্বোধন' নামে নবজাতকের অন্তর্গত হইয়াছে। এই কবিতাটির শেষ স্তবক বাদ দিয়া ও ভিতরের ভাষার সামান্য বদল করিয়া 'গীতবিতান'-এর নূতন সংস্করণে প্রয়োজিত হয় ভূমিকারূপে।[২]

কালিম্পঙে বাসকালে চারু বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত 'রবিরশ্মি' (১ম খণ্ড) প্রকাশিত হইয়া বোধ হয় পঁচিশে বৈশাখ কবির হস্তগত হইল।[৩] বইখানি উলটাইয়া পালটাইয়া স্থানে স্থানে পড়িয়া কবির মনে যে সমালোচনার উদয় হয়, তাহা ৩০ বৈশাখ (১৩৪৫) চারুবাবুকে এক পত্রে ব্যক্ত করেন।

কবি লিখিতেছেন, "নিজের অন্তরের জিনিসকে বাহিরের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণের মধ্যে দেখতে অদ্ভুত লাগে। তখন সেটাকে পরিচিতের দৃষ্টি থেকে দেখিনে, দেখি কৌতূহলের দৃষ্টিতে।" কবি পুরাতন রচনা সম্বন্ধে অত্যন্ত critical; তাই বলিতেছেন, "স্বয়ং বিধাতা তাঁর সেকালের সৃষ্টিতে লজ্জিত, নইলে আজ মানুষ জন্মাত না, সংকোচে তিনি আদি জীবসৃষ্টির চিহ্ন চাপা দিয়েছেন মাটির নিচে। আমার কাব্যেরও সেই দশা।"

কাব্য সমালোচনা সম্বন্ধে কবি বলিতেছেন, "তুমি আমার প্রত্যেক কবিতাটি নিয়ে ব্যাখ্যা করে চলেছ, তাতে আমি গৌরব বোধ করি। কিন্তু একটা কথা এই মনে হয়, কাব্যরস আস্বাদনে পাঠকদের অত্যন্ত বেশি যত্নে পথ দেখিয়ে চলা স্বাস্থ্যকর নয়। নিজে নিজে সন্ধান করা ও আবিষ্কার করায় সত্যকার আনন্দ। তা ছাড়া কাব্যের কেবল একটা মাত্র বাঁধা মানে না থাকতে পারে—তার আসনে এতটা স্থিতিস্থাপকতা থাকে যাতে ভিন্ন আয়তনের মানুষকে সে তার আপন আপন বিশেষ স্থান দিতে পারে।...নিজের রুচি ও শিক্ষা অনুসারে কেউ যে কাব্য বিচার করবে না তা নয়। কিন্তু তাতে অনেকখানি ফাঁক থাকা চাই, নিরেট ঠাসা গাইড্‌বুক সাবালক ভ্রমণকারীর স্বাধীন চেষ্টাকে প্রতিহত করে। উত্তরে বলতে পারো, সংসারে নাবালকের সংখ্যা বিস্তর—আমি বলি ওপথে তাদের না চলতে দেওয়াই ভালো।"[৪]

১ "ক্যান্টন শহরে সম্প্রতি [জাপানীদের] পৈশাচিকতা আগেকার সীমাকেও অতিক্রম করিয়াছে। ব্রিটেন ও ফ্রান্স ইহার প্রতিবাদ করিয়াছেন। কিন্তু বহুবিলম্বিত ও মৌখিক এই প্রতিবাদে কি হইবে? যখন দৃঢ়তা অবলম্বন করিলে জাপানকে নিবৃত্ত হইতে হইত, তখন কিছু না করিয়া এখন মৌখিক প্রতিবাদ বৃথা।"—বিবিধ প্রসঙ্গ, প্রবাসী ১৩৪৫ আষাঢ় পৃ ৪৫৪, 'জাপানীদের দ্বারা চৈনিক নারীদের পৈশাচিক অপমান' শীর্ষক প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য।

২ এ বিষয়ে রবীন্দ্ররচনাবলী ২৪ খণ্ড গ্রন্থপরিচয় পৃ ৪৬৬ দ্রষ্টব্য। "কবিতাটির আরম্ভের কুড়িটি ছত্র, রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত পাণ্ডুলিপি অনুসারে ১৯৩৮ সালের ১৩ অক্টোবর (১৩৪৫ আশ্বিন ২৬) তারিখে শান্তিনিকেতনে স্বতন্ত্র কবিতা আকারে প্রথম লিখিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। সেই আকারে উহা দ্বিতীয় সংস্করণ গীতবিতানে 'ভূমিকা' শিরোনামে মুদ্রিত হইয়াছিল।" (পৃ ৪৬৬) উপরিউক্ত তারিখে ভুল আছে মনে হইতেছে। ১৩৪৫ সালে ২৫ বৈশাখ [কালিম্পং] এ লিখিত বলিয়া নবজাতকে মুদ্রিত। সুতরাং এইটিই আদিরূপ।

৩ চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত কবির পরিচয়ের ইতিহাস রবিরশ্মি' ২য় খণ্ডের পরিশিষ্টে প্রকাশিত হইয়াছিল। বইখানির ভূমিকা ২৫ এ ডিসেম্বর ১৯৩৭-এ লিখিত হইলেও, উহা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে মুদ্রিত হইয়া ১৯৩৮ ফেব্রুয়ারি মাসের পূর্বে রেজেস্টার্ড হয় নাই। আমাদের মনে হয় প্রকাশিত হয় এপ্রিল মাসে। জীবনীলেখক ১৯৩৮ মে ৭ তারিখে চারুবাবুর বইখানি উপহার পান।

৪ প্রবাসী ১৩৪৫ আষাঢ় পৃ ৪০৮-০৯।

কালিম্পঙে থাকিতে থাকিতে কবি মেদিনীপুরের ম্যাজিস্ট্রেট বিনয়রঞ্জন সেনের প্রচেষ্টায় যে 'বিদ্যাসাগর গ্রন্থাবলী' মুদ্রিত হইতেছে তাহার প্রথম খণ্ড পাইলেন। কবি (১৩৪৫ জ্যৈষ্ঠ ৫) বিনয়রঞ্জনকে লিখিতেছেন, 'বিদ্যাসাগরের বেদীমূলে নিবেদন করবার উপযুক্ত এই অর্ঘ্য রচনা। আমরা সেই ক্ষণজন্মা পুরুষকে শ্রদ্ধা করবার শক্তি দ্বারাই তাঁর স্বদেশবাসীরূপে তাঁর গৌরবের অংশ পাবার অধিকার প্রমাণ করতে পারি। যদি না পারি তাতে নিজেদের শোচনীয় হীনতারই পরিচয় হবে।"[৫]

কালিম্পঙে প্রায় একমাস কাটিল। এখানে এবার 'বাংলাভাষা পরিচয় নামে' নূতন বই লিখিতেছেন। অতঃপর ৭ জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৫ (১৯৩৮ মে ২১) মৈত্রেয়ী দেবীর আমন্ত্রণে কবি মংপুতে আসিলেন। মৈত্রেয়ী দেবী অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের কন্যা; ইঁহার স্বামী ডক্টর মনোমোহন সেন গবর্মেণ্ট সিনকোনা বিভাগের অধ্যক্ষ, মংপুতে থাকিতে হয় কার্যোপলক্ষে। মংপু কালিম্পং হইতে ২০ মাইল দূরে, পার্বত্য পথে মোটরগাড়ি করিয়া যাতায়াত করিতে হয়। মৈত্রেয়ী দেবী স্বয়ং সাহিত্যিক ও রবীন্দ্রভক্ত; রবীন্দ্রনাথকে তিনি কী চোখে দেখিতেন তাহা 'মংপুতে রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থের প্রতি পৃষ্ঠা সাক্ষ্য বহন করিতেছে। কবির ভাষায় কবির ভাব প্রকাশের অসামান্য ক্ষমতা ইঁহার।

মংপুতে কবির এই প্রথম আগমন। কবির সঙ্গে আসিয়াছেন অনিলকুমার চন্দ ও সুধাকান্ত রায় চৌধুরী, এছাড়া পুরাতন ভৃত্য বনমালী। কবির জন্য মৈত্রেয়ী দেবীদের নিজ বাটীর অদূরেই একটি বড়ো বাড়ির ব্যবস্থা করা হইয়াছিল; সেইখানেই দিন পনেরো ও শেষ কয়দিন (৬-৯ জুন) মৈত্রেয়ী দেবীদের বাসায় থাকিয়া তিনি ৯ জুন কালিম্পঙে ফিরিয়া যান।

মংপুতে 'বাংলাভাষা পরিচয়' লেখা চলিতেছে; এখানকার ছোটো একটি ঘটনা উল্লেখযোগ্য। মৈত্রেয়ী দেবী কবির লেখার সুবিধার জন্য আরামকেদারার সম্মুখে কাঠের একটা বোর্ড্ দিয়াছিলেন; কবি তাঁহাকে বলেন, "চেয়ারে ব'সে টেবিলের উপর ঝুঁকে না লিখলে আমার চিন্তার flow নষ্ট হয়ে যায়। আরামচৌকিতে হেলান দিয়ে ঝিমুতে ঝিমুতে কখনো লেখা যায় না। এ একটা তপস্যা তো বটে, অতি-আরাম করলে কি হয়।" (মংপুতে রবীন্দ্রনাথ পৃ ১১) যাঁহারা কবিকে কর্মরত দেখিয়াছেন, তাঁহারা জানেন কবি কী পরিশ্রমী ছিলেন।

মংপুতে কবির দিন কিভাবে কাটিত সে সম্বন্ধে মৈত্রেয়ী দেবী লিখিতেছেন, "ভোর পাঁচটায় চা খেয়ে নিয়ে ন'টা সাড়ে ন'টা পর্যন্ত চিঠি লেখা ও 'বাংলাভাষা পরিচয়' বইটা নিয়ে কাজ চলত" (পৃ ১০)। কয়েকদিন পরে মৈত্রেয়ী দেবী লিখিতেছেন, "উনি (কবি) দিবারাত্রি লেখা নিয়ে রয়েছেন, বইটা প্রায় শেষ হয়ে এলো" (পৃ ২৭)। একদিন কবি বলিতেছেন, "আজ যে ভাষার খেয়াল নিয়ে মেতে উঠেছিলুম— অদ্ভুত সব ব্যাপার চলেছে ভাষার জগৎ জুড়ে, কী ক'রে যে ভাষাটা গড়ে উঠেছে সে এক রহস্যময় কারখানা।" (পৃ ৩২)। মোটকথা মনটা এই সৃষ্টির মধ্যে ডুবিয়া আছে। ইহারই ফাঁকে ফাঁকে দুই চারিটা কবিতা দেখা যায়। গত বৎসর আলমোড়ায় লেখেন 'বিশ্বপরিচয়'; সৃষ্টির অতল রহস্যলোকে ছিল বিচরণ; এবার কালিম্পং—মংপুতে লিখিলেন 'বাংলাভাষা পরিচয়' —ভাষার দুরধিগম্য রাজ্যে পরিভ্রমণ। কবি লিখিয়াছেন, "আমি যেন পায়ে-চলা পথের ভ্রমণকারী,…চলতে চলতে যা আমার চোখে পড়েছে এবং যে ভাবনা উঠেছে আমার মনে, সেই খাপছাড়া দৃষ্টির অভিজ্ঞতা নিয়ে যখন যা মনে আসে আমি ব'কে যাব। তাতে ক'রে মনে তোমরা সেই চ'লে বেড়াবার স্বাদ পাবে। তারও দাম আছে। বিশ্বপরিচয় বইটা লিখেছিলুম এই ভাবেই।" (ভূমিকা)

এই সময়ে কবি আরেকটি কাজ করিতেছেন, সেটি হইতেছে মহাভারত সম্বন্ধে বক্তৃতা রচনার উদ্যোগ। শান্তিনিকেতনে বাসকালে মার্চ (১৯৩৮) মাসের গোড়ায় কবিকে মহাভারত লইয়া আলোচনা করিতে দেখি। তিনি

৫ বিদ্যাসাগর ও তাঁহার গ্রন্থাবলী সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ, বিবিধ প্রসঙ্গ, প্রবাসী ১৩৪৫ আষাঢ় পৃ ৪৪৮।

প্রতিমা দেবীকে লিখিতেছেন (৫ মার্চ), "মহাভারত লেখার ভার স্বীকার করে নিয়েছি—অবিলম্বে শুরু করতে হবে।" শোনা যায়, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা দিবার জন্য এই তথ্য সংগ্রহ করিতেছিলেন। কালিম্পঙে গিয়া এই কার্যে হাত দিয়াছেন। সুধীরচন্দ্র করকে গীতবিতান সম্বন্ধে যে দীর্ঘ পত্র লেখেন (১৩৪৫ বৈশাখ ২৩, কবিকথা পৃ ৫৫) তাহাতে লিখিতেছেন, "চোখের দুর্বলতার জন্যে কোমর বেঁধে লিখতে বসতে পারছিনে—ছোটো অক্ষরের মহাভারত যেন কাঁকর বিছানো রাস্তা, তার উপর দিয়ে চোখ চালানো আরামের নয়।"[১]

মংপু বাসকালে তারিখ-দেওয়া তিন-চারটি কবিতার খবর পাই। একটি 'সেঁজুতি' কাব্যখণ্ডে, দুইটি 'নবজাতকে ও অপর একটি 'সানাই'এর মধ্যে স্থান পাইয়াছে। সেঁজুতির কবিতাটি অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের[২] 'পত্রোত্তর' (১৩৪৫ জ্যৈষ্ঠ ১৬)। অধ্যাপক মহাশয় তাঁহাকে কবিতায় পত্র (কবি নারদ, প্রবাসী ১৩৪৫ আষাঢ়) লেখেন ইহা তাহারই জবাব (মংপুতে রবীন্দ্রনাথ পৃ ১১-১৪)। এই কবিতাটির মধ্যে অনেক তত্ত্বকথা আছে; কয়টি পঙ্‌ক্তি উদ্ধৃত করিতেছি, উহার ব্যাখ্যা বহুব্যাপী হইতে পারে। তিনি বলিতেছেন :

কী আছে, জানি না দিন অবসানে মৃত্যুর অবশেষে ;
এ প্রাণের কোনো ছায়া
শেষ আলো দিয়ে ফেলিবে কি রং অস্তরবির দেশে,
রচিবে কি কোনো মায়া।

এ কি অজ্ঞেয়বাদের প্রশ্ন, না, চিররহস্যময় অজানা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা? এই কবিতা পাঠের পর কবি যাহা বলিয়াছিলেন সে সম্বন্ধে মৈত্রেয়ী দেবী নিজ ভাষায় লিখিতেছেন, "যখন সমাপ্তি হবে তখন চরম সমাপ্তি কিনা, যা অতীত তা শেষ হয়ে গেছে কিনা, কী জানি। যা সমুখে আর যা পিছনে, আমার কাছে যে উভয়ই অস্তিত্বহীন। কেবল বর্তমানটুকুই সত্য, সত্য মানে প্রত্যক্ষ। কিন্তু যা প্রত্যক্ষ নয় সেও সত্য হতে পারে।" (মংপুতে রবীন্দ্রনাথ পৃ ১৪) এই শ্রেণীর অনেক প্রশ্নই জাগে।

নবজাতকের 'রাজপুতানা' কবিতাটি লেখার ইতিহাস অন্যরূপ। স্টেট্‌স্‌ম্যান হইতে প্রকাশিত 'সুন্দর ভারত' (Wonderful India) গ্রন্থে রাজপুতানার ছবি দেখিয়া মনে যে ধিক্কার লাগে তাহারই অভিঘাতে উহা লিখিত।

১ রবীন্দ্রসদনের অধ্যক্ষ শোভনলাল গঙ্গোপাধ্যায় নিম্নলিখিত নোট আমাকে পাঠাইয়াছেন : "রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত ১৫৯ নং পাণ্ডুলিপিতে কবির হস্তাক্ষরে মহাভারত সম্বন্ধে নানারূপ মন্তব্য লিখিত আছে। পাণ্ডুলিপিটি ১৯৩৮ সালের একখানি ডায়ারি খাতা। অনুমান হয় ঐ সময় কবি মহাভারত সম্বন্ধে কোনো প্রবন্ধ লিখিবার মনস্থ করিয়াছিলেন। মন্তব্যগুলি পড়িলে মনে হয় তিনি মহাভারতের সময়কার সমাজব্যবস্থা, লৌকিক আচারব্যবহার রীতিনীতি ইত্যাদি বিষয়ে বিশেষ করিয়া লক্ষ্য করিতেছেন। সম্ভবতঃ এই সূত্রেই শান্তিনিকেতনের অধ্যাপক শ্রীসুখময় ভট্টাচার্য কবি কর্তৃক "মহাভারতের সমাজ" নামক সুবৃহৎ গ্রন্থখানি রচনা করিবার প্রেরণা লাভ করেন। এই সময়ে কবি যে Winternitz ও Hopkins-এর গ্রন্থ পাঠ করিয়াছিলেন উক্ত পাণ্ডুলিপি হইতে তাহারও প্রমাণ পাওয়া যায়।" সুধীরচন্দ্র করের 'কবিকথা' পৃ ৪২-৪৩ দ্রষ্টব্য। "কবি তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্যে মহাভারতের বক্তৃতা লিখবেন বলে তৈরি হচ্ছেন।" কবিকথা প ৮৯। দ্র 'মহাভারতের সমাজে'র ভূমিকা।

২ সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তর খ্যাতি দার্শনিক বলিয়াই; তবে তিনি কবিতাও লিখিতেন বাল্যকাল হইতে। 'ক্ষণ লেখা' নামে একখানি কাব্যখণ্ড লিখিয়া তিনি রবীন্দ্রনাথকে উৎসর্গ করেন :

নিখিলমনুজ পুজ্যাদীপ্তরশ্মিপ্রবাহে অমর সলিলধারে মিশ্রণং যাতু ভৌমঃ।
জলতু মম শিখেয়ং ম্লান শোভাবগাহে। কবিরবতু রবীন্দ্রো বাক্‌পতি সার্বভৌমঃ।

রবীন্দ্রনাথ গ্রন্থকারকে পুস্তকখানি সম্বন্ধে পত্র দেন; তার মধ্যে আছে,…"ক্ষণলেখা নামটি সঙ্গত হয় নি। সময়ের সীমার দ্বারা এর পরিচয় নয়।…ইংরেজীতে যাকে Classic রীতি বলে, তোমার কবিতা সেই রীতির—এ বড়ো সভার জন্যে পরিচ্ছন্ন ও প্রস্তুত, এর মধ্যে অনবধানতা ও অপারিপাট্য নেই।" প্রবাসী ১৩৪৫ অগ্রহায়ণ পৃ ৩২০।

কবি মৈত্রেয়ী দেবীকে বলিতেছেন, "হায় হায় এই কি সেই রাজপুতানা! মৃত্যুর বোঝা বহন ক'রে তবু বেঁচে আছে। এর চেয়ে তার ধ্বংস ছিল ভালো। কোনো-এক রকমের জীবনের চাইতে মরণই মঙ্গল, মরণই সম্মানের।" (পৃ ৩৩)

একি আত্মবিস্মরণ মোহ
বীর্যহীন ভিত্তি 'পরে কেন রচে শূন্য সমারোহ।...
নাট্যমঞ্চে ব্যঙ্গ করি বীর সাজে
তার স্বর আস্ফালনে উন্মত্ততা করে কোন্ লাজে।

কিছুকাল পূর্বে 'হিন্দুস্থান' কবিতায় এই তিরস্কারই ধ্বনিত হইয়াছিল। যে লোক স্বীয় বীর্য হইতে ভ্রষ্ট, তাহার পক্ষে অতীতকালের ইতিহাস লইয়া দম্ভ প্রকাশের মধ্যে তীব্র ব্যঙ্গ ছাড়া আর কিছুই নাই।

সানাই-এর 'অধীরা' কবিতা (১৯৩৮ জুন ৮। ১৩৪৫ জ্যৈষ্ঠ ২৫),[১] রচনার ইতিহাস 'মংপুতে রবীন্দ্রনাথে'র মধ্যে বিবৃত আছে; একদিন ঝড়বৃষ্টির পর বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে যে 'এক চঞ্চলা অধীরা ছুটে চলেছে'—যে বন্ধন মানে না, যে দুর্বার—এ 'অধীরা'য় তাহারই কথা ব্যক্ত হইয়াছে। (পৃ ৪২)

মংপু ত্যাগের দুই একদিন আগে কবি 'মংপু পাহাড়' (নবজাতক ১০ জুন) কবিতাটি লেখেন। এখানেও সেই জিজ্ঞাসা :

অবশেষে একদিন বন্ধন খণ্ডি
অজানা অদৃষ্টের অদৃশ্য গণ্ডি
অন্তিম নিমেষেই হবে উত্তীর্ণ।
তখনি অকস্মাৎ হবে কি বিদীর্ণ
এত রেখা এত রঙে গড়া এই সৃষ্টি
এত মধু-অঞ্জনে রঞ্জিত দৃষ্টি।
বিধাতা আপন ক্ষতি করে যদি ধার্য
নিজেরই তবিল-ভাঙা হয় তার কার্য।
নিমেষেই নিঃশেষ করি ভরা পাত্র
বেদনা না যদি তার লাগে কিছু মাত্র,
আমারি কি লোকসান যদি হই শূন্য—
শেষ ক্ষয় হলে কারে কে করিবে ক্ষুণ্ণ।

এ জীবনে পাওয়াটারই সীমাহীন মূল্য
মরণে হারানোটা তো নহে তার তুল্য।
রবিঠাকুরের পালা শেষ হবে সদ্য,
তখনো তো হেথা এক অখণ্ড অন্ত
জাগ্রত রবে চির দিবসের জন্যে
এই গিরিতটে এই নীলিম অরণ্যে।
তখনো চলিবে খেলা নাই যার যুক্তি—
বারবার ঢাকা দেওয়া, বারবার মুক্তি।
তখনো এ বিধাতার সুন্দর ভ্রান্তি—
উদাসীন এ আকাশে এ মোহন কান্তি॥

কবির মনের এত গভীর নিরাসক্তির উৎস কোথায় তাহা আমরা জানি। মৈত্রেয়ী দেবী লিখিতেছেন, "মনে পড়ে সেই তাঁর [কবির] সেই ভোরবেলাকার শান্ত সমাহিত মূর্তি। দুটি হাত কোলের কাছে জড়ো করা, ভোরবেলার আলো গায়ে এসে পড়েছে। সামনের সমস্ত দৃশ্যপট ছাড়িয়ে অদৃশ্যে নিবদ্ধ দৃষ্টি। সেই সময় ··কত দূরের মানুষ তিনি। অথচ কিছুক্ষণ পরেই দেখেছি খুকুর সঙ্গে ছড়া বলছেন আনন্দে। কত গভীর চিন্তায় মগ্ন থেকেছেন, কত লিখেছেন, অথচ সহজ সরলভাবে প্রত্যেকের সঙ্গে তাঁর ব্যবহার হাস্যপরিহাস একটুও ব্যাহত হয় নি। সেই মহৎ অনন্যসাধারণ মন নিজেকে পৃথক ক'রে সরিয়ে নিয়ে যায়নি। সকলের মধ্যে যে সকলের উর্ধ্বে তিনি, সেই তাঁর আশ্চর্য ক্ষমতার আর

১ সেইদিন সাঁতার প্রফুল্ল ঘোষ কবির সহিত দেখা করিতে আসেন; বিকালে যাইবেন, কবিকে প্রণাম করিতে আসিয়াছেন।

একটি নিদর্শন।" (পৃ ২৮-২৯) মংপু হইতে কালিম্পং ফিরিলেন ৯ জুন। সেখানে বিশ্বভারতী সম্পর্কীয় কাজে রাজপুরুষেরা আসিতেছেন, তাহাদের সহিত মোলাকাতের প্রয়োজন।

কালিম্পঙে প্রায় আরও একমাস কাটে। সেখানে যথাবিধি লেখাপড়া চলিতেছে। এখানেও কয়েকটি কবিতা লেখেন। এই সময়ে রাধারানী দেবীর (পূর্বে দত্ত, অধুনা দেব) দৌত্যে রবীন্দ্রনাথ 'অপরাজিতা দেবী'র কবিতায়-লেখা (১৯৩৮ জুন ১৬) একটি নাতিদীর্ঘ পত্র পান। পত্রটির শেষাংশে লেখিকা জানাইয়াছিলেন :

'রবি রাগ জানি, কবি, বাদলেও ফিকা না—
তাই চাই উত্তর। (না জানিয়ে ঠিকানা)।

'অপরাজিত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর' স্বাক্ষরে 'গরঠিকানী' কবিতাটি (১৩৪৫ আষাঢ় ৬, প্রহাসিনী) উক্ত পত্রের জবাবে লিখিয়া 'পত্র-দূতী' (১৩৪৫ আষাঢ় ৫, প্রহাসিনী) কবিতা-সহ রবীন্দ্রনাথ রাধারানী দেবীকে পাঠান।[১] কালিম্পঙে লিখিত আরও তিনটি কবিতা আছে—অদেয় (আষাঢ় ৩), যক্ষ (৬ই), মায়া (৮ই)—সবগুলিই সানাই-এর অন্তর্গত। 'যক্ষ' কবিতায় কবি বিরহিণী যক্ষিণীর কথা বলিয়াছেন, যাহার বেদনাকে কোনো কবি ভাষা দেন নাই; বিরহী যক্ষের দুঃখ কালিদাসের ভাষায় অমরতা লাভ করিয়াছে—নারীর বেদনা রূপ পায় নাই।

'হোথা বিরহিনী ও যে স্তব্ধ প্রতীক্ষায়,
দণ্ডপল গনি গনি মন্থর দিবস তার যায়।
সম্মুখে চলার পথ নাই,
রুদ্ধ কক্ষে তাই
আগন্তুক পান্থলাগি ক্লান্তিভারে ধূলিশায়ী আশা।
কবি তারে দেয় নাই বিরহের তীর্থগামী ভাষা।

'মায়া' কবিতাটি 'যক্ষে'র পরে পঠনীয়। 'অদেয়' কবিতাটির বিস্তারিত আলোচনা-ব্যাখ্যা 'মংপুতে রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থে পাওয়া যায় (পৃ ৮৫-৮৮)।

রবীন্দ্রনাথের বয়স এখন আটাত্তর বৎসর; কিন্তু এখনো য়ুরোপের সাম্প্রতিক সাহিত্যের গতিধারার সংবাদ রাখিবার জন্য মন সদাই উৎসুক। এ বিষয়ে তাঁহার প্রধান সহায় অমিয় চক্রবর্তী। তিনি বিলাত হইতে আধুনিক বই প্রায়ই পাঠান। অলড্যুস হাক্সলির একখানি বই পড়িয়া কবি অমিয়চন্দ্রকে কালিম্পং হইতে লিখিয়াছিলেন (১৩৪৫ আষাঢ় ২) যে বইখানি পড়িয়া তিনি খুবই তৃপ্ত; কারণ "তার (হাক্সলির) ভাষায় তার ইঙ্গিতে কোথাও বড়োকে বিদ্রূপ করা হয় নি।...ভালোকে নিয়ে বেঁকিয়ে কথা[২] বলতে আমাদের যে লজ্জা বোধ হয়।" (কবিতা ১৩৫০ কার্তিক) কবির দুঃখ যে অধুনা সাহিত্যের উৎকর্ষতার বিচার হইতেছে রচনার মধ্যে বিশেষ মতের অস্তিত্ব বা নাস্তিত্বের উপর। সাহিত্যের বিচার হইতেছে রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক মতবাদ দিয়া; এইটি কবির মতে সম্যক্ দৃষ্টি নহে।

আপন মনে লেখাপড়া করিতে পারিলে তো ভালোই হয়; কিন্তু বাধা কোথায় সে সম্বন্ধে বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়কে[৩] লিখিতেছেন (১৯৩৮ জুন ২৬), "প্রতিদিন অন্তবিহীন চিঠি লেখালেখি, আশীর্বাণীর দাবী, অভিমতের অনুরোধ,

১ ১৩৪৫ সালের প্রবাসীতে অপরাজিতা দেবীর 'নাৎনির পত্র,' রবীন্দ্রনাথের 'পত্রদূতী' ও 'গরঠিকানী' একত্রে প্রকাশিত হয়। (দ্র রবীন্দ্র-রচনাবলী ২৩শ খণ্ড গ্রন্থপরিচয় পৃ ৫৩১)

২ তু Criticising Joyce and Stein the Saturday Review (1951 Nov. 1 p 38) writes :..."Their methods have been...deliberate confusion of thought which has been worse than their confusion of language; because their effect on the public mind has been likewise identical, the creation of the sorry cult where incoherence passes for greatness."

৩ ১৯২৭ জুলাই মাসে বিজয়লাল শান্তিনিকেতনে বাংলার অধ্যাপক হইয়া আসেন। সেই বৎসরের শেষে চলিয়া যান।

বাংলাদেশের নবজাতদের নামকরণ, আসন্নবিবাহের সরকারী রসুনচৌকিগিরি আমার শরীরের স্বাস্থ্য এবং মনের শান্তির পক্ষে অসহ্য হয়েছে। দাবী অসঙ্গত হলেও আমি সহজে অস্বীকার করতে পারিনে বলেই আমার কাঁধ থেকে বোঝা নামলো না।...জনসাধারণের কাছে নিষ্কৃতি চেয়ে সংবাদপত্রে চিঠি দিয়েছি। এতদিনে হয়তো ছাপা হয়ে থাকবে। এই মৌন ব্রত আরম্ভ করার পূর্বে তোমাকে এই চিঠিতে আশীর্বাদ না করে থাকতে পারলুম না। আমার পল্লীচিত্র সম্বন্ধে তোমার বইখানি পড়ে বিশেষ খুশি হয়েছি...ডাকযোগে তোমার প্রতি এই আমার শেষ অভিনন্দন।"[১]

বিজয়লাল গ্রামসেবী, কন্‌গ্রেস-কর্মী; বাংলাদেশের গ্রামকে জানিবার ও বুঝিবার সুযোগ তিনি যথার্থই লাভ করিয়াছিলেন। তিনি রবীন্দ্র-সাহিত্যে পল্লী-চিত্র সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা প্রত্যেক রবীন্দ্রসাহিত্য-পাঠকের অবশ্য পঠনীয় বলিয়া আমরা মনে করি।[২]

কবি যখন মংপুতে, সেই সময়ে বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদের উদ্যোগে বঙ্কিম-জন্মশতবার্ষিকী উৎসব অনুষ্ঠিত হয়; তদুপলক্ষ্যে কবি পূর্বাহ্নে একটি কবিতা লিখিয়া পাঠাইয়া দিয়াছিলেন, তাহা ১০ আষাঢ় (১৩৪৫ ॥ ১৯৩৮ জুন ২৫) সভায় পঠিত হয়। সুতরাং কবিতাটি নিশ্চয়ই কয়েকদিন পূর্বে রচিত হইয়াছিল।[৩]

প্রত্যাবর্তনের পর

দুই মাসের উপর (১৯৩৮ এপ্রিল ২৫—জুলাই ৫) কালিম্পং ও মংপুতে থাকিয়া কবি ২০ আষাঢ় (১৩৪৫) শান্তিনিকেতনে ফিরিয়া আসেন; কয়েকদিন পূর্বেই গ্রীষ্মাবকাশের পর বিদ্যালয় খুলিয়াছে। আশ্রমে ফিরিয়া সংবাদ পাইলেন লাহোরে গ্রীষ্মের ছুটির সময় মৌলানা জিয়াউদ্দিনের মৃত্যু হইয়াছে। জিয়াউদ্দিন বিশ্বভারতীর ইসলামিক বিভাগের অধ্যাপক ছিলেন; ১৯২২ সালে অসহযোগ আন্দোলনের সময় তিনি বিশ্বভারতীর উত্তরবিভাগের ছাত্ররূপে আসেন। তারপর নিজ চেষ্টায় আপনার স্থান করিয়া লন। অধ্যাপক পুরে দাউদের সহায়তায় রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি কবিতা পারসিক ভাষায় তর্জমা করেন; উর্দু ভাষাতেও কবির একটি কাব্যসঞ্চয়ন প্রকাশ করেন। এ ছাড়া গবেষণা করেন নানা বিষয়ে। তাঁহার এই অকাল মৃত্যুর সংবাদে কবি খুবই মর্মাহত হন। শোকসভায় তিনি মৌলানা সম্বন্ধে একটি ভাষণ দান[৪] করেন; অন্তরের বেদনা প্রকাশিত হয় একটি কবিতায় (১৯৩৮ জুলাই ৮, নবজাতক)।

এই ভাষণ দানের পূর্বদিন 'ইস্‌টেশন' নামে একটি কবিতা লিখিত হয় (১৯৩৮ জুলাই ৭)। আসলে আলমোড়ায় লেখা (১৯৩৭ মে ২৯) ছোটো একটি কবিতার এটি ব্যাপকরূপ। মৃত্যুর দূত অকস্মাৎ প্রথমে মৌলানার কন্যাকে ও পরে তাঁহাকে কোথায় টানিয়া লইয়া গেল। চলমান যাত্রীর দিকে তাকাইয়া কি এই ভাবনাটিই কবির মনে হইয়াছিল—

১ প্রবাসী ১৩৪৮ মাঘ পৃ ৩৮৩।

২ রবীন্দ্র-সাহিত্যে পল্লী-চিত্র, শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়, প্রকাশক—নবজীবন পাবলিশিং হাউস, ১৯৫।২ কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা; দ্র প্রবাসী ১৩৪৫ শ্রাবণ পৃ ৫৮৪।

৩ বঙ্কিমচন্দ্র, "যাত্রীর মশাল চাই রাত্রির তিমির হানিবারে", প্রবাসী ১৩৪৫ শ্রাবণ পৃ ৫৫৫; দ্র বিমলচন্দ্র সিংহ সম্পাদিত 'বঙ্কিম-প্রতিভা, রঞ্জন পাবলিশিং হাউস।

৪ ভাষণ, ক্ষিতীশ রায় কর্তৃক অনুলিখিত, প্রবাসী ১৩৪৫ শ্রাবণ পৃ ৫৭৯-৮০।

'গেল গেল' ব'লে যারা
ফুকরে কেঁদে ওঠে
ক্ষণেক-পরে কান্না-সমেত
তারাই পিছু ছোটে !...

এক তুলি ছবিখানা এঁকে দেয়,
আর তুলি কালি তাহে মেখে দেয়।
আসে কারা এক দিক হতে ঐ
ভাসে কারা বিপরীত স্রোতে ঐ।

এবার পাহাড় হইতে ফিরিয়া কবি দীর্ঘকাল শান্তিনিকেতনে ছিলেন—দুই-একবার কলিকাতায় যাইতে হয় বটে—তবে বেশিদিনের জন্য থাকেন নাই। খুচরা কবিতা অনেকগুলি জমিয়াছে; সেগুলি একত্র করিয়া 'সেঁজুতি' নামে কাব্যখণ্ড প্রকাশিত হইল (ভাদ্র ১৩৪৫)।[১] কাব্যখানি উৎসর্গ করেন, 'ডাক্তার সার্ নীলরতন সরকার বন্ধুবরেষু' (১ শ্রাবণ ১৩৪৫)। গত বৎসর ভাদ্রমাসে কবি হঠাৎ হতচৈতন্য হইয়া পীড়িত হন, স্যর নীলরতন তাঁহাকে নিরাময় করেন।

অন্ধতামস গহ্বর হতে ফিরিনু সূর্যালোকে।
বিস্মিত হয়ে আপনার পানে হেরিনু নূতন চোখে।...

আপন মনে কবিতা লেখা ছাড়া দেশবিদেশের বহু সমস্যা সম্বন্ধে তাঁহাকে মতামত দিতে হয়। পৃথিবীব্যাপী অশান্তির দিকে তিনি চোখ মুদিয়া থাকিতে পারেন না। চীনের প্রতি জাপানের অত্যাচার উত্তরোত্তর বাড়িয়া চলিতেছে; কবি জাপানের এই ব্যবহারের প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিয়া চীনে এক পত্র পাঠাইলেন। উহা প্রকাশিত হইলে জাপানে যে প্রতিক্রিয়া হইল তাহার কথা একটু পরেই আলোচনা করিব।

চীনা-ভবনের অধ্যক্ষ তান্-য়ুনসান যখন দেশে যান, সেই সময়ে কবি তাঁহার মারফত পত্রখানি মার্শাল চিয়াংকাই-শেককে পাঠাইয়াছিলেন। পত্র চিয়াংকে লিখিত হইলেও, উহা আসলে চীনের প্রতি জাপানের অত্যাচারের প্রতিবাদ ও চীনের জয়লাভের জন্য তাঁহার অন্তরের শুভইচ্ছা জ্ঞাপন।

"Your neighbouring nation [Japan] which is largely indebted to you for the gift of your cultural wealth and therefore should naturally cultivate your comradeship for its own ultimate benefit, has suddenly developed a virulent infection of imperialistic rapacity imported from the West and turned the great chance of building the bulwark of a noble destiny in the East into a dismal disaster. ...Japan has cynically refused its own great possibility, its noble heritage of 'Bushido' and has offered a most painful disillusionment to us in an unholy adventure through which even some apparent success of hers is sure to bend down to the dust, loaded with a fatal burden of failure."[২]

বিদ্যালয় খোলার সঙ্গে সঙ্গে কবিকে ছোটো বড়ো নানা কাজের মধ্যে জড়াইয়া পড়িতে হয়। নূতন ছাত্রদের অভিনন্দন জ্ঞাপন করিয়া কবি একদিন আশ্রমের আদর্শ ও ইতিহাস বিবৃত করেন।[৩] দুইদিন পরে (৬ই) আশ্রমে বঙ্কিমচন্দ্রের জন্মশত-বার্ষিকী সভায় কবিকে সভাপতিত্ব করিতে হয়। সেদিন কবি বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে অনেক ব্যক্তিগত কথা

১ 'সেঁজুতি' সম্বন্ধে কবি লিখিতেছেন, "সন্ধ্যাবেলার প্রদীপ হিসাবে ওর মানেটা ভালো।" কবিকথা পৃ ৫৫, কালিম্পং হইতে লিখিত পত্র ২৩ বৈশাখ ১৩৪৫।

২ V. B. News VII 1938 July p 8.

৩ An address, ৪ অগস্ট ১৯৩৮ V. B. Q. 1938 p 182-86.

বলেন। তিনি বলেন, বন্দেমাতরম্ সুরসংযোগে তিনি বঙ্কিমকে শোনান এবং সেই সুরই এখন চলিতেছে। গানটির প্রথম দুইটি কলি শ্রোতাদের গাহিয়া শুনাইলেন ; নবীন শ্রোতাদের পক্ষে এইটি অভাবনীয় ঘটনা।

কবির বহুমুখী কর্মসৃষ্টি যুগপৎ চলিতেছে। পূর্বেই বলিয়াছি 'বাংলা ভাষা সম্বন্ধে একখানা বই মৃদুমন্দ গতিতে' লিখিয়া চলিয়াছেন ; সঙ্গে সঙ্গে অন্যকেও নানা কর্মে প্রবুদ্ধ করিতেছেন। প্রমথ চৌধুরী ও ইন্দিরা দেবী উভয়কে লোকশিক্ষা সংসদের উপযোগী দুইখানি বই লিখিবার জন্য তাগিদ দিতেছেন। কবির বিশেষ ইচ্ছায় প্রমথ চৌধুরী 'প্রাচীন হিন্দুস্থান' লিখিতেছেন ও ইন্দিরা দেবী ফরাসী ঐতিহাসিক রেনে গ্রুসের (Rene Grousset মৃ ১৯৫২) ভারতবর্ষ সম্বন্ধে একখানি বই-এর তর্জমা করিতেছেন।[১]

কয়েকদিন পরে কলিকাতা হইতে সংবাদ আসিল গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মৃত্যু হইয়াছে।[২] গগনেন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ ও সমরেন্দ্রনাথ এই ভ্রাতৃত্রয়ের সহিত রবীন্দ্রনাথের আবাল্যের সম্বন্ধ। ইঁহাদের মধ্যে কী গভীর প্রণয় ছিল, তাহা প্রত্যক্ষদর্শীরা জানেন। রবীন্দ্রনাথের রচনার প্রথম শ্রোতা ইঁহারা ; গগনেন্দ্রনাথদের চিত্রাবলীর প্রথম দর্শক রবীন্দ্রনাথ। কবির বহু নাটক অভিনয়ে গগনেন্দ্রনাথ প্রমুখ ভ্রাতৃত্রয় প্রধান অংশ গ্রহণ করিতেন। শেষজীবনে গগনেন্দ্র মুখপক্ষাঘাতে মূক হইয়া যান। ইঁহার মৃত্যুসংবাদে আমরা কবিকে একটি মাত্র কবিতা[৩] লিখিতে দেখি ; এখন তাঁহার যে বয়স তাহাতে কোনো আঘাত তাঁহাকে স্পর্শ করে না।

আপনার সাহিত্য সৃষ্টি ও বিশ্বভারতীর বিচিত্র কার্যের মধ্যে ডুবিয়া থাকিলেও, বাহিরের ঘটনা সম্বন্ধে তিনি উদাসীন থাকিতে পারেন না, এটি বহু ক্ষেত্রে দেখিয়াছি। সেইরূপ একটি ঘটনার উদ্‌ভব হইল।

সম্পূর্ণ অযাচিত ও অপ্রত্যাশিত পরিস্থিতির মধ্যে কবিকে জাপান তথা প্রাচ্য এশিয়ার বিশিষ্ট কবি, সাহিত্যিক ও মনীষী নোগুচির সহিত পত্রবিতর্কে নামিতে হইল। পাঠকের স্মরণ আছে, কয়েক মাস পূর্বে বর্তমান চীন সম্বন্ধে অধ্যাপক তান-য়ুনসান মারফত তিনি যে পত্র মার্শাল চিয়াংকাইশেককে পাঠাইয়াছিলেন, তাহা প্রাচ্য এশিয়ার সংবাদ-পত্রে প্রকাশিত হয়। সেই পত্রে কবি চীনের প্রতি জাপানের অন্যায় যুদ্ধের তীব্র প্রতিবাদ জ্ঞাপন করেন। কবির এই পত্র পাঠ করিয়া অধ্যাপক নোগুচি রবীন্দ্রনাথকে এক খোলাপত্র[৪] প্রেরণ করেন। তাহাতে তিনি এই যুদ্ধের জন্য চিয়াংকাইশেককে দায়ী করেন। জাপানী কবি লিখিয়াছেন, "But if you take the present war in China for the criminal outcome of Japan's surrender to the West, you are wrong, because not being a slaughtering madness, it is, I believe, the inevitable means, terrible it is though, for establishing a new great world in the Asiatic continent, where the 'principle of live-and-let live' has to be realized. Believe me, it is war of 'Asia for Asia.' With a crusader's determination and with a sense of sacrifice that belongs to a martyr, our young soldiers go to the front....I donot know why we cannot be praised by your countrymen. But we are terribly blamed by them, as it seems, for our heroism and aim." এ ছাড়াও

১ প্রথমখানি প্রকাশিত হইয়াছে, দ্বিতীয়খানি পুস্তকাকারে ছাপা হয় নাই।

২ ১৯৩৮ আগস্ট ১৯, সেঁজুতি।

৩ Memoirs of Gaganendranath Tagore—The Marquess of Zetland [Lord Ronaldshay], V.B. Qly. N. S. Vol. IV. Part I 1938 May p 1-4 ; Gaganendranath Tagore—Sir William Rothenstien, do p 4 ; Cousin Gaganendranath—Rathindranath Tagore—do p 11-16 ; The art of Gaganendranath—Nirad C. Chaudhuri, M. R. 1938 March p 330-34.

৪ নোগুচির পত্র, 41 Sakurayama, Nakano July 23rd 1938 Tokyo (Japan).

জাপানের Asia for Asia মতবাদ তিনি সমর্থন করেন এবং বলেন সেই আদর্শ রূপায়িত করিবার জন্য জাপান আজ বদ্ধপরিকর। জাপান এশিয়ান 'মনরো ডক্‌ট্রাইন' কায়েম করিবে এবং সমগ্র প্রাচ্যে Welfare State স্থাপন করিবে।

রবীন্দ্রনাথ ১ সেপ্টেম্বর (১৯৩৮) শান্তিনিকেতন হইতে নোগুচির এই পত্রের উত্তর লিখিয়া পাঠাইয়া দিলেন। কবির মতে Asia for Asia এই বুলি 'an instrument of political blackmail'। তিনি চীনের প্রতি জাপানের অত্যাচারের কথা উল্লেখ করিয়া বলিলেন, "You are building your conception of an Asia which would be raised on a tower of skulls." জাপানের রণকামীদিগকে তৈমুরলঙ্গের সহিত তুলনা করেন। কয়েকদিন পূর্বে জাপানের একজন রাজনৈতিক নেতা ঘোষণা করেন যে জাপানের সহিত ইতালি ও জারমেনির মিতালি 'highly spiritual and moral reasons'এর জন্য করিতে হইয়াছে; এবং ইহার পশ্চাতে জাপানের 'had no materialistic considerations'। কবি লিখিতেছেন, "I speak with utter sorrow for your people. ..I know that one day the disillusionment of your people will be complete and through laborious centuries they will have to clear the debris of their civilisation wrought to ruin by their own war-lords run amok"...কবি স্পষ্টই বলিলেন, "China is unconquerable, her civilisation is displaying marvellous resources"...কবির বিশ্বাস "Japanese and Chinese people will join hands together in no distant future in wiping off memories of a bitter past. True Asian humanity will be reborn"। নোগুচি কবির এই দীর্ঘ পত্রের দীর্ঘ উত্তরই দান করেন। কবি সেই পত্রের উত্তরে (২৯ অক্টোবর) একস্থানে লিখিলেন, "I am quite conscious of the honour you do me in asking me to act as a peacemaker. Were it in any way possible for me to bring you two peoples together and see you freed from this death struggle and pledged to the great common 'work of reconstructing the new world of Asia', I would regard the sacrifice of my life in the cause a proud privilge. But I have no power save that moral persuation, which you have so eloquently ridiculed."

কয়েক দিন পূর্বে জাপান হইতে কোনো বন্ধু কবিকে লেখেন যে তিনি যদি এই সময়ে জাপানে আসিতে পারেন তবে উপকার হইতে পারে। কবি সেই কথা উল্লেখ করিয়া নোগুচিকে লিখিতেছেন, "I actually thought for a moment, foolish idealist as I am, that your people may really need my services to minister to the bleeding heart of Asia।" কবি জাপানকে অন্তর হইতে ভালোবাসেন, কিন্তু তাহার এই হিংস্র রাজ্যপিপাসাকে ক্ষমা করিতে পারিতেছেন না; তিনি পত্রশেষ করিলেন এই লিখিয়া..."Wishing your people whom I love, not success, but remorse।" এত বড়ো অভিশাপ কখনো কোথাও বর্ণে বর্ণে এমনভাবে সত্য হয় নাই। জাপানের মহাযুদ্ধোত্তর ইতিহাস এই remorse এর ইতিহাস—জাপান আজ আমেরিকার অঙ্গুলিসংকেতে চলিতেছে।

নোগুচির এই পত্রে কতখানি তাঁহার নিজের মত ও কতখানি সাম্রাজ্যবাদী শাসনকর্তাদের মত ব্যক্ত হইয়াছিল বলিতে পারি না; তবে আশ্চর্য লাগে যখন জাপানপ্রবাসী রাসবিহারী বসু[১] জাপানী সাম্রাজ্যবাদের পক্ষ লইয়া চীনের প্রতি হানা সমর্থন করিলেন এবং কন্‌গ্রেস ও রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ ব্যক্তিদের নিন্দা করিলেন। জানি না ইহাও যুদ্ধের প্রচার কার্যের আবশ্যিক ঘটনা কিনা। আশ্রয়প্রাপ্ত বিদেশীকে দিয়া দেশের নিন্দাঘোষণা প্রচারের অন্যতম পদ্ধতিও হইতে পারে।

১ Mod. Rev. 1938 Dec. p 644.

আবার আমরা কবিকে অন্য জগতে পাইতেছি। এবার বর্ষামঙ্গল ও বৃক্ষরোপণ উৎসব শ্রীনিকেতনে অনুষ্ঠিত হইতেছে।[১] এই উৎসবক্ষেত্রে কবি যে ভাষণ দান করিলেন, তাহা 'অরণ্যদেবতা' নামে লিখিত হয় (প্রবাসী ১৩৪৫ কার্তিক)। ভাষণটি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। মানুষ অরণ্যসম্পদকে কিভাবে ধ্বংস করিয়া পৃথিবীর সর্বনাশ করিতেছে তাহারই আভাস ছিল এই ভাষণে। আজ সমাজতাত্ত্বিক ও অর্থনৈতিকদের নিকট বনোচ্ছেদ সমস্যা উৎকটভাবে স্পষ্ট। কবি লিখিতেছেন, "এ সমস্যা আজ শুধু এখানে নয়, মানুষের সর্বগ্রাসী লোভের হাত থেকে অরণ্যসম্পদকে রক্ষা করা সর্বত্রই সমস্যা দাঁড়িয়েছে।···মানুষ অমিতচারী।···মানুষ গৃধ্নুভাবে প্রকৃতির দানকে গ্রহণ করেছে, প্রকৃতির সহজ দানে তার কুলোয় নি, তাই সে নির্মমভাবে বনকে নির্মূল করেছে। তার ফলে আবার মরুভূমিকে ফিরিয়ে আনবার উদ্যোগ করেছে। ভূমির ক্রমিক ক্ষয়ে এই যে বোলপুরে ডাঙার কঙ্কাল বেরিয়ে পড়েছে, বিনাশ অগ্রসর হয়ে এসেছে—এক সময়ে এর এমন দশা ছিল না; এখানে ছিল অরণ্য, সে পৃথিবীকে রক্ষা করেছে ধ্বংসের হাত থেকে, তার ফলমূল খেয়ে মানুষ বেঁচেছে। সেই অরণ্য নষ্ট হওয়ায় এখন বিপদ আসন্ন। সেই বিপদ থেকে রক্ষা পেতে হলে আবার আমাদের আহ্বান করতে হবে সেই বরদাত্রী বনলক্ষ্মীকে, আবার তিনি রক্ষা করুন এই ভূমিকে, দিন তাঁর ফল, দিন তাঁর ছায়া।"[২]

বৃক্ষরোপণ প্রসঙ্গে এখানে একটি কথা আসিয়া পড়ে। রবীন্দ্রনাথ কবির ন্যায় বৃক্ষবন্দনা করিয়াছেন, তাহার সঙ্গে উৎসবের প্রেরণা দিয়াছেন; কিন্তু এই বৃক্ষরোপণের ব্যবহারিক দিকের প্রতি যে তাঁহার দৃষ্টি ছিল তাহা শ্রীনিকেতনের সমসাময়িক ও পরবর্তী কালের ইতিহাস অনুধাবন করিলেই জানা যায়। শ্রীনিকেতনের কাজ ক্ষুদ্র স্থানের মধ্যে সীমায়িত; বিশাল মহাদেশতুল্য ভারতের কতটুকু স্থান সে জুড়িয়া আছে! কিন্তু সেখান হইতে 'বনমহোৎসবে'র যে কার্যকরী রূপ চারিদিকের পল্লীমধ্যে সঞ্চারিত হইয়াছিল, তাহার যথাযথ মূল্য নিশ্চয়ই দিতে হইবে।

এই 'অরণ্যদেবতা'র কথা বলিতে গিয়া রবীন্দ্রনাথের অনুপ্রেরণায় শ্রীনিকেতনে এই ভাবধারা বাস্তবপথে কী রূপ লইয়াছিল, তাহাও জানা দরকার। কবির বাণী আকাশের শূন্যমাঝে বিলীন হয় নাই। কালীমোহন ঘোষ ও সুকুমার চট্টোপাধ্যায়ের উদ্যোগে বহুবিধ গাছ গ্রামে বিতরিত হয়।[৩] রন্ধনোপযোগী জ্বালানির সমস্যা ক্রমশই তীব্র হইয়া উঠিতেছে; গোবর সারকুড়ে না গিয়া রন্ধনশালায় যায়—তার একমাত্র কারণ জ্বালানি কাঠের অভাব। খাদ্যের জন্য শ্রীনিকেতন হইতে ফল, মূল, শাক, সবজির বীজ ও চারা যেমন সরবরাহ করা হইত, তেমনি জ্বালানি কাঠের চারাও বিতরণ করা হইত। অনুসন্ধিৎসু পাঠক শ্রীনিকেতনের এইসব পুস্তিকা, প্রচারপত্র প্রভৃতি দেখিলেই বুঝিবেন, বাংলাদেশ ও ভারত সরকার যাহা ১৯৫০ সালে প্রবর্তিত করিলেন, তাহার বিশ বৎসর পূর্বে রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনের চারিপার্শ্বের গ্রামের মধ্যে সেইসকল ভাব প্রচার করেন, কর্মের মধ্য দিয়া তাহাদের রূপও দান করেন।

এখানে প্রশ্ন উঠিতে পারে, কেজো বা practical জিনিসের সঙ্গে উৎসব কেন? এ লঘুতা তো কর্মনিষ্ঠার অন্তরায়! ইহার উত্তরে কবি শ্রীনিকেতনের বার্ষিক উৎসবে একবার বলেন,—"আমাদের কর্মব্যবস্থায় আমরা জীবিকার সমস্যাকে উপেক্ষা করিনি কিন্তু সৌন্দর্যের পথে আনন্দের মহার্ঘ্যতাকেও স্বীকার করেছি। তাল ঠোকার স্পর্ধাকেই

১ চিঠিপত্র ৫ম, ৩ সেপ ১৯৩৮। ১৩৪৫ ভাদ্র ১৭ পৃ ১১৯; পত্র ৭৫, ২৪ অগস্ট ১৯৩৮।

২ এই প্রবন্ধটি পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রচারঅধিকর্তার দ্বারা প্রকাশিত সচিত্র বনমহোৎসবে মুদ্রিত হইয়াছে। ১৯৫০ জুলাই ১-৭।১৩৫৭ আষাঢ় ১৬-২২।

৩ "About 299 plants of a large variety of flowers and fruits were distributed free to representatives of different villages. Tree-planting ceremonies were also organised in several different villages by the villagers themselves on the 4th" (1938 Sep.). V. B. News 1938 Sep. p 28.

আমরা বীরত্বের একমাত্র সাধনা ব'লে মনে করিনি। গ্রীস একদা সভ্যতার উচ্চ চূড়ায় উঠেছিল, তার নৃত্যগীত চিত্রকলা নাট্যকলায় সৌসম্যের অপরূপ ঔৎকর্ষ্য কোনো বিশিষ্ট সাধারণের জন্যে ছিল না, ছিল সর্বসাধারণের জন্যে।...যারা এখানে গ্রামের কাজ করতে আসেন তাঁদের বলি, শিক্ষাদানের ব্যবস্থা যেন এমন ভাব মনে রেখে না করা হয় যে, ওরা গ্রামবাসী, ওদের প্রয়োজন স্বল্প, ওদের মনের মতো ক'রে যা-হয় একটা গেঁয়ো ব্যবস্থা করলেই চলবে। গ্রামের প্রতি এমন অশ্রদ্ধা প্রকাশ যেন আমরা না করি।"

বৃক্ষরোপণোৎসবের দিন সন্ধ্যায় সিংহসদনে 'পরিশোধ' নৃত্যনাট্য অভিনীত হয়; কবি তাহাতে উপস্থিত ছিলেন। সেইদিন মধ্যাহ্নে স্যর সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন আসিয়াছিলেন, কবির বিশেষ আমন্ত্রণে তিনিও এই অভিনয় দেখিতে আসেন।

পরদিন রাধাকৃষ্ণন ছাত্র-অধ্যাপকগণের নিকট যে ভাষণ দান করেন সেখানে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন। কবির সহিত রাধাকৃষ্ণনের দীর্ঘদিনের পরিচয়, ভারতীয়দের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম 'রবীন্দ্রনাথের দর্শন' সম্বন্ধে ইংরেজি গ্রন্থ লিখিয়া যশস্বী হন। এই ভাষণে স্যর সর্বপল্লী য়োন্ নোগুচিকে লিখিত কবির পত্র সম্বন্ধে বিশেষভাবে উল্লেখ করিয়া বলেন যে, "the Poet was the voice of the whole civilisation even as Gandhi was the conscience of the whole country." তিনি বলেন এই উভয় মহাপুরুষই বলিতেছেন যে, "the state is only a convenience for providing citizens with economic wellbeing, cultural opportunity and spiritual life". তাঁহার মতে "modern civilisation is a scandal."

রাধাকৃষ্ণনের বক্তৃতা অন্তে রবীন্দ্রনাথ অতিথিকে ধন্যবাদ দিয়া বলেন, "My only claim is that of an artist who is amply rewarded if he is assured by a visitor like yourself, whose praise is precious, that he has been able to please you."[১]

দিন যায়, বাহিরের কাজকর্ম যাহা পারেন আপন মনে করেন সাধ্যমত পড়াশুনা করেন, যদিও চোখের দৃষ্টি ক্রমেই ধীরে ধীরে ক্ষীণতর হইতেছে। মাঝে মাঝে কবিতাও লিখিতেছেন। 'সেঁজুতি' ছাপা হইয়া গিয়াছে (১৩৪৫ ভাদ্র)। নূতন কবিতা জমিতেছে; এই ধারার প্রথম কবিতা 'আকাশপ্রদীপ' (১৩৪৫ ভাদ্র ২৩)। ইতিমধ্যে মেদিনীপুরে বিদ্যাসাগর স্মৃতিসংরক্ষণ সমিতির পক্ষ হইতে ঈশ্বরচন্দ্রের উপর কবিতা লিখিয়া পাঠাইবার আবেদন আসিয়াছিল; সেটি লিখিয়া দিলেন (১৩৪৫ ভাদ্র ২৪)।[২]

আমরা বারে বারে দেখিয়াছি কবির মন মাঝে মাঝে হাসির পাথেয় সংগ্রহে উৎসুক হইয়া উঠে। 'আকাশপ্রদীপে'র গম্ভীর কাব্যধারার মাঝে 'খাপছাড়া' কবিতা দেখা দেয়।[৩]

এই প্রহাসিনী মনের নূতন রূপ দেখা দিল দুইটি নাটিকায়—একটি ব্যঙ্গকৌতুক অপরটি প্রহসন। তবে দুইটি রচনাই পুরাতন লেখার রূপান্তর। 'স্বর্গে চক্রটেবিল বৈঠক' নামে যে ব্যঙ্গকৌতুকটি লিখিলেন সেইটি 'প্রাচীন দেবতার নূতন বিপদ' এর নূতন রূপ মাত্র। সেটি প্রকাশিত হয় সাধনায় (১৩০০ আষাঢ়, ব্যঙ্গকৌতুক)। প্রহসনটি 'মুক্তির উপায়' (সাধনা ১২৯৮ চৈত্র, গল্পগুচ্ছ) গল্পের নাটকীয় রূপ। বিজ্ঞানের গবেষণায় দেবতাদের অস্তিত্বলোপের সম্ভাবনায় স্বর্গে সকলেই উৎকণ্ঠিত। 'ব্যঙ্গকৌতুকে'র লেখাটি ও 'স্বর্গে চক্রটেবিল বৈঠকে'র[৪] ভাষাটি তুলনীয়। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করিতেছি; 'ব্যঙ্গকৌতুকে' আছে,—"দেবতাগণ বহুল চিন্তা ও তর্কের পর স্ট্যাটিস্টিক্স দেখিয়া

১ V. B. News VII. 1958 p 21.

২ প্রবাসী ১৩৪৫ কার্তিক পৃ ৪।

৩ ১৩৪৫ ভাদ্র ২৯, দ্র প্রহাসিনী ১ম সং।

৪ স্বর্গে চক্রটেবিল বৈঠক, প্রবাসী ১৩৪৫ আশ্বিন; ব্যঙ্গকৌতুক ২য় সং (১৩৪৫ কার্তিক)।

অবশেষে স্থির করিলেন, এখনো সময় হয় নাই।" এই নাটকে আছে,—চিত্রগুপ্ত বলিলেন "মুরগুরু কখনো সংখ্যাতত্ত্বের আলোচনা করেননি।…মর্ত্যে দেবগণের অধিকারে কী পরিমাণে খর্বতা ঘটেছে তার নির্ভুল সীমা নির্ণয়ের জন্য স্বপ্নাদেশ দেওয়া হোক কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংখ্যিক প্রমাণবিশারদের মাথায়; একাজে বৈজ্ঞানিক প্রশান্তি[১] আবশ্যক।" আশা করি পাঠক এই শেষ বাক্যের দ্ব্যর্থ বুঝিতে পারিয়াছেন।

'মুক্তির উপায়'[২] মূল গল্পের সঙ্গে নাটিকার মূলগত ঐক্য আছে। তবে পুষ্পমালা নামে এক মেয়েকে নাটিকার প্রধান নায়িকারূপে সৃষ্টি করিয়া কাহিনীটিকে দীর্ঘ ও হাস্যোজ্জ্বল করিয়াছেন। কবি ভূমিকায় লিখিতেছেন, "পুষ্পমালা এম. এ. পরীক্ষায় সংস্কৃতে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হওয়া মেয়ে। দূর সম্পর্কে হৈমর দিদি। কলেজি খাঁচা থেকে ছাড়া পেয়ে পাড়াগেঁয়ে বোনের বাড়িতে সংসারটাকে প্রত্যক্ষ দেখতে এসেছে। কৌতূহলের সীমা নেই। কৌতুকে জিনিসকে নানা রকমে পরখ করে দেখছে কখনো নেপথ্যে, কখনো রঙ্গভূমিতে। ভারি মজা লাগছে। সকল পাড়ায় তার গতিবিধি, সকলেই তাকে ভালোবাসে।"

সে বলিতেছে, "আমি মজা দেখতে বেরিয়েছি—ছুটি পেয়েছি বই পড়ার গারদ থেকে। দেখতে এলুম কেমন ক'রে নিজের পায়ে বেড়ি আর নিজের গলায় ফাঁস পরাতে নিস্‌পিস্ করতে থাকে মানুষের হাত দুটো। এ না হলে ভবের খেলা জমত না। ভগবান বোধ হয় রসিক লোক, হাসতে ভালোবাসেন।"

পুষ্পমালার ন্যায় মেয়ে সমাজে দেখা যায় কিনা জানি না, এক হিসাবে কন্যাটি অতি-প্রগলভা,—high-brow বা নাক-উঁচু অপবাদও দেওয়া যাইতে পারে। রবীন্দ্রনাথ যখন মূলগল্পটি লেখেন সাতচল্লিশ বৎসর পূর্বে তখন এই শ্রেণীর নায়িকার কল্পনা তাঁহার সাহিত্যে দেখা যায় কম। সবুজপত্র-উত্তর পর্ব হইতে এই শ্রেণীর নায়িকা তাঁহার গল্প মধ্যে প্রায়ই দেখা যাইতেছে। পুষ্পমালা হইতেছে লাবণ্য, কেতকী, সরলাদের সমগোষ্ঠিগত নব্যশিক্ষিতা নারী—এমনকি ইহারা 'গোরা'র নারীও নহে। কবিজীবনের পরিবেশের পরিবর্তন হইয়াছে—এখনকার নায়িকাদের অনেকেই ধনীকন্যা, ড্রয়িংরুমবিহারিনী, বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীধারিনী এমনকি বিলাতফেরত রমণী।

যাহাই হউক, এই প্রহসনটির সবটাই হাস্য নহে, কঠোর বিদ্রূপ আছে—সামাজিক কুসংস্কারের উপর কশাঘাতও আছে যুগপৎ। তবে এই শ্রেণীর কাশাঘাত তাঁহার রচনায় নূতন নহে। কিন্তু একটা কথা কবির সপক্ষে বলিবার আছে; ধর্মের বহিরবয়বে যে আবর্জনা পুঞ্জীভূত হইয়াছে—তাহারই নিন্দা তিনি করিয়াছেন, ধর্মের গভীর আধ্যাত্মিকতাকে কখনো বিদ্রূপিত করেন নাই।

'মুক্তির উপায়ে' গুরুর ও তাঁহার লাঞ্ছনার কাহিনীর সহিত রাজশেখর বসুর 'বিরিঞ্চিবাবা'র কিছু মিল পাওয়া যায়। উভয় ক্ষেত্রেই গুরু শেষকালে পুলিশের ভয়ে পলায়ন করিতেছেন। গল্পগুচ্ছের মূল আখ্যায়িকা ক্ষুদ্র, নাটকে সেইটি বহু পল্লবিত ও হাস্যোজ্জ্বল করার চেষ্টা হইয়াছে।

এবার পূজার ছুটি পড়িয়াছে সেপ্টেম্বরের শেষভাগে (২৫ সেপ্টেম্বর—২৯ অক্টোবর ১৯৩৮)। গান্ধীজির জন্মদিনের উৎসব হয় ২ অক্টোবর; কিন্তু বিদ্যালয় সে সময়ে বন্ধ থাকিবে বলিয়া ২১ সেপ্টেম্বর মন্দিরে জন্মদিন স্মরণ করিয়া কবি ভাষণ দান করিলেন।[৩]

১ ১৩৪৭ বৈশাখ। "প্রশান্তচন্দ্র [মহলানবীশ] দীর্ঘদিনের সাধনায় স্ট্যাটিস্টিক্‌সের [সাংখ্যিক) কাজে যে দক্ষতা অর্জন করেছেন, তারই জোরে প্রতিদিন অজস্র সম্মানে ভূষিত হচ্ছেন। তিনি বাঙালী বলে অবাঙালীরা তাঁর প্রাপ্য দিতে কার্পণ্য করছেন না। নিঃসংকোচে সকলে তাঁর সাহায্য গ্রহণ করেন।"— সজনীকান্ত দাসকে মোলাকাতে বলেন। দ্র ভারত ১৩৪৭ বৈশাখ ১৭।

২ মুক্তির উপায়, অলকা ১৩৪৫ আশ্বিন, রবীন্দ্র-রচনাবলী ২৩শ খণ্ড; দ্র V. B News 1938 Sep. p 18.

৩ V. B. News VII 1938 p 27.

বিদ্যালয় বন্ধ হইয়া গেলে কবি বাহিরে কোথাও গেলেন না। আপন মনে আপন কাজ করিয়া চলেন। অন্তরের ও বাহিরের বিচিত্র ভাবনা ও ঘটনা মনকে নাড়া দেয়—তাহার প্রকাশ হয় কবিতায়, পত্রে বা প্রবন্ধে। আমাদের আলোচ্য পর্বে (১৯৩৮ সেপ-অক্টো) য়ুরোপে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুরু হয় নাই সত্য, কিন্তু তাহার ঘনায়মান আয়োজন আজ সুস্পষ্ট। হিট্‌লার মধ্যয়ুরোপকে গ্রাস করিতে উদ্যত; চেকোশ্লোভাকিয়া আজ রাহুগ্রস্ত। এই প্রাচীন জাতি বহু শতাব্দী অস্ট্রিয়ার পাদপীঠতলে পিষ্ট হইয়াছিল। প্রথম মহাযুদ্ধের পর তাহাদের স্বকীয় সত্তা স্বীকৃত হয়, চেক্‌রা আপন রাজ্য স্থাপন করিতে পারে। ১৯১৮ সালে অক্টোবর মাসে চেকোশ্লোভাকিয়া রিপাবলিক মাসারিকের (Masaryk) সভাপতিত্বে প্রতিষ্ঠিত হয়। তারপর বিশ বৎসরে ঐ দেশের অনেক উন্নতি হয়। ইতিমধ্যে নাৎসিদের প্ররোচনায় চেকোশ্লোভাকিয়ার জার্মান অধিবাসীরা সুদেটান (Sudetan) অংশে আত্মকর্তৃত্বের দাবি করে। ডক্টর এডুআর্ড বেনেস (Benes) তখন সভাপতি। ১৯৩৫ সালে পঁচাশি বৎসর বয়সে মাসারিক সভাপতিত্ব ত্যাগ করেন; বেনেস তাঁহার স্থলে নির্বাচিত হইয়াছিলেন। জারমানদের তোষণ করিবার জন্য ব্রিটেন ও ফ্রান্স ম্যুনিকের কন্‌ফারেন্সে ঘোষণা করিলেন যে সুদেটান অঞ্চল নাৎসি জারমেনির অন্তর্গত হইতে পারে। এইটি ঘোষিত হয় ৩০ সেপ্টেম্বর ১৯৩৮। এই ঘটনার কয়েকদিন পরে রবীন্দ্রনাথ ১৫ অক্টোবর অধ্যাপক লেস্‌নিকে (Lesney) একপত্র মধ্যে লেখেন: "My words have no power to stay the onslaught of the maniacs, nor the power to arrest the desertion of those who erstwhile pretend to be the saviour of humanity". এই maniac হইতেছে হিটলার, ও মনুষ্যত্বের ত্রাণকর্তা হইতেছে ইংরেজ প্রভৃতি জাতি, যাহারা হিটলারের হুমকি শুনিয়া ত্রস্তব্যস্ত হইয়া তোষণনীতি অবলম্বন করিতেছেন। কবি অতি দুঃখে লিখিতেছেন, "I feel so humiliated...so helpless···"[১]

ম্যুনিক প্যাক্ট হইবার চারিদিন পরে কবি 'প্রায়শ্চিত্ত' কবিতাটি লেখেন (১৯৩৮ অক্টোবর ৪)।[২] য়ুরোপের, চীনের, ইথিওপিয়ার ঘটনাবলীর আলোকে কবিতাটি পঠনীয়। কয়েকটি পঙ্‌ক্তি মাত্র উদ্ধৃত করিতেছি :

পাপের এ সঞ্চয়
সর্বনাশের পাগলের হাতে
আগে হয়ে যাক ক্ষয়।···
প্রতাপের ভোজে আপনারে যারা বলি করেছিল দান
সে-দুর্বলের দলিত পিষ্ট প্রাণ
নরমাংসাশী করিতেছে কাড়াকাড়ি,
ছিন্ন করিছে নাড়ী।
তীক্ষ্ণ দশনে টানাছেঁড়া তারি দিকে দিকে যায় ব্যেপে
রক্ত পঙ্কে ধরার অঙ্ক লেপে।
সেই বিনাশের প্রচণ্ড মহাবেগে
একদিন শেষে বিপুলবীর্য শান্তি উঠিবে জেগে।
মিছে করিব না ভয়,
ক্ষোভ জেগেছিল তাহারে করিব জয়
জমা হয়েছিল আরামের লোভে
দুর্বলতার রাশি,
লাগুক তাহাতে লাগুক আগুন—
ভস্মে ফেলুক গ্রাসি।
···
যদি এ ভুবনে থাকে আজো তেজ
কল্যাণশক্তির
ভীষণ যজ্ঞে প্রায়শ্চিত্ত
পূর্ণ করিয়া শেষে
নূতন জীবন নূতন আলোকে
জাগিবে নূতন দেশে।

১ V. B. News 1938 Nov. p 88.

২ প্রায়শ্চিত্ত, বিজয়াদশমী [১৭ আশ্বিন] ১৩৪৫, নবজাতক, র-র ২৪ পৃ ৯, গ্রন্থপরিচয় অংশে ইহার আর-একটি রূপ আছে (পৃ ৪৬৬-৬৭)।

এই কবিতাটি সূক্ষ্মভাবে বিচার করিলে কী দাঁড়ায় তাহার বিচারের ভার পাঠকদের উপর ছাড়িয়া দিলাম। কোন্ দেশের নূতন জীবন নূতন আলোকে দেখা দিয়াছে? একি সেই দেশেরই ইঙ্গিত! বিপুলবীর্য শান্তি স্থাপনের প্রচেষ্টা কোথায়।

কবির মনে উত্তেজনা আসে—পত্রে প্রবন্ধে বা কবিতায় ব্যক্ত করেন রুদ্ধ ভাবনা; মন শমিত হয়—অন্তলোকে প্রয়াণে সময় লাগে না। যেদিন 'প্রায়শ্চিত্ত' লেখেন, সেইদিনই লেখেন 'বেজি' (১৯৩৮ অক্টোবর ৪, আকাশপ্রদীপ)।

বিদ্যালয় বন্ধ হইয়া গেলে কবি শান্তিনিকেতনে আছেন, আপনার কাব্যলোকে থাকিতে চান। বৃদ্ধবয়সে মানুষের মন স্বভাবতই ধাবিত হয় অতীতের কল্পলোকে। 'সেঁজুতি' প্রকাশিত হইয়া যাইবার পরে যে কবিতা লিখিতেছেন তাহার অনেকগুলিই 'স্মৃতির আকার দিয়ে আঁকা'।

গোধূলিতে নামল আঁধার,
ফুরিয়ে গেল বেলা,
ঘরের মাঝে সাঙ্গ হল
চেনা মুখের মেলা।

কিছুকাল পূর্বে কালিম্পং হইতে জন্মদিন[1] উপলক্ষে যে কবিতা লেখেন তাহার মধ্যে মনের বিষাদঘন ভাব ব্যক্ত হইয়াছিল:

ফিরায়ে নিতেছ শক্তি, হে কৃপণা চক্ষুকর্ণ থেকে
আড়াল করিছ স্বচ্ছ আলো; দিনে দিনে টানিছে কে
নিষ্প্রভ নেপথ্য-পানে। আমাতে তোমার প্রয়োজন
শিথিল হয়েছে, তাই মূল্য মোর করিছ হরণ
দিতেছ ললাটপটে বর্জনের ছাপ। কিন্তু জানি,
তোমার অবজ্ঞা মোরে পারে না ফেলিতে দূরে টানি।

'আকাশপ্রদীপ' কবিতাটির মধ্যে পুরাতনের হারানো ছবি জাগিতেছে:

পাণ্ডু আঁধার বিদায়-রাতের শেষে
যে তাকাতো শিশিরসজল শূন্যতা-উদ্দেশে
সেই তারকাই তেমনি চেয়েই আছে
অস্তলোকের প্রান্তদ্বারের কাছে।
অকারণে তাই এ প্রদীপ জ্বালাই আকাশ-পানে—
যেখান হতে স্বপ্ন নামে প্রাণে।

এই কবিতাটি পূরবীর 'তারা' কবিতাটির কথা স্মরণ করাইয়া দেয়—'ওই কি আমার হবে আপন তারা।' আজ জীবনের সন্ধ্যায় আসিয়া প্রথম জীবনপ্রত্যূষের ধ্রুবতারার কথা কি মনে হইতেছে। আবার আপনার দেহের মধ্যে ও মনের মধ্যে এবং পৃথিবীর চারদিকে যেসব ভাঙাগড়া ও ওঠাপড়া চলিতেছে সেই দিকে তাকাইয়া প্রশ্ন জাগিতেছে 'কেন'। 'আকাশপ্রদীপ' কবিতাটি যেদিন লিখিত হয় সেইদিনই 'কেন'র প্রথম খসড়া করেন।[2]

আবার কি সূত্র তার, ছিন্ন হয়ে যাবে
রূপহারা গতিবেগ
চলে যাবে বহু কোটি বৎসরের শূন্য যাত্রাপথে
ভেঙে ফেলে দিয়ে তার স্বল্পআয়ু বেদনার কমণ্ডলু।
কিন্তু কেন।

১ ১৯৩৮ সেপ ২৮, ১৩৪৫ আশ্বিন, আকাশপ্রদীপ।
২ ১৯৩৮ সেপ ১৮, দ্র র-র ২৪ পৃ ৪৬৮-৭০। এইটি পুনরায় লেখেন ১৯৩৮ অক্টোবর ১২ সেই পাঠটি 'নবজাতক'-এ গৃহীত।

সম্মুখের দিনগুলি ক্রমেই সংকীর্ণ হইয়া আসিতেছে ; তাই অতীত জীবনের ঘটনাবলীর মধ্যে মন বিচরণ করিতেছে :

পুরানো স্মৃতিরে দীর্ণ করি আপনার পক্ষপুটে ফিরে-চলা
সৃষ্টির আরম্ভবীজ লয় ভরি ভরি যত প্রতিধ্বনি।

এই শ্রেণীর কবিতা হইতেছে—স্কুল-পালানে (১৯৩৮ অক্টোবর ১৪), ধ্বনি (২১ শে), গানের স্মৃতি (২৩ শে), বঁধু (২৫ শে), জল (২৬ শে), শ্যামা (৩১শে)। সবগুলিই নূতন কাব্য 'আকাশপ্রদীপে'র অন্তর্গত। এগুলি জীবনস্মৃতির ঘটনাপূর্ণ কবিতা।—ছয়মাস পরে লিখিত 'কাঁচা আম' 'শ্যামা'র সঙ্গে পঠনীয়। এই সময় হইতে অনেক রচনাই 'স্মৃতির আকার দিয়ে আঁকা'। যথা যথা সময়ে সেগুলির আলোচনা করিব।

কবিতা লিখিয়া কখনো কেহ সারাদিন কাটাইতে পারে না। বিচিত্র কর্তব্য করিতে হয়। ২৭ অক্টোবর (১৯৩৮) কবি 'দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থমালা' সম্বন্ধে তাঁহার অভিমত লিখিয়া দেন। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলাসাহিত্যের ইতিহাস রচনার উপাদান সংগ্রহ করিয়া অমরকীর্তি অর্জন করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ সে সম্বন্ধে লিখিলেন, "দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থমালা' প্রকাশের আয়োজন যারা করচেন তাঁদের প্রতি সাধুবাদ সাহিত্যিক সৌজন্যের প্রচলিত অলস রীতিরূপে প্রয়োগ করলে উদ্যোগীদের বঞ্চনা করা হবে।"[১]

এই কাব্যধারা রচনার পর্বে কবি তাঁহার 'বাংলাভাষা পরিচয়'এর জন্য[২] একটি ভূমিকা লিখিয়া দিলেন। গ্রন্থখানি আদ্যন্ত পাঠ করিলে কবির মনের ব্যাপ্তি ও গভীর অধ্যয়নশীলতার পরিচয় পাওয়া যায়। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ভাষাতত্ত্ববিদ্ Bopp, Beams, Hoernle, MaxMuller, Sayce, Whitney, Bailey, Brugmann, Grierson ও সুনীতি চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতির সুপরিচিত গ্রন্থগুলি রবীন্দ্রনাথ কী নিষ্ঠা ও মনোনিবেশের সহিত পাঠ করেন, তাহার প্রমাণ ঐ সকল গ্রন্থ পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় বহন করিতেছে। অধিকাংশ গ্রন্থেই তাঁহার স্বহস্তলিখিত মন্তব্য রহিয়াছে।

এ ছাড়া গ্রামের ও শহরের নানাশ্রেণীর লোকের সংস্পর্শে আসায় বাংলাভাষার শব্দপ্রয়োগ ও উচ্চারণবিধির প্রভেদ সূক্ষ্মভাবে তিনি বরাবর লক্ষ্য করিয়া আসিতেছেন। এই অধ্যয়ন, শ্রবণ ও চিন্তনের ফলে তিনি যেসব প্রবন্ধ লেখেন তাহার কথা আমরা আলোচনা করিয়াছি ; 'শব্দতত্ত্ব' বাংলাভাষার রহস্য উদ্‌ঘাটনের অন্যতম প্রথম প্রচেষ্টা।

'বাংলাভাষা পরিচয়' গ্রন্থে ভাষার উৎপত্তি ও ভাষার সহিত ভাবের সম্বন্ধ, ভাবের সহিত শব্দসৃষ্টির প্রয়াস প্রভৃতি বিষয় সংক্ষেপে আলোচিত হইয়াছে। মানুষের মনোভাব প্রকাশে ভাষাজগতের অদ্ভুত রহস্য কবিকে অভিভূত করিয়াছে। ভাষাতত্ত্বের অনুসন্ধান বর্তমানযুগে আর ভাষার রাজ্যে আবদ্ধ নাই ; জীবতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব, মনস্তত্ত্বের মধ্যে ভাষার অভিব্যক্তি কিভাবে হইতেছে, তাহা আজ পণ্ডিতের আলোচনার বিষয়। কবি বাংলাভাষার পরিচয় দিতে গিয়া ভাষার মূলতত্ত্ব আলোচনা করিয়াছেন ; ভূমিকায় বলিতেছেন, "মানুষের মনোভব ভাষাজগতের যে অদ্ভুত রহস্য আমার মনকে বিস্ময়ে অভিভূত করে তারই ব্যাখ্যা করে এই বইটি আরম্ভ করেছি।"

"সমাজ ও সমাজের লোকদের মধ্যে এই প্রাণগত মনোগত মিলনের ও আদানপ্রদানের উপায় স্বরূপে মানুষের সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ যে সৃষ্টি, সে হচ্ছে তার ভাষা। এই ভাষার নিরন্তর ক্রিয়ায় সমস্ত জাতকে এক ক'রে তুলছে—নইলে মানুষ বিচ্ছিন্ন হয়ে মানবধর্ম থেকে বঞ্চিত হত।...

১ প্রবাসী ১৩৪৫ অগ্রহায়ণ পৃ ২৫০।

২ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক গ্রন্থখানি মুদ্রিত হয় (অক্টোবর ২৪। ১৩৪৫ কার্তিক ৭)। গ্রন্থখানি বিশ্বভারতী লোকশিক্ষা সংসদ কর্তৃক পাঠ্যরূপে মনোনীত হইয়াছে।

"জাতিক সত্তার সঙ্গে সঙ্গে এই যে ভাষা অভিব্যক্ত হয়ে উঠেছে এ এতই আমাদের অন্তরঙ্গ যে এ আমাদের বিস্মিত করে না, যেমন বিস্মিত করে না আমাদের চোখের দৃষ্টিশক্তি, যে-চোখের দ্বার দিয়ে নিত্যনিয়ত পরিচয় চলছে বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে।"

'বাংলাভাষা পরিচয়ে'র ভাষা হইতেছে চলতি বাংলা। চলতি বাংলার শ্রেষ্ঠ আদর্শ দেখাইবার জন্য আমাদের মনে হয় কবি রীতিমতো মেহনত করিয়া একটা মান খাড়া করেন। কবি এই ভাষাকে বলিয়াছেন প্রাকৃত বাংলা। সংস্কৃতের যুগে যেমন ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে ভিন্ন ভিন্ন প্রাকৃত প্রচলিত ছিল, তেমনি প্রাকৃত বাংলারও স্থানভেদে রূপভেদ আছে। কবির মতে এই সব প্রাকৃতের মধ্যে বিশেষ একটি প্রাকৃত আধুনিক বাংলাসাহিত্যের বাহন হইয়াছে। এই প্রাকৃত বা "চলতি বাংলা চলতি বলেই সম্পূর্ণ নির্দিষ্ট নিয়মে বাঁধা নয়।" সেইজন্য কবির মত যে "এই বিক্ষিপ্ত পথগুলিকে একটি পথে মিলিয়ে নেবার কাজ শুরু করা চাই।" লেখার ভাষা ও বলার ভাষার মধ্যে ভেদ যদি ক্রমেই বিস্তৃত ও গভীর হইয়া যায় তবে কালে লেখার সাহিত্য অচল হইয়া পড়ে; সেইজন্য ভাষার রাজ্যে সমাজ ও সাহিত্যিকের শাসন থাকার প্রয়োজন, ব্যাকরণ শিক্ষা সেই কার্য করিতে পারে। বলা বাহুল্য ভাষার basic রূপের বদল হয় সামান্যই, বদল হয় তাহার superstructureএর বা বহিরবয়বের। বাংলার basic রূপ 'প্রাকৃত'—তাহা চৈতন্যমহাপ্রভুর যুগেও যা এখনো তাহাই; বদল হইয়াছে শব্দসম্পদে ও শৈলীতে।

পূজার ছুটির পরে ১৯৩৮

পূজার ছুটির পর বিদ্যালয় খুলিল ৩০ অক্টোবর; সেই সময়ে বঙ্গীয় প্রাদেশিক স্কাউটনায়কদের শিক্ষাশিবির (Training Camp) স্থাপিত হয় শান্তিনিকেতনে। ৩০ অক্টোবর ক্রীড়াদি প্রদর্শনীর পর কবি ভাবী নায়কদের উদ্দেশে উপদেশ দান করেন। কবি বলিলেন, "Never grow old. I have been able to preserve my spirit of youth, despite the misleading exterior of my grey hair, simply because I have never ceased to love this earth and this life. It is a gift so great and so within the reach of us all that I cannot wish you better."[১]

বিদ্যালয় খুলিলেই বিচিত্র কাজের চাপ আসে; নানা ফরমাইশ নানা সমস্যা মিটাইতে হয়। ভাবেন বয়স হইয়াছে চুপ করিয়া থাকিবেন, সম্ভব হয় না। বিদ্যালয় খুলিবার দিন বারো পরে ডক্টর মেঘনাদ সাহা আশ্রমে আসেন। তিনি যে সভায় বক্তৃতা দেন, তথায় রবীন্দ্রনাথ উপস্থিত হইয়াছিলেন। (১৯৩৮ নভেম্বর ১৩)

অনুরোধ আসিয়াছে ১৭ নভেম্বর কেশবচন্দ্র সেনের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে তাঁহার অভিমত পাঠাইতে হইবে। তিনি যাহা লিখিয়া দেন, তাহা ইতিপূর্বে উদ্ধৃত হইয়াছে।[২]

পরদিন কামাল আতাতুর্কের মৃত্যুসংবাদ আসিলে বিদ্যালয়ের কাজ বন্ধ করা হয় (১৮ নভেম্বর); সেদিন রবীন্দ্রনাথ সভায় যে ভাষণ দেন তাহাতে তিনি বলেন, "Turkey was once called 'the Sickman

১ V. B. News 1938 Nov. p 89.

২ রবীন্দ্রজীবনী ১ম খণ্ড পৃ ২০ পাদটীকা।

of Europe' until Kemal came and set before us an example of a new Asia whose living present recalled the glories of dead past···Kemal Pasha's heroism was not on the battle-field only; he waged a relentless war against the tyranny of blind superstition which perhaps is the deadliest enemy a people have to contend against. To his own people he was a great deliverer; to us he should remain a great example; for standing on the quicksand of piety which is no better than prejudice, we are drifting towards a national disintegration.

"To my Hindu Countrymen I can say with confidence: 'your society is groaning under the weight of meaningless observances. If you cannot sacrifice prejudice and meet the challenge of a new age, then indeed you are doomed.

"To my Muslim Countrymen, who resent any criticism, I can only point to the examples of Turkey and Persia."

কবি তুর্কী ও পারস্যের ধর্মবিষয়ক যে উদারতার কথা বলিলেন, তাহা তুর্কীর ক্ষেত্রে সত্য হইতেও পারে—পারস্যের ক্ষেত্রে আদৌ সত্য নহে। পারস্যের শিয়া মুসলমান মোল্লাদের গোঁড়ামির কথা কবি ভালোরূপে জানিতে পারেন নাই; তাহাদের ধর্মান্ধতার ফলে বাহাই-রা কীভাবে নির্যাতীত হইয়াছিল তাহা কবি বিস্মৃত হইয়া থাকিবেন; কবি বাহাইদের সম্বন্ধে ভালো করিয়াই জানিতেন এবং আবদুল বাহা সম্বন্ধে নিউইয়র্কে ভাষণ দান করেন। এইটি প্রসঙ্গত আমরা পাঠকদের জন্য পেশ করিলাম।[১]

দেশের দিকে তাকাইয়াও আজ কোনো ভরসা পাইতেছেন না; সেখানে দেখিতেছেন—রাজনীতির মধ্যে না-আছে শৌর্য, না-আছে বীর্য, না-আছে বৃহৎ আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধা ও অভিনিবেশ। কবি হতাশভাবে একখানি পত্রে লিখিতেছেন, "আমার মন সরে যেতে চাচ্ছে সুদূরে—সেই দূরকে নিজের ভিতরেই সৃষ্টি করবার চেষ্টা করচি।"[২] তাঁহার ইচ্ছা সায়ান্স চর্চা করেন—নক্ষত্রলোকের বিরাট দেশকালের মধ্যে তীর্থযাত্রা করিয়া ভূমাকে ভোগ করেন। বিজ্ঞানের তত্ত্বকে আত্মতত্ত্বের সঙ্গে মিলাইয়া অসীমকে উপলব্ধির একান্ত ইচ্ছা। তাই বলিতেছেন, "যে বিশ্বজালে অচিন্তনীয় দূর নীহারিকার সঙ্গে একই আলোকসূত্রে বোনা আমার অস্তিত্ব,—আমার সমস্ত অন্তঃকরণ ধরা দিয়েছে তার টানে, সে আমাকে নিয়ে চলেছে সেই অপরিসীম রহস্যের দিকে যার মধ্যে জীবন-মরণের তাৎপর্য রয়েছে প্রচ্ছন্ন, সেই তাৎপর্যের মধ্যে রয়েছে কোনো একটা চিরন্তন অর্থ—যে অর্থ বহন ক'রে চলেছে অসীমের অভিমুখে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড।" এই দিনে লিখিত 'প্রশ্ন' (১৯৩৮ ডিসেম্বর ৭, নবজাতক) এই পত্রের সঙ্গে পঠনীয়।

চতুর্দিকে বহ্নিবাষ্প শূন্যাকাশে ধায় বহুদূরে
কেন্দ্রে তার তারাপুঞ্জ মহাকাল-চক্রপথে ঘুরে।
আপনার পানে চাই,
লেশমাত্র পরিচয় নাই।

১ The first and the last prophet of Persia, V. B. Q. 1981 Vol. VIII, No. 4.

২ অমিয় চক্রবর্তীকে লিখিত পত্র, ১৯৩৮ ডিসেম্বর ৩ [১৩৪৫ অগ্রহায়ণ ১৭]।

একি কোনো দৃশ্যাতীত জ্যোতি।
কোন্ অজানারে ঘিরি এই অজানার নিত্য গতি।
বহুযুগে বহুদূরে স্মৃতি আর বিস্মৃতি-বিস্তার
যেন বাষ্প পরিবেশ তার
ইতিহাসে পিণ্ড বাঁধে রূপে রূপান্তরে।
'আমি' উঠে ঘনাইয়া কেন্দ্র-মাঝে অসংখ্য বৎসরে।...
এ অজ্ঞেয়সৃষ্টি 'আমি' অজ্ঞেয় অদৃশ্যে যাবে নাবি।

এই অজানার কথা কবির কাব্যে ও রচনায় বারে বারে আসিয়া পড়িলেও এই অজানা অনিশ্চিত নহে।

পত্র ও কবিতা লিখিয়া নক্ষত্রলোকে বিচরণের সুখ অনুভব করিতে পারেন; কিন্তু বাস্তব জগত—বিশেষভাবে বিশ্বভারতী—সকালে চোখ মেলিলেই শত প্রশ্ন সহস্র সমস্যা লইয়া দ্বারে উপনীত হয়। তাহাকে এড়াইতে পারেন না, এড়াইতে চাহেনও না; কারণ সবের মধ্যেই তাঁহার আনন্দ ছিল।

শান্তিনিকেতনের বিদ্যায়তনের মধ্যে কিছু-না-কিছু পরিবর্তন চলেই। পাঠকের স্মরণ আছে ১৯৩২ সাল হইতে শিক্ষাভবন (কলেজ) ও পাঠভবন (স্কুল) একই পরিচালকের অধীনে আনীত হয় ও ডক্টর ধীরেন্দ্রমোহন সেন অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। ১৯৩৭ সালে অক্টোবরে ধীরেন্দ্রমোহন বিলাত গেলে প্রমদারঞ্জন ঘোষ প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য কর্তৃক উভয়-বিভাগের অধ্যক্ষ মনোনীত হইয়াছিলেন। এইবার পূজাবকাশের পর বিদ্যালয় খুলিলে পুনরায় দুই বিভাগ পৃথক্ করা হইল (১৯৩৮ নভেম্বর ১৫)। প্রমদারঞ্জন স্কুলবিভাগের রেকটর ও অনিলকুমার চন্দ কলেজবিভাগের প্রিন্সিপাল নিযুক্ত হইলেন; অনিলকুমার কবির সেক্রেটারির কাজ পূর্বের ন্যায় করিতে লাগিলেন।

এই সময়ে অনুষ্ঠিত শান্তিনিকেতনে একটি ঘরোয়া উৎসবের সংবাদ আছে; রবীন্দ্রনাথের পুত্র রথীন্দ্রনাথের পঞ্চাশৎ বৎসর পূর্ণ হইলে কবি পুত্রের আয়ু ও মঙ্গল কামনা করিয়া একটি কবিতা লিখিয়া দেন (১৯৩৮ নভেম্বর ২৭॥ ১৩৪৫ অগ্রহায়ণ ১১)। পুত্রের প্রতি পিতার স্নেহ স্বাভাবিক। কিন্তু রথীন্দ্রনাথ তাঁহার পিতার কর্মের সহায়মাত্র ছিলেন না, তাঁহার আদর্শকে মূর্তি দান করিবার জন্য তিনি যে শ্রম ও ত্যাগ স্বীকার করিয়াছিলেন তাহাই আজ কবি প্রকাশ করিলেন কবিতায়। রবীন্দ্রনাথের ন্যায় অদ্ভুত খেয়ালী প্রতিভাকে লইয়া চলা যে কী কঠিন, তাহা বাহিরের লোকের পক্ষে জানা সহজ নহে। যাহাই হউক রথীন্দ্রনাথের এই জন্মদিন পারিবারিক ঘটনা হিসাবে স্মরণীয় হইলেও শান্তিনিকেতনের ইতিহাসের দিক্ হইতেও এইটি উপেক্ষণীয় হয় নাই; আশ্রমে ছাত্র-অধ্যাপকগণের সম্মিলিত শুভইচ্ছা স্বতঃস্ফূর্ত হয়। উক্ত কবিতাটি "মধ্যপথে জীবনের মধ্যপথে উত্তরিলে আজি" এখনো গ্রন্থভুক্ত হয় নাই।

রবীন্দ্রনাথের বয়স আঠাত্তর বৎসর হইলেও বিশ্বভারতীর সর্ববিভাগের কাজের সঙ্গে যোগ এখনো রক্ষা করিয়া চলিয়াছেন। স্থির হইয়াছে শ্রীনিকেতন শিল্পভবনের একটি স্থায়ী ভাণ্ডার[১] কলিকাতায় খোলা হইবে (১৯৩৮ ডিসেম্বর ৮) এবং সেটি কন্‌গ্রেসপ্রেসিডেন্ট সুভাষচন্দ্রবসু উদ্‌ঘাটন করিবেন। সুভাষচন্দ্র তখন পঞ্জাবে; কবির প্রতি তাঁহার অন্তরিক শ্রদ্ধার আকর্ষণে তিনি পঞ্জাব হইতে কলিকাতায় চলিয়া আসিলেন, দুঃখের বিষয় রবীন্দ্রনাথ শরীরের জন্য উৎসবে যোগদান করিতে পারিলেন না; তিনি যে ভাষণ লিখিয়াছিলেন তাহা রথীন্দ্রনাথ পাঠ করিলেন।[২]

১ কলিকাতায় ২১০ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট-এ বিশ্বভারতী বুকশপের সংলগ্ন কক্ষে শ্রীনিকেতনের গৃহশিল্পজাত সামগ্রীর ভাণ্ডার খোলা হইয়াছে। বর্তমানে (১৯৫৩) ধর্মতলা স্ট্রীটে।

২ বিশ্বভারতী শ্রীনিকেতন শিল্পভাণ্ডার উদ্বোধন, অভিভাষণ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ২১০ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট কলিকাতা, ২২ শে অগ্রহায়ণ ১৩৪৫, ৮ পৃষ্ঠা; প্রবাসী ১৩৪৫ পৌষ পৃ ৪৮২-৮৪।

এই ভাষণ হইতে কয়েকটি পঙ্‌ক্তি মাত্র উদ্ধৃত করিতেছি: "সৃষ্টিকার্যে আনন্দ মানুষের স্বভাবসিদ্ধ, এইখানেই সে পশুদের থেকে পৃথক্ এবং বড়ো। পল্লী যে কেবল চাষবাস চালিয়ে আপনি অল্প পরিমাণে খাবে এবং আমাদের ভূরি পরিমাণে খাওয়াবে তা তো নয়। সকল দেশেই পল্লীসাহিত্য, পল্লীশিল্প, পল্লীগান, পল্লীনৃত্য নানা আকারে স্বতঃস্ফূর্তিতে দেখা দিয়েছে। কিন্তু আমাদের দেশে আধুনিক কালে বাহিরে পল্লীর জলাশয় যেমন শুকিয়েছে কলুষিত হয়েছে, অন্তরে তার জীবনের আনন্দউৎসেরও সেই দশা। সেইজন্যে যে রূপসৃষ্টি মানুষের শ্রেষ্ঠ ধর্ম, শুধু তার থেকে পল্লীবাসীরা যে নির্বাসিত হয়েছে তা নয়, এই নিরন্তর নীরসতার জন্যে তারা দেহে প্রাণেও মরে। প্রাণে সুখ না থাকলে প্রাণ আপনাকে রক্ষার জন্যে পুরো পরিমাণ শক্তি প্রয়োগ করে না—একটু আঘাত পেলেই হাল ছেড়ে দেয়।·· শুকনো কঠিন কাঠে শক্তি নেই, শক্তি আছে পুষ্পপল্লবে আনন্দময় বনস্পতিতে। যারা বীরজাতি তারা যে কেবল লড়াই করেছে তা নয়, সৌন্দর্যরস সম্ভোগ করেছে তারা, শিল্পরূপে সৃষ্টিকাজে মানুষের জীবনকে তারা ঐশ্বর্যবান করেছে, নিজেকে শুকিয়ে মারার অহংকার তাদের নয়···অন্য শক্তির সঙ্গে সঙ্গেই তাদের আছে সৃষ্টিকর্তার আনন্দ-রূপসৃষ্টির সহযোগিতা করবার শক্তি। সৌন্দর্যের সঙ্গে পৌরুষের অন্তরঙ্গ সম্বন্ধ, জীবনে রসের অভাবে বীর্যের অভাব ঘটে। আমার ইচ্ছা ছিল সৃষ্টির এই আনন্দপ্রবাহে পল্লীর শুষ্কচিত্তভূমিকে অভিষিক্ত করতে সাহায্য করব, নানাদিকে তার আত্মপ্রকাশের নানা পথ খুলে যাবে। এই রূপসৃষ্টি কেবল ধনলাভ করবার অভিপ্রায়ে নয়, আত্মলাভ করবার উদ্দেশে।"

এই ভাষণের শেষাংশে বিশ্বভারতীর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কবি আশঙ্কা জ্ঞাপন করিয়া বলেন, "দেশের বিরোধী বুদ্ধি অনেক সময়ে এই বলে আস্ফালন করে যে, শান্তিনিকেতনে শ্রীনিকেতনে আমি যে কর্মমন্দির রচনা করেছি আমার জীবিত কালের সঙ্গেই তার অবসান। একথা সত্য হওয়া যদি সম্ভব হয় তবে তাতে কি আমার অগৌরব, না তোমাদের? তাই আজ আমি এই শেষ কথা বলে যাচ্ছি, পরীক্ষা করে দেখো এ কাজের মধ্যে সত্য আছে কি না, এর মধ্যে ত্যাগের সঞ্চয় পূর্ণ হয়েছে কিনা।" রবীন্দ্রনাথের অভিভাষণের পর সুভাষচন্দ্র বলেন যে, শান্তিনিকেতন ও শ্রীনিকেতন রবীন্দ্রনাথের জীবিত কালের পর বর্তমান থাকিবে না, ইহা মিথ্যা কথা। ইহাতে শাশ্বত সত্য যদি কিছু থাকে, তবে তাহা অবিনশ্বর। হয়তো ইহার বর্তমান আকার (শান্তিনিকেতন ও শ্রীনিকেতন) স্থায়ী না হইতে পারে। কিন্তু তাহা হইলেও ইহার সত্য অংশ ভিন্ন আকারে চিরস্থায়ী হইবে।[১]

বর্তমানে দেশে পল্লীসংস্কারের যে উদ্যোগ চলিতেছে, চিন্তায় ও কর্মে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার অন্যতম প্রধান ও প্রথম পথপ্রবর্তক। সুভাষচন্দ্র তাঁহার উদ্বোধনী বক্তৃতায় এই বিষয়ে তাঁহার ব্যক্তিগত একটি স্মৃতিকথার উল্লেখ করেন। তিনি বলেন যে প্রায় চব্বিশ বৎসর পূর্বে তিনি ও তাঁহার কয়েকজন বন্ধু রবীন্দ্রনাথের কাছে স্বদেশসেবার বিষয়ে উপদেশ লইতে গিয়াছিলেন। নানারূপ ভাবধারার সংঘাত তখন দেশে চলিতেছিল। কবির নিকট হইতেও কবিজনোচিত উদ্দীপনাময়ী বাণীই তাঁহারা প্রত্যাশা করিয়াছিলেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ বলিলেন শুধু গ্রামসংগঠনের কথা—এই নীরস কথা শুনিয়া সেই তরুণ বয়সে তাঁহারা মোটেই প্রীত হন নাই। কিন্তু যতই দিন যাইতেছে রবীন্দ্রনাথের সেই উপদেশের মর্ম তিনি ভালো করিয়া উপলব্ধি করিতেছেন। (প্রবাসী ১৩৪৫ পৌষ পৃ ৪৮৩)

কলিকাতায় শিল্পভাণ্ডার স্থাপনের প্রায় সমসাময়িক ঘটনা হইতেছে শান্তিনিকেতনে কলাভবনে হ্যাভেল স্মৃতি-মন্দির প্রতিষ্ঠা। ই. বি. হ্যাভেলের নিকট ভারতীয় কলা যে কী পরিমাণ ঋণী তাহা অনেকের নিকট আজ অস্পষ্ট। আধুনিক ভারতের আত্মমর্যাদা তথা তাহার কলা-চেতনা উদ্‌বুদ্ধ করিবার জন্য যে কয়জন বিদেশী মনীষী ও মনস্বিনী

১ প্রবাসী ১৩৪৫ পৌষ পৃ ৪৮৩।

সহায়তা করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে হ্যাভেল, ওকাকুরা ও নিবেদিতা (মিস্ নোবল্)-এর নাম অমর স্থান লাভ করিবে। এই ভাবুকত্রয়ের সুষ্ঠু আলোচনা একান্ত বাঞ্ছনীয়। এই দিন রবীন্দ্রনাথ যে কথাগুলি বলেন, তাহাও স্মরণীয়।[১]

কবি বলিলেন, "চিত্রকলায় রূপসাধনার পরিচয় আমাদের বাড়িতেই পাই। অবন [অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর] যখন প্রথম তুলি ধরলেন তিনিও বিদেশী পথেই শিক্ষাযাত্রা আরম্ভ করেছিলেন, ইস্কুলমাস্টারের স্বাক্ষরের মক্‌শো ক'রে। ···সেই চির-ছাত্রগিরির দুর্দিন আজও হয়তো চলত যদি হ্যাভেল এসে দৃষ্টি না ফিরিয়ে দিতেন।. তিনি ফিরিয়ে দিলেন সেইদিকে ভারতীয় রূপকলার যেখানে প্রাণপুরুষের আসন।···সেজন্যে হ্যাভেলের কাছে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করি।"[২]

হ্যাভেল দীর্ঘকাল ধরিয়া ভারত-শিল্পধারাকে পুনঃপ্রবর্তিত করিবার জন্য যেসব প্রবন্ধ ও পত্রাদি লিখিয়াছিলেন ও তৎসংক্রান্ত যেসব আলোচনা সমসাময়িক পত্রিকাদিতে প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহার কাটিং (Cuttings) তিনি সংগ্রহ করিয়াছিলেন। এইসব কাগজপত্র হ্যাভেল-সংগ্রহে আছে; ভারতশিল্পের পুনরুত্থানের ইতিহাস রচনায় একদিন এই সবের প্রয়োজন হইবে।

সাতই পৌষের উৎসবদিনে কবি যথারীতি উপাসনা করিলেন। তিনি ভাষণে বলেন, বুদ্ধির পথে মানুষ বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের যে রহস্য আবিষ্কার করিয়াছে, তাহা বিস্ময়কর। মানুষ "স্থূলকে দেখেছে অস্থূলরূপে তেজোময় সর্বব্যাপকত্বে—জ্ঞানের অভিব্যক্তিত্বে এ তত্ত্ব অত্যাশ্চর্য।" অথচ আত্মার দিক হইতে সে মানুষ কী মূঢ়, কী নিষ্ঠুর। "বুদ্ধির অন্তর্গত এত বড়ো বিরাট বিকাশের সঙ্গে শ্রেয়োবুদ্ধির এমন হীনতার সমাবেশ মনকে ধাঁধা লাগিয়ে দেয়।' কবির মতে মানুষ তাহার 'অভিব্যক্তির আরো উপরের ভূমিকায়' উঠিবে—এখনো সে আত্মার বিকাশে অপরিণত। এই শ্রেণীর মতবাদ বহু আদর্শবাদী বিশ্বাস করেন।[৩]

পরদিন বিশ্বভারতী বার্ষিক পরিষদেও প্রতিষ্ঠাতা-আচার্যরূপে অভিভাষণ দান করিলেন।[৪] কবি এই ভাষণে বিশ্বভারতী স্থাপনের প্রেরণা সম্বন্ধে বলিয়া বক্তৃতাশেষে যে কথাটি বলিলেন, তাহা প্রত্যেকের স্মরণ করা দরকার: "যারা···এখানে আসেন তাঁদের জানিয়ে রাখি আমাদের এই বিদ্যায়তনে ব্যবসায়বুদ্ধি নেই। এখানে ক্ষণে ক্ষণে উত্তেজিত জনমতের অনুবর্তন করে জনতার মন রক্ষা করিনি, এবং সেই কারণে যদি আনুকূল্য থেকে বঞ্চিত হয়ে থাকি তবে সে আমাদের সৌভাগ্য। আমরা কর্মপ্রচেষ্টার মধ্যে শ্রেয়কে বরণ করবার প্রয়াস রাখি। কর্মের সাধনাকে মনুষ্যত্ব সাধনার সঙ্গে এক ব'লে জানি। আমাদের এখানে সাধনার আসন পাতা রয়েছে।" তিনি আরও বলেন, "আমাদের দেশে কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় আছে, সেখানে বাঁধা নিয়মে যান্ত্রিক প্রণালীতে ডিগ্রি বানাবার কারখানা বসেছে।···ব্যাপকভাবে···সংস্কৃতি-অনুশীলনের ক্ষেত্র প্রতিষ্ঠা ক'রে দেব, শান্তিনিকেতন-আশ্রমে এই আমার

১ আজকার এই সভার সভাপতিত্ব করেন পাটনার ব্যারিস্টার প্রফুল্লরঞ্জন দাস। (P. R. Das) শ্রীযুক্ত দাস ভারতশিল্পের বিশেষ অনুরক্ত, তিনি বহুশত টাকা দিয়া নন্দলালের যে দুইখানি চিত্র (আওরেঙজেব ও উমার তপস্যা) ক্রয় করিয়াছিলেন, তাহা এই সময়ে কলাভবনে দান করিয়াছিলেন।

২ ঈ. বি. হ্যাভেল [শান্তিনিকেতনে হ্যাভেল স্মৃতিমন্দির প্রতিষ্ঠা-উপলক্ষ্যে কবির ভাষণ, শ্রীনির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কৃত অনুলিপি অবলম্বনে বক্তা কর্তৃক পুনর্লিখিত। ১৯৩৮ ডিসেম্বর ১১, প্রবাসী ১৩৪৫ মাঘ পৃ ৪৯১-৯৫।

৩ ৭ই পৌষ [শান্তিনিকেতনের বার্ষিক উৎসবে আচার্যের উদ্বোধন ও উপদেশ, শ্রীপুলিনবিহারী সেন কর্তৃক অনুলিখিত ও বক্তা কর্তৃক সংশোধিত] প্রবাসী ১৩৪৫ মাঘ পৃ ৫৬৭-৬৯।

৪ শ্রীপ্রদ্যোতকুমার সেনগুপ্ত কর্তৃক অনুলিখিত ও বক্তা কর্তৃক সংশোধিত, প্রবাসী ১৩৪৫ মাঘ পৃ ৫৯৬-৯৯।

অভিপ্রায় ছিল—সকল রকম কারুকার্য শিল্পকলা নৃত্যগীতবাদ্য নাট্যাভিনয় এবং পল্লীহিত সাধনের জন্যে যেসকল শিক্ষা ও চর্চার প্রয়োজন সমস্তই এই সংস্কৃতির অন্তর্গত ব'লে স্বীকার করব।"

এখানে বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে সাংস্কৃতিক শিক্ষার সঙ্গে কবি পল্লীহিতকর কার্য যুক্ত করিতেছেন। এই রচনার বহু বৎসর পর স্বাধীন ভারতের শিক্ষাপরিকল্পনায় ছাত্রদের এই পল্লীমঙ্গল কর্মকে উপাধি লাভের পক্ষে আবশ্যিক করা যায় কিনা, সে বিষয়ে আলোচনা শোনা যাইতেছে। Society and education, community and education প্রভৃতি লইয়া বহু আলোচনা দেশেবিদেশে হইতেছে ; শিক্ষাকে পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে মিলাইবার প্রশ্ন কবির ভাবনার মধ্যে আসিয়াছিল বহুকাল পূর্বে।

এবার সাতই পৌষ উৎসবের প্রথম দিনে এলমহার্স্ট বিলাত হইতে আসেন ; তিনি ষোলো বৎসর পূর্বে কয়েকজন কর্মী লইয়া শ্রীনিকেতনের কাজ আরম্ভ করেন। দেশে ফিরিয়া গিয়া ১৯২৫ সালে ডিভনসায়ারে টটনেস-এ ডার্টিংটন হল নামে যে বিদ্যানিকেতন স্থাপন করেন তাহা শ্রীনিকেতনের আদর্শেই গঠিত। এলমহার্স্ট লিখিয়াছেন "It is some of these same principles that we learnt from the Poet that we have been trying out in Devonshire, Dartington Hall since 1925".[১] সেখানে কিভাবে কাজ চলিতেছে তাহার কিঞ্চিৎ আভাস আমরা পাই ধীরেন্দ্রমোহন সেনের বিদেশ ভ্রমণ অভিজ্ঞতার প্রতিবেদন হইতে।[২]

এনড্রুস সাহেবও বহুদিন পরে উৎসবের শেষভাগে আশ্রমে আসিয়া পৌঁছিলেন ; তবে একদিন মাত্র থাকিয়া এলাহাবাদ যাত্রা করিলেন ; সেখানে অল্ ইন্ডিয়া ফিলজোফিক্যাল কন্‌গ্রেসের সভাপতিত্ব করিবেন। পুনরায় ১৩ জানুয়ারি আশ্রমে ফিরিয়া কবির নানা কাজে সহায়তা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

পৌষ উৎসবের প্রায় সপ্তাহব্যাপী আনন্দ-কোলাহল, উত্তেজনা ও সভাসমিতির অন্তে কবির মন আত্মজিজ্ঞাসু হইয়াছে। কবির বয়স হইয়াছে, নূতন ভাবুকদলের সহিত যোগসূত্র ক্ষীণ হইয়া আসিতেছে, এ অভিযোগ আজকাল শোনেন। সুধীন্দ্রনাথ দত্তকে 'আকাশপ্রদীপে'র উৎসর্গপত্রে লিখিয়াছিলেন, "তোমাদের কালের সঙ্গে আমার যোগ লুপ্তপ্রায় হয়ে এসেছে এমনতরো অস্বীকৃতির সংশয়বাক্য তোমার কাছ থেকে শুনিনি।" বোধ হয় মনের এই পরিবেশে লিখিত হয় 'মাল্যতত্ত্ব' (১৯৩৮ ডিসেম্বর ৩১, প্রহাসিনী) ও 'সময়হারা' (১৯৩৯ জানুয়ারি ১, আকাশপ্রদীপ)।[৩] হালকাসুরে লঘুভাবে গভীর কথারই প্রকাশ :

খবর এল, সময় আমার গেছে,
আমার গড়া পুতুল যারা বেচে
বর্তমানে এমনতরো পসারী নেই
সাবেক কালের দালানঘরের পিছন কোণেই
ক্রমে ক্রমে উঠছে জমে জমে
আমার হাতের খেলনাগুলো, টানছে ধুলো।

...এতক্ষণ যা বকা গেল এটা প্রলাপমাত্র
নবীন বিচারপতি ওগো, আমি ক্ষমার পাত্র ;
পেরিয়ে মেয়াদ বাঁচে তবু যে-সব সময়হারা
স্বপ্নে ছাড়া সান্ত্বনা আর কোথায় পাবে তারা।



১ V. B. News 1939 Jan. p 52.

২ V. B. News 1938 July p 4-7. ডার্টিংটন হলের Hd. Master Carryর বই পড়িতে পড়িতে মনে হইতেছিল কবির শিক্ষাদর্শের কথাই যেন পড়িতেছি, অবশ্য Carry সাহেব জানেন না যে তাঁহার বিদ্যায়তনের স্রষ্টা এলমহার্স্ট কবির নিকট হইতে প্রেরণা পান ; সেই প্রেরণা তাঁহাকে এই নববিদ্যালয় স্থাপনের জন্য উদ্‌বোধিত করে।

৩ ১০৪৫ পৌষ ১৬, ১৯৩৯ জানুয়ারি ১ আকাশপ্রদীপ, পৃ ৪৯-৫০।

'সময়হারা'র পূর্বদিন লেখেন 'মাল্যতত্ত্ব' (১৯৩৮ ডিসেম্বর ৩১, প্রহাসিনী পৃ ৫৯-৬৫); সেখানেও হালকাভাবে সবটা বলিয়া শেষকালে বলিলেন :

আমি বললেম, ওগো কন্যে, গলদ আছে মূলেই.
এতক্ষণ যা তর্ক করছি সেই কথাটা ভুলেই।
মালাটাই যে ঘোর সেকেলে, সরস্বতীর গলে
আর কি ওটা চলে।
রিয়ালিস্টিক প্রসাধন যা নব্যশাস্ত্রে পড়ি
সেটা গলায় দড়ি।

শীতের সময় শান্তিনিকেতনে অতিথিঅভ্যাগতের ভিড় হয়; অনেকেই আসেন কৌতূহলবশত, কেহ আসেন সত্যকার শ্রদ্ধা ও প্রীতি লইয়া; কেহ আসেন বিশ্বভারতী দেখিতে, অধিকাংশই আসেন সেই সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের দর্শনপ্রার্থী হইয়া।

সাধারণ অতিথি ছাড়া বিশিষ্ট অতিথি-সমাগমও হয়। এবার শান্তিনিকেতনে আসেন ত্রিপুরার মহারাজা বীরবিক্রম কিশোরমাণিক্য ও কন্‌গ্রেসের রাষ্ট্রপতি সুভাষচন্দ্র বসু। মহারাজার সহিত আশ্রমের প্রাক্তন ছাত্র ত্রিপুরারাষ্ট্রের তদানীন্তন শিক্ষাসচিব সোমেন্দ্রচন্দ্র দেব বর্মণ ও অন্যান্য পার্ষদগণ আসিয়াছিলেন (১৯৩৯ জানুয়ারি ৯)। ত্রিপুরার রাজপরিবারের সহিত কবির দীর্ঘদিনের সম্বন্ধ; কিন্তু ইতিপূর্বে এই বংশের কোনো মহারাজা আশ্রমে আসেন নাই—সেদিক হইতে মহারাজা বীরবিক্রম কিশোরের এখানে আসা বিশেষভাবে স্মরণীয়; তাঁহার প্রীত্যর্থে নৃত্যনাট্য চণ্ডালিকা অভিনীত হয়। মহারাজ ঐদিন সংগীতভবনের জন্য বিশ হাজার টাকা দিবার প্রতিশ্রুতি দান করেন।[১]

পক্ষকাল পরে রাষ্ট্রপতি সুভাষচন্দ্র বসু কবিসন্দর্শনে শান্তিনিকেতনে আসেন (১৯৩৯ জানুয়ারি ২১)। শান্তিনিকেতন ও বোলপুরবাসীরা কন্‌গ্রেসের সভাপতির যথোপযুক্ত সম্মান দান করিয়াছিলেন।[২]

সুভাষচন্দ্র চলিয়া যাইবার কয়েকদিন পরে হিন্দীভবনের উদ্বোধন উপলক্ষ্যে জবহরলাল নেহেরু শান্তিনিকেতনে আসিলেন। পাঠকের স্মরণ আছে একবৎসর পূর্বে (১৯৩৮ জানুয়ারি ১৬) এন্‌ড্রুস সাহেব এই গৃহের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন; এ বিষয়ে পূর্বে আলোচনা হইয়া গিয়াছে। ৩১ জানুয়ারি (১৯৩৯ ॥ ১৩৪৫ মাঘ ১৭) জবহরলাল হিন্দীভবনের দ্বার উদ্‌ঘাটন করিলেন। এবার জবহরলাল শান্তিনিকেতনে তিন দিন ছিলেন (৩১জানু—২ ফেব্রু); তিনি রবীন্দ্রনাথের অতিথি—উত্তরায়ণেই ছিলেন। শেষদিন সুভাষচন্দ্র বসু তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য আসেন। কবির আশ্রমে ভারতের এই দুই অসাধারণ মানুষের সাক্ষাৎ স্মরণীয় ঘটনা।

আমাদের আলোচ্যপর্বে কন্‌গ্রেসের সভাপতি নির্বাচন লইয়া কন্‌গ্রেসীদলের মধ্যে মতভেদ দেখা দিয়াছে। ২৯ জানুয়ারি নিখিলভারত কন্‌গ্রেসকমিটিতে সুভাষচন্দ্র আগামী বৎসরের জন্য প্রেসিডেণ্ট নির্বাচিত হইয়াছেন; গান্ধীজি প্রমুখ নেতৃবৃন্দ পট্টভি সীতারামিয়াকে প্রেসিডেণ্ট হইবার জন্য মনোনীত করেন; পট্টভি পরাভূত হইলেন। আমাদের মনে হয় কন্‌গ্রেসের এই পরিস্থিতি আলোচনার জন্য সুভাষচন্দ্র দ্বিতীয়বার শান্তিনিকেতনে আসিয়া জবহরলালের সহিত সাক্ষাৎ করেন।

১ কবির মানপত্র, প্রবাসী ১৩৪৫ মাঘ পৃ ৬২৩।

২ "January 21 [1939], we had the honour of a visit from the Congress President Subhas Chandra Bose. This has practically been the first visit from a Congress President in office to our Institution, (Pandit Jawaharlal Neheru had come as President in 1936, but that was during the Pujah vacation) and we naturally made the most of the great event. Rashtrapati Bose was accorded a cordial reception in the Amra-Kunja soon after his arrival where Gurudeva received him and gave him his blessings. The Rashtrapati went through a crowded programme during the two days that he stayed here which included several informal meetings with the students." V. B News 1939 Feb.

জবহরলালের সহিত কী কথাবার্তা হয় এবং রবীন্দ্রনাথ তথায় ছিলেন কিনা আমরা জানি না। তবে এই সাক্ষাৎকারের কয়েকদিন পরে সুভাষচন্দ্র গান্ধীজির সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য বরধা যাত্রা করেন (১৫ ফেব্রু)। মহাত্মাজি ঘোষণা করিয়াছিলেন যে তিনি শুরু হইতেই সুভাষের পুনর্নির্বাচনের বিরোধী। তিনি বলিলেন, সীতারামিয়ার পরাজয় তাঁহারই পরাজয় ("the defeat is more mine than his")। তিনি নূতন সভাপতির সহিত অসহযোগ ঘোষণা করিলেন ("They must abstain when cannot co-operate. I must remind all Congressmen that those who being Congress-minded remain outside the Congress by design, represent it most")। তৎসত্ত্বেও সুভাষ গান্ধীজির সহিত সাক্ষাৎ করিলেন—বোধ হয় জবহরলালের পরামর্শে। জবহরলালকে সুভাষচন্দ্র শ্রদ্ধা করিতেন, তবে গান্ধীজি সম্বন্ধে তাঁহার অন্ধঅনুরক্তিকে তিনি সমালোচনার উর্ধ্বে মনে করিতেন না। জবহরলাল সম্বন্ধে সুভাষ লিখিয়াছিলেন, "The position of Pandit Jawaharlal Nehru in this connection is an interesting one. His ideas and views are of a radical nature and he calls himself a fullblooded socialist but in practice he is a loyal follower of the Mahatma. It would probably be correct to say that while his brain is with the left wingers, his heart is with Mahatma Gandhi."[১]

জবহরলাল ও সুভাষ—উভয়েই ২ ফেব্রুয়ারি (১৯৩৯) শান্তিনিকেতন ত্যাগ করিলেন; একমাস পরে ত্রিপুরীতে কন্‌গ্রেসের অধিবেশন। যথাস্থানে সে সম্বন্ধে আলোচনা করা হইবে।

ইহার কয়েকদিন পরেই শ্রীনিকেতনের সাম্বৎসরিক উৎসব উপলক্ষ্যে আসিলেন বিহার-কন্‌গ্রেস নেতা বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ। আর আসিলেন কলিকাতার লর্ড বিশপ ও মেট্রোপলিটান। মেট্রোপলিটান ব্রতীবালকদের পারিতোষিক বিতরণ করিলেন। রাজেন্দ্রপ্রসাদ এখানে আসিয়া অসুস্থ হইয়া পড়েন বলিয়া ৮ই পাটনায় ফিরিয়া যান। মেট্রোপলিটান কলিকাতায় ফিরিয়া গিয়া কবিকে যে পত্র দেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল; এই পত্রে আশ্রমের অন্তরের রূপটি তাঁহার আধ্যাত্মিক দৃষ্টির গোচরীভূত হয়।

তিনি লিখিতেছেন, "It had long been my ambition to visit you there, and my one regret now is that I had not done so long ago. I feel rather like the queen of Sheba who after visiting the court of King Solomon, admitted that the half had not been told her. That is certainly true of Santiniketan and I feel that the half cannot be told; for you cannot describe the 'spirit' of a place save in wholly inadequate terms; and it is the spirit pervading the work,...which is so impressive....It seemed to me that certain principles ran through the whole, which I summed up in my mind by such words as 'Growth'; for the whole had sprung naturally from the development of the original school, and each department as it reached maturity had separated, as a unit, in the complex structure."[২]

এবার উৎসবক্ষেত্রে কবি যে ভাষণ দেন, তাহার বিষয় ছিল 'পল্লীসেবা'।[৩] এই ভাষণে কবি দেশবাসী ও শ্রীনিকেতনের কর্মীদের বলেন যে দেশকে নূতন করিয়া গড়িয়া তুলিতে হইলে জ্ঞানের পংক্তিভেদ করিলে চলিবে না।

১ The Rebel President by Durlab Singh, Lahore 5th Ed. 1944.

২ V. B. News VII, 1939 March p 67.

৩ প্রবাসী ১৩৪৬ ফাল্গুন পৃ ৬৬২-৬৩।

কবি বলিলেন, "গ্রামবাসীদের অসম্মান কোরো না।...মনে রাখতে হবে শ্রেষ্ঠত্বের উৎকর্ষে সকল মানুষেরই জন্মগত অধিকার, গ্রামে গ্রামে আজ মানুষকে সেই অধিকার ফিরিয়ে দিতে হবে। সকলের চেয়ে বড়ো দরকার শিক্ষার সাম্য।" এই ভেদহীন শিক্ষার কথা কবির বহু ভাষণের মধ্যে দেখা যাইতেছে।

শ্রী-তে অভিনয়

কলিকাতায় শ্যামা, চণ্ডালিকা ও তাসের দেশের অভিনয় করার প্রস্তাব আসিয়াছে। পৌষ-উৎসবের (১৩৪৫) পর কবি এই তিনটি নাটিকা সংস্কারে প্রবৃত্ত হইলেন; অমিয়চন্দ্রকে লিখিতেছেন (১৯৩৯ জানুয়ারি ১২), 'তিনটে নাটকের রিহার্সল আমার ঘাড়ে চেপেছে'। নাটকের মহড়া অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাঁহার সম্মুখেই হইত; অভিনয়গুলিকে সকল প্রকারে সুন্দর করিবার জন্য কী যে মেহনত করিতেন, তাহা সমসাময়িক কর্মীরাই জানেন। তাঁহার নিজের পক্ষে এই সৃষ্টির পর্ব ছিল আনন্দলোকে বাস। একখানি পত্রে লিখিতেছেন, "দীর্ঘকাল আমার মন ছিল গুঞ্জনমুখরিত। আনন্দে ছিলুম। সে আনন্দ বিশুদ্ধ, কেননা সে নির্বস্তুক (abstract)।...গানেতে মনের মধ্যে এনে দেয় একটা দূরত্বের পরিপ্রেক্ষণী। বিষয়টা যত কাছেরই হোক সুরে হয় তার রথযাত্রা।" নিজের সাম্প্রতিক মনোভাব সম্বন্ধে কবি বলিতেছেন, "এখনকার মতো দুটো পাকা ঠিকানা পেয়েছি আমার বানপ্রস্থের—গান আর ছবি। যখন বাস্তব সাহিত্যের পাহারাওয়ালা আমাকে তাড়া করে তখন আমার পালাবার জায়গা আছে আমার গান।...আর আছে আমার ছবি; কোথা থেকে দেখা দিতে এসেছে এই শেষ বেলায়, যখন রোদ্দুর পড়ে এল।"[১]

কলিকাতায় 'শ্রী' রঙ্গমঞ্চে অভিনয়—ছাত্রছাত্রীর দল কলিকাতায় চলিয়া গেল। কবি ৬ ফেব্রুয়ারি (১৯৩৯) শ্রীনিকেতনের বাৎসরিক উৎসব সম্পন্ন করিয়া ৭ই কলিকাতায় গেলেন। কবি যেদিন কলিকাতায় পৌঁছিলেন, সেইদিন সন্ধ্যায় ২১০ কর্নওয়ালিশ স্ট্রীটে বিশ্বভারতীর অফিসে বিশ্বভারতী সম্মিলনীর উদ্বোধন-সভায় তাঁহাকে উপস্থিত হইতে দেখি। পরদিন 'শ্রী'তে 'তাসের দেশ' অভিনয় দেখিয়া কবি ১৪ ফেব্রুয়ারি মধ্যাহ্নে শান্তিনিকেতনে ফিরিয়া আসিলেন। কবির এত তাড়াহুড়া করিয়া কলিকাতা হইতে ফিরিবার কারণ, ঐদিন আওয়াগড়ের রাজা সূর্যপাল সিংহ শান্তিনিকেতনে আসিতেছেন, তাঁহার সংবর্ধনা হইবে। ঘটনাটি বিশেষভাবে বলিবার মতো; কারণ রবীন্দ্রনাথের যে কয়জন ভক্ত সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থভাবে কবি ও বিশ্বভারতীর প্রতি শেষপর্যন্ত অনুরক্ত ছিলেন, তাঁহাদের অন্যতম সূর্যপাল সিংহ। বিশ্বভারতীর উদ্দেশে তিনি বহু সহস্র টাকা কয়েকবারই দান করিয়াছিলেন। শান্তিনিকেতনের উত্তরে তিনি এক সুবৃহৎ অট্টালিকা নির্মাণ করেন—সেই অট্টালিকা তিনি বিনাশর্তে বিশ্বভারতীকে দান করিয়া গিয়াছেন। এই অকৃত্রিম নীরব সুহৃদটির প্রতি কবি তাঁহার অন্তরের প্রীতি জ্ঞাপনার্থে কলিকাতা হইতে আসিয়া পড়িলেন।

পাঠকের স্মরণ আছে ১৩৪৩ সালের আশ্বিন মাসে কবি 'কথা ও কাহিনী'র 'পরিশোধ' কবিতাটিকে অবলম্বন করিয়া একটি গীতিনাট্য রচনা করেন এবং শান্তিনিকেতনের ছাত্রছাত্রীরা কলিকাতার আশুতোষ কলেজহলে (১৯৩৬ অক্টোবর ১০ ও ১১) তাহা অভিনয় করেন।[২] সেই পরিশোধের রূপান্তর 'শ্যামা'। 'শ্যামা' অনেকবারই শান্তিনিকেতনে অভিনীত হইয়াছে এবং রূপান্তরিত হইয়াছেও বহুবার। দ্বিতীয়বারের অভিনয়ের সময় 'উত্তীয়'-এর

১ পত্রালাপ, শান্তিনিকেতন, ১৯৩৯ ফেব্রুয়ারি ১৪, প্রবাসী ১৩৪৫ চৈত্র পৃ ৭৮২-৮৫।

২ প্রবাসী ১৩৪৩ কার্তিক পৃ ১-১১। এই পাঠ আছে র-র ২৫শ খণ্ডের ২০৯-০৮ পৃষ্ঠায়।

অবতারণা ও ঘাতকহস্তে তাহার হত্যা নূতন সংযোজন। হত্যার দৃশ্যটি সম্বন্ধে সমালোচকরা মনে করেন যে এইটি নাটকের একটি দুর্বল অংশ। কবি সেটি জানিতেন; পারিপার্শ্বিকের অনুরোধে-উপরোধে এই অবান্তর অংশটি যোগ করিয়া দেন ও ঘাতকের নৃত্যাদির দ্বারা অভিনয়ের মধ্যে নূতন রস আনয়ন করেন। (রবীন্দ্রসংগীত পৃ ২৬৯)

নাট্যমঞ্চে হত্যা বা মৃত্যুর চিত্র দেখানো সম্বন্ধে প্রাচীন নাট্যকারদের বিশেষ মত ছিল; প্রাচীন নাট্যে এই শ্রেণীর ঘটনা প্রদর্শিত হইত না। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার পুরাতন নাটকে মৃত্যু বা হত্যা দৃশ্য দেখাইয়াছিলেন; কিন্তু সংশোধিত নাটকগুলি হইতে ঐ সব দৃশ্য পরিত্যাগ করেন, যেমন—তপতীও পরিত্রাণে। শ্যামার এই নূতন সংস্করণে এই শ্রেণীর হত্যা দৃশ্যের সংযোজন তাঁহার শেষকালের সংশোধিত নাটকগুলির বিপরীত পথে গিয়াছিল।

পরিশোধ কবিতাটির মূল মহাযান বৌদ্ধগ্রন্থ 'মহাবস্তু-অবদান' অন্তর্গত শ্যামা-জাতক। কবি গল্পাংশ সংগ্রহ করেন রাজেন্দ্রলাল মিত্রের The Sanskrit Buddhist Literature of Nepal (1882) হইতে। অতঃপর ফরাসী পণ্ডিত Emile Senart ১৮৯০ সালে মহাবস্তু গ্রন্থ প্রকাশ করেন। রবীন্দ্রনাথ নেপালে সংস্কৃত বৌদ্ধসাহিত্যগ্রন্থ মধ্যে শ্যামা জাতকের যে সারমর্ম পান তাহাই অবলম্বন করিয়া 'পরিশোধ' কবিতাটি লিখিয়াছিলেন (১৮৯৯ অক্টোবর ৯)। নিম্নে শ্যামা জাতকের গল্পাংশ সংক্ষেপে বর্ণিত হইল। রবীন্দ্রনাথ পরিশোধ ও শ্যামায় উহার কতটুকু গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যাইবে।

বজ্রসেন তক্ষশিলার শ্রেষ্ঠিপুত্র; সে 'অশ্ববাণিজক'। বারাণসী অভিমুখে অশ্ববিক্রয়ের জন্য সে আসিতেছিল। তাহার সঙ্গে ছিল বারাণসীগামী অন্য সার্থবাহ। পথমধ্যে বণিকসার্থ তস্কর কর্তৃক লুণ্ঠিত হয়, বণিকগণও হতাহত হয়। বজ্রসেন কোনো প্রকারে আত্মরক্ষা করিয়া বারাণসীতে উপস্থিত হয়। রাত্রিকালে নগরীর এক 'শূন্যাগারে' সে আশ্রয় লইল। সেই রাত্রিতেই রাজকুলে চৌরকর্তৃক বহুধন অপহৃত হয়। রাজার আজ্ঞায় প্রভাতকালে রক্ষিগণ শূন্যাগারে নিদ্রিত শ্রান্তক্লান্ত ব্রজ্রসেনকে দেখিতে পাইয়া তাহাকেই চোর মনে করিয়া শৃঙ্খলাবদ্ধ করিল। রাজাদেশে তাহার প্রাণদণ্ড হইল।

রাজপুরুষগণ কর্তৃক বজ্রসেন যখন গণিকাবীথির মধ্য দিয়া শ্মশানে নীত হইতেছিল, তখন শ্যামা নাম্নী অগ্রগণিকা দর্শনমাত্রই বজ্রসেনের প্রতি প্রেমাসক্ত হইয়া পড়ে। শ্যামা ভাবিল—এই পুরুষকে যদি না লাভ করিতে পারি তবে মরিব। চেটীকে ডাকিয়া রাজপুরুষদের নিকট পাঠাইয়া বলিল—তোমাদের বহু হিরণ্য দান করিব। অন্য এক পুরুষকে পাঠাইতেছি, তাহার পরিবর্তে বজ্রসেনকে ছাড়িয়া দিয়ো। রাজপুরুষেরা স্বীকৃত হইল। শ্যামার গৃহে উত্তীয় নামে এক শ্রেষ্ঠিপুত্র বাস করিত। শ্যামা ছলপূর্বক তাহাকে ভোজনপাত্রসহ শ্মশানস্থিত বন্দী বজ্রসেনের নিকট পাঠাইল। রক্ষিগণ শ্যামার ইঙ্গিত অনুসারে উত্তীয়কে হত্যা করিয়া বজ্রসেনকে মুক্তি দিল।

শ্যামা বজ্রসেনকে লইয়া বিলাসলীলায় কালাতিপাত করে। কিন্তু বজ্রসেনের মনে শান্তি নাই; সে ভাবে বোধ হয় শ্রেষ্ঠিপুত্রের মতো তাহাকেও শ্যামা একদিন হত্যা করিবে। শ্যামা বজ্রসেনের মনোভাব দেখিয়া অত্যন্ত দুঃখিত। তাহাকে সুখী করিবার জন্য উদ্যানসমন্বিত দীর্ঘিকা নির্মাণ করিল; পুষ্করিণীর চারিদিকে প্রাচীর বেষ্টিত হইল। সেই জলাশয়ে 'অতৃতীয়' অবস্থায় তাহারা জলক্রীড়ায় রত হইল। প্রণয়ের ভান করিয়া পানপাত্র হইতে শ্যামাকে প্রচুর মদ্য পান করাইল, অতঃপর জলমধ্যে তাহাকে লইয়া গিয়া শ্বাসরোধ করিয়া মৃতকল্প করিয়া ফেলিল। বজ্রসেন ভাবিল শ্যামা মরিয়াছে। তখন সে সেই স্থান ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিল ও তক্ষশিলায় ফিরিয়া গেল।

প্রাচীরের বাহিরের প্রতীক্ষমান চেটীগণ ক্রীড়ায় বিলম্ব দেখিয়া শঙ্কিত চিত্তে সেখানে আসিয়া দেখিল শ্যামা মৃতবৎ পড়িয়া আছে, বজ্রসেন পলাতক। বহু শুশ্রূষায় শ্যামার প্রাণসঞ্চার হইলে তাহারা নগরে ফিরিয়া আসিল।

বজ্রসেন পলায়ন করিলে শ্যামা ভীতা হইল; ভাবিল, উত্তীয়ের মৃত্যুসংবাদ শ্রেষ্ঠী জানিতে পারিবে। তখন সে নানা

ভাবে প্রমাণ করিল যে সে শ্রেষ্ঠিপুত্রের জন্য বিধবার ন্যায় বাস করিতেছে। রাজার অনুমতি অনুসারে শ্যামা গৃহবধূরূপে শ্রেষ্ঠিগৃহে প্রবেশলাভ করিল। মুক্তাভরণা শুক্লবসনা শ্যামা সেখানে আকুল হৃদয়ে অশ্ববাণিজক বজ্রসেনের কথাই ধ্যান করে, শ্রেষ্ঠী ও শ্রেষ্ঠিপত্নী ভাবে, শ্যামা তাহাদের পরলোকগত পুত্রের জন্য শোকমগ্না।

অনন্তর কিছুকাল পরে তক্ষশিলা হইতে একদল নট বারাণসীতে আসে। একদিন তাহারা শ্রেষ্ঠিগৃহে ভিক্ষার্থ আসিলে শ্যামা বজ্রসেনের সংবাদ লয় এবং তাহাদের মারফত বজ্রসেনকে সংবাদ প্রেরণ করে। তক্ষশিলায় বজ্রসেন এই বার্তা পাইয়া ভাবিল, শ্যামা তো মরে নাই; পূর্বতন শ্রেষ্ঠিপুত্রের ন্যায় তাহাকে বধ করিতে পারে। এই ভাবিয়া দূরতর দেশে পলায়ন করিল; উভয়ের সাক্ষাৎ আর হইল না।[১]

মূল গল্প অবলম্বন করিয়া রবীন্দ্রনাথ যে আখ্যায়িকা সৃষ্টি করিয়া কবিতায় এবং পরে নাট্যে রূপ দান করেন—তাহা সুবিদিত। ১৯৩৯ সালের অভিনয়কালে রবীন্দ্রনাথ 'শ্যামা'র যে একটি সংক্ষিপ্ত নাট্যপরিচয় লিখিয়া দিয়াছিলেন, তাহা আমরা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম :

প্রথম দৃশ্য। রাজপথে। বজ্রসেন বণিক। সে অনেক সন্ধানে ইন্দ্রমণির হার সংগ্রহ করেছে। তার ইচ্ছা, এই হার সে কাউকে বেচবে না। বিনামূল্যে যাকে পরাতে চায় তাকেই খুঁজে বের করবে। বন্ধু বললে, 'এই হারের প্রতি রাজার চরের লক্ষ্য আছে।' বজ্রসেন বললে, 'সেই ভয়ে যাচ্ছি বিদেশে পালিয়ে।' বলতে বলতে কোটালের চর এসে বললে, 'তোমার পেটিকায় কী আছে, দেখাও।' বজ্রসেন বললে, 'এ তুমি ছুঁয়ো না, এ আমার প্রাণের চেয়ে প্রিয়।' বলে সে ছুটে গেল। কোটালের চর বললে, 'দেখব তুমি কোথায় পালাও'।

দ্বিতীয় দৃশ্য। শ্যামার সভা। শ্যামা রাজনটী, বিখ্যাত সুন্দরী। তার প্রেমে পাগল বালক উত্তীয়। সে শ্যামার পূজা করে দূরের থেকে। সখীদের করুণা তার 'পরে। শ্যামা নৃত্যগীতে প্রবৃত্ত, এমন সময়ে চোর অপবাদ দিয়ে প্রহরী শ্যামার সভার মধ্য দিয়ে বজ্রসেনের পিছন পিছন ছুটে গেল। শ্যামা বজ্রসেনের দেবকান্ত মূর্তি দেখে মুগ্ধ। সখীকে পাঠিয়ে বজ্রসেনের সঙ্গে প্রহরীকে ডেকে পাঠালে। বজ্রসেনকে বাঁচাবার জন্যে দুদিন সময় চাইলে। প্রহরী রাজি হল। শ্যামা সভাস্থদের উদ্দেশ করে বললে, 'তোমাদের মধ্যে এমন বীর কে আছে যে এই নিরপরাধ বিদেশীকে অন্যায় অপবাদ থেকে রক্ষা করবে।' উত্তীয় এসে বললে, 'ন্যায় অন্যায় বুঝিনে, ঐ বিদেশীর নামের অভিযোগ আমি নিজে স্বীকার করে প্রাণ দেব—সেই মৃত্যুর বন্ধনেই তোমার সঙ্গে আমার মিলন হবে।' প্রহরীর কাছে সে আত্মসমর্পণ করলে। কারাগারে তার মৃত্যু হল।

তৃতীয় দৃশ্য। পথে। বজ্রসেনের সঙ্গে শ্যামার মিলনের আনন্দ। দেশত্যাগ করে বজ্রসেন ও শ্যামার পলায়ন। পলাতকা রাজনটীর সন্ধানে প্রহরীর অনুসরণ। সখীরা তাকে ছলনা করে ভুলিয়ে দিলে। শ্যামাকে বার বার বজ্রসেনের প্রশ্ন, কী উপায়ে তাকে উদ্ধার করা হয়েছে। অবশেষে শ্যামার কাছে শুনলে তার জন্যে প্রাণ দিয়েছে উত্তীয়। বজ্রসেন তাকে ধিক্কার দিলে, ক্রুদ্ধ হয়ে তাকে বর্জন করে চলে যাবার সময়ে শ্যামা তাকে ছাড়তে চাইলে না। বজ্রসেন তাকে সাংঘাতিক আঘাত করে চলে গেল; শ্যামার প্রতি প্রেম ভুলতে পারলে না, অনুতাপে দগ্ধ হয়ে ঘুরে বেড়াতে লাগল, শ্যামাকে ডাকতে লাগল মৃত্যুলোক থেকে। সেই আহ্বানে শ্যামার হঠাৎ আবির্ভাব। বললে, 'তোমার নিষ্ঠুর আঘাতের মধ্যেও করুণা ছিল, আমি মরণের দ্বার থেকে তোমার কাছে ফিরে এসেছি।' আবার বজ্রসেনের মনে ধিক্কার জাগল। বললে, 'চলে যাও।' শ্যামা প্রণাম করে চলে গেল।

১ শ্যামা জাতক ও রবীন্দ্রনাথের 'পরিশোধ' কবিতা, শ্রীবিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য, বিশ্বভারতী পত্রিকা, ১১শ বর্ষ ৩য় সংখ্যা ১৩৫৯ মাঘ-চৈত্র রবীন্দ্র-প্রসঙ্গ পৃ ১৫০-৫৭। গল্পাংশ এই প্রবন্ধ হইতে সংকলিত।

পরিতপ্ত বজ্রসেনের গান :

ক্ষমিতে পারিলাম না যে
ক্ষমো এ মম দীনতা,
পাপীজনশরণ প্রভু।
মরিছে তাপে মরিছে লাজে
প্রেমের বলহীনতা
ক্ষমো এ মম দীনতা।
প্রিয়ারে নিতে পারিনি বুকে,
প্রেমেরে আমি হেনেছি,
পাপীরে দিতে শাস্তি শুধু
পাপেরে ডেকে এনেছি।
জানি গো তুমি ক্ষমিবে তারে
যে অভাগিনী পাপের ভারে
চরণে তব বিনতা,
ক্ষমিবে না ক্ষমিবে না
আমার ক্ষমাহীনতা।

শ্যামা ক্ষুদ্র নৃত্যনাটিকা, তিনটি মাত্র দৃশ্য সম্বলিত ; শ্যামা, উত্তীয় ও বজ্রসেন,—এই তিনটি মাত্র চরিত্র—ইহার মধ্যে উত্তীয় বুদ্বুদের ন্যায় মিলাইয়া গেল ; কিন্তু সমস্ত নাটিকার মধ্যে সে-ই আছে সবার অন্তরালে, সকলের অন্তরে। মনস্তত্ত্বর দিক হইতে এই ক্ষুদ্র নাটিকাটি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। মূল শ্যামা জাতক, কথা ও কাহিনীর পরিশোধ কবিতা, পরিশোধের নাট্যীয় রূপ এবং সর্বশেষে 'শ্যামা'য় তাহার রূপান্তর—এই চারিটি পাঠ লইয়া সুবিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন। মনস্তত্ত্বের দিক হইতে এই নৃত্যনাট্যের সুক্ষ্ম আলোচনা করিয়াছেন হরিপদ কেরানি [কানাই সামন্ত] 'উত্তীয়' প্রবন্ধে।[১]

তিনি বলেন, বৈষ্ণবদের মতে 'বয়সের মধ্যে কৈশোর ধ্যেয়, কৈশোরই শ্রেষ্ঠ।' "বালক কিশোর উত্তীয় তাহার নাম, ব্যর্থ প্রেমে মোর উন্মত্ত অধীর।" 'এরূপ ভাবোন্মত্ত কিশোর, এরূপ কবি···এরূপ বাতুল, জাগতিক জীবনে এবং জীবনদর্পণ কাব্যে কাহিনীতে বারংবার দেখা দিয়েছে সন্দেহ নাই।' 'উত্তীয় আপনার কামগন্ধহীন প্রণয় নিবেদনের পাত্রীকে শুধু জীবনই দেয় নাই, আপন হৃদয়শোণিতে এই কাহিনীর শীর্ষভাগে সেই চির-প্রিয়ারই নাম লিখাইয়া লইয়াছে কবিকে দিয়া।'···'এই ভাবোন্মত্ত কিশোর যে করুণহৃদয় কবিকর্তৃক উপেক্ষিত নয়,···লক্ষ্যভ্রষ্ট বাসনাবেদনার আবেগে শ্যামা যদি বা তাহাকে ভুলিয়া যায় কবি যে তাহাকে ভোলেন নাই, ··প্রায় চল্লিশ বৎসরের ব্যবধানে সে কথা প্রথম জানা গেল শ্যামা নৃত্যনাট্যে।' কিশোরের প্রেম নিরাসক্ত ; অর্থাৎ 'ভোগের ক্ষুধা, অহংসাৎ করিবার আকাঙ্ক্ষা আপনার কলঙ্কিত হাতের ছাপ বিশ্বের সকল সৌন্দর্যে আঁকিয়া দিবার দুরাগ্রহ—এসব কিছুই তাহার নাই।' তাহার কাছে শ্যামা—"মায়াবনবিহারিণী হরিণী" ; তাহার অন্তরের প্রশ্ন "কেন তারে ধরিবারে করি পণ"— উত্তরেই সে বলে 'অকারণ' ; "পরশ করিব ওর প্রাণমন অকারণ,"—"বাঁধনবিহীন সেই যে বাঁধন অকারণ।" ইহাকেই আমাদের দেশের কাব্যে বলা হইয়াছে 'কামগন্ধহীন প্রেম'—দুর্লভ হইলেও অসম্ভাব্য নহে। 'কামগন্ধহীন প্রেম কৈশোরেই স্বাভাবিক।' এই প্রেম উত্তীয়র নিকট অতিসত্য পদার্থ, অতিবাস্তব অনুভূতি। Fancy বা কল্পনা বলিয়া তাহাকে আমরা অবজ্ঞা করিতে পারি না ; 'কারণ, নিছক কল্পনার জন্য মানুষ কি প্রাণ দিতে পারে ?' সে বলে, "ন্যায় অন্যায় জানি নে,··· শুধু তোমারে জানি।" এই কথা প্রাণ মন দেহ দিয়া,··· সকল জীবন দিয়া বলিতে পারে—এক উত্তীয়।' সে বলে,

"আমার জীবনপাত্র উচ্ছলিয়া মাধুরী করেছ দান।
তুমি জান নাই···মরমে আমার ঢেলেছ তোমার গান।
যারে জান নাই,···তার গোপন ব্যথার নীরব রাত্রি হোক আজি অবসান।"

[১] শা-জাহান, শ্রীহরিপদ কেরানি পৃ ২৭-৪৩। এই পুস্তিকাটি রবীন্দ্রসাহিত্যরসিকরা উপভোগ করিবেন।

এই মর্মন্তুদ ঘটনার পর শ্যামা ও বজ্রসেনের মিলনের মধ্যে উত্তাপ রহিয়া গেল তৃণাঙ্কুশের ন্যায় চিরকালের মতো। শ্যামা ও বজ্রসেনের জন্য থাকিল—

"কঠিন বেদনার তাপস দোঁহে
যাও চিরবিরহের সাধনায়।"

এই চিরবিরহের সাধনায় বোধ হয় শ্যামা ও বজ্রসেনের প্রেমসাধনার আহুতি হইয়াছিল।[১]

দ্বিতীয় নাটিকা 'চণ্ডালিকা',[২] তাহারও মধ্যে কিছু কিছু যোগবিয়োগ হয়। অভিনয়কালে প্রচারের জন্য রবীন্দ্রনাথ 'চণ্ডালিকা'র সংক্ষিপ্ত একটি পরিচয় লিখিয়া দেন। আমরা নিম্নে সেইটি উদ্ধৃত করিলাম :

প্রথম দৃশ্য। ফুলওয়ালির দল ফুল বিক্রি করতে এসেছে। চণ্ডালিকাও আনলে তার ফুলের ডালি। সবাই ঘৃণায় তার পাশ কাটিয়ে গেল। দইওয়ালা এল দই বেচতে, চণ্ডালিকা প্রকৃতি কেনবার জন্যে হাত বাড়াতেই দইওয়ালাকে সবাই নিষেধ করলে। চুড়িওয়ালা এল চুড়ি বিক্রি করতে, প্রকৃতি চুড়ি কিনতে চাইতেই চুড়িওয়ালাকে সবাই সতর্ক করে দিলে। চণ্ডালিকা মনের দুঃখে তার সৃষ্টিকর্তাকে ধিক্কার দিলে। প্রকৃতির মা মায়ার প্রবেশ। ঘরের কাজে চণ্ডালিকার ঔদাসীন্য নিয়ে তাকে ভৎর্সনা করতেই, মা তাকে অপমানের মধ্যে জন্ম দিয়েছে বলে তাকে তিরস্কার করলে। মা বিস্মিত হয়ে চলে গেল। বুদ্ধদেবের শিষ্য আনন্দ এসে জল চাইলেন। তার হাতের জল অশুচি বলে চণ্ডালিকা সংকোচ প্রকাশ করলে। আনন্দ বললেন, 'যে জল তৃষিতের তৃষ্ণা দূর করে, তাপিতের তাপ শান্ত করে, সেই জলই শুচি।' তিনি জল খেয়ে চলে গেলেন। তাঁর করুণা ও তাঁর রূপে প্রকৃতির মন মুগ্ধ হয়ে গেল। পাড়ার মেয়েরা ধানকাটার কাজে ওকে ডাকতে এল। ও বললে, "আমায় ডেকো না, আমায় ডেকো না। আমার কাজভোলা মন, আছে দূরে কোন্ করে স্বপনের সাধনা।"

দ্বিতীয় দৃশ্য। বুদ্ধের পূজার অর্ঘ্য নিয়ে পথ দিয়ে চলে গেল পূজারিনীরা। প্রকৃতি এসে গাইলে,

"ফুল বলে ধন্য আমি, ধন্য আমি মাটির 'পরে—
দেবতা ওগো তোমার পূজা আমার ঘরে।"

মা এসে বললে, "তুই অবাক করলি যে, উমার মতো তুই তপস্যা করছিস নাকি। তোর সাধনা কার জন্যে।" চণ্ডালিকা বললে, "যে আমাকে আহ্বান করলে, তার জন্যে। আমি ছিলুম বাণীহারা, যে আমাকে বাণী দিয়েছে, আমার মনের মধ্যে যে বাজিয়ে দিয়ে গেছে 'জল দাও', তার জন্যে।" মা বললে, "তোর কাছে কে আবার জল চাইলে, সে কি তোর আপন লোক নাকি।" প্রকৃতি বললে, 'তিনি বলেছেন, তিনি আমার আপন লোকই বটেন। তিনি আমাকে নব জন্ম দিয়েছেন। মন্ত্র পড়ে তুই নিয়ে আয় ভিক্ষুকে এই অমানিতার পাশে, আমি তাঁকে আত্মনিবেদনের সম্মান দেব।" এত বড়ো স্পর্ধার কথা শুনে মা স্তম্ভিত হয়ে গেল। এমন সময় ভিক্ষুর দল নিয়ে আনন্দ পথ দিয়ে চলে গেলেন। তার দিকে তাকালেন না দেখে চণ্ডালিকার অসহ্য ক্ষোভ হল। মা বললে, "মন্ত্র পড়ে আমি ওঁকে আনবই।" তার শিষ্যাদের সঙ্গে সম্মোহন নৃত্য করে কন্যার হাতে একটা মায়াদর্পণ দিলে। বললে, "এই দর্পণ নিয়ে যখন তুই নাচবি দেখতে পাবি তাঁর কী দশা হচ্ছে।"

তৃতীয় দৃশ্য। এ দৃশ্যে মন্ত্রের কাজ চলেছে। মায়াদর্পণে আনন্দের অভিভব-দৃশ্য দেখে মাঝে মাঝে প্রকৃতি অনুতপ্ত হচ্ছে, মাকে নিষেধ করছে, আবার তাকে উৎসাহিত করছে। অবশেষে মহাকালনাগিনীমন্ত্র-প্রভাবে টান

১ হরিপদ কেরানির লেখা হইতে সংকলিত।

২ দ্র রবীন্দ্রজীবনী ৩য় পৃ ৩৬৩।

ধরল। পরাভূত আনন্দের অসম্মানে দুঃখার্ত হয়ে আনন্দকে প্রকৃতি প্রণাম করে বললে, "আমাকে ক্ষমা করো, তোমাকে মাটিতে টেনেছি, তুমি আমাকে ধূলি হতে তুলে নাও তোমার পুণ্যলোকে।"[১]

শ্যামা যেমন প্রায় নূতন করিয়া লিখিত হইল, তাসের দেশের তেমনই বহুল পরিমাণে পরিবর্তন হইল (১৯৩৯ জানুয়ারি ১৪॥ ১৩৪৫ পৌষ ২৯)। পূর্ববর্তী সংস্করণে কয়েকটি গান ছিল; এবার আরও কয়েকটি নূতন গান যোজনা করিলেন: ১। খর বায়ু বয় বেগে ২। গোপন কথাটি রবে না গোপনে ৩। তোলন নামন (তাসের কাওয়াজ) ৪। বলো সখী বলো তার নাম ৫। অজানা সুর কে দিয়ে যায় কানে কানে ৬। কেন নয়ন আপনি ভেসে যায় ৭। গগনে গগনে যায় হাঁকি ৮। বাঁধ ভেঙে দাও বাঁধ ভেঙে দাও।

এই নাটিকার দ্বিতীয় সংস্করণ সুভাষচন্দ্রকে উৎসর্গ করিলেন (১৯৪৫ মাঘ)। সুভাষচন্দ্র তখন কন্‌গ্রেসের সভাপতি। তাঁহাকে এই গ্রন্থ উৎসর্গ[২] করিবার বিশেষ কারণ ছিল। পাঠকের স্মরণ আছে কয়েক মাস পূর্বে কলিকাতায় শিল্পনিকেতন উন্মোচনকালে কবি সুভাষচন্দ্রকে আহ্বান করিয়াছিলেন এবং তাঁহার ভাষণের শেষভাগে বিশ্বভারতীর প্রতি দেশবাসীর দৃষ্টিদানের জন্য অনুরোধ জ্ঞাপন করেন। আজ তরুণ বাংলা তথা ভারতের আশাআকাঙ্ক্ষার প্রতীক সুভাষচন্দ্র; তিনি আজ নির্জীব প্রাণে সংগ্রামের মন্ত্র দিতেছেন; কবির 'তাসের-দেশ'-এর মর্মকথা 'আধমরাদের ঘা দিয়ে তুই বাঁচা'; সুভাষচন্দ্র সেই বাণীর বাহক বলিয়া কবির ভরসা,—তাঁহার নেতৃত্বে কন্‌গ্রেসের মাধ্যমে দেশের মধ্যে নূতন প্রাণ সঞ্চারিত হইবে।

এবার শান্তিনিকেতনে দোলপূর্ণিমা উৎসব উপলক্ষ্যে নৃত্যগীত সংযোগে 'মায়ার খেলা'র অংশবিশেষ অভিনীত হইল। এই বৎসরের অগ্রহায়ণে মায়ার খেলা নৃত্যনাট্যের কল্পনা ও রচনা শুরু হয়।[৩] মায়ার খেলা গীতিনাট্যরূপে লিখিত হয় বহুবৎসর পূর্বে, অভিনয়ও হয়। আধুনিকযুগে ১৯৩৩ মার্চমাসে কলিকাতায় 'মায়ার খেলা' একবার অভিনীত হইয়াছিল। রবীন্দ্রনাথ সে সময়ে বরাহনগরে প্রশান্তচন্দ্রের বাটীতে ছিলেন। প্রতিমা দেবীকে লখনৌতে লিখিয়াছিলেন, "মায়ার খেলায় প্রথম দিন অনেক ত্রুটি ছিল দ্বিতীয় দিন নিখুঁৎ হয়েছিল—লোকের ভালো লেগেছে। তোমরা যেবার করেছিলে সেবারকার মতো অত ভালো হয়নি।" (চিঠিপত্র ৩য় খণ্ড পত্র ৪৮) এবার দোলোৎসবে নৃত্যনাট্য অংশবিশেষ অভিনীত হয়—সম্পূর্ণ নৃত্যনাট্যের অভিনয় শান্তিনিকেতনে কখনো হয় নাই। কবির নানা কাজের মধ্যে এই সময়টার অনেকখানি 'মায়ার খেলা'কে নৃত্যরূপ দিবার জন্য অতিবাহিত হয়। পাঠক লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন কিছুকাল হইতে কবি তাঁহার কাব্যনাট্য, গীতিনাট্য প্রভৃতিকে নৃত্যনাট্যে রূপায়িত করিবার চেষ্টা করিতেছেন। মায়ার খেলা গীতিনাট্য ছিল; এবার তাহাকে নৃত্যনাট্যে রূপদান করিলেন।

১ রবীন্দ্ররচনাবলী ২০শ খণ্ড গ্রন্থপরিচয় দ্রষ্টব্য।

২ "কল্যাণীয় শ্রীমান্ সুভাষচন্দ্র স্বদেশের চিত্তে নূতন প্রাণসঞ্চার করবার পুণ্যব্রত তুমি গ্রহণ করেছ, সেই কথা স্মরণ করে তোমার নামে 'তাসের দেশ' নাটিকা উৎসর্গ করলুম।" মাঘ ১৩৪৫।

৩ গীতবিতান পৃ ৯২৪।

নানা কথা

শান্তিনিকেতনে বসন্ত উৎসব; উৎসবের জন্য কবি নূতন গান রচনা করিতেছেন, পুরাতন কবিতায় সুর দিতেছেন। এই সময়ে শান্তিনিকেতনে অমিতা সেন সংগীতভবনের অন্যতম শিক্ষিকারূপে আসেন। অমিতা (খুকু) শিশুকাল হইতে আশ্রমে লালিতা। রবীন্দ্রসংগীতে অসামান্য ক্ষমতা ছিল তাহার। বিশ্ববিদ্যালয়ে সমস্ত পরীক্ষা শেষ করিয়া সে পুনরায় আসিয়াছে আশ্রমে। তাহাকে ফিরিয়া পাইয়া রবীন্দ্রনাথের সুরের উৎস যেন খুলিয়া গেল।[১]

কিন্তু 'হোলি'র আনন্দ-উৎসবের দিনে ভারতবর্ষময় মহাত্মাজির অনশনের জন্য সকলেরই উদ্বেগ; সেদিনকার কবির ভাষণেও এই উদ্বেগের কথাই প্রকাশ পাইতেছে। কবি বলিলেন, "আজ পৃথিবীর মধ্যে সব চেয়ে শোচনীয়তার উপক্রমণিকা দ্বারের নিকট সমাগত। কঠোর অন্যায় ও অবিচারের বিরুদ্ধে মহাত্মাজি অনশনব্রত গ্রহণ করেছেন…। অন্যায়কে অত্যাচারকে আমরা মানব না, এই কথা বলবার জন্যে মহাপুরুষরা জীবন উৎসর্গ করেছেন…।"[২]

মহাত্মাজি কেন অনশন পণ গ্রহণ করিয়াছেন, তাহার ইতিহাস এখানে বলা দরকার মনে করি। আমাদের আলোচ্য পর্বে (১৯৩৯) দেখা যাইতেছে যে ভারতশাসনের নূতন বিধান অনুসারে প্রদেশ ও কেন্দ্রীয় সরকারের সম্বন্ধ একপ্রকার সুনির্দিষ্ট হইয়াছিল; কিন্তু দেশীয় রাজ্যে প্রজার অধিকার অনধিকারের কোনো প্রশ্নের মীমাংসা হয় নাই, সেখানে মধ্যযুগীয় শাসনপ্রথা অপ্রতিহতভাবে চলিতেছে এবং তাহার মীমাংসার কোনো প্রস্তাব ভারতশাসনবিধিতে নাই। বৃটিশ ভারতে স্বরাজলাভের আন্দোলনের দৃষ্টান্তে দেশীয়রাজ্যের প্রজামণ্ডলীর মধ্যে রাজ্যশাসন বিষয়ে আত্মকর্তৃত্ব লাভের আন্দোলন দেখা দিয়াছে। গুজরাটের অন্তর্গত রাজকোট রাজ্যের প্রজারা কতকগুলি অধিকার লাভের জন্য আন্দোলন করিয়া অবশেষে সত্যাগ্রহ অবলম্বন করে। সর্দার বল্লভভাই পাটেলের মধ্যস্থতায় রাজকোটের রাজা বা ঠাকুরসাহেব শাসনসংস্কারে সম্মত হন, সত্যাগ্রহ বন্ধ হয়। কিন্তু অচিরেই অঙ্গীকার ভঙ্গ করিলে, প্রজাবৃন্দ পুনরায় সত্যাগ্রহ অবলম্বন করে। মহাত্মাজির জন্মভূমি রাজকোট; তিনি ঠাকুরসাহেবের এই ব্যবহারের প্রতিবাদে রাজকোটে গিয়া অনশন সত্যাগ্রহ করিলেন। মহাত্মাজির অনশন যখন চলিতেছে তখন ত্রিপুরীতে ৫২ বাৎসরিক কন্‌গ্রেসের অধিবেশন বসিয়াছে। সেখানেও গুরুতর সমস্যা। সে সমস্যা বৃটিশ ও ভারতীয়ের সম্বন্ধ বিষয়ক নহে। তাহা হইতেছে প্রবীণ ও নবীনের চিরন্তন সংগ্রাম। সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে কন্‌গ্রেসের নেতৃস্থানীয়দের মতবিরোধ।

কথাটা আরও পরিষ্কার করিয়া বলা দরকার, কারণ সুভাষচন্দ্রের নানা কর্ম ও মতবাদের প্রতি রবীন্দ্রনাথের সহানুভূতি যে ছিল তাহা নানা পত্রে, প্রবন্ধে ও মোলাকাতে প্রকাশ পায়। জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাস-অভিজ্ঞেরা জানেন কন্‌গ্রেসী নেতারা স্বাধীনতা-সংগ্রাম ও অসহযোগনীতি সাময়িকভাবে মুলতবী রাখিয়া দেশের সংগঠন কার্য যতটা-করা-যায়-ততটাই-লাভ—এই মনোভাব লইয়া বৃটিশ শাসকদের সহিত প্রদেশ শাসন বিষয়ে সহযোগিতা করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের ক্ষমতা ও অধিকার যে কী পরিমাণ সীমায়িত তাহা তখন তাঁহারা বুঝিতে পারেন নাই, অথবা জানিয়া শুনিয়াই ইংরেজকে সহযোগিতাদানের শেষ সুযোগ দিয়াছিলেন। অচিরকালের মধ্যেই প্রমাণিত হইল প্রাদেশিক মন্ত্রীমণ্ডলী ইংরেজ গবর্নরের ও কেন্দ্রীয় সরকারের আজ্ঞাধীন কর্মচারী

১ কবিকথা পৃ ১৭৩।

২ বসন্ত উৎসব, ১৩৪৫ ফাল্গুন ২১, সাগরময় ঘোষকৃত অনুলিপি হইতে মুদ্রিত, প্রবাসী ১৩৪৫ চৈত্র পৃ ৯১১-১২।

মাত্র। নূতন শাসনবিধিতে প্রাদেশিক সরকারের আত্মকর্তৃত্ব স্বীকৃত হইয়াছিল সত্য, কিন্তু কেন্দ্রীয় শাসনক্ষেত্রে ভারতীয়দের উপর সত্যকার কোনো দায়িত্ব অর্পিত হয় নাই—ফেডারেশন-এর কোনো প্রস্তাবই গৃহীত হয় নাই।

সমাজতন্ত্রী তথা বিদ্রোহী যুবশক্তি কংগ্রেসে নিজেদের মত প্রচার ও তথায় আপনাদিগকে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য বদ্ধপরিকর। ইহারা কংগ্রেসের তরফ হইতে ভারতশাসন ব্যাপারে সহযোগিতা করিবার বিরোধী এবং আইনসভা বর্জন করিয়া নূতন ভারতশাসন আইন ধ্বংস করিতেই কৃতসংকল্প। এই সমাজতন্ত্রী দল কংগ্রেসপরিচালকদের ঘোর আপত্তি সত্ত্বেও ভারতের নয়া-শক্তির উদ্‌বোধক সুভাষচন্দ্রকে দ্বিতীয়বারের জন্য (ত্রিপুরী) কন্‌গ্রেসের সভাপতি নির্বাচন করিয়াছিল।[১] গান্ধীজি কিভাবে সুভাষচন্দ্রের সহিত অসহযোগিতা করিয়াছিলেন, তাহার কথা বলা হইয়াছে।[২] এই সব গণ্ডগোলের একমাসের মধ্যেই ত্রিপুরীতে কন্‌গ্রেস (১৯৩৯ মার্চ ৭)। গান্ধীজি ত্রিপুরীতে আসেন নাই, পূর্বেই বলিয়াছি তিনি রাজকোটে অনশন করিতেছেন।

রবীন্দ্রনাথ কন্‌গ্রেসের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের এই মনোভাবকে কিছুতেই সমর্থন করিতে পারিতেছেন না; ত্রিপুরী কন্‌গ্রেসের সপ্তাহ পরে অমিয়চন্দ্রকে লিখিতেছেন (১৯৩৯ মার্চ ১৭): "অবশেষে আজ, এমন কি কন্‌গ্রেসের মঞ্চ থেকেও হিটলারি নীতির নিঃসংকোচ জয়ঘোষণা শোনা গেল।...স্বাধীনতার মন্ত্র উচ্চারণ করবার জন্য যে বেদী উৎসৃষ্ট সেই বেদীতেই আজ ফাসিস্টের সাপ ফোঁস করে উঠেছে।"[৩] রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রবাসীতে লিখিয়াছিলেন, "মহাত্মা গান্ধীর সহিত হিটলারের কোন আধ্যাত্মিক সাদৃশ্য নাই। অথচ ত্রিপুরীতে কন্‌গ্রেসের গত অধিবেশনের সময় অভ্যর্থনাসমিতির সভাপতি শেঠ গোবিন্দদাস হিটলারের প্রশংসা করিয়াছিলেন, এবং পরে যুক্তপ্রদেশদ্বয়ের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত গোবিন্দবল্লভ পন্থও তাঁহার এক বক্তৃতায় হিটলারের প্রশংসা করিয়াছিলেন।"[৪] "পঞ্জাব প্রতিনিধিদের বিদায়ধ্বনি—"মহাত্মাজি কী জয়। হিন্দুস্থানকী হিটলার কী জয়"[৫] শোনা যায়।

মহাত্মাজির অনশনের জন্যে কবি উদ্বিগ্ন হইলেও নীতিহিসাবে অনশন-অস্ত্র প্রয়োগ করাকে তিনি আদৌ সমর্থন করিতে পারিতেন না। কয়েকদিন পরে (২০ চৈত্র) অমিয় চক্রবর্তীকে যে পত্র দেন তাহাতে এই পদ্ধতির নিন্দা করিয়া তিনি লিখিতেছেন, "আমাদের দেশে আধ্যাত্মিক সাধনা ও কর্মসাধনাকে একাসনে বসানো বিপজ্জনক।...মহাত্মাজি মাঝে মাঝে যদি চিত্তশোধনের জন্যে এই কৃচ্ছ্র সাধনা করতেন তাহলে সেটা ভারতীয় প্রথার সঙ্গে মিলত।...মহাত্মাজি যখন রাষ্ট্রিক উদ্দেশ্য নিয়ে মাঝে মাঝে অনশনব্রত গ্রহণ করেন তখন সমস্ত দেশ উৎকণ্ঠিত হয়ে ওঠে, এতে তাঁর আত্মার কী উৎকর্ষ সাধন হয় আমি বুঝতেই পারিনে—বরঞ্চ ফল উল্‌টো হবারই কথা।" এই পত্রে রবীন্দ্রনাথ স্বীকার করেন যে পুণা প্যাক্টের সময় তিনি যাহা করিয়াছিলেন, তাহা মহাত্মাজির জীবন সংশয়ের দিক হইতে, ফলে বাংলার প্রতি রাজনৈতিক অবিচারকে তিনি মানিয়া লইয়াছিলেন। কবির মতে "লক্ষ্যসিদ্ধির উদ্দেশে মানুষের করুণাবৃত্তির উপর এই যে পীড়ন অন্তত ভারতবর্ষ কোনোদিন একে কর্তব্য বলে স্বীকার করেনি।... গান্ধীজির এই অদ্ভুত আচরণের সঙ্গে সঙ্গে এই আত্মপীড়নমূলক ছেলেমানুষি আবার দেশে ছড়িয়ে গেছে।"[৬]

১ দ্র প্রবাসী ১৩৪৫ ফাল্গুন পৃ ৭৫৩-৫৮ বিবিধ প্রসঙ্গ।

২ দ্র মনোরঞ্জন গুপ্ত, ত্রিপুরী কন্‌গ্রেসের পথনির্বাচন, প্রবাসী ১৩৪৫ চৈত্র পৃ ৯১৩-১৬। গোপাল হালদার, ত্রিপুরীর মন্ত্র, প্রবাসী ১৩৪৬ বৈশাখ পৃ ১০৩-০৮।

৩ প্রবাসী ১৩৪৬ বৈশাখ পৃ ৮।

৪ প্রবাসী ১৩৪৬ বৈশাখ পৃ ১২৬।

৫ প্রবাসী ১৩৪৬ বৈশাখ পৃ ১০৮।

৬ পত্র, অমিয়চন্দ্র চক্রবর্তীকে লিখিত, ১৩৪৫ চৈত্র ২৩। ১৯৩৯ এপ্রিল ৩ কলিকাতা।

রবীন্দ্রনাথের এই কঠোর বিশ্লেষণ যে কত সত্য তাহা পরবর্তীযুগের ইতিহাস সাক্ষ্য দিতেছে। মতভেদ হইলেই লোকে কত সহজে এই অনশন ব্রত গ্রহণ করিয়া সকল প্রকার বিধিবিধানকে অচল করিয়া দিয়াছে, সে দৃষ্টান্তের অভাব নাই।

বসন্ত উৎসবের দুইদিন পরে (১৯৩৯ মার্চ ৭) লিখিত 'নামকরণ' নামে প্রহাসিনী কবিতার প্রথম স্তবকটি উদ্ধৃত করিলাম—ইহার মধ্যে কোনো অর্থ রসিক ঐতিহাসিক বা ইতিহাস-রসিক অনুসন্ধান করিতে পারেন:

দেয়ালের ঘেরে যারা গৃহকে করেছে কারা,
ঘর হতে আঙিনা বিদেশ,
'গুরুভজা বাঁধা বুলি যাদের পরায় ঠুলি,
মেনে চলে ব্যর্থ নিদেশ,
যাহা কিছু আজগবি বিশ্বাস করে সবই,
সত্য যাদের কাছে হেঁয়ালি,
সামান্য ছুতো নাতা—সকলই পাথরে গাঁথা
তাহাদের বলা চলে দেয়ালি।[১]

এই দিনে ত্রিপুরীর কন্‌গ্রেস বসিয়াছে এবং রাজকোটে গান্ধীজি অনশনে আছেন। অনশন গ্রহণ করিবার পটভূমি পূর্বেই দেখানো হইয়াছে।

কবি শান্তিনিকেতনে থাকিলে বহু লোক তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসেন। দক্ষিণ ভারতের বিখ্যাত মালায়লামী কবি Vallathol (১৯৩৯ মার্চ ১০) কলামণ্ডলের কয়েকটি ছাত্র সহ কবিদর্শনে আসেন। তিনি জীবনীলেখককে লিখিয়াছেন যে তাঁহার সেই দিনটি চিরস্মরণীয় হইয়া আছে। বল্লথোল মালাবারের বিশিষ্ট কবি বলিয়া খ্যাতিমান; লোকে তাঁহাকে বলে মালয়ালামের 'টাগোর'। তিনি কথাকলির নৃত্য দেখান, কবি সে উৎসবে উপস্থিত ছিলেন।[২] কয়েকদিন পরে আসেন ভারতের শিক্ষাকমিশনর মিঃ জন সার্জেন্ট (১৭ মার্চ)।

সাহিত্যসৃষ্টিতে এখন ভাঁটার টান। কবিতা আছে, গদ্য প্রবন্ধাদি খুবই কম। অমিয়চন্দ্র চক্রবর্তীকে লিখিতেছেন[৩] "প্রবন্ধ লেখবার বয়স গেছে।" তাই এবার মন গিয়াছে পত্রালাপে। তার কারণ, "প্রবন্ধ আপন ভার এবং আয়তন নিয়ে অধিকাংশ রাস্তাতেই চলতে পারে না; চিঠি চলে যায় পিচ-বাঁধানো রাস্তায় বাইসিক্‌লের মতো। চিঠির সেই হালকা রাস্তায় আমার মন আজকাল চলতে উৎসুক।

"বয়স যখন অল্প ছিল তখন প্রাত্যহিক দেখাশুনোর ফসল সংগ্রহ ক'রে চিঠিতে চালান করতে ভালোবাসতুম। তার প্রধান কারণ মনটা তখন পথে ঘাটে পলাতকা হয়ে বেড়াত, যা দেখত যা শুনত তাতেই তার ছিল ঔৎসুক্য। এই ঘোরাফেরা আর চিঠির বকুনি এক জাতের।·· ছিন্নপত্রে তার পরিচয় পেয়েছ।

"তারপরে এল প্রবন্ধের পালা···বঙ্গদর্শন দ্বিতীয় পর্যায়ের যুগে।···কিছুকাল তার আধিপত্য ছিল। একেবারে তার দিন যায় না,···তার জোর কমেছে। বাহুল্যে তার আর রুচি নেই।"[৪] 'ছিন্নপত্র' যুগের পত্র ছিল চোখের দেখায় মনের রসে রঙিন-করা তার ছবি, জীবন্ত হয় পাঠকের মনের মধ্যে। তারপর পাই একধরনের পত্র যাহা 'পত্রধারা'

১ প্রবাসী ১৩৪৬ পৌষ; প্রহাসিনী সংযোজন, র-র ২৩শ খণ্ড পৃ ৫০-৫২।

২ বল্লথোল লিখিয়াছেন, "I had the rare fortune of meeting Gurudeva Tagore once. It was about two years before his death. A Kathakali performance had been arranged for him on that occasion, which was appreciated and greeted by Gurudeva. Before our meeting Tagore had heard about me from Deenabandhu Andrews. At the remembrance of his close and sincere embrace and the most gentle reception my eyes become wet even to-day! Oh! How wonderful was the deep affection of the Great Poet!" (31st December 1952)

৩ ১৯৩৯ মার্চ ১৭। ১৩৪৫ চৈত্র ৩, দ্র প্রবাসী ১৩৪৬ বৈশাখ পৃ ৬-১০।

৪ প্রবাসী ১৩৪৬ জ্যৈষ্ঠ পৃ ১৬১, পত্রালাপ ১৯৩৯ এপ্রিল ১১। ১৩৪৫ চৈত্র ২৮।

নামে পরিচিত। সেগুলি মতামত লইয়া তর্ক ও কথা-কাটাকাটি, সেখানে মনের সঙ্গে মতের বোঝাপড়া। এখনকার পত্রালাপ "পায়ে চলার পথে আলাপ জমিয়ে যাবার ঝোঁকে।...যাকে ভালো ক'রে চিনি তার সামনে ব'সে বকে যাওয়া সহজ, কেননা সেও ভিতর থেকে বকিয়ে নেয়। লেখাটার পরিমাণ থাকে দুটি মনের মাপে।"[১]

অমিয়চন্দ্রের সহিত কবির দীর্ঘ দিনের বিচিত্র বিষয়ের আলোচনারাজি একটি সাহিত্য বিশেষ,—এগুলি যেন কবির মনের ডায়েরি। বাহিরের আধুনিক সাহিত্যের নূতন খবর অনেক কিছুই পান এই অসাধারণ সাহিত্যজহুরীর কাছ হইতে। অমিয়চন্দ্র নিজে ভাবিতে পারেন, সেইজন্য কবিকে তিনি যেসব পত্র দিতেন, তাহাতে কবিকে ভাবাইয়া তুলিতেন। এই ভাবনার উদ্‌বোধনে তাঁহার লেখনী হইত সচল। রবীন্দ্রনাথের বিরাট পত্রগুচ্ছ সংকলিত ও সম্পাদিত হইয়া প্রকাশিত হইলে কবির আর-একটি মূর্তি রবীন্দ্র-পাঠকদের সম্মুখে উদ্‌ভাসিত হইবে। এই পত্রালাপের মধ্যে সমসাময়িক রাজনীতি ও সাহিত্য বিচারের কথা আসিয়া পড়ে। সমসাময়িক য়ুরোপ ও ভারতের বিচিত্র রাজনৈতিক ঘটনা কবিকে যে কী পীড়িত করিতেছে—তার প্রমাণ পাই পত্রগুলি হইতে। তিনি একপত্রে লিখিতেছেন, "মানুষের মনে একটা প্রবল জোয়ার-ভাঁটার পর্যায় আছে। মানুষ বলছি যাকে, সে ব্যক্তিগত মানুষ নয়, নেশনগত মানুষ; প্রথম বয়সে যে নেশনের সংস্রবে আমাদের মনে প্রথম উদ্‌বোধন জেগেছিল, তার চিত্তসমুদ্রে তখন ভরা জোয়ার, তার উদার মনের প্রসারণ সকল দিকেই, মনুষ্যত্বের সকল প্রদেশেই। মনে স্থির করেছিলুম...মানুষকে মুক্তি দেবার জন্যই তার নিরন্তর প্রয়াস।" তারপর একদিন "ভাঁটার সময় এল পৃথিবী জুড়ে।...প্রাদেশিকতা, সাম্প্রদায়িকতা অচলায়তনের প্রাকার—শ্রেণী আভিজাত্যের গর্বে উদ্ধত হয়ে উঠল।...বুদ্ধিপ্রভাবের বিরুদ্ধে একটা গভীর প্রতিক্রিয়া কাজ করতে লেগে গেছে।...ভালোমন্দের আদর্শের চেয়ে বড়ো হোলো চোখ বুজে মেনে চলার আদর্শ।...

"এই তামসিক মনোবৃত্তিরই সাংঘাতিক চেহারা দেখা দিল য়ুরোপে।...তাদের অনেকেই আজ কেউ বা স্বেচ্ছায় কেউ বা ইচ্ছার বিরুদ্ধে ডিক্টেটরি মুঠোর সংকীর্ণ সীমানার মধ্যে নিজেদের নিষ্পিষ্ট করে দিয়ে এক একটা বড়ো বড়ো জড়পিণ্ড পাকিয়ে তুলতে লাগল।· দলে দলে পোলিটিক্যাল গুরুদের ধনুর্ধর চেলারা সম্পূর্ণ হতবুদ্ধিতার তপস্যায় আজ প্রবৃত্ত।...অবশেষে আজ...কন্‌গ্রেসের মঞ্চ থেকেও হিটলারি নীতির নিঃসংকোচ জয়ঘোষণা শোনা গেল।"

এই ডিক্টেটরি মনোভাব কিভাবে য়ুরোপের শিল্প ও সাহিত্যকে এমনকি বিজ্ঞানকেও আচ্ছন্ন করিতেছে তাহার সংবাদ কবিকে বেশি করিয়া বাজিতেছে। ভারতবর্ষে ইতিপূর্বে সাহিত্যের মধ্যে কতখানি হিন্দুয়ানি কতখানি মুসলমানি লইয়া তর্ক শুরু ও বাছবিচার আরম্ভ হইয়াছিল; এখন আসিয়াছে সাহিত্যের মধ্যে কোনটা বুর্জোয়া, কোন্‌টা প্রোলেটোরিয়েট—রচনার ভালোমন্দ বিচার হইবে এই মার্কা দিয়া। কবির আপসোস "শেষকালে কি জাত-মানা মত্তহস্তী সাহিত্যেরও পদ্মবনে ঢুকে পড়বে।" (প্রবাসী ১৩৪৬ বৈশাখ পৃ ৯)

কবি এই পত্রগুচ্ছে সুধীন্দ্রনাথ দত্তের 'স্বগত' নামে যে গদ্য সমালোচনাগ্রন্থের আলোচনা করিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণভাবে পাঠ করিলে তবেই কবির মনের মধ্যে কত যে প্রশ্ন, কত যে সমস্যা জাগিতেছে তাহার সন্ধান পাঠক পাইবেন। আধুনিক কবিতা সম্বন্ধেও তাঁহার মতামত জানা যায়।[২] কবি নিজের রচনা সম্বন্ধে বলেন যে তাঁহার

১ "বাক্যালাপের বৈঠকেও তাঁকে (কবিকে) কোনো কোনো অংশে পাওয়া যায়। কিন্তু সে আলাপ এমন কারো সঙ্গে হওয়া চাই যাঁর মনের সংঘাতে তাঁর মন সক্রিয় হয়ে ওঠে—যেমন ছিলেন তাঁর সহচর অমিয়চন্দ্র।" 'মানুষ রবীন্দ্রনাথ,' তেজেশচন্দ্র সেন কৃত সমালোচনা, প্রবাসী ১৩৪৬ জ্যৈষ্ঠ পৃ ১৯৫।

২ প্রবাসী ১৩৪৬ জ্যৈষ্ঠ পৃ ১৬০-৬৪, পত্র ২৮ চৈত্র ১৩৪৫, এই প্রবন্ধের অধিকাংশই সুধীন্দ্রনাথের সমালোচনা।

'লেখায় প্রধানত কল্পনা আর শ্রেয়োবুদ্ধি এই দুটোরই চালনা। সুধীন্দ্রনাথের মুখ্য আনন্দ মননে, শিক্ষা দেওয়া উপদেশ দেওয়ার আভাস যদি কোথাও দেখতে পাওয়া যায় সেটা নেহাৎ গৌণ, এমন কি মনে তার প্রতি তাঁর অশ্রদ্ধা আছে। মননে যার প্রয়োজনাতীত আনন্দ তার কাছে নিশ্চিন্ত সিদ্ধান্তের পাকা দাম নেই।" কবি বলিয়াছেন, "সুধীন্দ্রের লেখা পাঠকদের কাছ থেকে ভাবনার দাবি করে, কেননা মননশীল তাঁর মন।"

মার্চ মাসে খুচরা লেখার মধ্যে পত্রধারা ছাড়া দুই চারিটি কবিতা চোখে পড়ে। কবিতার মধ্যে উল্লেখযোগ্য— 'প্রজাপতি' (১০ই মার্চ, নবজাতক) ও 'ঢাকিরা ঢাক বাজায়' (২৯ মার্চ)। দিনের ব্যবধানও যেমন, ভাবের ব্যবধানও তেমনই। প্রজাপতিকে ঘরের মধ্যে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া কবিচিত্তে 'বিচিত্রবোধের এ ভুবন' সম্বন্ধে নূতন ভাবনা জাগিয়াছে। 'প্রজাপতি' কবিতাটি লিখিবার সময়ে ও পরে কবির মনে যে ভাবনারাজির উদ্ভব হয়, তাহা সুধীরচন্দ্র কর এইভাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন : "মনের কী রকম একটা অবস্থা হয়েছে, সব কিছুই জানতে ইচ্ছে হয়, জানতে পাইনে। এত যে পড়ি, যতই জানি—হঠাৎ এক এক সময় একটা সামান্য ঘটনায় মনে হয়, কিছুই জানিনে, কোনো দিন যে জানতেও পারব না, এইটেই আরো অসহ্য। এই যে পিঁপড়েটা মাটিতে চলে যাচ্ছে, এর জানা তো আমার জানা হয়ে ওঠেনি। দেশকালের ধারণা ওর কী রকম, কে জানে।...আমরা ওদের কাছে আছি কি ভাবে ?...বাঘকে দেখে আমি ভয় পাব, একটা প্রজাপতি তো পাবে না। মধুর মধ্যে প্রজাপতি লুটে আছে। কিন্তু ফুলের সৌন্দর্য ওর কাছে নেই। ওর জগত যত ক্ষুদ্রই হোক, ওর অনুভূতির কাছে তার যা রূপ রস, ভোগের যা নিবিড়তা, সে আমার অভিজ্ঞতার বাইরে। সেইজন্যেই চিরকাল রইল আমার কাছে একদিকে দিয়ে ওর বিশিষ্টতা, তা মূল্যের অতীত। কাল রাত্রে স্নানের ঘরে মুখ ধুতে গিয়ে টেবিলের উপর লক্ষ্য করছিলেম একটা প্রজাপতি। আজ সকালেও দেখি সেটা সেইখানেই ; বুঝলাম ওটা মৃত।.. কিসে থেকে ওর মৃত্যু ঘটল। আমি থাকি আমার কবিতা নিয়ে ; ওর বোধের কাছে তার অস্তিত্ব নেই। তেমনি ওর বোধ আমি পাইনে বলে ওর যেটা সত্য, আমার কাছে সেটা হয়তো মিথ্যা।...ঐ প্রজাপতি, আর আমি,—আমরা আলাদা বোধের জগতসীমায় যার যার কোঠায় বাঁধা।"[১]

সম্পূর্ণ নূতন অভিঘাতে 'ঢাকিরা ঢাক বাজায়' কবিতাটি লিখিত হয়। কবিতাটির (আকাশপ্রদীপ) মধ্যে গভীর একটি বেদনা প্রচ্ছন্ন। আমাদের আলোচ্য পর্ব বাংলায় মুসলিম লীগের মন্ত্রী পরিষদ্ কর্তৃক শাসিত। সেই যুগে বাংলাদেশে নারীহরণ ও নারীউৎপীড়ন ব্যাপারটা দৈনন্দিন ঘটনায় পরিণত হইয়াছিল।[২] রবীন্দ্রনাথের এই কবিতায় অপমানিতা নারীর বেদনা পরিস্ফুট। চারিদিকে এক কাতর ধ্বনি—"উপায় নাই রে, নাই প্রতিকার বাজে আকাশ জুড়ে।" সেদিন অসহায়ভাবে বাঙালি মেয়েরা এই অপমান সহ্য করিয়াছিল, সংঘবদ্ধভাবে প্রতিরোধ করিবার প্রয়াস দেখা যায় নাই।

মার্চের শেষ দিন (১৩৪৬ চৈত্র ১৭)। কবি কলিকাতায় গেলেন, বিশ্বভারতীসম্মিলনীর পক্ষ হইতে বসন্তউৎসবের অনুষ্ঠানে। তিনি জোড়াসাঁকোর বাড়িতে আছেন, ইতিমধ্যে তাঁহার কাছে অনুরোধ আসিয়াছে কানাডা হইতে ; অটোয়া হইতে Empire Day[৩] Programmeএ কবির একটি কবিতা রেডিয়ো হইতে ব্রডকাস্ট করা হইবে। তজ্জন্য ১ এপ্রিল (১৮ চৈত্র) তিনি লিখিলেন 'আহ্বান' (নবজাতক); ইহার অনুবাদও করিয়া দেন, সেটি ২৯ মে (১৯৩৯) অটোয়া রেডিয়ো স্টেশন হইতে মুক্ত হয়।[৪]

১ রবীন্দ্র-আলোকে রবীন্দ্র-জীবন, শারদীয়া যুগান্তর ১০৫৫ পৃ ৯২-৯৩।

২ "তবে নারীউৎপীড়কদের মধ্যে হিন্দুও আছে এবং অপমানিতাদের মধ্যে মুসলমান নারীও আছে। সুতরাং দুর্বৃত্তদের ধর্ম একই। তবে সাধারণভাবে হিন্দুদের চেয়ে মুসলমানদের উৎপাত বেশি হইত।" প্রবাসী ১৩৪৬ আশ্বিন পৃ ৯০৫-০৮, পুনশ্চ ১৩৪৬ বৈশাখ পৃ ১২৩-২৫।

৩ V. B. News Vol. 1939 Oct. কবির কণ্ঠস্বর record করিয়া পাঠানো হয়। সেটি রবীন্দ্রভবনে আছে।

৪ Empire Day, a celebration of the unity of the British empire was inaugurated in 1902, officially recognised since 1904 ; it is held on the anniversary of Queen Victoria's birthday, May 24. Canada was in revolt in the thirties

তোমরা এসো তরুণ জাতি সবে
মুক্তিরণ ঘোষণা বাণী জাগাও বীর রবে,
তোলো অজেয় নিঃশ্বাসের কেতু।
রক্তে রাঙা ভাঙনধরা পথে
দুর্গমেরে পেরোতে হবে বিঘ্নজয়ী রথে,
পরান দিয়ে বাঁধিতে হবে সেতু।
মিথ্যা দিয়ে চাতুরী দিয়ে রচিয়া গুহাবাস
পৌরুষেরে ক'রো না পরিহাস।
বাঁচাতে নিজ প্রাণ
বলির পদে দুর্বলেরে ক'রো না বলিদান।

নববর্ষের শুভ দিনটিতে (১৩৪৬ বৈশাখ ১। ১৯৩৯ এপ্রিল ১৫) কবির মন চিরদিনই উদ্‌বুদ্ধ হয়; যেমন হয় সাতই পৌষে মহর্ষির দীক্ষাদিনে। নববর্ষে কবি মন্দিরে যে ভাষণ দান করেন তাহার মধ্যে একটি কথা বিশেষভাবে উদ্ধৃত করিব। "এই প্রশ্নটাই আমার মনে কিছুদিন থেকে জাগছে, কী পেয়েছ জীবনে, সব চেয়ে কী বড়ো কথা তোমার অভিজ্ঞতায়। সব চেয়ে যা আমার চোখে পড়ে, সে হচ্ছে পরম বিস্ময়। আরম্ভ থেকে পদে পদে বিস্ময়ের অন্ত নেই। অন্য জীবজন্তুরা শুধু তাদের খাদ্যাহরণে তাদের বাঁধা জীবনযাত্রায় সন্তুষ্ট, তাদের তো বিস্ময় নেই।"[১] কবি জীবনে ছন্দ সুর ও প্রেমের মধ্যে যে বিস্ময়ের আনন্দ উপলব্ধি করিয়াছেন তাহার কথাই এই ভাষণে বলিয়াছেন। আর মনকে আলোড়িত করিতেছে মানুষের প্রচণ্ড দুঃখ, চারিদিকে অমানুষিকতার বার্তা।

নববর্ষ উপলক্ষ্যে কবি আর একটি কবিতা লেখেন। লাহোরে কবির জন্মোৎসবঅনুষ্ঠানের উদ্যোগীরা অমিয় চক্রবর্তীর মারফত নূতন কবিতার জন্য কবিকে অনুরোধ করেন; তদুপলক্ষ্যে 'জন্মদিন' নামে কবিতাটি লিখিত হয়।[২] কবিতাটির মধ্যে সমসাময়িক রাজনৈতিক ঘটনারাজির অভিঘাতজনিত বেদনা ধ্বনিতেছে; পঞ্জাবে হিন্দু-মুসলমান-শিখদের বিরোধ আর প্রচ্ছন্ন নাই। মুসলমানরা হিন্দুদের সহিত মিলিতভাবে রাজনৈতিক প্রচেষ্টায় অংশ গ্রহণ করিবে না। তাহারা পৃথক্ থাকিতে চায়; এই মনোভাব কবির পক্ষে অত্যন্ত বেদনাদায়ক, তিনি লিখিতেছেন:

হে বিষয়ী, হে সংসারী, তোমরা যাহারা
আত্মহারা,
যারা ভালোবাসিবার বিশ্বপথ
হারায়েছ, হারায়েছ আপন জগৎ,
রয়েছ আত্মবিরহী গৃহকোণে,
লক্ষ্মীর মন্দিরে
আমি আনিয়াছি নিমন্ত্রণ,
বিরহের ব্যথা নেই মনে।
আমি কবি পাঠালেম তোমাদের উদ্‌ভ্রান্ত পরানে
সে ভাষার দৌত্য যাহা হারানো নিজেরে কাছে আনে,
ভেদ করি মরুকারা
শুষ্ক চিত্তে নিয়ে আসে বেদনার ধারা।
জানায়েছি, সেথাকার তোমার আসন
অন্যমনে তুমি আছ ভুলি।[৩]

নববর্ষের দিন (১৩৪৬) অপরাহ্ণে কবির জন্মোৎসব পঁচিশে বৈশাখ পুরীতে থাকিবেন। সেইদিনই দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্মরণে 'দিনান্তিকা' নামে চা-চক্রের নূতন গৃহের উদ্‌বোধন হইল। দিনান্তিকা শান্তিনিকেতনের মধ্যে দর্শনীয় স্থান। গৃহের মধ্যে নন্দলালপরিকল্পিত ও কলাভবনের ছাত্রদের দ্বারা অঙ্কিত প্রাচীরচিত্র আছে। এইখানে প্রতিদিন বৈকালে পদমান-বেতন-নিরপেক্ষ সকল শ্রেণীর কর্মী চা-পান উপলক্ষ্যে জমায়েত হন।

of the last century; after order was restored the British parliament sent Lord Durham in 1837 to study the situation and propose reforms. The Report has been the most valuable document in the English language on the subject of colonial policy. By 1889 Canada was united and granted a constitution. Durham Report was published in 1839. May 1939 was the centenary of Durham Report. [Durham, John George Lambtion, Earl of, 1792-1840]

১ প্রবাসী ১৩৪৬ জ্যৈষ্ঠ পৃ ২৭২।

২ প্রবাসী, নবজাতক [পুরী] ১৩৪৬ বৈশাখ ৯; র র ২৪ পৃ ৪৩।

৩ তু 'মন যে দিল না সাড়া তাই তুমি গৃহছাড়া' পদটি। সেটিও 'প্রবাসী' নামে প্রবাসীতেই প্রকাশিত হয়।

বহু বৎসর পূর্বে চা-এর সভা বসিত রান্নাঘরের বারান্দায় [তাহার চিহ্ন নাই], শরৎকুমার রায় ছিলেন ইহার উৎসকেন্দ্র; চা-পান করিতে, পরিবেশন করিতে, তাঁহার অকৃত্রিম আনন্দ ছিল। তিনি চলিয়া যাইবার পর দিনেন্দ্রনাথের বাসায় সকলে চা-পানের জন্য সমবেত হইতেন। দিনেন্দ্রনাথ প্রথমে বেণুকুঞ্জে ও পরে দেহলির একতলায় বাস করেন; তাঁহার গৃহেই সভা বসিত। দিনেন্দ্রনাথ সুরপুরীর বাড়িতে চলিয়া গেলে কর্মীরা নিজেদের ব্যয়ে চা-চক্র স্থাপন করিলেন। রবীন্দ্রনাথ এই চা-এর মজলিসে মাঝে মাঝে আসিতেন। তখন সভা বসিত গ্রন্থাগারের উপরতলায়। ১৯২৪ সালে রবীন্দ্রনাথ চীন হইতে ফিরিয়া আসিলে সুসীম চা-চক্রের উৎসব ও উদ্‌বোধন এইখানে হইয়াছিল। তজ্জন্য কবি যে গান রচনা করেন, তাহার কথা বলিয়াছি। এই প্রতিষ্ঠানের প্রতি কবির বিশেষ আকর্ষণের কারণ ছিল। মনে আছে একবার বিদেশে যাইবার পূর্বে লেখককে (লেখক তখন চা-চক্রের সম্পাদক) বলেন যে চা-চক্রকে যেন বাঁচাইয়া রাখা হয়। তিনি জানিতেন এই ভেদহীন, কাঞ্চনকৌলীন্যহীন Club আশ্রমের একটি বিশেষ প্রয়োজন সিদ্ধ করিতেছে। এইটি নষ্ট হইয়া গেলে শান্তিনিকেতনের সমাজজীবনের মূলে আঘাত করা হইবে।[১]

দিনেন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর তাঁহার সুহৃৎ ও গুণগ্রাহীগণের চেষ্টায় অর্থ সংগৃহীত হয় এবং তদ্দ্বারা এই তোরণগৃহটি নির্মিত হয়। স্থাপত্যপরিকল্পনা সুরেন্দ্রনাথ করের, বিভূষণ প্রযোজক নন্দলাল বসু।

এই বৎসর রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে দুইখানি বই প্রকাশিত হয়; 'বিপ্লবী রবীন্দ্রনাথ' লেখেন বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় ও 'মানুষ রবীন্দ্রনাথ' লেখেন কাননবিহারী মুখোপাধ্যায়। উভয়েই অল্পকালের জন্য শান্তিনিকেতনে অধ্যাপনা করেন। 'বিপ্লবী রবীন্দ্রনাথ' বইখানি কবির ভালো লাগিয়াছিল বলিয়া শুনিয়াছি; কিন্তু দুঃখের বিষয় বাংলা সরকার বইখানি বিপ্লবাত্মক মনে করিয়া বাজেয়াপ্ত (proscribe) করেন। কাননবিহারীর সে সৌভাগ্য হয় নাই। প্রবাসীতে ইহার যে সমালোচনা বাহির হয় (১৩৪৫ চৈত্র পৃ ৯০৯), তাহাতে প্রবাসীর সমালোচক লেখেন যে কানন-বিহারীর "চেষ্টা সম্পূর্ণ সফল না হইলেও অনেকটা সফল হইয়াছে। তাঁহার পর্যবেক্ষণের ও বিশ্লেষণের শক্তি এবং নূতন ধরনের এরূপ একটি বহি লেখার কঠিন কার্যে হস্তক্ষেপের সাহস প্রশংসনীয়। তিনি অল্পকাল মাত্র কবির নিকটে থাকিবার সুযোগ পাইয়া তাঁহাকে যতটা বুঝিয়াছেন তাহা প্রশংসার যোগ্য। অবশ্য তিনি যে সবই ঠিক বুঝিয়াছেন এমন বলা যায় না। শান্তিনিকেতনের কর্মপ্রণালী তাঁহার মতে যথেষ্ট সুফলদায়ক হয় নাই। ইহার জন্য তিনি অধিকাংশ কর্মীকে যতটা দায়ী করিয়াছেন, আমাদের বিবেচনায় ততটা দায়ী তাঁহারা নহেন। এই কর্মপ্রণালী যে পরিমাণে সফল হইয়াছে তাহার এবং শান্তিনিকেতনের আদর্শের প্রশংসা তিনি অবশ্য করিয়াছেন।" পরিশেষে সমালোচকের বক্তব্য এই যে, "কিছু অনভিপ্রেত দোষ ত্রুটি সত্ত্বেও বহিখানি ভালো এবং বাংলাসাহিত্যে এরূপ বহির প্রয়োজন আছে।"

কিন্তু সমালোচকের এই মন্তব্য শান্তিনিকেতনবাসীরা অনুমোদন করিতে পারেন নাই। অচিরকাল মধ্যেই প্রবাসীর জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় (১৩৪৬) 'মানুষ রবীন্দ্রনাথ' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। লেখকের নাম রহিয়াছে শ্রীতেজেশচন্দ্র সেন। ইনি শান্তিনিকেতনের বহুদিনের অধ্যাপক। লেখাটির মধ্যে বলা হইয়াছে,—"গ্রন্থকার যাকে মানুষ রবীন্দ্রনাথ আখ্যা দিয়েছেন—তাকে চিনতে গেলে প্রশস্ত পরিপ্রেক্ষণী, বিচক্ষণ দৃষ্টিশক্তি, বহুবিস্তৃত প্রভূত তথ্য-

১ একবার বিধুশেখর ভট্টাচার্য মহাশয়ের নিকট হইতে 'চা-স্পৃহ-চঞ্চলে'র দল কিছু টাকা আদায় করিয়া ভোজের আয়োজন করেন। কবি এই সংবাদ পাইয়া 'চাতক' নামে একটি কবিতা লিখিয়া পাঠাইয়া দেন। প্রথম স্তবকটি উদ্ধৃত হইল :

কী রসসুধা-বরষাদানে মাতিল সুধাকর
তিব্বতীর শান্ত গিরিশিরে!

তিয়াবিদল সহসা এত সাহসে করি ভর
কী আশা নিয়ে বিধুরে আজি ঘিরে!

বিশ্বভারতী পত্রিকা ১৩৫০ কা-পৌ সংখ্যা; দ্র প্রহাসিনী, সংযোজন র-র ২৩ পৃ ৪৬।

সংগ্রহে ও তার বিশ্লেষণে সময় ও সুযোগের প্রয়োজন। অতি অল্প কয়েকদিন মাত্র কাননবিহারী শান্তিনিকেতনে শিক্ষকতা করেছিলেন। তাঁর এই অল্পকালের কটাক্ষপাতে রবীন্দ্রনাথের সুদীর্ঘকালের চিন্তা ও সাধনার ক্ষেত্র সম্বন্ধে লেখকের যে অনায়াসে লিখিত মত ব্যক্ত হয়েছে সে তাঁর চেয়ে অনেক অভিজ্ঞ ব্যক্তির পক্ষেও দুঃসাহসের বিষয় হত।"

'মনের মানুষ যেখানে, বলো কোন্ সন্ধানে যাই সেখানে'—বাউলের এই পদটি উদ্ধৃত করিয়া সমালোচক লিখিতেছেন, "হয়তো যাওয়া ঘটবে না, কিন্তু যথোচিত অধ্যবসায় ও শ্রদ্ধার সঙ্গে সন্ধান করা হয়েছে তার প্রমাণ আবশ্যক। এই কারণেই বন্ধু প্রভাতকুমারকে নমস্কার করি, তিনি ফাঁকি দেননি—তাড়াতাড়ি বাজারে চলনসই একখানা বই বের করেননি। হয়তো কোথাও কোথাও ত্রুটি থাকতে পারে, কিন্তু চেষ্টার অগভীরতা বা শৈথিল্য দেখিনি।"

সমালোচকের মতে "জীবনীলেখা অতি দুরূহ সাহিত্যিক ক্ষমতাসাধ্য।" "মানুষরূপে ও কর্মীরূপে তিনি (কাননবিহারী) রবীন্দ্রনাথকে যথোচিত চেনেন একথা মেনে নেওয়া শক্ত। কবিকে যাঁরা তাঁর সুখে দুঃখে উৎসবে শোকে কর্মসাধনার নানা কঠিন ঘাত-প্রতিঘাতে নানা বাধার সঙ্গে সংগ্রামে এবং বিদেশী সমাজের সঙ্গে তাঁর বহুব্যাপী ঘনিষ্ঠ যোগের পর্বে পর্বে তাঁকে কাছে থেকে দেখেছেন এবং দূরে থেকে সংবাদলাভের অবকাশ পেয়েছেন তাঁদের অনেকে বর্তমান আছেন। কিন্তু মানুষ রবীন্দ্রনাথকে বাঙালীর কাছে পরিচিত করিয়ে দেবার ভার নিতে তাঁরা সাহস করেন নি। আমার বন্ধু প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয় বহু যত্ন ও অধ্যবসায়ে রবীন্দ্রনাথের জীবনীর ছোটো-বড়ো দলিলগুলি প্রায় নিঃশেষে সংগ্রহ করেছেন, যাঁদের প্রতিভা আছে তাঁরা এর থেকে জীবনী লেখবার সুযোগ পাবেন।" মোটকথা কাননবিহারীর গ্রন্থ কবিকে যে পরিতৃপ্ত করিতে পারে নাই সেই কথাই এই রচনা মারফতে প্রকাশ পায়।

আর-একটি আধা-রাজনৈতিক ব্যাপারের সঙ্গে এই সময় কবির নাম জড়িত হইয়া পড়ে। বাংলাদেশে তখন প্রধানমন্ত্রী ফজলুল্ হক্ সাহেব—শিক্ষামন্ত্রীও তিনি। কিছুকাল হইতে সরকারী, আধা-সরকারী চাকরিরাজ্যে হিন্দুমুসলমান সংঘাত দেখা যাইতেছে। মুসলমানের অভিযোগ তাহারা কাজ পায় না, হিন্দুর অভিযোগ অযোগ্য মুসলমানের উপর দায়িত্বপূর্ণ কর্মের ভার অর্পিত হওয়ায় যোগ্য হিন্দু সুযোগ হইতে বঞ্চিত হইতেছে। গবর্মেন্টের নীতি efficiency বা কর্মকুশলতার মাপকাঠি হইতে যদি মুসলমানপ্রার্থীর যোগ্যতায় ঘাটতি হয়, তথাচ তাহাকে নিযুক্ত করা উচিত। তাঁহাদের যুক্তি, দায়িত্ব না-পাইলে কোনো কালেই কেহ যোগ্যতা লাভ করিবে না। বাংলাদেশের অর্ধেকের উপর মুসলমানকে পিছাইয়া রাখিলেও চলিতে পারে না। যাহা হউক এই ব্যাপার লইয়া হিন্দু বঙ্গবাসীদের মধ্যে আন্দোলন আরম্ভ হয়। রবীন্দ্রনাথ মংপু হইতে অমিয়চন্দ্রকে এক পত্রে লিখিতেছেন (১৯৩৯ জুন ২০), "হিন্দুমুসলমানের চাকরির হার বাঁটোয়ারা নিয়ে অবিচার হয়েছে। এই নিয়ে হিন্দুরা ভারতশাসন দরবারে নালিশ জানিয়েছেন। সেই পত্রে নাম স্বাক্ষর করতে আমার যথেষ্ট দ্বিধা ছিল।...অনিচ্ছাসত্ত্বেও নালিশের পত্রে আমি সই দিয়েছি।"

বলা বাহুল্য এ শ্রেণীর কাজ কবিকে বহুবার করিতে হইয়াছে, বিশেষভাবে জীবনের শেষ দিকে পাচজনের অনুরোধ-উপরোধ তিনি আর এড়াইতে পারিতেন না। অনেক সময় 'সুখের থেকে সোয়াস্তি ভালো' মনে করিয়া পারিপার্শ্বিকের উপদ্রব হইতে রক্ষা পাইবার জন্য, নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে বহু জিনিসে সহি দিতেন। রাজনীতির ক্ষেত্রে, বিশ্বভারতীর অপ্রিয় কার্যকলাপে, পারিবারিক ও বৈষয়িক ব্যাপারে এইধরনের 'অনিচ্ছাসত্ত্বের সহি' দিয়া আপাত-উৎপাত হইতে 'সোয়াস্তি' পাইতেন। কিন্তু এসবের প্রতিক্রিয়ায় যাহা ঘটিত তাহার দায় তাঁহাকে একাই শেষকালে সামলাইতে হইয়াছে।

যাহা হউক, কবি মেমোরিয়ালে সহি দিয়াও হিন্দুদের পক্ষে বিষয়টাকে মহাসর্বনাশ বলিয়া মনে করিতেছেন

না ; তাহার কারণ সম্বন্ধে লিখিতেছেন, "দীর্ঘকাল চাকরির অন্নে বাঙালীর নাড়ী দুর্বল হয়ে গেছে, তা নিয়ে আর কাড়াকাড়ি করতে রুচি হয় না। হিন্দুর ভাগ্যে পরাধীন জীবিকার অসম্মানের দ্বারগুলো যদি বন্ধ হয় তো হোক,— তাহলেই বুদ্ধি খাটাতে হবে শক্তি খাটাতে হবে আত্মনির্ভরের বড়ো রাস্তা খুঁজে বের করতে।"[১]

পুরীতে ১৩৪৬

নববর্ষের পরদিন (১৯৩৯ এপ্রিল ১৬) রবীন্দ্রনাথ কলিকাতায় গেলেন, সেখান হইতে পুরী যাইবেন। কলিকাতায় দুই-একদিনের জন্য আসিলেও সভাসমিতি তাঁহাকে টানিয়া সেখানে লইয়া যায়; উদ্যোক্তারা উৎসাহের আতিশয্যে ভুলিয়া যান কবির বয়স আঠাত্তর বৎসর। স্থানিক বিশ্বভারতী-সম্মেলনের উদ্যোগে নববর্ষের উৎসব (১৭ই) —সভার স্থান পাইকপাড়ার প্রাসাদ—কবিকে সেখানে যাইতে হইল।[২] তরুণ সাহিত্যিক কুমার বিমলচন্দ্র সিংহের আগ্রহে উৎসব পাইকপাড়ায় অনুষ্ঠিত হয়।

দুইদিন পরে (১৯ এপ্রিল) কবি পুরী যাত্রা করেন। উড়িষ্যার নবগঠিত প্রদেশে নূতন শাসনব্যবস্থায় কন্‌গ্রেসের শাসন প্রবর্তিত হইয়াছে ; কবি কংগ্রেস-গবর্মেণ্টের অতিথি। তখনকার প্রধান মন্ত্রী ছিলেন বিশ্বনাথ দাস।

রবীন্দ্রনাথের সহিত উড়িষ্যার সম্বন্ধ বহুকালের। উড়িষ্যায় এককালে দ্বারকানাথ ঠাকুরের জমিদারি ছিল। মহর্ষির জীবিতকালে বহুবৎসর সমস্ত জমিদারি একত্র ছিল—এমনকি গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের এস্টেট তখনো পৃথক্ হয় নাই। সেই অখণ্ড জমিদারি তদারক করিবার জন্য রবীন্দ্রনাথকে যৌবনে কয়েকবারই উড়িষ্যায় আসিতে হয়।[৩] উড়িষ্যা ভ্রমণকালে লিখিত কয়েকখানি পত্রের অংশ 'ছিন্নপত্রে' দেখা যায় ; 'সোনার তরী'র কয়েকটি কবিতা উড়িষ্যায় রচিত। 'চিত্রাঙ্গদা'র খসড়া এখানেই করেন (১২৯৮ ভাদ্র ২৮)।[৪]

পুরীতে কবি আছেন সার্কিট হাউসে ; এইখানে বিহারীলাল গুপ্তের সঙ্গে তিনি আসেন প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে। কবি এখানে আসিয়া অমিয় চক্রবর্তীকে লিখিতেছেন,[৫]—"মনে পড়ছে এইখানেই এই বাড়িতেই লিখেছিলুম— 'হে আদি জননী সিন্ধু বসুন্ধরা সন্তান তোমার।'[৬]—সমুদ্রে তখন বোধ হয় যৌবনের উদ্দামতা ছিল। তার সঙ্গে ছন্দের পাল্লা দেবার স্পর্ধাতেই আমার সেই লেখা।" আজ কবির বয়স আশীর কাছাকাছি, আজ তিনি অনুভব করিতেছেন, "এখনকার লেখায় সেদিনকার মতো উদ্বেল প্রাণের অচিন্তিত গতিমত্ততা থাকতেই পারে না, আছে হয়তো আত্মসমাহিত মনের ফল ফলানোর নিগূঢ় আবেগ।"

১ কন্‌গ্রেস, প্রবাসী ১৩৪৬ আষাঢ় পৃ ৩১৮ ; দ্র কালান্তর পৃ ৩৭৪।

২ V. B. News 1939 May p 87.

৩ পুরীতে কবির একখানি বাড়ি ছিল ; 'পোড়াবাড়ি' নামে সেটি পরিচিত। কবি তৈয়ারি বাড়ি কেনেন ও গগনেন্দ্রনাথরা জমি কিনিয়া 'পাথারপুরী' নামে অট্টালিকা নির্মাণ করেন। পরে অর্থকৃচ্ছ্রতার জন্য কবিকে ঐ বাড়ি বিক্রয় করিয়া ফেলিতে হয় ; কলিকাতার মল্লিকরা সেটি কেনেন। এখন সেটি উড়িষ্যা সরকার requisition করিয়া লইয়া সরকারী কর্মচারীদের থাকিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। (১৯৫২ মে) 'পাথারপুরী'ও বিক্রীত হইয়া গিয়াছে, এখন সেটি কলেজহোস্টেল।

৪ দ্র রবীন্দ্রজীবনী ১ম খণ্ড পৃ ২৩০।

৫ পত্র, পুরী ১৯৩৯ এপ্রিল ২৩। ১৩৪৬ বৈশাখ ১০ ; দ্র কবিতা ১৩৫০ আষাঢ়।

৬ 'সমুদ্রের প্রতি' লিখিত হয় ১২৯৯ চৈত্র ১৭ রাজসাহীতে ; দ্র র-জী ১ম খণ্ড পৃ ২৮২। পুরীতে কবিতাটির খসড়া করিয়া থাকিতে পারেন, কিন্তু লিখিত হয় লোকেন পালিতের বাড়িতে রাজসাহীতে।

পুরীতে কবি তিন সপ্তাহ ছিলেন। এই সময়ের মধ্যে তাঁহার জন্মদিন পড়ে। সেদিন (১৯৩৯ মে ৮) সার্কিট হাউসে উড়িষ্যার কয়েকটি মহিলাসমিতি সমবেতভাবে কবিসংবর্ধনা করেন। পরদিন গবর্মেণ্টপার্কে প্রধানমন্ত্রী বিশ্বনাথ দাসের উদ্যোগে কবির জন্মোৎসব মহাআড়ম্বরে উদ্‌যাপিত হইল। বহু সহস্র লোক উদ্যানে জমায়েত হয়। জগন্নাথ মন্দিরের পুরোহিতগণ কবির আয়ুর্বৃদ্ধি কামনা করিয়া সংস্কৃত মন্ত্র ও কবির গুণগান করিয়া প্রশস্তি পাঠ করেন। এ ছাড়া উড়িষ্যার আরও কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হইতে মানপত্র পঠিত হয়। কতকগুলি সময়াভাবে পঠিত বলিয়া গৃহীত হয়। এইদিন এনড্রুস সাহেব পুরীতে ছিলেন। তিনি কবির জন্মদিন উপলক্ষ্যে একটি কবিতা পাঠ করেন।[১] রবীন্দ্রনাথ সর্বশেষে তাঁহার ভাষণ দেন। এই দিনে 'জন্মদিন' নামে কবিতা লিখিত হয়। (নবজাতক)

তোমরা রচিলে যারে
নানা অলংকারে
তারে তো চিনি নে আমি,
চেনেন না মোর অন্তর্যামী
তোমাদের স্বাক্ষরিত সেই মোর নামের প্রতিমা।
বিধাতার সৃষ্টিসীমা
তোমাদের দৃষ্টির বাহিরে।

কবি ভালো করিয়া জানেন মানুষের ব্যক্তিসত্তাকে—

বাহির হইতে
মিলায়ে আলোক অন্ধকার
কেহ এক দেখে তারে, কেহ দেখে আর।
খণ্ড খণ্ড রূপ আর ছায়া,
আর কল্পনার মায়া,
আর মাঝে মাঝে শূন্য, এই নিয়ে পরিচয় গাঁথে
অপরিচয়ের ভূমিকাতে।

পুরী বাসকালে জন্মদিন সম্বন্ধে কবিতা ছাড়াও কবিকে আরও কয়েকটি কবিতা লিখিতে দেখি। যেমন— 'এপারে ওপারে' (১৩৪৬ বৈশাখ ২০, নবজাতক), অত্যুক্তি[২] (বৈশাখ ২৪, সানাই)। 'এপারে ওপারে' কবিতায় তুচ্ছ কথা তুচ্ছ কাজে নিযুক্ত মানুষের ছবি; কবির মন "ক্ষণে ক্ষণে ব্যগ্র হয়ে ওঠে জাগি সর্বব্যাপী সামান্যের সচল স্পর্শের লাগি;" কবির আপসোস,—"আপনার উচ্চতট হতে নামিতে পারে না সে যে সমস্তের ঘোলা গঙ্গাস্রোতে।" এই সর্বব্যাপী সামান্যের সহিত মিলিতে না পারিবার বেদনা অভিজাত কবিচিত্তে মাঝে মাঝে দেখা দেয়; 'এবার ফিরাও মোরে' হইতে 'ঐকতান' (জন্মদিনে) পর্যন্ত এই ভাবনা ক্ষণে ক্ষণে প্রকাশ পাইয়াছে।

পুরীতে কবি ভালোই আছেন। লিখিতেছেন, "আমার কোনো কর্ম নেই, এখানে আমাকে কারো কোনোই প্রয়োজন নেই, যাঁরা আমাকে যত্ন করে রেখেছেন তাঁরা আমার কাছ থেকে কোনো ব্যবসায়িক পরামর্শ দাবী করেন নি। আমার শরীর মনে সমুদ্রের হাওয়া যে শুশ্রূষাশীতল হাত বুলিয়ে দিচ্ছে সেটা নূতন দায়িত্বপ্রাপ্ত উড়িষ্যাপ্রদেশের আতিথ্যের প্রতীক।"

পূর্বেই বলিয়াছি উড়িষ্যার যাঁহারা নূতন রাষ্ট্রনায়ক কবি তাঁহাদের অতিথি। এই ব্যাপারটার মধ্যে নূতনত্ব আছে। পুরাকালে রাজা বা রাজন্যরা গুণীদের সমাদর করিতেন, তাঁহারা স্বীকার করিতেন 'মানবচিত্তোৎকর্ষের সর্বজনীন উত্তরাধিকার।' ইংরেজ-রাষ্ট্রব্যবহারে গুণীদের কোনো স্থান ছিল না। 'প্রাচ্য রাষ্ট্রব্যবহারে নম্রভাবে আপন গুণজ্ঞতার গৌরব প্রকাশ উপেক্ষিত হয় নাই' বলিয়া কবি সন্তুষ্ট।

১ V. B. News 1939 June p 89.

২ অত্যুক্তি কবিতাটি প্রবাসী ১৩৪৬ জ্যৈষ্ঠে প্রকাশিত 'অদেয়' (১৯৩৮ জুন ১৮, সানাই)-র সহিত তুলনীয়। কবির মুখে 'অদেয়'র ব্যাখ্যা দিয়াছেন মৈত্রেয়ী দেবী তাঁহার 'মংপুতে রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থে, পৃ ৭৭।

উড়িষ্যার নব্য রাষ্ট্রশাসনের ভার যাঁহারা গ্রহণ করিয়াছেন তাঁহাদের প্রজাবাৎসল্য এবং বিচক্ষণতা কবিকে মুগ্ধ করিয়াছে। দেশের রাষ্ট্রনীতির মধ্যে গৌরবের যাহা তাহার কথা ভাবিয়া যেমন তৃপ্ত, তাহার বিরুদ্ধে ভাঙনের ধ্বনি শুনিয়াও তিনি তেমনি উদ্বিগ্ন। কবি বুঝিতে পারিতেছেন যে উড়িষ্যার এই সৌভাগ্যের গৌরব সকল দলকে অন্তরে অন্তরে একত্র করিতে পারে নাই। দলগত মতভেদ রাজনীতিতে চিরদিন আছে ও থাকিবে এ কথা রবীন্দ্রনাথ জানিতেন। সকল শ্রেণীর লোক একই মত পোষণ করিবে, রাষ্ট্রিক ব্যাপারে এই প্রকারের সর্বনাশা মতবাদ কবি সমর্থন করিতেন না। তিনি লিখিতেছেন, "রাষ্ট্রসম্পদ যাদের অনেক কালের সাধনার জিনিস এবং যাদের কাছে পরম মূল্যবান তারা দলগত পরস্পর তীব্র বিরুদ্ধতা সত্ত্বেও এর সম্মান বিস্মৃত হয় না। প্রয়োজন বোধ করলে তারা আঘাত লাগায় বাইরের দিকে, গোড়ার দিকে নয়।" কিন্তু ভারতের রাজনীতিতে "পোলিটিশিয়ানেরা আপন দলাদলির স্বার্থসিদ্ধির জন্যে···ছাত্রদের বুদ্ধিস্থৈর্য ও আত্মসংযম রক্ষার প্রয়োজনকে উপেক্ষা করতে শেখালেন, এমনকি তাদের অন্যায় আবদারকে নির্বিচারে প্রশ্রয় দিতে লাগলেন।" কবি পুরীতে আসিয়া সেখানকার ছাত্রমহলের এই মনোভাব লক্ষ্য করিয়া অতি দুঃখে লিখিতেছেন, "এখানকার একদল ছাত্র আপন নবলব্ধ রাষ্ট্রসম্পদের মর্যাদা নষ্ট ক'রে তাকে সর্বজনের কাছে অশ্রদ্ধেয় করবার জন্যে উঠে পড়ে লাগতে সংকোচ করলে না।" কবি এই ব্যাপারকে 'কৌতুকাবহ শোচনীয় কাণ্ড' বলিয়া অভিহিত করেন। তিনি বলিতেছেন, "আজ আমরা স্বারাজ্যের আংশিক অধিকার পেয়েছি, এই অধিকারকে ক্রমশ প্রশস্ত ক'রে পরিপূর্ণতায় হয়তো নিয়ে যাওয়া অসম্ভব হবে না। কিন্তু সেজন্যে আবশ্যক সৃষ্টি করবার শক্তি চালনা, যে-শক্তিতে আছে ধৈর্য, আছে পরিণত বুদ্ধির গাম্ভীর্য, এবং অবিচলিত শ্রদ্ধার সঙ্গে লক্ষ্য বিষয়ের সম্মান রক্ষার প্রতি গভীর দরদ।" দেখা যাইতেছে একদল লোক "সকল বিষয়েই আপন শক্তি প্রকাশ করতে চায় ভেঙে ফেলবার আস্ফালনে।··· অতি তুচ্ছ বিষয়েও অদ্ভুত জেদের সঙ্গে তারা আপোস করতে নারাজ।" কবির মতে 'স্বভাবত অকর্মণ্যরাই অসহিষ্ণু।' রাষ্ট্রিক ব্যাপারে ভয় এই অসহিষ্ণুতাকে। "যারা এক লাফে সমস্ত বাধা ডিঙিয়ে সদ্যফল পেতে চায় তারা ভুলে যায় প্রতিকূলতার মাঝখানে আড্ডা ক'রে বারে বারে প্রতিহত হয়েও অক্ষুণ্ণ ধীরবুদ্ধি দিয়ে ভিতর থেকে বাধাকে আক্রমণ করতে থাকাই বীরোচিত।···অব্যবস্থিত চিত্তদের কে মনে করিয়ে রাখতে পারবে যে, মহৎ কাজে চাই তপস্যার চিত্তবৃত্তি শান্ত দান্ত উপরতস্তিতিক্ষুঃ সমাহিতো ভূত্বা।" কবি মনোক্ষোভে বলিতেছেন, "যখন দূরের থেকে আমরা রাষ্ট্রিক মুক্তির কামনা করেছিলুম স্বপ্নাবেশে তার মহার্ঘতা দীর্ঘকাল কল্পনা করেছি। কিন্তু শুভাদৃষ্টের দান যখন হাতে এল তখন তার মূল্য সম্পূর্ণ উপলব্ধি করবার যোগ্য মনোবৃত্তি দেখতে পাচ্ছিনে।"[১] কবি ১৩৩৯ সালে যে কথা বলিয়াছিলেন, যথার্থ স্বাধীনতা লাভের পরও সর্বশ্রেণীর লোকে যে সে-কথা স্পষ্ট ভাবে বুঝিয়াছে তাহা তো মনে হয় না।

দেশের বাহিরে প্রলয়ের হুংকার চলিতেছে, য়ুরোপীয় মহাসমরের আয়োজন সর্বত্র; কোথায় কখন কিভাবে প্রথম অস্ত্রাঘাত পড়িবে তাহারই প্রতীক্ষামাত্র। কবি লিখিতেছেন, "ইতিহাসের ঝোড়ো মাতুনি চলেছে জগত জুড়ে, লুটোপুটি করচে ওষধি বনস্পতি, দোহাই পাড়চে শাখাপ্রশাখারা বধির আকাশের দিকে। এই ধাক্কাটা তাদের ভাঙবেই যাদের মজ্জা দুর্বল, কাঁচাফল অনেক পড়ে যাবে পাক ধরবার পূর্বেই, একটা সংকটের পর্ব চুকিয়ে দিয়ে যারা টিঁকে থাকবে তারা নতুন জীবনের পালা আরম্ভ করবে ছিন্নবিচ্ছিন্ন অতীতের মাঝখানে—যা অনিবার্য তা সব নিষেধকে ঠেলেঠুলে কাজ করবে ভিতরের থেকে।" (উড়িষ্যার অতিথি)

উড়িষ্যার অতিথি, প্রবাসী ১৩৪৬ জ্যৈষ্ঠ পৃ ২৮৮-৩০০।

মংপুতে একমাস

পুরী হইতে ফিরিয়া কবি মংপু যাত্রা করেন। মংপুর কথা পূর্বেই বলিয়াছি। গত বৎসর কালিম্পং হইতে সপ্তাহ তিনের জন্য মংপুতে যান। এবার কালিম্পং না গিয়া মংপুতে ডক্টর মনোমোহন সেন ও মৈত্রেয়ী দেবীর আতিথ্য গ্রহণ করিলেন। সেখানে একমাস থাকিয়া (১৭মে-১৭ জুন ১৯৩৯) কলিকাতায় নামিয়া আসেন। এই একমাসের বিস্তৃত কাহিনী মৈত্রেয়ী দেবী তাঁহার 'মংপুতে রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থে বিবৃত করিয়াছেন।

মংপুতে মৈত্রেয়ী দেবীর যত্নে কবি বেশ আরামে ও আনন্দে আছেন। মাঝে মাঝে কবিতা লেখেন, সন্ধ্যায় সকলকে লইয়া সাহিত্য আলোচনা করেন। কবিতাগুলি সানাই ও নবজাতকের মধ্যে সংগৃহীত হইয়াছে; কয়েকটি কবিতার ইতিহাস পাই মৈত্রেয়ী দেবীর বইতে।[১] 'কর্ণধার' নামে যে কবিতাটি 'সানাই'এ পাই তাহা মংপুতে লিখিত মূল রচনা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্; মংপুতেই ইহার কয়েকবার রদবদল করেন; তারপর প্রবাসীতে (১৩৪৬ অগ্র) যে একটি রূপ দেখা গেল (লিখিত ১৯৩৯ সেপ্টেম্বর ১৪), সেটিও শেষরূপ নহে, সানাই কাব্যখণ্ডে আবার পরিবর্তিত-রূপে বাহির হইল। রবীন্দ্রনাথ কাব্যকে কেবল মাত্র আত্মপ্রকাশ রূপে দেখেন না, তিনি কলারূপেও তাহার বিচার করেন; সেইজন্য তাঁহার কাছে কাব্যপ্রসাধন কাব্য-সাধনারই সমতুল্য।[২] নবজাতকের 'সাড়ে নয়টা' (১৯৩৯ জুন ৮) ও সানাইএর 'মানসী' (৯ জুন) কবিতাদ্বয়ের ইতিহাস পাওয়া যায় ঐ গ্রন্থেই।

রেডিয়োর মধ্য দিয়া দূরদূরান্তের যে বিচিত্র সুরতরঙ্গ ভাসিয়া আসে তাহার রহস্য কবিকে মুগ্ধ করে। এই কথা আলোচনা করিতে করিতে পদ্মাতীরে কী শান্ত পরিবেশের মধ্যে 'মানসী' কবিতা লেখেন, তাহারই কথা গল্পচ্ছলে বলেন। সেই ভাবনা হইতেই এই দুইটি কবিতার উদ্ভব। (দ্র র-র ২৪ পৃ ৪৮২) মানসী লিখিবার কয়েকদিন পরে 'পরিচয়' (১৯৩৯ জুন ১৩) নামে আখ্যায়িকার আভাসযুক্ত একটি দীর্ঘ কবিতা লিখিত হয়। ১৯৩৮ এর অগস্ট মাসে শান্তিনিকেতনে কবি 'বাসা বদল' (সানাই) নামে যে একটি কবিতা লেখেন ও মংপুতে বাসকালে 'পরিচয়' (১৩ জুন) নামে যে কবিতাটি লিখিলেন উভয়ের উৎস একটি সাধারণ গদ্যছন্দের অপ্রকাশিত কথিকা। 'বাসা বদলে'র ঘটনাংশ যথার্থ পাওয়া যাইবে 'পরিচয়ে'র শেষাংশে—মূল কথিকার রূপটি সেখানে আছে। শিল্পী বা সাহিত্যিককে তাহার রচনা-রহস্য দ্বারা বিচার করিয়া মনে করি সে বুঝি অতিমানব বা মহামানব। কিন্তু পরিচয়ের সীমার মধ্যে আসিলে দেখা যায় যে, সে সাধারণ বা প্রাকৃত জনের ন্যায়ই ক্ষুধাতৃষ্ণার আঘাতে জর্জরিত; তখন ভক্তের বিহ্বলতা ভাঙিয়া যায়—সে বলে "যে-তুমি নও প্রতিদিনের সেই তোমারে দিলাম যে-অঞ্জলি তোমার দেবীর প্রসাদ রবে তাহে।" প্রেমাস্পদকে কেহ প্রাকৃতজনের স্বভাব-দুর্বল অবস্থায় দেখিতে চাহে না; 'চণ্ডালিকা'তে আনন্দের পতন সম্ভাবনায় প্রকৃতি যে নিদারুণ কষ্ট পাইয়াছিল তাহার কারণ 'চাইনা তোমায় ধরতে আমি মোর বাসনায় ঢেকে।' ইহার সঙ্গে তুলনীয় ছোটোগল্প 'শেষ কথা'য় অচিরার উক্তি ও ব্যবহার।

কবি সাময়িক পত্রিকা হাতে আসিলেই পড়েন; থিওজফিক্যাল জার্নালের কয়েকটি সংখ্যা মংপুতে পান; এই পত্রিকায় আদিভৌতিক অনেক কথা থাকে। কবি সেগুলি পড়িয়া মৈত্রেয়ী দেবীর সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনা করেন, নিজ জীবনের অভিজ্ঞতার কথা তাঁহাকে বলেন। দশ বৎসর পূর্বে (১৯২৯) বুলা বা উমা সেনের মাধ্যমে যেসব অদ্ভুত

১ কর্ণধার (খসড়া ২৩ মে ১৯৩৯, সানাই), উদ্‌বৃত্ত (৩০ মে, সানাই), স্মৃতির ভূমিকা (৮ জুন, সানাই), সাড়ে নয়টা (৮ জুন নবজাতক), মানসী (৯ জুন, সানাই), পরিচয় (১৩ জুন, সানাই)

২ দ্র মংপুতে রবীন্দ্রনাথ ১ ম সং পৃ ১৭৭-৭৯; রবীন্দ্র-রচনাবলী ২৪ গ্রন্থপরিচয় পৃ ৪৭৬-৭৭।

কথা জানিতে পারেন তাহারই বিস্তারিত আলোচনা এখানে পাই। (পৃ ৬৪-৬৯) এ সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য পূর্বেই বলিয়াছি।

কিন্তু কবিচিত্তের আর-একটি দিক অত্যন্ত উদ্বেগপূর্ণ। আপাতদৃষ্টিতে ১৯৩৯ সালে কন্‌গ্রেসের জয়জয়কার আটটি প্রদেশে; কিন্তু সবচেয়ে বড়ো সমস্যা দেখা দিয়াছে কন্‌গ্রেসের কর্তৃত্ব লইয়া। সুভাষচন্দ্রের দ্বিতীয়বার কন্‌গ্রেস-প্রেসিডেণ্ট নিযুক্ত হওয়ার পূর্বে হইতে কন্‌গ্রেসে ভাঙন ধরিয়াছে; তারপর রাষ্ট্রপতির পদত্যাগ দ্বারাও তাহা শমিত হয় নাই। উড়িষ্যায় বাসকালে বিরোধীদলের যে মনোভাব লক্ষ্য করিয়াছিলেন, তাহা, কবির মতে আশাপ্রদ নহে। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষণীতে রবীন্দ্রনাথ লিখিত 'উড়িষ্যার অতিথি'[১] ও 'কন্‌গ্রেস'[২] শীর্ষক পত্র-প্রবন্ধ দুইটি বিচার্য। মংপু হইতে কবি অমিয় চক্রবর্তীকে লিখিতেছেন "পৃথিবীতে যে দেশেই যে-কোনো বিভাগেই ক্ষমতা অতিপ্রভূত হয়ে সঞ্চিত হয়ে ওঠে সেখানেই সে ভিতরে ভিতরে নিজের মারণ-বিষ উদ্‌ভাবিত করে। ইম্‌পিরিয়ালিজ্‌ম্ বলো, ফাসিজ্‌ম্ বলো, অন্তরে অন্তরে নিজের বিনাশ নিজেই সৃষ্টি ক'রে চলেছে। কন্‌গ্রেসের অন্তঃসঞ্চিত ক্ষমতার তাপ হয়তো তার অস্বাস্থ্যের কারণ হয়ে উঠেছে ব'লে সন্দেহ করি।··· মুক্তির সাধনা তপস্যার সাধনা। সেই তপস্যা সাত্ত্বিক এই জানি মহাত্মার উপদেশ। কিন্তু এই তপঃক্ষেত্রে যাঁরা রক্ষকরূপে একত্র হয়েছেন তাঁদের মন কি উদারভাবে নিরাসক্ত? তাঁরা পরস্পরকে আঘাত ক'রে যে বিচ্ছেদ ঘটান সে কি বিশুদ্ধ সত্যেরই জন্যে, তার মধ্যে কি সেই উত্তাপ একেবারে নেই যে-উত্তাপ শক্তিগর্ব ও শক্তিলোভ থেকে উদ্ভূত? ভিতরে ভিতরে কন্‌গ্রেসের মন্দিরে এই যে শক্তিপূজার বেদী গ'ড়ে উঠছে তার কি স্পর্ধিত প্রমাণ এবারে পাইনি যখন মাহাত্মাজিকে তাঁর ভক্তেরা মুসোলীনি ও হিট্‌লারের সমকক্ষ বলে বিশ্বসমক্ষে অসম্মানিত করতে পারলেন।···

"আমি সর্বান্তঃকরণে শ্রদ্ধা করি জওহারলালকে, যেখানে ধন বা অন্ধ ধর্ম বা রাষ্ট্রপ্রভাব ব্যক্তিগত সংকীর্ণ সীমায় শক্তির ঔদ্ধত্য পুঞ্জীভূত করে তোলে সেখানে তার বিরুদ্ধে তাঁর অভিযান। আমি তাঁকে প্রশ্ন করি, কন্‌গ্রেসের দুর্গদ্বারের দ্বারীদের মনে কোথাও কি এই ব্যক্তিগত শক্তিমদের সাংঘাতিক লক্ষণ দেখা দিতে আরম্ভ করে নি? এতদিন পরে অন্তত আমার মনে সন্দেহ প্রবেশ করেছে। কিন্তু আমি পোলিটিশিয়ান নই, এই প্রসঙ্গে সে কথা কবুল করব।" এই দীর্ঘ প্রবন্ধে কবি ত্রিপুরী-উত্তর কন্‌গ্রেসের মনোভাবের যে বিশ্লেষণ করিয়াছিলেন, তাহা আজও গভীরভাবে প্রণিধানযোগ্য। কবি বলিতেছেন, "দেশে মিলনকেন্দ্ররূপে কন্‌গ্রেসের প্রতিষ্ঠা হওয়া সত্ত্বেও ভারতবর্ষে এক প্রদেশের সঙ্গে আর-এক প্রদেশের বিচ্ছেদের সাংঘাতিক লক্ষণ নানা আকারেই থেকে থেকে প্রকাশ পাচ্ছে। ভারতবর্ষে হিন্দু ও মুসলমানের অনৈক্য শোচনীয় এবং ভয়াবহ সে কথা বলা বাহুল্য।···এই দুর্ভাগ্য ভারতবর্ষে আচার ও ধর্ম এক সিংহাসনের শরিক হয়ে মানুষের বুদ্ধিকে আবিল করে রেখেছে।" ভারতের প্রত্যেক 'পাঁচ-দশ ক্রোশ অন্তর অতলস্পর্শ গর্ত' 'এবং সেই গর্তগুলোকে দিনরাত আগলে রয়েছে ধর্মনামধারী রক্ষকদল।' নানা কারণে 'প্রদেশে প্রদেশে জোড় মেলে নি।'

ত্রিপুরী কন্‌গ্রেসের কথা উল্লেখ করিয়া কবি লিখিতেছেন যে সেখানকার "অধিবেশনের ব্যবহারে বাঙালি জাতির প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করা হয়েছে, এই অভিযোগ বাংলাদেশে ব্যাপ্ত। এই নালিশটাকে বিশ্বাস ক'রে নেওয়ার মধ্যে দুর্বলতা আছে।" মহাত্মাজির নেতৃত্বে ভারতের যে অভাবনীয় পরিবর্তন হইয়াছে, তাহার কথা বারে বারে স্বীকার করিয়াও বলিলেন, "তবু তাঁর স্বীকৃত সকল অধ্যবসায়ই চরমতা লাভ করবে এমন কথা শ্রদ্ধেয় নয়। অন্য কোনো

[১] উড়িষ্যার অতিথি, প্রবাসী ১৩৪৬ জ্যৈষ্ঠ পৃ ২৯৭-৩০০, পুরী হইতে অমিয় চক্রবর্তীকে লিখিত পত্র।

[২] কন্‌গ্রেস, প্রবাসী ১৩৪৬ আষাঢ় পৃ ৩১৬-১৮, মংপু হইতে ২০ মে বা ১১ জ্যৈষ্ঠ অমিয় চক্রবর্তীকে লিখিত পত্র।

কর্মবীরের মনে নতুন সাধনার প্রেরণা যদি জাগে…" এবং "যদি কোনো কৃতী "নূতন পথ খুলতে বেরোন, আমি অনভিজ্ঞ, তাঁর সিদ্ধি কামনা করব, দেখব তাঁর কামনার অভিব্যক্তি—কিন্তু দূরের থেকে।"

কবি সুভাষচন্দ্রকে এই কর্মবীর রূপে ভাবিতেছেন। তিনি লিখিলেন, "আজ আমি জানি, বাংলাদেশের জননায়কের প্রধান পদ সুভাষচন্দ্রের। সমস্ত ভারতবর্ষে তিনি যে আসন গ্রহণের সাধনা ক'রে আসছেন সে পলিটিক্সের আসরে।…আজকেকার এই গোলমালের মধ্যে আমার মন আঁকড়ে ধ'রে আছে বাংলাকে। যে বাংলাকে আমরা বড়ো করব সেই বাংলাকেই বড়ো ক'রে লাভ করবে সমস্ত ভারতবর্ষ। তার অন্তরের ও বাহিরের সমস্ত দীনতা দূর করবার সাধনা গ্রহণ করবেন এই আশা করে আমি সুদৃঢ়সংকল্প সুভাষকে অভ্যর্থনা করি এবং এই অধ্যবসায়ে তিনি সহায়তা প্রত্যাশা করতে পারবেন আমার কাছ থেকে, আমার যে বিশেষ শক্তি তাই দিয়ে। বাংলাদেশের সার্থকতা বহন করে বাঙালি প্রবেশ করতে পারবে সসম্মানে ভারতবর্ষের মহাজাতীর রাষ্ট্রসভায়। সেই সার্থকতা সম্পূর্ণ হোক সুভাষচন্দ্রের তপস্যায়।"[১]

দেশের সমস্যা সম্বন্ধেও যেমন মন উদ্বিগ্ন, চীনের সংবাদেও মন তেমনি ক্ষুব্ধ। মংপুতে একদিন বলিতেছেন, "চীনদেশের কাহিনী আর শুনতে পারিনে। ইচ্ছে করে না খবরের কাগজ খুলি, ইচ্ছে করে না রেডিয়োর খবর শুনি। কিন্তু না শুনেও তো পারিনে। চোখ বুজে তো বেদনার অন্ত করা যায় না। এ অত্যাচারের ইতিহাস অসহ্য হয়ে উঠল।…বাঁচতে ইচ্ছে করে না আর। এ পৃথিবী বাসের অযোগ্য হয়ে উঠেছে।…এ নৃশংসতা আর কত দেখব।"[২]

কিন্তু রাজনীতি সম্বন্ধে আপসোস ও আশা পোষণ করাই তো রবীন্দ্রনাথের সমগ্র চিত্তের রূপ নহে। সাময়িক-ভাবে সমসাময়িক রাজনীতির বেদনাদায়ক সংবাদাদি তাঁহার স্পর্শচেতন চিত্তকে বেদনায় কাতর করে—তাহা প্রকাশ করেন পত্রে প্রবন্ধে কবিতায়; তারপর মন চলে নিজের পথে—লিখিতেছেন আর্ট সম্বন্ধে প্রবন্ধ (১৯৩৯ মে ২৫)। অর্ধেন্দুশেখর গাঙ্গুলি রচিত 'রূপশিল্প'[৩] নামে গ্রন্থখানি পড়িয়া মনের মধ্যে যে ভাবনাগুলির উদয় হয়, তাহাই প্রকাশ পায় ঐ প্রবন্ধে। পূর্বেই বলিয়াছি কবিতা আছে সবার মাঝে মাঝে। এই প্রবন্ধে কবি কেবল চিত্রাদি চাক্ষুষ কলার আলোচনা করেন নাই, সংগীতাদি শ্রাবণ কলারও সূক্ষ্ম আলোচনা উত্থাপন করিয়াছেন।

রবীন্দ্র-রচনাবলী

মংপু হইতে কবি শান্তিনিকেতনে ফিরিলেন (১৯৩৯) জুন ১৯। গ্রীষ্মাবকাশের পর বিদ্যালয় এখনো খোলে নাই। কয়েকদিনের জন্য শ্রীনিকেতনের ত্রিতলে বাস করিবার জন্য গেলেন (২৫ জুন)। শ্রীনিকেতনে থাকেন সপ্তাহ তিন। ১৭ জুলাই (১৩৪৪ শ্রাবণ ১) শান্তিনিকেতনে ফিরিয়া আসেন।

আমাদের এই আলোচ্যপর্বে রবীন্দ্রনাথের রচনাবলী প্রকাশনের ব্যবস্থা চলিতেছে। প্রকাশন বিভাগের অধ্যক্ষ চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য ও বিশ্বভারতীর সহকারী কর্মসচিব কিশোরীমোহন সাঁতরা এ বিষয়ে অগ্রণী হন। পাঠকের স্মরণ আছে রবীন্দ্রনাথের সমগ্র রচনা বহুকাল গ্রন্থাবলীরূপে প্রকাশিত হয় নাই, তাঁহার কাব্যগ্রন্থের শেষ প্রকাশ হয় ১৯১৫-

১ কনগ্রেস, মংপু, ২০মে ১৯৩৯; দ্র কালান্তর ২য় সং পৃ ৩৬৩-৭৫।
২ মংপুতে রবীন্দ্রনাথ পৃ ৫৪।
৩ প্রবাসী ১৩৪৬ আষাঢ় পৃ ৩৮৭-৯০।

১৬ সালে, গদ্যগ্রন্থাবলী প্রকাশিত হয় ১৯০৭-০৯ সালে। তাহার পর ১৯২২ সালে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার তৎকাল পর্যন্ত প্রকাশিত গ্রন্থাদি বিশ্বভারতীকে দান করিয়াছেন। এতকাল পরে বিশ্বভারতী প্রকাশন বিভাগ কবির সমুদয় রচনা মুদ্রণের ব্যবস্থা করিলেন।[১]

শ্রীনিকেতনে বাসকালে কবি এই 'রচনাবলী'র জন্য তাঁহার ভূমিকা লিখিয়া দিলেন (১৯৩৯ জুন ৩০)। কবির মহা সংকোচ তাঁহার পুরাতন রচনা সম্বন্ধে, ঘোর আপত্তি সে-সবের পুনঃপ্রকাশের। কিন্তু তাঁহার আপত্তিতে কেহই সায় দেন নাই। কবি এই ভূমিকায় লিখিতেছেন, "আমার আশি বছর বয়সের সাহিত্যিক প্রয়াসকে সম্পূর্ণ আকারে পুঞ্জিত করবার এই যে চেষ্টা আজ দেখছি, এর মধ্যে নিশ্চিত অনুমান করছি অনেক গাঁথুনি আছে, যার উপরে আগামী কালের বিস্মরণের দুত প্রত্যহ অদৃশ্য কালিতে লুপ্তির চিহ্ন অঙ্কিত করে চলেছে। এ সম্বন্ধে আমার কোনো মোহ নেই, এবং ক্ষোভ করাও বৃথা বলে মনে করি।...

"কালের পরিবর্তিত গতির সঙ্গে অনেক জীব তাল রেখে চলতে পারে নি, প্রাণরঙ্গশালা থেকে সেই বেতালাদের সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু সবাই তো সরেনি। অনেক আছে কালের সঙ্গে তাদের মিল ভাঙেনি। আজ নূতনও তাদের দাবি করে, পুরাতনও তাদের ত্যাগ করে নি। কি শিল্পকলায়, কি সাহিত্যে যদি তার যথেষ্ট প্রমাণ না থাকত তা হলে বলতে হত সৃষ্টিকর্তা মানুষের মন আপন পিছনের রাস্তা ক্রমাগত পুড়িয়ে ফেলতে ফেলতেই চলেছে। কথাটা তো সত্য নয়। মানুষ সামনের দিকে যেমন অগ্রসরণ করে তেমনি অনুসরণ করে পিছনের, নইলে তার চলাই হয় না। পিছনহারা সাহিত্য বলে যদি কিছু থাকে সে কবন্ধ, সে অস্বাভাবিক।"

এই প্রসঙ্গে কবি যে পত্র চারুচন্দ্র ভট্টাচার্যকে দেন তাহা তিনি নিবেদনে উদ্ধৃত করিয়াছেন। কবি লিখিয়াছিলেন, "ভূরিপরিমাণ যেসকল লেখাকে আমি ত্যাজ্য বলে গণ্য করি আপনাদের সম্মিলিত নির্বন্ধে সেগুলিকেও স্বীকার করে নিতে হবে। আমার লজ্জা চিরন্তন হয়ে যাবে এবং তাতে আমার নাম-স্বাক্ষর থাকবে। অর্থাৎ ভাবীকালের সামনে যখন দাঁড়াব তখন গাধার টুপিটা খুলতে পারব না। আপনারা তর্ক করে থাকেন ইতিহাসের আবর্জনা দিয়ে যে গাধার টুপিটা বানানো হয় ইতিহাসের খাতিরে সেটা মহাকালের আসরে পরে আসতেই হবে। কবির তাতে মাথা হেঁট হয়ে যায়। ইতিহাসও বহু অবাস্তবকে বর্জন করতে করতে তবে সত্য ইতিহাস হয়। মানুষের অতিবৃদ্ধপ্রপিতামহের দেহে যে একটা লম্বমান প্রত্যঙ্গ ছিল সেটা সর্বদা পশ্চাতে যোজনা করে বেড়ালে মানুষের ইতিহাস উজ্জ্বল হয় না, একথা মানব-সন্তান মাত্রেই স্বীকার করে থাকে।" অবশেষে একটা আপস-নিষ্পত্তি হইল যে কবির বর্জিত রচনাসমূহ পরিশিষ্ট খণ্ডে স্থান পাইবে।

শ্রীনিকেতনে কবি যে তিন সপ্তাহ বাস করেন, সেটা প্রায় নির্জনবাসের তুল্য; বাহিরের লোকজন অতিথি-অভ্যাগতের ভিড় এখানে কম। কিন্তু পত্রাদির আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করা কোথায়ও সম্ভব নহে। একখানি পত্র ও তাহার ইতিহাস এখানে লিপিবদ্ধ করিতেছি। শরৎচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে অনেক অলীক কথা মুখে মুখে সাহিত্যিক ও অসাহিত্যিক সমাজে চালু ছিল বরাবরই। নরেন্দ্র দেব 'সাহিত্যাচার্য্য শরৎচন্দ্র' নামক গ্রন্থের ২য় সংস্করণে (পৃ ৭৯, ৮০) প্রবাসীর সম্পাদক, রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে কতকগুলি সংবাদ সরবরাহ করেন। এতদ্‌সম্পর্কে শ্রীনিকেতনে থাকিতে কবি রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের নিকট হইতে এক পত্র পান। তদুত্তরে তিনি (৯ জুলাই ১৯৩৯) লিখিতেছেন, "গল্প প্রকাশ করা নিয়ে শরৎচন্দ্রের সঙ্গে প্রবাসীর দ্বন্দ্ব ঘটেছিল সেই জনশ্রুতির উল্লেখ এই প্রথম

১ রবীন্দ্র-রচনাবলী প্রথম খণ্ড, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, প্রায় ২৫ খণ্ডে সমাপ্য...দ্র কবিতা ১৩৪৬ পৌষ পৃ ৪৯-৫৬, বুদ্ধদেব বসু লিখিত সমালোচনা।

আপনার পত্রে জানতে পারলুম। ব্যাপারটা যে সময়কার তখন শরতের সঙ্গে আমার আলাপ ছিল না। অনেক অমূলক খবরের মূল উৎপত্তি আমাকে নিয়ে, এও তার মধ্যে একটি। এই জন্যে মরতে আমার সংকোচ হয়। তখন বাঁধভাঙা বন্যার মতো ঘোলা গুজবের স্রোত প্রবেশ করবে আমার জীবনীতে—আটকাবে কে ?"[১]

শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের প্রায় সমসাময়িক আর-একটি পত্র পাই। ১৩৪৭ চৈত্র ২ 'যুগান্তরে' প্রবোধচন্দ্র সান্যালকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের একটি পত্র প্রকাশিত হয়। পত্রখানির শেষ অনুচ্ছেদে আছে, "কোনো কোনো মানুষ আছে প্রত্যক্ষ পরিচয়ের চেয়ে পরোক্ষ পরিচয়েই যারা বেশি সুগম। শুনেছি শরৎ সে জাতের লোক ছিলেন না। তাঁর কাছে গেলে তাঁকে কাছে পাওয়া যেত। তাই আমার ক্ষতি রয়ে গেল। তবু তাঁর সঙ্গে আমার দেখাশোনা কথাবার্তা হয় নি যে তা নয়, কিন্তু পরিচয় ঘটতে পারলে না। শুধু দেখাশোনা নয়, যদি চেনা-শোনা হোত তবে ভালো হোত। সমসাময়িকতার সুযোগটা সার্থক হোত। হয় নি, কিন্তু সেই সময়টাতেই বিস্মিত আনন্দে দূরের থেকে আমি পড়ে নিয়েছি তাঁর বিন্দুর ছেলে, বিরাজবৌ, রামের সুমতি, বড়োদিদি। মনে হয়েছে কাছের মানুষ পাওয়া গেল। মানুষকে ভালোবাসার পক্ষে এই যথেষ্ট।"[২]

শ্রীনিকেতনে থাকিবার সময় একদিন (১৯৩৯ জুলাই ১৪) কবি তথাকার সর্বশ্রেণীর কর্মীদের সহিত মিলিত হন ও তাহাদের নিকট শ্রীনিকেতনের আদর্শ ও কিভাবে এখানে কর্মে প্রবৃত্ত হন তাহার ইতিহাস অত্যন্ত সরলভাবে বলেন। এই ভাষণের মধ্যে জমিদারিতে তাঁহার জীবনের প্রথম অভিজ্ঞতার কথা বলেন,—[৩] "তখন আমি যে জমিদারি ব্যবসায় করি, নিজের আয়-ব্যয় নিয়ে ব্যস্ত, কেবল বণিক্-বৃত্তি ক'রে দিন কাটাই, এটা নিতান্তই লজ্জার বিষয় মনে হয়েছিল।" এই ভাষণের মধ্যে পুরাতন কথা সবই তবুও সেদিন যাহাদের জন্য বলিয়াছিলেন, তাহাদের উপযুক্ত হইয়াছিল।

গত কয়েক বৎসরের মধ্যে শ্রীনিকেতনের কর্মব্যবস্থায় কিছু পরিবর্তন হইয়াছে; সুকুমার চট্টোপাধ্যায় আসিয়াছেন; তাঁহার চেষ্টায় 'দেশবিদেশে' নামে একখানি পত্রিকা প্রকাশিত হইতেছে। ধীরেন্দ্রমোহন সেন এখন শ্রীনিকেতনের শিক্ষাবিভাগের অধিকর্তা। ১৯৩৭ জানুয়ারি মাসে বোলপুর হইতে গুরুট্রেনিং বিদ্যালয়[৪] শ্রীনিকেতনে উঠিয়া আসে। বঙ্গীয় গবর্মেণ্ট ইহার ব্যয়ভার বহন করেন; বিশ্বভারতীর উপর বিদ্যালয় পরিচালনার ভার অর্পণ তাঁহারা করেন। কবি প্রতিষ্ঠানের নাম দেন 'শিক্ষাচর্চা'। ধীরেন্দ্রমোহন এখন শিক্ষাসত্র ও শিক্ষাচর্চার ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ (১৯৩৮ জুলাই)। শান্তিনিকেতনে শিক্ষা-পাঠভবনের অধ্যক্ষতা করিতেছিলেন প্রমদারঞ্জন ঘোষ। তিনি ১৯৩৭ সেপ্টেম্বর হইতে ১৯৩৯ জুলাই পর্যন্ত এই কার্য করেন। এই ১৯৩৯ এর জুলাই হইতে শিক্ষা ও পাঠভবন পুনরায় পৃথক্ করিয়া দেওয়া হইল। শিক্ষাভবন বা কলেজ বিভাগের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হইলেন অনিলকুমার চন্দ[৫]; তিনি এতদিন ইতিহাস ও রাষ্ট্রনীতির অধ্যাপক ছিলেন এবং কবির সেক্রেটারির কাজ করিতেন।

১ প্রবাসী ১৩৪৬ শ্রাবণ পৃ ৫৭১-৭২।

২ প্রবাসী ১৩৪৬ জ্যৈষ্ঠ পৃ ২৮২ বিবিধ প্রসঙ্গ, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের উপন্যাসাদির সমালোচনা।

৩ V. B. News 1939 p 16-18. সুকুমার চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক অনুলিখিত ও বক্তা কর্তৃক সংশোধিত, প্রবাসী ১৩৪৬ ভাদ্র পৃ ৬৬১-৬৩, শ্রীনিকেতনের ইতিহাস ও আদর্শ।

৪ বোলপুর গুরুট্রেনিং বিদ্যালয় যেখানে ছিল সেখানে এখন বোলপুর বালিকা বিদ্যালয়।

৫ অনিলকুমার চন্দ ১৯৩৯ জুলাই হইতে ১৯৫২ জুলাই পর্যন্ত শিক্ষাভবনের অধ্যক্ষ ছিলেন। ভারতের পার্লামেণ্টে বা লোকসভায় তিনি সদস্য নির্বাচিত ও পরে পররাষ্ট্র দপ্তরের উপ-মন্ত্রী নিযুক্ত হইলে তিনি বিশ্বভারতীর কার্য ছাড়িয়া দেন। বিশ্বভারতী বিশেষ প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে সম্মানার্হ অধ্যাপকের পদ দান করিয়াছেন।

পহেলা শ্রাবণ (১৯৩৯ জুলাই ১৭) কবি শান্তিনিকেতনে ফিরিয়া আসিলেন—বিদ্যালয় খুলিয়া গিয়াছে। নূতন সাহিত্যসৃষ্টির প্রেরণা ক্ষীণ ; তবে অন্যকে উদ্‌বোধিত করিতেছেন লিখিবার জন্য। এই অভ্যাস কবির আযৌবনের ; বলেন্দ্রনাথ তাঁহার হাতে গড়া। কত নগণ্যের রচনা শুদ্ধ করিয়া দিয়াছেন তাহার হিসাব নাই। সামান্য লেখক-লেখিকাকে লিখিবার জন্য কী উৎসাহ দিয়াছেন, তাহা সাক্ষ্য দিবার লোক এখনো আছেন।

আমাদের আলোচ্য পর্বে কবি প্রমথ চৌধুরীর 'প্রাচীন হিন্দুস্থান'[১] ও ইন্দিরা দেবীকৃত ভারতবর্ষ সম্বন্ধে রেনে গ্রুসের ফরাসীগ্রন্থের তর্জমা প্রকাশনের ব্যবস্থা করিতেছেন। প্রমথ চৌধুরী 'ইতিহাসে ভূগোলে মিলিয়ে' 'প্রাচীন হিন্দুস্থান' নামে 'বই লেখবার সংকল্প' গ্রহণ করেন, সেটা কবির ভালোই লাগে।[২] কবির ভরসা ছিল কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বইখানির প্রকাশনভার গ্রহণ করিবেন ; কিন্তু তাঁহাদের পছন্দ না হওয়ায়, বিশ্বভারতী হইতেই উহা প্রকাশনের ব্যবস্থা করা হইল। কবি প্রমথ চৌধুরীকে লিখিতেছেন, "ওর মধ্যে আমার হাত চালিয়েছি অনেকখানি ; তার কারণ, ওটাকে আমাদের লোকশিক্ষা সংসদের আদর্শে তৈরি করতে হোলো। ভয় আছে পাছে জিনিসটাকে না চিনতে পেরে উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠ। যাই হোক, আটআনা সংস্করণের মাপে বেরবে।"[৩]

রেনে গ্রুসে বিখ্যাত ফরাসী ঐতিহাসিক ; প্রাচ্যদেশ সম্বন্ধে তাঁহার গ্রন্থ প্রামাণ্য বলিয়া সমাদৃত। তাঁহার ফরাসী গ্রন্থ I' histoire de Extreme-orient এর ভারতবর্ষ অংশ অনুবাদ করেন ইন্দিরা দেবী। কবি তাহা আনাইয়া শান্তিনিকেতনে অনুলিপি করান, ভাষার প্রয়োজনমত সংস্কার করেন এবং 'পরিচয়' পত্রিকায় পাঠাইয়া দেন (১৯৩৯ অগস্ট ৪)।[৪]

সেইদিন শান্তিনিকেতনে আসিলেন আওয়াগড়ের মহারাজা সূর্যপাল সিংহ ; তিনি এবার পক্ষকাল আশ্রমে কবির অতিথিরূপে থাকেন। তিনি বিশ্বভারতীর জন্য বহু টাকা দান করিয়াছেন, তাহার সঙ্গে দিয়াছিলেন কবির প্রতি অকৃত্রিম অনুরাগ। এইবার আসিয়া তিনি বিশ্বভারতীর জন্য ১, ২৭, ৫০১ টাকা দান করিলেন ; ইহার পূর্বে ও পরে তিনি যে টাকা দান করিয়াছেন, তাহার তালিকা আমরা নিম্নে দিলাম।[৫]

আওয়াগড়ের মহারাজা থাকিতে থাকিতে বৃক্ষরোপণ উৎসব সম্পন্ন হয়। এবার উৎসব হয় চীনভবনের দক্ষিণ প্রাঙ্গণে। হাঙ্গেরিয়ান শিল্পী মিসেস ব্রুনার (Brunner) বুদ্ধগয়া হইতে বোধিদ্রুমের একটি চারা আনিয়াছিলেন, এইবার সেইটি রোপিত হয়।[৬]

১ প্রাচীন হিন্দুস্থান সমালোচনা, শৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা, প্রবাসী ১৩৩৬ ফাল্গুন পৃ ৬৩১।

২ চিঠিপত্র ৫ম পত্র ১২৫, ২০ নভেম্বর ১৯৩৮ পৃ ৩০৭ ; পত্র ১২৯, ২৪ জুলাই ১৯৩৯ (৮ শ্রাবণ ১৩৪৬) পৃ ৩১০। পুনশ্চ পত্র ১৩২, ১০ জানুয়ারি ১৯৪০।

৩ চিঠিপত্র ৫ম পত্র ১২১, ২৪ জুলাই ১৯৩৯ পৃ ৩১০।

৪ পরিচয়-এর প্রবন্ধের নিম্নে লেখা ছিল—"শ্রীযুক্তা ইন্দিরা দেবী কর্তৃক লিখিত ও শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক সম্পাদিত রেণে গ্রুসের 'ভারতবর্ষ' সম্পূর্ণ আকারে বিশ্বভারতীর লোকশিক্ষা সংসদ প্রকাশ করিবেন।" দুঃখের বিষয় সে-গ্রন্থ প্রকাশিত হয় নাই।

পরিচয় ৯ম বর্ষ ১ম খণ্ড ১৩৪৬ ভাদ্র পৃ ১৭১-৮২, আশ্বিন পৃ ২৬২-৭৬, কার্তিক পৃ ৩৫৯-৬৭, অগ্রহায়ণ ৪১৭-২৫, পৌষ ৫৫৪-৬১, ৯ম বর্ষ ২য় খণ্ড ১৩৪৭ বৈশাখ পৃ ৩২০-৩০, ১৩৪৭ জ্যৈষ্ঠ পৃ ৪১৪-২৭।

৫ According to the desire of the Founder-President the Samsad earmarked out of the fund Rs 60,000/ for endowment of Sangit-Bhavana and Library fund and Rs 67, 501 for capital expenditure at Santiniketan." Annual Report Visva-Bharati 1939 p 1.

৬ V. B. News 1939 Sep. p 22.

আমরা পূর্বে বলিয়াছি এ সময়ে কবির রচনা খুব কমই চোখে পড়ে। তবে এই সময়ের রচিত একটি মাত্র কবিতার উল্লেখ আমরা করিব; কবিতাটির নাম 'রাত্রি'।[১] মংপু হইতে অমিয় চক্রবর্তীকে কবি যে এক পত্র লেখেন (১৬ জুন) তাহার শেষাংশের সহিত এই কবিতাটি পঠনীয়। বার্ধক্যে মৃত্যু সম্বন্ধে ভাবনা খুবই স্বাভাবিক; তাহার ছায়া ঘনাইয়া আসিলে মন যখন শাশ্বত সত্যের প্রতি সন্দিগ্ধ হয়, তখন সেই বিহ্বলতা দূর করিবার জন্য আপনার ঊর্ধ্বে আপনি উঠিবার জন্য, আপনার জরা পীড়াজনিত স্বাভাবিক দুর্বলতাকে অস্বীকার করিবার জন্য যেন এই ঘোষণা।

নিজেরে ধিক্কার দিয়ে মন ব'লে ওঠে,
নহি নহি আমি নহি অপূর্ণ সৃষ্টির
সমুদ্রের পঙ্কলোকে অন্ধতলচর
অর্ধস্ফুট শক্তি যার বিহ্বলতা-বিলাসী মাতাল
তরলে নিমগ্ন অনুক্ষণ।
আমি কর্তা, আমি মুক্ত, দিবসের আলোকে দীক্ষিত,
কঠিন মাটির 'পরে
প্রতি পদক্ষেপ যার
আপনারে জয় করে-চলা।

আমাদের এই আলোচ্য পর্বে রবীন্দ্রনাথ 'ডাকঘর' নাটকের জন্য নূতন কতকগুলি গান লেখেন, সংলাপে কিছু নূতন পাঠ সংযোগ এবং কিছু পাঠ পরিবর্তন করেন। জুলাইমাসে শ্রীনিকেতন হইতে ফিরিয়া শান্তিনিকেতনের ছাত্রদের লইয়া মহড়াও আরম্ভ করেন[২]; তিন চার মাস ধরিয়া রিহর্শাল চলে; কিন্তু শেষ পর্যন্ত অভিনয় হয় নাই। কবির ভগ্নস্বাস্থ্যের উপর অধিক পীড়নের শঙ্কায় শেষপর্যন্ত তাঁহাকে প্রতিনিবৃত্ত করা হয়।

ডাকঘরের জন্য নূতন এই কয়টি গান এই সময়ে লিখিত: ১। আমার দূর আকাশের নেশায় মাতাল ঘরভোলা সব যত ২। বাহির হলেম আমি আপন ভিতর হতে, ৩। শুনি ওই রুনুঝুনু পায়ে পায়ে নূপুরধ্বনি ৪। এই তো ভরা হল ফুলে ফুলে ফুলের ডালা ৫। সুরের জালে কে জড়ালে আমার মন ৬। কোথাও আমার হারিয়ে যাওয়ার নেই মানা ৭। সমুখে শান্তিপারাবার। শান্তিদেব লিখিতেছেন,এই মহড়ার পর্বে কবি "একদিন বলেছিলেন যে, তাঁর মৃত্যুর ত আর বেশি দেরি নেই, এটি যদিও অমলের মৃত্যুর গান কিন্তু এ গানটি তাঁরও মৃত্যুতে আমরা কাজে লাগাতে পারব।"[৩] আমাদের মনে হয় এ কথা কবি রহস্য করিয়াই বলিয়াছিলেন। এ সময়ের কবিকে যাঁহারা জানেন তাঁহারা স্বীকার করিবেন যে, তিনি এই প্রকার স্থূলতার পক্ষপাতী হইতে পারেন না।[৪] শান্তিদেব বলেন যে, তিনি জাভা হইতে ফিরিয়া অর্থাৎ পূজাবকাশের পর এই গানটি শুনিতে পান ও শেখেন।[৫]

১ ১৯৩৯ জুলাই ২৬। নবজাতকের এই কবিতাটির প্রসঙ্গে কবির শান্তিনিকেতনের শেষ দিনের একটি ঘটনা তুলনীয়। দ্র কবিকথা পৃ ৫২-৫৩।

২ "Gurudeva...returned to Santiniketan on July 17 [1939]. He is at present engaged in directing the rehersals of Dakghar which is expected to be produced sometime during this term" V. B. News. Vol VIII 1939 August p 19.

৩ রবীন্দ্রসংগীত পৃ ২২৩। দ্র 'শেষলেখা'র ভূমিকা।

৪ "রচনাকালীন সময়ের সঙ্গে প্রয়োজনের সঙ্গে সেই-সব লেখার যোগ বিচ্ছিন্ন করে দেখলে তার সম্পূর্ণ তাৎপর্য গ্রহণ করা সম্ভবপর হয় না। যে মানুষ সুদীর্ঘকাল থেকে চিন্তা করতে করতে লিখেছে তার রচনার ধারাকে ঐতিহাসিকভাবে দেখাই সংগত।" রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্রিক মত, কালান্তর, রবীন্দ্ররচনাবলী ২৪, পৃ ৪২৭।

৫ ৬ নং গানটি সানাই-এ আছে, তারিখ ১০ জানু ১৯৪০ (রচনাবলী ২৪); ৭ নং শেষলেখার অন্তর্গত, তারিখ ৩ ডিসেম্বর ১৯৩৯। তারিখগুলি বসানোর মধ্যে কোথাও একটা গোল আছে, অথবা সংবাদের মধ্যে ভুল আছে।

মহাজাতি সদন

কবি শান্তিনিকেতনে আছেন। সুভাষচন্দ্রের নিকট হইতে কবির কাছে অনুরোধ আসিল, তাঁহার পরিকল্পিত মহাজাতি সদনের ভিত্তিপ্রস্তর কবিকে স্থাপন করিতে হইবে। 'মহাজাতি সদন' কী সে বিষয়টি সম্বন্ধে কিছু বলা দরকার।

সুভাষচন্দ্র কন্‌গ্রেস-প্রেসিডেণ্ট হইয়া কলিকাতায় একটি স্থায়ী কন্‌গ্রেসভবনের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন; তখনো এলাহাবাদের 'আনন্দভবন' কন্‌গ্রেসের জন্য পাওয়া যায় নাই। সুতরাং এই পরিকল্পনার মধ্যে বৈশিষ্ট্য ছিল। এই গৃহনির্মাণের জন্য 'সুভাষ কন্‌গ্রেস ফাণ্ড' নামে একটি তহবিল খোলা হইয়াছিল ১৯৩৭ সালের ১৭ এপ্রিল। রবীন্দ্রনাথ এই সংবাদ পাইয়া (২৭ মে) সুভাষচন্দ্রকে এক পত্রে লিখিয়া পাঠান, "তোমাদের সংকল্পিত কন্‌গ্রেস-ভবনের পরিকল্পনাটি যথোচিত হয়েছে বলে মনে করি। এই ভবনের প্রয়োজনীয়তা বিচিত্র এবং ব্যাপক। সর্বজনের আনুকূল্যে এর প্রতিষ্ঠা উপযুক্তরূপে সম্পন্ন হবে আশা করে আগ্রহান্বিত হয়ে আছি। এই গৃহের সম্পূর্ণতার মধ্যে আমাদের সৌভাগ্যের এবং গৌরবের রূপ দেখতে পাব।"

পাঠকের স্মরণ আছে প্রায় বাইশ বৎসর পূর্বে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় ফেডারেশন হলের ভিত্তি স্থাপন হয়। সেদিনের সভায় রবীন্দ্রনাথ উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু তাহার উপর ইমারত আর উঠে নাই। সেখানে এখন ব্রাহ্মবালিকা বিদ্যালয় ও কর্পোরেশনের পার্ক। এবারকার কন্‌গ্রেসভবন নির্মাণের জন্য কলিকাতা কর্পোরেশন সেণ্ট্রাল (চিত্তরঞ্জন) এভিন্যুর উপর একখণ্ড জমি দান করেন (১৯৩৮ অগস্ট ২৪)।[১]

এই ঘটনার অনতিকাল মধ্যে সুভাষচন্দ্রের সহিত কন্‌গ্রেসের বিরোধের সূত্রপাত হয়। কলিকাতায় নিখিলভারত কন্‌গ্রেস কমিটির সভায় সুভাষ প্রেসিডেণ্ট-পদ ত্যাগ করিলেন (১৯৩৯ এপ্রিল)। এই ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় বাংলাদেশের এক শ্রেণীর লোকের মধ্যে কন্‌গ্রেসবিরোধী মনোভাবের উদয় হয়। রবীন্দ্রনাথ দূর হইতে দেশের সমস্ত সংবাদ রাখিতেন।

রবীন্দ্রনাথ মনে করিতেছেন দেশের মধ্যে প্রবীণ ও নবীনের দ্বন্দ্বের সময় সুভাষচন্দ্রই দেশনায়কত্ব করিবার উপযুক্ত ব্যক্তি। সুভাষচন্দ্রের রাষ্ট্রপতিপদ ত্যাগের পরই (১৯৩৯ মে) কবি 'দেশনায়ক' নামে এক দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখিয়া সুভাষচন্দ্রকে অভিনন্দিত করিতে চাহিলেন।[২] এই অকথিত ভাষণে কবি যাহা সুভাষচন্দ্রের ও দেশবাসীর উদ্দেশ্যে বলিয়াছিলেন তাহা হইতে কয়েকটি অনুচ্ছেদ নিম্নে উদ্ধৃত হইল :

"বাঙালী কবি আমি, বাংলাদেশের হয়ে তোমাকে দেশনায়কের পদে বরণ করি। গীতায় বলেন, সুকৃতের রক্ষাকর্তা বারংবার আবির্ভূত হন। দুর্গতির জালে রাষ্ট্র যখন জড়িত হয়, তখনই পীড়িত দেশের অন্তর্বেদনার প্রেরণায় আবির্ভূত হয় দেশের অধিনায়ক। রাজশাসনের দ্বারা নিষ্পিষ্ট, আত্মবিরোধের দ্বারা বিক্ষিপ্তশক্তি বাংলাদেশের অদৃষ্টাকাশে দুর্যোগ আজ ঘনীভূত। নিজের মধ্যে দেখা দিয়েছে দুর্বলতা, বাইরে একত্র হয়েছে বিরুদ্ধ শক্তি। আমাদের অর্থনীতিতে কর্মনীতিতে শ্রেয়োনীতিতে প্রকাশ পেয়েছে নানা ছিদ্র, আমাদের রাষ্ট্রনীতিতে হালে দাঁড়ে তালের মিল নেই।...

এই রকম দুঃসময়ে একান্তই চাই এমন আত্মপ্রতিষ্ঠ শক্তিমান পুরুষের দক্ষিণ হস্ত, যিনি জয়যাত্রার পথে প্রতিকূল ভাগ্যকে তেজের সঙ্গে উপেক্ষা করতে পারেন।...

১ মহাজাতি সদন, ১৯৭০ জানুয়ারি ২৩, নেতাজী সুভাষচন্দ্রের চতুর্সপ্ততিতম জন্মদিনে পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রচারবিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত।

২ সুভাষচন্দ্র সম্পর্কে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের লেখা এই অপ্রকাশিত ভাষণ ১৯৩৯ সালের মে মাসে লিখিত ও মুদ্রিত হয়, কিন্তু তখন উহা প্রচার করা হয় নাই। আনন্দবাজার পত্রিকা। দ্র সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় কৃত সুভাষচন্দ্র, পরিশিষ্ট।

বহু অভিজ্ঞতাকে আত্মসাৎ করেছে তোমার জীবন, কর্তব্যক্ষেত্রে দেখলুম তোমার যে পরিণতি তা থেকে পেয়েছি তোমার প্রবল জীবনীশক্তির প্রমাণ। এই শক্তির কঠিন পরীক্ষা হয়েছে কারাদুঃখে,[১] নির্বাসনে, দুঃসাধ্য রোগের আক্রমণে; কিছুতে তোমাকে অভিভূত করে নি; তোমার চিত্তকে করেছে প্রসারিত, তোমার দৃষ্টিকে নিয়ে গেছে দেশের সীমা অতিক্রম করে ইতিহাসের দূরবিস্তৃত ক্ষেত্রে। দুঃখকে তুমি করে তুলেছ সুযোগ, বিঘ্নকে করেছ সোপান। সে সম্ভব হয়েছে, যেহেতু কোনো পরাভবকে তুমি একান্ত সত্য ব'লে মানোনি। তোমার এই চারিত্র শক্তিকেই বাংলা দেশের অন্তরের মধ্যে সঞ্চারিত ক'রে দেবার প্রয়োজন সকলের চেয়ে গুরুতর।

"বাংলাদেশের ইচ্ছার মূর্তি একদিন প্রত্যক্ষ করেছি বঙ্গভঙ্গরোধের আন্দোলনে। বঙ্গকলেবর দ্বিখণ্ডিত করবার জন্যে সমুদ্যত খড়্গকে প্রতিহত করেছিল এই ইচ্ছা। যে বহুবলশালী শক্তির প্রতিপক্ষে বাঙালী সেদিন ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল সেই রাজশক্তির অভিপ্রায়কে বিপর্যস্ত করা সম্ভব কি না এ নিয়ে সেদিন সে বিজ্ঞের মতো তর্ক করেনি, বিচার করেনি, কেবল সে সমস্ত মন দিয়ে ইচ্ছা করেছিল।

"তার পরবর্তী কালের প্রজন্মে (generation) ইচ্ছার অগ্নিগর্ভরূপ দেখেছি বাংলার তরুণদের চিত্তে। দেশে তারা দীপ জ্বালাবার জন্যে আলো নিয়েই জন্মেছিল, ভুল ক'রে আগুন লাগাল, দগ্ধ করল নিজেদের, পথকে ক'রে দিল বিপথ। কিন্তু সেই দারুণ ভুলের সাংঘাতিক ব্যর্থতার মধ্যে বীর হৃদয়ের যে মহিমা ব্যক্ত হয়েছিল সেদিন ভারতবর্ষের আর কোথাও তো তা দেখি নি। তাদের সেই ত্যাগের পর ত্যাগ, সেই দুঃখের পর দুঃখ, সেই তাদের প্রাণ নিবেদন, আশু নিষ্ফলতায় ভস্মসাৎ হয়েছে কিন্তু তারা তো নির্ভীক মনে চিরদিনের মতো প্রমাণ ক'রে গেছে বাংলার দুর্জয় ইচ্ছাশক্তিকে। ইতিহাসের এই অধ্যায়ে অসহিষ্ণু তারুণ্যের যে হৃদয়-বিদারক প্রমাদ দেখা দিয়েছিল তার উপরে আইনের লাঞ্ছনা যত মসী লেপন করুক তবু কি কালো করতে পেরেছে তার অন্তর্নিহিত তেজস্ক্রিয়তাকে।

"আমরা দেশের দৌর্বল্যের লক্ষণ অনেক দেখেছি, কিন্তু যেখানে পেয়েছি তার প্রবলতার পরিচয় সেইখানেই আমাদের আশা প্রচ্ছন্ন ভূগর্ভে ভবিষ্যতের প্রতীক্ষা করছে। সেই প্রত্যাশাকে সম্পূর্ণ প্রাণবান ও ফলবান করবার ভার নিতে হবে তোমাকে; বাঙালীর স্বভাবে যা কিছু শ্রেষ্ঠ, তার সরসতা, তার কল্পনাবৃত্তি, তার নতুনকে চিনে নেবার উজ্জ্বল দৃষ্টি, রূপসৃষ্টির নৈপুণ্য, অপরিচিত সংস্কৃতির দানকে গ্রহণ করবার সহজ শক্তি, এই সকল ক্ষমতাকে ভাবের পথ থেকে কাজের পথে প্রবৃত্ত করতে হবে। দেশের পুরাতন জীর্ণতাকে দূর ক'রে তামসিকতার আবরণ থেকে মুক্ত ক'রে নব বসন্তে তার নতুন প্রাণকে কিশলয়িত করবার সৃষ্টিকর্তৃত্ব গ্রহণ করো তুমি।

"বলতে পারো, এত বড়ো কাজ কোনো একজনের পক্ষে সম্ভব হোতে পারে না। সে কথা সত্য। বহু লোকের দ্বারা বিচ্ছিন্ন ভাবেও সাধ্য হবে না। একজনের কেন্দ্রাকর্ষণে দেশের সকল লোকে এক হোতে পারলে তবেই হবে অসাধ্য সাধন। যাঁরা দেশের যথার্থ স্বাভাবিক প্রতিনিধি তাঁরা কখনোই একলা নন। তাঁরা সর্বজনীন, সর্বকালে তাঁদের অধিকার। তাঁরা বর্তমানের গিরিচূড়ায় দাঁড়িয়ে ভবিষ্যতের প্রথম সূর্যোদয়ের অরুণাভাসকে প্রথম প্রণতির অর্ঘ্যদান করেন। সেই কথা মনে রেখে আমি আজ তোমাকে বাংলাদেশের রাষ্ট্রনেতার পদে বরণ করি, সঙ্গে সঙ্গে আহ্বান করি তোমার পার্শ্বে সমস্ত দেশকে।

"এমন ভুল কেউ যেন না করেন যে বাংলাদেশকে আমি প্রাদেশিকতার অভিমানে ভারতবর্ষ থেকে বিচ্ছিন্ন করতে চাই অথবা সেই মহাত্মার প্রতিযোগী আসন স্থাপন করতে চাই রাষ্ট্রধর্মে যিনি পৃথিবীতে নূতন যুগের উদ্বোধন করেছেন,

১ সাড়ে পাঁচ বৎসর বন্দী থাকিবার পর সুভাষচন্দ্র মুক্তি লাভ করায় শ্রদ্ধানন্দ পার্কে বিরাট জনসভায় তাঁহার সংবর্ধনা হয়। শান্তিনিকেতন হইতে রবীন্দ্রনাথ যে টেলিগ্রাম করিয়াছিলেন তাহার অর্থ, "সমগ্র জাতির কণ্ঠের সহিত কণ্ঠ মিলাইয়া আমি সুভাষকে স্বাগত সম্ভাষণ করিতেছি।" (১৩৪৩ চৈত্র ২৩) প্রবাসী ১৩৪৪ বৈশাখ, পৃ ১৪০, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় এই সভায় সভাপতিত্ব করেন।

ভারতবর্ষকে যিনি প্রসিদ্ধ করেছেন সমস্ত পৃথিবীর কাছে। সমগ্র ভারতবর্ষের কাছে বাংলার সম্মিলন যাতে সম্পূর্ণ হয়, মূল্যবান হয়, পরিপূর্ণ ফলপ্রসূ হয়, যাতে সে রিক্তশক্তি হয়ে পশ্চাতের আসন গ্রহণ না করে, তারই জন্যে আমার এই আবেদন। ভারতবর্ষে রাষ্ট্রমিলন যজ্ঞের যে মহদনুষ্ঠান আজ প্রতিষ্ঠিত, প্রত্যেক প্রদেশকে তার জন্যে উপযুক্ত আহুতির উপকরণ সাজিয়ে আনতে হবে। তোমার সাধনায় বাংলাদেশের সেই আত্মাহুতি ষোড়শোপচারে সত্য হোক, ওজস্বী হোক—তার আপন বিশিষ্টতা উজ্জ্বল হয়ে উঠুক।

"বহুকাল পূর্বে একদিন আর এক সভায় আমি বাঙালী সমাজের অনাগত অধিনায়কের উদ্দেশে বাণীদূত পাঠিয়েছিলাম। তার বহু বৎসর পরে আজ আর এক অবকাশে বাংলাদেশের অধিনেতাকে প্রত্যক্ষ বরণ করছি। দেহে মনে তাঁর সঙ্গে কর্মক্ষেত্রে সহযোগিতা করতে পারব আমার সে সময় আজ গেছে, শক্তিও অবসন্ন। আজ আমার শেষ কর্তব্যরূপে বাংলাদেশের ইচ্ছাকে কেবল আহ্বান করতে পারি। সেই ইচ্ছা তোমার ইচ্ছাকে পূর্ণ শক্তিতে প্রবুদ্ধ করুক, কেবল এই কামনা জানাতে পারি। তারপরে আশীর্বাদ করে বিদায় নেব এই জেনে যে দেশের দুঃখকে তুমি তোমার আপন দুঃখ করেছ, দেশের সার্থক মুক্তি অগ্রসর হয়ে আসছে তোমার চরম পুরস্কার বহন করে।"

আমাদের প্রশ্ন এই ভাষণ লিখিত ও মুদ্রিত হইয়াও প্রকাশিত হইল না কেন? কন্‌গ্রেস ছয়টি প্রদেশে মন্ত্রীত্ব লাভ করিয়া আপনাদের সাফল্য সম্বন্ধে এতই নিশ্চিন্ত যে, তাঁহাদের কর্মপদ্ধতির সমালোচনা তাঁহাদের পক্ষে সহ্য করা কঠিন। রবীন্দ্রনাথের এই ভাষণ কন্‌গ্রেসপক্ষীয়দেরই সমালোচনা। আমাদের মনে হয় কবির সুহৃৎ ও বিশ্বভারতীর হিতাকাঙ্ক্ষীদের পরামর্শে এই প্রবন্ধ প্রকাশ করা হয় নাই। কিন্তু সুভাষ সম্বন্ধে তাঁহার মনোভাব কবি গোপন করিতে পারিলেন না; অমিয়চন্দ্রকে লিখিত 'কন্‌গ্রেস' নামে পত্র-প্রবন্ধ তাহার সাক্ষ্য; কিন্তু অচিরেই সুভাষের অন্য এক কর্মোপলক্ষ্যে রবীন্দ্রনাথ তাঁহাকে সর্বসাধারণ সমক্ষে অভিনন্দিত করিলেন; সেইটি হইতেছে 'মহাজাতি সদন'-এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন।

'মহাজাতি সদন' এই নাম রবীন্দ্রনাথের দেওয়া। সুভাষচন্দ্র তাঁহার অভিভাষণে রবীন্দ্রনাথকে বলিলেন, "গুরুদেব! আপনি বিশ্বমানবের শাশ্বত কণ্ঠে আমাদের সুপ্তোত্থিত জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষাকে রূপ দিয়েছেন। আপনি চিরকাল মৃত্যুঞ্জয়ী যৌবনশক্তির বাণী শুনিয়ে আসছেন। আপনি শুধু কাব্যের বা শিল্পকলার রচয়িতা নন। আপনার জীবনে কাব্য এবং শিল্পকলা রূপপরিগ্রহ করেছে। আপনি শুধু ভারতের কবি নন—বিশ্বকবি। আমাদের স্বপ্ন মূর্ত হতে চলেছে দেখে যে সমস্ত কথা, যে সমস্ত চিন্তা, যে সমস্ত ভাব আজ আমাদের অন্তরে তরঙ্গায়িত হয়ে উঠেছে—তাহা আপনি যেমন উপলব্ধি করবেন, তেমন আর কে করবে? যে শুভ অনুষ্ঠানের জন্য আমরা এখানে সমবেত হয়েছি তার হোতা আপনি ব্যতীত আর কে হতে পারবে? গুরুদেব! আজকার এই জাতীয় যজ্ঞে আমরা আপনাকে পৌরোহিত্যের পদে বরণ করে ধন্য হচ্ছি। আপনার পবিত্র করকমলের দ্বারা মহাজাতি-সদনের ভিত্তিস্থাপনা করুন। যে সমস্ত কল্যাণ প্রচেষ্টার ফলে ব্যক্তি ও জাতি মুক্ত জীবনের আস্বাদ পাবে এবং ব্যক্তির ও জাতির সর্বাঙ্গীণ উন্নতি সাধিত হবে—এই গৃহ তারই জীবন-কেন্দ্র হয়ে 'মহাজাতি সদন' নাম সার্থক ক'রে তুলুক—এই আশীর্বাদ আপনি করুন। এই আশীর্বাদ করুন যেন আমরা অবিরাম গতিতে আমাদের সংগ্রাম-পথে অগ্রসর হয়ে ভারতের স্বাধীনতা অর্জন করি এবং আমাদের মহাজাতির সাধনাকে সব রকমে সাফল্যমণ্ডিত ও জয়যুক্ত ক'রে তুলি।"

রবীন্দ্রনাথের ভাষণ হইতে কয়েকটি পংক্তি উদ্ধৃত করিতেছি—কবির মন কিভাবে কাজ করিতেছে তাহার আভাস পাইব—

"আজ এই মহাজাতি সদনে আমরা বাঙালীজাতির যে শক্তির প্রতিষ্ঠা করবার সংকল্প করেছি তা সেই

রাষ্ট্রশক্তি নয়, যে শক্তি শত্রুমিত্র সকলের প্রতি সংশয়কণ্টকিত। জাগ্রত চিত্তকে আহ্বান করি, যার সংস্কারমুক্ত উদার আতিথ্যে মনুষ্যত্বের সর্বাঙ্গীণ মুক্তি অকৃত্রিম সত্যতা লাভ করে। বীর্য এবং সৌন্দর্য, কর্মসিদ্ধিমতী সাধনা এবং সৃষ্টিশক্তিমতী কল্পনা, জ্ঞানের তপস্যা, এবং জনসেবার আত্মনিবেদন, এখানে নিয়ে আসুক আপন আপন বিচিত্র দান। অতীতের মহৎ স্মৃতি এবং ভবিষ্যতের বিপুল প্রত্যাশা এখানে আমাদের প্রত্যক্ষ হোক, বাংলাদেশের যে আত্মিক মহিমা নিয়ত পরিণতির পথে নবযুগের নবপ্রভাতের অভিমুখে চলেছে, অনুকূল ভাগ্য যাকে প্রশ্রয় দিচ্ছে এবং প্রতিকূলতা যার নির্ভীক স্পর্ধাকে দুর্গম পথে সম্মুখের দিকে অগ্রসর করছে সেই তার অন্তর্নিহিত মনুষ্যত্ব এই মহাজাতি সদনের কক্ষে কক্ষে বিচিত্র মূর্তরূপ গ্রহণ করে বাঙালিকে আত্মোপলব্ধির সহায়তা করুক।...আত্মগৌরবে সমস্ত ভারতের সঙ্গে বাংলার সম্বন্ধ অচ্ছেদ্য থাকুক, আত্মাভিমানের সর্বনাশা ভেদবুদ্ধি তাকে পৃথক্ না করুক এই কল্যাণ-ইচ্ছা এখানে সংকীর্ণচিত্ততার উর্ধ্বে আপন জয়ধ্বজা যেন উড্ডীন রাখে।..."[১]

রবীন্দ্রনাথের সহিত সুভাষচন্দ্রের এই প্রচেষ্টার কী গভীর যোগ ছিল, তাহা ১৯৪৯ সালের ২৪ জানুয়ারিতে 'মহাজাতি সদন বিল' উপস্থাপিত করিবার সময় পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তদানীন্তন আইন-মন্ত্রী নীহারেন্দু দত্ত-মজুমদার যে ভাষণ দেন, তাহাতে পরিব্যক্ত হইয়াছে।

মহাজাতি সদনের ভিত্তি স্থাপনের পর দিন (২০ অগস্ট ১৯৩৯) জোড়াসাঁকোর বাড়িতে বিশ্বভারতী-সম্মেলনের উদ্যোগে গীত-উৎসবের অনুষ্ঠান হয়। এই উৎসবে জবহরলাল আসেন। জবহরলাল চীনে যাইতেছেন, কলিকাতা হইতে এরোপ্লেন ধরিবেন। রবীন্দ্রনাথ কলিকাতায় আসিয়াছেন, এই সংবাদ পাইয়াই তিনি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন।[২] ইতিপূর্বে নেহেরুর চীনযাত্রার পরিকল্পনার কথা জানিতে পারিয়া কবি তাঁহাকে একখানি পত্রে লেখেন, "I feel proud that the new spirit of Asia will be represented through you and our best traditions of Indian humanity find their voice during your contacts with the people of China. My tours in the Far East have convinced me that in the main our peoples have maintained an *Asiatic tradition of cultural interchange.*" কবির একান্ত ইচ্ছা ছিল নেহেরু জাপানেও যান। জাপান তখন চীনের সর্বনাশসাধনে উন্মত্ত। কবি নেহেরুকে লিখিতেছেন, "Let Japan take warning not to betray the basis of her civilisation which she shares with China and with us in India; far greater than the fearful hurt she is inflicting on China, would be the inevitable wrecking of her own humanity which her militarists seem determined to achieve." কবি এই পত্রে আর-একটি কথা নেহেরুকে বলেন— "I cannot help hoping that as a messenger from India's youth you would give strength to the historic forces of *Asiatic unity*, bringing new urge of neighbourly understanding to our Eastern peoples".[৩] কবির এই স্বপ্ন বহু বৎসর পরে নেহেরু Asiatic conference আহ্বান করিয়া সফল করেন।

১ প্রবাসী ১৩৪৬ আশ্বিন পৃ ৮৪৬-৮৭।

২ নেহেরু তাঁহার A Diary of a Travel গ্রন্থে লিখিতেছেন—"I learnt that Poet Rabindranath Tagore was in Calcutta. That was too good an opportunity to miss as it is always a delight to meet Gurudeva. I hastened to his house from my hotel and for all too brief a time, he spoke to me of the intermingling of the great Asiatic cultures and why it was necessary that India should develop contacts with Eartern Countries."...(Do p 18)

৩ V. B. News VII No 3. 1939. Sep. p 20-21. ইটালিক্স্ আমাদের।

মংপুতে দুইমাস ১৯৩৯

কলিকাতার কর্তব্য শেষ করিয়া কবি শান্তিনিকেতনে ফিরিলেন (১৩৪৬) ভাদ্রমাসের গোড়ার দিকে (অগস্ট ২১)। দিন কাটে নানা ভাবে। নিজের দিন কিভাবে যায় নিজেই লিখিতেছেন:

পদ্মাসনার সাধনাতে দুয়ার থাকে বন্ধ
ধাক্কা লাগায় সুধাকান্ত, লাগায় অনিল চন্দ।
ভিজিটরকে এগিয়ে আনে, অটোগ্রাফের বহি
দশ-বিশটা জমা করে, লাগাতে হয় সহি।
আনে অটোগ্রাফের দাবি, রেজিস্টারি চিঠি,
বাজে কথা, কাজের তর্ক, নানান খিটিমিটি।
পদ্মাসনের পদ্মে দেবী লাগান মোটরচাকা,
এমন দৌড় মারেন তখন মিথ্যে তাঁরে ডাকা।
ভাঙাধ্যানের টুকরো যত খাতায় থাকে পড়ি
অসমাপ্ত চিন্তাগুলোর শূন্যে হুড়াহুড়ি।[১]

ইতিপূর্বেই বর্ষামঙ্গলের জন্য গানের মহড়া অধ্যাপক শৈলজারঞ্জন মজুমদারের তত্ত্বাবধানে শুরু হইয়াছিল। এই সময়ে শান্তিদেব ঘোষ জাভা দ্বীপে; তথাকার নৃত্যকলা ও গীতবাদ্য সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জনের জন্য ভারতীয় দ্বীপগুলিতে ঘুরিতেছেন। বর্ষামঙ্গলের জন্য নূতন গানের দাবি অনেকেই পেশ করিতেছেন। কবি পদ্মাসনার সাধনাতে বসিয়া একটির পর একটি গান লিখিয়া দেন, সেই গানগুলি এই (গী-বি পৃ ৪৭৫-৮১): ১। ওগো সাঁওতালি ছেলে ২। বাদলদিনের প্রথম কদম ফুল করেছ দান (তু সানাই, দেওয়া-নেওয়া) ৩। আজি তোমায় আবার চাই শুনাবারে ৪। এসো গো, জেলে দিয়ে যাও প্রদীপখানি (তু সানাই, আহ্বান), ৫। আজি ঝরো ঝরো মুখর বাদর-দিনে ৬। আজ শ্রাবণের গগনের গায় বিদ্যুৎ চমকিয়া যায় ৭। স্বপ্নে আমার মনে হল কখন ঘা দিলে আমার দ্বারে, (তু সানাই, আধোজাগা) ৮। শেষ গানেরি রেশ নিয়ে যাও চলে ৯। এসেছিলে তবু আস নাই জানায়ে গেলে (তু সানাই, দ্বিধা) ১০। এসেছিনু দ্বারে তব শ্রাবণরাতে (তু সানাই, কৃপণা) ১১। নিবিড় মেঘের ছায়ায় মন দিয়েছি মেলে ১২। আমার যেদিন ভেসে গেছে চোখের জলে ১৩। পাগলা হাওয়ার বাদল দিনে ১৪। আজি মেঘ কেটে গেছে সকালবেলায় (তু সানাই, মরিয়া) ১৫। সঘন গহন রাত্রি, ঝরিছে শ্রাবণ ধারা ১৬। ওগো তুমি পঞ্চদশী, পৌঁছিলে পূর্ণিমাতে (তু সানাই, পূর্ণা)।[২]

বর্ষামঙ্গলের পরেও কবি আরও দুইটি গান রচেন,— 'বারে বারে ফিরে ফিরে তোমার পানে', 'ঝরে রিমিকি ঝিমিকি ঝরে ভাদরের ধারা' (গী-বি পৃ ৮৯৯)।[৩] কিছু দিনের মধ্যেই পুনরায় আর-একটি বর্ষাউৎসব হয়, কবিকথা ১৮১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

সুধীরচন্দ্র কর 'কবিকথা'য় বলেন যে এই গানগুলি বর্ষার জন্য রচিত হয় এবং কবি পরে কয়েকটি গানকে কবিতায় রূপান্তরিত করেন (পৃ ১৭৬-৮২)। ইহা ঘটে ১৯৪০ এর জানুয়ারি মাসে, অর্থাৎ গান রচিবার চারি মাস পরে। এতকাল

১ ধ্যানভঙ্গ, বঙ্গলক্ষ্মী ১৩৭৬ আশ্বিন, প্রহাসিনী। "The number of his (Rabindranath) engagements in December (1939) last was so alarmingly out of proportion that our Upacharya C. F. Andrews thought fit to issue a statement requesting the public to allow Gurudeva his well-earned rest." V. B. News 1940 Feb. Autograph-hunterদের নিকট হইতে Poor Students' Fundএর জন্য একটি করিয়া টাকার দাবি জানানো হয়। V. B. News 1940 Feb.

২ এই গানগুলি গী-বি ২য় সংস্করণ, যাহা ১৩৪৬ সালে মুদ্রিত হয় কিন্তু ১৩৪৮ এর পূর্বে প্রকাশিত হয় নাই সেই খণ্ডে আছে, পৃ ২০৬-২১। এই তালিকার পরে আর বর্ষার গান নাই।

৩ গীতবিতান, ১৩৪৬ সালে মুদ্রিত ২য় খণ্ডের পরিশিষ্টে এই দুইটি গান আছে, পৃ ৩৩৫-৩৬।

আমরা দেখিয়া আসিয়া ছিলাম যে রবীন্দ্রনাথ কবিতাকে গানে রূপান্তরিত করিয়াছেন, এখন তাহার বিপরীত পদ্ধতি অনুসৃত হইয়াছে। তথ্য ও তত্ত্ব হিসাবে বিষয়টি গভীরভাবে বিচারণীয়।[১]

শান্তিনিকেতনে বর্ষামঙ্গল উৎসবের দুই দিন পরে শ্রীনিকেতনে হলকর্ষণ[২] উৎসব। সেই উৎসবের ভাষণে (১৩৪৬ ভাদ্র ১২) বিজ্ঞানীর দৃষ্টিতে কবির ভাষায় মানুষের ইতিহাস আলোচিত হইয়াছে। আদি অরণ্যচর মানুষ কিভাবে ধীরে ধীরে কৃষিজীবী হইয়া উঠিল, কিভাবে সভ্যতার নানা শাখা সমাজে দেখা দিল তাহার আলোচনা করিয়া বলিলেন যে, তারপর মানুষের এমন একযুগ আসিল, যখন সে অরণ্যধ্বংসে ব্যাপৃত হইল। "অরণ্যের হাত থেকে কৃষিক্ষেত্র জয় ক'রে নিলে, অবশেষে কৃষিক্ষেত্রের একাধিপত্য অরণ্যকে হটিয়ে দিতে লাগল। নানা প্রয়োজনে গাছ কেটে কেটে পৃথিবীর ছায়াবস্ত্র হরণ ক'রে তাকে দিতে লাগল নগ্ন করে। তাতে তার বাতাস করতে লাগল উত্তপ্ত, মাটি উর্বরতার ভাণ্ডার দিতে লাগল নিঃস্ব ক'রে। অরণ্যের আশ্রয়হারা আর্যাবর্ত আজ তাই খরসূর্যতাপে দুঃসহ।

"কৃষিযুগের পরে সম্প্রতি এসেছে সদর্পে যন্ত্রবিদ্যা।...আজ যন্ত্রবিদ্যা মানুষের হাতে অস্ত্র দিয়েছে বহু শত শতঘ্নী...। আত্মশক্র আত্মঘাতী মানুষ ধ্বংস-বন্যার স্রোতে গা ভাসান দিয়েছে। মানুষের আরম্ভ আদিম বর্বরতায়, তারও প্রেরণা ছিল লোভ, মানুষের চরম অধ্যায় সর্বনেশে বর্বরতায়, সেখানেও লোভ মেলেছে আপন করাল কবল। জ্বলে উঠেছে প্রকাণ্ড একটা চিতা—সেখানে মানুষের সঙ্গে সঙ্গে সহমরণে চলেছে তার ন্যায়নীতি, তার বিদ্যাসম্পদ, তার ললিত কলা।

"যন্ত্রযুগের বহুপূর্ববর্তী সেই দিনের কথা আজ আমরা স্মরণ করব যখন পৃথিবী স্বহস্তে সন্তানকে পরিমিত অন্ন পরিবেষণ করেছেন যা তার স্বাস্থ্যের পক্ষে তার তৃপ্তির পক্ষে যথেষ্ট, যা এত বীভৎস রকমে উদ্বৃত্ত ছিল না...।"

'হলকর্ষণ' উৎসবসন্ধ্যায় কবি শান্তিনিকেতনে ছাত্রদের নিকট 'গদ্যকাব্যে'র অর্থ সম্বন্ধে এক ভাষণ দান করেন (১৯৩৯ অগস্ট ২৯)।[৩] আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি সমালোচনার মূল কথা রুচির কথা তুলিয়াছেন। বিজ্ঞানের নানা কোঠা আয়ত্ত করিতে হইলে সাধনার প্রয়োজন হয়; কিন্তু রুচি এমন একটা জিনিস যাহাকে কবি বলিলেন 'সাধন-দুর্লভ'; সেইটি আয়ত্ত করিবার বাঁধা পথ নাই। কবি বলিতেছেন, "রুচির সঙ্গে যোগ দেয় নিজের স্বভাব, চিন্তার অভ্যাস, সমাজের পরিবেষ্টন ও শিক্ষা। এগুলি যদি ভদ্র, ব্যাপক ও সূক্ষ্ম বোধশক্তিমান হয় তাহলে সেই রুচিকে সাহিত্যপথের আলোক ব'লে ধরে নেওয়া যেতে পারে। কিন্তু রুচির শুভ সম্মিলন কোথাও সত্য পরিণামে পৌঁছেছে কিনা তাও মেনে নিতে অন্য পক্ষে রুচিচর্চার সত্য আদর্শ থাকা চাই। সুতরাং রুচিগত বিচারের মধ্যে একটা অনিশ্চয়তা থেকে যায়। সাহিত্য-ক্ষেত্রে যুগে যুগে তার প্রমাণ পেয়ে আসছি। বিজ্ঞান দর্শন সম্বন্ধে যে মানুষ যথোচিত চর্চা করে নি সে বেশ নম্রভাবেই বলে, মতের অধিকার নেই আমার। সাহিত্যে ও শিল্পে রসসৃষ্টির সভায় মতবিরোধের কোলাহল দেখে অবশেষে হতাশ হয়ে বলতে ইচ্ছে হয়, ভিন্ন রুচির্হি লোকঃ। সেখানে সাধনার বালাই নেই ব'লে স্পর্ধা আছে অবারিত, আর সেই জন্যেই রুচিভেদের তর্ক নিয়ে হাতাহাতিও হয়ে থাকে।"

এই ভাষণে কবি গদ্যকাব্য কী এবং কেন লিখিতে প্রবৃত্ত হন তাহার সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিয়া বলিতেছেন, "এতদিন যে রূপেতে কাব্যকে দেখা গেছে, এবং সে-দেখার সঙ্গে আনন্দের যে অনুষঙ্গ, তার ব্যতিক্রম হয়েছে গদ্য-

১ রবীন্দ্র-রচনাবলী ২৪ গ্রন্থপরিচয় পৃ ৪৯১-৯২।

২ হলকর্ষণ, সুকুমার চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক অনুলিখিত ও কবি কর্তৃক সংশোধিত, প্রবাসী ১৩৪৬ আশ্বিন।

৩ ক্ষিতীশ রায় কর্তৃক অনুলিখিত ও বক্তা কর্তৃক সংশোধিত, প্রবাসী ১৩৪৬ পৌষ।

কাব্যে। কেবল প্রসাধনের ব্যত্যয় নয়, স্বরূপেতে তার ব্যাঘাত ঘটেছে।" কবির বিশ্বাস যে "অলংকরণের বহিরাবরণ থেকে মুক্ত ক'রে কাব্য সহজে আপনাকে প্রকাশ করতে পারে;" দৃষ্টান্তস্বরূপ তিনি ছান্দোগ্য উপনিষদের জাবালা উপাখ্যান ও ইংরেজি বাইবেলের কথা তোলেন। ইংরেজি বাইবেল সম্বন্ধে বলিতেছেন, "এই অনুবাদের ভাষার আশ্চর্য শক্তি এদের মধ্যে কাব্যের রস ও রূপকে নিঃসংশয়ে পরিস্ফুট করেছে। এই গানগুলিতে গদ্যছন্দের যে মুক্ত পদক্ষেপ আছে, তাকে যদি পদ্যপ্রথার শিকলে বাঁধা হ'ত তবে সর্বনাশই হ'ত।" ভাষণের শেষ দিকে বলিতেছেন,…"আমি অনেক গদ্যকাব্য লিখেছি যার বিষয়বস্তু অপর কোনোরূপে প্রকাশ করতে পারতুম না। তাদের মধ্যে একটা সহজ প্রাত্যহিক ভাব আছে, হয়তো সজ্জা নেই; কিন্তু রূপ আছে এবং এই জন্যই তাদেরকে সত্যকার কাব্যগোত্রীয় ব'লে মনে করি।"

ইতিমধ্যে মহাত্মাজির সপ্ততিতম জন্মজয়ন্তী (১৯৩৯ অক্টোবর ২) উপলক্ষ্যে একটি গ্রন্থ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন দ্বারা সম্পাদিত হইয়া প্রকাশের আয়োজন হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের নিকট পত্র আসে বাণীর জন্য। কবি মংপু যাইবার পূর্বে সেটি লিখিয়া পাঠাইয়া দেন; কারণ স্থির হইয়াছে ২ অক্টোবর মহাত্মাজির জন্মদিনে ঐ গ্রন্থ প্রকাশিত হইবে।[১] কবি লিখিলেন,—"Occasionally there appear in the arena of politics, makers of history, whose mental height is above the common level of humanity. They wield an instrument of power, which is almost physical in its compelling force and often relentless, exploiting the weakness in human nature—its greed, fear, or vanity. When Mahatma Gandhi came and opened up the path of freedom for India, he had no obvious medium of power in his hand, no overwhelming authority of coercion. The influence which emanated from his personality was ineffable like music, like beauty. Its claim upon others was great because of its revelation of a spontaneous self-giving. This is the reason why our people have hardly ever laid emphasis upon his natural cleverness in manipulating recalcitrant facts. They have rather dwelt upon the Truth which shines through his character in lucid simplicity. This is why, though his realm of activity lies in practical politics, peoples' minds have been struck by the analogy of his character with that of the great masters, whose spiritual inspiration comprehends and yet transcends all varied manifestations of humanity, and makes the face of worldliness turn to the light that comes from the eternal source of wisdom."[২]

ভারতে বিশ্বশান্তি ও অহিংসার প্রতীক মহাত্মা গান্ধীর জয়ন্তী-উৎসবের আয়োজন হইতেছে, আর ওদিকে য়ুরোপে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সূত্রপাত হইতেছে। ৩ সেপ্টেম্বর (১৯৩৯) ব্রিটেন ও ফ্রান্স উভয়ে জারমেনির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিল। কারণ জারমেনি পহেলা সেপ্টেম্বর পোল্যাণ্ড আক্রমণ করিয়াছে। পোল্যাণ্ডের স্বাধীনতা বিপন্ন দেখিয়া আজ ইংরেজ যুদ্ধে অবতীর্ণ হইল। এই মহাযুদ্ধ কেন বাধিল সে সম্বন্ধে আমরা অন্যত্র আলোচনা করিব।

ব্রিটেন এই যুদ্ধ ঘোষণা করায় ভারতবর্ষের রাজনৈতিক আকাশ অকস্মাৎ মেঘাচ্ছন্ন হইয়া পড়িল। ব্রিটেনের

১ V. B. News 1937 Oct. p 81.

২ From the Commemoration volume, edited by Dr. S. Radhakrishnan in celebration of Mahatma Gandhiji's 70th Birthday.

দাবি ভারত গবর্মেণ্ট এই মহাযুদ্ধকে তাহারই যুদ্ধ বলিয়া মানিয়া লয় এবং সর্বতোভাবে সাহায্য দান করে। ভারতীয় নেতা ও ভাবুকদের নিকট এই দাবি অত্যন্ত অস্পষ্ট। গান্ধীজি এই সময় স্পষ্টভাবে ভারতসচিব লর্ড জেট্‌ল্যাণ্ডকে জানাইলেন, 'কেবল স্বাধীন ভারতের সাহায্যই মূল্যবান।' তিনি বলিলেন "কন্‌গ্রেসের ইহা জানিবার সম্পূর্ণ অধিকার আছে যে যুদ্ধের শেষে স্বাধীন দেশ বলিয়া ভারতবর্ষের দাবি ও মর্যাদার নিশ্চয়তা—ব্রিটেনের স্বাধীন দেশ বলিয়া পদবী ও মর্যাদার নিশ্চয়তার সমান হইবে।"[১]

বাংলাদেশ হইতে রাজনৈতিক দলের বাহিরে আছেন এমন একদল লোকও প্রায় এই একই সময়ে এই যুদ্ধের উদ্দেশ্য বিষয়ে একটি বিবৃতি প্রকাশ করিলেন ; এই বিবৃতির প্রথমেই রবীন্দ্রনাথের সহি ছিল।

কবি মংপু যাইতেছেন। ৬ সেপ্টেম্বর কলিকাতায় আসিলেন। দুই দিন পরে বর্তমান যুদ্ধসংকটে ব্রিটেন ও ভারতের কর্তব্য সম্বন্ধে বিবৃতি প্রকাশিত হইল।[২] নিম্নে উহার বঙ্গানুবাদ অংশত উদ্ধৃত হইতেছে :

"এই মহাসংকটের সময়ে যখন কেবলমাত্র কয়েকটি দেশ নহে, পরন্তু সমগ্র সভ্যতাসৌধ বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছে, তখন ভারতবর্ষের কর্তব্য সুস্পষ্ট। ভারতবর্ষের সমবেদনা পোল্যাণ্ডের সপক্ষে। ভারতবর্ষ নিশ্চয়ই ব্রিটেনের পক্ষ অবলম্বন করিয়া, বলপ্রয়োগ দ্বারা আধিপত্য বিস্তারের যে সর্বনাশী নীতি অনুসৃত হইতেছে, তাহার প্রতিরোধ করিবে। নিজের দেশের স্বার্থের জন্যও কোন ভারতীয় এই রূপ কামনা করিবে না যে, ইংলণ্ড পরাজিত হউক। ইংলণ্ড যদি যুদ্ধে হারিয়া যায়, তাহা হইলে ভারতবর্ষের স্বাধীনতালাভের পথে বাধা পড়িবে। তখন নূতন বৈদেশিক শাসনের অধীনে ভারতবর্ষের দাসত্বের নূতন অধ্যায় আরম্ভ হইবে।

"ভারতবর্ষকে যদি অন্যান্য দেশের জন্য যুদ্ধ করিতে হয়, তাহা হইলে সর্বাগ্রে তাহাকে আত্মরক্ষায় সমর্থ হইতে হইবে।

"ভারতবর্ষ একান্ত অসহায়ভাবে নিরস্ত্র এবং সামরিক শিক্ষাবিহীন হইয়া পড়িয়াছে—ইহাই আজ ভারতীয় জীবনের অন্যতম সাতিশয় দুঃখকর অবস্থা। সুতরাং জাতি ধর্ম ও প্রদেশ নির্বিশেষে দেশের যুবকগণকে সমবেত করিয়া তাহাদিগকে উপযুক্ত সামরিক শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করাই এখন প্রথম কর্তব্য। বাংলার কথা বলিতে গেলে বলিতে হয় যে, বাংলার জন্য একটি নিজস্ব পৌরসেনা বিভাগ (militia) গঠন করিতে হইবে। সকলকেই, কথায় নহে, কার্যে ইহা অনুভব করিতে সমর্থ হইতে হইবে যে তাহারা, যেমন অন্যদের, সেইরূপ তাহাদের নিজের দেশ রক্ষার জন্য এবং নিজেদের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য সকলের সহিত সমশ্রেণীভুক্ত হইয়া সংগ্রাম করিতেছে।

"এই সংকটকালে ব্রিটেনের প্রতি ভারতবর্ষের কর্তব্য যদি সুস্পষ্ট হইয়া থাকে, তাহা হইলে ভারতবর্ষের প্রতি ইংলণ্ডের যে কর্তব্য আছে, তাহাও কম সুস্পষ্ট হইয়া উঠে নাই।" "ব্রিটেনের পক্ষে নূতন দিক্ হইতে নূতন ভাবে ভারতবর্ষের প্রতি দৃষ্টিপাত করা প্রয়োজন।" "গণতন্ত্র রক্ষাকল্পে স্বাধীন ভারত যাহাতে স্বাধীনভাবে সর্বপ্রকার সম্ভাব্য সাহায্য করিতে পারে, তজ্জন্য ব্রিটেন জগতের শান্তির খাতিরে ভারতবর্ষে স্বশাসন পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহার সহিত চিরস্থায়ী বন্ধুত্ব স্থাপনের এই মহা সুযোগ যেন না হারান।"

ভারতীয়দের প্রশ্নের ও দাবির উত্তরে বৃটিশ সরকার কোনো প্রকার প্রতিশ্রুতি দিতে স্বীকৃত হইলেন না।

১ প্রবাসী ১৩৪৬ কার্তিক পৃ ১০৫।

২ স্বাক্ষরকারীদের নাম,—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রফুল্লচন্দ্র রায়, স্যর মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়, স্যর নীলরতন সরকার, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, বিজয়চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, শৈলেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, নরেন্দ্রকুমার বসু, নির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। দ্র প্রবাসী ১৩৪৬ আশ্বিন পৃ ৮৬৩-৬৪।

ভারতবর্ষ বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্গত অধীন দেশ—ব্রিটেনের যুদ্ধই তাহার যুদ্ধ। যুদ্ধে জয় লাভের জন্য সকল প্রকার সহায়তা যে ভারত হইতে দাবি করে, তাহার প্রতিবন্ধকতা বা সে-সম্বন্ধে সংশয়প্রকাশ করা চলিবে না। কন্‌গ্রেস প্রদেশের মন্ত্রীরা বুঝিলেন ব্রিটিশ সরকারের সহিত সংগ্রাম অনিবার্য, তাঁহাদিগকে মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করিতে হইবে। আর তাঁহারা যদি পদত্যাগ না করেন তবে ইংরেজ গবর্ণর তাঁহার পদাধিকার বলে মন্ত্রীদের কর্মচ্যুত করিবেন ও শাসনভার স্বয়ং অথবা যে তাঁবেদার মন্ত্রীপরিষদ্ বৃটিশের সহিত সহযোগিতা করিবে তাহাদের মারফত প্রদেশ শাসন করাইবেন। ফলে যুদ্ধ ঘোষণার কয়েকদিনের মধ্যেই কন্‌গ্রেসী মন্ত্রীরা পদত্যাগ করিলেন। এই সব সাম্প্রতিক ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় রবীন্দ্রনাথ পত্রধারা লেখেন।

কলিকাতায় দিন পাঁচেক থাকিয়া কবি চলিলেন মংপু; এবার মংপুতে মৈত্রেয়ী দেবীর অতিথি।[১] সেখানে কবি ছিলেন প্রায় দুই মাস—১২ সেপ্টেম্বর হইতে ৯ নভেম্বর (১৯৩৯) পর্যন্ত। কবি শান্তিনিকেতনে ফিরিয়া আসেন ১১ নভেম্বর; পূজাবকাশের পর বিদ্যালয় খুলিল ১৮ই।

এই দুই মাস কবির কিভাবে মংপুতে অতিবাহিত হয়, তাহার পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা আমরা মৈত্রেয়ী দেবীর বই-তে পাই কিন্তু, দেশের ও বিদেশের রাজনৈতিক ঘটনাবলী কবিকে যে দুঃখ দিতেছিল তাহার সংবাদ আমরা ঐ গ্রন্থে পাই না, তাহা পাই অমিয় চক্রবর্তীকে লিখিত সমসাময়িক 'পত্রধারা'য়।

য়ুরোপের মহাযুদ্ধ শুরু হইয়া গেলে কবি লিখিতেছেন (১৯৩৯ সেপ ১৮), "মানুষের জগত দেখতে দেখতে উলট পালট হয়ে যাচ্চে। অত্যন্ত বিশ্বাস ছিল পাশ্চাত্য সভ্যতার উপরে—ভুলে গিয়েছিলুম সভ্যতার অর্থ ক্রমশই দাঁড়িয়েছে বস্তু ব্যবহারের আশ্চর্য নৈপুণ্যে। তার পিছনে অনেকদিন ধরে যে মারাত্মক রিপু বীভৎস হয়ে উঠেছিল তার সম্বন্ধে লজ্জাভয় হয়েছে অনভ্যস্ত। এই রক্তপিপাসু বসে আছে পুলপিটের পিছনেই; কলেজক্লাসের আঙিনায়; ধর্মতত্ত্ব, বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব, অর্থনৈতিক তত্ত্ব এর চারদিকেই বিচিত্র বাক্য প্রবাহ বইয়ে দিয়ে চলেছে, কিন্তু একে কিছুতেই স্পর্শ করতে পারবে না, এ বসে বসে ভিৎ খুঁড়ে চলেছে—আজ Babel এর স্তম্ভ পড়চে ভেঙে চুরে। এর কোনো প্রতিকার আছে বলে ভেবে পাইনে—মারের পর মার আবর্তিত হল, থামবে কোথায়।"[২]

আর একখানি পত্রে লিখিতেছেন—"দেখলুম দ্বারে বসে ব্যথিত চিত্তে, মহাসাম্রাজ্যশক্তির রাষ্ট্রমন্ত্রীরা নিষ্ক্রিয় ঔদাসীন্যের সঙ্গে দেখতে লাগল জাপানের করাল দংষ্ট্রাপংক্তির দ্বারা চীনকে খাবলে খাবলে খাওয়া···। দেখলুম ঐ স্পর্ধিত সাম্রাজ্যশক্তি নির্বিকার চিত্তে এবিসীনিয়াকে ইটালির হাঁ-করা মুখের গহ্বরে তলিয়ে যেতে দেখল, মৈত্রীর নামে সাহায্য করল জর্মনির বুটের তলায় গুঁড়িয়ে ফেলতে চেকোশ্লোভিয়াকে, দেখলুম নন্-ইনটরভেনশনের কুটিল প্রণালীতে স্পেনের রিপাবলিককে দেউলে ক'রে দিতে, দেখলুম ম্যুনিক প্যাক্টে নতশিরে হিটলারের কাছে একটা অর্থহীন সই সংগ্রহ ক'রে অপরিমিত আনন্দ প্রকাশ করতে। নিজের সম্মান খুইয়ে এবং ইমান রক্ষা করতে উপেক্ষা করে মুনফা তো কিছুই হল না— পদে পদে শত্রুর হস্তকে বলিষ্ঠ করে তুলে আজ নামতে হল দারুণ যুদ্ধে। এই যুদ্ধে ইংলণ্ড ফ্রান্স জয়ী হোক একান্ত মনে এই কামনা করি। কেননা মানব ইতিহাসে ফ্যাসিজমের নাৎসিজমের কলঙ্ক প্রলেপ আর সহ্য হয় না।"[৩]

১ চিঠিপত্র ৫ম পত্র ১৩০, ১ সেপ্টেম্বর ১৯৩৯। ১৫ ভাদ্র ১৩৪৬, পৃ ৩১০। শান্তিনিকেতন হইতে লিখিতেছেন, "মংপু পাহাড়ের পথে আগামী বুধবার রওনা হব কলকাতায়।" অর্থাৎ ৬ সেপ্টেম্বর।

২ পত্র, অমিয়চন্দ্র চক্রবর্তীকে, মংপু ১৮ সেপ ১৯৩৯; দ্র কবিতা ১৩৪৯ পৌষ।

৩ পত্রালাপ, মংপু ২০ সেপ ১৯৩৯, প্রবাসী ১৩৪৬ কার্তিক পৃ ৮৭-৮৮।

পত্রান্তরে 'আমাদের 'অবস্থা' আলোচনাকালেও কবি য়ুরোপের এই বিভীষিকাময় পরিস্থিতি কেমন করিয়া সম্ভব হইল তাহার কথা বলিয়াছেন। প্রথম মহাযুদ্ধান্তে কবি জর্মনিতে যান ১৯২১ সালে। সেইসময়কার অবস্থা সম্বন্ধে লিখিতেছেন, "জেতা যে নিশ্চিত জিতেছে এই কথাটাকে সে নানা রকমে দেগে দিচ্ছিল বিজিতের মনে।··· ক্ষমাহীন প্রতিহিংস্রক নীতি তার সুবিচার এবং শ্রেয়োবুদ্ধিকে অন্ধ করে দেয়। দেখা গেল, জয়ের দ্বারা হিংস্রতার উষ্মা শান্ত হয় না। উত্তরোত্তর তার উদগ্রতা বাড়িয়ে উঠতে থাকে।···সেই তো খোঁচা দিয়ে দিয়ে তরুণ জর্মনিকে অবশেষে হিংস্র করে তুললে, তাকে বর্বরতার পথে টেনে নিল। য়ুরোপের মাঝখানে হিংস্র শক্তির প্রকাণ্ড একটা অনাবৃষ্টি দেখা দিল। যে নির্মম শাসনশক্তি আমাদের দেশে ব্যেপে দিয়েচে নির্জীব তামসিকতা, সেই শক্তিই য়ুরোপে জাগিয়ে তুলেছে উগ্রকঠোর তামসিকতা।··· দেখলুম একবারকার যুদ্ধের ফসল যখন সে ঘরে তোলে তখন আর-একবারকার যুদ্ধের বীজ বপন করতে সে ভোলে না।"[১]

ভারতবর্ষের এই যুদ্ধে কী কর্তব্য সে সম্বন্ধে স্পষ্ট করিয়া কিছু না বলিলেও তিনি যে ফাসিজ্‌ম প্রভৃতি totlalitarian মতবাদের বিরোধী, তাহা তাঁহার পত্র হইতে জানা যায়।

য়ুরোপের ঘনায়মান মরণযজ্ঞে কূটনীতিজ্ঞরা যে ধর্মবুদ্ধির পরিচয় দিতেছেন, তাহাতে কবি অত্যন্ত আতঙ্কিত। লর্ড হ্যালিফ্যাক্স[২] এই সময়ে ঘোষণা করিলেন যে, "যে সকল দেশ তাহাদের রাষ্ট্রস্বাতন্ত্র্য আশু বিপদ্‌গ্রস্ত বলিয়া উপলব্ধি করিতেছে, তাহাদের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য ইংরেজ যে প্রস্তুত, এ তাহারা কাজে ও কথায় সুস্পষ্ট করিয়া দিবার চেষ্টা করিতেছে। এই কারণেই তাহারা পোল্যাণ্ডের পক্ষ লইতে প্রতিশ্রুত। কবি বলিতেছেন রাষ্ট্রের স্বাতন্ত্র্যনীতি যেমন আক্রান্ত হইয়াছে পোল্যাণ্ডে, তেমনি তো হইয়াছিল মানচুরিয়া, আবিসিনিয়া, চীন, স্পেন, চেকোস্লোভাকিয়াতে। কিন্তু ইহাদের সম্বন্ধে ব্রিটেন অত্যাচারিতকে রক্ষা করিবার দায়িত্ব কাজে ও কথায় স্বীকার করেন নাই। কবির সহানুভূতি সকল অত্যাচারিত দেশের জন্য; তবে চীনের জন্য তাঁহার বেদনা কেবল চীনাদের দুর্দশার জন্য নহে, জাপানের দুর্বুদ্ধিতার জন্য, তাঁহার আশঙ্কা জাপানের ভবিষ্যত লইয়া।[৩]

কবি যে পোলিটিশান নহেন, তাহা কবুল করিয়া বলিলেন, "যাঁরা আমাদের দেশের রাষ্ট্রনেতা তাঁরা কল্পনা করছেন যুদ্ধে যদি রাজশক্তির সহায়তা করি তাহলে বরলাভ করব। এই যে সহায়তার সম্বন্ধ এটা দরকষাকষির হাটে; এটা আন্তরিক মৈত্রীয় নয় ···।" কবি চিরদিনই উদ্দেশ্যমূলক ভাবনা লইয়া সৎকর্মে প্রবৃত্ত হইবার বিরোধী। ধর্ম ধর্মের জন্যই অনুসরণীয়—তাহার সঙ্গে কোনো শর্ত জোড়া দেওয়া যায় না। তাই নেতাদের শর্তসাপেক্ষ সহযোগিতা প্রস্তাব কবি ঠিকভাবে গ্রহণ করিতে পারেন নাই।

তবে ভারতের গতি কী সে সম্বন্ধে কবির মত স্পষ্ট; তিনি বলিতেছেন, "যে পথে বড়ো বড়ো দেশ আজ উন্মত্তের মতো ধাবমান···সে পথে" উহারা "যে কোথায় পৌঁছবেন সেটা সন্দেহজনক। এইটুকু বলিতে পারি ইতিহাসের গতি রহস্যময়। দুর্বলের দুঃখও প্রবলের জাহাজে ছিদ্র ক'রে দিয়েছে তার প্রমাণ আছে। ইতিহাসে যুদ্ধবিগ্রহই একমাত্র সুযোগ নয়, বঞ্চিতের নৈরাশ্যও কোথা থেকে সুযোগ আকর্ষণ ক'রে আনে এখনি তা বলতে পারি নে। বলতে পারি নে ব'লেই তার আকস্মিক্ আবির্ভাব বলশালীকে একদিন অভিভূত করবে।"[৪] আজ দুনিয়ার সর্বত্র দুর্বল সর্বহারার

১ নয় বৎসর পূর্বে পক্ষীমানব (২৫ ফাল্গুন ১৩৩৮, নবজাতক), কবিতায় কবি এবারকার নিষ্ঠুর যুদ্ধনীতির সম্ভাবনা সম্বন্ধে বলেন।

২ ভারতের ভূতপূর্ব ভাইসরয় লর্ড আরবিন এখন লর্ড হ্যালিফ্যাক্স।

৩ পত্র অমিয়চন্দ্র চক্রবর্তীকে লিখিত, মংপু ২৮ সেপ ১৯৩৯ (১১ আশ্বিন ১৩৪৬), কবিতা ১৩৫০ আশ্বিন।

৪ পত্রালাপ, আমাদের অবস্থা, মংপু ৫ নভেম্বর ১৯৩৯, প্রবাসী ১৩৪৬ অগ্র পৃ ১৬৪-৬৭।

দল মিলিত হইতেছে, বঞ্চিতের দল সংঘবদ্ধ হইয়া সঞ্চয়ীর দলে আতঙ্ক সৃষ্টি করিতেছে ; এক বৎসর পূর্বে 'প্রায়শ্চিত্ত' (নবজাতক) কবিতাটি স্মরণীয়।

কিন্তু রবীন্দ্রমানসে এই রাজনীতির আলোচনা সামান্য অংশে ব্যাপ্ত। সাময়িক পত্রিকা ও রেডিয়ো হইতে সংবাদ আহরণ করিয়া মনে যেটুকু উদ্বেগ ও উত্তেজনা সৃষ্ট হয়, তাহাকে শমিত করেন পত্রালাপের মধ্য দিয়া, বক্তব্যটুকু বলা হইয়া গেলেই ভারটা নামিয়া যায়—মন আপনার স্বাভাবিকতায় ফিরিয়া আসে। কবিতা লিখিয়াও এইভাবের মুক্তি পান।

মংপু বাসকালে কবিতা-লেখা ছবি-আঁকা চলিতেছে ; সেপ্টেম্বরের শেষভাগে 'শেষকথা' নামে একটি বড়ো রকমের 'ছোটো গল্প' আরম্ভ করেন ; সেটি শেষ করেন ৪ অক্টোবর।[১]

'শেষ কথা' সম্বন্ধে মৈত্রেয়ী দেবী লিখিতেছেন, "কি আশ্চর্য পরিশ্রম করতে পারতেন এখন পর্যন্তও, ভাবলে আশ্চর্য লাগে। ভোর পাঁচটায় বাইরে এসে বসতেন, ছ'টার মধ্যে চা খাওয়া খবর শোনা শেষ ক'রে চিঠির উত্তর লিখতে বসতেন।···তারপর থেকে শুরু হোলো লেখা। মাঝে ঘণ্টা দেড়েক স্নানাহারের জন্য বাদ দিয়ে তারপর একেবারে আলোজ্বালা পর্যন্ত কাজ চলেছে তো চলেছেই।" "'শেষ কথা' লেখা হলে বললেন এখনকার গল্পগুলো গল্পগুচ্ছের মত নয়—এগুলো বড় বেশি সাইকোলজিক্যাল হ'য়ে পড়ে। গল্পগুচ্ছের গল্পগুলো যেমন মানুষের প্রত্যহের ঘরোয়া জীবন নিয়ে গড়ে উঠেছে আজকাল আর সেরকম হয় না। আশ্চর্য লাগে আমার, কি ক'রে অত details মনে হোতো, লিখতুম কি ক'রে।" (মংপুতে রবীন্দ্রনাথ পৃ ১৯২)

'শেষ কথা' গল্পটির অপূর্ব রচনাকুশলতা। তিনটি মাত্র চরিত্র—অচিরা, বৃদ্ধ অধ্যাপক ও নবীনমাধব। সকল চরিত্রই অনির্বচনীয় মহিমা লাভ করিয়াছে গল্পের মধ্যে। এত বড়ো ট্র্যাজেডি অথচ গোড়া থেকে সবটাই প্রায় প্রচ্ছন্ন। সরল কথাবার্তা আর ঘটনার মধ্য দিয়া অগ্রসর হইয়া যাইতে যাইতে হঠাৎ গল্পের চরম মুহূর্তটি কখন যে আসিয়া পড়িল, তাহার জন্য পাঠকের মন আদৌ প্রস্তুত ছিল না। মনের উপর অকস্মাৎ বেদনার তীব্র আঘাত রাখিয়া গল্পের শেষ ; অথচ ট্র্যাজেডির জন্য কাহাকেও দায়ী করা যায় না—মনে হয় যেন এইটিই হওয়া উচিত ছিল। "বাংলা ভাষায় এ-রকম উঁচুসুরে বাঁধা নরনারীর চরিত্রসৃষ্টি একমাত্র রবীন্দ্রনাথের দ্বারাই সম্ভব। এত অল্প আয়োজনে, এমন অনায়াস ভঙ্গিতে একটা বিরাট দুঃখের ইতিহাস অথচ কোথায়ও কোনো অভাব বোধ হল না, না ঘটনায়, না ঘটনা-মধ্যবর্তী অংশের।"[২]

গল্পটির মধ্যে 'কচ ও দেবযানী'র উত্তর আছে অচিরার চরিত্রে। নবীনমাধবকে যখনই সে দুর্বল হইতে দেখিল, তখনই সে আপনার মোহজাল কঠিন হস্তে ভাঙিয়া নবীনমাধবকে মুক্তি দিল ; তাহাকে যেন জোর করিয়া ঠেলিয়া দিল আপনার কঠোর ব্রতের মধ্যে। অচিরা ভবতোষকে ভালোবাসিয়াছিল সত্য ; কিন্তু এখন ভবতোষ ভাসিয়া গিয়াছে, আছে ভালোবাসা—যে ভালোবাসা ইম্‌পার্সোনাল। এখন অচিরার আধারের দরকার নাই। গল্পটির সঙ্গে তুলনীয় কয়েকমাস আগে মংপুতে লেখা 'পরিচয়' কবিতাটি (সানাই)।

কবিতার মধ্যে গুরু লঘু দুইই আছে, 'সানাই'-এ যে কবিতাটি 'কর্ণধার' নামে দেখা যায়, প্রবাসীর অগ্রহায়ণ (১৩৪৬) সংখ্যায় 'লীলা' (মংপু ১৯৩৯ অক্টোবর ১৪) নামে সেইটি প্রথম প্রকাশিত হয়। তার পূর্বে ও পরে ইহার রূপের

১ অমিয় চক্রবর্তীকে পত্র, ৬ অক্টোবর ১৯৩৯ কবিতা ১৩৫০ আশ্বিন। 'ছোটো গল্প' নামে 'দেশ' পত্রিকায় ১৩৪৬ অগ্রহায়ণ ৩০ প্রকাশিত হয়। পরে অনেক সংস্কার করিয়া 'শনিবারের চিঠি'তে (১৩৪৬ ফাল্গুন) প্রকাশিত হয় ; তখন সেটির নাম দেন 'শেষ কথা'। দ্র তিনসঙ্গী র-র ২৫শ।

২ পরিমল গোস্বামী, রবীন্দ্রনাথের তিনসঙ্গী, প্রবাসী ১৩৪৮ জ্যৈষ্ঠ।

ও রসের কত যে বদল হইয়াছিল তার ইতিহাস আছে 'মংপুতে রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থে। মৈত্রেয়ী দেবী লিখিতেছেন, 'কয়েক মাস পরে তার যে সংস্করণ 'সানাই'তে প্রকাশ হ'ল তাকে আর চেনবার জো নেই।'[১] সম্পূর্ণ পৃথক্ সুরের কবিতা 'নারীর কর্তব্য', 'আন্নাকালী পাকড়াশী' ছদ্ম স্বাক্ষরে 'অলকা'[২] পত্রিকায় (১৩৪৬ অগ্র) বাহির হয়।[৩]

মেদিনীপুরে ও পরে

মংপুতে প্রায় দুই মাস বাস করিয়া কবি ১১ নভেম্বর (১৯৩৯) শান্তিনিকেতন ফিরিলেন। বিদ্যালয় খুলিয়াছে; সেখানে ভাঙাগড়া, অদলবদল চলিতেছে। মনে হইতেছে ঠিক মনের মতো রূপ লইতেছে না, ভাবিতেছেন লোক বদল করিলেই তাঁহার মনের মতো জিনিসটি গড়িয়া উঠিবে। কিন্তু বাধা যে কত এবং কী জটিল (subtle) তাহার ঐতিহাসিক ও মনস্তাত্ত্বিক বিচার সময় সাপেক্ষ।

যাহাই হউক, এবার পাঠভবনের অধ্যক্ষতা প্রমদারঞ্জন ঘোষের নিকট হইতে লইয়া কৃষ্ণ কৃপালনীর উপর ন্যস্ত হইল (১৫ নভেম্বর); এ সময়টা না স্কুলের শেষ, না কলেজের আরম্ভ। কবির ইচ্ছা আগামী বৎসরের শুরু হইতেই যেন কার্য সুচারুরূপে নূতনভাবে চলে। কৃষ্ণ কৃপালনী বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পঠনপাঠন নিয়মাবলী সম্বন্ধে তেমন ওয়াকিবহাল ছিলেন না; তবে প্রখর বুদ্ধিবলে অল্প সময়ের মধ্যে আয়ত্ত করিয়া লইতে সমর্থক হন।

প্রমদারঞ্জন দীর্ঘকাল শিক্ষা ও পাঠভবনের অধ্যক্ষতা করিয়াছিলেন। প্রমদারঞ্জনের ন্যায় নিষ্ঠাবান, নির্ভীক অথচ রবীন্দ্রনাথের ও আশ্রমের আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধাশীল কর্মী দুর্লভ। বিধিবহির্ভূত কোনো কাজ তাঁহাকে দিয়া করানো সহজ ছিল না বলিয়া কর্তৃপক্ষের ক্ষণে ক্ষণে অসুবিধা হইত। তিনি ধর্মের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া কর্ম করিতেন, তাই আমাদের ন্যায় প্রাকৃত ধর্মবুদ্ধিসম্পন্নদের অসুবিধা হইত।

কবির আটাত্তর বৎসর বয়স; এখনো কাজের ফরমাইশ হইতে আপনাকে মুক্ত করিতে পারিতেছেন না। তাই খানিকটা লোকের মনোরঞ্জনার্থে, খানিকটা বাহির জগতকে দেখিবার কৌতূহল নিবারণার্থে এই বয়সেও বাহিরের আহ্বানে সাড়া দিলেন।

এবার আহ্বান আসিয়াছে মেদিনীপুর হইতে। তৎকালীন জেলা-ম্যাজিস্ট্রেট বিনয়রঞ্জন সেন (B. R. Sen, I.C.S)-এর চেষ্টায় সেখানে বিদ্যাসাগর স্মৃতি-মন্দির নির্মিত হইয়াছে—সেইটির দ্বার উন্মোচন করিবার জন্য কবির নিমন্ত্রণ। বিনয়রঞ্জনের চেষ্টায় বিদ্যাসাগরের গ্রন্থাবলী প্রকাশ করিবার জন্য যে তহবিল সংগৃহীত হয়, তাহা বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের হস্তে সমর্পিত হয়; সজনীকান্ত ও ব্রজেন্দ্রনাথের যুগ্মসাধনায় বিদ্যাসাগর-গ্রন্থাবলী প্রকাশিত হইয়াছে। কয়েক মাস পূর্বে মেদিনীপুরে বিদ্যাসাগর স্মৃতি সংরক্ষণ সমিতির উদ্দেশে কবি একটি বাণী পাঠাইয়াছিলেন (২৪ ভাদ্র ১৩৪৫)। এবার দ্বারোদ্‌ঘাটন উৎসবের জন্য একটি ভাষণ লিখিয়াছিলেন (১৯৩৯ নভেম্বর ২৮)।[৪]

১ রবীন্দ্ররচনাবলী ২৪ পৃ ৪৭৬-৭৯।

২ 'অলকা' পত্রিকা প্রমথ চৌধুরীর সম্পাদকত্বে বাহির হইতেছিল।

৩ রবীন্দ্রভবনের পাণ্ডুলিপির সংক্ষিপ্ত নির্দেশ অনুসারে মনে হয়, উহা ১৩৪৬ কার্তিক ৫ (১৯৩৯ অক্টোবর ২২) বিজয়াদশমীর দিন কলিকাতা উল্টোডিঙির শ্রীমতী নবরানী হালদারকে প্রেরিত হইয়াছিল। র-র ২৩ গ্রন্থপরিচয় পৃ ৫৩৭।

৪ ২৭ নভেম্বর ১৯৩৯ অমিয়চন্দ্রকে লিখিতেছেন, "বিদ্যাসাগরের স্মৃতিসভার জন্য লিখতে বসেছি"।

কবি (১৫ ডিসেম্বর) মেদিনীপুর যাত্রা করেন, সঙ্গে কৃষ্ণ কৃপালনী, অনিলকুমার চন্দ, সুধাকান্ত রায়চৌধুরী, ও শচী রায়। হাওড়ায় তাঁহাকে স্বাগত করিবার জন্য বি. আর. সেনের দূতরূপে আসেন রঘুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় নামে একজন যুবক ম্যাজিস্ট্রেট। সেইদিন কলিকাতা কর্পোরেশনের উদ্যোগে খাদ্য ও পুষ্টি প্রদর্শনী (Food and nutrition exhibition)। রবীন্দ্রনাথ ঐ প্রদর্শনী উন্মোচন করিবেন, তাঁহাকে স্টেশনে স্বাগত করিতে আসিলেন মেয়র নিশীথ সেন, কলিকাতা হাইকোর্টের লব্ধপ্রতিষ্ঠিত ব্যারিস্টার।

কবি উৎসবক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া 'খাদ্য ও পুষ্টি' সম্বন্ধে ক্ষুদ্র একটি ভাষণ পাঠ করেন। কবি এই ভাষণে বলেন, "আহার্যের অপূর্ণতাবশত দীর্ঘকাল হ'তে আমাদের প্রাণসম্বলের ক্ষয় হয়েছে এবং নিরন্তর হ'তে চলেছে সে-কথা এতদিন ভুলে ছিলুম, কিন্তু আর ভুললে চলবে না। যে সকল জাতি প্রবল শক্তিমান তাদের সঙ্গে সকল বিষয়েই আমাদের প্রতিযোগিতার সময় এসেছে। জীবিকার ক্ষেত্রেও আমরা ছোটোবড়ো সকল দিক থেকে হটে যাচ্ছি।"

কবি অত্যন্ত আপসোস করিয়া বলেন যে ভারতের সকল জাতির খাদ্যবিশ্লেষণ-তালিকায় দেখা যায় বাঙালির খাদ্য পুষ্টিকরতার গুণে প্রায় সকলের নিচের কোঠায়। বাঙালির কলে-ছাটা সাদা চাউল ও ফেন বা কাঞ্জি-ফেলা ভাত খাওয়ার সমালোচনা করিয়া কবি বলেন, "স্বজাতির আয়ুক্ষয় নিবারণ লক্ষ্য করে নিজেদের অভ্যাসের সঙ্গে রুচির সঙ্গে লড়াই করতে যারা না পারে তারা নিজের বিদেশী শত্রুভাগ্য নিয়ে বিলাপ পরিতাপ করতে যেন লজ্জাবোধ করে।[১] বলা বাহুল্য কবির এই উপদেশ কবি-প্রলাপ বলিয়া দেশবাসী শুনিবার প্রয়োজন বোধ করে নাই। এমন কি তাঁহার প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ে বহু চেষ্টা করিয়াও আহারের অভ্যাস বদলাইতে পারেন নাই।

কবি এই উৎসব সম্পন্ন করিয়া হাওড়ায় ফিরিয়া আসিলেন; বি. এন্. রেলওয়ে কবির জন্য বিশেষ সেলুনের ব্যবস্থা করিয়া রাখেন। ইতিমধ্যে সুভাষচন্দ্র বসু স্টেশনেই কবির সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। কন্‌গ্রেস হাই কমান্ডের সহিত মতানৈক্য হওয়ায় সুভাষ কন্‌গ্রেস হইতে চার মাস পূর্বে বহিষ্কৃত হইয়াছিলেন (১৯৩৯ অগস্ট)। রবীন্দ্রনাথ সুভাষচন্দ্রের নিকট হইতে দেশের সমসাময়িক অবস্থা ও লোকের মনোভাবের একটা চিত্র পাইয়াছিলেন। কবির সহিত একান্তে সুভাষের কথাবার্তা যাহাতে না-হয় তজ্জন্য একটু চেষ্টা হইয়াছিল বলিয়া শুনিয়াছি। কিন্তু কবি সুভাষের সহিত দীর্ঘ আলোচনা করেন। এই মোলাকাতের কোনো প্রতিবেদন প্রকাশিত হয় নাই। ব্যাপারটা এইখানে শেষ হইল না।

১৫ ডিসেম্বর (১৩৪৬ অগ্রহায়ণ ২৯) রাত্রি দশটার সময় রবীন্দ্রনাথ মেদিনীপুর পৌঁছিলেন। স্টেশনে এই শীতের রাত্রে কবিকে দেখিবার জন্য বহু সহস্র লোকের সমাগম হয়। জনতার মধ্যে কয়েকজন শ্বেতাঙ্গকেও দেখা যায়। সংবর্ধনাকারীদের মধ্যে মহিষাদলের রাজকুমার, জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বিনয়রঞ্জন সেন, জেলা জজ এস. এন. গুহরায়, রায়বাহাদুর দেবেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য, এস. ডি. ও. বি. কে. আচার্য, এ মনীষীনাথ বসু, ক্ষিতীশচন্দ্র চক্রবর্তী ও চিত্তরঞ্জন রায় প্রভৃতি বহু গণ্যমান্য লোক ছিলেন।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে একই ট্রেনে করিয়া যাঁহারা মেদিনীপুরে আসিলেন তাঁহাদের মধ্যে স্যর যদুনাথ সরকার, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, ডাঃ রঘুবীর সিং, ক্ষিতিমোহন সেন, অমিয়চন্দ্র চক্রবর্তী, সজনীকান্ত দাস, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়-এর নাম উল্লেখযোগ্য।

১৬ ডিসেম্বর শনিবার সকাল ৮ঘটিকায় শোভাযাত্রাসহকারে রবীন্দ্রনাথ বিদ্যাসাগর-স্মৃতি-মন্দিরে উপনীত

১ খাদ্য ও পুষ্টি ।১৫।১২।৩৯। কলিকাতা পৌর পরিষদের অনুষ্ঠিত খাদ্য ও পুষ্টি সম্পর্কীয় প্রদর্শনীতে পঠিত, প্রবাসী ১৩৪৬ পৌষ পৃ ৪১৮-১৯।

হইলেন। স্মৃতিরক্ষা-সমিতির পক্ষ হইতে তাঁহাকে স্বাগতসম্ভাষণ জানাইবার পর তিনি স্মৃতমন্দিরের দ্বারোদ্‌ঘাটন করেন। এই উপলক্ষ্যে তিনি যে বক্তৃতা দিয়েছিলেন তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল :

"...আজ বিশেষ করে মনে করিয়ে দেবার দিন এল যে, সৃষ্টিকর্তারূপে বিদ্যাসাগরের যে স্মরণীয়তা আজও বাংলা ভাষার মধ্যে সজীব শক্তিতে সঞ্চারিত, তাকে নানা নব নব পরিণতির অন্তরাল অতিক্রম করে সম্মানের অর্ঘ্য নিবেদন করা বাঙালির নিত্যকৃত্যের মধ্যে যেন গণ্য হয়। সেই কর্তব্যপালনের সুযোগ ঘটাবার জন্যে বিদ্যাসাগরের জন্মপ্রদেশে এই যে মন্দিরের প্রতিষ্ঠা হয়েছে, সর্বসাধারণের উদ্দেশে আমি তার দ্বার উদ্‌ঘাটন করি। পুণ্যস্মৃতি বিদ্যাসাগরের সম্মাননার অনুষ্ঠানে আমাকে যে সম্মানের পদে আহ্বান করা হয়েছে, তার একটি বিশেষ সার্থকতা আছে। কারণ এই সঙ্গে আমার স্মরণ করবার এই উপলক্ষ্য ঘটল যে, বঙ্গসাহিত্যে আমার কৃতিত্ব দেশের লোকে যদি স্বীকার করে থাকেন, তবে আমি যেন স্বীকার করি, একদা তার দ্বার উদ্‌ঘাটন করেছেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।..."

১৭ ডিসেম্বর স্মৃতিমন্দির-প্রাঙ্গণে রবীন্দ্রনাথের সংবর্ধনা-সভার আয়োজন করিলেন মেদিনীপুর পৌরসভা, মেদিনীপুর জেলাবোর্ড ও বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের মেদিনীপুর শাখার সদস্যবৃন্দ।

প্রারম্ভে 'জন-গণ-মন-অধিনায়ক' সংগীত গীত হইবার পর পৌরসভার পক্ষ হইতে দেবেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য একখানি অভিনন্দনপত্র পাঠ করিয়া শুনাইলেন এবং অর্ঘ্যস্বরূপ উহা সুদৃশ্য আধারে স্থাপন করিয়া কবিগুরুকে প্রদান করিলেন। তাহার পর জেলাবোর্ডের পক্ষ হইতে এবং সাহিত্যপরিষদের পক্ষ হইতে আরও দুইখানি মানপত্র পঠিত হয়। মানপত্রদ্বয় কবিগুরুকে অর্ঘ্যস্বরূপ প্রদত্ত হইল।[১]

মেদিনীপুর হইতে কবি ফিরিলেন—মনের মধ্যে দেশের রাজনৈতিক ও বিশেষভাবে কন্‌গ্রেসের মধ্যে ভাঙনের ব্যাপার লইয়া অত্যন্ত চিন্তাকুল। শান্তিনিকেতনে ফিরিয়াই কবি মহাত্মাজিকে টেলিগ্রাম যোগে অনুরোধ করিলেন যে, দেশের ও বিশেষভাবে বাংলাদেশের রাজনৈতিক অবস্থা বিবেচনা করিয়া সুভাষকে কন্‌গ্রেসে ফিরাইয়া লইলে দেশের মঙ্গল হইবে। মহাত্মাজি, কবিকে তদুত্তরে জানান যে কন্‌গ্রেস হাইকমান্ড সমস্ত বুঝিয়া সুঝিয়াই এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন ; সুভাষের উপর হইতে নিষেধ (ban) উঠাইয়া লওয়া হইবে যদি তিনি কন্‌গ্রেসের শাসন (discipline) মানেন। কয়েকদিন পরে মহাত্মাজি মিঃ এনড্রুসকেও এইবিষয়ে পত্র দিয়া বলেন যে সুভাষ পরিবারের 'আব্দারে ছেলে' (spoilt child)-র ন্যায় ব্যবহার করিতেছেন ; গুরুদেবের পক্ষে এইসব জটিল ব্যাপার সমাধান করা কঠিন।

গান্ধীজিকে কবির টেলিগ্রাম (১৯৩৯ ডিসেম্বর ২০) : "Owing gravely critical situation all over India and especially in Bengal would urge Congress Working Committee immediately remove ban against Subhas and invite his cordial co-operation in supreme interest national unity."

বরধা হইতে গান্ধীজির উত্তর (১৯৩৯ ডিসেম্বর ২২) : "Your wire was considered by Working Committee. With knowledge they have they are unable lift ban. My personal opinion is you should advice Subhasbabu submit discipline if ban is to be removed. Hope you are well".

১ দ্র দৈনিক ভারত, ২রা পৌষ সোমবার ১৩৪৬। ১৮ ডিসেম্বর, ১৯৩৯, বিদ্যাসাগরস্মৃতিসংরক্ষণ সমিতির নিবেদন, পুস্তিকা, বাংলা ১৩৪৬ অগ্রহায়ণ ৩০, বিদ্যাসাগরস্মৃতিমন্দির প্রবেশ উৎসব, কার্যসূচী, বিদ্যাসাগরস্মৃতিমন্দির প্রবেশ উৎসব, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের বাণী, ১৩৪৬ পৌষ ৩০।

এনড্রুসকে লিখিত গান্ধীজির পত্র (১৯৪০ জানুয়ারি ১৫): "If you think it proper tell Gurudev that I have never ceased to think of his wire and anxiety about Bengal. I feel that Subhas is behaving like a spoilt child of the family. The only way to make up with him is to open his eyes. And then his politics show sharp differences. They seem to be unbridgeable. I am quite clear the matter is too complicated for Gurudev to handle. Let him trust that no one in the committee has anything personal against Subhas. For me, he is as my son. I hope you are well. Love."[১]

মেদিনীপুর হইতে ফিরিবার অব্যবহিত পরেই পৌষ উৎসব। এই উৎসবের জন্য 'অন্তর্দেবতা'শীর্ষক[২] ভাষণ লিখিত হয় (প্রবাসী ১৩৪৬ মাঘ)। এই ভাষণে কবির মনে আজ এই কথাই জাগিতেছে—What man has made of man—আজ জগতে কী প্রলয়ংকর যুদ্ধের সূচনা হইয়াছে। স্থানিক যুদ্ধ বিশ্বব্যাপী হইয়া উঠিল—এ বেদনা কবিকে বড়ই পীড়িত করিতেছে। কবির মনের প্রশ্ন—'কে জাগালে সেই লড়াইকে'। নিজেই উত্তরে বলিতেছেন, "বিশ্বের অপমানিত কল্যাণশক্তি। এই অপমান বহুকাল ধ'রে সঞ্চিত হয়ে উঠেছিল দূরপ্রসারিত প্রতাপের আশ্রয়ে, স্তরে স্তরে পুঞ্জীভূত ঐশ্বর্যের অন্তরালে। রিপুর থেকে রিপুকে জাগাল, লোভের থেকে ঈর্ষাকে।...মানুষের পরস্পরের মধ্যে যাতায়াতের সহজ পথ আজ উত্তরোত্তর দুর্গম ক'রে তোলা হচ্ছে, এবং মানবসমাজে এই কাঁটার বেড়া দেওয়া অনাতিথ্যের অনাত্মীয়তা যে ক্রমশ প্রবর্ধমান অসভ্যতার প্রমাণরূপে কুশ্রী হয়ে উঠল, অসংকোচে সে-কথা মানুষ ভুলে যাচ্ছে। এইসব মৃত্যুভারবাহক দুর্লক্ষণ আর গোপন থাকছে না, তার কারণ এই যে ইতিহাসের প্রহরীশালায় কল্যাণধর্মের দণ্ডনীতি উদ্যত।...পৃথিবীতে অনেক জাতি মরেছে, হয় দুর্বলতার অপরাধে, নয় বলদৃপ্ত প্রবলতার পাপে।..."

আমাদের ধর্মশাস্ত্রে বলে, 'রুদ্র বলহীনকে ক্ষমা করেন না।' দুর্বলের অভিমান কবির কাছে অসহ্য। মানুষ চিরদিন দুঃখকে বরণ করিয়াছে স্বেচ্ছায়। "সে কোন্ মহাশক্তির সাধনায়? সে শক্তি প্রাকৃতিক নয়, মানসিক নয় সে আত্মিক। আপনার মধ্যে যখন সেই মহত্ত্বের উপলব্ধি করে তখন সে কোনো ত্যাগে ক্লেশে দীনাত্মার মতো শোক করে না।" ইহাই হইতেছে এই জগৎব্যাপী অশান্তির দিনে কবির অন্তর্দেবতার বাণী।

কবির এই অন্তর্বেদনা প্রকাশ পাইয়াছে 'বড়দিন' কবিতায় খৃস্ট-স্মরণে। বিশ্বব্যাপী যুদ্ধায়োজনে সকলেই দেবতার দোহাই পাড়িতেছে—তাহারা দেবতার নামে নরহত্যা করিয়া দেবতার আশীর্বাদ মাগিতেছে। কবি নিরতিশয় কাতর হইয়া লিখিতেছেন :

> একদিন যারা মেরেছিল তাঁরে গিয়ে
> রাজার দোহাই দিয়ে,
> এ যুগে তারাই জন্ম নিয়েছে আজি
> মন্দিরে তারা এসেছে ভক্ত সাজি ;
> ঘাতক সৈন্যে ডাকি'
> মারো মারো উঠে হাঁকি।[৩]

১ এইসব টেলিগ্রাম ও পত্রাদি রবীন্দ্র-সদনে আছে।

২ "For the first time Gurudeva had written out his message and had it printed beforehand though the inspiration of the moment carried him much beyond the limitations of the written word." V. B. News 1940 Jan.

৩ প্রবাসী ১৩৪৬ মাঘ পৃ ৫২৯, ইংরেজি অনুবাদ ২৫-১২-৩৯ ; দ্র V. B. News VIII 1940 Jan. ; দ্র গীতবিতান।

এবারকার খৃস্টউৎসবের দিন এন্‌ড্রুস মন্দিরে উপাসনা করিলেন, এইটি আশ্রমে তাঁহার শেষ ভাষণ। এই দিন কবির রচিত গানটিও গীত হয়।

চারিদিকের যুদ্ধায়োজন এবং দেশের রাজনৈতিক ও সাম্প্রদায়িক অশান্তির মধ্যে মনের শান্তভাব ও মনুষ্যত্বের 'পরে বিশ্বাস রক্ষা করা ক্রমেই কঠিন হইয়া উঠিতেছে। কিন্তু সম্পূর্ণরূপে আস্থা হারানো কবির পক্ষে সম্ভব নহে যখন দেখেন মানুষের মধ্যে মুষ্টিমেয় মহতের দল আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধা রক্ষা করিয়া বিদ্রূপ ও বিপদকে বরণ করিতে দ্বিধাবোধ করিতেছে না। এলমহার্স্টের নিকট হইতে European Order and World (publisher P. E. P) নামে একখানি পুস্তিকা পাইয়া লিখিতেছেন, "I can realise...that the best minds of Europe are being put to a severe test, that they have the sanction of the peoples of Europe in trying to formulate a Federal Union which will unite the peoples in spite of the ringleaders of blind nationalism, who, sitting safely in the citadels of power, send the youth of the land to destroy each other on the battlefield."

জগৎব্যাপী সমস্যা সম্বন্ধে যাহাই বলুন,—ভারতবর্ষের বিচিত্র সমস্যা প্রতিনিয়ত কবির মনকে পীড়িত করিতেছে। ভারতের এই-যে সব manufactured complexities যেগুলির উদ্ভাবক হইয়াছে interested groups led by ambition and outside instigation—তাহার সমাধান কিভাবে করা যায় এই হইতেছে প্রশ্ন। কবির ইচ্ছা য়ুরোপ-আমেরিকার ও ভারতের শ্রেষ্ঠ মনীষিগণ মিলিত হইয়া সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করিয়া ভারতের কল্যাণপথ নির্দেশ করুন। তবে সেকাজে পোলিটিশিয়ানের প্রয়োজন নাই, ভাবুক সমাজের প্রয়োজন।[১] নেভিন্‌সনকে কবি এই কথাই লেখেন অন্যভাবে কয়েকদিন পরে।

এই সময়ের কাছাকাছি (১৯৩৯ ডিসেম্বর ২১) চীন হইতে আসেন শিল্পী জু পেয়ঁ (Ju Peon)। কলাভবনে তাঁহার যে সংবর্ধনা হয় তাহাতে রবীন্দ্রনাথ উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে স্বাগত করেন।[২]

১ World Order. V. B. News VIII 1940 Jan. p 53-54.

২ V. B. News 1940 Feb. p 58 শান্তিনিকেতনে শিল্পী জু পেয়ঁ—ডক্টর শ্রীকালিদাস নাগ, প্রবাসী ১৩৪৬ মাঘ পৃ ৫৫৩-৫৬ (সচিত্র)
[জু পেয়ঁ-জন্ম ১৮৯৪ মে,—মৃত্যু ১৯৫১ ডিসেম্বর]

গান্ধীজি শান্তিনিকেতনে ১৯৪০

মনের পরিবেশের সম্পূর্ণ বদল হইয়া গেল—বাড়িতে বিবাহ। রথীন্দ্রনাথের পালিতা কন্যা নন্দিনীর[১] বিবাহ (১৯৩৯ ডিসেম্বর ৩০)। বিবাহোৎসবে[২] বিপুল আড়ম্বর হয়, কবি আছেন 'উদীচী' নামে নূতন বাড়িতে। 'পুনশ্চ'র পরে রাস্তার ধারে দ্বিতল এই বাড়িটি বিশ্বভারতীর আচার্যের জন্য বিশ্বভারতী হইতে নির্মিত হইয়াছিল। এই বাড়ির নাম সরকারীভাবে দাঁড়াইয়া গিয়াছে উদীচী। কবি কখনো লিখিয়াছেন সেঁজুতি কখনো বা চামেলি। কবি আপন মনে পড়াশুনা লইয়া আছেন; চারিদিকে কোলাহল; মাঝে মাঝে আলিহোসেনের সানাই-এর সুর ভাসিয়া আসিতেছে—'সমস্ত এ ছন্দভাঙা অসংগতি মাঝে সানাই লাগায় তার সারঙের তান'।[৩] সানাই-এর সুরে আগমনীর গান জাগাইয়া তোলে কবিচিত্তে নিজ জীবনের 'শেষ বেলার ছবি।'[৪] অতীত জীবনকথা অকস্মাৎ কানে-আসা সানাই-এর সুরে কি আজ জাগিল? কে জানে? তাই যেন লিখিতেছেন:

> এল বেলা পাতা ঝরাবারে
> শীর্ণ বলিত কায়া, আজ শুধু ভাঙা ছায়া
> মেলে দিতে পারে।
>
> একদিন ডাল ছিল ফুলে ফুলে ভরা
> নানা-রং-করা।

সানাইএর গান ও কবিতা[৫] লেখা, বিচিত্র সামাজিক কর্তব্য পালন ও তৎসঙ্গে প্রয়োজনের তাগিদে দুইএকটি গদ্য প্রবন্ধ রচনা চলিতেছে। এই সময়ে প্রমথ চৌধুরী সম্পাদিত 'অলকা'র জন্য ফিন্‌ল্যাণ্ড সম্বন্ধে একটা 'বিবরণ সংগ্রহ করে' প্রবন্ধ লেখেন।[৬]

১ নন্দিনীর পিতা কচ্ছ দেশীয় বণিক, নাম চতুর্ভুজ। ১৯২১ সালে তিনি সপরিবারে শান্তিনিকেতনে আসেন; পুরাতন 'প্রাক্তনী'র গৃহে (গুরুপল্লী যাইতে বাম দিকে বর্তমান চীনা ভবনের কাছে) চতুর্ভুজ প্রথমে থাকেন। তারপর মাঠের মধ্যে একটি গৃহ নির্মাণ করেন; সেই গৃহে বর্তমানে ডাক্তার শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বাস করেন। তখন রতনকুঠি ও ঐ বাড়িটি ছাড়া অন্য কোনো ঘরবাড়ি ওদিকে ছিল না। যাহাই হউক পুরাতন প্রাক্তনীতে যখন চতুর্ভুজরা বাস করিতেছেন সেই সময়ে প্রতিমা দেবীর দৃষ্টি এই পরিবারের প্রতি পড়ে। চতুর্ভুজের পত্নী ছিলেন উন্মাদ রোগগ্রস্তা, প্রতিমা দেবী শিশুটিকে লইয়া গিয়া লালনপালন করেন। বহুকাল নন্দিনী জানিত প্রতিমা দেবীই তাহার গর্ভধারিণী জননী। রবীন্দ্রনাথের বহু কবিতা গল্প নন্দিনীর জন্য বা ইহাকে কেন্দ্র করিয়া লিখিত হয়। কন্যার ডাক নাম পুপে, পুপু ইত্যাদি।

২ নন্দিনী-অজিতের বিবাহ। "তোমরা দুজনে একমনা"-প্রবাসী ১৩৪৮ কার্তিক। বোম্বাই-এর অজিতসিং মোরারজি খাটাউ-এর সহিত বিবাহ হয়। এই বিবাহ উপলক্ষ্যে কবি ১৩৪৬ পৌষ ১৪ (১৯৩৯ ডিসেম্বর ৩০) নিম্নলিখিত গান তিনটি রচনা করেন: নবজীবনের যাত্রাপথে দাও দাও এই বর; প্রেমের মিলনদিনে সত্য সাক্ষী যিনি; সুমঙ্গলী বধূ সঞ্চিত রেখো প্রাণে স্নেহমধু (গীতবিতান ২য় সং পৃ ৮৫৫-৫৬)।

৩ ১৯৪০ জানুয়ারি ৪, সানাই; র-র ২৪ পৃ ৮১-৮৩।

৪ শেষবেলা, ১১ জানুয়ারি ১৯৪০, নবজাতক; র-র ২৪ পৃ ৬০-৬১।

৫ নিম্নে এই সময়ের কবিতা ও গানের তালিকা প্রদত্ত হইল: ৪ জানুয়ারি ১৯৪০। সানাই··· সানাই র-র ২৪ পৃ ৮১। ১০ই জানুয়ারি। রূপকথায় "কোথাও আমার হারিয়ে" পৃ ৯২। আহ্বান "জ্বেলে দিয়ে যাও" পৃ ৯৩। পূর্ণা "তুমি গো পঞ্চদশী" প ৮৪। দেওয়া-নেওয়া "বাদল দিনের প্রথম কদমফুল" পৃ ৮৪। ১১ই জানুয়ারি—শেষবেলা (কবিতা) নবজাতক পৃ ৬০। ১২ জানুয়ারি— শেষদৃষ্টি (কবিতা) নবজাতক পৃ ৭। ১৩ই জানুয়ারি— অনাবৃষ্টি "প্রাণের সাধন করি নিবেদন" সানাই পৃ ৭৬, "অধরা মাধুরী ধরা পড়িয়াছে" সানাই পৃ ৭৮ নতুন রঙ-"এ ধূসর জীবনের গোধূলি" সানাই পৃ ৭৭, ব্যথিতা "জাগায়ো না, ওরে জাগায়ো না" সানাই পৃ ৭৯। ১৫ই জানুয়ারি—জানালায় "বেলা হয়ে গেল" সানাই পৃ ৭৪-৭৫, ক্ষণিক "এ চিকন তব লাবণ্য" সানাই পৃ ৭৫-৭৬, দ্বিধা "এসেছিলে তবু আস নাই", সানাই পৃ ১০২, আধোজাগা, "রাত্রে কখন মনে হল যেন," সানাই পৃ ১০৩। ২০শে জানুয়ারি—ছড়া (৮) "রাত্তিরে কেন হল মর্জি" র-র ২৬ পৃ ২৬-৩০। ২১শে জানুয়ারি—বিপ্লব "ডমরুতে নটরাজ বাজালেন"— সানাই [১৬-১-৪০ এ প্রথম খসড়া হয়। র-র ২৪ পৃ ৭১-৭৩ পৃ ৪৮১]। ২৮শে জানুয়ারি—রূপ-বিরূপ, "এই মোর জীবনের মহাদেশ" নবজাতক র-র পৃ ৬২-৬৩। কর্ণধার. "ওগো আমার প্রাণের কর্ণধার" সানাই পৃ ৬৮-৭০।

৬ চিঠিপত্র ৫ম, পত্র ১৩২।১০ জানুয়ারি ১৯৪০; পত্র ১৩৩, ১৯৪৫ জানুয়ারি ১৩ পৃ ৩১২-১৩; অলকা দ্বিতীয় বর্ষ ১৩৪৬ মাঘ পৃ ৩৮৭-৮৮।

হঠাৎ কবি কেন ফিন্‌ল্যান্ড সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখিতে গেলেন, তাহার কারণ সম্বন্ধে আমরা পরিশিষ্টে আলোচনা করিব। এই প্রবন্ধ শেষে রবীন্দ্রনাথ বলেন, "রাশিয়া এই অসমকক্ষ দ্বন্দ্বে জিতলেও তার লজ্জা ঘুচবে না।" এই সময়ে অমলা দেবীর 'মনোরমা' নামে গল্পের বই কবির হাতে পড়ে; বইখানি পড়িয়া লিখিতেছেন[১] "এই বইখানিতে অনেকগুলি গল্প যা নিষ্ঠুর। তাকে মনোরম বলা যায় না। ফিন্‌ল্যাণ্ডের উপর সোভিয়েটের বোমা নিক্ষেপের বিবরণ হৃদয়ভেদী কিন্তু হৃদ্য নয়। তবু প্রতিদিন তীব্র ঔৎসুক্যের সঙ্গে খবরের কাগজ খুলে দেখি দানবিকতার শল্য মানব ইতিহাসের মর্মস্থলে কতদূর পর্যন্ত পৌঁছল।" কয়েকমাস পরে কালিম্পঙে লিখিত 'অপঘাত' (১৩৪৭ জ্যৈষ্ঠ ১) কবিতার মধ্যে শেষ দুই পংক্তিতে পাই—"টেলিগ্রাম এল সেই ক্ষণে ফিন্‌ল্যাণ্ড চূর্ণ হল সোভিয়েট বোমার বর্ষণে।"

১৯৩৯ সালের ৩০ নভেম্বর রাশিয়া ফিন্‌ল্যাণ্ড আক্রমণ করিয়াছিল—জারমেনির সঙ্গে ব্রিটেন ও ফ্রান্সের যুদ্ধ আরম্ভের তিন মাস পরে। আর রুশিয়ার সঙ্গে যুদ্ধ শুরু হয় উনিশ মাস পরে। ঘটনার দিক হইতে একটি সংবাদ উল্লেখযোগ্য। জানুয়ারি মাসের মাঝামাঝি সময়ে (১৭ই) চীনা বৌদ্ধ পণ্ডিত তাই-সু (Tai-shu) কয়েক জন সঙ্গীসহ শান্তিনিকেতনে আসিলেন। ইঁহারা ভারতে goodwill mission লইয়া আসিয়াছেন, রবীন্দ্রনাথ আম্রকুঞ্জে এই অতিথিদের অভ্যর্থনা করিয়া বলেন, "The ancient friendship between China and India might be revived by contact in the realms of spirit and culture." বৌদ্ধ আচার্য বলেন, 'প্রভু বুদ্ধ ভারতীয় জীবনে এক নূতন ভাব-বন্যা আনিয়াছিলেন। বর্তমান ভারতে বৈষয়িক ও আধ্যাত্মিক জীবনের যে সুন্দর সমন্বয় হইয়াছে, কবি রবীন্দ্রনাথ তাহার মূর্ত প্রতীক।'[২]

কয়েকদিন পরেই শান্তিনিকেতনে মাঘোৎসব। রবীন্দ্রনাথ এই দিনের জন্য 'পূর্বের সাধনা' শীর্ষক ভাষণ লিখিয়াছিলেন (১৩৪৬ মাঘ ৯)। এই ভাষণে তিনি বলেন, "এযুগকে বলে বৈজ্ঞানিক যুগ। বিজ্ঞানবুদ্ধির পরিচালনায় মানুষের মন আজ এসে পড়েছে প্রাকৃত জগতের অপরিসীম বাস্তবলোকে।" আমরা পূর্বে বলিবার চেষ্টা করিয়াছি যে রবীন্দ্রনাথের ধর্মসংজ্ঞা ক্রমেই অভিব্যক্ত হইয়া আসিতেছে। আধুনিক জীবনে ধর্ম বলিতে কী বুঝায় সে সম্বন্ধে তাঁহার ধারণা আজ জীবনসন্ধ্যায় অতি স্বচ্ছ; বিজ্ঞান ও আধ্যাত্মিকতার মধ্যে বিরোধ তাঁহার সাধনায় আজ নিশ্চিহ্ন। এই প্রবন্ধে কবি আদিম মানবের মনের উপর আরণ্য বাসভূমির প্রভাব সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া বলিতেছেন যে, "মানুষের মনও তার বাসস্থানের অনুরূপ ছিল; তার ভাবনা-চিন্তা ছিল জটিল বাধায় ছায়ান্ধকারে আবিল। তার বিশ্বজগতের ধারণা ছিল অনেকখানিই কল্পনা দিয়ে গড়ে তোলা, সবই যেন স্বপ্নের সৃষ্টি। সেই কল্পনা যতই অদ্ভুত অস্বাভাবিক ও বিকৃত হত ততই তার সভ্যতা সম্বন্ধে প্রত্যয় মনে চিহ্ন দিত জোরের সঙ্গে। আকস্মিক প্রাকৃতিক ঘটনাগুলি কোনো দৈবশক্তির খেয়াল থেকে অযৌক্তিক ভাবে দেখা দিয়েছে, আর সেগুলি যে আমাদেরই দণ্ডপুরস্কাররূপে বিহিত এ ছাড়া আর কোনো কারণ তারা ভাবতে পারত না।...

"দেবতা অকারণে পীড়নপ্রিয় এবং ঈর্ষান্বিত এই ধারণা দৃঢ় হয়েছিল প্রাকৃতিক ঘটনায় বারংবার অপ্রতিহার্য বিপৎপাত দেখে এবং সেই সকল অপঘাতের মধ্যে শ্রেয়োনীতির কোনো পরিচয় না পেয়ে। একথা মানুষ ভুলেছিল প্রকৃতির সঙ্গে আমাদের ব্যবহার বুদ্ধির, ধর্মানুষ্ঠানের নয়।...সে পদে পদে আপন অদৃশ্য শত্রুকে দেখেছে বিশেষ বারে, বিশেষ লগ্নে, বিশেষ গ্রহে, বিশেষ বাহ্য লক্ষণে এবং সেই শত্রুতার প্রতিকার কল্পনা করেছে এমন কোনো প্রক্রিয়ায় যার মধ্যে কোনো অর্থ নেই বুদ্ধির কোনো বিচার নেই। শাঁখঘণ্টা বাজিয়েছে বধিরতার কাছে, ছায়াকে তাড়না করেছে শিশুর মতো বিশ্বাসে।"

১ সমালোচনা, প্রবাসী ১৩৪৬ মাঘ।

২ V. B. News Vol No 8, 1940 Feb. ভারত ১৩৪৬ মাঘ ৪।

অবশেষে বিজ্ঞান মানুষের মনকে শৃঙ্খলমুক্ত করিতে আরম্ভ করিল। মানুষ ক্রমে ক্রমে বুঝিতে লাগিল যে প্রকৃতির সঙ্গে তাহার 'যোগ কোনো অলৌকিক শক্তির প্রসাদের অপেক্ষা করে না।' সমস্ত সভ্যদেশ সত্য প্রণালীতে প্রকৃতিকে জানার অধ্যবসায়ে প্রবৃত্ত হওয়ায় সম্মোহনের প্রতি তাহার দুর্বল ভীরু বুদ্ধির বিশ্বাস দূর হইতেছে। "কেবল ভারতবর্ষে আমাদের রক্তের মধ্যে এমন একটা মুগ্ধতা আছে যে শিক্ষা সত্ত্বেও প্রকৃতির ক্রিয়ার মধ্যে নিয়মের অমোঘতার প্রতি বিশ্বাস আমরা দৃঢ় রাখতে পারি নে, অন্ধসংস্কার আমাদের বুদ্ধিকে পরিহাস করতে থাকে জাদুর প্রলোভন দেখিয়ে। তাকেই আমরা সনাতন ধর্মবিধান বলে মনে করি, জানিনে এই হল তমসাচ্ছন্ন নাস্তিকতা।"

বিশ্বব্যাপারকে নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্ম মানুষ যেমন জাদুক্রিয়ার উপর নির্ভর করিয়াছিল, তেমনই আধ্যাত্মিক সাধনার ক্ষেত্রেও বাহ্যানুষ্ঠানের কৃচ্ছ্রসাধন প্রণালীর উপর তাহার বিশ্বাস ছিল দৃঢ়।

রবীন্দ্রনাথের মতে মানুষের এই আধ্যাত্মিক তামসিকতা হইতে মুক্তির বাণী আসে বুদ্ধদেবের নিকট হইতে। 'তপস্যায় কৃচ্ছ্রসাধনকে তিনি অস্বীকার করলেন।' ভারতবর্ষে জ্ঞানীরা বলেন যে "যথার্থ সাধনা উপকরণে নয়, কষ্টদায়ক কোনো প্রণালীতে নয়, সে সাধনা সত্যে ত্যাগে দয়ায় ক্ষমায়। এই সমস্ত চারিত্রগুণের সর্বপ্রধান ধর্ম এই যে এরা মানুষের সঙ্গে মানুষকে মেলায়। নইলে এদের আর কোনো অর্থই নেই। এই মিলনের সাধনাই মানুষের ধর্মসাধনা।" আমাদের শাস্ত্রে যোগের কথা আছে; সকলের সঙ্গে যোগের পথ তাহাতে নির্দেশ করা আছে করুণায় মৈত্রীতে ও অহিংসায়। "মানুষকে ছেড়ে কোনো দেবতাকে পাওয়ার কথা এ নয়, এ নয় পৃথিবীকে ছেড়ে দিয়ে স্বর্গের দিকে তাকানো।"

এই ভাষণের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ নিজের সাধনার কথার অতর্কিতভাবে আভাস দিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন, "আমি জানিনে কোনো বাহ্যপ্রক্রিয়া···আমি কেবল জানি মনের উপর বাণীর প্রভাব,···তেমন বাণী আমরা পেয়েছি আমাদের ঋষিদের কাছ থেকে, তাঁদের পরিপূর্ণ জীবনের ফলস্বরূপে। এ বাণী আমরা নির্বাচন ক'রে নিতে পারি নিজের স্বভাবের বিশেষ প্রবর্তনা থেকে। কোনো এক শুভক্ষণে আমি পেয়েছি আমার জীবনের মন্ত্র শান্তম্ শিবম্ অদ্বৈতম্। আমি চেষ্টা করি এই মন্ত্র আমার চিত্তের কুহরে ধ্বনিত ক'রে রাখতে।" শান্তিনিকেতনের মাঘোৎসবের উপাসনায় এইটিই রবীন্দ্রনাথের শেষ ভাষণ। পর বৎসরে উৎসবে তিনি উপস্থিত হইতে পারেন নাই।[১]

মাঘোৎসবের কয়েকদিন পরেই শ্রীনিকেতনের বার্ষিক উৎসব—৬ ফেব্রুয়ারি (১৯৪০)। প্রধান অতিথিরূপে আসিয়াছেন বাংলাদেশের শিক্ষামন্ত্রী আজিজুল হক। এই উৎসবের আঙ্গিকরূপে যে প্রদর্শনী হয় সেটি উন্মোচন করেন তিনি। 'পল্লীসেবা'[২] সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ যে ভাষণ মৌখিক দান করিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে নূতন কথা বেশি নাই; তৎসত্ত্বেও দুই একটি কথা পুনরুক্ত হইলেও স্মরণীয়। তিনি বলেন, "অশিক্ষিত পল্লীবাসীর সঙ্গে শিক্ষিত শহরবাসীর ভেদ দূর করতে না পারলে দেশ কখনো বড়ো হতে পারবে না। আজ বিজ্ঞানের শিক্ষাকে সর্বত্র ছড়িয়ে দিতে হবে···। সব শিক্ষার পথকে সহজ করে গ্রামে সর্বজনের সুগম করে দিতে পারাটাই সকলের চেয়ে বড়ো সেবা। যে শিক্ষা য়ুরোপ থেকে এসেছে আমাদের দেশে তাকে গ্রহণ করে সকলের মাঝে ঢেলে দিতে হবে, কারণ শিক্ষার মধ্যে দেশবিদেশের ভেদ নেই।" শিক্ষা ও বিশেষভাবে বিজ্ঞান শিক্ষা ব্যতীত মূঢ় মনের জড়তা দূর হইতে পারে না—এইটিই কবির প্রধান বক্তব্য।

১ পূর্ণের সাধনা, ১৩৪৬ মাঘ ৯, প্রবাসী ১৩৪৬ ফাল্গুন পৃ ৬৩৮-৪২।

২ পল্লীসেবা, ১৯৪০ ফেব্রুয়ারি ৬, অভিভাষণের অনুলিখন, প্রবাসী ১৩৪৬ ফাল্গুন পৃ ৬৩২-৩৪।

এদিকে পৃথিবীব্যাপী যুদ্ধের ফলে প্রায় প্রত্যেক যুদ্ধনিরত দেশেই ব্যক্তিস্বাধীনতা বহুলভাবে খর্বিত হইতেছিল। ইংলণ্ডে H. W. Nevinson, National Council for Civil Liberties-এর প্রেসিডেণ্ট রূপে এক পত্র সর্বত্র প্রেরণ করেন। এই প্রচারপত্র পাইয়া কবি নেভিনসনকে লিখিতেছেন (১৯৪০ ফেব্রুয়ারি ৪): "I join with you in your crusade for the liberty of the human spirit and share your hope that the Western Civilisation will yet triumph over the ordeal that it has set for itself. In some ways it is even harder for India to pursue the path of freedom, not only our unnatural political situation which hampers free national expression but the legacies of medieval habits and thoughts will have to be overcome.

"It is therefore, all the more necessary that leaders of thought in your country and ours should counteract the passions of the day and maintain close contact in our human endeavour."[১]

ইহার কয়দিন পরে (1940 March 31) কবি নেভিনসনকে লিখিতেছেন, "It has been most kind of you to have asked me to join the National Council for Civil Liberties as a Vice-President and I accept the honour with great pleasure. I can of course do nothing more at present than just lend my name to it; 80 is after all a very advanced age in the Tropics. But I should not complain, as, on the whole, I am keeping quite fit".[২]

একথা আশা করি সকলেই স্বীকার করিবেন যে রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হওয়া কবির পক্ষে অধর্ম নহে। চিন্তাশীল, ভাবুক, শিল্পী ও কবিদের পক্ষে অন্যায়ের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হওয়া স্বাভাবিক। এ বিষয়ে ক্রোচে (Croce) বলিতেছেন, "A man could only suppress his political interest by at the same time suppressing all his others; he would not be unpolitical only but apathetic, and total apathy is death, the death of thought and imagination, of philosophy and poetry, which have no subject matter but the life of the passions." Croce বলেন যে সমাজের দার্শনিক, কবি ও শিল্পীরা unpolitical man হইবেন না; "if we may so speak more exactly, 'a sympolitical' one, who is concerned in politics as in every human activity. He is concerned not to produce bad propagandist poetry, philosophy or history, still less to undertake political activities outside his province, but simply to transmute his passionate concern into pure poetry, philosophy or history; and this he could not do if he had not this passionate concern, if his mind were indifferent that is to say empty."[৩]

ইতিমধ্যে জানা গেল মহাত্মা গান্ধী শান্তিনিকেতন আসিতেছেন, তাঁহার সঙ্গে আছেন কস্তুরবাঈ। উভয়ে একত্র আসিয়াছিলেন ১৯১৫ সালে। এবার আগমনের উদ্দেশ্য কবির সহিত উভয়ের শেষ সাক্ষাৎ। পঁচিশ

১ Amrita Bazar Patrika 1940 Feb. 6; দ্র V. B. News VIII 1940: Feb. p 61.

২ Henry W. Nevinson, Esq, 4, Downside Crescent, Hampstead, N. W. 3. England.

৩ Croce, Unpolitical man, 1931 in his *My Philosophy*, selected by Klibansky and trans by Carritt. p 53-54.

বৎসর পূর্বে ইঁহাদের পুত্রেরা ও পুত্রোপম ফিনিক্স-ছাত্ররা ভারতে প্রথম আশ্রয় পাইয়াছিল এই শান্তিনিকেতনে, সেই স্থানের পুরাতন অধ্যাপক ও কর্মীগণের সহিত মিলিত হইবার জন্য এবার আসা।

বোলপুর আসার সঙ্গে গান্ধীজির কোনো রাজনৈতিক কর্মের যোগ ছিল না; তৎসত্ত্বেও বোলপুর স্টেশনে কয়েকজন উৎসাহী 'স্বদেশসেবক' মহাত্মাজিকে অপমান করিবার অপচেষ্টায় বিক্ষোভ প্রদর্শন করিয়াছিলেন।[১]

মহাত্মাজি ও কস্তুরাবাঈ আশ্রমে আসেন ১৭ ফেব্রুয়ারি (১৯৪০)। সেইদিন অপরাহ্ণে আম্রকুঞ্জে গান্ধীজির সংবর্ধনা হইল। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং গান্ধীজিকে মাল্যভূষিত করিয়া স্বাগত করিলেন: "I hope we shall be able to keep close to a raticent expression of love in welcoming you into our Ashrama and never allow it to overflow into any extravagant display of phrases. Homage to the Great naturally seeks its manifestation in the language of simplicity and we offer you these few words to let you know that we accept you as our own as one belonging to all humanity."

গান্ধীজি প্রতিভাষণে বলেন, প্রথমেই এখানে আসিয়া তাঁহার এন্‌ড্রুসের কথা মনে পড়িতেছে—আজ সকালে কলিকাতায় এন্‌ড্রুসের সহিত সাক্ষাৎই ছিল তাঁহার প্রথম কাজ। এন্‌ড্রুসের বড়ই ইচ্ছা ছিল যে আশ্রমে গান্ধীজি ও কবি মিলিত হন। আজিকার এই উৎসবে তাঁহার অনুপস্থিতিজনিত বেদনা সকলেই বোধ করিতেছেন। মহাত্মাজি বলেন, শান্তিনিকেতনে আসিলে মনে হয় যেন নিজ গৃহে আসিয়াছেন; ১৯১৫ সালে শান্তিনিকেতনের আতিথ্যের কথা উল্লেখ করিয়া বলেন যে সেদিন যখন তাঁহাদের মাথা গুঁজিবার স্থান কোথাও ছিল না, এই শান্তিনিকেতনেই তাঁহারা আফ্রিকা হইতে আসিয়া আশ্রয় পান। সেই সময় হইতে তিনি অনুভব করিয়া আসিতেছেন গুরুদেব তাঁহাকে কী ভালোবাসেন। কবির আশীর্বাদ পাইবার প্রথম সুযোগেই তিনি আশ্রমে উপস্থিত হইয়াছেন। তিনি গুরুদেবের আশীর্বাদ পাইয়াছেন, তাঁহার অন্তঃকরণ পূর্ণ হইয়াছে।

গান্ধীজি শেষ আসেন ১৯২৫ সালে—এই সময়ের মধ্যে শান্তিনিকেতন ও শ্রীনিকেতনের অনেক পরিবর্তন হইয়া গিয়াছে। ১৮ ফেব্রুয়ারি সকালবেলা তিনি শান্তিনিকেতনের প্রত্যেকটি বিভাগ দেখিলেন ও পুরাতন কর্মীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন। ক্ষিতিমোহন সেন, নন্দলাল বসু, হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতির কাজকর্ম বিশেষভাবেই দেখিলেন। নন্দলাল কন্‌গ্রেসমণ্ডপ ও গ্রামউদ্যোগ সম্মেলনের বিভূষণে কয়েকবার ভার গ্রহণ করেন; গান্ধীজি তাঁহাকে ভালো করিয়া জানিতেন; সেইজন্য কলাভবনের কাজকর্ম পুঙ্খানুপুঙ্খভাবেই পর্যবেক্ষণ করিলেন। অতঃপর শ্রীনিকেতনের গ্রামসেবার কাজ, শিক্ষাসত্র ও শিল্পসদনের উদ্যোগসমূহ দেখিয়া আসিলেন। মহাত্মাজি শিক্ষাসত্র দেখিয়া নিশ্চয়ই লক্ষ্য করিয়াছিলেন যে তাঁহার বুনিয়াদী শিক্ষার ও কবির গ্রাম্য শিক্ষার মূলে একটু ভেদ আছে। কবি চাহিয়াছিলেন শিশুর মনোবিকাশের ছন্দ প্রকাশিত হয় আর্টের মাধ্যমে—self-expression-এর মধ্য দিয়া; মহাত্মাজির শিক্ষাবিধির ভিত্তি কারুকেন্দ্রিক-বা craftএর মাধ্যমে, প্রয়োজনের চাহিদা মিটানোতেই শিক্ষার সার্থকতা। অপরাহ্ণে কবির সহিত তাঁহার দীর্ঘ কথোপকথন হয়; কী কথাবার্তা হয় তাহা প্রকাশিত হয় নাই। "Gandhiji had several intimate talk with Gurudev. But they are of too sacred and personal a character for recapitulation here."

১ প্রবাসী ১৩৪৬ চৈত্র পৃ ৮৩২

সন্ধ্যার পর উত্তরায়ণের প্রাঙ্গণে গান্ধীজির জন্য 'চণ্ডালিকা' নাটিকার অভিনয় হইল। 'হরিজন' পত্রিকার সাংবাদিক লিখিয়াছেন যে গান্ধীজিকে এরূপ তন্ময় হইয়া অভিনয় দেখিতে তিনি কখনো দেখেন নাই।[১]

মহাত্মাজি শান্তিনিকেতন ভ্রমণ করিয়া গিয়া বলেন, "The visit to Santiniketan was pilgrimage to me." শান্তিনিকেতন ছাড়িবার পূর্বে রবীন্দ্রনাথ গান্ধীজির হস্তে একখানি পত্র দেন (১৯৪০ ফেব্রু ১৯); তাহাতে তিনি গান্ধীজিকে একটিমাত্র অনুরোধ জ্ঞাপন করেন যে, তাঁহার অবর্তমানে বিশ্বভারতীর প্রতি তিনি (গান্ধীজি) যেন দৃষ্টি রাখেন।[২] কলিকাতার পথে গান্ধীজি কবির পত্রখানি পড়েন ও উত্তর লিখিয়া জানান যে বিশ্বভারতীর স্থায়িত্ব বিষয়ে তিনি তাঁহার যথাসাধ্য করিবেন।

গান্ধীজি কলিকাতায় গিয়া কবির পত্রখানি মৌলানা আবুল কালাম আজাদকে দেখান। তারপর ভারত স্বাধীন হইলে মৌলানা সাহেব শিক্ষামন্ত্রীত্ব গ্রহণ করিলে মহাত্মাজি পুনরায় তাঁহাকে কবির প্রতিষ্ঠানের প্রতি দৃষ্টি রাখিবার জন্য অনুরোধ করেন। এই অনুরোধ পালিত হয় ১৯৫১ সালে—কবির মহাপ্রস্থানের দশবৎসর পর![৩]

সিউড়ি ও বাঁকুড়ায়

স্থির হইয়া বসিয়া থাকা কবির ভাগ্যেও নাই, স্বভাবেও নাই। তাহা না হইলে আশী বৎসর বয়সে লোকেই বা তাঁহাকে আহ্বান করিবে কেন আর তিনিই বা আহ্বানে সাড়া দেন কেন। এবার আহ্বান আসিয়াছে বীরভূমের সদর সিউড়ির প্রদর্শনী উদ্‌বোধনের (১৯৪০ ফেব্রুয়ারি ২১) জন্য। তখন বীরভূমের জেলাম্যাজিস্ট্রেট বিনোদবিহারী সরকার। তিনি সাহিত্যভক্ত ও রবীন্দ্রনাথের বিশেষ অনুরক্ত। জেলাবোর্ডের চেয়ারম্যান তখন জিতেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। জিতেন্দ্রলালের ন্যায় তেজস্বী নির্ভীক বিদ্বান কর্মীর জীবনকথা ও কর্মণ্যতা আজ বিস্মৃত। কিন্তু এক সময়ে তাঁহার বাগ্মিতা সকলকে মুগ্ধ করিয়াছিল। জেলাবোর্ডের তরফ হইতে তিনি যে ভাষণ দান করেন, তাহাতে রবীন্দ্রনাথের যে বিশ্লেষণ ও প্রশস্তি ছিল তাহা তাঁহার ন্যায় সাহিত্যিকেরই উপযুক্ত হইয়াছিল। রবীন্দ্রনাথের কথা শুনিবার ও তাঁহাকে দেখিবার জন্য সভাক্ষেত্রে কত সহস্র লোক যে সমবেত হইয়াছিল তাহা বলা কঠিন। কী বিরাট জনতা দেখিয়াছিলাম।

১ At seventynine the Poet's countenance shows no diminution in its luster, the eyes burn brighter than ever, the step is firm although he needs support and moves about only with difficulty. The voice has lost none of its vigour or its sonorous musical quality, and the spirit retains all the freshness and irrepressible exuberance of youth. He insisted upon Gandhiji witnessing the performance of his favourite musical pantomime, *Chandalika*, in which his granddaughter, [Nandita, Mrs. K. R. Kripalani] played the principal part. He personally supervised the rehearsal and even delayed the programme by a quarter of an hour till he was satisfied that everything was tip-top. It was a sight to be remembered when at one stage he almost jumped to the edge of his seat and broke out into a musical interpolation to provide the cue when the performers had seemed to have lost it. His enthusiam must have got an infection quality in it, for I have never seen Gandhiji follow with such sustained and rapt interest any entertainment as he did this one during the full one hour that it lasted." *Harijan* 1940 March 9.

২ V. B. News 1940 April. Two Letters.

৩ কবির পত্র, Visvabharati News VIII 1940 April p 73-74.

অপরাহ্নে ম্যাজিস্ট্রেটের বাংলোতে বিরাট পার্টি হয়, তাহাতে শহরের বহু শত লোক সমবেত হন। কবি সন্ধ্যার পর আহমদপুর হইয়া ট্রেনযোগে ফেরেন।

ইহার পরই কবির আহ্বান আসিল বাঁকুড়া হইতে; কবি দূরদূরান্তের দেশবিদেশে গিয়াছেন, ঘরের কাছের স্থানে যাইবার সুযোগ হয় নাই, আহ্বানও আসে নাই। এই সময়ে সুধীন্দ্রকুমার হালদার আই-সি-এস বাঁকুড়ার ম্যাজিস্ট্রেট ও বর্ধমান বিভাগের অস্থায়ী কমিশনরও বটে। সুধীন্দ্রকুমার বিখ্যাত অধ্যাপক হীরালাল হালদারের পুত্র, ইহার পত্নী উষা দেবী কলিকাতার বিখ্যাত চিকিৎসক প্রাণকৃষ্ণ আচার্যের কন্যা, কবির একান্ত স্নেহাস্পদা। পশ্চিম বাংলার বহু জনহিতকর কার্যের সহিত উষা দেবীর এককালে যোগ ছিল। ইঁহাদের আগ্রহে ও ব্যবস্থায় কবির বাঁকুড়া যাওয়া সম্ভব হইল।

বোলপুর হইতে ট্রেনযোগে খানা স্টেশন পর্যন্ত গিয়া, সেখান হইতে মোটরে করিয়া কবি বাঁকুড়া যান রানীগঞ্জের পথে। কবিকে দেখিবার জন্য পথে পথে কী ভিড়! রানীগঞ্জে জনতার চাপে মোটরগাড়ি ভাঙিবার মতো হয়।

বাঁকুড়ায় কবি ছিলেন হিল্‌হাউস নামে একটি বাড়িতে (১৯৪০ মার্চ ১-৩; ১৩৪৬ ফাল্গুন ১৭-১৯)। পৌঁছিবার পরদিন কবি বাঁকুড়া প্রদর্শনীর দ্বার উদ্‌ঘাটন করিলেন; তৎপূর্বে মণ্ডপতলে নানা প্রতিষ্ঠান হইতে কবিপ্রশস্তি পাঠ ও কবি সম্বন্ধে বক্তৃতা হয়।[১] রবীন্দ্রনাথ সকল অভিনন্দনের উত্তরে একটি ভাষণ দান করেন।[২]

পরদিনেও কয়েকটি অনুষ্ঠানে কবিকে যোগদান করিতে হয়; ইহার মধ্যে ছাত্রসভায় কবির অভিভাষণ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই সভার পর কবি বাঁকুড়া মেডিক্যাল স্কুল পরিদর্শনে গিয়া খুবই প্রীত হন; কবি লেখেন, "কর্তৃপক্ষদের প্রসাদ-বঞ্চিত এই হিতানুষ্ঠানটিকে বাঁকুড়ার গৌরব-স্থান বলিলে অল্প বলা হয়, বস্তুত ইহা বাংলাদেশেরই একটি মহতী কীর্তি।"[৩] সেইদিনই লেডি ডাফরিন হাসপাতালের প্রসূতি-সদনের ভিত্তি স্থাপন কবি কর্তৃক সম্পন্ন হয়। কবি মেডিক্যাল বিভাগের ছাত্রদের উদ্দেশে বলেন, "বর্তমান যুব-সম্প্রদায়ের উচিত বস্তুজগতের এমন একটি নূতনতর রূপের প্রবর্তন করা, যাহার দ্বারা সমগ্র মানবজাতির কল্যাণ সাধিত হয়। কিন্তু আত্মোৎসর্গের মহামন্ত্রে দীক্ষিত না হইলে এরূপ সৃষ্টি করা সম্ভব হয় না।" 'ভারত' পত্রিকা (১৩৪৬ ফাল্গুন ২৩) এই উক্তি সম্বন্ধে বলেন, "কবিগুরু অতি সংক্ষেপে যাহা বলিয়াছেন তাহার মধ্যে এত গভীর বিষয় নিহিত আছে যে, তাহা উপলব্ধি করিবার জন্য বিশেষরূপ মননশীলতার প্রয়োজন।" কবির বিজ্ঞানী মন বস্তুজগৎগত কল্যাণের কথা বলে—কোনো ভাবুকতার বাণী ইহা নহে।

বাঁকুড়ার ছাত্রদের উদ্দেশে কবি যে বক্তৃতা করেন, তাহাতে স্থানীয় ছাত্ররা উপলক্ষ্যমাত্র। দেশে ছাত্রদের মধ্যে যে উচ্ছৃঙ্খলতা ও ভাবচাঞ্চল্য দেখা দিয়াছে, কবি তাহারই সমালোচনা করিয়া বলেন যে, ছাত্ররা "এ-কথা···ভুলে যায় যে, যারা অকুণ্ঠিত মনে নিয়ম ভাঙতে চায় তারা নিয়ম গড়তে কোনোদিন পারে না। এই ভাঙন-ধরানো মন সাংঘাতিক-ভাবে বিস্তার লাভ করছে, এদের হাতে কীর্তি গঠিত হচ্ছে না, কীর্তি ভাঙছে। দলাদলিতে ক্রমাগতই ফাটল ধরিয়ে দিচ্ছে দেশের আশ্রয়সৌধকে। ছাত্রদের মধ্যে যাঁরা এই সৃষ্টিশক্তি সৃষ্টিপ্রীতির মূলে আঘাত করেছেন তাঁরা এটা করেছেন স্বাজাত্য-কর্তব্যের দোহাই দিয়ে। সভা-ভাঙা দল-ভাঙা ইস্কুল-ভাঙা মাথা-ভাঙা সমস্ত এর অন্তর্ভুক্ত ক'রে

১ বাঁকুড়ার পৌরজনের পক্ষ হইতে হরিসাধন দত্ত, অভ্যর্থনাসমিতির তরফ হইতে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, সাহিত্যপরিষদের পক্ষ হইতে যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি ও শিক্ষাসম্মিলনীর পক্ষ হইতে নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় অভিনন্দন পাঠ করেন।

২ কবির উত্তর, বাঁকুড়ার জনসভায় অভিনন্দনের উত্তরে লিখিত, ১৩৪৬ ফাল্গুন ১৮।—প্রবাসী ১৩৪৭ বৈশাখ।

৩ প্রবাসী ১৩৪৬ চৈত্র পৃ ৮২৭-৩০, ৮৩৯।

মারণ-তাণ্ডবের পিছনে দাঁড়িয়ে বাহবা দিয়েছেন। যে-বয়সে কোনো একটা গড়ে তোলবার শক্তি বা অভিজ্ঞতা থাকে না সেই বয়সে তাঁরা নিজের দলের সুযোগ ঘটাবার জন্যে এদের কানে ভাঙার মাহাত্ম্য ঘোষণা ক'রে নেশা জমিয়েছেন। দেশকে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করবার কাজে ছেলেদের উৎসাহ জাগিয়েছেন,—এই কাজটা সবচেয়ে সহজ।...

"ধ্বংস করবার কাজে যখন আগুন লাগানো হয় তখন সর্বনাশ করতে করতে সেটা আপনি ছড়িয়ে পড়ে—তাতে কারো কোনো কৃতিত্বের প্রয়োজন হয় না, বুদ্ধির তো নয়ই। যে-বয়সে স্বভাবতই পরিণাম-দৃষ্টি থাকে না, যখন দায়িত্ব-বোধের যথেষ্ট চর্চা হয়নি, তখন এই আগুন লাগানোর মাতামাতিতে দল বাঁধতে প্রশ্রয় দেওয়ার মতো দেশের অনিষ্ট সাধন আমি তো কিছু মনে করতে পারি নে।"[১] কবির এই সতর্ক বাণীর অবহেলার ফল যে কী হইয়াছে, তাহা আজ কাহাকেও স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া বলিবার প্রয়োজন নাই।

তিনদিন বাঁকুড়ায় থাকিয়া বেঙ্গল-নাগপুর রেলপথে কলিকাতা হইয়া কবি শান্তিনিকেতনে ফিরিলেন। আসিয়া লিখিলেন 'দূরের গান' (সানাই); এই প্রায় আশী বৎসর বয়সেও কবির মন বলে, 'আমি সুদূরের পিয়াসী। তাই নূতন স্থান হইতে, নূতন মানুষের আহ্বান আসিলে, নূতন পারিপাশ্বিকের মধ্যে যাইবার জন্য মন বলে, 'চলি গো চলি গো, যাইগো চলে।'

সুদূরের পানে-চাওয়া উৎকণ্ঠিত আমি
মন সেই আঘাটায় তীর্থপথগামী
যেথায় হঠাৎ-নামা প্লাবনের জলে
তটপ্লাবী কোলাহলে
ওপারের আনে আহ্বান,
নিরুদ্দেশ পথিকের গান। (দূরের গান)

কিন্তু ক্রমশই চলার বেগ চলিতেছে চরম অচলার অভিমুখে। বাহিরের সমস্ত কর্মব্যস্ততা, হাসিবিদ্রূপ, কাব্যসৃষ্টি, রূপসৃষ্টি—সমস্তর পিছনে মনের মধ্যে নিয়ত উঁকি মারিতেছে চরম চলার শেষ আবেদন। এই মনোভাবটি একভাবে প্রকাশ পাইয়াছে দ্বিজেন্দ্র-শতবার্ষিকী উৎসবের ভাষণে।[২] ২৯ ফাল্গুন দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মশতবার্ষিকী উৎসব; মন্দিরে কবির অভিভাষণ পঠিত হয়। কবি ভাষণে বলেন, "আমি আজ নিজের কথাই জানাই। এই তো দেখছি জরা ক্রমশই আমার চারদিকে তার ফাঁসগুলি আঁট করে দিচ্ছে। সৃষ্টিগতিস্রোতের সঙ্গে আমার যে-সব ইন্দ্রিয়বোধশক্তির সহচারিতা এত দীর্ঘকাল চলে এসেছে আজ তাদের মাঝখানে ক্রমশই নানা বেড়া উঠছে স্থূল হয়ে। সেই ব্যবধানে প্রতিহত হয়ে জীবনলীলা চিরকালের জন্যে অবরুদ্ধ হয়ে যাবে এমন কথা সহজে মনে আসতে পারে। কেননা এই ব্যবধানের অতীত পথে যে অস্তিত্ব-স্রোত তাকে আমরা দেখতে পাইনে।...বিনাশ যদি কোনোখানেই সৃষ্টির প্রতিকূলে সত্যরূপে থাকত তাহলে সেই রন্ধ্র দিয়ে বহিঃসৃত হয়ে সৃষ্টি কোন্‌কালে যেত অতলে তলিয়ে।... সব কিছু একাকার হয়ে যেত অবৈচিত্র্যে, সব চলা হয়ে যেত শুব্ধ। কিন্তু ক্লান্তিবিহীন মৃত্যু দূর করে দেয় সঞ্চরমান কালের ক্লান্তি। জীর্ণতাকে সে ধ্বংসস্তূপের মধ্যে ফেলে দিয়ে নূতন রচনার তোরণ নির্মাণ করছে সেই উপকরণে। প্রথমকে সে বারে বারে ফিরিয়ে আনছে শেষকে অতিক্রম করে।" বিজ্ঞানীদের মতে কোনো একটা বিশেষ দূর

১ বাঁকুড়ার ছাত্রদের উদ্দেশে, প্রবাসী ১৩৪৭ বৈশাখ পৃ ৯৪।

২ শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, দ্বিজেন্দ্র শতবার্ষিকী... [মন্দিরে পঠিত অভিভাষণ], প্রবাসী ১৩৪৭ বৈশাখ পৃ ৫-৭।

সীমানায় বিশ্ব আপনার ক্রমবিস্ফারিত স্ফীতিতে বিদীর্ণ হইয়া বিলুপ্ত হইবে— কবি এ তত্ত্ব মানিতে প্রস্তুত নহেন; ভারতীয় সাধকদের ধ্যানদৃষ্টি অনুসারে সৃষ্টির আদিও নাই অন্তও নাই, আছে কল্পকল্পান্তর, প্রকাশের পর প্রকাশের অনুবর্তন, প্রলয়ের চক্রপথে।

কয়েকদিন পরে দোলপূর্ণিমা-বসন্তউৎসব। যথাবিধি শান্তিনিকেতনে তাহা নিষ্পন্ন হইল। সেদিন কবি বসন্তকে আহ্বান করিলেন একটি কবিতায়; তবে তাহা নূতন সুরে বাঁধা (অস্পষ্ট ১৩৪৭ চৈত্র ১৪, নবজাতক)। আমরা একটু পরেই কাব্যে অবচেতনতা সম্বন্ধে যে আলোচনার আভাস দিয়াছি, তাহার সুর 'সানাই' ও 'নবজাতকে'র কয়েকটি কবিতার মধ্যে পাওয়া যায়—কেবল 'প্রহাসিনী' ও 'ছড়া'র মধ্যেই নহে। 'অস্পষ্ট'র মধ্যে অবচেতনার আমেজ স্পষ্টই। জীবনের অনেক কিছুই থাকিয়া যায় অস্পষ্ট। তবুও মানুষ বৃথাই সমস্তকেই স্পষ্ট করিয়া তুলিবার জন্য ব্যাকুল।

চেতনার জালে এ মহাগগনে বস্তু যা কিছু টিঁকিবে সৃষ্টি তারেই স্বীকার করিয়া স্বাক্ষর তাহে লিখিবে।
তবু কিছু মোহ, কিছু কিছু ভুল জাগ্রত সেই প্রাণনার প্রাণতন্তুতে রেখায় রেখায় রঙ রেখে যাবে আপনার।
এ জীবনে তাই রাত্রির দান দিনের রচনা জড়ায়ে চিন্তা কাজের ফাঁকে ফাঁকে সব রয়েছে ছড়ায়ে ছড়ায়ে।
বুদ্ধি যাহারে মিছে বলে হাসে সে যে সত্যের মূলে আপন গোপন রসসঞ্চারে ভরিছে ফসলে ফুলে।
অর্থ পেরিয়ে নিরর্থ এসে ফেলিছে রঙিন ছায়া। বাস্তব যত শিকল গড়িছে, খেলেনা গড়িছে মায়া।

(অস্পষ্ট, নবজাতক)

'অস্পষ্ট' ও 'জবাবদিহি' (নবজাতক) পর-পর দিন রচিত কবিতা। 'জবাবদিহি'র দিনে 'আসা যাওয়া' ও 'জ্যোতির্বাষ্প' (সানাই) লিখিত বলিয়া তারিখ দেওয়া আছে। দোলের পরদিন লিখিলেন, 'জবাবদিহি'। আপাতদৃষ্টিতে একটি হালকা ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া উহা রচিত, যেমন হালকাভাবে রচিত 'অস্পষ্ট' কবিতাটি। কিন্তু উভয়ের মধ্যে কবির জীবন-জিজ্ঞাসার একটি গভীর ইঙ্গিত মেলে। মৃত্যু বা 'কালো রঙ'কে অথবা বিস্মৃতিকে কবি 'সৃষ্টির প্রতিকূলে' চরম বিনাশরূপে দেখিতেছেন না:

সকাল বেলা বেড়াই খুঁজি খুঁজি কোথা সে মোর গেল রঙের ডালা,
কালো এসে আজ লাগালো বুঝি শেষ প্রহরের রঙ হরণের পালা।
ওরে কবি, ভয় কিছু নেই তোর কালো রঙ যে সকল রঙের চোর।
জানি যে ওর বক্ষে রাখে তুলি হারিয়ে-যাওয়া পূর্ণিমা-ফাল্গুনী—
অস্তরবির রঙের কালো ঝুলি, রসের শাস্ত্রে এই কথা কয় শুনি।
অন্ধকারে অজানা-সন্ধানে অচিন লোকে সীমাবিহীন রাতে,
রঙের তৃষা বহন করি প্রাণে চলব যখন তারার ইশারাতে,
হয়তো তখন শেষ বয়সের কালো করবে বাহির আপন গ্রন্থি খুলি
যৌবন-দীপ—জাগাবে তার আলো ঘুমভাঙা সব রাঙা প্রহরগুলি।
কালো তখন রঙের দীপালিতে সুর লাগাবে বিস্মৃত সংগীতে।

নবজাতক ও সানাই

গত কয়েক বৎসরের মধ্যে লিখিত অথচ কোনো কাব্যগ্রন্থে সংকলিত হয় নাই এ শ্রেণীর বহু কবিতা জমিয়া উঠিয়াছে। কবির ইচ্ছা সেগুলি আগামী জন্মদিনে একখানি কাব্যখণ্ডে প্রকাশ করেন। কিন্তু ১৩৩৯ হইতে ১৩৪৭ সাল পর্যন্ত লিখিত কবিতাগুলি জড়ো করিয়া দেখা গেল, সেগুলি এমন বিচিত্র ভাবের যে, একটি কাব্যখণ্ডে প্রকাশিত হইলে উহার কোনো রূপই ফুটিয়া উঠিবে না। কবিকে এইটি দেখাইলেন অমিয় চক্রবর্তী। অমিয়চন্দ্র যে কবিতাগুলি বাছিয়া দিলেন, তাহা দুইখানি কাব্যে প্রকাশের ব্যবস্থা হয়। নির্বাচিত কবিতাগুলির মধ্যে তেমন ভাবিক যোগ নাই; উভয় কাব্যের মধ্যেই নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য যে আছে, নামেই তাহার প্রকাশ। এই কাব্য দুইখানির একটি 'নবজাতক' অপরটি 'সানাই'।[১] নবজাতক প্রকাশিত হইল ১৩৪৭ এর বৈশাখ মাসে। 'কবিতা'র সমালোচক বলিতেছেন যে কবির এই নূতন কাব্যগ্রন্থের নামকরণ ইঙ্গিতময়। সম্প্রতি তাঁহার কাব্যে মৃত্যু অনেকখানি প্রাধান্য পাইয়াছিল, এই কাব্যখণ্ডে মৃত্যু গিয়াছে দূরে। "প্রান্তিকে দেখেছি কবিকে অন্ধকারের ভীষণ শক্তির সঙ্গে যুঝতে, এবারে হার হয়েছে অন্ধকারের, নতুন সূর্যোদয় দিগন্তে। তাঁরই অনুপম ভাষা চুরি ক'রে বলতে হয় যে তিনি চিরজীবিত, তাই তিনি বার বার নবজাতক।"[২] নবজাতকের 'শেষ কথা' কবিতাটি ভূমিকা লেখার একই দিনে রচিত :

এ ঘরে ফুরাল খেলা
এল দ্বার রুধিবার বেলা।…
জানি না বুঝিব কিনা প্রলয়ের সীমায় সীমায়
শুভ্রে আর কালিমায়
কেন এই আসা আর যাওয়া,
কেন হারাবার লাগি এতখানি পাওয়া।
জানি না এ আজিকার মুছে-ফেলা ছবি
আবার নূতন রঙে আঁকিবে কি তুমি শিল্পী কবি।

নবজাতকের সূচনায় কবি বলিয়াছেন যে তাঁহার "কাব্যের ঋতুপরিবর্তন ঘটেছে বারে বারে। প্রায়ই সেটা ঘটে নিজের অলক্ষ্যে। কালে কালে ফুলের ফসল বদল হয়ে থাকে।…কাব্যে এই যে হাওয়া বদল থেকে সৃষ্টিবদল এ তো স্বাভাবিক"…কিন্তু "কবির এ সম্বন্ধে খেয়াল থাকে না। বাইরের থেকে সমঝদারের কাছে এর প্রবণতা ধরা পড়ে।" এই সমঝদার হইতেছেন অমিয় চক্রবর্তী, যিনি কবির সমসাময়িক কবিতাগুলি বিশ্লেষণ করিয়া পৃথক্ করিয়া দেন। কবি লিখিতেছেন, অমিয়চন্দ্র "হয়তো দেখেছিলেন, এরা বসন্তের ফুল নয়; এরা হয়তো প্রৌঢ় ঋতুর ফসল, বাইরে থেকে মন ভোলাবার দিকে এদের ঔদাসীন্য। ভিতরের দিকের মননজাত অভিজ্ঞতা এদের পেয়ে বসেছে। তাই যদি না হবে তা হলে তো ব্যর্থ হবে পরিণত বয়সের প্রেরণা।" (১৯৪০ এপ্রিল ৪)

কিন্তু মন এই মননজাত খোরাক পাইতেছে না বলিয়া তাঁহার আপসোস। অমিয়চন্দ্রকে লিখিতেছেন, (৩১ মার্চ ১৯৪০) "আমার মুশকিল, আমার দেহ ক্লান্ত, তার চেয়ে ক্লান্ত আমার মন; কেননা মন স্থাণু হয়ে আছে, চলাফেরা বন্ধ—তুমি থাকলে মনের মধ্যে স্রোতের ধারা বয়—তার প্রয়োজন যে কত তা আশপাশের লোকে বুঝতে পারে না।"[৩] একথা অতি সত্য। কারণ কবির মনকে উদ্‌বুদ্ধ করিতে পারে আর-একটি মন যাহার মননশক্তি সক্রিয়,—যে প্রশ্ন উত্থাপন করিতে পারে, তর্কের দ্বারা, বিচারের দ্বারা চেতনাকে উত্তেজিত করিতে পারে—অমিয়চন্দ্র সেই শ্রেণীর

১ দ্র কবিকথা পৃ ৫৭-৫৯।
২ কবিতা ১৩৪৭ আষাঢ় পৃ ৪৪।
৩ কবিতা ১৩৫১ আষাঢ়।

ভাবুক ; আধুনিক জগতের সঙ্গে যুক্ত বলিয়া তিনি কবির মনের ঠিক খোরাকটি জোগান দিতে পারিতেন—'আশপাশের লোকে' বুঝিতে পারে না কবির মন কী চায়।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের জীবনকাহিনী সবটাই কবিমানসের ইতিহাস নহে ; শান্তিনিকেতনে 'অসম্ভব ভিড়ের আক্রমণ নিরবচ্ছিন্ন চলছে'—[১] যাহার প্রধান কেন্দ্র কবি। বিশিষ্টদের মধ্যে আওয়াগড়ের মহারাজা ও সুরগুজার মহারাজা আসিয়াছেন ; এইসব অতিথির আগমনে কবিকে স্বভাবত বিব্রত হইতে হয়। আওয়াগড়ের মহারাজা সম্বন্ধে লিখিতেছেন, "উনি অত্যন্ত সাদা মানুষ—ওঁর থাকার মধ্যে কোনো ভার নেই।"[২]

জীবনের ভার যখন গুরু, দেহ যখন জরাগ্রস্ত, মন যখন প্রকাশ-অনুকূলতার অভাবে ক্ষণে ক্ষণে স্তব্ধ হয়, তখন কবিচিত্ত আপনার অন্তর্বেদনাকে শমিত করিবার চেষ্টা করে হাস্য-উপহাসে। গাণিতিক নিয়মে curve-এর মতন যেন ইহার গতিরেখা—কঠোর মননজাত কবিতা বা আত্মানুভূত রস-উদ্বেলিত গানের ধারার পরে এই বক্ররেখাগতির পথে হাসির পাথেয় খুঁজিয়া পান। তাই 'জীবনের রস আজ মজ্জায়' রসপ্রলাপ জাগায় ক্ষণে ক্ষণে। সে রসপ্রলাপ কখনো 'প্রহাসিনী'র কৌতুকহাস্যে, কখনো ছড়ার প্রলাপে ব্যক্ত। এইসব ছড়া হালকাভাবের মুক্তশৃঙ্খল কল্পনায় পূর্ণ, দায়িত্বহীন আনন্দকোলাহলে মুখর। শব্দের যোজনায়, বাক্যের বুননে, ছন্দের রননে বিচিত্র, অদ্ভুত রূপসৃষ্টিতে মন বল্‌গাহারা। কবির এই 'ছড়া'র সূত্রপাত হয় 'খাপছাড়া' ও 'সে'র মধ্যে। তারপর 'ছড়ার ছবি' 'প্রহাসিনী'র মধ্য দিয়া চলে হাসি ও গল্পের কবিপ্রলাপ, 'গল্পসল্পে' তার শেষ। 'ছড়া' কাব্যখণ্ডের কবিতাগুলি লেখেন ১৯৪০ সালে।[৩] কালিম্পঙে শেষ অসুস্থতার পরেও লেখেন দুইটি। এই ছড়াগুলির উদ্‌ভব কোথায় তাহার বিশ্লেষণ নিজেই করিয়াছেন 'ছড়া'র ভূমিকায় (১৩৪৭পৌষ ২১। ১৯৪১ জানুয়ারি ৫)

অলস মনের আকাশেতে প্রদোষ যখন নামে
কর্মরথের ঘড়ঘড়ানি যে মুহূর্তে থামে
এলোমেলো ছিন্ন চেতন টুকরো কথার ঝাঁক
জানিনে কোন্ স্বপ্নরাজের শুনতে সে পায় ডাক,
ছেড়ে আসে কোথা থেকে দিনের বেলার গর্ত,
কারো আছে ভাবের আভাস কারো বা নেই অর্থ,
ঘোলা মনের এই যে সৃষ্টি আপন অনিয়মে
ঝিঁঝির ডাকে অকারণের আসর তাহার জমে।
পষ্ট আলোর সৃষ্টি পানে যখন চেয়ে দেখি
মনের মধ্যে সন্দেহ হয় হঠাৎ মাতন একি।

১ দ্র চিঠিপত্র ৫ম, পত্র ১১২, ১৯৪০ জানুয়ারি ১০, "আগন্তুকের বিষম ভীড়, প্রাণ বেরিয়ে গেল। কাজকর্ম ক্ষতবিক্ষত, অকাজ ধরাশায়ী।"

২ এই সময়ে আওয়াগড় ভবন নির্মাণ কার্য শুরু হয়। ১৯৮৯ সালে মহারাজ বিশ্বভারতীকে এই অট্টালিকা দানপত্র করিয়া দেন।

৩ 'ছড়া'র তালিকা: ১। ২০ জানুয়ারি ১৯৪০ উদীচী ছড়া ৮; ২। ৭ ফেব্রুয়ারি উদয়ন ছড়া ৬। শ্রাদ্ধ, প্রবাসী ১৩৪৬ চৈত্র, ৩। ১৮ ফেব্রুয়ারি উদয়ন ছড়া ৪ : মামলা, প্রবাসী ১৩৪৭ জ্যৈষ্ঠ; ৪। ৭ মার্চ উদয়ন ছড়া ১০; ৫। ৯ মার্চ উদয়ন ছড়া ৩। পরিস্থিতি প্রবাসী ১৩৪৭ বৈশাখ; ৬। ১৭ মার্চ উদয়ন ছড়া ৯। রবিবারী সংস্করণ, বঙ্গলক্ষ্মী ১৩৪৭ বৈশাখ; ৭। এপ্রিল-মে মংপু ছড়া ২; ৮। ১৫ মে কালিম্পং ছড়া ১; ৯। ২০ অগস্ট উদীচী ছড়া ৫। চলচ্চিত্র, আনন্দবাজার পত্রিকা ১৩৪৭ শারদীয়া; ১০। ১০ নভেম্বর পুনশ্চ ছড়া ৭; ১১। ৫ ডিসেম্বর ১৯৪০ উদয়ন ছড়া ১১; ১২। ৫ জানুয়ারি ১৯৪১ উদয়ন ছড়া ভূমিকা। ১০, ১১, ১২ সংখ্যক অথবা 'ছড়া'র ৭, ১১ ও ভূমিকা লিখিত হয় শেষ অসুস্থতার পর; দ্র 'ছড়া'র সমালোচনা বুদ্ধদেব বসু, কবিতা ১৩৪৮ কার্তিক।

মংপুতে শেষ বাসকালে (২১ এপ্রিল—৭ মে ১৯৪০) একদিন বলিয়াছিলেন, "আজ আমায় পাগলামিতে পেয়েছে ; যা রোদ উঠেছে, কবির মাথায় মিলগুলোকে নাচিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে। মিথ্যে বকা দৌড় দিয়েছে মিলের স্কন্ধে চেপে।" (মংপুতে রবীন্দ্রনাথ পৃ ২২৫) সেদিন লেখেন :

কদমাগঞ্জ উজাড় করে আসছিল মাল মালদহে,
চড়ায় প'ড়ে নৌকাডুবি হল যখন কালদহে

এই ধরনের হঠাৎ-আসা অর্থহীন ছন্দদোলা সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন :

খেয়াল-স্রোতের ধারায় কী সব ডুবছে এবং ভাসছে,
ওরা কী যে দেয় না জবাব কোথা থেকে আসছে।

পণ্ডিতেরা বলেন অবচেতন বা মনের অজ্ঞাত গহন হইতে অসংলগ্ন ছড়া, কবিতার জন্ম হয়। এসব তত্ত্ব তাঁহার অনেক জানা ছিল তাই লিখিলেন, "অবচেতন মনের কাব্যরচনা অভ্যাস করছি। সচেতন বুদ্ধির পক্ষে বচনের অসংলগ্নতা দুঃসাধ্য। ভাবীযুগের সাহিত্যের প্রতি লক্ষ্য ক'রে হাত পাকাতে প্রবৃত্ত হলেম।···কেউ কিছু বুঝতে যদি না পারেন, তা হলেই আশাজনক হবে।"[১]

'নবযুগের কাব্যে'র[২] বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে কবি অন্যত্র বলিয়াছেন যে শোনা যাইতেছে "এখনকার কবিতা অবচেতন তত্ত্বে-পাওয়া কবিতা। অবচেতন মনের লীলা খাপছাড়া অসংলগ্ন। অর্থের সংগতি ঘটায় যে-মন সে সেখানে অনেকখানি ছুটি নিয়েছে।" কবির মতে "অবচেতনী কল্পনার অসংলগ্নতার আঙ্গিক কাব্যে ব্যবহার করা চলতে পারে যদি ঠিকমতো তার ব্যবহার হয়। যদি এই প্রণালীতে বিশেষ একটা ছবি ফুটে ওঠে, বিশেষ একটা রস জাগে মনে। কাব্যের এই বিশেষত্বকে উপেক্ষা করা চলবে না।

"অবচেতন মন যা-তা আঁকজোক পাড়ে কিন্তু রেখা রঙের সমন্বয় ক'রে ছবি আঁকে না। হাল আমলের কবি হয়তো পণ করেন আঁকজোক কিছুই বাদ দেব না, তাতে যেখানে সেখানে নানা আঁচড়ে ছবির ঐক্যকে যদি অস্পষ্ট করে দেয় সেও স্বীকার। এটা খানিকটা বিজ্ঞানীবুদ্ধি। বিজ্ঞান আর্টের মতো শুচিবায়ুগ্রস্ত নয়—যা কিছু আছে তাদের সমান দাম দিয়ে মেনে নেবার দিকে তার ঝোঁক। আর্টের মধ্যে আছে সম্ভোগের দাবি, আর সায়ান্স সব কিছুকে নির্বিচারে টেনে আনে। আধুনিক যুগের প্রকাশতত্ত্বে আছে এই দুয়ের মিল।"

আধুনিক নবীন কবিদের মধ্যে অমিয়চন্দ্র বিশেষ স্থান লাভ করিয়াছেন। রবীন্দ্রসাহিত্য ও রবীন্দ্রপরিবেশের মধ্যে নিমজ্জিত থাকিয়াও তিনি তাঁহার কাব্যসাধনায় অনুকারক শ্রেণীভুক্ত হন নাই। অমিয়চন্দ্র কবিকে তাঁহার নবপ্রকাশিত 'খসড়া' ও 'একমুঠো' নামে কাব্য দুইখানি পাঠাইয়াছিলেন। এই কাব্য দুইখানিকে আশ্রয় করিয়া রবীন্দ্রনাথ 'নবযুগের কাব্য'[৩] নামে প্রবন্ধটি লেখেন। ইতিপূর্বে অমিয়চন্দ্রের 'চেতন স্যাকরা' নামে কবিতাটি পড়িয়া রবীন্দ্রনাথ মংপু হইতে অমিয়চন্দ্রকে একপত্র লিখিয়া অভিনন্দিত করেন। কবি বলিতেছেন, 'আমার সম্পর্কীয় একটা অপবাদ শুনেছি যে আমার নিজের ছাঁদের কবিতা ব্যূহ বেঁধে আছে বাংলাসাহিত্যকে ঘিরে। তারি বিরুদ্ধে বিদ্রোহী অসহিষ্ণুতা প্রায় দেখতে পাওয়া যায়। সে বিদ্রোহ জয়ী হোক্ এ আমি অন্তরের সঙ্গে কামনা করি। তাই আমি আনন্দ পেয়েছি অমিয়চন্দ্রের কাব্যে তাঁর স্বকীয় স্বাতন্ত্র্যে।"

১ অবচেতনার অবদান, শনিবারের চিঠি ১৩৪৬ অগ্রহায়ণ পৃ ২৯৫।

২ প্রবাসী ১৩৪৬ চৈত্র পৃ ৭৩৬-৪২, দ্র সাহিত্যের স্বরূপ।

৩ প্রবাসী ১৩৪৬ চৈত্র পৃ ৭৩৯-৪০।

এনড্রুসের মৃত্যু

কবির দিন এই ভাবে কাটিতেছে। এমন সময়ে খবর আসিল (১৯৪০ এপ্রিল ৫) কলিকাতায় এনড্রুস-এর মৃত্যু হইয়াছে। কিছুকাল হইতে তাঁহার শরীর খারাপ হইতেছিল, অবশেষে ২১ জানুয়ারি কলিকাতায় Riordam Nursing Home এ তিনি আশ্রয় গ্রহণ করেন ও সেইখানেই মৃত্যু হয়।[১]

সেদিন মন্দিরে উপাসনায় কবি এনড্রুসের কথা বলেন।[২] জীবনে তিনি তাঁহার কাছে কী পরিমাণ ঋণী তাহা গভীর আবেগে প্রকাশ পায় সেদিন। এই খৃস্টান সন্ন্যাসীর নিকট ভারত যে কতভাবে ঋণী, তাহার সম্যক্ আলোচনা জাতীয় ইতিহাসের দিক হইতে এখনো হয় নাই। কবি এই দিনের ভাষণে বলেন, "দেখেছি দিনে দিনে নানা উপলক্ষ্যে ভারতবর্ষের কাছে তাঁর অসামান্য আত্মোৎসর্গ।" কবির মুখে কতবার শুনিয়াছি যে তাঁহার বন্ধুভাগ্য নাই; তবে একমাত্র বন্ধু যাঁহার উপর তিনি নির্ভর করিতে পারেন তিনি এনড্রুস। আমরাও এই খৃস্টান সন্ন্যাসীর সংস্পর্শে আসিয়া বুঝিয়াছিলাম যে খৃস্টের বাণী ইঁহার জীবনে সফল হইয়াছে। দেশাত্মবোধ, জাত্যাভিমান প্রভৃতির উর্ধ্বে যে এমন ভাবে উঠা যায়, তাহা এ-মানুষকে যাঁহারা না দেখিয়াছেন, তাঁহাদের পক্ষে কল্পনা করা কঠিন। অন্যযুগে জন্মগ্রহণ করিলে ইঁহাকে খৃস্টীয় সমাজ 'সেণ্ট' বা সাধু আখ্যা দিত।

১৯১২ সালে ইংলনডে কবির সহিত এনড্রুসের প্রথম সাক্ষাৎ হয়। তারপর এই দীর্ঘ কাল (২৮ বৎসর) তিনি আশ্রমের সহিত নানাভাবে যুক্ত ছিলেন; কবি ইঁহাকে বিশ্বভারতীর অন্যতম উপাচার্য মনোনয়ন করেন। তবে এনড্রুস যে কেবল রবীন্দ্রনাথ ও বিশ্বভারতীরই সহিত যুক্ত ছিলেন, তাহা নহে; তিনি শ্রমিক আন্দোলন এবং বিশেষভাবে বিদেশে ভারতীয় শ্রমিক সমস্যা ও মহাত্মাজির স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে বরাবরই একাত্ম ছিলেন। মানুষের দুঃখ ও যে-কোনো পরাধীন জাতির বন্ধন মুক্তি দান ছিল তাঁহার জীবনের আকাঙ্ক্ষা। তজ্জন্য কী কষ্ট কী লাঞ্ছনাই না ভোগ করিয়াছেন।

রবীন্দ্রনাথকে এনড্রুস কী চক্ষে যে দেখিতেন, তাহার সম্যক আলোচনা হয় নাই; অসংখ্য পত্র, ভাষণ ও রচনার মধ্যে কবির প্রতি উচ্ছ্বসিত ভক্তি প্রকাশ পাইয়াছে। ১৯৩৬ সালে ইংলণ্ডের সাদাম্পটন হইতে এনড্রুস যাহা লিখিয়াছিলেন (১৯৩৬ মার্চ ২০) তাহা এখানে উদ্ধৃত করিলে পাঠক বুঝিবেন রবীন্দ্রনাথ এনড্রুসের জীবনে কী পরিবর্তন আনিয়াছিলেন: "Twentyfive years ago, my whole heart was given to the poet Rabindranath Tagore, and it has remained with him ever since. He has been my Gurudeva, teaching me to understand and love humanity in the East no less than I had learnt in earlier years, to love it in the West. By his love and patience he broke down within me the narrow barriers of religious tradition which had confined me before owing to my birth, upbringing and education. Nothing but friendship so deep and sincere as his could have effected this. Now looking back after a quarter of a century, I can say with truth that this friendship has grown stronger as the years have passed

১ অস্ত্রোপচারের প্রাক্‌কালে এনড্রুস অমিয় চক্রবর্তীকে যে পত্র লেখেন তাহার তর্জমা। দ্র প্রবাসী ১৩৪৭ বৈশাখ পৃ ১২০।

২ দীনবন্ধু এনড্রুস ১৯৪০ এপ্রিল ৫, শান্তিনিকেতন মন্দিরে কথিত ও শ্রীনির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক অনুলিখিত, প্রবাসী ১৩৪৭ বৈশাখ পৃ ১২৮-৩১। দ্র রবীন্দ্রনাথকে লিখিত অমিয়চন্দ্রের পত্র, পুরী ৬।৪।৪০, প্রবাসী ১৩৪৭ বৈশাখ পৃ ১০৩।

and has remained steadfast throughout. It has been a supreme treasure in my life; the greatest gift God has given me in human ways."[১]

মৃত্যুর কয়েক মাস পূর্বে এন্‌ড্রুস মডার্ণ রিভিউ পত্রিকায় (১৯৪০ ফেব্রুয়ারি) ভারতের স্বাধীনতা সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছিলেন, নিম্নে উদ্ধৃত হইল: "In order to avoid any wrong impression let me add that I entirely agree with Prof. Seeley, when he says that '*prolonged* submission to a foreign yoke is one of the most potent causes of national deterioration.' I quote from memory. The emphasis there is on the word 'prolonged.' Every year that now passes in India, without the removal of the foreign yoke, is undoubtedly an evil. It is likely to undo any benefit that may have been derived before. This was my thesis in a series of articles which I wrote in 1921, called 'The immediate need of independence' where I emphasized the word 'immediate,' and I hold fast to every word which I then wrote. Nearly twenty years have passed since that date and hope deferred has made the heart sick. Things in India have deteriorated, as Prof. Seeley prophesied, and the evil is rapidly increasing. This agony of subjection is eating like iron into the soul, and the strain must be relieved at once.[২]

ভারতের স্বাধীনতার জন্য কী উদ্বেগ। এ শুধু ভারতের জন্য নহে। ইনি মহাত্মাজির অসহযোগ আন্দোলন মনে প্রাণে সমর্থন করেন, কিন্তু খিলাফত আন্দোলনকে বরদাস্ত করিতে পারেন নাই; কারণ তাহার দ্বারা মুসলীম জগতের উপর তুর্কীর সুলতানের আধিপত্য কায়েম করা হইত। পৃথিবীর কোনোজাতি কাহারও অধীন থাকে এই ভাবনা এন্‌ড্রুসের ছিল অসহ্য।

জবহরলাল নেহেরু তাঁহার আত্মজীবনীতে এন্‌ড্রুস সম্বন্ধে লিখিতেছেন: "C F Andrews wrote a pamphlet advocating independence for India. I think it was called *Independence—the Immediate Need*. This was a brilliant essay based on some of Seeley's writings on India, and it seemed to me not only to make out an unanswerable case for independence but also to mirror the inmost recesses of our hearts···It was wonderful that C. F. Andrews, a foreigner and one belonging to the dominant race in India, should echo that cry of our inmost being...Andrews had written that 'the only way of self-recovery was through some vital upheaval from within. It could not come through loans and gifts and concessions and proclamations from without. It must come from within. Therefore, it was with the intense joy of mental and spiritual deliverance from an intolerable burden, that I watched the actual outlook of such an inner explosive force,...when Mahatma Gandhi spoke to the heart of India the *mantram*—'Be free! Be slaves no more!' and the heart

১ V. B News 1936 May-June, p 88.

২ প্রবাসী ১৩৪৮ বৈশাখ পৃ ১০৯ হইতে উদ্ধৃত।

of India responded. In a sudden movement her fetters began to be loosened, and the pathway of freedom was opened." (p 66-67)

মৃত্যুর চারিমাস পূর্বে কবি নববর্ষের দিন যে ভাষণ (সভ্যতার সংকট) দান করেন, তাহাতে এন্‌ড্রুস সম্বন্ধে তাঁহার শেষ অভিমত ব্যক্ত করেন : "আমার ব্যক্তিগত সৌভাগ্যক্রমে মাঝে মাঝে মহদাশয় ইংরেজের সঙ্গে আমার মিলন ঘটেছে।...দৃষ্টান্তস্থলে এনড্রুসের নাম করতে পারি, তাঁর মধ্যে যথার্থ মানবকে বন্ধুভাবে অত্যন্ত নিকটে দেখবার সৌভাগ্য আমার ঘটেছিল। আজ মৃত্যুর পরিপ্রেক্ষণীতে স্বার্থসম্পর্কহীন তাঁর নির্ভীক মহত্ত্ব আরও জ্যোতির্ময় হয়ে দেখা দিয়েছে।...তাঁর স্মৃতির সঙ্গে এই [ইংরেজ] জাতির মর্মগত মাহাত্ম্য আমার মনে ধ্রুব হয়ে থাকবে।"

মৈত্রেয়ী দেবী লিখিতেছেন, "একদিন দুপুর বেলা কথা উঠল এন্‌ড্রুস সাহেবের। সুধাকান্তবাবু 'দেশ' পত্রিকায়[১] একটা প্রবন্ধ লিখেছেন। আমি ঘরে ঢুকতেই আমার হাতে কাগজটা দিয়ে বললেন, 'পড়ে দেখো। ভালো লিখেছে, সমস্ত মানুষটি ফুটে উঠেছে। পড়তে পড়তে মনে পড়তে লাগল তাকে। সকাল বেলা এসেই গুরুদেব বলে জড়িয়ে ধরত। কী অকৃত্রিম আশ্চর্য ভালোবাসাই ছিল তার। কত করেছে আমাদের জন্য, কী অজস্র পরিশ্রম নিঃস্বার্থ নিষ্কাম ভাবে অথচ তার জন্য এতটুকু গর্ব নেই। যথার্থ ক্রিশ্চান। অথচ প্রথম দিকে আমাদের মধ্যেই কেউ কেউ ওকে সন্দেহ করেছে কত রকম, সে সব কথা ওর কানেও গেছে। জলভরা চোখে শান্তিনিকেতনের মাঠে মাঠে ঘুরে বেড়িয়েছে।' বলতে বলতে ওঁর গলা ধরে এলো, বাইরের দিকে চেয়ে চুপ ক'রে রইলেন। কেবল মনে পড়ে সেই লাল ধুলোয় ধূসর জামা কাপড়, ধুতি খুলে খুলে পড়ছে, কোনোমতে সামলে সামলে চলেছে সন্ন্যাসী।" (পৃ ২৬০)

এন্‌ড্রুসের মৃত্যুসংবাদ যখন আসিল, তখন সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরও মৃত্যুশয্যায়। বর্ষশেষের দিন (১৯৪০ এপ্রিল ১৩) ইন্দিরা দেবীকে কবি যে পত্রখানি লেখেন, তাহাতে তাঁহার মনের, দেহের ও পারিপার্শ্বিকের সংবাদগুলি সংক্ষিপ্ত হইলেও সুস্পষ্ট। তিনি লিখিতেছেন, "সুরেনের জন্যে মন কী রকম উদ্বিগ্ন হয়ে আছে তা বলে উঠতে পারিনে।... আমার নিজের শরীর একটুও ভালো নেই—প্রায়ই জ্বর হয়। আর অহোরাত্র থাকে সেই জ্বরের দুর্বলতা। কাজ করবার শক্তি কমেছে রুচিও নেই, অথচ এত কাজের আক্রমণ এর আগে আর কখনো মনে পড়ে না। বয়স যতই বাড়ছে মন যতই ভারাক্রান্ত হয়ে পড়ছে জরায়, নিরবকাশ ততই নীরন্ধ্র হয়ে উঠেচে। আমার কাজের সঙ্গে এত লোকের দায়িত্ব জড়িত যে অস্বাস্থ্যের দোহাই দিয়ে তাকে সরিয়ে রাখতে পারিনে।

১ এনড্রুস-স্মৃতি, শ্রীসুধাকান্ত রায়চৌধুরী, দেশ ১৩৪৭ বৈশাখ; দ্র প্রবাসী ১৩৪৭ জ্যৈষ্ঠ পৃ ২২২-২৩।

এনড্রুসের মৃত্যুর পাঁচদিন পরে এই গানটি লিখিত (১৩৪৬ চৈত্র ২৮। ১৯৪০ এপ্রিল ১০) :

প্রেম এসেছিল নিঃশব্দ চরণে।
তাই স্বপ্ন মনে হল তারে—
দিই নি তাহারে আসন।
বিদায় নিল যবে, শব্দ পেয়ে গেনু ধেয়ে
সে তখন স্বপ্ন কায়াবিহীন
নিশীথ তিমিরে বিলীন—
দূরপথে দীপশিখা, রক্তিম মরীচিকা।

—গীতবিতান ২য় সং পৃ ৯০০।

এনড্রুসের মৃত্যুর পর তাঁহার স্মৃতিরক্ষার জন্য আয়োজন চলিতে লাগিল; মহাত্মাজি এ বিষয়ে অগ্রণী হইলেন। যে টাকা উঠিল তাহা দ্বারা বিশ্বভারতী খৃস্টীয় সংস্কৃতি চর্চার জন্য 'দীনবন্ধুভবন' খোলা হইয়াছে। এছাড়া শান্তিনিকেতন ও শ্রীনিকেতনের মধ্যে Andrews Memorial Hospital-এর ভিত্তিপ্রস্তর মহাত্মাজি প্রোথিত করেন (১৯৪৫)। কিন্তু সে স্মৃতিমন্দির এখনো নির্মিত হয় নাই এবং খৃস্টধর্মালোচনার ব্যবস্থাও হয় নাই। Miss Marjorie Sykes, Life of C. F. Andrews লিখিয়াছেন। কয়েক বৎসর পূর্বে বানারসী দাস চতুর্বেদী হিন্দিতে একখানি জীবনী লেখেন। মিস্ সাইকস ইহার সহায়তায় ইংরেজি বইখানি লেখেন। বানারসী দাস বহুকাল এনড্রুসের সহকারী রূপে আশ্রমে ছিলেন। বহির্ভারতে ভারতীয়দের অবস্থা বিষয়ে ইনি এককালে অনেক কাজ করেন। মিস সাইকস ১৯৩৯ জুলাই হইতে Society of Friends এর অর্থানুকূল্যে আশ্রমে অধ্যাপিকা রূপে নিযুক্ত হন। বর্তমানে ইনি দক্ষিণ ভারতে তালিমী সংঘের সহিত যুক্ত।

২৭

"কিন্তু আমার তো যাবার সময় হয়ে এসেছে—কোনো কিছুর জন্যে পরিতাপ করবার সময় নেই জানি, তেমনি আর সময় নেই কর্তব্য থেকে নিষ্কৃতি নেবার।...এই জন্যে দুর্বল স্বাস্থ্যের কুহেলিকাচ্ছন্ন দিনের অস্বচ্ছ আলোয় ঝুঁকে পড়ে কাজ করে চলেছি।...কিন্তু কী হবে নালিশ করে আর কতদিনকারই বা মেয়াদ। এতদিন পরে সুরেনকে যদি হারাতেই হয় তাহলে আমার পক্ষে সান্ত্বনা এই থাকবে যে তার বিচ্ছেদ বেশি জায়গা পাবে না নিজেকে বিস্তীর্ণ করবার জন্যে।"[১]

কয়েকদিন পরে রথীন্দ্রনাথকে লিখিয়াছিলেন, "বুঝতে পারচি মৃত্যুর সঙ্গে লড়াইয়ে সুরেন পেরে উঠবে না। এত কষ্টও পাচ্ছে। নানা রকম কষ্টের ভিতর দিয়ে ওর জীবনটা গেল। অমন মানুষের ভাগ্যে এত কষ্ট ঘটতে পারে এ কথা ভাবলে অত্যন্ত ধিকার জন্মায় বিশ্ববিধানের উপর। মনটার ভিতর বৃথা ছটফট করতে থাকে।"[২]

কালিম্পঙে

শান্তিনিকেতনে নববর্ষ (১৩৪৭)। সেদিন রবীন্দ্রনাথের জন্মদিন উৎসব পালিত হইল।[৩] এতদ্‌উপলক্ষ্যে চীন হইতে মার্শাল চিয়াংকাইশেক শুভইচ্ছা প্রেরণ করেন ও চীনের শিক্ষামন্ত্রী Chien Li fu কবির উদ্দেশে একটি কবিতা লিখিয়া পাঠান। কবি উৎসবক্ষেত্রে তাঁহার জীবনে কী চাহিয়াছিলেন এবং কী করিয়াছেন তাহার মনোজ্ঞ এক বিশ্লেষণ করেন। তাঁহার ধ্যানজীবন ও ভাবময় জীবনের সহিত কর্মজীবনের যোগ হইয়াছে কিনা সে কথা উত্থাপন করিয়া বলেন যে, কর্মের সঙ্গে তাঁহার যোগ-যে হইয়াছে তাহার প্রমাণ শান্তিনিকেতন। "কিন্তু সে লোহালক্কড়ে বাঁধা যন্ত্রশালার কর্ম নয়, কর্মরূপে সেও কাব্য। আমার মনে যে সজীব সমগ্রতার পরিকল্পনা ছিল, তার মধ্যে বুদ্ধিবৃত্তিকে রাখতে চেয়েছিলুম সম্মানিত ক'রে। তাই বিজ্ঞানকে আমার কর্মক্ষেত্রে যথাসাধ্য সমাদরের স্থান দিতে চেয়েছি।" শান্তিনিকেতনে "যেমন আহ্বান করেছি প্রকৃতির সঙ্গে আনন্দের যোগ, তেমনি একান্ত ইচ্ছা করেছি এখানে মানুষের সঙ্গে মানুষের যোগকে অন্তঃকরণের যোগ করে তুলতে। কর্মের ক্ষেত্রে যেখানে অন্তঃকরণের যোগধারা কৃশ হয়ে ওঠে সেখানে নিয়ম হয়ে ওঠে একেশ্বর। সেখানে সৃষ্টিপরতার [creation] জায়গায় নির্মাণপরতা [construction] আধিপত্য স্থাপন করে। ক্রমশই সেখানে যন্ত্রীর যন্ত্র কবির কাব্যকে অবজ্ঞা করবার অধিকার পায়।...যেখানে বহু লোককে নিয়ে সৃষ্টি সেখানে সৃষ্টিকার্যের বিশুদ্ধতা রক্ষা সম্ভব হয় না। মানব সমাজে এই রকম অবস্থাতেই আধ্যাত্মিক তপস্যা সাম্প্রদায়িক অনুশাসনে মুক্তি হারিয়ে পাথর হয়ে ওঠে। তাই এইটুকু মাত্র আশা করতে পারি যে ভবিষ্যতে প্রাণহীন দলীয় নিয়মজালের জটিলতা এই আশ্রমের মূলতত্ত্বকে একেবারে বিলুপ্ত করে দেবে না।"

আশ্রমের প্রথম-অবস্থায় ইহার স্বরূপ কী ছিল তৎসম্বন্ধে বলিতেছেন, "উপকরণবিরলতা ছিল এর বিশেষত্ব। সরল জীবনযাত্রা এখানে চারদিকে বিস্তার করেছিল সত্যের বিশুদ্ধ স্বচ্ছতা। খেলাধুলায় গানে অভিনয়ে ছেলেদের সঙ্গে আমার সম্বন্ধ অবারিত হত নবনবোন্মেষশালী আত্মপ্রকাশে। যে শান্তকে শিবকে অদ্বৈতকে ধ্যানে অন্তরে আহ্বান

১ চিঠিপত্র ৫ম, পত্র ৮১, বর্ষশেষ চৈত্র ১৩৪৬।

২ চিঠিপত্র ২য়, মংপু ২৫ এপ্রিল ১৯৪০।

৩ জন্মদিন, প্রবাসী ১৩৪৭ জ্যৈষ্ঠ পৃ ১৫৭-৫২।

করেছি তখন তাকে দেখা সহজ ছিল কর্মে।...অল্প যে কয়জন শিক্ষক ছিলেন আমার সহযোগী তাঁরা অনেকেই বিশ্বাস করতেন...এই অক্ষর পুরুষে আকাশ ওতপ্রোত। তাঁরা বিশ্বাসের সঙ্গেই বলতে পারতেন...সেই এককে জানো, সর্বব্যাপী আত্মাকে জানো, আত্মন্বেব, আপন আত্মাতেই, প্রথাগত আচার-অনুষ্ঠানে নয়—মানবপ্রেমে, শুভকর্মে, বিষয়-বুদ্ধিতে নয়,—আত্মার প্রেরণায়। এই আধ্যাত্মিক শ্রদ্ধার আকর্ষণে তখনকার দিনকৃত্যের অর্থদৈন্যে ছিল ধৈর্যশীল ত্যাগধর্মের উজ্জ্বলতা।" কবি তাঁহার এই আশীবৎসরের আয়ুক্ষেত্রে দাঁড়াইয়া শান্তিনিকেতনের অন্তরের কথাটি সেদিন বলিলেন; আশ্রম সম্বন্ধে ইহাই তাঁহার শেষ ভাষণ।

এই ভাষণের আরম্ভভাগে প্রকৃতির মধ্যে বিশেষকে বিশেষভাবে রূপ দিবার যে প্রবর্তনার কথা তুলিয়াছেন, তাহার নাম দিয়াছেন 'স্বাভাবিকী বলক্রিয়া' [natural forces ?]। কয়েকদিন পরে মংপুতে 'প্রথম দৈপ্রতি'' নামে যে কবিতা লেখেন সেইটি এই ভাষণের এই অংশের বাতিক'বলিতে পারা যায়।[১]

কালের প্রবল আবর্তে প্রতিহত
ফেনপুঞ্জের মতো,
আলোকে আঁধারে রঞ্জিত এই মায়া,
অদেহ ধরিল কায়া।
সত্তা আমার, জানি না সে কোথা হতে
হোলো উত্থিত নিত্য-ধাবিত স্রোতে।
সহসা অভাবনীয়
অদৃশ্য এক আরম্ভ মাঝে—কেন্দ্র রচিল স্বীয়।
বিশ্বসত্তা মাঝখানে দিল উঁকি,
এ কৌতুকের পশ্চাতে আছে জানি না কে কৌতুকী।

ক্ষণিকের নিয়ে অসীমের এই খেলা,
নববিকাশের সাথে গেঁথে দেয় শেষ-বিনাশের হেলা,
আলোকে কালের মৃদঙ্গ উঠে বেজে,
গোপনে ক্ষণিকা দেখা দিতে আসে
মুখঢাকা বধূ সেজে
গলায় পরিয়া হার
বুদ্বুদ মনিকার।
সৃষ্টির মাঝে আসন করে সে লাভ,
অনন্ত তারে অন্ত সীমায় জানায় আবির্ভাব।[২]

কবির প্রশ্ন এই যে ক্ষণিকের জন্য বুদ্বুদের মতো আমরা ভাসিয়া উঠিতেছি অসীম কালের প্রবাহের মধ্যে—কোথা হইতে ইহার উদ্‌ভব। বিরাট অসীম এক বিশ্বসত্তা যেন এতটুকু এতটুকু কেন্দ্রের মধ্যে ক্ষণে ক্ষণে আপনাকে বাঁধিতেছে এবং আপনাকে খুলিতেছে।

জন্মোৎসবের তিনদিন পরে (১৭ এপ্রিল) কবি কলিকাতায় গেলেন—কালিম্পং যাইবেন। কলিকাতায় তাঁহাকে Calcutta Builders Stores Ltd-এর Trust House উন্মোচন করিতে হইল (১৯ শে)। এই ব্যবসায়ের মালিক যোগেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় যৌবনে বরিশাল হইতে আসেন ও কাঠের ছোটোখাটো কাজের ঠিকা লইয়া সামান্যভাবে ব্যবসায় শুরু করেন (১৯১৭)। তারপর নিজ নিষ্ঠা বলে তিনি বিরাট কর্মশালার ও প্রভূত ধনের অধিকারী হন। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় গত বৎসর (১৯৩৯ জানুয়ারি ২৬) ইহার কারখানাগৃহের ভিত্তিপ্রস্তর প্রোথিত করেন; এবার গৃহদ্বার[৩] উন্মোচন করিলেন রবীন্দ্রনাথ।

পরদিন (১৯৪০ এপ্রিল ২০) কবি কালিম্পং যাত্রা করিলেন; পূর্বদিন পীড়িত সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে শেষবারের মতো দেখিয়া আসিয়াছিলেন।[৪]

১ দ্র জন্মদিনে ১১ নং, মংপুতে রবীন্দ্রনাথ পৃ ২৩৭-৩৮।
২ দ্র মংপুতে রবীন্দ্রনাথ পৃ ২৩৮।
৩ ৩৩ চিত্তরঞ্জন এভিন্যু, কলিকাতা।
৪ চিঠিপত্র ৫ম, পত্র ৮২; চিঠিপত্র ২য়, মংপু ২৪ এপ্রিল ১৯৪০।

কলিকাতায় আসিলে নানা লোক আসেন, দেশের ও দশের নানা সমস্যা লইয়া আলোচনা হয়। কবিও মতামত দিয়া যান। এইরূপ একটি ঘটনা কবিকে অত্যন্ত বিব্রত করে।

'শনিবারের চিঠি'র সম্পাদক সজনীকান্ত দাস রবীন্দ্রনাথের সহিত মোলাকাত করিতে আসেন; দেশের অনেক কথা তাঁহার সহিত হয়। এই দীর্ঘ কথোপকথনে স্বদেশীযুগের বাংলাদেশ, সোভিএট দেশ, সাম্প্রতিক রাজনীতি প্রভৃতি বিবিধ বিষয়ের আলোচনা করিয়া অবশেষে কবি বলেন, "এই আমাদের দেশ, এ দেশের কোন্ সফল কীর্তি আমরা আশা করতে পারি? আদুরে ছেলের মতো আমরা আব্দারের ঠোঁট ফুলিয়ে ভাঙবার কাজেই আছি। গড়ার কাজ ধৈর্যের—পুরুষের। আমাদের দিয়ে তার কোনোটা হল না। শুধু মেয়েলি নালিশ—ওরা দিলে না এই অধিকার; সুতরাং কান্না শুরু করো, অলক্ষ্যে মাথা লক্ষ্য করে ঢিল ছোড়ো। নিজেরা করব না, কাউকে কিছু করতে দেব না।

"ভারতবর্ষের গ্লানির কেন্দ্র আজ এই বাংলাদেশ। অথচ বাঙালীর আর্ত নালিশ অহরহ শোনা যাচ্ছে,—হিংসায় ও ঈর্ষায় তাকে নাকি চেপে মারছে অন্যান্য প্রদেশের সম্মিলিত চেষ্টা, বাঙালীর ভালো আজ আর কেউ দেখতে পারে না। এর চেয়ে মিথ্যে নালিশ আর কিছু হতে পারে না।...এই আমাদের ললাটলিপি। নইলে [রাজনীতির ক্ষেত্রে] যে সুযোগ বাঙালী পেয়েছিল, তেমন সুযোগ জাতির জীবনে কচিৎ আসে। না আসুক, কিন্তু সেদিনের শিক্ষা কি আমাদের কোনও কাজে লেগেছে। যে খোকামি প্রশ্রয় পেয়ে আজ বাংলাদেশের কপিধ্বজ রথের চূড়ায় চ'ড়ে বসেছে, সেই খোকামির স্বরূপ চেনবার শক্তি বাঙালীর এতদিনে অর্জন করা উচিত ছিল। দুঃখের বিষয় তা হয়নি। বাংলাদেশের আধুনিক পলিটিক্স সেই নিষ্ফলতারই সাক্ষ্য দিচ্ছে।"

রবীন্দ্রনাথের এই বিবৃতি ১৩৪৭ বৈশাখ ১২ যুগান্তরাদি সমসাময়িক দৈনিকে প্রকাশিত হইলে লোকে অনুমান করিল—কবির এই আক্রমণস্থল সুভাষচন্দ্র; কারণ এই সময়ে তিনি কন্‌গ্রেসবিদ্রোহী, বাংলাদেশের নানা রাজনৈতিক অশান্তি ও উত্তেজনার জন্য লোকে তাঁহাকে দায়ী করিতেছিল। সতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত 'ভারত' দৈনিকে লিখিলেন (১৩৪৭ বৈশাখ ১৭), "বাংলাদেশে রাজনীতিক্ষেত্রে যে অসাধুতার জয়গীতি চলিতেছে তাহার বিরুদ্ধে...রবীন্দ্রনাথ তীব্রতম ভাষায় নিজের ব্যথা ও দেশের ব্যথার কথা ব্যক্ত করিয়াছেন।" দাশগুপ্ত মহাশয় লিখিতেছেন যে বারো-চোদ্দ মাস পূর্বে রবীন্দ্রনাথ সুভাষচন্দ্রকে দেশগৌরবের আখ্যা দান করিয়াছিলেন। কিন্তু ইতিমধ্যে এমন সব ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে, যাহাতে কবির পক্ষে হয়তো তাঁহার সেই মত রক্ষা করা কঠিন হইয়া উঠিয়াছে। ১৩৭৬ সালের শেষভাগ হইতে বাংলাদেশে বিশেষ করিয়া কলিকাতায় কন্‌গ্রেস 'খাদি' ও 'সুভাষী' এই দুইটি দলে ভাগ হইয়া পড়ে। এই ভাগাভাগি নূতন না-হইলেও এবার উগ্রভাবে দেখা দিয়াছিল বাংলার রাজনীতিতে। সুভাষচন্দ্র কন্‌গ্রেস হইতে বহিষ্কৃত হইবার পর হইতে নূতন দল গঠনে প্রবৃত্ত হন। এখন কলিকাতার ছাত্র ও যুবকদের নেতৃস্থানীয় তিনিই। 'খাদি' বা গান্ধীবাদীদের সহিত বিরোধ প্রায়ই বাধে; শ্রদ্ধানন্দ পার্কে 'জাতীয়-সপ্তাহে' (১৯৪০ এপ্রিল ৬-১৩) যে চরখা-কাটা বা সূত্রযজ্ঞ চলিতেছিল, তাহা নবীনপন্থীদের দৌরাত্ম্যে প্রায় দক্ষযজ্ঞে পরিণত হইয়াছিল। এইরূপ ঘটনা প্রায়ই ঘটিতে থাকে। মফঃস্বলেও তাহার তরঙ্গ পৌঁছায়; কবির বাঁকুড়ার বক্তৃতায় এই উচ্ছৃঙ্খলতার তিরস্কার ছিল। ইতিপূর্বে রামগড়ে কন্‌গ্রেস সভামণ্ডপের অনতিদূরে সুভাষের চেষ্টায় রফাবিরোধী (anti-compromise) সম্মেলন আহূত হয়। মোটকথা কলিকাতায় সুভাষচন্দ্রের অনুকূলে যেমন একটি দল গড়িয়া উঠে, তাঁহার কন্‌গ্রেস-বিরোধী মনোভাবের জন্যও তাঁহার বিরুদ্ধবাদীর দল পুষ্ট হয়। আমাদের পক্ষে সেসব সমসাময়িক কদর্য ইতিহাস আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক। যাহাই হউক দেশনেতা সম্বন্ধে কবির মত ইংরেজি কাগজেও প্রকাশিত হইলে দেশময় আলোচনা শুরু হইল। এই রচনার জের চলে প্রায় তিনমাস; তারপরে কালিম্পং হইতে ফিরিয়া জুলাই (১৯৪০)-এর গোড়ায় কবি প্রেসে যে বিবৃতি দেন তাহাতে আলোচনা কিছু স্তব্ধ হয়; তবে তখন সুভাষচন্দ্র কারাপ্রাচীরের অন্তরালে। সে বিবৃতি সম্বন্ধে আমরা যথাস্থানে আলোচনা করিব।

পুনরায় পাহাড়ে

রথীন্দ্রনাথদের কালিম্পঙে আসিতে দেরি থাকায় কবি প্রথমে গিয়া উঠিলেন মংপুতে (১৯৪০ এপ্রিল ২১) মৈত্রেয়ী দেবীদের বাসায়। এখানে ৭ মে পর্যন্ত থাকেন। মংপুতে যে কয়দিন ছিলেন, তার বিস্তৃত বর্ণনা মৈত্রেয়ী দেবী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন (মংপুতে রবীন্দ্রনাথ, পৃ ২১২-৬২)।

কবি আপন মনে আছেন, নানারূপ কবিতা[১] লেখেন,— কখনো লিরিক, কখনো ছড়া। কিছুকাল আগে গোঁসাইজির কাছ থেকে ছেলেদের জন্যে কিছু লিখিবার অনুরোধ আসে। ছড়ার রাজ্যে মাঝে মাঝে ঘুরিতে ঘুরিতে মনে পড়ে পুরাতন জীবনের কথা; ইচ্ছা হয় ছেলেবেলার কথা লেখেন। কয়েকটি কাহিনী লিখিলেন গদ্যছন্দে। কিন্তু সে ছন্দ ছেলেদের বই-এর জন্য পছন্দ না হওয়ায় সোজা গদ্যে সেটা রূপান্তরিত করিলেন, সেইটি 'ছেলেবেলা' নামে পরে প্রকাশিত হয়।

এবার কবির জন্মোৎসব মংপুতেই অনুষ্ঠিত হয়; তদুপলক্ষ্যে তিনটি কবিতা লেখেন (জন্মদিনে ৫, ৬, ৭)।

কাল প্রাতে মোর জন্মদিনে
এ শৈল-আতিথ্যবাসে
বুদ্ধের নেপালী ভক্ত এসেছিল মোর বার্তা শুনে।

অপরাহ্ণে এসেছিল জন্মবাসরের আমন্ত্রণে
পাহাড়িয়া যত।
একে একে দিল মোরে পুষ্পের মঞ্জরী
নমস্কার সহ।[২]

মংপুতে জন্ম-উৎসবের পরদিন কবির কাছে সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মৃত্যুসংবাদ আসে। সুরেন্দ্রনাথ[৩] কবির প্রিয় ছিলেন, তাহা এই পরিবারের সহিত অন্তরঙ্গ ছাড়া অপরের পক্ষে জানা সম্ভব নহে। বর্ষশেষের দিন কবি শান্তিনিকেতন হইতে যে-পত্র ইন্দিরা দেবীকে লেখেন, তাহা পূর্বেই উদ্ধৃত হইয়াছে তাহাতে আমরা এই সম্বন্ধের কিঞ্চিৎ আভাস পাই। মৃত্যুসংবাদ পাইয়া ইন্দিরা দেবীকে লিখিতেছেন, "তোরা বোধ হয় জানিস আমার নিজের ছেলেদের চেয়ে সুরেনকে আমি ভালোবেসেছিলুম। নানা উপলক্ষ্যে তাকে আমার কাছে টানবার ইচ্ছা করেছি বারবার, বিরুদ্ধভাগ্য নানা আকারে কিছুতেই সম্মতি দেয় নি। এইবার মৃত্যুর ভিতর দিয়ে বোধ হয় কাছে আসব, সেই দিন নিকটে এসেছে।"[৪] এই দিন 'জন্মমৃত্যু' (জন্মদিনে ৮) কবিতাটি লেখেন।

১ মংপুতে কবি যে কয়টি কবিতা লেখেন—১৯৪০ এপ্রিল ২২ 'পুষ্পালয়ের অন্তরে ও বাহিরে' এনড্রুসের একটি ইংরেজি কবিতার অনুবাদ, প্রবাসী ১৩৪৭ আশ্বিন পৃ ৭৬৫; ২৩ এপ্রিল শেষ অভিসার, সানাই পৃ ৮১; ২৪ এপ্রিল পাল্‌কি; ২৮ এপ্রিল বাল্যদশা র-র ২৬ পৃ ৬৫৬-৬২; প্রথম প্রৈতি, প্রবাসী ১৩৪৭ আশ্বিন (দ্র মংপুতে রবীন্দ্রনাথ পৃ ২৩৮); 'কদমাগঞ্জ উজাড় করে'—ছড়া ২ (মংপুতে রবীন্দ্রনাথ পৃ ২২৫); ৫-৭ মে জন্মদিনে ৫, ৬, ৭, ৮ নং, রবীন্দ্র-রচনাবলীর ৪র্থ খণ্ডর ভূমিকা।

২ 'মংপুতে রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থে এই উৎসবের বিস্তারিত বর্ণনা আছে। জন্মদিনে ৬ ও ৭ দ্রষ্টব্য।

৩ রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় প্রবাসীর 'বিবিধ প্রসঙ্গে' সুরেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে লিখিতেছেন, "বাংলায় তিনি একটি সদ্যপ্রস্ফুটিত সাকুরাপুষ্প নাম দিয়া একটি জাপানী গল্পের অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং মহাভারতের প্রধান গল্পটি সাধুভাবায় লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথের একাধিক গ্রন্থ এবং অনেক প্রবন্ধ এবং ছোটগল্প তিনি অনুবাদ করিয়াছিলেন। তাহার অধিকাংশ মডার্ন রিভিয়ুতে প্রকাশিত হইয়াছিল।—দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর রবীন্দ্রনাথের গান ও সুর যেমন বহুজনের অধিগম্য করিয়া দিয়া গিয়াছেন, সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরও তেমনি রবীন্দ্রনাথের বহু রচনা বাংলার ও বাঙালী জাতির বাহিরেব লোকদের অধিগম্য করিয়া দিয়াছেন। তিনি তাহা না করিলে কবির বহু রচনা বাংলা-না-জানা লোকদের অজ্ঞাত থাকিয়া যাইত।" প্রবাসী ১৩৪৭ জ্যৈষ্ঠ পৃ ২৫৩।

৪ মংপু ১৯৪০ মে ৬, চিঠিপত্র ৫ম, পত্র ৮৩।

আজি জন্মবাসরের বক্ষ ভেদ করি
প্রিয় মৃত্যুবিচ্ছেদের এসেছে সংবাদ ;
আপন আগুনে শোক দগ্ধ করি দিল আপনারে,
উঠিল প্রদীপ্ত হয়ে।…

আলোকে তাহার দেখা দিল
অখণ্ড জীবন, যাহে জন্মমৃত্যু এক হয়ে আছে।
সে মহিমা উদ্বারিল যাহার উজ্জ্বল অমরতা
কৃপণ ভাগ্যের দৈন্য দিনে দিনে রেখেছিল ঢেকে।

এই মনোভাব অন্যভাবে প্রকাশ পাইয়াছে পরদিন লিখিত আর-একটি কবিতার মধ্যে। 'অনন্ত আমি'[১] কবিতায় জীবনের প্রতি অচলা বিশ্বাস প্রকাশ পাইয়াছে প্রতিছত্রে :

রাহুর মতন মৃত্যু
শুধু ফেলে কালো ছায়া,
পারে না করিতে গ্রাস জড়ের কবলে

জীবনের স্বর্গীয় অমৃত,
নিত্য জ্যোতি তার,
একথা নিশ্চিত মনে জানি।

কালিম্পঙে (৭ মে) ফিরিবার কয়েক দিন পরে কবি শান্তিনিকেতন হইতে কালীমোহন ঘোষের মৃত্যুসংবাদ (১৯৪০ মে ১২) পাইলেন। বিশ্বভারতীর ইতিহাসে কালীমোহন ঘোষের নাম চিরস্মরণীয় ; কারণ, কবির গ্রামউদ্যোগ পর্বের প্রারম্ভ হইতে কালীমোহন যুক্ত হন। গ্রামসেবা তাঁহার জীবনের ধর্ম ও কর্ম ছিল, চাকুরীমাত্র ছিল না। রবীন্দ্রনাথ ভাবের বাহক, কিন্তু তাঁহার ভাবকে রূপ যাঁহারা দিয়াছিলেন, তাঁহাদের অন্যতম হইতেছেন কালীমোহন।[২] কিছুকাল হইতে কালীমোহনের শরীর অসুস্থ হইয়া পড়ে ও তিনি গত ১৯৩৯ নভেম্বর ২২ কার্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছিলেন।

মৃত্যুসংবাদ পাইয়া কালিম্পঙ হইতে কবি শান্তিদেব ঘোষকে লিখিয়াছিলেন (১৯৪০ মে ১৯), "তোমার পিতার মৃত্যুসংবাদে গুরুতর আঘাত পেয়েছি। শান্তিনিকেতনে আসবার পূর্বে থেকেই তাঁর সঙ্গে আমার নিকট সম্বন্ধ ঘটেছিল। কর্মের সহযোগিতায় ও ভাবের ঐক্যে তাঁর সঙ্গে আমার আত্মীয়তা গভীরভাবে বিস্তার লাভ করেছিল। অকৃত্রিম নিষ্ঠার সঙ্গে আশ্রমের কাছে তিনি আপনার জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। তাঁর আন্তরিক জনহিতৈষা শ্রীনিকেতনের নানা শুভকর কার্যে নিজেকে সার্থক করেছে।"[৩] কালীমোহন সম্বন্ধে কবির এই উক্তি কবি-উক্তি নহে, তাহা বর্ণে বর্ণে সত্য। দুঃখের বিষয় এই ভাবুক কর্মী সম্বন্ধে কোনো সুষ্ঠু আলোচনা কেহ করেন নাই।

সুরেন্দ্রনাথের ও কালীমোহনের মৃত্যুসংবাদ তাঁহাকে ব্যথিত করে নিঃসন্দেহেই ; কিন্তু এ শ্রেণীর আঘাতে তিনি আযৌবন অভ্যস্ত, তাই মৃত্যুর আঘাত তাঁহার অন্তরকে অভিভূত করে না, তিনি আপনার জগতে আপনি আছেন। শুরু করিয়াছেন এবার 'খুচরো কবিতা লিখতে।' এখনকার অনেক কবিতা তাঁহার ভাষায় 'দুর্দিনের প্রতি স্পর্ধা প্রকাশ।' আপন জীবনের মধ্যে যে-সব দুর্যোগ ঘটিতেছে কী দৈহিক, কী মানসিক—সেগুলিকে যেমন বলিষ্ঠভাবে ঠেলিয়া দিয়া স্পর্ধা প্রকাশ করিতেছেন আপনার সৃষ্টি সাধনায়, তেমনই সমসাময়িক জাগতিক ব্যাপারের দুষ্কৃতকারীদের স্পর্ধাকে তিরস্কৃত করিতেছেন কাব্যমাধ্যমে। একটি ছড়ার মধ্যে[৪] সমসাময়িক দেশীয় রাজনীতির উপর কটাক্ষ আসিয়া পড়িয়াছে বলিয়া আমাদের মনে হয়। ব্যাখ্যা করিয়া স্পষ্ট করা কঠিন :

১ প্রবাসী ১৩৪৭ জ্যৈষ্ঠ পৃ ২২৭ ; দ্র শেষলেখা ২ সংখ্যক।

২ ক্ষিতিমোহন সেন, কালীমোহন স্মৃতি, প্রবাসী ১৩৪৭ আষাঢ় পৃ ৩৬৮-৭০।

৩ কালীমোহন স্মৃতি (পুস্তিকা), শান্তিনিকেতন প্রেস।

৪ ছড়া (১) কালিম্পঙ, ১৯৪০ মে ১৫, ছড়া, র-র ২৬ পৃ ৬।

লোকে বলে, কলকদল সূর্যলোকের আলো
দখল ক'রে জ্যোতির্লোকের নাম করেছে কালো।
তাই তো সবই উলট-পালট, উপর-নামন নীচে
ভয়ে ভয়ে নিচু মাথায় সমুখটা যায় পিছে।
হাঁচির ধাক্কা এতখানি এটা গুজব মিথ্যে—
এই নিয়ে সব কলেজ-পড়া বিজ্ঞানীদের চিত্তে
অল্প কিছু লাগল ধোঁকা ; রাগল অপর পক্ষে—
বললে, পড়াশুনোয় কেবল ধুলো লাগায় চক্ষে,
অন্যদেশে অসম্ভব যা পুণ্য ভারতবর্ষে
সম্ভব নয় বলিস যদি প্রায়শ্চিত্ত কর্ সে।
এর পরে দুই দলে মিলে ইটপাটকেল ছোঁড়া—
চক্ষে দেখায় সর্ষের ফুল, কেউ বা হল খোঁড়া।
পুণ্য ভারতবর্ষে ওঠে বীরপুরুষের বড়াই,
সমুদ্দুরের এপারেতে একেই বলে লড়াই ;
সিন্ধুপারে মৃত্যুনাটে চলছে নাচানাচি,
বাংলাদেশে তেঁতুল বনে চৌকিদারের হাঁচি।

এইটি যেমন হইল স্থানীয় রাজনীতির ব্যঙ্গ, তেমনি আধুনিক বর্বর সভ্যতাকে ধিক্কৃত করিয়াছেন 'অভিশাপ' (জন্মদিনে ২১) ও 'নবজাতকের কাণ্ড' (জন্মদিনে ১৬) কবিতাদ্বয়ে। মানুষের 'পরে এত বিশ্বাস, আদর্শবাদের 'পরে এমন নিষ্ঠা আজ কি সব নষ্ট হইবে। কবির বিশ্বাস :

দিনবদলের পালা এল
ঝোড়োযুগের মাঝে।
শুরু হবে নির্মম এক নূতন অধ্যায়—
নইলে কেন এত অপব্যয়,
আসছে নেমে নিষ্ঠুর অন্যায়।[১]

পৃথিবীর ইতিহাসে আবার laws of the jungle ফিরিয়া আসিল। মানুষের মধ্যে সুপ্ত পশুটিকে শিক্ষায়, শাসনে, উপদেশে শমিত করিবার যে চেষ্টা এত যুগ ধরিয়া চলিতেছে, তাহাকে ব্যর্থ করিয়া সভ্যতার যে বিকট মূর্তি আজ ধরিত্রীর বুকে দেখা দিয়াছে, কবি তাহার নাম দিলেন 'দন্তুর সভ্যতা।'[২] কবি অমিয় চক্রবর্তীকে লিখিতেছেন, "কয়েক শতাব্দী পূর্বে য়ুরোপীয় সভ্যতা হঠাৎ সদাগরী শাবক প্রসব করতে শুরু করেছিল। তারা খাবার সন্ধানে ঘুরে বেড়াতে লাগল আমাদের এশিয়া-আফ্রিকার পাড়ায়, ওদের মধ্যে কেউ কেউ ছিল মোটা মোটা পিণ্ড চর্ব্য চোষ্য লেহ্য নানাবিধ আকারে। এই ভোজের লোভনীয় মাংসগন্ধ পৌঁচ্ছিল য়ুরোপীয় নাসারন্ধ্রে। যেসব বঞ্চিত শাবকদের জিবে জল আসছিল অথচ মুখে গ্রাস জুটছিল না, তাদের জঠরানল ঠাণ্ডা ছিল না। অবশেষে ভুক্ত অভুক্ত দুইপক্ষের মধ্যে লেগে গেছে কামড়াকামড়ি। একদা ছিল শিকার এবং শিকারীর পালা, এবার শুরু হল শিকারী এবং শিকারীর পালা। য়ুরোপ-জননীর পক্ষে এটা শোকাবহ। আজ সে কাতর কণ্ঠে বলছে শান্তি চাই। কিন্তু শান্তি তো বাইরে থেকে আসে না ভিতরে তার উৎস।⋯ লুব্ধ অভ্যাসবশত অন্যদের না খেয়ে যাদের চলে না সেই মাংসাশীদের মধ্যে হনন-নীতি কিছুতেই থামতে পারে না। বহুদিন থেকে এদের কারো বা সামনের দিকে প্রকাশ্যে, কারো বা কসের দিকে গোপনে দাঁতগুলি কী অস্বাভাবিক রকমে বেড়ে চলেছিল আজকের দিনে বড়ো ক'রে বদন ব্যাদান করতেই ভীষণ ভাবে সেটা প্রকাশ পেল।"

কিন্তু এই 'দন্তুর সভ্যতা' কখনই মানবের শেষ কথা হইতে পারে না—এইটি হইতেছে কবির বিশ্বাস। কবি মনে করেন যে, অভিব্যক্তির তপস্যায় উদ্ভিদ, পশুপক্ষী যেমন একটা সুশ্রীতায় পৌঁছিয়াছে, মানবের অন্তরের মধ্যে সেইরূপ

১ খুচরো কবিতা : ছড়া (১) 'সুবলদাদা আনলে টেনে' (১৫ মে), মানসী (২২ মে), অভিশাপ (২২ মে), নামকরণ (২৪ মে), অন্তঃশীলা (২০ মে), আত্মছলনা (২৯ মে), অপঘাত (২৯ মে। ১ জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৭)। নবজাতকের উত্তরকাণ্ড (৩১ মে), বিমুখতা (জুন)। আমাদের মনে হয় সানাই-এর অন্তর্গত অ-তারিখী আরও কতকগুলি কবিতা এই সময়ের রচনা। দ্র অমিয় চক্রবর্তীকে লিখিত পত্র ২৫ মে ১৯৪০ [১১ জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৭]; প্রবাসী ১৩৪৭ আষাঢ়।

২ কালিম্পং ২০ জুন ১৯৪০, প্রবাসী ১৩৪৭ শ্রাবণ পৃ ৪২৩।

একটি সু-সম বোধ জাগিবে। "দেখছি এতে স্খলন ঘটে, ছন্দ মেলে না, ওজনের ভুল হয়, বুঝতে পারি তিনি সর্বশক্তিমান নন, সেইজন্যে তাঁকে এত কাটাকুটি করতে হয়, সেই কাটাকুটির দুঃখ আমরা এড়াব কী ক'রে। আমাদের সেই চেষ্টাই নৈতিক চেষ্টা, যে চেষ্টায় কাটাকুটির কারণের শোধন হয়, জগৎগুরুরা তারি ধ্যান করেছেন।...তা যদি না হ'ত তবে যাঁরা সত্যের জন্যে মঙ্গলের জন্যে martyr হয়েছেন তাঁদের পাগল বলতুম। উলটে এই কি প্রমাণ হচ্ছে না যে যারা তাঁদের বিদ্ধ করেছে, তারাই মত্ত তারাই অন্ধ।"[1]

মনের এই কথাটিই ব্যক্ত করিয়াছিলেন 'অভিশাপ' কবিতায় একমাস পূর্বে (১৯৪০ মে ২২):

রক্তমাখা দন্তপংক্তি হিংস্র সংগ্রামের
 শতশত নগর গ্রামের
 অন্ত্র আজ ছিন্ন ছিন্ন করে ;...
যে লোভ-রিপুরে
 লয়ে গেছে যুগে যুগে দূরে দূরে
 সভ্য শিকারীর দল পোষমানা শ্বাপদের মতো,
 দেশবিদেশের মাংস করেছে বিক্ষত,
লোলজিহ্বা সেই কুক্কুরের দল
 অন্ধ হয়ে ছিঁড়িল শৃঙ্খল,
 ভুলে গেল আত্মপর ;
আদিম বন্যতা তার উদ্বারিয়া উদ্দাম নখর
 পুরাতন ঐতিহ্যের পাতাগুলা ছিন্ন করে,
 ফেলে তার অক্ষরে অক্ষরে
 পঙ্কলিপ্ত চিহ্নের বিকার। (জন্মদিনে ২১)[2]

ভারতের তথা পৃথিবীর ঘনায়মান জটিল রাজনীতি কবিকে খুবই ম্রিয়মাণ করে ; ভাবিতেছেন স্বাধীনতার প্রতীক আমেরিকা বুঝি কিছু শান্তিদান করিতে পারিবে। ১৯৪০ জুন ১৫ কালিম্পং হইতে তিনি আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টকে নিম্নলিখিত কেব্‌ল পাঠান: "Today, we stand in awe before the fearfully destructive force that has so suddenly swept the World. Every moment I deplore the smallness of our means and the feebleness of our voice in India, so utterly inadequate to stem, in the least, the tide of evil that has menaced the permanence of civilization.

"All our individual problems of politics today have merged into one supreme world politics, which, I believe, is seeking the help of the United States of America as the last refuge of the spiritual man, and these few lines of mine merely convey my hope, even if unnecessary, that she will not fail her mission to stand against the Universal disaster that appears so imminent." কিন্তু এ যে কবির বাণী, রাজনৈতিকদের হৃদয়ে তাহা প্রবেশ করে না।

কবির এই সময়ের সকল রচনাই জগদ্ব্যাপী মারণযজ্ঞের নিন্দা নহে, আপন ক্লান্তমনের ক্ষোভপ্রকাশ নহে। এমন সব কবিতা আছে যাহা অত্যন্ত ব্যক্তিগত ও লিরিক্যাল—'সানাই'-এর কবিতাগুলি তারই দৃষ্টান্ত। সেই ব্যক্তিগত কথার আমেজ পাই 'ছেলেবেলা'র খসড়ায় যাহার কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। ছেলেদের জন্য কিছু লিখিবার প্রেরণা যেখান হইতে আসুক,—নিজ জীবনেরই ছেলেবেলার কথা বলার কারণ আরও গভীরে। বার্ধক্যের সঙ্গে সঙ্গে পুরাতন স্মৃতির মধ্যে ঘুরিবার যে স্বাভাবিক ইচ্ছা মানুষমাত্রেরই মধ্যে দেখা দেয়, কবির শেষ জীবনে সেটি খুবই স্পষ্টভাবে দেখা দিয়াছে। "কিছুকাল হোলো একটা কবিতার বইয়ে এর কিছু কিছু চেহারা দেখা দিয়েছিল, সেটা গদ্যের ফিল্‌মে। বইটার নাম 'ছড়ার ছবি'। তাতে বকুনি ছিল কিছু নাবালকের, কিছু সাবালকের।

১ মহামানবের সভা, ১৯৪০ জুন ২০, কালিম্পং, প্রবাসী . ৩৪৭ শ্রাবণ পৃ ৪২৪-২৫। এইদিন 'দস্তুর সভ্যতা' পত্রখানি লিখিত।

২ ১৩৪৭ জ্যৈষ্ঠ ১২ কালিম্পং হইতে কবি উদ্বোধন কার্যালয় হইতে স্বামী জগদীশ্বরানন্দ অনূদিত শ্রীমদ্ভগবতগীতা ও স্বামী গম্ভীরানন্দ সম্পাদিত 'স্তবকুসুমাঞ্জলি' উপহার পাইয়া পত্র দেন।

তাতে খুশির প্রকাশ ছিল অনেকটাই ছেলেমানুষি খেয়ালের। এই বইটাতে বালভাষিত গল্পে।" (ছেলেবেলা, ভূমিকা)। "Symbolic memory is the process by which man not only repeats his past experience but also reconstructs this experience. Imagination becomes a necessary element of true recollection."[১] কবিজীবনের শেষ কয় বৎসর সংকীর্ণ বাল্যজীবনের কয়েকটি অভিজ্ঞতা ও স্মৃতি ঘিরিয়া সাহিত্য নানাভাবে পল্লবিত হইয়াছে। এই স্মৃতির কেন্দ্রে অনেকখানি ছিলেন বউঠাকুরাণী কাদম্বরী দেবী। মৈত্রেয়ী দেবী লিখিতেছেন, "বিস্মিত মনে তাই ভাবি, এত দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানের পরে যে স্নেহের স্মৃতি এমন ওতপ্রোতভাবে তাঁর জীবনে জড়িয়েছিল, তাঁর কল্পনায় মাধুর্য বিস্তার করত, অসংখ্য কবিতায় কবিত্বের কেন্দ্র হোতো, সে না জানি কি প্রভাবমণ্ডিত ছিল। কিংবা কবির মন তার আপন আলোতেই সৃষ্টি করে জগৎ, বাইরে তার অবলম্বন উপলক্ষ্য মাত্র; তবুও এ কথা মনে না ক'রে পারা যায় না, এমন অভূতপূর্ব বিরাট প্রতিভার মধ্যে এত গভীর দীর্ঘকালস্থায়ী প্রভাব যিনি বিস্তার করতে পারেন—তিনি কম প্রতিভাশালিনী নন।"[২]

প্রত্যাবর্তনের পর

কালিম্পং হইতে কবি কলিকাতায় ফিরিলেন আষাঢ়ের মাঝামাঝি (১৯৪০ জুন ২৯)। সেইদিন সন্ধ্যায় বিচিত্রা-ভবনে 'গীতালি' সমিতির অধিবেশন, কবিই উদ্বোধক। তদুপলক্ষ্যে কবি সংগীত সম্বন্ধে একটি মৌখিক ভাষণ দান করেন; কবি বলেন যে, "আমার গান যাতে আমার গান ব'লে মনে হয়, এইটি তোমরা করো।...স্টীম রোলার চালিয়ে তাকে চেপ্টা করা যেতে পারে, কিন্তু তাতে দরদ থাকবে না।" কবির এই দুর্ভাবনার কারণ ছিল। লোকে তাঁহার গানকে বিকৃত করিয়া গাহে তাহা তিনি জানেন—স্বকর্ণেও বহুবার শুনিয়াছেন। কবি একবার গল্প বলিয়াছিলেন যে গয়ায় একবার এক মজলিশে 'আমার মাথা নত করে দাও' গানটি একজন গান করেন; কবি পরে বলেন 'সে গান শুনিয়া আমার মাথা সত্যই নত হইয়া গেল।' এই ভাষণে কবি আরও বলেন, "আজ বাংলাদেশে গানে একটা খেলো ভাব এসে পড়েছে। কারণ, গান নিয়ে দোকানদারী প্রবল হয়ে উঠেছে। আমি তো ভীত হয়ে পড়েছি। দোকানের মাপেতে দর অনুসারে বাঁকাচোরা ক'রে তার রসটস চেপেচুপে চলেছে আমারই গান।" এই নাতিদীর্ঘ ভাষণে নিজ গান সম্বন্ধে কবির মনের দুঃখটি প্রকাশ পাইয়াছে।[৩] কলিকাতায় থাকিতে থাকিতে আর একদিন সন্ধ্যায় 'ছেলেবেলা'র কিছু অংশ একটি ঘরোয়া বৈঠকে পড়িয়া শুনাইলেন।

কলিকাতায় কয়েকদিনের জন্যও আসিলে কবিকে নানা কাজের মধ্যে এখনো জড়াইয়া পড়িতে হয়। আশী বৎসর বয়সেও লোকে তাঁহাকে রেহাই দেয় না। আচার্য জগদীশচন্দ্রের পত্নী অবলা বসু প্রতিষ্ঠিত নারীশিক্ষা সমিতি একটি বিশিষ্ট প্রতিষ্ঠান; তাহার অন্তর্গত বিধবাদের শিক্ষাকেন্দ্র বাণীভবনে ২ জুলাই কবিকে লইয়া যাওয়া হয়। এখানে কবি বিধবা ছাত্রীদের সম্বোধনে বলেন যে আত্মমর্যাদা অনুভব ও অন্ধসংস্কার ত্যাগ ব্যতীত আত্মপ্রতিষ্ঠ হওয়া যাইবে না।

১ Cassirer, *An essay on Man*, p 82.

২ মংপুতে রবীন্দ্রনাথ পৃ ২০৭; তু গানের মত্র, ১৯৪০ জুলাই ১৮, সানাই, "চাবি করা চুরি, প্রাণের গোপন দ্বারে প্রবেশের সহজ চাতুরী," দ্র জীবনস্মৃতি, 'ঘরের পড়া' পরিচ্ছেদে চাবি চুরির কথা আছে।

৩ সমসাময়িক দৈনিক ১৩৪৭ আষাঢ় ১৭।

কবি কলিকাতায় থাকিতে থাকিতে একদিন (১৯৪০ জুলাই ১) সুভাষচন্দ্র তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসেন। তাঁহাদের মধ্যে কী কথোপকথন হয় তাহা আমরা জানি না; তবে পরদিন য়ুনাইটেড্ প্রেস মারফত কবির এক বিবৃতি বাহির হইল; তাহাতে কবি বলিলেন, "অল্প কয়েকদিন হোলো আমার কোনো ভাষণে আমি দেশের লোকের কাছে যে বেদনা জানিয়েছিলাম সেটাতে বিশেষভাবে সুভাষচন্দ্রকে লক্ষ্য করা হয়েছে বলে একটা অনুমান সাধারণের মধ্যে রাষ্ট্র হয়ে গেছে, সেটা আমার পক্ষে লজ্জার বিষয়, কারণ ইঙ্গিতের মধ্যে প্রচ্ছন্ন রেখে ব্যক্তি-বিশেষকে এরকম গঞ্জনা আমার স্বভাবসংগত নয়।

"মোকাবিলায় আমি সুভাষকে কখনো ভৎ‌সনা করিনি তা নয়, করেছি তার কারণ তাঁকে স্নেহ করি। কিন্তু সেদিন আমি সাধারণত বাংলাদেশের সেই শ্রেণীর লোককেই ধিক্কার জানিয়েছিলুম, যাঁরা কাজ করেন না, কলহ করেন, দল বাঁধতে গিয়ে দল ভাঙেন।[১]... ব্যক্তিগতভাবে সুভাষকে আমি স্নেহ করি।... তিনি দেশকে অন্তরের সঙ্গে ভালোবাসেন এবং দেশবিদেশের রাজনীতি চর্চা করেছেন সেইজন্য তাঁর কাছে আমি আশা করি এবং দাবি করি তিনিও দেশকে তার বর্তমান দুর্গতির জটিলতা থেকে উদ্ধার করবেন, তার সাংঘাতিক অনৈক্য গহ্বরের উপরে সেতু বন্ধন করবেন, তাঁর প্রতি দেশের সকল শ্রেণীর লোকের বিশ্বাসকে উদ্বুদ্ধ করবেন, তাঁর দেশসেবা সার্থক হবে। চারিদিকে দলীয় আঘাতে অভিঘাতে তাঁর মনকে উদ্‌ভ্রান্ত না করে, তাঁর প্রতি আমার এই সস্নেহ শুভকামনা।"[২]

বলা বাহুল্য এইসব বাক্‌বিতণ্ডার মধ্যে স্বেচ্ছায় নামিবার বয়স আর নাই; তবে বহুলোকে কবির স্নেহের ও দেহের দুর্বলতার সুযোগ গ্রহণ করিয়া তাঁহার নিকট হইতে আপনাদের অনুকূলে বাণী আদায় করিয়া লইতেন। মাঝে একবার দৈনিক কাগজে মোটা অক্ষরে মুদ্রিত হইল রবীন্দ্রনাথ কন্‌গ্রেসের চারি আনার সদস্য হইয়াছেন! এই শ্রেণীর স্নেহের উপদ্রব বহুভাবে ভোগ করিয়াছেন।

সুভাষ সম্বন্ধে কবির ভাষণ প্রকাশিত হইলে সমসাময়িক আনন্দবাজার পত্রিকার (১৩৪৭ আষাঢ় ২০) সম্পাদকীয় বীথিতে এই ঘটনার সম্বন্ধে নিম্নলিখিত মন্তব্য প্রকাশিত হয়: "প্রায় দুই মাস পূর্বে রবীন্দ্রনাথের 'স্বদেশীযুগের স্মৃতি'কে উপলক্ষ্য করিয়া বাংলাদেশের কয়েকখানি কাগজে যে মাতামাতি শুরু হইয়াছিল এবং ঐ মর্মস্পর্শী প্রবন্ধটি সুভাষচন্দ্রের বিরুদ্ধে অত্যন্ত হীন ও নির্লজ্জ প্রচারকার্যে ব্যবহার করিবার যে কুৎসিত সাড়া পড়িয়াছিল, তাহার উত্তরে আমরা লিখিয়াছিলাম, 'তাঁহার [কবির] লেখাকে কেহ দলগত স্বার্থসিদ্ধি করিবার কদর্য কার্যে ব্যবহার করিতে পারে, তাহা বোধ হয় কবি স্বপ্নেও ভাবেন নাই। তাঁহার লেখার এমন অপপ্রয়োগ আর কখনও হইয়াছে বলিয়া স্মরণ করিতে পারি না'।" দীর্ঘ দুই মাস পরে কবি সেই আপত্তি জানাইয়াছেন, আরও কিছুদিন পূর্বে জানাইলেই ভালো করিতেন। কারণ এই সময়ে হলওয়েল মনুমেণ্ট স্থানান্তরিত করিবার জন্য আন্দোলনের ফলে সুভাষকে বাংলা গবর্মেণ্ট পুনরায় গ্রেপ্তার করিয়াছেন। আনন্দবাজার পত্রিকার সম্পাদক লিখিতেছেন, "সমগ্র দেশ কবির এই শুভ কামনায় যোগ দিতেছে। আমরা বিশ্বাস করি কারাপ্রাচীরের অন্তরালেও কবির আশীর্বাদ সুভাষচন্দ্রের নিকট পৌছিবে।"[৩]

১ তু সমুদ্রপাড়ি, আরবসমুদ্র, ১৭ জ্যৈষ্ঠ ১৩১৭, পথের সঞ্চয়, র-র ২৬ পৃ ৪৮৮।

২ আনন্দবাজার পত্রিকা ১৩৪৭ আষাঢ় ২০।

৩ প্রবাসী, বিবিধ প্রসঙ্গে ১৩৪৭ শ্রাবণ পৃ ৫-১০ লিখিতেছেন, "বাংলা সরকার সুভাষবাবুকে বন্দী করিয়া নিজেদের কোন সুবিধা করিতে পারেন নাই, সুবিধা ও উপকার করিয়াছেন সুভাষবাবুর ও তাঁহার দলের লোকদের।...সম্প্রতি রবীন্দ্রনাথ সুভাষবাবুর গ্লানি মোচনের নিমিত্ত যে বাণীর প্রচার করাইয়াছেন, তাহা হইতেও এই সুবিধা কিছু হইয়াছিল কিনা বলিতে পারি না।"

কলিকাতা বাসকালে ভূপর্যটক রমানাথ বিশ্বাস কবির সহিত দেখা করিতে আসেন ও সেই দিন কবি যান অসুস্থ ডাক্তার নীলরতন সরকারকে দেখিবার জন্য।

গ্রীষ্মাবকাশের পর বিদ্যালয় খুলিবার সঙ্গে সঙ্গেই কবি শান্তিনিকেতনে ফিরিলেন ৩ জুলাই। কালিম্পঙে যে খুচরো কবিতা লিখিতেছিলেন, তাহার ধারা এখানে আসিবার পরেও চলিতেছে, সে কবিতাগুলি 'সানাই'-এর অন্তর্গত।[১]

এবার আশ্রমে ফিরিয়া কবি বিদ্যালয়ের অধ্যয়ন অধ্যাপনার দিকে দৃষ্টি দিয়াছেন; নিজে বড়ো ছেলেদের বাংলার ক্লাস লইতেছেন; এ কাজ তাঁহার বয়সে খুবই ক্লান্তিকর তবুও তরুণদের মনের স্পর্শ পাইবার জন্য তাহাদের আহ্বান করেন। তপোবন[২] প্রবন্ধটি পড়াইবার সময় কবি যে কয়টি কথা বলেন, তাহা হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি। কবি বলেন, "প্রথমেই ব'লে রাখা দরকার, ঐতিহাসিক তপোবনের কথা আমি জানিনে। কেউ জানে ব'লে আমি বিশ্বাস করিনে। তপোবনের কথার উল্লেখ আছে পুরাণে, কিন্তু এত অসম্ভব অলৌকিক অতিপ্রাকৃত কাহিনীর সঙ্গে সে জড়িত যে তাকে ঐতিহাসিক সত্য ব'লে বিশ্বাস করতে কাউকে অনুরোধ করিনে।" কয়েকটি অলৌকিক কথার উল্লেখ করিয়া কবি বলেন 'এমন সব কথা বিশ্বাস করবার আশ্চর্য শক্তি যাঁদের আছে, তাঁদের পড়াশুনো করবার দরকার নেই।' কবির মতে 'তপোবনের জনশ্রুতি যখন কাব্যে পুরাণে দেখা দিয়েছিল তখন তার অস্তিত্ব এক কল্পনা ছাড়া আর কোথাও ছিল না।' রবীন্দ্রনাথের পক্ষে তপোবন সম্বন্ধে এই মন্তব্য করার কারণ ছিল। তাঁহার তপোবন সম্বন্ধে ভাষণ ও নানা উক্তির সমালোচনা হইয়াছিল ঐতিহাসিক মহলে। কবি সেসব কথা জানিতেন বলিয়া আজ তিনি স্পষ্ট করিয়া তপোবন বলিতে যথার্থ কী বুঝায় তাহাই পরিষ্কার করিয়া বলেন। অধ্যাপনার মাঝে মাঝে বুধবারে[৩] মন্দিরে উপদেশ দান করিতেছেন, দীর্ঘকাল তিনি মন্দিরে উপদেশ দেন নাই।

এই সব নিত্যকর্মের মধ্যে সামান্য লেখকদের গ্রন্থের কাহারও পাণ্ডুলিপি দেখিয়া দেন, কাহারও প্রকাশিত গ্রন্থের প্রশংসাপত্র লেখেন। আমাদের আলোচ্যপর্বে (শ্রাবণ ১৩৪০) শান্তিনিকেতনের পদার্থবিজ্ঞানের অধ্যাপক প্রমথনাথ সেনগুপ্ত[৪] কবির প্রেরণায় 'পৃথ্বীপরিচয়' নামে ছোটো একখানি বিজ্ঞানের বই লেখেন। সে-সম্বন্ধে প্রমথনাথ গ্রন্থকারের নিবেদনে বলেন, "বিজ্ঞানের ভাণ্ডার থেকে কিছু কিছু তথ্য আহরণ ক'রে শিক্ষার্থী ও জনসাধারণের চিত্তক্ষেত্রে বর্তমান যুগের বিজ্ঞান-শিক্ষার ভূমিকা ক'রে দেবার অতিগুরুভার অর্পণ করেছেন 'গুরুদেব' আমাদের মতো অক্ষমের হাতে। এই বইখানি আগাগোড়া পড়ে, দরকার মতো ভাষা ও তথ্যের পরিবর্তন করতে গুরুদেব অনেক কষ্ট স্বীকার করেছেন। তাঁর সহায়তা না পেলে আমার পক্ষে এই বই লেখা অসম্ভব ছিল।"

এই বইখানি প্রকাশিত হয় লোকশিক্ষা গ্রন্থমালায়। বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ ও লোকশিক্ষা গ্রন্থমালা[৫] একই উদ্দেশ্যে প্রকাশিত হয় নাই। লোকশিক্ষা গ্রন্থমালার উদ্দেশ্য সহজ ভাষায় বিষয়কে সাধারণ পাঠকের উপযোগী করা। কবি প্রমথনাথের বই-এর ভূমিকায় লিখিতেছেন, "বিষয় হিসাবে বিজ্ঞান সহজে আয়ত্তগম্য নয় ব'লেই বিজ্ঞান-অধ্যাপনায়

১ সানাই-এর এই কবিতাগুলি লিখিত— ১৬ জুলাই ১৯৪০ অসম্ভব ছবি, অসম্ভব। ১৭ জুলাই, স্বপ্ন, ১৮ জুলাই, গানের মন্ত্র। ১৯ জুলাই, অবসান (সানাই-এর শেষ কবিতা)।

২ 'তপোবন' প্রবন্ধ পড়াইবার সময় যে ব্যাখ্যান করেন তাহা 'দেশ' পত্রিকায় বাহির হয়; দ্র প্রবাসী ১৩৪৭ ভাদ্র পৃ ৬৫৭-৫৯। 'মানসী' কাব্যের ভূমিকা, দেশ ১৩৪৭, দ্র প্রবাসী ১৩৪৭ আশ্বিন; মনোবিকাশের ছন্দ, দেশ; দ্র প্রবাসী ১৩৪৭ অগ্রহায়ণ।

৩ বুধবারে মন্দিরের উপদেশ—আশ্রমের আদর্শ ১৩৪৭ শ্রাবণ ৮, প্রবাসী ১৩৪৭ ভাদ্র পৃ ৬৫; 'ভারতবর্ষের ধর্ম' ১৫ শ্রাবণ, প্রবাসী ১৩৪৭ আশ্বিন পৃ ৭৫০; মন্দিরে অভয় বাণী ২২ শ্রাবণ, ১৩৪৭ প্রবাসী ১৩৪৭ ভাদ্র পৃ ৬৬।

৪ প্রমথনাথ সেনগুপ্ত বর্তমানে খড়্গপুরের টেকনলজিক্যাল মহাবিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার।

৫ লোকশিক্ষা গ্রন্থমালার প্রথম গ্রন্থ বিশ্বপরিচয়, দ্বিতীয় গ্রন্থ প্রাচীন হিন্দুস্থান ও তৃতীয় গ্রন্থ পৃথ্বীপরিচয়।

শিক্ষকেরা সচরাচর দুরূহ শব্দের আশ্রয় নিয়ে থাকেন। দুর্বোধ শিক্ষার ভার দুর্গম ভাষার পথে বহন করতে গিয়ে প্রথম শিক্ষার্থীদের মন পীড়িত পিষ্ট হোতে থাকে, এবং তাহাদের শক্তির প্রভূত অপচয় ঘটে। এই অনর্থক মানসিক ক্ষতি নিবারণ অত্যন্ত আবশ্যক ব'লে আমি মনে করি। জনসাধারণের কাছে বিজ্ঞানের দ্বার উদ্‌ঘাটনের চেষ্টা পাশ্চাত্ত্য দেশে আজকাল বহুপ্রচলিত। এই কর্তব্যসাধনে যাঁরা প্রবৃত্ত তাঁরা কেবল যে বিখ্যাত বিজ্ঞানবিদ্‌ তা নয়, তাঁরা ভাষা ব্যবহারে নিপুণ। তাঁরা শিক্ষণীয় বিষয়কে যথোচিত সরল করতে চেষ্টার ত্রুটি করেন না। দেশের চিত্তক্ষেত্রে বিজ্ঞানের সেচন ব্যাপারকে ব্যাপক ক'রে তোলা তাঁরা কত বড়ো সতর্ক সাধনার বিষয় ব'লে মনে করেন এর থেকে তার প্রমাণ হয়। আমাদের দেশে জনসাধারণ যেখানে বিজ্ঞানের পরিচয় থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত সেখানে সহজ প্রণালীতে বিদ্যাদানের অধ্যবসায়কে আমি পুণ্য কর্ম ব'লে গণ্য করি। লোকশিক্ষাসংসদ এই কাজের ভার গ্রহণ করতে প্রবৃত্ত।"

রবীন্দ্রনাথ কবি, কিন্তু তিনি বিশ্বাস করিতেন যে মানুষের মনের মুক্তি হইবে বিজ্ঞান চর্চায়; মূঢ়তার অপনোদন না হইলে যথার্থ সত্যের জ্যোতি কখনো উদ্‌ভাসিত হইতে পারে না। সত্য অখণ্ড—বিজ্ঞানের সত্যের সহিত মানবতার সত্য, অধ্যাত্মজীবনের সত্যর বিরোধ নাই। সমস্ত জ্ঞানের বুনিয়াদ বিজ্ঞান-চর্চা।

কবির দৃষ্টি ও সহানুভূতি ছিল বহুব্যাপক। আমাদের আলোচ্যপর্বে জীবনী-লেখক সামান্য একখানি গ্রন্থ লেখেন; কবির সম্মুখে সেটি দিলে তিনি ভালো করিয়া দেখিলেন ও পরে লিখিয়া দিলেন, (১৩৪৭ আষাঢ় ২৫) "জ্ঞানভারতীর সম্পাদনায় শ্রীযুত প্রভাতকুমারের অধ্যবসায় সার্থক হয়েছে। বাংলা সাহিত্যের শব্দভাণ্ডারে এই গ্রন্থের সংগ্রহ আদরনীয়।" এইভাবে কত লোককে যে তিনি উৎসাহ বাক্য দিয়াছেন সে সম্বন্ধে তথ্য এখনো সংগৃহীত হয় নাই।[১]

সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির কাজ বোলপুর শহরে টেলিফোন উন্মোচন। কয়েক বৎসর পূর্বে রবীন্দ্রনাথ অসুস্থ হইয়া পড়িলে শান্তিনিকেতনবাসীরা কিরূপ বিব্রত হইয়া পড়িয়াছিলেন, তাহা আমরা জানি। সেই হইতে গবর্মেণ্টের সহিত শান্তিনিকেতনের কর্তৃপক্ষের পত্র ব্যবহার চলে ও অবশেষে ২৪ জুলাই (১৯৭০) বোলপুরে টেলিফোন কেন্দ্র স্থাপিত হইল। প্রাতে কবি শান্তিনিকেতনের উত্তরায়ণ হইতে কলিকাতাস্থ পোস্ট ও টেলিগ্রাফ বিভাগের প্রধানের সহিত বাক্যালাপ করেন। অপরাহ্ণে বোলপুর টেলিফোন এক্‌সচেঞ্জে গিয়া কবি উহা উন্মোচন করিয়া আসেন।

কিন্তু কবিজীবনের সবটাই কবিতা লেখা, ভূমিকা লেখা বা সভা কর. নহে; হাসি-বিদ্রূপ তাঁহার জীবনের অঙ্গ। আজ জীবনসন্ধ্যায় সেই চিরসরসতা কিছু ম্লান হয় নাই। 'কালান্তর' (২৯ জুলাই) ও 'তুমি' (৪ অগস্ট) কবিতা দুইটি এই মনোভাবের উদাহরণ। তবে 'কালান্তর' কবিতাটি প্রহাসিনীর মধ্যে সংযোজিত হইলেও তাহাকে বিশুদ্ধ হাস্যোদ্দীপক বলা যায় না; কারণ কালান্তরজনিত দীর্ঘনিশ্বাস ছন্দ মধ্যে স্পষ্ট শোনা যাইতেছে। দ্বিতীয় কবিতা[২] 'তুমি'র লক্ষ্যস্থল হইতেছেন সুধীরচন্দ্র কর ও সুধাকান্ত রায়চৌধুরী। 'ঐ ছাপাখানার ভূত' [Printer's Devil] দিয়া কবিতাটির সূত্রপাত। এই সময়ে সুধীরচন্দ্র প্রকাশন বিভাগের কাজের সঙ্গে যুক্ত—কবির আপিসেই কাজ করেন, লেখার কপি বা প্রুফের তাড়া লইয়া ঘনঘনই দেখা-সাক্ষাৎ করিতে যাইতে হয়। কবির শেষ কয় বৎসরের

১ গত বৎসর (১৯৩৯ সেপ্টেম্বর ৪) কুঞ্জেশ্বর মিশ্র রচিত রামায়ণবোধ বা বাল্মীকির আত্মপ্রকাশ নামক গ্রন্থ পাইয়া কবি লিখিয়াছিলেন, "সাধনালোকপ্রদীপ্ত 'রামায়ণবোধ' গ্রন্থখানি পড়িয়া তৃপ্তিলাভ করিলাম। ইহাতে যে মননশীলতার পরিচয় আছে, তাহা শ্রদ্ধার যোগ্য।" প্রবাসী ১৩৪৬ পৌষ, পুস্তক-পরিচয় পৃ ৩৮৬।

২ প্রহাসিনী সংযোজন, র র ২৩ পৃ ৬৩, ৬৫; দ্র, নিরুক্ত মাসিক পত্র ১৩৪০।

টুকরো টুকরো হাসিপ্রলাপের কবিতাগুলির কিছু 'খাপছাড়া'র সংযোজনী অংশে গিয়াছে তবে এছাড়াও বহু ছড়া ইতস্তত ছড়াইয়া আছে—সমসাময়িক প্রবন্ধাদির মধ্যে তাহাদের সন্ধান মেলে।

বিশ্বভারতীর ঘটনার দিক হইতে এখানে বলিবার মতো বিষয় হইতেছে ধীরেন্দ্রমোহন সেনের শ্রীনিকেতন ত্যাগ। তিনি সেখানকার শিক্ষাবিভাগের অধিকর্তা ছিলেন (১৯৩৮ জুলাই হইতে) এবার বৃহত্তর কর্মক্ষেত্রে আহ্বান আসিল। তিনি দিল্লিতে Technical Assistant to Education Commissioner [Sergaent] also Secretary to the Advisory Bord of Education নিযুক্ত হন ১৯৪০ অগস্ট ১। শ্রীনিকেতন শিক্ষাবিভাগের ভার গ্রহণ করিলেন মার্জোরি সাইক্‌স (M. Sykes)। ইনি কোয়েকার সম্প্রদায় হইতে প্রেরিত হন।

এই শ্রাবণ (১৩৪৭) মাসে কবির কাব্যখণ্ড 'সানাই' প্রকাশিত হইল। সানাই-এ বিচিত্র সুরের সমাবেশ হইয়াছে। ইহার কতকগুলি ছোটো ছোটো কবিতার স্বতন্ত্র সংগীত রূপ প্রচলিত আছে; কোথাও বা গান আগে রচিত হয়, কোথাও বা কবিতা।[১] আমরা পূর্বেই বলিয়াছি যে গত কয়েক বৎসরের মধ্যে যেসব খুচরা কবিতা জমা হইয়াছিল, তাহার কতকগুলি নবজাতক খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছিল; অবশিষ্টগুলি এবার সানাই-এর মধ্যে সংগৃহীত হইল। নবজাতকের ন্যায় এই কাব্যখণ্ডেও কবিতাগুলির মধ্যে নিবিড় ভাবানুষঙ্গ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, তবে স্তবকে স্তবকে রচনাকালের নৈকট্যহেতু কিছু কিছু ভাবের মিল থাকিতে পারে। এই কাব্যের বিশেষ লক্ষণীয় ইহার গানগুলি বিবাহ-অনুষ্ঠানের মাঙ্গলিক সূচনা করে 'সানাই' কবিতা।

এদিকে শান্তিনিকেতনে খুবই উৎসাহ; সাতই অগস্ট (১৯৪০) অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ হইতে কবিকে সাহিত্যাচার্য উপাধি দান করিবার জন্য স্যর মরিস গোয়ার প্রমুখ সুধীগণ আসিতেছেন। তাঁহাদের

১ দ্রষ্টব্য তুলনামূলক তালিকা, র-র ২৪ পৃ ৪৯১।

সানাই-এর কবিতা	গীতবিতানে প্রকাশিত গীতরূপের প্রথম ছত্র : পৃষ্ঠাঙ্ক
অনাবৃষ্টি ১৩।১।১৯৪০	মম দুঃখের সাধন যবে করিনু নিবেদন পৃ ৩৬১
নতুন রঙ ১৩।১।৪০	ধূসর জীবনের গোধূলিতে পৃ ৩৬৪ ও ৩৭৫। ২টি পাঠ।
গানের খেয়া ১৩।১।৪০	আমি যে গান গাই পৃ ৩৬৩।
অধরা ১৩।১।৪০	অধরা মাধুরী ধরেছি ছন্দবন্ধনে পৃ ৩৬৩।
ব্যথিতা ১৩।১।৪০	ওরে জাগায়ো না পৃ ৩৬৪।
বিদায় [১৩৪৬]	বসন্ত সে যায় তো হেসে পৃ ৩৬০।
যাবার আগে [১৩৪৬]	এই উদাসী হাওয়ার পথে পৃ ৩৬০।
পূর্ণা ১০।১।৪০	ওগো তুমি পঞ্চদশী পৃ ৪৮১।
কৃপণা [জানু ১৯৪০]	এসেছিনু দ্বারে তব শ্রাবণরাতে পৃ ৪৭৮।
ছায়াছবি [১৩৪৫]	আমার প্রিয়ার ছায়া পৃ ৪৭৪। (১৯৩৮ অগস্ট ২৫)
দেওয়া-নেওয়া ১০।১।৪০	বাদল দিনের প্রথম কদম ফুল পৃ ৪৭৫। (১৯৩৯ জুলাই ৩০)
আহ্বান ১০।১।৪০	এসো গো জ্বেলে দিয়ে যাও পৃ ৪৭৬। (১৯৩৯ অগস্ট ১)
দ্বিধা [জানু ১৯৪০]	এসেছিলে তবু আস নাই পৃ ৪৭৮।
আধোজাগা [জানু ১৯৪০]	স্বপ্নে আমার মনে হল পৃ ৪৭৭।
উদ্‌বৃত্ত (১৯৩৯ সেপ ৩০)	যদি হায় জীবন পূরণ নাই হল পৃ ৩৬২।
ভাঙন (১৯৩৯ জুলাই ১২)	তুমি কোন্ ভাঙনের পথে এলে পৃ ৩৫৯।
গানের জাল [১৯৩৯]	দৈবে তুমি কখন নেশায় পেয়ে পৃ ৩৬৬।
মরিয়া [১৯৩৯]	আজি মেঘ কেটে গেছে পৃ ৪৮০।
গান (১৯৩৮ ডিসে ৮)	যে ছিল আমার স্বপনচারিণী পৃ ৩৫২ ও ৯২০।
বাণীহারা [১৩৪৬]	বাণী মোর নাহি পৃ ৩৬১।
আত্মছলনা (১৯৪০ মে ২৯)	দোষী করিব না পৃ ৩৬৬।

উপযুক্ত আতিথ্য, তাঁহাদের ভাষণের প্রত্যভিভাষণ রচনা প্রভৃতি বিষয় লইয়া কবি ও কর্তৃপক্ষ ব্যস্ত। অক্সফোর্ডের রীতি অনুসারে মানপত্র লাতিন ভাষায় লিখিত হয়; স্থির হইল বিশ্বভারতীর আচার্যরূপে রবীন্দ্রনাথও তাঁহার ভাষণ সংস্কৃতে দিবেন। পণ্ডিতদের সহায়তায় সেইভাবে ভাষণ অনূদিত ও মুদ্রিত হইল।

সেইদিন বুধবার। আমরা পূর্বে বলিয়াছি কবি গত কয়েক সপ্তাহ হইতে স্বয়ং মন্দিরে উপস্থিত হইয়া উপদেশ দান করিতেছেন। এবারকার ভাষণের মধ্যে ছিল কবির অভয় বাণী। পৃথিবীব্যাপী দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের জন্য একটা আতঙ্কের আবির্ভাব হইয়াছে— বুঝিবা বর্তমান যুদ্ধের ফলে মানবসভ্যতা লুপ্ত হয়! কবি এই আতঙ্কের বিরুদ্ধে তাঁহার মহতী বাণী উচ্চারণ করিয়াছেন; কবি সেদিন প্রাতে বলেন যে, পৃথিবীতে পুরাকালে বহু জলপ্লাবন, অগ্ন্যুৎপাত, ভূমিকম্প, ভূভাগের সমুদ্রগর্ভে নিমজ্জন প্রভৃতি হইয়া গিয়াছে। যখন সেইসব ঘটিয়াছিল, তখন সে যুগের মানুষ ভাবিয়া থাকিবে সৃষ্টি বুঝি লোপ পাইবে, প্রলয়কাল উপস্থিত। কিন্তু সেই সমুদয়ের মধ্য দিয়া পৃথিবী পূর্ণ পরিণতির দিকেই অগ্রসর হইয়া আসিতেছে। সেইরূপ নানা বিপ্লব, নানা সংগ্রামের মধ্য দিয়া মানুষ ও তাহার সভ্যতা পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হইতেছে। বস্তুত কবির মতে মানবসৃষ্টি এখনও শেষ হয় নাই। সভ্যতার ভাঙন ধরে নাই, সভ্যতা এখনো পূর্ণ হয় নাই, পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হইতেছে। ইহাই হইতেছে আশাবাদী কবির বাণী।[১] এই কথা কবি অন্যভাবে কালিম্পং হইতে অমিয়চক্রবর্তীকে এক পত্রে লেখেন, এবং একটি কবিতার মধ্য দিয়াও আংশিকভাবে ব্যক্ত করেন। সেদিন অপরাহ্ণে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের কবিপ্রশস্তির উত্তরে কবি যে কথা কয়টি বলেন তাহার মধ্যেও এই আশাবাদীর অভয় বাণী শুনিতে পাই।

সাতই অগস্ট, (১৯৪০) বাইশে শ্রাবণ (১৩৪৭) সিংহসদনে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিগণ সমবেত হইয়া রবীন্দ্রনাথকে ডক্টর অব্ লিটারেচর বা সাহিত্যাচার্য উপাধি দান করিলেন। ১৯১২ সালে কবির ইংরেজি গীতাঞ্জলি প্রকাশিত হইলে এই প্রস্তাব একবার উঠে; তখন বোধ হয় রাজনৈতিক কারণে লর্ড কর্জন সে প্রস্তাব বেশিদূর অগ্রসর হইতে দেন নাই। রোদেনস্টাইন দুঃখ করিয়া বলিয়াছিলেন যে, যে সম্মান দান করিতে ইংলন্ড কৃপণতা করিয়াছিল, ভারতের সহিত নিঃসম্পৃক্ত সুইডেন কবিকে সেই সম্মান প্রথম প্রদর্শন করিল। যাহা হউক, এতকাল পরে, কবির মৃত্যুর ঠিক একবৎসর পূর্বে ইংলন্ড কবির প্রতি শেষ সম্মান প্রদর্শন করিয়া আপনার ত্রুটির অপনোদন করিল।

সমাবর্তন সভায় ভারতের ফেডারেল কোর্টের প্রধান বিচারপতি স্যর মরিস্ গোয়ার (মৃ ১৯৫২ সেপ) ও স্যর সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিরূপে উপস্থিত হইয়াছিলেন। ভারতপ্রবাসী অক্সফোর্ডের উপাধিপ্রাপ্ত প্রাক্তন[২] ছাত্রগণ, ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিগণ, বিশ্বভারতীর সদস্য, অধ্যাপক ও বহু সুহৃদ্ সেদিন সভায় উপস্থিত হন।

অক্সফোর্ডের চিরাচরিত রীতিঅনুসারে মানপত্র লাতিন ভাষায় পঠিত হয়। রবীন্দ্রনাথও তাঁহার প্রত্যুত্তর সংস্কৃতে পাঠ করেন; অবশ্য দুইটি ভাষণই ইংরেজিতে তর্জমা করিয়া পড়া হয়।[৩] স্যর মরিস গোয়ার তাঁহার ভাষণে বলেন, "the university, whose representative I am, has in honouring you, done honour to

১ কবির অভয় বাণী, প্রবাসী ১৩৪৭ ভাদ্র, পৃ ৬৬১-৬২ 'বিবিধ প্রসঙ্গে' এই নামটি দেন রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়।

২ বঙ্গীয় শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টর মিঃ বটম্লি, হাইকোর্টের অন্যতম জজ মিঃ হেন্ডারসন, শাহেদ সুরাবর্দি, অপূর্বকুমার চন্দ, ডক্টর অমিয়চন্দ্র চক্রবর্তী, অধ্যাপক সুশোভন সরকার প্রভৃতি।

৩ প্রবাসী ১৩৪৭ ভাদ্র পৃ ৬৮১-৮৩।

itself.” একথা অতি সত্য যে, রবীন্দ্রনাথ তাঁহার জীবনসন্ধ্যায় বৃটিশ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এ সম্মান না পাইলে, তাঁহার কিছু অগৌরব হইত না, পাওয়াতেও বিশেষ গৌরব বৃদ্ধি পাইল না; তবে দেশের দিক হইতে ঘটনাটি তুচ্ছ নহে। কারণ, প্রতীচ্যের এক প্রভু জাতির অতি রক্ষণশীল বিশ্ববিদ্যালয় আজ প্রাচ্যের এক কবিকে সম্মান দান করিয়া তাঁহার বৈদগ্ধ্য স্বীকার করিয়া লইলেন।

সেদিন উৎসব সময়ে ভীষণ বৃষ্টি হয়, তৎসত্ত্বেও সিংহসদনের হল লোকাকীর্ণ হইয়াছিল। সন্ধ্যায় অতিথিদের বিনোদনার্থে ছাত্রছাত্রীরা 'শাপমোচন' অভিনয় করিয়াছিল।

উত্তেজনা উদ্বেগ শমিত হইল। আশ্রমের স্বাভাবিক শান্তজীবন যথাবিধি চলিতেছে; শ্রাবণ শুক্লাসপ্তমীর দিন (১৩৪৭ শ্রাবণ ২৫) উত্তর ভারতের ভক্তকবি গোস্বামী তুলসীদাসজির মৃত্যুতিথি শান্তিনিকেতনে উদ্‌যাপিত হইতেছে। রবীন্দ্রনাথ এই সভায় সভাপতিত্ব করেন। তাঁহার স্বাস্থ্যের যে অবস্থা তাহাতে কেবলমাত্র গোস্বামীজির প্রতি শ্রদ্ধা তাঁহাকে এই সভায় আকর্ষণ করে। কবি সভায় বলিলেন:

“তুলসীদাসের স্মৃতিবাসরে আজকে তোমরা আমাকে সভাপতিরূপে বরণ করেছ—তুলসীদাসের সাহিত্যের সঙ্গে আমি বিশেষ ভাবে পরিচিত নই, সুতরাং সে বিষয়ে বিশেষ কিছু বলা আমার দ্বারা সম্ভব হয়ে উঠবে না। নৌকোর ধ্বজা তার গৌরব বৃদ্ধি করবার জন্য, যাত্রার সময়ে ধ্বজা তাকে সহায়তা করে না। আমি কেবল মাত্র তেমনি তোমাদের স্মৃতিবাসরে গৌরব বৃদ্ধিই করতে পারব—তুলসীদাসকে জানবার সহায়তা করতে পারব না।

“ছোটো ছোটো কবিরা জন্মগ্রহণ ক'রে ভাষার গাঁথুনিকে ধীরে ধীরে শক্ত করে বেঁধে তোলে, সাহিত্যকে উন্নতির দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। সাহিত্য তাদের শক্তিসঞ্চারে যে-পরিমাণে পরিপুষ্টিলাভ করে তা দেশের জনসাধারণের কাছে ধরা পড়ে না। বড়ো কবিরা যখন তাঁদের অপূর্ব শক্তি নিয়ে অসাধারণ প্রতিভা নিয়ে জন্মগ্রহণ করেন, মহীরুহ বনস্পতির মতো তখন তাঁদের কাব্যের মূল পৌঁছায় দেশের অন্তস্তলে। সমগ্র দেশকে তাঁরা রস পরিবেশন করে থাকেন; তাঁদের কর্মকুশলতা ভাষাকে নতুন করে গড়ে তোলে, চিন্তা করবার প্রণালীকে নতুন রূপ দেয়, মানুষের চিত্তকে উদ্বোধিত করে নতুন প্রেরণায়।

“তুলসীদাস তাঁর 'রামচরিতে'র উপকরণ সংগ্রহ করেছিলেন বাল্মীকির রচনা থেকে; কিন্তু সেই উপকরণকে তিনি সম্পূর্ণ নিজের ভক্তিতে রসসমৃদ্ধ করে নতুন করে দান করেছেন। সেইটেই তার নিজস্ব দান—পুরাতনের আবৃত্তি নয়, তাতে তাঁর যথার্থ প্রতিভার প্রকাশ পেয়েছে। তিনি নতুন দৃষ্টি নিয়ে সেই পুরাতন উপকরণকে নতুন রূপ দান করে পরিবেশন করেছেন সমস্ত দেশকে। ভক্তিদ্বারা যে ব্যাখ্যায় তিনি রামায়ণকে নতুন পরিণতি দিয়েছেন সেটা সাহিত্যে অসাধারণ দান।

“বর্তমানে ইংরেজি সাহিত্যের প্রভাব সর্বত্র বিস্তৃতি লাভ করছে, মানুষের রুচিতে পরিবর্তন এসেছে। তবু তুলসীদাসের দান যুগকে সম্পূর্ণভাবে অধিকার করে আছে। এই যে সমস্ত কালকে অধিকার করা—এ সৌভাগ্য অল্পলোকেরই হয়। হিন্দীসাহিত্যে তুলসীদাসের দানকে সকলের চেয়ে বড়ো বলে গণ্য করা হয়েছে এবং চিরকাল তাঁর সে গৌরব অক্ষুণ্ণ থাকবে। তাঁর রচনা হিন্দী সাহিত্যে স্রোত বইয়ে দিয়েছে—পরিবর্তনের পথে নতুন গতিদান করেছে—হিন্দী ভাষায় গৌরব বাড়িয়েছে। অনুভবে এর সত্যতা আমাদের কাছে সহজেই ধরা পড়ে। আজ পর্যন্ত সেই স্রোত বিশিষ্ট পথ রচনা করে আধুনিক হিন্দী সাহিত্যে বয়ে চলে এসেছে।

“আমার মনে পড়ে বাল্যকালে প্রতি সন্ধ্যায় আমাদের বাড়ির দারোয়ানরা তুলসীদাসের রামায়ণ গান করত। তারা সেই গান থেকে যেন অমৃতলাভ করে সমস্ত দিনের ক্লান্তি দূর করত— তাদের অবসর সময়কে রসময় করে তুলত। তাদের ভিতর দিয়ে আমি সর্বপ্রথম তুলসীদাসের প্রতিভার পরিচয় পেয়েছি।

"বর্তমানে বাংলা এবং হিন্দী সাহিত্যে নতুন কাল এসেছে। সমস্ত পরিবর্তিত হতে চলেছে—আমাদের চিত্তের গতি বদলে গিয়েছে কালের প্রভাবে—মানুষের কাব্যরুচিকেও সে-গতি দিয়েছে বদলে। য়ুরোপের সাহিত্য আমাদের দেশের সাহিত্যকে এক নতুন পন্থায় নিয়ে গেছে—নতুন-বিকাশের পথ খুঁজে দিয়েছে। তবু এ কথাও ভুললে চলবে না—যাঁদের শিক্ষিত বলি তাঁদের প্রভাব অতি সামান্য, জনসাধারণের চিত্ত হচ্ছে দেশের যথার্থ ভূমি; যেখানে স্বভাবত প্রকৃতির প্রেরণায় ফসল ফলে সে হচ্ছে সর্বজনের চিত্তক্ষেত্র। সে-ক্ষেত্রে যথার্থ সৃষ্টির অধিকারের পথে য়ুরোপীয় সাহিত্যের প্রভাব ব্যাঘাত জন্মাতে পারবে না। দেশের সেই সর্বজনের চিত্তক্ষেত্র থেকে তুলসীদাসের অধিকার কোনো কালেই যাবে না। তাঁর দান স্থায়ী মহান প্রতিভার বিকাশ নিয়ে কালের প্রভাবকে অতিক্রম করে চিরকাল দেশকে সমৃদ্ধ করবে।"[১]

বিবিধ রচনা

বার্ধক্যের দিনগুলি কবির মন্থর গতিতে চলিতেছে। শরীর রীতিমতো ভাঙিয়া পড়িয়াছে এবং দ্রুত ভাঙিতেছে। দৃষ্টিশক্তি এখন অতি ক্ষীণ, শ্রবণশক্তিও ততোধিক দুর্বল; হাঁটিতে চলিতে অসম্ভব কষ্ট হয়। কিছুকাল হইতে ঠেলা চেয়ার-গাড়িতে ঘোরাঘুরি করেন। তৎসত্ত্বেও ছোটো বড়ো কাজের জন্য লোকও আসে, লেখার জন্য তাগিদও আসে—দর্শনপ্রার্থীর দলও আসে। শরীরের এই অবস্থাতে লিখিতে খুবই কষ্ট হয়—কিন্তু না লিখিয়াও পারেন না।

বাহির হইতে যেসব দর্শনপ্রার্থী এই সময়ে কবির সহিত মোলাকাত করিতে আসেন (১৯৪০ অগস্ট ২১) তাঁহাদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হইতেছেন নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ। বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির সভাপতি সুরেন্দ্রমোহন ঘোষ, উক্ত সমিতির সহকারী সভাপতি লাবণ্যলতা চন্দ ও রাজনৈতিক কর্মী মনোরঞ্জন গুপ্ত।[২] ইহাদের সহিত নানা বিষয়ের আলোচনা প্রসঙ্গে কবি বলেন যে রাষ্ট্রক্ষমতা অধিকারের আশুলক্ষ্যে পৌছিবার উন্মাদনায় বাংলার রাজনৈতিক কর্মিগণ ভুলিয়া যান যে ভারতবর্ষে সর্বব্যাপী বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনিতে হইলে সাংস্কৃতিক প্রগতির প্রয়োজন। তিনি বলেন ভারতের শোচনীয় সাংস্কৃতিক বিচ্ছিন্নতা বহু অশুভের মূলে রহিয়াছে। ভারতের একাংশ অপরাংশকে কতটুকু চেনে। কাশ্মীর ও কুমারিকা, আসাম ও পঞ্জাবের মধ্যে কী সাংস্কৃতিক যোগ আছে। কথাটি সংক্ষেপে উক্ত ও বিবৃত হইলেও ইহার মধ্যে যে গভীর সত্য রহিয়াছে তাহা চিন্তনীয়।[৩]

ইতিমধ্যে কবির হাতে আসিয়া পড়ে 'আধুনিক কাব্যপরিচয়' নামে একটি কাব্যসংগ্রহ। কাব্যখানি সম্পাদন করেন আবু সৈয়দ আয়ুব ও হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। 'আধুনিক' এই শব্দ সংযোগ দ্বারা বইখানিকে

১ ১৩৪৭ সালে শান্তিনিকেতনে হিন্দী সাহিত্য সম্মেলন-অনুষ্ঠিত তুলসীদাসের স্মৃতিবাসরের সভাপতিরূপে গুরুদেব কর্তৃক কথিত ও রথীন্দ্রকান্ত ঘটক চৌধুরী কর্তৃক অনুলিখিত। ১৩৭০ আশ্বিন ২০, বালুচর (পোঃ আঃ পালং, ফরিদপুর) হইতে অনুলেখক এই লেখাটি পাঠাইয়াছেন। কবি কর্তৃক ভাষণটি সংশোধিত বা অনুমোদিত হইয়াছিল কিনা জানি না।

২ মনোরঞ্জন গুপ্ত রবীন্দ্রনাথের চিত্র সম্বন্ধে 'রবীন্দ্র-চিত্রকলা' নামক একখানি গ্রন্থ লিখিয়াছেন। ইহাতে রবীন্দ্রনাথের অঙ্কিত ২০ খানি চিত্রের প্রতিলিপি আছে।

৩ সুরেন্দ্রমোহন ঘোষ ও মনোরঞ্জন গুপ্তের বিবৃতি। দ্র সমসাময়িক দৈনিক ১৯৪০ অগস্ট ২৩।

বিশিষ্টতা দান করা হইয়াছিল; কবি বইখানি পড়িয়া 'কিঞ্চিৎ বিস্মিত' হইয়া লিখিতেছেন (১৯৪০ অগস্ট ২২), "দেখলুম তার অনেক কবিতাই আমাদের কালের হাট থেকে এসেছে। তার আকৃতি চেনা তার প্রকৃতিও। তাহলে বলতে হবে আধুনিক কবিতা বহু প্রাচীন কাল থেকেই চলে এসেছে, কবির প্রেয়সী বুড়ি হয়ে মরে যায় না।... এই সংকলন গ্রন্থে এখনো অনেক কবিতা দেখলুম যাতে কাল-শিল্পী বিকৃতিকে নূতনত্ব বলে স্পর্ধা করেছে। বিকৃতি তার অস্বাভাবিকতা দ্বারা চমক লাগায়—যে জন্যে আপন পোষা জীবজন্তুর মধ্যে ইচ্ছা করে মানুষ বিরূপের সন্ধান করে। অস্বাভাবিক আকস্মিক, স্বাভাবিক চিরকালের। অদ্ভুত এবং অপূর্বের মধ্যে যে প্রভেদ সে তো কবিরাই জানে। বিজ্ঞানীর কাছে দুইয়ের মূল্যই সমান।"[১] এই কাব্যখণ্ডে 'শিশুতীর্থ' রচনাটি গদ্য কবিতার শ্রেষ্ঠ নিদর্শনরূপে সম্পাদক অন্তর্ভুক্ত করেন। ২০ অগস্ট (১৯৪০) আবু সৈয়দ আয়ুবকে কবি যে পত্র লেখেন, সে পত্রাংশ আমরা পূর্বেই উদ্ধৃত করিয়াছি।[২]

এই সময়ে কবির হাতে আরও কয়েকখানি বই আসিয়া পড়ে। চট্টগ্রাম হইতে আবুল ফজল নামে এক সাহিত্যিক 'চৌচির', 'মাটির পৃথিবী' ও 'বিচিত্রকথা' নামে তিনখানা বই কবিকে পাঠাইয়া লেখেন, 'লেখাগুলির স্থান-বিশেষও যদি রবির স্নেহরশ্মিপাতে ধন্য হয়' তিনি সুখী হইবেন। এই পত্রে নবীন লেখক বলেন যে মুসলমান সমাজের এমন কতকগুলি শব্দ আছে যাহা ব্যবহার না করিলে ঠিক সমাজচিত্র ফুটিয়া উঠে না। রবীন্দ্রনাথ 'চৌচির' গল্পটি তাঁহার 'দৃষ্টিকে ক্লিষ্ট করেও' পড়িলেন ও দীর্ঘ পত্রে তাহার জবাবও লিখিলেন। (১৯৪০ সেপ্টেম্বর ৬) এই পত্রে বাংলাভাষার মধ্যে বিদেশী শব্দপ্রয়োগ সম্বন্ধে কবির মত ব্যক্ত হইয়াছে। তিনি বলিতেছেন, "আচারের পার্থক্য ও মনস্তত্ত্বের বিশেষত্ব অনুবর্তন না করলে ভাষার সার্থকতা থাকে না। তথাপি ভাষার নমনীয়তার একটা সীমা আছে। ভাষার যেটা মূল স্বভাব তার অত্যন্ত প্রতিকূলতা করলে ভাবপ্রকাশের বাহনকে অকর্মণ্য করে ফেলা হয়।... ভাষার মূল প্রকৃতির মধ্যে একটা বিধান আছে যার দ্বারা নূতন শব্দের যাচাই হতে থাকে, গায়ের জোরে সেই বিধান না মানলে জারজ শব্দ কিছুতেই জাতে ওঠে না।"

মুসলমান লেখকদের নবসাহিত্য প্রয়াস সম্বন্ধে কবি বলিতেছেন, "শক্তিমান মুসলমান লেখকরা বাংলাসাহিত্যে মুসলমান জীবনযাত্রার বর্ণনা যথেষ্ট পরিমাণে করেন নি, এ অভাব সম্প্রদায় নির্বিশেষে সমস্ত সাহিত্যের অভাব।...চাঁদের এক পৃষ্ঠায় আলো পড়ে না সে আমাদের অগোচর, তেমনি দুর্দৈবক্রমে বাংলাদেশের আধখানা সাহিত্যের আলো যদি না পড়ে তাহলে আমরা বাংলাদেশকে চিনতে পারব না, না পারলে তার সঙ্গে ব্যবহারে ভুল ঘটতে থাকবে। কিন্তু এই পরিচয় স্থাপন ব্যাপারে কোনো একটা জিদ বশত ভাষার প্রতি যদি নির্মমতা করেন তা হলে উল্টো ফল ফলবে। এই উল্টো ফল ফলাবার অধ্যবসায়ে বাংলাদেশ আজ কণ্টকিত।"[৩]

ইতিমধ্যে আনন্দবাজার পত্রিকার পূজাসংখ্যার জন্য নূতন গল্পের তাগিদ আসিয়াছে, টাকাও অগ্রিম লওয়া হইয়া গিয়াছে, লিখিতেই হইবে। অগস্ট মাসের শেষভাগে একটি গল্প লেখেন। কালিম্পঙে প্রতিমা দেবীকে লিখিতেছেন, (১৯৪০ সেপ্টেম্বর ৩) "গল্পটা শেষ হয়ে গেছে, এখন তাতে প্ল্যাস্টার লাগাচ্ছি।" পক্ষকাল পরে কলিকাতা হইতে অমিয়চন্দ্রকে লিখিতেছেন, "দায়ে পড়ে একটা গল্প লিখতে বাধ্য হয়েছিলুম, বহু কষ্টে লিখে নিষ্কৃতি নিয়েছি। আনন্দবাজার পূজার সংখ্যায় যাবে— কি রকম হয়েছে কী জানি। লিখতে আর প্রবৃত্তি নেই।" এই গল্পটি 'ল্যাবরেটরি',—'তিনসঙ্গী'র অন্তর্গত।

১ পত্র ১৯৪০ অগস্ট ২২ (১৩৪৭ ভাদ্র ৬)। মাসিক বসুমতী ১৩৫২ মাঘ।

২ রবীন্দ্রজীবনী ৩য় খণ্ড পৃ ৩০৩ পা-টী ২।

৩ পত্র ১৯৪০ সেপ্টে ৬, সওগাত ১৩৪৮ বৈশাখ পৃ ৬৩৯-৪০।

লেখা হইয়া গেলে কবি একদিন শান্তিনিকেতনের কয়েকজনের কাছে সেটি পড়িয়া শোনান। কালিম্পঙে প্রতিমা দেবীকে লিখিত মীরা দেবীর এক পত্র হইতে কবির সাম্প্রতিক মনের ও স্বভাবের একটি নিখুঁত চিত্র আমরা পাই। তিনি লিখিতেছেন, "বাবা যে-গল্পটা [ল্যাবরেটরি] লিখছিলেন সেটা শেষ হয়েছে দুই-তিন দিন আগে, অনকয়েককে প'ড়ে শুনিয়েছেন। সেদিন সকাল থেকে সে কী এক্‌সাইটমেণ্ট বাবার,......।... বাবা এমন ইরিটেটেড্‌ মেজাজে ছিলেন, পড়া শেষ না-হওয়া পর্যন্ত যে-ক'টি আমরা উপস্থিত ছিলুম গল্পপড়ার সময় ভয়ে সব জুজু হয়ে বসে, কারো মুখে হাসি নেই বা কথা নেই।...যে-বিষয় নিয়ে এত ভয় সঞ্চার হয়েছিল আসলে গল্পটা কিন্তু সে-রকম ভয়াবহ নয়।...গল্পটি হচ্ছে বর্তমান যুগের মেয়েদের নিয়ে।"[১] গল্পের প্রধান নায়িকা সোহিনী—রবীন্দ্রনাথের অপরূপ সৃষ্টি; ইতিপূর্বে সৃষ্ট কোনো নারীচরিত্রের সঙ্গে ইহার মিল পাওয়া যায় না, "সোহিনীকে নিয়ে যখন কেউ-কেউ আলোচনা করতেন, তাঁদের প্রায়ই [কবি] বলতেন, 'সোহিনীকে সকলে হয়তো বুঝতে পারবে না। সে একেবারে এখনকার যুগের সাদায়-কালোয় মিশানো খাঁটি রিয়লিজম, অথচ তলায় তলায় অন্তঃসলিলার মতো আইডিয়ালিজমই হোলো সোহিনীর প্রকৃত স্বরূপ'"[২] কবি জানিতেন, আধুনিকেরা সোহিনীকে সহ্য করিতে পারিবেন না, প্রাচীনাদের তো কথাই নাই। আনন্দবাজার পত্রিকার শারদীয় সংখ্যায় (১৩৪৭) গল্পটি যখন প্রকাশিত হয়, তখন তিনি রোগশয্যায়। "কী আগ্রহ তাঁর গল্পটি দেখে, ডাক্তারদের বারণসত্ত্বেও তিনি কাগজখানি হাতে নিয়ে আগাগোড়া চোখ বুলিয়ে গেলেন।"

ল্যাবরেটরি সম্বন্ধে একজন আধুনিক লেখক লিখিয়াছেন যে রবীন্দ্রনাথ মানবচরিত্র লইয়া স্বয়ং বৈজ্ঞানিক খেলা খেলিয়াছেন। "তিনি এই গল্পের নরনারীকে নিয়ে ল্যাবরেটরিতে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা করেছেন। আচারহীন পাত্রে বুদ্ধি, আচারের সংকীর্ণ পাত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা আর বিজ্ঞানের পাত্রে তরল চরিত্র ঢেলে নীচে দিয়েছেন বুনসেন বার্নার। ফুটন্ত চরিত্রগুলোকে একসঙ্গে মেশানো হ'ল। রাসায়নিক বস্তুগুলি পরস্পর পরস্পরকে কেবল আঘাত করতে লাগল, মিলতে পারল না। প্রত্যেকটি চরিত্র অতি প্রখরভাবে জীবন্ত কিন্তু অতি নিষ্ঠুরভাবে ট্র্যাজিক। তারা পরস্পরকে অপমান করে চলেছে।" কারণ ইহারা শিক্ষার আবরণযুক্ত হইলেও কালচারহীন বা ধর্মহীন। "সবগুলো চরিত্রই এখানে মিলেছে হয় বিশুদ্ধ বিষয়বুদ্ধির ক্ষেত্রে না-হয় বিশুদ্ধ স্বার্থের ক্ষেত্রে।" এই গল্পের নরনারীরা "গল্পের বিচারে সফলতা লাভ করায় আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে উগ্রভাবেই। কিন্তু কোনো মতেই আমাদের মনে অনুকম্পা জাগায় না। মানবজীবনের পূর্ণ চাঞ্চল্য নিয়েও তারা যেন মনুষ্যত্বের বিকার। একমাত্র রেবতীর মধ্যে কিছু সম্ভাবনা ছিল, কিন্তু সে অভীক নয়; সে তৃণখণ্ড মাত্র। স্রোতে ঘুরপাক খেয়ে ভেসে বেড়াল এবং শেষ পর্যন্ত পিসিমা-রূপ অতীত যুগের অতি পরিচিত খোলসে গা ঢাকা দিয়ে বেঁচে গেল।"[৩] তিনসঙ্গীর গল্পত্রয় এবং 'বদনাম' কবির পুরাতন গল্পধারা হইতে যে সম্পূর্ণ পৃথক্‌ সে-কথা স্পষ্ট করিয়া নির্দেশিবার প্রয়োজন নাই। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার শেষ বয়সে কি ছন্দে, কি চিত্রে, কি গল্পে—পুরাতনের পথ বা conventionকে বহুল পরিমাণে অতিক্রম করিয়া আসিতেছেন। সে, খাপছাড়া, প্রহাসিনী, ছড়ার ছবি, গল্পসল্পর মধ্যে যেসব মানুষ সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহারা তাঁহার ছবির ন্যায়ই unconventional type; অর্থাৎ ইহাদের কোনো 'জাত' নাই। তিনসঙ্গীর ল্যাবরেটরির চরিত্রগুলি সৃষ্টিছাড়া অর্থাৎ unconventional—এবং সোহিনী, কবির ভাষায়, সাদায়-কালোয় মেশানো খাঁটি রিয়ালিজম্‌, ইহার 'জাত' নাই, সকলেই ইহার ছোঁয়াচ বাঁচাইয়া পাশ কাটাইয়া যাইবে, আত্মীয় বলিয়া কেহই

১ প্রতিমা দেবী, নির্বাণ পৃ ৪-৬।

২ নির্বাণ পৃ ৩৪।

৩ পরিমল গোস্বামী, রবীন্দ্রনাথের তিনসঙ্গী, প্রবাসী ১৩৪৮ জ্যৈষ্ঠ পৃ ৩১৮।

পরিচয় দিবে না। বুদ্ধদেব বসু এই কথাটা আর-একভাবে স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন, "সোহিনীতে সেই চরিত্রবতীকে তিনি এঁকেছেন যে একদিক থেকে বাস্তবিকই খারাপ মেয়ে কিন্তু অন্যদিকে একটি মহৎ জীবনব্রতে সে উৎসর্গিত। সেখানেই তিনি অকুণ্ঠিত অভিনন্দন জানিয়েছেন যেখানে দেখেছেন এমন-কোনো লক্ষ্যের প্রতি নিষ্কম্প্র নিষ্ঠা, যা প্রচলিত ভালোমন্দর বাইরে ও নিজের সুখদুঃখের উপরে।"[১]

'বদনাম' গল্পের সৌদামিনী বা সদু conventional সমাজনীতি বা ধর্মনীতি অনুসারে পতিব্রতা নহে। সে-ও আইডিয়ার কাছে নিজের শ্রেষ্ঠ সম্পদকে বলি দিল—স্ত্রীলোক বদনাম কিনিল। রবীন্দ্রনাথ একদিন প্রসঙ্গকথায় রানী চন্দকে বলিয়াছিলেন যে মেয়েদের সমস্যা হইয়াছে অর্থনৈতিক। তাহাদের উপার্জন করিতে দেওয়া হয় নাই। "পুরুষরা নিয়েছে সেই ভার—তোমরা থাকবে পরম নিশ্চিন্তে। প্রথম আমি মেয়েদের পক্ষ নিয়ে 'স্ত্রীর পত্র' গল্পে বলি। বিপিন পাল তার প্রতিবাদ করেন, কিন্তু পারবেন কেন। তারপর আমি যখনই সুবিধা পেয়েছি বলেছি। এবারেও সুবিধা পেলুম, ছাড়ব কেন, সদুর মুখ দিয়ে কিছু বলিয়ে নিলুম।"[২]

বুদ্ধদেব বসু ঠিকই বলিয়াছেন যে "সাধারণত বয়সের সঙ্গে সঙ্গে লোকের রক্ষণশীলতা বাড়ে, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের বেলায় হয়েছে ঠিক উল্টো, যত বয়স বেড়েছে ততই তিনি মুক্ত হয়েছেন। যা সাময়িক, যা প্রথাগত, যা দেশে কালে আপেক্ষিক, যা লোকাচারের সংস্কার কিংবা ব্যবহারিক বিধিমাত্র সে সমস্তের ঊর্ধ্বে গেছে তাঁর দৃষ্টি, নীতির চেয়ে সত্যকে বড়ো করে দেখেছেন, রীতির চেয়ে জীবনকে।" জবহরলালও কবি সম্বন্ধে এই ভাবেরই কথা বলিতেছেন, "Contrary to the usual course of development as he [Tagore] grew older he became more radical in his outlook and views."[৩] "তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী ও মতামত বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অধিকতরভাবে কেন প্রগতিপন্থী হয়, সচরাচর এমন ঘটে না বরঞ্চ এর উল্টোটাই হয়ে থাকে।" (ভারত সন্ধানে পৃ ৩৭৯)

ল্যাবরেটরি গল্প পড়া হইয়া গেল—দিন যায়, কিন্তু মন শান্তিনিকেতনে টিকিতেছে না। রথীন্দ্রনাথ প্রতিমাদেবী কেহই কাছে নাই। প্রতিমাদেবী কালিম্পঙে, রথীন্দ্রনাথ জমিদারি সফরে গিয়াছেন। কবি প্রতিমাদেবীকে ৩ সেপ্টেম্বর (১৯৪০) লিখিতেছেন, "হংসবলাকার দলে যদি নাম লেখা থাকত তাহলে উড়ে চলতুম মানসসরোবরের দিকে, মংপুতে মাগুরমাছের সরোবরতীরেও শান্তি পাওয়া যেতে পারত। মধ্য সেপ্টেম্বরের প্রতীক্ষায় রইলুম।"[৪]

যেদিন এই পত্রখানি লিখিলেন, সেইদিন শান্তিনিকেতনে প্রাতে বৃক্ষরোপণ উৎসব ও সায়াহ্নে বর্ষামঙ্গল উৎসব অনুষ্ঠিত হয় (১৩৪৭ ভাদ্র ১৮)। এবারকার বর্ষামঙ্গলের জন্য কবি একটি মাত্র গান লেখেন—'এসো এসো ওগো শ্যামছায়াঘন দিন।' ইহাই কবির শেষ বর্ষাসংগীত।[৫]

প্রতিমা দেবীকে তেসরা তারিখের পত্রে লেখেন যে মধ্য-সেপ্টেম্বরে তিনি শান্তিনিকেতন ত্যাগ করিবেন। সত্যই সকলের নিষেধ ও বাধা অগ্রাহ্য করিয়া সুধাকান্তকে সঙ্গে লইয়া কবি কলিকাতা চলিয়া গেলেন (১৭ সেপ), পাহাড়ে যাইবেনই।

কলিকাতায় গেলে ডাক্তার নীলরতন সরকার ও বিধানচন্দ্র রায় কবিকে ভালো করিয়া পরীক্ষা করিয়া এক বিবৃতিতে বলিলেন যে, দেশবাসী যদি কবিকে আরও কিছুদিন বাঁচিতে দিতে চান, তবে যেন তাঁহারা কবির

১ সব-পেয়েছির দেশে পৃ ১০২।

২ আলাপচারী রবীন্দ্রনাথ পৃ ১০৩-০৪। বদনাম গল্পটি লেখা হয় ১৯৪১ জুন মাসে।

৩ Jawharlal Nehru, The Discovery of India, The Signet Press 1946 March p 404.

৪ দ্র নির্বাণ পৃ ২, প্রতিমা দেবীকে লিখিত পত্র।

৫ রচিত ১৩৪৭ ভাদ্র ১৬, দ্র গীতবিতান পৃ ৯০১, দ্র কবিকথা পৃ ১৮২।

উপর অকারণ আর জুলুম না করেন। চিকিৎসকদের নিষেধ সত্ত্বেও কবি দুইদিন পরে কালিম্পং যাত্রা করিলেন; যাত্রার পূর্বে লিখিতেছেন, "কিছুদিন থেকে আমার শরীর ক্রমশই ভেঙে পড়চে, দিনগুলো বহন করা যেন অসাধ্য বোধ হয়। তবু কাজ করতে হয়েছে তাতে এত অরুচি বোধ সে আর বলতে পারিনে। ভারতবর্ষে এমন জায়গা নেই যেখানে পালিয়ে থাকা যায়। ভিতরের যন্ত্রগুলো কোথাও কোথাও বিকল হয়ে গেছে—বিধান রায় আশঙ্কা করেন হঠাৎ একটা অপঘাত ঘটতে পারে। সেইজন্যে কালিম্পঙে যেতে নিষেধ করেছিলেন। কিন্তু মন বিশ্রামের জন্যে এত ব্যাকুল হয়েছে যে তাঁর নিষেধ মানা সম্ভব হোলো না। চল্লুম আজ কালিম্পঙ।"[১]

কবির কোনো বিষয়ে ঝোঁক উঠিলে, তাহা হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিতে বড়ো কেহ পারিত না। রথীন্দ্রনাথ "যদি বোঝাতেন তখনি শিষ্ট ছেলের মতো ঠাণ্ডা হয়ে যেতেন। এই ব্যাপারটি ছিল পরিজনবর্গের একটি আমোদের বিষয়।" (নির্বাণ পৃ ১২) তিনি দূরে থাকায় অনুচর ও সেবকগণকে বাধ্য হইয়া কবিরই হুকুম তামিল করিতে হয়। প্রতিমা দেবী কালিম্পঙে হঠাৎ টেলিফোন যোগে জানিতে পারিলেন যে কবি সেখানে আসিতেছেন। এই শরীরে কালিম্পং যাওয়ায় যে কী ঘটিল তাহা আমরা যথাস্থানে বলিব।

আমাদের আলোচ্য পর্বে কবির 'চিত্রলিপি' নামে বই প্রকাশিত হইল। গত দশ বৎসর হইতে রবীন্দ্রনাথ ছবি আঁকিতেছেন, এখানে-সেখানে সাময়িক পত্রিকাদিতে দু-চারখানি ছবির 'ছবি' মুদ্রিত হইয়াছে। 'বিচিত্রিতা'র মধ্যে কয়েকখানির প্রতিলিপি ছিল। এইবার চিত্রলিপিতে (১৯৪০ সেপ) কবির অঙ্কিত ১৮ খানি চিত্রের প্রতিলিপি (১০ খানি বহু বর্ণময়) এবং চিত্রের ভাব ও উদ্দেশ্য লইয়া ১৮টি ক্ষুদ্র কবিতা ও তাহার ইংরেজি তর্জমা স্বহস্তলিখিত প্রতিলিপি সমেত প্রকাশিত হইল। এতদ্ভিন্ন কবির রচিত একটি ইংরেজি ভূমিকা ও শিল্পাধিষ্ঠাত্রী চিত্রলেখা দেবীর উদ্দেশ্যে রচিত আর-একটি বাংলা কবিতা ও তাহার অনুবাদ আছে।

অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এইগ্রন্থের বিস্তারিত সমালোচনা করিয়া বলিতেছেন,[২] "শিল্পের দিক হইতে এই ছবিগুলির সার্থকতা অথবা, এগুলির নিরর্থকতা বিচার করিবার যোগ্যতা আমার নাই। তবে আমি এইটুকু বলিতে পারি, কবির আঁকা অনেকগুলি ছবিই আমার কাছে উপভোগ্য। রঙের সমাবেশের দরুন, অনেকগুলির মূল্য আমার কাছে শব্দহীন গানের সুরের গুঞ্জনের মতো মনে হয়। আমার কাছে কিন্তু সবচেয়ে ভালো লাগে, কবির হাতে আঁকা কতকগুলি মুখ। আমার মনে হয় এইখানে কবি মুখের আকার ও ভঙ্গীর দ্বারা অদ্ভুত ভাবে ছবিতে মানুষের ব্যক্তিত্ব ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। এখানে তাঁহার কৃতিত্ব একেবারে শিশু চেষ্টিতের মতো নহে, ওখানে যেন অকস্মাৎ প্রৌঢ় শিল্পের, ওস্তাদ শিল্পীর হাতের ঝংকার দেখা দিয়াছে।...এই মুখচিত্রগুলি নূতন ভাবে, নিরতিশয় শক্তি সহানুভূতি ও সার্থকতার সঙ্গে মানব-চরিত্রের সম্বন্ধে কবির সুগভীর আত্মীয়তা বোধের এবং ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের প্রমাণ দিতেছে। এই প্রকারের মুখের ছবিগুলির জন্যই আমি রবীন্দ্রনাথকে উচ্চকোটির রূপশিল্পীর আসন দিতে ইতস্তত করিব না।"

এই সময়ে Hilda Seligman নামে এক মহিলা লেখিকা অশোকের সময়কার ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে একখানি উপন্যাস লেখেন। রবীন্দ্রনাথ ইহার ভূমিকা লিখিয়া দেন। রবীন্দ্রনাথ অশোক সম্বন্ধে কোনো গাথা বা কবিতা লেখেন নাই সত্য, তবে অশোকের আদর্শকে তিনি যে শ্রদ্ধা করিতেন তাহার প্রমাণ আছে।[৩] প্রয়াণ-কালের এক বৎসর পূর্বে

১ অমিয় চক্রবর্তীকে লিখিত পত্র ১৯৪০ সেপ ১৯।

২ দ্র ১৯০৩ সালের 'সাহিত্যের সামগ্রী' প্রবন্ধ, বঙ্গদর্শন ১৩১০ কার্তিক।

৩ প্রবাসী ১৩৪৭ পৌষ।

তিনি দেবতাদের প্রিয় প্রিয়দর্শী অশোকের উদ্দেশ্যে তাঁহার শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়া লিখিলেন, "In an age of fratricide, aided by intellectual dehumanization in large areas of the world, it is difficult to restore the calm air so necessary for the realisation of great human ideals. Hilda Seligman has chosen in her book to reveal the organisation side of a great humanism which came with king Asoka of India. My good thoughts go with the author in her venture to present ancient India through its message which has a perennialy modern significance"[১]

শেষ সফর—১৯৪০ সেপ্টেম্বর

১৯ সেপ্টেম্বর (১৯৪০) কবি কালিম্পঙে যাত্রা করিলেন। এবার এখানে থাকা হয় মাত্র সাতদিন। প্রথম কয়দিন শরীর ভালোই ছিল, আপন মনে লেখাপড়া করেন—কবিতা লেখেন। অমিয় চক্রবর্তীকে লিখিতেছেন (২৫শে): "কর্তব্যের সংসারের দিকে পিঠ ফিরিয়ে বসে আছি। রক্তে জোয়ার আসবে বলে মনে হচ্ছে যেন। শারদা পদার্পণ করেছেন পাহাড়ের শিখরে, পায়ের তলায় মেঘপুঞ্জ কেশর ফুলিয়ে স্তব্ধ আছে। মাথার কিরীটে সোনার রৌদ্র বিচ্ছুরিত। কেদারায় বসে আছি সমস্ত দিন, মনের দিকপ্রান্তে ক্ষণে ক্ষণে শুনি বীণাপানির বীণার গুঞ্জন।"

মনে ভাবিতেছি, যেন অসংখ্য ভাষার শব্দরাজি
ছাড়া পেল আজি,
দীর্ঘকাল ব্যাকরণ দুর্গে বন্দী রহি
অকস্মাৎ হয়েছে বিদ্রোহী…। (জন্মদিনে ২০)

শব্দের অফুরন্ত লীলার কথা ও অগণিত রূপান্তরের কথা ব্যক্ত হইয়াছে:

পাহাড়ের নীলে আর দিগন্তের নীলে
শূন্যে আর ধরাতলে মন্ত্র বাঁধে ছন্দে আর মিলে।
আমার আনন্দে আজ একাকার ধ্বনি আর রঙ,
জানে তা কি এ কালিম্পঙ। (জন্মদিনে ১৪)

এই দুইটি কবিতা পরপর লেখা;—মনের মধ্যে ধ্বনি ও বাহিরে রঙ—এই দুই-এর লীলাতরঙ্গ কবিকে চিরদিনই আনন্দ দিয়াছে।

২৫ সেপ্টেম্বর অমিয় চক্রবর্তীকে যে পত্র দেন, তাহাতে তাঁহাকে কালিম্পঙে আসিবার নিমন্ত্রণ আছে; সেইদিন খবর পাইলেন মংপু হইতে মৈত্রেয়ী দেবী পরদিন আসিতেছেন। এই দিন হইতে কবির শরীর খারাপ হইতে থাকে; পরদিন হঠাৎ অজ্ঞানভাব দেখা দিল। কালিম্পঙের মতো স্থানে এইরূপ আকস্মিক ঘটনার জন্য কেহই প্রস্তুত ছিলেন না; সুধাকান্তর ছেলের অসুখ বলিয়া কবি কয়দিন পূর্বে তাঁহাকে জোর করিয়া বোলপুর পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। সচ্চিদানন্দ বা আলু রায় আছে সেখানে আর পুরাতন ভৃত্য বনমালী। মংপু হইতে মৈত্রেয়ী দেবী আসাতে খুবই ভালো হইয়াছিল। তাঁহার আগমনে প্রতিমা দেবী অনেকটা নিশ্চিন্ত হইলেন।

কালিম্পঙের বিস্তৃত বর্ণনা প্রতিমা দেবী কৃত 'নির্বাণ' গ্রন্থে আছে; সুতরাং তাহার পুনরুক্তি এখানে নিষ্প্রয়োজন। রথীন্দ্রনাথ তখন জমিদারিতে, কোথায় ঘুরিতেছেন জানা নাই। প্রতিমা দেবী কলিকাতায় প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ ও

১ Hilda Seligman. *When Peacocks called.* The Bodley Head. ১৯৪০ নভেম্বর ২৮ বইখানি লেখিকা কর্তৃক কবিকে উপহৃত হয়। দ্র প্রবোধচন্দ্র সেন, রবীন্দ্রসাহিত্যে অশোক, বিশ্বভারতী পত্রিকা ১৩৫১ বৈশাখ-আষাঢ় সংখ্যা পৃ ১৮৯-৯৭ রবীন্দ্রপ্রসঙ্গ ২। অশোক, বি-ভা-প ১৩৫১ মাঘ-চৈত্র সংখ্যা পৃ ১৩৯-৪২।

শান্তিনিকেতনে অনিল চন্দকে টেলিফোনে কবির অবস্থা জানাইলেন। প্রশান্তচন্দ্র কলিকাতা হইতে তিনজন ডাক্তার লইয়া উপস্থিত হইলেন। সুরেন্দ্রনাথ কর, অনিল চন্দ, সুধাকান্তও শান্তিনিকেতন হইতে আসিয়া পড়িলেন। সেই দিনই তাঁহারা কবিকে লইয়া কলিকাতায় রওনা হইলেন। ২৯ সেপ্টেম্বর কলিকাতায় পৌঁছিলেন। ইহাই কবির শেষ ভ্রমণ।

কলিকাতায় প্রায় একমাস অসুস্থ থাকিয়া কবি সারিয়া উঠিলেন বটে, তবে আর পুরাতন স্বাস্থ্য ফিরিয়া পাইলেন না। কালিম্পং হইতে কলিকাতায় ফিরিবার দুই দিন পরে বরধা থেকে মহাদেব দেশাই আসিলেন মহাত্মাজির বার্তা লইয়া। প্রতিমা দেবী লিখিতেছেন, "মহাদেব দেশাই অনিলকুমারের সঙ্গে বাবামশায়ের ঘরে এসে, মহাত্মাজির সহানুভূতি, আন্তরিক প্রেম ও প্রীতি জানালেন। অনিলকুমার জোরে-জোরে মহাদেব দেশাই মহাশয়ের বার্তা গুরুদেবকে বুঝিয়ে দিলেন, কেননা তখন তিনি ভালো ক'রে শুনতে পাচ্ছিলেন না। তাঁর চোখ দিয়ে দরদর করে জল পড়তে লাগল, চোখের জল তাঁর এই প্রথম দেখলুম। নার্ভের উপর এত বেশি সংযম তাঁর ছিল যে, অতি বড়ো শোকেও তাঁকে কখনো বিচলিত হোতে দেখিনি, আজ যেন বাঁধ ভেঙে গেল।" (নির্বাণ পৃ ৩২)

জোড়াসাঁকোর বাটীতে কবি শয্যাশায়ী, যথার্থ রোগীর ন্যায় দিন যায়। তাহারই মধ্যে শরীর একটু ভালো বোধ করিলে মুখে মুখে কবিতা বলিয়া যান, পার্শ্বের সেবকরা লিখিয়া লন। কালিম্পঙে শেষ রচনা লেখেন ২৫ সেপ্টেম্বর—তারপর 'রোগশয্যায়'র কবিতা (৩) 'জপের মালা' লিখিলেন ৩০ অক্টোবর। সেই হইতে রচনার উৎস আবার খুলিয়া গেল—'রক্তে জোয়ার' আসিল না সত্য কিন্তু ক্ষীণ স্রোত দেখা দিল। ইহার মধ্যেও বাণীর জন্য অনুরোধ আসে; অন্ধদের দুঃখলাঘব শিবির (Blind relief camp)-প্রতিষ্ঠা উপলক্ষ্যে তাঁহাকে কয়েক ছত্র লিখিয়া দিতে হইবে; এই প্রতিষ্ঠানের সহিত যুক্ত ছিলেন কলিকাতার লর্ড বিশপ ও ভারতের মেট্রোপোলিটন—খ্রীষ্টীয় চার্চের সর্বাধ্যক্ষ—স্বর্গীয় এনড্রুসের বন্ধু ও তাঁহার অন্তিমশয্যার আশীর্বাদক। কবি এই কয়টি পঙক্তি লিখাইয়া পাঠাইয়া দিলেন;

আলোকের পথে প্রভু, দাও দ্বার খুলে—
আলোকপিয়াসী যারা আছে আঁখি তুলে,
প্রদোষের ছায়াতলে হারায়েছে দিশা,
সমুখে আসিছে ঘিরে নিরাশার নিশা।
নিখিল ভুবনে তব যারা আত্মহারা
আঁধারের আবরণে খোঁজে ধ্রুবতারা,
তাহাদের দৃষ্টি আনো রূপের জগতে—
আলোকের পথে।[১]

পরদিন (১৯৪০ নভেম্বর ৩) যে কবিতাটি লেখেন (রোগশয্যায় ৪ নং) সেটি এই কবিতারই অনুক্রমণ। কবির নিজ দৃষ্টি ক্ষীণ হইয়া আসিতেছে, তাই যেন লিখিতেছেন :

অজস্র দিনের আলো···
দু চক্ষুরে দিয়েছিলে ঋণ।
ফিরায়ে নেবার দাবি জানায়েছ আজ
তুমি মহারাজ।

কলিকাতায় ১৮ নভেম্বর পর্যন্ত ছিলেন; সে সময়ে 'রোগশয্যায়'-র ১০টি কবিতা লিখিত হয়। শান্তিনিকেতনে ফিরিয়া আসিয়াও 'রোগশয্যায়'র কবিতা রচনা চলে ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত। তখন থেকে শুরু হয় প্রধানত 'আরোগ্য'র কবিতাগুচ্ছ; তাহার সঙ্গে আছে 'গল্পসল্প', ও 'জন্মদিনে'র কবিতা, অন্যান্য পাঁচরকমের রচনা ও চিঠিপত্র। সবই অনুলিখিত হয়—আর নিজে পারেন না।

রোগের কষ্ট ও যাতনাকে কবি আজ নিজ ব্যক্তিসত্তার বাহিরে অনাদিকালের সৃষ্টিরহস্যের মধ্যে দেখিতেছেন। বিশ্বসৃষ্টিকে এক সময়ে নৃত্যলীলা রূপে দেখিয়া বলিয়াছিলেন :

১ প্রবাসী ১৩৪৭ অগ্রহায়ণ পৃ ২৭০।

নৃত্যের বশে সুন্দর হল বিদ্রোহী পরমাণু,
পদযুগ ঘিরে জ্যোতিমঞ্জীরে বাজিল চন্দ্রভানু।
তব নৃত্যের প্রাণবেদনায় বিবশ বিশ্ব জাগে চেতনায়
যুগে যুগে কালে কালে সুরে সুরে তালে তালে,
সুখে দুখে হয় তরঙ্গময় তোমার পরমানন্দ হে।
(গীতবিতান পৃ ৫৪৪)

আজ বলিতেছেন :

এই মহা বিশ্বতলে যন্ত্রণার ঘূর্ণযন্ত্র চলে,
চূর্ণ হতে থাকে গ্রহতারা।
উৎক্ষিপ্ত স্ফুলিঙ্গ যত
দিক্‌বিদিকে অস্তিত্বের বেদনারে
প্রলয়দুঃখের রেণুজালে
ব্যাপ্ত করিবারে ছোটে প্রচণ্ড আবেগে। (রোগশয্যায় ৫)

অন্য আর-একটি কবিতায় বলিলেন :

অসুস্থ দেহের মাঝে ক্লিষ্ট রচনার যে প্রয়াস
তাই হেরিলাম আমি অনাদি আকাশে।

মানুষের জয়গান কবি চিরদিন করিয়াছেন; আজ দেহযন্ত্রণার মাঝেও যে মুক্ত চেতনার দুর্জয় শক্তি অনুভব করিতেছেন তাহার বিস্ময় কবিকে অভিভূত করে :

মানুষের ক্ষুদ্র দেহ,
যন্ত্রণার শক্তি তার কী দুঃসীম।
মানবের দুর্জয় চেতনা,
দেহদুঃখ হোমানলে
যে অর্ঘ্যের দিল সে আহুতি—
জ্যোতিষ্কের তপস্যায়
তার কি তুলনা কোথা আছে।
এমন অপরাজিত বীর্যের সম্পদ,
এমন নির্ভীক সহিষ্ণুতা,
এমন উপেক্ষা মরণেরে,
হেন জয়যাত্রা
বহ্নিশয্যা মাড়াইয়া দলে দলে
দুঃখের সীমান্ত খুঁজিবারে
নামহীন জ্বালাময় কী তীর্থের লাগি—

কিন্তু সর্ব মানবের মধ্যে সচেতনে দুঃখকে বরণ করিয়া চলিবার আনন্দ-আবেগ আজও বিশ্বব্যাপী হয় নাই; কারণ মানুষ এখনো অসম্পূর্ণ। তাই—

আদি মহার্ণব-গর্ভ হতে
অকস্মাৎ ফুলে ফুলে উঠিতেছে
প্রকাণ্ড স্বপ্নের পিণ্ড,
বিকলাঙ্গ, অসম্পূর্ণ—
অপেক্ষা করিছে অন্ধকারে
কালের দক্ষিণ হস্তে পাবে কবে পূর্ণ দেহ,
বিরূপ কদর্য নেবে সুসংগত কলেবর
নব সূর্যালোকে।
মূর্তিকার দিবে আসি মন্ত্র পড়ি'
ধীরে ধীরে উদ্‌ঘাটিবে বিধাতার অন্তর্গূঢ়
সংকল্পের ধারা! (রোগশয্যায় ৯)

কবির বিশ্বাস মানুষ বহু ভাঙাচোরার মধ্য দিয়া গিয়া অবশেষে একদিন পূর্ণতা লাভ করিবে। কবির এ স্বপ্ন যদি সত্য হয়, তবে বৈচিত্র্যহীন সে পৃথিবী কি বাসের যোগ্য থাকিবে? সমগ্রের জন্য পূর্ণতার আশা কবিস্বপ্ন মাত্র!

কিন্তু স্বপ্নজগৎ ছাড়া জাগ্রত জগতের প্রতি কবির দৃষ্টি আজ তেমনই দরদে পূর্ণ, সে দরদ মানুষ পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ গাছপালা ফুলফলে— বিশ্বচরাচরে সমভাবেই ব্যাপ্ত। বিনিদ্র রজনী শেষে আলোর প্রথম অভ্যুদয়কে তিনি অভিনন্দিত করেন— আবার সকলের বিরক্তি-উৎপাদক চড়ুই পাখি কোনো কবি যাহার জন্য দুইটি পঙ্‌ক্তিও লিখিয়া যান নাই—তাহাকে অমর করিয়া গেলেন ছন্দমধ্যে।

ওগো আমার চড়ুই পাখি সাশির পরে ঠোকর মার এসে,
একটুখানি আঁধার থাকতে বাকি দেখ কোনো খবর আছে নাকি।
ঘুমঘোরের অল্প অবশেষে

সমস্ত কবিতাটির মধ্যে কী দরদ কী সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ। রবীন্দ্রনাথ কত পাখি কত গাছ কত ফুল যাহাদের কোনো কবি সম্মান দেন নাই তাহাদের কথা বলিয়াছেন, সে সম্বন্ধে আলোচনা হইতে পারে।

কবি ১৭ সেপ্টেম্বর শান্তিনিকেতন হইতে বাহির হইয়াছিলেন; সেখানে ফিরিলেন দুইমাস পরে ১৮ নভেম্বর ১৯৪০; কলিকাতা বাসকালে 'রোগশয্যায়'র কবিতা লিখিতেছিলেন, শান্তিনিকেতনে ফিরিয়া সে-ধারা চলিল। প্রত্যাবর্তনের পরদিন লেখেন ছড়া (৭ নং) 'গলদা চিংড়ি তিংড়ি মিংড়ি' ইত্যাদি। 'রোগশয্যায়'র কবিতাগুলি ৩০ অক্টোবর হইতে ৫ ডিসেম্বরের মধ্যে লিখিত। এই কাব্যখণ্ডের অনির্দিষ্ট উৎসর্গপত্রে যে-দুইটি নারীর কথা আছে, 'নির্বাণে' প্রতিমা দেবীর সাক্ষ্য অনুসারে তাঁহারা হইতেছেন নন্দিতা কৃপালনী ও অমিতা ঠাকুর। নন্দিতা কবির কনিষ্ঠা কন্যা মীরাদেবীর কন্যা; অমিতা স্বর্গীয় অজিতকুমার চক্রবর্তীর কন্যা—অজীনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্ত্রী, তাঁহাদের বাড়ির বধূ।

কবির শেষ অসুস্থতার সময়ে যে কয়জন ব্যক্তি তাঁহার সেবায় নিযুক্ত ছিলেন, সুধাকান্ত তাঁহাদের অন্যতম। তিনি রোগশয্যায় রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে তাঁহার নিজ অভিজ্ঞতা হইতে লিখিতেছেন,[১] "রোগের নিদারুণ যন্ত্রণায় রোগী কাতরতা প্রকাশ করে এইটেই স্বাভাবিক নিয়ম, কিন্তু ··রোগকাতর রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে আমরা যা লক্ষ্য করলুম, তা সাধারণ নিয়মের বহির্ভূত ব্যাপার। যন্ত্রণাকে অবিচলিতভাবে সহ্য করার অসাধারণত্ব দেখিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। যাঁরা তাঁর সেবাশুশ্রূষায় নিযুক্ত থাকেন তাঁদের চিত্তবিনোদন করেন তিনি নানারকম হাস্য-পরিহাস দিয়ে, নিজের যন্ত্রণাকে উপেক্ষা করবারও উপায়ও হয়তো তাই। বিমর্ষতার চর্চা করা রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতিবিরুদ্ধ।"

রুগ্ন যদি রোগেরে চরম সত্য বলে, মুখশ্রী করিবে কি প্রতিবাদ,
তাহা নিয়ে স্পর্ধা করা লজ্জা বলে জানি— মুখোশের নির্লজ্জ নকলে। (রোগশয্যায় ২৪)
তার চেয়ে বিনা বাক্যে আত্মহত্যা ভালো।

রোগ-কক্ষ যাহাতে বিষাদময় না হইয়া উঠে তজ্জন্য তাঁহার কী চেষ্টা। মাঝে মাঝে মুখে মুখে ছড়া কবিতা বলিয়া সকলকে আনন্দিত রাখিবার চেষ্টা করেন; পার্শ্বের সেবক বা সেবিকারা লিখিয়া লইতেন। সেবিকাদের মধ্যে নন্দিতা, বৃদ্ধ 'দাদামহাশয়ের সেবাশুশ্রূষার অধিকাংশ কর্তব্যের ভার তিনি নিয়েছেন পরমানন্দে।' তাঁহার উদ্দেশ্যে লেখেন 'গানের সুরে রাঙা পরিহাস':

'ঐ দেখা যায় তোমার বাড়ি অনেক ফুল তো ফোটে সেথায়
চৌদিকে মালঞ্চ ঘেরা, একটি ফুল সে সবার সেরা। ইত্যাদি

'মালঞ্চ' নন্দিতাদের বাড়ির নাম। এই ধরনের কয়েকটি ছড়া সুধাকান্ত সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন।[২]

সুস্থ থাকিলে অনেক সময়েই কবি সকালেই লেখা লইয়া বসেন। সুধাকান্ত বলিতেছেন, "লেখার কাজ শেষ হলেই ডাক পড়ে সেই 'পূর্ববঙ্গীয় ব্যক্তিটি'র যিনি কবি সুধীরচন্দ্র কর বলে পরিচিত। ইনি রবীন্দ্রনাথের অপ্রকাশিত রচনার রক্ষক। এঁর কাছে সযত্নে থাকে সব জমা। রবীন্দ্রনাথের নির্দেশক্রমে ঐ তহবিল থেকে গান কবিতা

১ প্রবাসী ১৩৪৭ পৌষ।

২ রবীন্দ্র-দৈনিকী, প্রবাসী ১৩৪৭ ফাল্গুন পৃ ৬১৪-১৫।

খরচের হিসেবে চলে যায় এক-একটি কাগজে, পাঠকসমাজের কাছে। এক্ষেত্রে একটু বলে রাখা ভালো যে, এই হিসাবী ভাণ্ডারী এই জমা-খরচের কারবারে জমার অঙ্কে রস-সামগ্রীর ঘাটতি পড়লেই, অমনি কবিকে তাগিদ দিয়ে জমার ঘরে নূতন রচনা সংগ্রহ করে নেন। এর উদ্দেশেই 'বাঙাল' শীর্ষক ছড়াটি রবীন্দ্রনাথ তৈরী করেছিলেন।" (১৯৪০ ডিসেম্বর ২২) কবি প্রায়ই বলেন, 'আর বেশিদিন নয়··· ক্লান্ত হয়ে গেছে মন, এবার বিদায় নিলেই হয়।' শেষ দাঁড়ি টানিয়াছেন বলিয়া ভাবিতেছেন—কিন্তু :

বাঙাল যখন আসে মোর গৃহ দ্বারে,
নূতন লেখার দাবি লয়ে বারে বারে
আমি তারে হেঁকে বলি সরোষ গলায়
শেষ দাঁড়ি টানিয়াছি কাব্যের কলায়।
মনে মনে হাসে, তবুও সে ফিরে ফিরে আসে !

তারপর এ কী ? সকালে উঠিয়া দেখি
নিলজ্জ লাইনগুলো যত
বাহির হইয়া আসে গুহা হতে নির্ঝরের মতো।
পশ্চিম-বঙ্গের কবি দেখিলাম মোর
বাঙালের মতো নেই জেদের অপ্রতিহত জোর।

যে-রবীন্দ্রনাথ সেবা গ্রহণ করিতে চিরকাল পরাঙ্মুখ ছিলেন, আজ তিনি অসহায়ভাবে সম্পূর্ণরূপে পরমুখাপেক্ষী।[১]

সজীব খেলনা যদি গড়া হয় বিধাতার কর্মশালে,
কী তাহার দশা হয় তাই করি অনুভব আজি আয়ুশেষে। (রোগশয্যায় ১৯)

পরের সেবা বিশেষভাবে নারীর সেবা কবি কখনো তেমন গ্রহণ করেন নাই—প্রয়োজনও হইয়াছে কম। আজ সেবিকারূপিণী নারীকে নূতনভাবে দেখিতে পাইতেছেন (রোগশয্যায় ১৪)। নারীপ্রশস্তি কবিধর্ম; রবীন্দ্রনাথ অগণিত কবিতায় আকৈশোর নানাভাবে নারীর স্তুতি করিয়াছেন; কিন্তু চারিদিকে আজ নারীর কী অপমান, পুরুষের কী ঘৃণ্য ব্যবহার। বাংলাদেশে নারীর অপমান-কাহিনী নিত্য কানে আসে। এই সময়ে (১৯৩০) বাংলাদেশে মুসলীম লীগের শাসন চলিতেছে। নারীহরণ ও নারীনির্যাতন দেশের দৈনন্দিন ঘটনা। অথচ অপরাধের দমন নাই। অপরাধীর শাসন নাই। মনের এই অবস্থায় 'অবিচার' (১৩৪৭ পৌষ ৪) কবিতাটি লিখিত হয় :

নারীর দুঃখের দশা অপমানে জড়ানো
এই দেখি দিকে দিকে ঘরে ঘরে ছড়ানো ;···
অর্ধেক কাপুরুষ অর্ধেক রমণী।
তাতেই তো নাড়ী-ছাড়া এ-দেশের ধমনী।
বুঝিতে পারে না ওরা এ বিধানে ক্ষতি কার,
জানি না কী বিপ্লবে হবে এর প্রতিকার।
একদা পুরুষ যদি পাপের বিরুদ্ধে
দাঁড়ায়ে নারীর পাশে নাহি নামে যুদ্ধে

অর্ধেক কালীমাখা সমাজের বুকটা
খাবে তবে বারে বারে শনির চাবুকটা।
এত কথা বৃথা বলা, যে পেয়েছে ক্ষমতা
নিঃসহায়ের প্রতি নাই তার মমতা,
আপনার পৌরুষ করি দিয়া লাঞ্ছিত
অবিচার করাটাই হয় তার বাঞ্ছিত।[২]

একদিন রোগশয্যায় শুইয়া শুইয়া কবি রানী চন্দকে বলেন, "এক হিসেবে নারী হচ্ছে universal, তাদের স্থান হচ্ছে সৃষ্টির মূলে। দয়া, সেবা, লালনপালন এতেই তাদের সত্যকার রূপ প্রকাশ পায়। পুরুষ যেমন বিধাতার স্বতন্ত্র সৃষ্টি, কিন্তু মেয়েদের বেলায় তা নয়। সব নারী মিলে —এক নারী।" (আলাপচারী রবীন্দ্রনাথ পৃ ৭২) এই দিন

১ কবির শুশ্রূষাকারী ও সেবিকাদের মধ্যে ছিলেন অনেকেই : নন্দিতা কৃপালনী, অমিতা ঠাকুর, রানী চন্দ, সুরেন্দ্রনাথ কর, বিশ্বরূপ বসু, তেজেশচন্দ্র সেন, সুধাকান্ত রায়চৌধুরী, সরোজরঞ্জন চৌধুরী, বিনায়ক মাসোজি প্রভৃতি।

২ প্রবাসী ১৩৪৭ মাঘ।

কবি লেখেন 'নারী' কবিতাটি (আরোগ্য ১৯৪১ জানুয়ারি ১৩, ২৩ সংখ্যক)। কবিতাটি লিখিয়া কবি রানী দেবীকে দিয়া বলেন 'তোকে উপলক্ষ্য করে বিশ্বের নারীদের লিখেছি। রোগী তোদের কাছে দেবতা" (ঐ পৃ ৭৪)।

যে অভাগ্য নাহি লাগে কাজে
প্রাণলক্ষ্মী ফেলে যারে আবর্জনা মাঝে
তুমি তারে আনিছ কুড়ায়ে,
তার লাঞ্ছনার তাপ স্নিগ্ধ হস্তে দিতেছ জুড়ায়ে।

তাঁহার শুশ্রূষাকারীদের মধ্যে সুরেন্দ্রনাথ ছিলেন নিত্য জাগ্রত; তাঁহার সেবাকে কবি অমর করিয়া গেলেন 'আরোগ্য' কাব্য উৎসর্গ দ্বারা। এই কবিতার মধ্যে আছে :

বহু লোক এসেছিল জীবনের প্রথম প্রভাতে—
কেহ বা খেলার সাথী, কেহ কৌতুহলী,
কেহ কাজে সঙ্গ দিতে, কেহ দিতে বাধা।
আজ যারা কাছে আছ এ নিঃস্ব প্রহরে,
পরিশ্রান্ত প্রদোষের অবসন্ন নিস্তেজ আলোয়
তোমরা আপন দীপ আনিয়াছ হাতে,
খেয়া ছাড়িবার আগে তীরের বিদায়-স্পর্শ দিতে।

সত্যই সুরেন্দ্রনাথের নীরব চিরসহিষ্ণু সেবা সকলকেই মুগ্ধ করিয়াছিল। আর-একটি কবিতায় সরোজরঞ্জনের সেবা-নিষ্ঠার কথা বলিয়াছেন। (আরোগ্য ২১) বিশ্বরূপ বসুর কথাও আছে সেইদিনের আর-একটি রচনায় (আরোগ্য ২০)। অপরদের সম্বন্ধে বলিতেছেন :

পাশে যারা দাঁড়ায়েছে দিনান্তের শেষ আয়োজনে,
নাম না-ই বলিলাম তাহারা রহিল মনে মনে।
তাহারা দিয়েছে মোরে সৌভাগ্যের শেষ পরিচয়···। (আরোগ্য ১৫)

সুধাকান্ত সম্বন্ধে একটি কবিতা মুখে মুখে বলেন, সেটি প্রকাশিত হয় নাই; নিম্নে পাদটীকায় উদ্ধৃত হইল।[১]

এই অসুস্থতার মধ্যেও বিশ্বভারতীর সংবাদ রাখেন সবই। এই সময়ে চীন হইতে ভারতে যে Good-will mission আসে, তাহার অধিকর্তা হইয়া আসেন তাই-চি তাও; ইনি চীনা য়ুয়ান বা ব্যবস্থাপক সভার বিশিষ্ট সভাপতি, চীনের পাবলিক সার্বিস কমিশনের সভাপতি, চীন-হিন্দু সংস্কৃতি সমাজের সভাপতি এবং চীনের অগ্নিযুগে সানইয়াৎ সানের অন্যতম সহায়ক ছিলেন।

---

১ উদয়ন ১৯৪১ মার্চ ১২ বিকাল, রবীন্দ্রভবন থেকে প্রাপ্ত :

সুধাকান্ত
বচনের রচনে অক্লান্ত
মুখে কথা নাহি বাধে,
পসরা ভরিয়া রাখে বহুবিধ কুড়ানো সংবাদে,
প্রত্যহ কণ্ঠের পায় সাড়া
পাড়া হতে পাড়া।
আজি তার আত্মত্যাগ বাক্যত্যাগে হয়েছে কঠোর
রোগীর সেবার কার্যে মোর।
ও পাশের ঘরে
দিন কাটে সঙ্গীহীন নিঃশব্দ প্রহরে।
বাধা দেয় যাদের প্রবেশে
আহা যদি কাছে পেত এই ব'লে মরে যে ক্ষোভে সে।
তবু বিধাতার বর
আছে তার পর
বাক্যরুদ্ধ হয়ে গেলে তবু তার কাছে
অন্য পথ আছে।
অনায়াসে শব্দ আর মিল
কলমের মুখে তার করে কিলবিল।
মোর দিন মান
মুখর খাতায় তার যাহা তাহা দিতেছে জোগান
রচে বসি তুচ্ছতার ছবি—
ভয়ে মরি ছাই চাপা পড়ে বুঝি কবি।
মনে আছে একমাত্র আশা
বুদবুদের ইতিহাসে সুদীর্ঘ কালের নেই ভাষা।
বাহিরেতে চলিয়াছে দেশে দেশে বিরাটের পালা
অকিঞ্চিৎকরের স্তূপ জমাইছে এ আরোগ্যশালা।
লিখিবার কথা কোথা রুদ্ধ ঘরে দু চক্ষু বুলাই।
কোনোমতে ছড়া কেটে নিজেরে ভুলাই।
ধাক্কা তারে দেয় পিছে খ্যাপা উনপঞ্চাশ বায়ু,
এ বেলা ওবেলা তার আয়ু,
এরি মধ্যে কবি ঘেঁষে সুধাকান্ত এল
ইহাকেই বলে না কি strange bed-fellow!

তাই-চি-তাও প্রমুখ চীনা শুভইচ্ছা বাহিনীর সদস্যরা ৯ ডিসেম্বর শান্তিনিকেতনে আসিলেন। পরদিন প্রাতে আম্রকুঞ্জে অতিথিদের যথারীতি অভ্যর্থনা হইল। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ অসুস্থ বলিয়া তাই-চি-তাওকে তাঁহার কক্ষেই লইয়া যাওয়া হয়। দোভাষীর সাহায্যে উভয়ের বাক্যালাপ হইতে থাকে। কথাপ্রসঙ্গে তাও-চি-তাও বলেন, "আমি বাহির হইতে অতিথির ন্যায় এখানে আসি নাই, অন্তরের রাজ্যে আমি এই দেশেরও অধিবাসী।...যে-সময়ে চীন ও ভারত আপনাদের যথার্থ সত্তাকে ফিরিয়া পাইবার জন্য ব্যাকুল, সেই মুহূর্তে চীনদেশে আপনার আবির্ভাব দেবতার আশীর্বাদ স্বরূপ। ১৯২৪ সালে আপনি যে কেবল ভারতবর্ষের বাণীই চীনে বহন করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন তাহা নয়, আপনি আমাদিগের মধ্যে সেই জ্ঞান সঞ্চারেরও চেষ্টা করিয়াছিলেন, যাহাতে আমরা পাশ্চাত্য বস্তুতান্ত্রিকতার মায়াপাশ ছেদন করিয়া নিজেদের আত্মশক্তিতে প্রতিষ্ঠিত হইবার পথ চিনিয়াছি; সেই সময় হইতেই আমাদের সংস্কৃতির নবযুগের সূচনা।" বিদেশীর পক্ষে এইটি যে কত বড়ো স্বীকৃতি, তাহা ভাবিলে বিস্ময় লাগে। দুর্বল চীনের প্রতি বহিঃশত্রুর উপদ্রবের বিরুদ্ধে কবি চিরদিন প্রতিবাদ করিয়া আসিয়াছেন, তবে তাঁহার আশা যে 'আপন বীর্যের বলে সকল বাধা উত্তীর্ণ হইয়া চীন স্বাধীনতার পূর্ণতায় প্রতিষ্ঠিত হইবে।'[১]

কবির মনে চীনের কথা জাগিতেছে, তাই-চি-তাও ও তাঁহার সঙ্গীরা চলিয়া যাইবার পর দিন প্রাতে লিখিলেন:

সেই পুরাতন কালে ইতিহাস যবে
সংবাদে ছিল না মুখরিত
নিস্তব্ধ খ্যাতির যুগে—
আজিকার এই মতো প্রাণযাত্রা-কল্লোলিত প্রাতে
যাঁরা যাত্রা করেছেন
মরণশঙ্কিল পথে
আত্মার অমৃত অন্ন করিবারে দান
দূরবাসী অনাত্মীয় জনে,
দলে দলে যাঁরা
মরুবালুতলে অস্থি গিয়েছেন রেখে,
সমুদ্র যাঁদের চিহ্ন দিয়েছে মুছিয়া,
অনারব্ধ কর্মপথে
অকৃতার্থ হন নাই তাঁরা,
মিশিয়া আছেন সেই দেহাতীত মহাপ্রাণ মাঝে
শক্তি জোগাইছে যাহা অগোচরে চিরমানবেরে,
তাঁহাদের করুণার স্পর্শ লভিতেছি
আজ এই প্রভাত আলোকে,
তাঁহাদের করি নমস্কার।[২]

সেইদিন প্রাতে কবি সাতই পৌষের ভাষণটি মুখে মুখে বলিয়া যান, অমিয় চক্রবর্তী সেইটি লিখিয়া লন; পরে কবি সেইটি দেখিয়া দেন। ভাষণটির নাম 'আরোগ্য।'[৩] কবি বলেন, "আজ আমি রোগের দশা অতিক্রম করছি ব'লেই আরোগ্য কা'কে বলে সেটা বিশেষভাবে অনুভব করি, কিন্তু যথার্থ আরোগ্য সে জীবনের সকল অবস্থারই সম্পদ।" যৌবনের তেজ যখন প্রখর থাকে, লোকে তখন ভাবে, বার্ধক্যটা একটা অভাবাত্মক দশা, অর্থাৎ ক্রমে ক্রমে সমস্ত শক্তি হ্রাস হইয়া সেই দশা মৃত্যুর সূচনা করে। কিন্তু আজ কবি ইহার ভাবাত্মক দিক উপলব্ধি করিতে পারিতেছেন। তাই বলিতেছেন, "সত্তার যে বহিরঙ্গ, যাকে আমরা অহং নাম দিতে পারি, তার থেকে শ্রদ্ধা ক্রমশ শিথিল হয়ে আসছে।"

কবির মনে সদ্যপ্রত্যাগত চীনা অতিথিদের কথা জাগিতেছে; তাহাদের দুঃখ, তাঁহাকে পীড়িত করে, তাহাদের বীরত্বের মধ্যে আশার অরুণালোক দেখিতে পান। ভারত ও চীনের ক্ষেমধর্মের আদর্শে কবির গভীর শ্রদ্ধা; তাই

১ শ্রীসুধাকান্ত রায়চৌধুরী, রবীন্দ্রনাথ ও তাই-চি-তাও সংবাদ, প্রবাসী ১৩৪৭ পৌষ পৃ ৪২৩-২৪।

২ প্রবাসী ১৩৪৭ মাঘ পৃ ৪৬৬; উদয়ন শান্তিনিকেতন ১৯৪০ ডিসেম্বর ১২ প্রাতে।

৩ আরোগ্য, উদয়ন, শান্তিনিকেতন, ১৯৪০ ডিসেম্বর ১২ প্রাতে, শ্রীঅমিয় চক্রবর্তী কর্তৃক প্রতিলিপি, কবি কর্তৃক অনুমোদিত, ৭ই পৌষ শান্তিনিকেতনের বার্ষিক উৎসবে আচার্য শ্রীক্ষিতিমোহন সেন কর্তৃক পঠিত; প্রবাসী ১৩৪৭ মাঘ পৃ ৪৬৪-৬৬।

তিনি আশা করেন একদিন চীনের আত্মবিরোধের অবসান হইবে, তখন চীন তার সেই চিরন্তন প্রাচীন শান্তিকে পুনরায় পৃথিবীত স্থাপন করিতে পারিবে। ভারত সম্বন্ধেও তাঁহার অনুরূপ আশা। জীবনের সন্ধ্যায় চারিদিকের অকথিত বর্বরতার মধ্যে এখনো 'শান্তি এবং কল্যাণ এবং সর্বমানবের মধ্যে ঐক্য' আদর্শে কবি আস্থাবান। তাঁহার শেষ পৌষ-উৎসবের কামনা, "আমাদের পিতামহের মর্মস্থান থেকে উচ্চারিত [শান্তং শিবম্ অদ্বৈতম্] এই বাণী আমাদের প্রত্যেকের ধ্যানমন্ত্র হয়ে জগতে শান্তির দৌত্য করতে থাক্।...মানুষের সম্বন্ধে অদ্বৈতবুদ্ধি অর্থাৎ অখণ্ড মৈত্রী প্রচার করবার জন্য সেদিনকার বুদ্ধভক্ত ভারত থেকে প্রাণান্ত স্বীকার করেও দেশবিদেশে অভিযান করেছিল, পরস্পরকে আত্মসাৎ করবার জন্যে নয়।"[১]

পৌষ-উৎসব (১৩৪৭) আসিয়াছে; ৫ পৌষ ছেলেমেয়েদের আনন্দবাজারের মেলা। কবির মন ছাত্রদের উৎসবক্ষেত্রে। মৈত্রেয়ী দেবী, প্রতিমা দেবী, অমিয় চক্রবর্তী ও সুধাকান্তের কাছে সেইদিন তিনি গল্প করিয়া বলেন, পূর্বে একবার ছেলেরা কী করিয়া তাঁহার কাছ হইতে টাকা আদায় করিয়াছিল; আরো বলিলেন "এবার তো আমি যেতে পারব না। তা আমার বৌমার [প্রতিমা দেবী] কাছে পাঁচ টাকা জমা আছে···সেই টাকা আনন্দবাজারের দোকানীদের দিয়ে আসবে।" আনন্দবাজারের লভ্যাংশ দরিদ্রভাণ্ডার বা বিশেষ কোনো সেবাকর্মে ব্যয়িত হয়।

পৌষ-উৎসবের দিন মন্দিরে কবি উপস্থিত হইতে পারিলেন না। তিনি দুঃখ করিয়া বলিয়াছিলেন, "আমি আশ্রমে উপস্থিত আছি অথচ ৭ই পৌষের উৎসবের আসন গ্রহণ করতে পারি নি এরকম ঘটনা আজ এই প্রথম ঘটল।"

জীবনের শেষ সাতই পৌষ—১৩৪৭। কবি মন্দিরে যাইতে পারেন নাই, সেই সকালে লিখিলেন 'ভক্ত কুকুর' সম্বন্ধে কবিতা (আরোগ্য ১৪)। আজ কবির সহানুভূতি সর্বত্র বিরাজমান—সামান্য এক কুকুরের প্রতিও :

দেখি যবে মূক হৃদয়ের
প্রাণপণ আত্মনিবেদন
আপনার দীনতা জানায়ে,
ভাবিয়া না পাই ও যে কী মূল্য করেছে আবিষ্কার
আপন সহজ বোধে মানবস্বরূপে;
ভাষাহীন দৃষ্টির করুণ ব্যাকুলতা
বোঝে যাহা বোঝাতে পারে না,
আমারে বুঝায়ে দেয় সৃষ্টিমাঝে মানবের সত্য পরিচয়।

সেইদিন সন্ধ্যায় অমিয় চক্রবর্তীর সঙ্গে কবির 'মানবিক অভিব্যক্তি' সম্বন্ধে যে দীর্ঘ আলোচনা হয়, তাহা সুধাকান্ত সুনিপুণভাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।[২]

এই শেষ সাতই পৌষের (১৩৪৭) দিন কবি প্রদ্যোৎকুমার সেনগুপ্তের[৩] অটোগ্রাফের খাতায় এই কয়টি পংক্তি লিখিয়া দিলেন :

বরষে বরষে শিউলি তলায়
ব'স অঞ্জলি পাতি,
ঝরা ফুল দিয়ে মালাখানি লহ গাঁথি;
এ-কথাটি মনে জেনো
দিনে দিনে তার ফুলগুলি হবে ম্লান—
মালার রূপটি বুঝি
মনের মধ্যে রবে কোনোখানে
যদি দেখ তারে খুঁজি।
সিন্দুকে রহে বন্ধ
হঠাৎ খুলিলে আভাসেতে পাও
পুরানো কালের গন্ধ।

১ আরোগ্য, প্রবাসী ১৩৪৭ মাঘ পৃ ৪৬৪-৬৫।

২ প্রবাসী ১৩৪৭ মাঘ পৃ ৪৭৫-৭৭।

৩ প্রদ্যোৎকুমার শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন ছাত্র। ১৩৪২ হইতে ১৩৪৭ পর্যন্ত প্রতিবৎসর সাতই পৌষ তিনি কবির নিকট হইতে অটোগ্রাফ গ্রহণ করেন। সেগুলি প্রকাশিত হয় প্রবাসী ১৩৪৭ মাঘ পৃ ৪৩০-৩১-এ।

শরীর ভালো থাকিলে সন্ধ্যায় কবি নানারকমের আলোচনা করেন : অমিয় চক্রবর্তী উপস্থিত থাকিলে কথাবার্তা জমে ভালো। জগদ্ব্যাপী যুদ্ধের কথা উঠায় একদিন বলিলেন, "মানুষকে মানুষ মারছে পশুর মতো, কী ভয়ংকর নির্মমতা। অথচ আশ্চর্য ব্যাপার দেখো, একদল মানুষ এইসব দুঃখ কী তীব্রভাবে অনুভব করছে অন্তরে। এই যে তোমার মনে আমার মনে বাজছে—আরো কত লোকের মনে ব্যথা বাজছে—এর কারণ কী? আমার মনে এর একটা গূঢ় কারণের সন্ধান পাই।···আমার চিন্তায় এবং অনুভূতিতে টের পাই—একটা বিরাট মানব-সত্তা আছে অতীত বর্তমান এবং ভবিষ্যতকে জুড়ে, যে-সত্তার মধ্যে ক্রমাগত চলেছে একটা ভালোর তপস্যা।···

"সকলের মধ্যে একটা সাধারণ ভালোর জন্য একটা তাগিদ আছে, সকলের মধ্যেই অকল্যাণের বিরুদ্ধে কম বেশি প্রতিবাদ আছে।···বিরাট মানবসত্তার মধ্যে সব কালকে জড়িয়ে অনন্তকাল ধরে যে ভালোর তপস্যা চলেছে, ঐ সব মানুষের মধ্যেও একটি অবিচ্ছিন্ন ঐক্যসূত্রে চলেছে তারি ক্রিয়া।

"কিন্তু সে ঐক্যের ভিতর দিয়ে যে মানুষ সেই বিরাট মানবসত্তার পরম লক্ষ্যের কেন্দ্রাভিমুখে অগ্রসর না হতে পারে—সে চলে যায়, ঝরে যায়।···আমগাছে মুকুলের অজস্রতা ঘটে। কিন্তু সেই অগণ্য মুকুলের মধ্যে যারা ফলের পূর্ণতাকে প্রাপ্ত না হয়ে ঝরে যায় মরে যায় তাদের কথা কেউ ভাবে না···।" ইহাই হইতেছে প্রাকৃত ঘটনা—প্রকৃতির ঊর্ধ্বে যাহারা উঠিল না—তাহারা গেল অতলে; জগতে দেখা যায় মহৎদেরই লোকে স্মরণে রাখে। এই মহৎ কে? কবি বলিতেছেন, "বহুযুগ ধরে যে মনের সত্তা ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমানকে নিয়ে রয়েছে তারই পরম লক্ষ্যের দিকে যখন কোনো মানুষের মনুষ্যত্বের পরিণতি সার্থক হয়েছে তখন তিনি হয়েছেন মহৎ।···তাঁর বিনাশ নেই, তিনি পৌঁছেছেন পরম সত্যে।" এই প্রাকৃত ও মহতের মধ্যে বহুস্তরে বহু মানবের উদ্ভব হয়। "সংসারে যাঁরা কিছু ক্ষমতা নিয়ে জন্মেছেন কিম্বা এক-একটা বিষয়ে বিশেষ প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন, তাঁরা জীবজগতের মধ্যে নিশ্চয়ই এক-একটি পর্যায়ের এক-এক পংক্তিতে কেউ এতটুকু বড়ো কেউ অতটুকু বড়ো হয়েছেন সেটা মনের এবং সেই দিক দিয়ে ইন্‌টেলিজেনসের একটা ক্রমবিকাশের ফল বলতে পার। কিন্তু তাঁরাও, আমি যে মানবাত্মার কথা বলছি সেই বিরাট আত্মার লক্ষ্যের অন্তর্গত নন।" এই শ্রেণীর প্রতিভাবানদের সম্বন্ধে কবি বলিলেন যে, কালের বুকে ইহাদের স্মৃতিও মুছিয়া যায়। "কেন না তাঁদের বিদ্যা বুদ্ধি প্রতিভা সবই কেবলমাত্র জীবলোকের এক-একটা দিকের অনন্য-সাধারণতার অন্তর্গত।" কবির মতে "মানুষের যেটা পরম সার্থকতা সেটা আত্মার অনুভূতিতে, সেই বিরাট মানবাত্মার সঙ্গে যে মানুষের একাত্মতার অনুভূতি এবং উপলব্ধি যত গভীর সে মানুষ ততটাই সত্য।···যে মানুষ আত্মার রাজ্যে সেই পরমাত্মার সঙ্গে আত্মীয়তার ঘনিষ্ঠতাকে না উপলব্ধি করেছে সে ব্যর্থ হয়েছে, যেমন করে ব্যর্থ হয় ফল-না-হওয়া কত ফুল, তাদের সুখদুঃখের পর্ব ক্ষণিকতার মধ্যে কিছুক্ষণ বেঁচে থেকেই কালের মধ্যে নিঃশেষে মিলিয়ে যায়, তা নিয়ে দুঃখ করে লাভ নেই।" কবির বিশ্বাস এই শ্রেণীর মহামানব বা মহাত্মা যাঁহারা পরমাত্মার সঙ্গে একাত্ম, "তাঁরা ভবিষ্যতের লোকে রচনা করেন তাঁদের আসন। সে-আসন থেকে কেউ তাঁদের নামাতে পারে না।···তাঁরা সাময়িক সুখদুঃখকে নির্ভয়ে আনন্দে জলাঞ্জলি দিয়ে ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে স্থির করেছেন তাঁদের সাধনা।" কবি-জীবনের শেষ পৌষ-উৎসবের এই দুইটি দিন স্মরণীয়।

এই উৎসবের অন্তর্গত খ্রীষ্ট-জন্মদিনে কবির মনে চারিদিকের নৃশংসতা যে দারুণ বিক্ষোভ সৃষ্টি করিতেছে, তাহার প্রকাশ হয় 'প্রচ্ছন্ন পশু' (১৯৪০ ডিসেম্বর ২৪) কবিতায় :

সংগ্রাম-মদিরা পানে আপনা বিস্মৃত
দিকে দিকে হত্যা যারা প্রসারিত করে
মরণলোকের তারা যন্ত্রমাত্র শুধু,
তারা তো দয়ার পাত্র মনুষ্যত্বহারা।
সজ্ঞানে নিষ্ঠুর যারা উন্মত্ত হিংসায়
মানবের মর্মতন্তু ছিন্ন ছিন্ন করে
তারাও মানুষ ব'লে গণ্য হয়ে আছে,

কোনো নাম নাহি জানি বহন যা করে
ঘৃণা ও আতঙ্কে মেশা প্রবল ধিক্কার,
হায়রে নির্লজ্জ ভাষা হায় রে মানুষ।

ইতিহাস-বিধাতারে ডেকে ডেকে বলি
প্রচ্ছন্ন পশুর শাস্তি আর কত দূরে
নির্বাপিত চিতাগ্নিতে স্তব্ধ ভগ্নস্তূপে।[১]

দেহের এই অবস্থাতেও কোনো দিকে কোনো ত্রুটি না হয়—তাহার দিকে সজাগ দৃষ্টি আছে। এখনো কেহ কোনো অভিমত চাহিলে তাহাকে বিফল মনোরথ করেন না। এই সময়ে 'লোকশিক্ষা গ্রন্থমালা'য় প্রকাশের জন্য ডাক্তার পশুপতি ভট্টাচার্য লিখিত 'আহার ও আহার্য' নামক গ্রন্থখানি কবির কাছে আসে। ডাক্তার পশুপতিকে কবি খুবই স্নেহ করিতেন; ইতিপূর্বে তাঁহার 'ভারতীয় ব্যাধি ও তাহার প্রতিকার' গ্রন্থ পাঠ করিয়া অভিমত দিয়াছিলেন। এবারও বইখানি দেখিয়া কবি খুশি হইয়া লিখিলেন (১৯৪১ জানুয়ারি ৬) "পশুপতি, পরিভাষাবর্জিত সরল প্রণালীতে রচিত পথ্যবিচার সম্বন্ধে তোমার লেখাটি আমার ভালো লেগেছে ব'লে আমাদের লোকশিক্ষা গ্রন্থাবলীর মধ্যে তাকে গ্রহণ করবার জন্যে আমি আনন্দের সঙ্গে সম্মতি দিয়েছি। আমাদের দেশের কুপথ্যজীর্ণ পাকস্থলীর পক্ষে এই গ্রন্থ বিশেষ উপযোগী হয়েছে ব'লে আমার বিশ্বাস। আশা করি, তোমার এই লেখা দেশের লোকে আহার সম্বন্ধে অভ্যস্ত রুচির সংস্কার সাধনে শ্রদ্ধার সঙ্গে ব্যবহার করবে।"

রোগশয্যায় দিন যায়, কখনো কেদারায়, কখনো বিছানায়। রাত্রি কাটে কখনো অনিদ্রায়, কখনো বিচিত্র ভাবনায়। ইহারই মধ্যে চলে বিচিত্র সাহিত্যসৃষ্টি—কোনোটি গম্ভীর, কোনোটি লঘু, কোনোটি গদ্য, কোনোটি পদ্য। যেদিন সকালে (৫ মাঘ) লিখিলেন, 'করিয়াছি বাণীর সাধনা দীর্ঘকাল ধরি, আজ তারে ক্ষণে ক্ষণে উপহাস পরিহাস করি।'... (জন্মদিনে) সেই দিনই লেখেন 'মিলের কাব্য'; হালকাভাবে লিখিত বলিয়া 'প্রহাসিনী'তে সংযোজিত কবিতাটি নিছক হাস্য উদ্রিক্ত করে না, তার প্রমাণ ইহার ভূমিকাটি।[২]

কবি বলিতেছেন, "আমি ঠাট্টা করে বলে থাকি, আমার জীবনের প্রথম পালা কল্যাণরাগে, তখন সুস্থ শরীরে চলাফেরা চলত, দ্বিতীয় পালা এই কেদারা রাগিণীতে অচল ঠাটে বাঁধা।" হঠাৎ কবি বলিতে শুরু করিলেন, "যখন মনে ভাবি কিছু একটা হল, সুখদুঃখের তীব্রতা নিয়ে এমন করে হল যে কোনো কালে তার ক্ষয় হবে বলে ধারণাই হয় না, ঠিক সেই মুহূর্তেই মহাকাল পিছনে ব'সে ব'সে মুখ ঢেকে তার চিহ্নগুলো মুছতে শুরু করে দিয়েছেন। কিছুকাল পরে দেখি সাদা হয়ে গেছে, মনে যদি বা স্মৃতি থাকে তবু যে অনুভূতি তার সত্যতার প্রমাণ আজ লেশমাত্র তার বেদনা নাই। তাহলে যেটা হল শেষ পর্যন্ত সেটা কী। সংস্কৃত শ্লোকে প্রশ্ন আছে, রঘুপতির অযোধ্যাপুরী গেল কোথায়। রঘুপতি অযোধ্যা বহু লোকের বহু কালের নানাবিধ সুস্পষ্ট অনুভূতিতেই প্রতিষ্ঠিত, সেই বিপুল অনুভূতি গেল শূন্য হয়ে। তা হলে যা ছিল সে কী ছিল। মস্ত একটা 'না' প্রকাণ্ড একটা 'হাঁ'য়ের আকার ধরেছিল। নাস্তিত্ব সে অস্তিত্বের জাল গেঁথেই চলেছে, আবার সে জাল গুটিয়ে নিচ্ছে নিজের মধ্যে। এই দুর্বোধ রহস্যকে বাস্তব বলব কেমন করে। এই যে ইন্দ্রজাল এর মধ্যে দুইয়ের মিল চলেইছে, তাই একে মিত্রাক্ষর কাব্য বলতে হবে—একের উপাদানে সৃষ্টি হয়ই না। সৃষ্টি জোড় মিলনের কাব্য। গদ্যের ধারা শেষকালে মুখে মুখে ছড়ার ছন্দে লাইনে লাইনে গাঁট বেঁধে চলল।" 'মিলের কাব্য' কবিতাটির উদ্ভব এইভাবে হয়।

কাব্য বলে বেঠিক কথা এক হয়ে যায় আর
যেমন বেঠিক কথা বলে নিখিল সংসার।

আজকে যাকে বাষ্প দেখি কালকে দেখি তারা,
কেমন করে বস্তু বলি প্রকাণ্ড ইশারা।

১ প্রবাসী ১৩৪৭ মাঘ, 'প্রচ্ছন্ন পশু' পৃ ৪২৮।

২ কবিতা ১৩৪৭ চৈত্র।

ফোটা ঝরার মধ্যখানে এই জগতের
কী যে জানায় কালে কালে স্পষ্ট কি তা জানি
বিশ্ব থেকে ধার নিয়েছি তাই আমরা কবি
সত্যরূপে ফুটিয়ে তুলি অবাস্তবের ছবি।

ছন্দ ভাষা বাস্তব নয় মিল যে অবাস্তব—
নাই তাহাতে হাট-বাজারের গন্ধ কলরব।
হাঁ-য়ে না-য়ে যুগল নৃত্য কবির রঙ্গভূমে।
এতক্ষণ তো জাগায় ছিলুম এখন চলি ঘুমে।[১]

ইতিমধ্যে কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকট হইতে এক পত্র আসিয়াছে ; তিনি কবির প্রায় সমবয়সী,—তিনি নিজে পীড়িত, রবীন্দ্রনাথের কাছে জীবনের পাথেয়রূপে আশিসপ্রার্থী হইলেন। কবি তাঁহাকে লিখিয়া পাঠাইলেন:

হে বন্ধু, হে সাহিত্যের সাথী,
আসিছে আসন্ন হয়ে রাতি।
আছি দোঁহে দিনান্তের প্রদোষচ্ছায়ায়
পারের খেয়ার প্রতীক্ষায়।
পথে দীপ ধরে আছে জানি না সে কোন্ শুকতারা,
কোন্ প্রভাতের কূলে বিদায়ের যাত্রা হবে সারা।

মায়া-বিজড়িত এই জীবনের স্বপ্নরাজ্য হতে
চির জাগরণ হবে পূর্ণের আলোতে,—
মৃত্যুর আনন্দরূপ এ আশ্বাসে অন্তিম আঁধারে
দেখা দিবে এ জন্মের দ্বিধাদ্বন্দ্ব পারে।

সহযাত্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর[২]

জীবনের সন্ধ্যায় কত কথা মনে পড়ে—কতটুকু তার আজ ব্যক্ত করিতে পারিতেছেন। মনে হইতেছে 'বিপুলা এ পৃথিবীর কতটুকু জানি।'

সবচেয়ে দুর্গম যে-মানুষ আপন অন্তরালে
তার পূর্ণ পরিমাপ নাই বাহিরের দেশকালে।
সে অন্তরময়

অন্তর মিশালে তবে তার অন্তরের পরিচয়।
পাই নে সর্বত্র তার প্রবেশের দ্বার
বাধা হয়ে আছে মোর বেড়াগুলি জীবনযাত্রার।

কবি নিজ জীবনে সর্বলোকের মধ্যে প্রবেশলাভ করিতে পারেন নাই, সে খেদ তাঁহার ছিল।

আমার কবিতা, জানি আমি,
গেলেও বিচিত্র পথে হয় নাই সে সর্বত্রগামী।
কৃষাণের জীবনের শরিক যে-জন…
কর্মে ও কথায় সত্য আত্মীয়তা করেছে অর্জন
যে আছে মাটির কাছাকাছি
সে কবির বাণী লাগি কান পেতে আছি।
সাহিত্যের আনন্দের ভোজে
নিজে যা পারি না দিতে নিত্য আমি থাকি তার খোঁজে।
সেটা সত্য হোক,
শুধু ভঙ্গী দিয়ে যেন না ভোলায় চোখ।…
সত্য মূল্য না দিয়েই সাহিত্যের খ্যাতি করা চুরি
ভালো নয়; ভালো নয়. নকল সে শৌখিন মজদুরি।

এসো কবি, অখ্যাতজনের
নির্বাক মনের
মর্মের বেদনা যত করিয়ো উদ্ধার—
প্রাণহীন এদেশেতে গানহীন যেথা চারি ধার,
অবজ্ঞার তাপে শুষ্ক নিরানন্দ সেই মরুভূমি
রসে পূর্ণ করে দাও তুমি।
অন্তরে যে উৎস তার আছে আপনারি
তাই তুমি দাও তো উদ্‌বারি।
সাহিত্যের ঐকতান-সংগীত সভায়
একতারা যাহাদের তারাও সম্মান যেন পায়—
মূক যারা দুঃখে সুখে,
নতশিরে স্তব্ধ যারা বিশ্বের সম্মুখে,

১ মিলের কাব্য, ১৯৪০ জানুয়ারি ১৯ ; দ্র প্রহাসিনী, সংযোজনী র-র ২৩ পৃ ৬৭-৬৮।
২ 'পারের খেয়ার প্রতীক্ষায়' ১৯৪১ জানুয়ারি ১৭ প্রবাসী ১৩৪৮ আশ্বিন পৃ ৭২৪।

ওগো গুণী,
কাছে থেকে দূরে যারা তাহাদের বাণী যেন শুনি।
তুমি থাকো তাহাদের জ্ঞাতি,
তোমার খ্যাতিতে তারা পায় যেন আপনার খ্যাতি—
আমি বারংবার
তোমারে করিব নমস্কার।[১]

স্বাধীনতা দিনের স্মরণেই বোধ হয় (২৭ জানুয়ারি) লিখিলেন একটি কবিতা (জন্মদিনে ২২):

সিংহাসনতলচ্ছায়ে দূরে দূরান্তরে
যে রাজ্য জানায় স্পর্ধাভরে
রাজায় প্রজায় ভেদ মাপা,
পায়ের তলায় রাখে সর্বনাশ চাপা।...

আজ মহাযুদ্ধে বৃটেন ভারতের সহায়তা চাহিতেছে—কিন্তু কে সাহায্য দান করিবে? আজ ভারতকে কী দুর্বল, কী অসহায় করিয়া রাখিয়াছে ইংরেজ।

সেথা মুমূর্ষুর দল রাজত্বের হয় না সহায়,
হয় মহা দায়।
একপাখা শীর্ণ যে পাখির
ঝড়ের সংকটদিনে রহিবে না স্থির—
সমুচ্চ আকাশ হতে ধুলায় পড়িবে অঙ্গহীন—
আসিবে বিধির কাছে হিসাব-চুকিয়ে-দেওয়া দিন।
অভ্রভেদী ঐশ্বর্যের চূর্ণীভূত পতনের কালে
দরিদ্রের জীর্ণ দশা বাসা তার বাঁধিবে কঙ্কালে।

এ কি কবির ভবিষ্যৎ বাণী বৃটিশের ভাবী দশা সম্বন্ধে? বহু বৎসর পূর্বে কবি গাহিয়াছিলেন—"আমাদের শক্তি মেরে তোরাও বাঁচবি নেরে। বোঝা তোর ভারি হলেই ডুববে তরীখান।" ইতিহাস কি আজ তাহার সাক্ষ্য দিতেছে না? ভারতের রাজনৈতিক অবস্থা এখন (১৯৪১) অত্যন্ত সংকটাপন্ন; ইংরেজ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে ব্যস্ত, ভারতের কোনো দাবিদাওয়া সে শুনিতে চায় না। সে চায় ভারতের আনুগত্য, যুদ্ধে সহযোগিতা। এদিকে ভারতও স্বাধীনতা-লাভের জন্য উদ্‌গ্রীব। স্বাধীনতাকামীদের পক্ষ হইতে সত্যাগ্রহ, সাম্রাজ্যবাদীদের তরফ হইতে নিগ্রহ যুগপৎ সমান্তরাল রেখায় চলিতেছে। গান্ধীজির অহিংসমন্ত্রে রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা চিরদিনের; আজ ইংরেজ গবর্মেণ্টের সন্ত্রাস প্রয়াসকে উপেক্ষা করিয়া জবরদস্তিকে প্রতিহত করিবার জন্য ভারত দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। কবির মনে আজ সেই কথাটি জাগিতেছে—তিনি লিখিলেন:

গান্ধী মহারাজের শিষ্য
কেউ বা ধনী, কেউ বা নিঃস্ব,
এক জায়গায় আছে মোদের মিল,—
গরিব মেরে ভরাই নে পেট,
ধনীর কাছে হই না তো হেঁট,
আতঙ্কে মুখ হয় না কভু নীল।[২]

কবির মর্তজীবনের শেষ মাঘোৎসব আসিল। শান্তিনিকেতনের মন্দিরে (১৩৪৭ মাঘ ১১) গুরুদয়াল মল্লিক উপাসনা করিলেন; তদনন্তর কবির অভিভাষণ পঠিত হয়। ইহার একস্থানে কবি স্পষ্ট করিয়াই বলেন যে, "১১ই মাঘের উৎসব যে-সত্যে প্রতিষ্ঠিত তাকে আমাদের দেশের জনসাধারণ স্বীকার করে নি। যা তারা স্বীকার করে না তাকে কলঙ্কিত করে। যিনি পরম শ্রদ্ধেয় যেমন মহাত্মা রামমোহন রায় তাঁর সম্বন্ধে বিরোধের উত্তাপ আজো প্রশমিত হয়নি।" কবির মতে মহাপুরুষের 'সম্মানে স্বদেশের প্রতিই সম্মান' একথা আমরা ভুলিয়া থাকি। রবীন্দ্রনাথের জীবনে রামমোহন যে কতখানি স্থান জুড়িয়া ছিলেন, তাহা যাঁহারা কবির লিখিত রামমোহন সম্বন্ধে রচনা ও মাঘোৎসবের ভাষণগুলি পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা সাক্ষ্য দিবেন। 'চিরস্মরণীয়' কবিতা (জন্মদিনে ১৮) রামমোহন স্মরণেই রচিত।

১ ঐকতান, প্রবাসী ১৩৪৭ ফাল্গুন পৃ ৫৭৫-৭৭; জন্মদিনে ১০ সংখ্যক।

২ গান্ধী মহারাজা, ১৩ ডিসেম্বর ১৯৪০ সন্ধ্যা।

মৃত্যুঞ্জয় যাহাদের প্রাণ,
সব তুচ্ছতার ঊর্ধ্বে দীপ যারা জ্বালে অনির্বাণ,
তাহাদের মাঝে যেন হয়
তোমাদেরি নিত্য-পরিচয়।
তাহাদের খর্ব কর যদি
খর্বতার অপমানে বন্দী হয়ে রবে নিরবধি।
তাদের সম্মানে মান নিয়ো
বিশ্বে যারা চিরস্মরণীয়।[১]

রামমোহন রায় যে কেবল রবীন্দ্রনাথের শ্রদ্ধার মানুষ ছিলেন তাহা নহে, অনেকের জানা নাই যে, স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহাকে গভীর শ্রদ্ধা করিতেন। ভগিনী নিবেদিতাকে এ বিষয়ে তিনি যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল: "It was here too, that we heard a long talk on Rammohan Roy, in which he pointed out three things as the dominant notes of this teacher's message,—his acceptance of the Vedanta, his preaching of patriotism, and the love that embraced the Mussalman equally with the Hindu. For all these things, he claimed himself to have taken up the task that the breadth and foresight of Rammohan Roy had mapped out."[২]

শেষ মাঘোৎসবের দিন কবি দুইটি কবিতা লেখেন। প্রাতে লিখিলেন:

সৃষ্টিলীলাপ্রাঙ্গণের প্রান্তে দাঁড়াইয়া
দেখি ক্ষণে ক্ষণে
তমসের পরপার,
যেথা মহা-অব্যক্তের অসীম চৈতন্যে ছিনু লীন।
আজি এ প্রভাতকালে ঋষিবাক্য জাগে মোর মনে।

এইটি আছে 'জন্মদিনে' (১৩)। অপরটি সন্ধ্যায় লিখিত, সেইটি আছে 'আরোগ্য' খণ্ডে (৩৩):

এ আমির আবরণ সহজে স্খলিত হয়ে যাক ;
চৈতন্যের শুভ্র জ্যোতি
ভেদ করি কুহেলিকা
সত্যের অমৃত রূপ করুক প্রকাশ।
সর্বমানুষের মাঝে
এক চিরমানবের আনন্দকিরণ
চিত্তে মোর হোক বিকীরিত।...

কবির জীবন কী গভীরে প্রবেশ করিতেছে তাহা এই সময়ের কবিতাগুলি পাঠ করিলেই বুঝা যায়, প্রান্তিক রোগশয্যায়, আরোগ্য ও জন্মদিনে—এই কাব্য চতুষ্টয়কে যদি আমরা কেবলমাত্র কাব্য হিসাবে বিচারে প্রবৃত্ত হই, তবে হয়তো আমাদের প্রয়াস আংশিকভাবে সফল হইতে পারে ; কিন্তু কাব্যকলা অতিক্রম করিয়া কবি-মানসের যে বিরাট সত্তার স্পর্শে আমরা আসি, তাহা আমাদের অভিজ্ঞতার বাহিরের বস্তু ; অথবা প্রাকৃত লোকে ঈশ্বর সম্বন্ধে যে সাধারণ সংজ্ঞা পোষণ করে, কবির ঈশ্বরচেতনা তাহা হইতে অনেক দূরে বলিয়া তাহার আবেদন তাহাদের অন্তরে পৌঁছায় না। তাঁহার ঘোষণা 'জয় অজানার জয়'। সত্যই ইহসংসারে এই-যে আমাদের বাস—সে তো জানা-অজানার মধ্যেই ; বিপুলা এ পৃথিবী সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান যেমন সীমায়িত, তেমনই চক্ষের, মনের ও ধ্যানের অগম্য অজ্ঞাত লোক সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান আরও অস্পষ্ট। উপনিষদে আছে—

নাহং মন্যে সুবেদেতি নো ন বেদেতি বেদ চ। যো নস্তদ্বেদ তদ্বেদ নো ন বেদেতি বেদ চ ॥ (ব্রাহ্মধর্ম ৪র্থ অধ্যায় পৃ ৬)

'আমি ব্রহ্মকে সুন্দররূপে জানিয়াছি, এমন মনে করি না। আমি ব্রহ্মকে যে না জানি এমনো নহে, জানি যে

১ প্রবাসী ১৩৪৭ ফাল্গুন পৃ ৫৮০ ; দ্র জন্মদিনে ১৮।

২ Notes on some wanderings with the Swami Vivekananda. Authorised ed. 1918—Ed. by Swami Saradananda, Udbodhan office, Calcutta, Chap II, p 19 ; প্রবাসী ১৩৪৭ পৌষ পৃ ৩৯৪ হইতে উদ্ধৃত।

এমনো নহে। আমি ব্রহ্মকে যে না জানি এমনো নহে, জানি যে এমনো নহে',—এই বাক্যের মর্ম যিনি আমাদিগের মধ্যে জানেন, তিনিই তাঁহাকে জানেন।

গভীর জীবনের ধ্যানলব্ধ সত্যের প্রকাশ ও কবিজীবনের অনুভূতির প্রকাশ চলে যুগপৎ এই জীবনসন্ধ্যায়। ইহারই সঙ্গে আছে রূপসৃষ্টির প্রয়াস—গল্পের মধ্য দিয়া। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যসৃষ্টির মধ্যে আমরা বারেবারে দেখিয়াছি গভীর মনন-ধর্মী বা লিরিক-ধর্মী কবিতার সঙ্গে বা পরে পরেই চলে গল্পের মধ্য দিয়া বিচিত্র চরিত্র সৃষ্টির পালা। রোগশয্যায় প্রমুখ কাব্য চতুষ্টয়ের শেষভাগে দেখা দিল 'গল্পসল্প'। ইহার আগেই দেখা দেয় 'ছড়া'র আনন্দলহরী; সে আনন্দ-দীপ সকলপ্রকার শারীরিক দুঃখের মধ্যেও অনির্বাণ ছিল। 'ছড়া'গুলি লিখিয়া তাহার ভূমিকায় বলিয়াছিলেন :

অলস মনের আকাশেতে
প্রদোষ যখন নামে
কর্মরথের ঘড়ঘড়ানি
যে মুহূর্তে থামে
এলোমেলো ছিন্ন চেতন
টুকরো কথার ঝাঁক
জানিনে কোন্ স্বপ্নরাজের
শুনতে যে পায় ডাক,
ছেড়ে আসে কোথা থেকে
দিনের বেলার গর্ত,
কারো আছে ভাবের আভাস
কারো বা নেই অর্থ।
ঘোলা মনের এই যে সৃষ্টি
আপন অনিয়মে
ঝিঁঝির ডাকে অকারণের
আসর তাহার জমে।[১]

'গল্পসল্প'র গদ্য ও পদ্য লেখেন ফেব্রুয়ারি ও মার্চ (১৯৪১) মাসে; সেগুলি শেষ জীবনের অপরূপ সৃষ্টি; অসুস্থ শরীরের অবসাদগ্রস্ত মনের কোনো ছায়া নাই এ রচনার মধ্যে; গল্পসল্পে যে চরিত্রগুলি অঙ্কিত হইয়াছে, তাহাদের অনেকগুলিই কবির বাল্যকালের দেখা মানুষ; কবির ভাষাবিন্যাসে তাহারা কেহ হইয়াছে বড়ো, কেহ হইয়াছে ছোটো; মোটকথা সকলেই হইয়াছে অমর—সাহিত্যের সজ্জায়।

গল্পসল্পের শেষ রচনা 'দাদা হব ছিল বিষম শখ' (১৯৪১ মার্চ ১২)। এই হালকা সুরে গাঁথা কবিতাটির মধ্যে জীবনের শেষ ছবি যেন আঁকা।

সাঙ্গ হয়ে এল পালা,
নাট্যশেষের দীপের মালা,
নিভে নিভে যাচ্ছে ক্রমে ক্রমে,
রঙিন ছবির দৃশ্যরেখা,
ঝাপসা চোখে যায় না দেখা
আলোর চেয়ে ধোঁয়া উঠছে জমে।
সময় হয়ে এল এবার
স্টেজের বাঁধন খুলে দেবার,
নেবে আসছে আঁধার যবনিকা,
খাতা হাতে এখন বুঝি
আসছে কানে কলম গুঁজি,
কর্ম যাহার চরম হিসাব লিখা।
চোখের 'পরে দিয়ে ঢাকা
ভোলা মনকে ভুলিয়ে রাখা
কোনো মতেই চলবে না তো আর।
অসীম দূরের প্রেক্ষণীতে
পড়বে ধরা শেষ গণিতে
জিত হয়েছে, কিংবা হোলো হার।

'গল্পসল্প' লিখিবার মূলে ছিল শিশুদের দ্রুতপাঠ-উপযোগী সরস গ্রন্থের অভাব মোচনের চেষ্টা। প্রথমে শান্তিনিকেতন পাঠভবন হইতে প্রকাশিতব্য পাঠ্যগ্রন্থমালার অন্তর্গত করিয়া প্রকাশ করিবার জন্য ইহার রচনা শুরু হয়।

১ 'ছড়া' কবিতাগুচ্ছের ভূমিকা স্বরূপ এই কবিতাটি (প্রবা, ১৩৪৭ পৌষ ২১। ১৯৪১ জানু ৫, দ্র শনিবারের চিঠি)।

তৎকালীন সম্পাদক শান্তিনিকেতনের অধ্যাপক ক্ষিতীশ রায় কবির এই পরিকল্পনাটির সঙ্গে বিশেষভাবে যুক্ত ছিলেন। কিন্তু লেখা অগ্রসর হইলে, বইখানিকে কবির অন্যান্য সাহিত্যগ্রন্থের মর্যাদায় স্বতন্ত্ররূপেই বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ কর্তৃক প্রকাশের ব্যবস্থা হয়।[১] গল্প বলিবার প্রেরণা হইতে যেমন ছোটো ছোটো 'গল্পসল্প' জমিয়া উঠিল, তেমনি তিন (Short story) চারিটি ছোটো-গল্পেরও খসড়া করেন আর কয়েক দিন পরে।

বসন্তউৎসব আগত। এই অসুস্থতার মধ্যে যাহাতে উৎসব নিখুঁতভাবে সম্পন্ন হয় তজ্জন্য শৈলজারঞ্জন ও শান্তিদেবকে যথাযথভাবে এখনো উপদেশ দান করিতেছেন। 'নটীর পূজা'র অভিনয় হইবে সেদিন সন্ধ্যায়। কবি যাইতে পারিবেন না; তাই তাঁহার সম্মুখে একদিন অভিনয় হইল। কিন্তু আজকাল তাঁহার শ্রবণদর্শন-শক্তি উভয়ই হ্রাস পাইয়াছে; গানের সমস্ত সুর আজকাল ধরিতে পারেন না। এই বসন্তোৎসবের দিন কবি লেখেন;

আর বার ফিরে এল বসন্তের দিন।
রুদ্ধকক্ষে দূরে আছি আমি—
এ বৎসরে বৃথা হোলো পলাশবনের নিমন্ত্রণ ![২]

সেদিন ও তার পূর্ব দিনে লিখিত কবিতাগুলি 'জন্মদিনে' নামে কাব্যখণ্ডের মধ্যে সঙ্কিত। যদিও বসন্তোৎসবের সময় লিখিত, এগুলি যথাযথভাবে জন্মদিনের কবিতা। নিজ জন্মদিনের কথা কেন আজ স্মরণে আসিতেছে বলিতে পারি না, হয়তো মনে মনে আশঙ্কা ছিল জন্মদিন ফিরিয়া নাও আসিতে পারে। তাই যেন শেষ কথাটি বলিতে চেষ্টা করিলেন এই তিনটি কবিতায়—"সেদিন আমার জন্মদিন। বহু জন্মদিনে গাঁথা আমার জীবনে দেখিলাম আপনারে বিচিত্ররূপের সমাবেশে জন্মবাসরের ঘটে নানা তীর্থে পুণ্যতীর্থবারি করিয়াছি আহরণ, এ-কথা রহিল মোর মনে।[৩] ১৯৪১ ফেব্রুয়ারি ২১।

শেষ কয়মাস

নববর্ষ আসিতেছে, তদুপলক্ষ্যে কবির নিকট হইতে একটি গান চাওয়া হয়; শান্তিদেব লিখিতেছেন, "প্রথমে আপত্তি করলেন, কিন্তু আমার আগ্রহ দেখে…বললেন 'সৌম্য [ঠাকুর] আমাকে বলেছে মানবের জয়গান গেয়ে একটা কবিতা লিখতে। সে বলে আমি যন্ত্রের জয়গান গেয়েছি মানবের জয়গান করিনি। তাই একটা কবিতা রচনা করেছি, সেটাই হবে নববর্ষের গান।' কবিতাটি ছিল বড়ো, দেখে ভাবলাম এত বড়ো কবিতায় সুরযোজনা করতে বলা মানে তাঁকে কষ্ট দেওয়া। সুর দেবার একটু চেষ্টা করে সেদিন আর পারলেন না, বললেন 'কালকে হবে।' পরের দিন সেই কবিতাটি সংক্ষেপ করতে করতে শেষ পর্যন্ত, বর্তমানে 'ঐ মহামানব আসে' গানটি যে আকারে আছে, সেই আকারে তাকে পেলাম।"[৪]

এই মহামানব কী ? এ তো কোনো ব্যক্তি যাঁহাকে আমরা মহাপুরুষ বলি তাঁহার আবাহন নহে। এই আবাহন কবির MAN-কে—যে মানব আইডিয়া রূপে, শাশ্বত ঐক্যরূপে চিরন্তন, যে মানব ভাবীকালের অভ্যুদয়ের প্রতীক্ষায় রহিয়াছে। সেইদিক হইতে গানটি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য।

১ দ্র কবিকথা পৃ ৪১।

২ জন্মদিনে (৪); উদয়ন ১৯৪১ ফেব্রুয়ারি ২১।

৩ জন্মদিনে ১, ২, ৩, ৪ রচিত), ১৯৪১ ফেব্রুয়ারি ২০ ও ২১।

৪ উদয়ন, 'শান্তিনিকেতন ১৩৪৮ বৈশাখ ১; দ্র গীতবিতান (নূতন সং) পৃ ২৮৭, দ্র রবীন্দ্রসংগীত পৃ ২৮৩-৮৫।

এই নববর্ষে (১৩৪৮ বৈশাখ ১) কবির 'জন্মদিনে' কাব্যখণ্ড প্রকাশিত হয় ; ইহাই তাঁহার জীবিত কালের শেষ মুদ্রিত কাব্য। এই মাসে 'গল্পসল্প'ও বাহির হয়।

রোগক্লান্ত জীবনের শেষ নববর্ষ আসিল। এবার তাঁহার জন্মোৎসবের ভাষণ হইল 'সভ্যতার সংকট'। আজ য়ুরোপ ও পৃথিবীর স্থানে স্থানে যুদ্ধের যে মরণতাণ্ডব চলিতেছে, তাহারই কারণ বিশ্লেষণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন এই ভাষণে। পাশ্চাত্য দেশের অষ্টাদশ শতকের আদর্শবাদ,—য়ুরোপীয় বিশেষ করিয়া ইংরেজি সাহিত্যের সৌন্দর্য এককালে ভারতীয়দের যে কী মুগ্ধ করিয়াছিল—সে কথা কবি স্মরণ করেন। কিন্তু আজ বিংশশতকের মধ্যভাগে ইংরেজের কী মূর্তি দেখা যাইতেছে। কবি বলিতেছেন, 'মানব আদর্শের এত বড়ো নিষ্ঠুর বিকৃত রূপ কল্পনা করতেই পারিনি।' ভারতবর্ষের জনসাধারণের নিদারুণ দারিদ্র্য হৃদয়বিদারক। তাহার সহিত যখন বহির্জগতের তুলনা করেন, তখন মনের প্রশান্তি রক্ষা করা কঠিন হইয়া উঠে। কবি অতি দুঃখে বলিতেছেন, "যে যন্ত্রশক্তির সাহায্যে ইংরেজ আপনার বিশ্বকর্তৃত্ব রক্ষা করে এসেছে তার যথোচিত চর্চা থেকে এই নিঃসহায় দেশ বঞ্চিত, অথচ চক্ষের সামনে দেখলুম জাপান যন্ত্রচালনার যোগে দেখতে দেখতে সর্বতোভাবে কীরকম সম্পদ্‌বান হয়ে উঠল। সেই জাপানের সমৃদ্ধি আমি স্বচক্ষে দেখে এসেছি।...আর দেখেছি রাশিয়ায় মস্কাও নগরীতে জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের, আরোগ্যবিস্তারের কী অসামান্য অকৃপণ অধ্যবসায়। সেই অধ্যবসায়ের প্রভাবে এই বৃহৎ সাম্রাজ্যের মূর্খতা ও দৈন্য ও আত্মাবমাননা অপসারিত হয়ে যাচ্ছে। এই সভ্যতা জাতিবিচার করেনি, বিশুদ্ধ মানবসম্বন্ধের প্রভাব সর্বত্র বিস্তার করেছে। তার দ্রুত এবং আশ্চর্য পরিণতি দেখে একই কালে ঈর্ষা এবং আনন্দ অনুভব করেছি। মস্কাও শহরে গিয়ে রাশিয়ার শাসনকার্যের একটি অসাধারণতা আমার অন্তরকে স্পর্শ করেছিল ; দেখেছিলেম সেখানকার মুসলমানদের সঙ্গে রাষ্ট্রঅধিকারের ভাগবাঁটোয়ারা নিয়ে অমুসলমানদের কোনো বিরোধ ঘটে না, তাদের উভয়ের মিলিত স্বার্থসম্বন্ধের ভিতরে রয়েছে শাসনব্যবস্থার যথার্থ সত্য ভূমিকা।"

এই অভিভাষণের শেষে কবি যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা ভবিষ্যৎ-বাণীর ন্যায় সফল হইয়াছে—এখন কেবল অপেক্ষা নিখিল জগতে মহামানবের জাগরণ। কবি বলিতেছেন— "ভাগ্যচক্রের পরিবর্তনের দ্বারা একদিন না একদিন ইংরেজকে এই ভারতসাম্রাজ্য ত্যাগ করে যেতে হবে। কিন্তু কোন্ ভারতবর্ষকে সে পিছনে ত্যাগ করে যাবে ? কী লক্ষ্মীছাড়া দীনতার আবর্জনাকে। একাধিক শতাব্দীর শাসনধারা যখন শুষ্ক হয়ে যাবে, তখন এ কী বিস্তীর্ণ পঙ্কশয্যা দুর্বিষহ নিষ্ফলতাকে বহন করতে থাকবে। জীবনের প্রথম আরম্ভে সমস্ত মন থেকে বিশ্বাস করেছিলুম য়ুরোপের অন্তরের সম্পদ এই সভ্যতার দানকে। আর আজ আমার বিদায়ের দিনে সে বিশ্বাস একেবারে দেউলিয়া হয়ে গেল। আজ আশা করে আছি, পরিত্রাণকর্তার জন্মদিন আসছে আমাদের এই দারিদ্র্যলাঞ্ছিত কুটীরের মধ্যে। অপেক্ষা করে থাকব। সভ্যতার দৈববাণী সে নিয়ে আসবে, মানুষের চরম আশ্বাসের কথা মানুষকে এসে শোনাবে এই পূর্ব দিগন্ত থেকেই। আজ পারের দিকে যাত্রা করেছি—পিছনের ঘাটে কী দেখে এলুম, কী রেখে এলুম, ইতিহাসের কী অকিঞ্চিৎকর উচ্ছিষ্ট সভ্যতাভিমানের পরিকীর্ণ ভগ্নস্তূপ ; কিন্তু মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ, সে বিশ্বাস শেষ পর্যন্ত রক্ষা করব। আশা করব, মহাপ্রলয়ের পরে বৈরাগ্যের মেঘমুক্ত আকাশে ইতিহাসের একটি নির্মল আত্মপ্রকাশ হয়তো আরম্ভ হবে এই পূর্বাচলের সূর্যোদয়ের দিগন্ত থেকে। আর একদিন অপরাজিত মানুষ নিজের জয়যাত্রার অভিযানে সকল বাধা অতিক্রম করে অগ্রসর হবে তার মহৎ মর্যাদা ফিরে পাবার পথে। মনুষ্যত্বের অন্তহীন প্রতিকারহীন পরাভবকে চরম বলে বিশ্বাস করাকে আমি অপরাধ মনে করি।

"এই কথা আজ বলে যাব, প্রবল প্রতাপশালীরও ক্ষমতা মদমত্ততা আত্মম্ভরিতা যে নিরাপদ নয় তারই প্রমাণ হবার দিন আজ সম্মুখে উপস্থিত হয়েছে ; নিশ্চিত এ সত্য প্রমাণিত হবে যে—

অধর্মেণৈধতে তাবৎ ততো ভদ্রাণি পশ্যতি। ততঃ সপত্নান্ জয়তি সমূলস্তু বিনশ্যতি।"

রোগশয্যার দিন কিভাবে যাইতেছে তাহার কথা বলিয়াছি। প্রতিদিনই কিছু না কিছু বলেন, পাশের লোকে লিখিয়া লয়। রানী চন্দ কথাবার্তা লিখিতে চেষ্টা করেন, তার আভাস 'আলাপচারী রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থে পাওয়া যায়। এক-একদিন একএকটি প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন—কোনোদিন পুরাতন কথা, বিলাতে হেন্‌রী মর্লি কিভাবে পড়াইতেন—বঙ্কিমচন্দ্র কোন্ বই পড়িয়া কী বলেন ইত্যাদি। সমাজে মেয়েদের স্থান যে কত বড়ো এবং কেন-যে বড়ো একদিন সে-সম্বন্ধে আলোচনা করিলেন (১৯৪১ এপ্রিল ২০)। সেদিন বলিলেন, 'সব মানুষই instinct নিয়ে জন্মায়। সবার ভিতরেই থাকে কামনা, ইচ্ছে। ক্ষুধার অন্ন,—এই অন্ন দেহ মন দুই-ই চায়। মানুষের ভিতরে ভিতরে অনেকরকম পশুবৃত্তি আছে যা নির্মল নয়, অথচ প্রবল। যারা ভালো তারা চায়, সেই instinctটাকে জয় করতে।...এইখানেই দরকার হয় শিক্ষার। শিক্ষার দ্বারা instinctকে মার্জিত, সুন্দর, সংযত সুসভ্য করা যায়। instinctকে মার্জিত করেই সাধক, মুনি, সাধু হোতে পেরেছে। এই জায়গায়ই শিক্ষার প্রয়োজন; সংস্কারে এ হয় না।" (আলাপচারী পৃ ৮৮)

কিছুকাল হইতে কবির মনে সাহিত্য সম্বন্ধে নানা প্রশ্ন জাগিতেছে।[১] যুগের পরিবর্তনে মানুষের রসসম্ভোগের মানেরও পরিবর্তন হয়। অতীতের মুহূর্তগুলি এক সময়ে তো 'বর্তমান' ছিল; সেই অতীতের 'বর্তমানে', সেযুগের কবি ও শিল্পীরা যথাযথ সম্মান লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু আজ কয়জনকে আমরা স্মরণ করি, কয়জনের নাম সর্বসাধারণের জ্ঞাত। অথচ একদিন সেইযুগের সর্বসাধারণ তাহাদের জয়জয়কার করিয়াছিল; মনে হইয়াছিল তাহাদের যশ অনন্তকাল থাকিয়া যাইবে। আসল কথা চিরকাল গীতিকাব্যের অনির্বচনীয়তা ফুটিয়া উঠে ভাষার ব্যঞ্জনার দ্বারা। ভাষা কালে কালে বদল হয় ও সেই সঙ্গে রসের ও সৌন্দর্যের মানেরও বদল হয়। এককালের রস অন্যকালের মানুষ পাইবে না।[২] কিন্তু এই সাহিত্যের কতকগুলি বিষয় 'সুবর্ণের লিপি'তে লিখিত হয়; সাহিত্যিক যেখানে চরিত্র সৃষ্টি করেন, সেখানে তাহার বিনাশ নাই যদি সে একবার মানুষের অন্তরে প্রবেশ করে। রামায়ণ, মহাভারত, কালিদাস, সেকসপীয়র প্রভৃতিতে যেসব চরিত্র জীবন্ত হইয়া দেখা দিয়াছে, তাহারা মানবহৃদয়ে স্থান পাইয়াছে; ভাষার পরিবর্তন হইয়াছে, রসের পরিবর্তন হইয়াছে, কিন্তু সাহিত্যের অপরূপ চরিত্রগুলি অমরত্ব লাভ করিয়া আজও লোকসমাজে জীবিত। রবীন্দ্রসাহিত্যেও দেখা যায় যে কবিও তাঁহার রচনায় বহুশত চরিত্র সৃষ্টি করিয়াছেন,—তাহাদের মধ্যে কয়েকটি ইতিমধ্যেই বাঙালি শিক্ষিতসমাজের কথোপকথনের মধ্যে জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে। সেই আদিম প্রেরণা কথা কও, গল্প বলো হইতে এখনো লিখিতেছেন 'গল্পসল্প'—কবিজীবনের শেষ রূপসৃষ্টি।

এই আলোচনায় কবি-যে বলিলেন এককালের সাহিত্যের রস অন্যকালের মানুষ পায় না, সেই কথাটি সেদিনকার কবিতার মধ্যেও প্রকাশ পাইয়াছে। কিন্তু 'কিছু বা যায় না বোঝা'—

আপনার পরিচয় গাঁথা হয়ে চলে, নিজেরে চিনিতে পারে
দিনশেষে পরিস্ফুট হয়ে ওঠে ছবি, রূপকার নিজের স্বাক্ষরে,

১ দ্র সাহিত্যের মূল্য, প্রবাসী ১৩৪৮ জ্যৈষ্ঠ পৃ ২০১-০২ উদয়নে কথিত ১৯৪১ এপ্রিল ২৫; দ্র আলাপচারী রবীন্দ্রনাথ, পৃ ৯৫-৯৭।

২ অতি আধুনিক একজন সাহিত্যিক এ বিষয়ে যে কী বলিয়াছেন, তাহা এখানে উদ্ধৃত করিতেছি: "Art is man's noblest attempt to preserve Imagination from Time, to make unbreakable toys of the mind, mudpies which endure; and yet even the masterpieces whose permanence grants them a mystical authority over us are doomed to decay; a word slithers into oblivion, then a phrase, then an idea ...each generation discovers anew the value of masterpieces, generations are never quite the same and ours are in fact coming to prefer the response induced by violent stimuli-film, radio, press—to the slow permeation of the personality by great literature."—Cyril Connolly, the condemned playground, the Mac. 1946

তারপরে মুছে ফেলে বর্ণ তার লেখা তার
উদাসীন চিত্রকর কালো কালি দিয়ে ;
কিছুবা যায় না মোছা সুবর্ণের লিপি,
ধ্রুবতারকার পাশে জাগে তার জ্যোতিষ্কের লীলা।[১]

কয়েকদিন পরে লিখিত 'ধূলি' (৩ মে, শেষলেখা ৯ সংখ্যক) কবিতায় বলিতেছেন :

বাণীর মুরতি গড়ি একমনে
নির্জন প্রাঙ্গণে পিণ্ড পিণ্ড মাটি তার
যায় ছড়াছড়ি— অসমাপ্ত মূক
শূন্যে চেয়ে থাকে নিরুৎসুক।
গর্বিত মূর্তির পদানত মাথা করে থাকে নিচু,
কেন আছে উত্তর না দিতে পারে কিছু।
বহুগুণে শোচনীয় হায় তার চেয়ে
এককালে যাহা রূপ পেয়ে
কালে কালে অর্থহীনতায়
ক্রমশ মিলায়।[২]

কয়েকমাস পূর্বে রোগশয্যায় শায়িত অবস্থায় জোড়াসাঁকো বাসকালে এই ভাবটি অন্যভাবে মনের মধ্যে উদিত হয় ; কবির বিশ্বাস যে ভবিষ্যতে তাঁহার কাব্যের 'গুঞ্জন' চিরদিন রবে কিন্তু লোকে 'ভুলে যাবে তার মানে।'···

শুধু এইটুকু আভাসে বুঝিবে···
বিস্মৃত যুগে দুর্লভ ক্ষণে
বেঁচেছিল কেউ বুঝি,
আমরা যাহার খোঁজ পাই নাই
তাই সে পেয়েছে খুঁজি। (রোগশয্যায় ১০)

এই দিনে রচিত অন্য কবিতাটির মধ্যেও বলিতেছেন—

ভিত্তি যার ধ্রুব বলে হয়েছিল মনে
তলে তার ভূমিকম্প টলে ওঠে প্রলয় নর্তনে।

এই কথাটির অন্তরালে আছে আরও গভীর তত্ত্ব, বিশ্বজগতে যে ধ্বংসলীলা চলিতেছে এ যেন তাহারই ব্যাখ্যা।

জগতের মাঝখানে যুগে যুগে হইতেছে জমা সুতীব্র অক্ষমা।
অগোচরে কোনোখানে একটি রেখার হলে ভুল
দীর্ঘ কালে অকস্মাৎ আপনারে করে সে নির্মূল।

যুগে যুগে কত প্রাণী অপর্যাপ্ত শক্তির সম্বল লইয়া ধরায় আবির্ভূত হইয়াছিল, কত জাতির অভ্যুদয় হয় এই শক্তির উপর নির্ভর করিয়া কিন্তু

সে শক্তিই ভ্রম তার,
ক্রমেই অসহ্য হয়ে লুপ্ত করে দেয় মহাভার।

কবির মতে 'দারুণ ভাঙন এসে পূর্বেরই আদেশে'। কবির বিশ্বাস যে একদা সৃষ্টির শেষে বহিয়া 'নূতন প্রাণ উঠিবে অঙ্কুর।' তাই বলিতেছেন এই নিদারুণ অক্ষমার উদ্দেশে (রোগশয্যায় ১১)—

হে অক্ষমা,
সৃষ্টির বিধানে তুমি শক্তি যে পরমা ;
শান্তির পথের কাঁটা তব পদপাতে
বিদলিত হয়ে যায় বারবার আঘাতে আঘাতে।

কবির জন্মদিন আসিতেছে—মর্ত্যজীবনের শেষ জন্মদিনের জন্য লিখিলেন (২৩ বৈশাখ ১৩৪৮) 'হে নূতন, দেখা দিক আর-বার জন্মের প্রথম শুভক্ষণ' এই গানটি। আসলে 'পূরবী'-কাব্যের পঁচিশে বৈশাখ নামে কবিতাটির

১ শেষলেখা (৭), উদয়ন ১৯৪১ এপ্রিল ২৫ ; ব-র ২৬ পৃ ৪৪।

২ সাহিত্যের মূল্য লইয়া যেদিন আলোচনা করেন, সেদিন ২৫ এপ্রিল—নন্দিতার বিবাহদিনের পঞ্চবার্ষিকী ; কবি একটি কবিতায় তাঁহার ভাবনা লিপিবদ্ধ করেন (শেষলেখা ৮)।

কতকগুলি ছত্র লইয়া ও একটু-আধটু পরিবর্তন করিয়া গানটি রচিত হয় ও স্বয়ং সুরযোজনাও করেন। কবির জন্মদিন সম্বন্ধে তাঁহার প্রথম রচিত গান লিখিত হয় ১৩০৬ সালে : 'ভয় হতে তব অভয় মাঝারে নূতন জনম দাও হে' (কল্পনা)।[১]

কবির জন্মদিন ২৫ বৈশাখ (১৩৪৮) শেষবারের ন্যায় অনাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হইল। কয়েকদিন পূর্বে নূতন বৎসরের পত্রিকাদিতে রবীন্দ্রজয়ন্তী সম্বন্ধে আলোচনার কথা শুনিয়া যাহা বলিয়াছিলেন, তাহার সঙ্গে এইটি তুলনীয়। তিনি বলেন, "সাহিত্যজীবনে খ্যাতি বড়ো ক্ষণস্থায়ী··· দুদিনেই সব উবে যায়। সংসারে বড়ো জিনিস হচ্ছে প্রীতি, খ্যাতি নয়। নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করি যখন তোমাদের কাছ থেকে প্রীতি, ভালোবাসা পাই।···আমি এই ভালোবাসাই পেয়েছি জীবনে অনেক কী দেশে কী বিদেশে। পেয়েছি নিজের লোকের কাছ থেকে, তার ঢের বেশি পেয়েছি অনাত্মীয়ের কাছ থেকে।[২] এই জন্মদিন উপলক্ষ্যেও একটি কবিতা লেখেন। অন্নদাশঙ্কর রায়কে বাঁকুড়ায় সেটি লিখিয়া পাঠান—[৩]

আমার এ জন্মদিন-মাঝে আমি হারা
আমি চাহি বন্ধুজন যারা
তাহাদের হাতের পরশে
মর্ত্যের অন্তিম প্রীতিরসে
নিয়ে যাব জীবনের চরম প্রসাদ,
নিয়ে যাব মানুষের শেষ আশীর্বাদ।
শূন্য ঝুলি আজিকে আমার ;
দিয়েছি উজাড় করি
যাহা কিছু আছিল দিবার,
প্রতিদানে যদি কিছু পাই—
কিছু স্নেহ, কিছু ক্ষমা—
তবে তাহা সঙ্গে নিয়ে যাই
পারের খেয়ায় যাব যবে
ভাষাহীন শেষের উৎসবে।[৪]

সেইদিন সন্ধ্যায় আশ্রমবালিকারা 'বশীকরণ' প্রহসনটি অভিনয় করিয়াছিল ; কবি অভিনয়ের শেষ পর্যন্ত বসিয়াছিলেন, ইহাই তাঁহার শেষ অভিনয় দর্শন।

কয়েকদিন পরে (১৩ মে) ত্রিপুরা-দরবার হইতে রাজপ্রতিনিধিরা আসিলেন রবীন্দ্রনাথকে 'ভারত ভাস্কর'[৫] উপাধি অর্পণ করিবার জন্য। কবি প্রতিনিধিদের বলেন যে তাঁহার জীবনের প্রত্যূষে তিনি ত্রিপুরা-দরবার হইতে যে সম্ভাষণ পান, তাহা তাঁহার কাব্যজীবনের প্রথম পাথেয় ; আজ জীবনসন্ধ্যায় সেই ত্রিপুরা হইতে তাঁহার বিদায়কালে শেষ অর্ঘ্য আসিল। কবির ভাষণ পাঠ করেন রথীন্দ্রনাথ।[৬]

১ দ্র কবিকথা, পৃ ১৬৪-৬৬। ২ আলাপচারী রবীন্দ্রনাথ, পৃ ৯০-৯১। ৩ শেষলেখা ১০ সংখ্যক, ৬ মে ১৯৪১।

৪ প্রবাসী ১৩৪৮ শ্রাবণ পৃ ৪০৫।

৫ ইন্দিরাদেবীকে যে পত্র দেন তাহাই কবির তাঁহাকে লিখিত শেষ পত্র। "আমার চিরদিনের কলম পরের ঘাড়েই চাপাতে হচ্ছে কিন্তু বকলমে তোকে লিখতে ভাল লাগল না—খোঁড়া কলমকে চাবুক লাগিয়ে কোনো মতে ক লাইন লিখিয়েছি—এখন সে ফিরে চলল পিঁজরাপোলে।" (১৩ মে ১৯৪১)—চিঠিপত্র ৫ম পৃ ২৬ পত্র ৮৪।

৬ [প্রবাসী ১৩৪৮ জ্যৈষ্ঠ পৃ ৩৫৪] গত ৮ মে কবির জন্মদিনে আগরতলায় রবীন্দ্রজয়ন্তী উপলক্ষ্যে মহারাজা বাহাদুরের রোবকারি বা ঘোষণাবাণীতে এই সংকল্পের কথা প্রচারিত হইয়াছিল : "যেহেতু বাঙ্গালার তথা সমগ্র ভারতবর্ষের গৌরব বিশ্ববরেণ্য জনপ্রিয় কবি শ্রীযুত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহোদয়ের অশীতিতম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে জয়ন্তী-উৎসব হওয়া এ পক্ষের অভিপ্রেত।

যেহেতু মর্ত্যদেহে অমৃতের অনুসন্ধানই মনুষ্যত্বের চরম বিকাশ—'মর্তোঽমৃতো ভবতি এতাবদনুশাসনম্' ঋষিরা কাব্যের ভিতর দিয়া ভগবদ্‌সত্তাকে উপলব্ধি করিবার সুযোগ জগৎকে দিয়াছেন, রবীন্দ্রনাথের বাল্য রচনায় অঙ্কুরোদ্গত সেই অমর জ্যোতির প্রকাশ এ রাজ্যের তদানীন্তন অধীশ্বর, এ পক্ষের প্রপিতামহ গুণী রসিক মহারাজ বীরচন্দ্রমাণিক্য বাহাদুরকে আকর্ষণ করায়—তিনিই তরুণ রবিকে রাজ-অভিনন্দনে অভিনন্দিত করিয়াছিলেন—

যেহেতু এ পক্ষের পিতামহ ত্রিপুরা রাজ্যে নব-যুগ-আলোকবাহী মহারাজ রাধাকিশোর মহামাণিক্য বাহাদুরের সহিত অকৃত্রিম সৌহৃদ্যবন্ধনে আবদ্ধ থাকিয়া কবিবর নিরবচ্ছিন্নভাবে সাহিত্য, কাব্যে ও চিন্তাধারায় এ রাজ্যের কল্যাণ কামনা করিয়া আসিতেছেন—

যেহেতু কবিবরের সপ্ততিতম জয়ন্তী-উৎসবে কলিকাতা নগরীতে হোতৃ কার্যে বৃত হইবার গৌরব লাভ এ পক্ষে হইয়াছিল, তদ্ধেতু অশীতিতম জন্মবার্ষিকী দিবসে ভারতীয় কৃষ্টি ও সাধনার আলোকস্তম্ভস্বরূপ কবিবরকে তদীয় পরিণত প্রতিভা-যুগে সসম্ভ্রমে অভিনন্দিত করা ত্রিপুরা-রাজ্যের কর্তব্য—"জ্যোৎস্না ভরাহত মহচ্চন্দ্রাকারম্"—অতএব এইউৎসব জয়ন্তীকে চিরস্মরণীয় করিবার নিমিত্ত কবি শ্রীযুত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহোদয়কে 'ভারতভাস্কর' আখ্যায় ভূষিত করা যায়,—এবং শ্রীভগবান্ তদীয় আশীর্বাদে কবিবরকে সুস্থদেহে শতবর্ষ ভোগ করিবার সুযোগ দান করুন।"

এই গ্রীষ্মাবকাশে শান্তিনিকেতনে আসেন অধ্যাপক বুদ্ধদেব বসু সপরিবারে ও সাহিত্যিক জ্যোতির্ময় রায়। শান্তিনিকেতন-বাসের এই কাহিনী বুদ্ধদেববাবু 'সব-পেয়েছির দেশে'[১] নামক গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। কবি অসুস্থ, বুদ্ধদেবের ধারণা ছিল কবি "হয়তো দু'একটির বেশি কথা বলবেন না, হয়তো আগেকার মতো নিঃসংশয় নিঃসংকোচে তাঁর পাশে গিয়ে বসা চলবে না। দেখে ভুল ভাঙলো।...মুখ তাঁর শীর্ণ। আগুনের মতো গায়ের রং ফিকে হয়েছে, কিন্তু হাতের মুঠি কি কব্জির দিকে তাকালে বিরাট বলিষ্ঠ দেহের আভাস এখনো পাওয়া যায়। কেশরের মতো যে-কেশগুচ্ছ তাঁর ঘাড় বেয়ে নামতো তা ছেঁটে ফেলা হয়েছে, কিন্তু মাথার মাঝখান দিয়ে দ্বিধা-বিভক্ত কুঞ্চিত শুভ্র দীর্ঘ কেশের সৌন্দর্য এখনো অম্লান।...এই অপরূপ রূপবান পুরুষের দিকে এখন স্তব্ধ হ'য়ে তাকিয়ে থাকতে হয়, যেমন ক'রে আমরা শিল্পীর গড়া কোনো মূর্তি দেখি। এত সুন্দর বুঝি রবীন্দ্রনাথও আগে কখনো ছিলেন না, এর জন্যে এই বয়সের ভার আর রোগদুঃখভোগের দরকার ছিলো।...

"কে বলবে তাঁকে দেখে যে তাঁর অসুখ!...কণ্ঠস্বর ঈষৎ ক্ষীণ, মাঝে মাঝে একটু থামেন, কিন্তু কথার জন্য কক্ষনো হাৎড়াতে হয় না, ঠিক জায়গায় ঠিক কথাটি আপনিই মুখে এসে বসে।...সেদিন এক ঘণ্টার উপরে প্রায় অনর্গল কথা বললেন, সাহিত্য সংগীত চিত্রকলা জীবনদর্শন হাস্যপরিহাস মেশানো এক আশ্চর্য অবিশ্রান্ত ঝরনায় নেয়ে উঠলুম। এঁর অসুখ! ভাবা যায় না। এই প্রদীপ্ত মনীষা, জীবনের ছোটো বড়ো সমস্ত ব্যাপারে এই জ্বলন্ত উৎসাহ, ভাষার উপর এই রাজকীয় কর্তৃত্ব—এর সঙ্গে কোনো রকম রোগ কি বৈকল্যকে সংশ্লিষ্ট করতে আমাদের মন একেবারেই বিমুখ হয়। অথচ সত্যি তিনি অসুস্থ, অত্যন্ত অসুস্থ। তাঁর রোগে যন্ত্রণা যেমন, ছোটোখাটো বিরক্তিকর আনুষঙ্গিকও কম নয়।... কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিস্বরূপের এতটুকু বিকৃতি কোথাও হয়নি। তাঁর মুখে সব কথাই আছে, রোগের কথা একটিও নেই।...এতটুকু শৈথিল্য নেই আচরণে কি চিন্তায় কি ব্যবহারে।" বুদ্ধদেব শান্তিনিকেতনে তেরো দিন ছিলেন; ইহার মধ্যে কবির সঙ্গে মাঝে মাঝে দেখা করিতে যাইতেন। কবির কথা ও আলোচনা সম্বন্ধে তিনি বলেন সে "যেন বর্ণাঢ্য গীতিনিঃস্বন, যেন গীতধ্বনিত ইন্দ্রধনু।"

বুদ্ধদেব কলিকাতা ফিরিয়া যাইবার কয়েক দিনে পরে কবি লিখিতেছেন (২১ জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৮), "এবারে আশ্রম থেকে তুমি অনেক ঝুড়ি বকুনি সংগ্রহ ক'রে নিয়ে গিয়েছ। আশা করি তার বারো আনাই আবর্জনা নয়। বাজে বকুনির বাহুল্য প্রমাণ করে খুশির প্রাচুর্যকে, সেটা নিন্দনীয় নয়।"[২]

রবীন্দ্রনাথের সহিত বুদ্ধদেবের বিচিত্র বিষয়ের আলোচনা হয় তবে প্রধানত যাহা তিনি লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন তাহা সাহিত্য ও চিত্রসম্বন্ধে কবির অভিমত। সাহিত্যের মূল্য সম্বন্ধে কবি যে সব কথা বলেন তা লিপিবদ্ধ করিয়া (২৫ মে ১৯৪১) বুদ্ধদেব 'কবিতা'য় প্রকাশ করেন (১৩৪৮ আষাঢ় পৃ ১১২-১৪)। সেগুলি 'সাহিত্যে ঐতিহাসিকতা' ও 'সাহিত্যের উৎস' বিষয়ক দুইটি আলোচনা। এইগুলি পরে কবি স্বয়ং দেখিয়া (বা শুনিয়া) কিছু কিছু রদ বদল করিয়া প্রবাসীতে প্রেরণ করেন।[৩] এই সব আলোচনার মধ্যে কবি একদিন বলেন যে তাঁহার সৃষ্টিকার্যের তিনটি পর্যায়—সাহিত্য, গান ও ছবি। "এদের ভিতর দিয়ে আমি প্রকাশ করেছি আমাকে আমার আনন্দকে।"

শান্তিনিকেতনে বিদ্যালয়াদি গ্রীষ্মের জন্য বন্ধ হইয়াছে; এবার এতদ্অঞ্চলে ভীষণ অনাবৃষ্টি—অসহ্য গরম; কবি

১ দ্র The Land of Heart's desire. V. B. News IX 1941 Jun p 95-96.

২ সব-পেয়েছির দেশ, পৃ ১০৫।

৩ [সাহিত্য, গান, ছবি, প্রবাসী ১৩৪৮ আষাঢ় পৃ ৩৬২-৬৫। সাহিত্য, শিল্প ১৩৪৮ আষাঢ় পৃ ৩১৫-৩৬। সাহিত্যে, চিত্রবিভাগ, ১৩৪৮ জ্যৈষ্ঠ পৃ ২৩৪ক খ।

সারাদিন air-conditioned ঘরে থাকেন। সন্ধ্যার পর বারান্দায় আনিয়া কবিকে বসানো হয়; মাঝে মাঝে নূতন নূতন গল্পের প্লট বলেন, তাহারই একটি 'বদনাম' নামে প্রকাশিত হয় (প্রবাসী ১৩৭৮ আষাঢ়)।

কবির শরীর ক্রমশই মন্দের দিকে যাইতেছে; কিন্তু চিঠিপত্র আসিলে বা ভালো বই পাইলে তাহার ঠিকমতো জবাব এখনো পাঠান। বিশু মুখোপাধ্যায় কবিকে ছবি সম্বন্ধে কোনো প্রশ্ন করিয়া পাঠান এবং তারও পূর্বে যামিনী রায়কে ছবি আঁকার প্রেরণা সম্বন্ধে এক পত্র লিখিয়াছিলেন। বিশু মুখোপাধ্যায়কে 'ছবির স্বৈরাচার' সম্বন্ধে (২৩ জুন ১৯৪১) লেখেন, "আমি পঞ্চাশ বছর ধরে ভাষার সাধনা করছি। সুতরাং তার সমস্ত কৌশল তার গতিবিধির নিয়ম সে এক রকম জেনে নিয়েছি। কিন্তু এই ছবি যা অকস্মাৎ আমার স্কন্ধে আবির্ভূত হয়েছে, তার সঙ্গে আমার সম্পূর্ণ চেনাশোনা হয়নি। তার স্বৈরাচার আমাকে পেয়ে বসেছে। কিন্তু স্বৈরাচারের অন্তর্নিহিত যে নিয়ম তাকে ভিতরে ভিতরে চালনা করে, সে আমার কাছে অত্যন্ত গোপনে আছে।...এই চিত্রকলা আমাকে এড়িয়ে চলে। এর গতিবিধি আমার অগোচর...।...সাহিত্যের বাহন হচ্ছে ভাষা, ভাষা আপন অর্থ আপনি নিয়ে চলে। সেই অর্থের কৈফিয়ত দিতে হয়। কিন্তু বর্ণবিন্যাস ও রেখাবিন্যাস, সে নিস্তব্ধ, তার মুখে বাণী নেই, তাকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলে সে অঙ্গুলি নির্দেশ করে দেয় যে, ঐ দেখো। আর কোনো কথা জিজ্ঞাসা কোরো না।" যামিনীকান্ত রায়কে লেখেন, "যখন ছবি আঁকতুম না, তখন বিশ্বদৃশ্যে গানের সুর লাগত কানে, ভাবের রস আসত মনে। কিন্তু যখন ছবি আঁকায় মনকে টানল, তখন দৃষ্টির মহাযাত্রার মধ্যে মন স্থান পেলো। গাছপালা, জীবজন্তু, সকলই আপন আপন রূপ নিয়ে চারি দিকে প্রত্যক্ষ হয়ে উঠতে লাগল। তখন রেখায় রঙে সৃষ্টি করতে লাগল যা প্রকাশ হয়ে উঠেছে। এ ছাড়া অন্য কোনো ব্যাখ্যা দরকার নেই।"[১]

এমন সময়ে হাতে আসিল অবনীন্দ্রনাথের 'ঘরোয়া'র পাণ্ডুলিপি; শ্রীমতী রানী চন্দের লেখনী অবনীন্দ্রনাথের মুখের কথাগুলিকে সুন্দরভাবে রূপ দান করিয়াছে। কবি অবনীন্দ্রনাথকে লিখিলেন (২৭ জুন), "কী চমৎকার— তোমার বিবরণ শুনতে শুনতে আমার মনের মধ্যে মরা গাঙে বান ডেকে উঠলো"। বই সম্বন্ধে বললেন—"এ তো ঐতিহাসিক পাণ্ডিত্য নয় এ যে সৃষ্টি—সাহিত্যে এ পরম দুর্লভ। প্রাণের মধ্যে প্রাণ রক্ষিত হয়েছে—এমন সুযোগ দৈবাৎ ঘটে।" দুই দিন পরেও অবনীন্দ্রনাথকে 'ঘরোয়া' সম্বন্ধে আরও একখানি পত্র লেখেন[২] ও ১৩ জুলাই গ্রন্থখানির জন্য একটি ভূমিকা লিখিয়া দেন। সেখানে কবি বলেন যে, অবনীন্দ্রনাথ "দেশকে উদ্ধার করেছেন আত্মনিন্দা থেকে। আত্মগ্লানি থেকে তাকে নিষ্কৃতি দান করে তার সম্মানের পদবী উদ্ধার করেছেন।"

আমাদের এই আলোচ্য পর্বে রবীন্দ্রনাথের জীবনসন্ধ্যায় তাঁহাকে শেষ বারের মতো ভারতের প্রতি এক বিদেশীর অপমানকর উক্তির প্রতিবাদ করিতে দেখি। এই সময়ে মিস্ রাথবোন[৩] ভারতের নিন্দা করিয়া এক তীব্র খোলা চিঠি লিখিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথ এই রোগজীর্ণ দেহে তাহার এক উত্তর 'খোলা চিঠি' রূপেই প্রকাশ করিলেন। মিস্ রাথবোন ব্রিটিশ বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ হইতে পার্লামেন্টের সদস্য—ব্রিটেনের শিক্ষিত সমাজে ও রাজনৈতিকদের মহলে সুপরিচিত। সুতরাং তাঁহার মতামত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে ও ইংরেজি ভাষাভাষী দেশের অধিবাসীদের নিকট উপেক্ষণীয় ছিল না। ভারতের দুর্দিন। কন্‌গ্রেস-মন্ত্রীত্ব রদ হইয়া যাইবার পর নেতাদের অনেকেই

১ ছবি, শিল্পী যামিনী রায়কে লেখা রবীন্দ্রনাথের পত্র, (৭ জুন ১৯৪১) প্রবাসী ১৩৪৮ শ্রাবণ পৃ ৪০৬।

২ অবনীন্দ্রনাথের 'ঘরোয়া', প্রবাসী ১৩৪৮ কার্তিক পৃ ২।

৩ Miss E. Rathbone M. A., M. P. (1872-1951) President National Union of Societies of equal citizenship since 1919. Vice-chairman, Family endowment society. Independent member of Parliament for combined English Universities since 1929.

অন্তরীণে অথবা কারাগারে আবদ্ধ। দেশবিদেশে ভারতের বিরুদ্ধে কুৎসা রটনা হইয়াছে ইংরেজ রাজনীতিকদের নিয়োজিত বিশিষ্ট লোকেদের প্রধান কার্য। মিস্ রাথবোনের পত্রের মর্ম এই যে, ভারতীয়রা ইংরেজদের দ্বারা পাশ্চাত্য শিক্ষা পাইয়া সর্বতোভাবে উন্নত, কিন্তু আজ ইংলণ্ডের যুদ্ধে তাহারা সহায়তা করিতে পরাঙ্মুখ—ইহা অকৃতজ্ঞতা। তিনি ভারতীয়দের উদ্দেশ্যে বলেন, "আপনাদের সাহায্য ব্যতিরেকেও আমরা যুদ্ধে জিতিব—যাঁহাদের চিন্তাধারা আপনাদের হইতে পৃথক তাঁহাদের সাহায্য আমরা পাইতেছি।" তবে তিনি পত্রমধ্যে একথাও কবুল করেন যে তাঁহার অভিযোগটা হয়তো একদেশদর্শী হইয়াছে, অর্থাৎ তিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহার উল্টা দিকেও অনেক কথা বলিবার আছে। তৎসত্ত্বেও তিনি দীর্ঘ পত্রে ভারতীয়দের আক্রমণ করিলেন।

মিস্ রাথবোনের চিঠির উপর রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য এসোসিয়েটেড্ প্রেসের মারফত ভারতের ইংরেজি সকল দৈনিকে মুদ্রিত হইল (১৯৪১ জুন ৫)। অসুস্থ অবস্থায় রবীন্দ্রনাথ বহুকাল নিজ হস্তে কিছু লিখিতে পারিতেন না। এক্ষেত্রেও কৃষ্ণ কৃপালনী কবির নির্দেশে মন্তব্যটি লিখিয়া দিলেন। কবি বলিলেন, "ভারতীয়দিগকে লিখিত মিস্ রাথবোনের খোলা চিঠি পড়িয়া আমি গভীর বেদনা অনুভব করিয়াছি।···তাঁহার এই পত্র প্রধানত জবহরলালের উদ্দেশেই লিখিত এবং একথা আমি নিঃসন্দেহে বলিতে পারি, মিস্ রাথবোনের দেশবাসিগণ আজ যদি ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের এই মহানুভব যোদ্ধার কণ্ঠ কারাপ্রাচীরের অন্তরালে রুদ্ধ না রাখিত, তাহা হইলে তিনি মিসের এই অযাচিত উপদেশের যথাযোগ্য ও সতেজ উত্তর দিতেন। বলপ্রয়োগজনিত তাঁহার মৌন আমাকেই, রোগশয্যা হইতেও, এই প্রতিবাদ জানাইতে বাধ্য করিয়াছে।

"মহিলাটি আমাদের বিবেকের প্রতি অবিবেচনা এবং বস্তুতঃ ধৃষ্টতার সহিত যে স্পর্ধিত অনাস্থা ও অশ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়াছেন তাহার দ্বারা তাঁহার স্বদেশবাসীদের অভীষ্টসিদ্ধির কোনও সাহায্য হয় নাই। 'ব্রিটিশ চিন্তাধারার উৎস হইতে আকণ্ঠ বারি পান করিয়াও' গরীব স্বদেশবাসীর প্রকৃত স্বার্থের জন্য কিছু চিন্তা আমরা এখনও করি, আমাদের এই অকৃতজ্ঞতায় মিস্ রাথবোন লজ্জায় স্তম্ভিত হইয়াছেন। ব্রিটিশ চিন্তাধারার যতটুকু পাশ্চাত্য সভ্যতার মহত্তম ঐতিহ্যের প্রতীক, ততটুকু হইতে আমরা বাস্তবিক বহু শিক্ষা লাভ করিয়াছি। কিন্তু একথাও না বলিয়া থাকিতে পারি না যে, আমাদের মধ্যে যাঁহারা এই শিক্ষা হইতে লাভবান হইয়াছেন আমাদের অশিক্ষিত করিবার সর্বপ্রকার সরকারী প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করিয়াই তাঁহাদিগকে এই লাভটুকু সঞ্চয় করিতে হইয়াছে। অন্য যে কোনো য়ুরোপীয় ভাষার সাহায্যে আমরা পাশ্চাত্য বিদ্যার সহিত পরিচিত হইতে পারিতাম। জগতের অন্যান্য জাতি কি সভ্যতার আলোকের জন্য ইংরেজদের পথ চাহিয়া বসিয়াছিল? আমাদের সে সকল তথাকথিত ইংরেজ-বন্ধু মনে করেন যে, তাঁহারা যদি আমাদের 'শিক্ষাদান' না করিতেন তবে আমরা অজ্ঞানান্ধকারের যুগেই থাকিয়া যাইতাম, তাঁহাদের এই মনোভাব দাম্ভিক আত্মতৃপ্তি ছাড়া আর কিছুই নহে। ভারতে ব্রিটেনের সরকারী শিক্ষার প্রণালী বাহিয়া যাহা আমাদের সন্তানগণের নিকট পৌঁছিয়াছে, তাহা ব্রিটিশ ভাবধারার শ্রেষ্ঠ সম্পদ নহে, উহার উচ্ছিষ্ট অসার অংশ। ফলে ভারতীয়রা তাহাদের নিজেদের দেশের স্বাস্থ্যকর সংস্কৃতি-সম্ভোগ হইতে বঞ্চিত হইয়াছে। কিন্তু যদি ধরিয়া লওয়া যায় যে, ইংরেজি ভাষা ছাড়া আমাদের জ্ঞানালোক পাইবার অন্য পথ নাই, তবে সেই 'ইংলণ্ডীয় চিন্তাধারার উৎস হইতে আকণ্ঠ পান করিবার ফলে' দুই শতাব্দীব্যাপী ব্রিটিশ শাসনের পর ১৯৩১ সালে আমরা দেখিতে পাই ভারতের সমগ্র জনসংখ্যার শতকরা মাত্র একজন ইংরেজি ভাষায় লিখনপঠনক্ষম (literate) হইয়াছে। অন্য দিকে, রাশিয়ার মাত্র পনেরো বৎসরের সোভিএট শাসনের ফলে ১৯৩২ সালে সোভিএট য়ুনিয়নে শতকরা ৯৮টি বালকবালিকা শিক্ষালাভ করিয়াছে। (এই সংখ্যাগুলি ইংরেজ-প্রকাশিত 'স্টেটস্‌ম্যান্স ইয়ার বুক' হইতে উদ্ধৃত। ঐ বহির রাশিয়ার অনুকূলে পক্ষপাতভ্রান্ত হইবার সম্ভাবনা নাই)।

"কিন্তু এই তথাকথিত সংস্কৃতির চেয়ে আজ জীবনধারণের সম্বল চাই আগে। জীবনোপায়ের ভিত্তির উপরই জ্ঞানালোক দানের নিমিত্ত শিক্ষায়তন নির্মিত হইতে পারে।

"আমাদের দেশের টাকার থলি দুই শতাব্দী কাল দৃঢ় মুষ্টিতে শক্ত করিয়া ধরিয়া রাখিয়া যে ব্রিটিশ জাতি আমাদের ধনদৌলত শোষণ করিয়াছে তাহারা আমাদের দেশের দরিদ্র জনসাধারণের জন্য কী করিয়াছে? চতুর্দিকে চাহিয়া দেখুন, অনশনশীর্ণ লোকেরা অন্নের জন্য ক্রন্দন করিতেছে। আমি পল্লী নারীদিগকে কয়েক ফোঁটা জলের জন্য কাদা খুঁড়িতে দেখিয়াছি, কেননা ভারতের গ্রামে পাঠশালা হইতেও কূপ বিরল। আমি জানি যে ইংলণ্ডের লোক আজ দুর্ভিক্ষের দ্বারে উপস্থিত। আমি তাহাদের জন্য ব্যথিত। কিন্তু যখন দেখি যে, খাদ্য সম্ভারপূর্ণ জাহাজগুলিকে পাহারা দিয়া ইংলণ্ডের উপকূলে পৌঁছিয়া দিবার জন্য ব্রিটিশ নৌবহরের সমগ্র শক্তি নিয়োগ করা হইতেছে, এবং যখন এমন অবস্থাও মনে পড়ে যে, এদেশের একটা জেলার লোক অনাহারে মরিতেছে অথচ পাশের জেলা হইতে এক গাড়ি খাদ্যও তাহাদের দ্বারে পৌঁছিতে দেখি না, তখন আমি বিলাতের ইংরেজ এবং ভারতের ইংরেজের মধ্যে একটা পার্থক্য না দেখিয়া থাকিতে পারি না।

"ব্রিটিশ রাজ আমাদিগকে খাওয়াইতে পারেন নাই বটে, কিন্তু আমাদের দেশে 'আইন ও শৃঙ্খলা' রক্ষা করিয়াছেন, এই জন্যই কি আমরা ইংরেজের নিকট কৃতজ্ঞ থাকিব। চতুর্দিকে চাহিয়া দেখুন, দেশের সর্বত্র দাঙ্গার উদ্দাম প্রাদুর্ভাব চলিতেছে। যখন কুড়িতে কুড়িতে লোক নিহত হইতেছে, আমাদের সম্পত্তি লুণ্ঠিত হইতেছে, নারীদের সম্ভ্রম নষ্ট হইতেছে, কিন্তু শক্তিমান ইংরেজের অস্ত্র তাহার প্রতিকারের নিমিত্ত নড়িতেছেও না, তখন কিন্তু পরপার হইতে ইংরেজরা চীৎকার করিয়া আমাদিগকে ভৎর্সনা করিয়া বলিতেছেন, তোমরা তোমাদের ঘর সামলাইতে পার না।

"ইতিহাসে এরূপ উদাহরণের অভাব নাই যে, সশস্ত্র যোদ্ধারাও প্রবলতর শক্তির সম্মুখীন হইতে পরাঙ্মুখ হইয়াছে। বর্তমান যুদ্ধের এমন অবস্থা দেখা গিয়াছে যে, বীরশ্রেষ্ঠ ইংরেজ, ফরাসী এবং গ্রীক সৈনিকগণও প্রবলতর অস্ত্রশক্তির দ্বারা অভিভূত হইয়া য়ুরোপের রণক্ষেত্র ত্যাগ করিয়াছে। কিন্তু যখন আমাদের দেশের দরিদ্র নিরস্ত্র, অসহায় কৃষক, রোরুদ্যমান শিশুর ভারে ভারাক্রান্ত কৃষক সহস্র গুণ্ডার আক্রমণ হইতে ঘরবাড়ি রক্ষা করিতে না পারিয়া পলায়ন করে, তখন বোধ হয় ইংরেজ রাজপুরুষগণ আমাদের কাপুরুষতা দেখিয়া অবজ্ঞার হাসি হাসেন; ইংলণ্ডের প্রত্যেক লোক তাহার ঘরবাড়ি শত্রুর হস্ত হইতে রক্ষার জন্য অস্ত্র ধারণ করিয়াছে। কিন্তু ভারতবর্ষে ফতোয়া জারি করিয়া লাঠি চালনা শিক্ষা পর্যন্ত নিষেধ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। চিরকাল সন্ত্রস্ত এবং তাহাদের সশস্ত্র প্রভুদের কৃপার উপর নির্ভরশীল করিয়া রাখিবার জন্য আমাদের দেশের লোকদিগকে ইচ্ছা করিয়াই নিরস্ত্র ও পৌরুষহীন করিয়া রাখা হইয়াছে।

"এত কাল ইংরেজ পৃথিবীব্যাপী যে প্রভুত্ব করিয়া আসিয়াছে, আজ নাৎসীরা তাহাকে সেই প্রভুত্বের যোগ্যতার প্রমাণ দিতে স্পর্ধিত আহ্বান করিয়াছে বলিয়াই ইংরেজ নাৎসীদিগকে বিদ্বেষের চক্ষে দেখে; কিন্তু মিস্ রাথবোন আশা করেন যে, আমরা প্রণতিপূর্বক তাঁহার দেশের লোকদের হস্ত চুম্বন করিব, কেননা তাহাদের সেই হাত আমাদের পায়ে দাসত্বের শৃঙ্খল পরাইয়া দিয়াছে। কোনো একটি গবর্মেণ্ট ভালো কি মন্দ বিচার করিতে হইলে তাহার মুখপাত্রদের মুখের কথা শুনিয়া বিচার করা চলে না; সেই গবর্মেণ্ট প্রজার কি বাস্তব হিত করিয়াছে তাহা দ্বারাই বিচার করিতে হয়। ইংরেজরা যে আমাদের অনাদরণীয় হইয়া রহিয়াছে এবং আমাদের হৃদয়ে স্থান পায় নাই, তাহা ততটা এই জন্য নহে যে, তাহারা বিদেশী, যতটা এইজন্য যে, তাহারা আমাদের কল্যাণের অছি বলিয়া পরিচয় দিয়াছে, কিন্তু অছির কর্তব্য সম্বন্ধে বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া বিলাতের স্বল্পসংখ্যক ধনিকের পকেট স্ফীত করিবার জন্য ভারতবর্ষের কোটি কোটি লোকের সুখস্বাচ্ছন্দ্য বলি দিয়াছে। আমার এরূপ মনে করা অনুচিত হইত না, যে, ভদ্রগোছ ইংরেজরা ভারতীয়দের এই সকল

ক্ষতি ও অনিষ্ট মনে রাখিয়া অন্ততপক্ষে নীরব থাকিবেন এবং আমরা যে নিষ্ক্রিয় আছি তজ্জন্য কৃতজ্ঞ থাকিবেন; কিন্তু তাঁহারা যে আমাদের অনিষ্ট সাধনের উপর আবার অপমানও করিবেন এবং কাটা ঘায়ে নুনের ছিটা দিবেন, তাহা একেবারে শালীনতার সকল সীমার বাহিরে।"[১]

যাহাই লিখুন বা বলুন শরীর আর বহিতেছে না। প্রতিমাদেবী লিখিতেছেন, "আষাঢ় মাস পড়তেই বাবামশায় খোলা আকাশে বর্ষার রূপ দেখবার জন্য উতলা হয়ে উঠলেন, তখন তাঁকে উত্তরায়ণের দোতলায় নিয়ে আসা হোলো। প্রথমটা কিছুতেই আসবেন না, অনেক করে রাজি করানো গেল। এই সময় ডাক্তারদের মত নিয়ে কবিরাজী চিকিৎসা শুরু হয়েছে। [শ্যামাদাস বাচস্পতির পুত্র] কবিরাজ বিমলানন্দ তর্কতীর্থ মহাশয় এই আয়ুর্বেদিক চিকিৎসার ভার গ্রহণ করেন।" এই সময়ে কলিকাতা হইতে প্রশান্তচন্দ্রের পত্নী রানীদেবী শান্তিনিকেতনে আসেন। "তাঁকে বাবামশায় অত্যন্ত স্নেহ করতেন, তিনি এসে মাসাবধি কাছে থাকাতে অপারেশনের দিনগুলি গুরুদেবের কাছে পূর্ণ হয়ে উঠেছিল প্রীতি ও আনন্দের পরিবেশে। রানীর গল্প শুনতে তিনি ভালোবাসতেন এবং তাঁকে কাছে বসিয়ে হাস্যালাপ করে প্রফুল্ল হয়ে উঠতেন।"

কিন্তু কোনো চিকিৎসায় কোনো উপকার দেখা যাইতেছে না। কলিকাতা হইতে ডাক্তার ইন্দুভূষণ বসু, বিধানচন্দ্র রায়, ললিতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ও পরিবারের বন্ধু জ্যোতিঃপ্রকাশ সরকার আসিলেন। তাঁহারা কবিকে পরীক্ষাদি করিয়া স্থির করিলেন শ্রাবণ মাসে অপারেশন করিতে হইবে। ডাক্তার রামচন্দ্র অধিকারী, জিতেন্দ্রনাথ দত্ত এবং সত্যেন্দ্রনাথ রায় প্রভৃতি বিশেষজ্ঞরাও কয়েকবার আসিলেন। অপারেশন সম্বন্ধে সকলেই একমত।

অতঃপর ২৫ জুলাই (৯ শ্রাবণ) কবিকে কলিকাতায় লইয়া যাওয়া হইল। তৎকালীন ই. আই. রেলওয়ের অধিকর্তা এন. সি. ঘোষ কবির জন্য বিশেষ একখানি সেলুনগাড়ির ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন।

প্রায় সত্তর বৎসর শান্তিনিকেতনের সহিত রবীন্দ্রনাথের সম্বন্ধ,—বাল্য, যৌবন, প্রৌঢ় ও বার্ধক্যের সকল অবস্থার স্মৃতি এই স্থানের সঙ্গে জড়িত। জানি না আজ সেই স্থান ত্যাগের মুহূর্তে সেসব স্মৃতির ছবি মনের চক্ষে দ্রুত চলিয়া গিয়াছিল কিনা।

জোড়াসাঁকোর পৈতৃক বাড়িতে আসিলেন। এবার যেন বুঝিতে পারিতেছেন আয়ু ক্ষীণ হইয়া আসিতেছে। দুই দিন পরে (১১ শ্রাবণ) লিখিলেন:

প্রথমদিনের সূর্য প্রশ্ন করেছিল
সত্তার নূতন আবির্ভাবে—কে তুমি।
মেলেনি উত্তর।
বৎসর বৎসর চলে গেল,
দিবসের শেষ সূর্য
শেষ প্রশ্ন উচ্চারিল পশ্চিম সাগরতীরে,
নিস্তব্ধ সন্ধ্যায়—কে তুমি।
পেল না উত্তর।

কয়েকদিন পূর্বে একখানি পত্রে কবি লিখিয়াছিলেন, "আমার মনে পড়ে বেদের সেই বাণী কো বেদঃ অর্থাৎ কে জানে, যিনি সৃষ্টি করেছেন তিনিই কি জানেন। কিংবা জানেন না, এমন সন্দেহের বাণী বোধ হয় জগতে আর কোনো শাস্ত্রে প্রকাশ হয় নি যে, যার সৃষ্টি তিনি আপন সৃষ্টিকে জানেন না। সৃষ্টি তাঁকে বহন করে নিয়ে চলে। আসল কথা চরম প্রশ্নের কোনো উত্তর নেই।"[২] যে গৃহের মধ্যেই একদিন এই সত্তার আবির্ভাব হইয়াছিল, আজ সেখানেই অন্তর্ধানের অপেক্ষায় রহিয়াছে সেই সত্তা।

১ প্রবাসী ১৩৪৮ আষাঢ় পৃ ৩৯১-৯২ 'বিবিধ প্রসঙ্গ' মিস্ রাথবোনের চিঠির উপর রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য। কবি উহা ইংরেজিতে লেখেন, উপরের বাংলাটি সাময়িক পত্রের অনুবাদ, কবিকৃত নহে।

২ বিশু মুখোপাধ্যায়কে লিখিত পত্র, ২৩ জুন ১৯৪১, প্রবাসী ১৩৪৮ কার্তিক পৃ ২০। মহাপ্রয়াণের দুইমাস পূর্বে লিখিত।

কয়েকদিন অপারেশনের পরামর্শাদির পর ৩০ জুলাই ডাক্তার ললিতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় অস্ত্রোপচার করিলেন। এই ঘটনার পূর্বে তিনি প্রতিমাদেবীকে শেষ চিঠি দেন নিজ হস্তে—অতি কষ্টে 'বাবামশায়' শব্দটি লিখিয়াছিলেন। প্রতিমা দেবী অসুস্থ অবস্থায় শান্তিনিকেতনে ছিলেন। এই পত্র পাইয়া তিনি চলিয়া আসেন, তখন কবির জ্ঞান আচ্ছন্ন। অপারেশনের কিছু পূর্বে কবি তাঁহার জীবনদেবতার উদ্দেশে শেষ অর্ঘ্য নিবেদন করিলেন :

তোমার সৃষ্টির পথ রেখেছ আকীর্ণ করি
বিচিত্র ছলনাজালে,
হে ছলনাময়ী।
মিথ্যা বিশ্বাসের ফাঁদ পেতেছ নিপুণ হাতে
সরল জীবনে।
এই প্রবঞ্চনা দিয়ে মহত্ত্বেরে করেছ চিহ্নিত ;
তার তরে রাখনি গোপন রাত্রি।
তোমার জ্যোতিষ্ক তারে
যে-পথ দেখায়
সে যে তার অন্তরের পথ,
সে যে চিরস্বচ্ছ,
সহজ বিশ্বাসে সে যে
করে তারে সমুজ্জ্বল।
বাহিরে কুটিল হোক অন্তরে সে ঋজু,
এই নিয়ে তাহার গৌরব।
লোকে তারে বলে বিড়ম্বিত।
সত্যেরে সে পায়
আপন আলোকে ধৌত অন্তরে অন্তরে।
কিছুতে পারে না তারে প্রবঞ্চিতে,
শেষ পুরস্কার নিয়ে যায় সে যে
আপন ভাণ্ডারে।
অনায়াসে যে পেরেছে ছলনা সহিতে
সে পায় তোমার হাতে
শান্তির অক্ষয় অধিকার।[১]

অপারেশনের পর কয়েকদিনের মধ্যে শরীরের গতি সম্পূর্ণ বদলাইয়া গেল। অবশেষে রাখীপূর্ণিমার অবসানে ১৩৪৮ সালের ২২ শ্রাবণ (১৯৪১ অগস্ট ৭) বেলা ১২-১০ মিনিটে কবির মহাপ্রয়াণ হইল।[২]

১ জোড়াসাঁকো, ৩০ জুলাই, ১৯৪১, সকাল সাড়ে নয়টা, শেষ লেখা। দ্র র-র ২৬ পৃ ৩৪৯।

২ দ্র প্রতিমাদেবী, নির্বাণ। কুমার শ্রীজয়ন্তনাথ রায়, বিশ্বকবির মহানির্বাণ, প্রবাসী ১৩৪৮ ভাদ্র পৃ ৬৪৩ ক-এ। সেবিকা [শ্রীমতী রানী চন্দ], রবীন্দ্রনাথের জীবনের শেষ কয়দিন, প্রবাসী ১৩৪৭ আশ্বিন পৃ ৭৪১-৪৭।

কেন রে এই দুয়ারটুকু পার হতে সংশয়।
জয় অজানার জয়॥
এই দিকে তোর ভরসা যত, ওই দিকে তোর ভয়।
জয় অজানার জয়॥
জানাশোনার বাসা বেঁধে কাটল তো দিন হেসে কেঁদে,
এই কোণেতেই আনাগোনা নয় কিছুতেই নয়।
জয় অজানার জয়॥
মরণকে তুই পর করেছিস ভাই,
জীবন যে তোর তুচ্ছ হল তাই।
দুদিন দিয়ে ঘেরা ঘরে তাইতে যদি এতই ধরে
চিরদিনের আবাসখানা তাই কি শূন্যময়।
জয় অজানার জয়॥

পরিশিষ্ট

১. সংযোজন ও সংশোধন

প্রথম খণ্ড

পৃ ৮—তত্ত্ববোধিনী সভা। দ্র সংযোজন ২য় খণ্ড পৃ ২৫৮।

পৃ ৯—দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা গ্রহণ—১৭৬৫ শক; ১২৫০ সাল পৌষ ৭॥১৮৪৩ ডিসেম্বর ২১।

—"যোড়াসাঁকোস্থ কমলবাবুর, বাড়ী ভাড়া লইয়া তাহাতে প্রথম ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপিত হয়;" ১৭৫০ শক ভাদ্র ৬, বুধবার। ১৮২৮ অগস্ট ২০। ভাদ্রোৎসব এখনো ব্রাহ্মসমাজে অনুষ্ঠিত হয়।

কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ মন্দির প্রতিষ্ঠা ১৮৩০ জানুয়ারি ২৩ বা ১১ই মাঘ ১৭৫২ শক॥ ১২৪৭ বঙ্গাব্দ, শনিবার

—১৮৪৭, ১১ই মাঘ (১৭৭২ শক) অক্ষয়কুমার দত্ত সাম্বৎসরিক সভায় ঘোষণা করিলেন, "বেদ ঈশ্বরপ্রত্যাদিষ্ট নহে, বিশ্ববেদান্তই প্রকৃত বেদান্ত।" রাজনারায়ণ বসুর আত্মজীবনী। দ্র সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী সম্পাদিত মহর্ষির আত্মজীবনীর পরিশিষ্ট ৪৫, পৃ ৪২৩।

পৃ ১১—'মাতৃবন্দনা', রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, দেশ ১৩৫৪ আষাঢ় ৬। শ্রীহলধর হালদার [শ্রীপুলিনবিহারী সেন] লিখিতেছেন: "রবীন্দ্র-জননী সারদাদেবী প্রসঙ্গে 'রবীন্দ্র-জীবনী'কার লিখিয়াছেন, 'দেবেন্দ্রনাথের ন্যায় মহাপুরুষের পত্নী এবং দ্বিজেন্দ্রনাথ প্রমুখ সন্তানের জননী হইলেও সাহিত্যে তাঁহাকে স্মরণ করিয়া কোনো অমর সৌধ নির্মিত হয় নাই। তাঁহার কৃতকর্মা পুত্র অথবা বিদুষী কন্যাগণের মধ্যে কেহই তাঁহার মাতৃদেবী সম্বন্ধে তেমন-কিছু লিখেন নাই, কেহ কোনো গ্রন্থ মাতৃনামে উৎসর্গও করেন নাই। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার বিরাট সাহিত্যে জননী সম্বন্ধে কয়েকটি স্থানে মাত্র সামান্য উল্লেখ করিয়াছেন…।' এই প্রসঙ্গে, সুরেশচন্দ্র সমাজপতি সম্পাদিত 'আগমনী' (মহালয়া ১৩২৬) হইতে রবীন্দ্রনাথের 'মাতৃবন্দনা' কবিতাবলী পুনর্মুদ্রিত করিতেছি। এই কবিতাগুলিও অবশ্য 'সামান্য উল্লেখ' বলিয়া বিবেচ্য; তবু এগুলির অধিকাংশ কোনো গ্রন্থান্তর্ভুক্ত হয় নাই বলিয়া—কেবল 'জননী তোমার করুণ চরণখানি' 'গীতাঞ্জলি'তে মুদ্রিত হইয়াছিল—সাধারণের নিকট অপরিচিত, এইজন্য এগুলি পুনরায় প্রকাশিত হইতেছে।"—

হে জননী, ফুরাবে না তোমার যে দান,
শিরার শোণিতে তাহা চির বহমান।
তুমি দিয়ে গেছ মোরে সূর্য তারা চাঁদ,
আমার জীবন সে তো তব আশীর্বাদ।

—

মাতঃ, পুণ্যময়ী মাতৃভূমি
চিনায়ে দিয়েছ তুমি
তোমা হতে জানিয়াছি নিখিল মাতারে।
সে দোঁহার শ্রীচরণে
নত হয়ে কায়মনে
পারি যেন তব পূজা পূর্ণ করিবারে।

—

জননি, তোমার করুণ চরণখানি
হেরিনু আজি এ অরুণ-কিরণরূপে।
জননি, তোমার মরণহরণ বাণী
নীরব গগনে ভরি উঠে চুপে চুপে।
তোমারে নমি হে সকল ভুবন মাঝে,
তোমারে নমি হে সকল জীবন-কাজে,
তনু মন ধন করি নিবেদন আজি—
ভক্তিপাবন তোমার পূজার ধূপে,
জননি, তোমার করুণ চরণখানি
হেরিনু আজি এ অরুণ-কিরণরূপে।

জননি,
তোমার মঙ্গল-মূর্তি অমৃতে লভিছে স্ফূর্তি
অমর্ত্য জগতে।
তোমার আশিসদৃষ্টি করিছে আলোকবৃষ্টি
সংসারের পথে।

তোমার স্মরণপুণ্য করিতেছে গ্লানিশূন্য
সন্তানের মন।
যেন গো মোদের চিত্ত চরণে যোগায় নিত্য
কুসুমচন্দন।

—

হে জননি, বসিয়াছ মরণের মহা-সিংহাসনে,
তোমার ভবন আজি বাধাহীন বিপুল ভুবনে।
দিনের আলোক হতে চাও তুমি আমাদের মুখে,
রজনীর অন্ধকারে আমাদের লও টানি বুকে।
মোদের উৎসব মাঝে তোমার আনন্দ করে বাস,
মোদের দুঃখের দিনে শুনি যে তোমার দীর্ঘশ্বাস।
মোদের ললাটে আছে তোমার আশিস-করতল
এ কথা নিয়ত স্মরি দেহমন রাখিব নির্মল।

—

ওগো মা, তোমারি মাঝে, বিশ্বের মা যিনি
ছিলেন প্রত্যক্ষ বেশে জননীরূপিণী।
সেদিন যা কিছু পূজা দিয়েছি তোমায়,
সে পূজা পড়েছে বিশ্বজননীর পায়।
আজি সে মায়ের মাঝে গিয়েছ মা চলি,
তাঁহারি পূজায় দিনু তব পুষ্পাঞ্জলি।

জীবনস্মৃতির পরিশিষ্টে কবিতাগুলি উদ্ধৃত হইয়াছে।

পৃ ১৩ পাদটীকা ১—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় জানাইয়াছিলেন (৫-১২-৪৭): সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৮৬৪ ডিসেম্বর ১২ তারিখে আহমদাবাদের কাজে যোগদান করেন। সুতরাং তাহার পূর্বে ফিরিয়াছিলেন।

পৃ ১৪—জ্যোৎস্নাময় স্থলে জ্যোৎস্নানাথ ঘোষাল হইবে। বর্ণকুমারী দেবী রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর সময় জীবিতা ছিলেন। মাধুরীলতার জন্ম ১৮৮৬ অক্টোবর ২৫। রেণুকার জন্ম ১৮৯১ জানুয়ারি ২৩।

২৬—যদু ভট্ট (যদুনাথ ভট্টাচার্য ১৮৪০-৮৩)। ১৮৭০ সালে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ যদু ভট্টকে নিমন্ত্রণ করিয়া গান শোনেন। কয়েক বৎসর পর তিনি ঠাকুরবাড়িতে গানের গৃহশিক্ষক নিযুক্ত হন। রবীন্দ্রনাথ ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ যদু ভট্টর রচিত হিন্দী গান ও সুর লইয়া বহু বাংলা গান রচনা করেন। যদু ভট্ট এই সময়ে কয়েকটি ব্রহ্মসংগীতও রচনা করিয়াছিলেন। ঠাকুর-পরিবারের সূত্রে ত্রিপুরার মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্যর সহিত ইনি পরিচিত হন; মহারাজ ইঁহাকে 'রঙ্গনাথ' উপাধি দেন। তাঁহার কয়েকটি হিন্দী গানে 'রঙ্গনাথ' নাম পাওয়া যায়। ত্রিপুরায় তিনি বাস করিতে যান নাই। বেশির ভাগ সময় কাটে কলিকাতায় ঠাকুরবাড়িতে। মাত্র ৪৩ বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হয়। দ্র রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, যদু ভট্ট, মাসিক বসুমতী ১৩৬১ আষাঢ় পৃ ৪৮৯-৯১।

শান্তিদেব ঘোষ তাঁহার 'রবীন্দ্রসংগীত' গ্রন্থে যদু ভট্ট সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের ভাষণ হইতে উদ্ধৃতি আছে। "ছেলেবেলায় আমি একজন বাঙালি গুণীকে দেখেছিলাম, গান যাঁর অন্তরের সিংহাসনে রাজমর্যাদায় ছিল।...তিনি বিখ্যাত যদু ভট্ট।... যখন আমাদের জোড়াসাঁকোর বাড়িতে থাকতেন নানাবিধ লোক আসত তাঁর কাছে শিখতে; বাঙলাদেশে এরকম ওস্তাদ জন্মায়নি। তাঁর প্রত্যেক গানে একটি originality ছিল, যাকে আমি বলি স্বকীয়তা।" দ্র রবীন্দ্রসংগীত পৃ ৪৫।

পৃ ৩৬—'কয়েকদিন বোলপুরে থাকিবার কথা হইল।' কয়েক বৎসর পূর্বে রেললাইন খোলা হয়। অজয় ব্রিজ পর্যন্ত রেলপথ খোলা হয় ১৮৫৮ অক্টোবর ৩; সাঁইথিয়া পর্যন্ত ১৮৫৯ সেপ ৩; সাঁইথিয়া হইতে তিনপাহাড়ি ১৮৬০।

পৃ ৩৭—বোলপুর স্টেশনে নামিয়া রায়পুর যাইতে হইলে শান্তিনিকেতন পথে পড়ে না। দ্র জ্ঞানেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় লিখিত 'শান্তিনিকেতন আশ্রম'।

পৃ ৩৭—মহর্ষির বোলপুর আগমন।—আমাদের মনে হয় মহর্ষি আহমদপুরের পথে রায়পুর আসেন। কাটোয়া পর্যন্ত

নদীপথে আসিয়া কাটোয়া-গুহুটিয়া রাস্তা দিয়া আসিয়া সুরুল-গুহুটিয়া সড়কে পড়েন। গুহুটিয়া হইতে সুরুল পর্যন্ত যাতায়াতের বড়ো রাস্তা এককালে ছিল। বোলপুরে রেলপথ আসে ১৮৫৯ সালের শেষভাগে। মহর্ষির সহিত প্রতাপনারায়ণ সিংহের ঘনিষ্ঠতা হয় ১২৬৫ বা ১৮৫৮ এর পূর্বে। সিমলা পর্বত হইতে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ এক পত্রে রাজনারায়ণ-বসুকে লিখিতেছেন [১২ শ্রাবণ ১৭৮০ (১২৬৫) ॥ ১৮৫৮ জুলাই ২৭] "তুমি শুনিয়া অবশ্য আহ্লাদিত হইবে যে বীরভূম নিবাসী শ্রীযুক্ত প্রতাপনারায়ণ সিংহ ব্রহ্মরসের আস্বাদন পাইয়া তাহাতে অত্যন্ত অনুরক্ত হইয়াছেন।" এই সময়ে দেবেন্দ্রনাথের বয়স ৪০।৪১ বৎসর। হিমালয় যাত্রার পূর্বেই প্রতাপনারায়ণদের সহিত পরিচয়াদি হয় এবং পাহাড় হইতে ফিরিয়া দেবেন্দ্রনাথ রায়পুর আসিয়া থাকিবেন। তখন পর্যন্ত কাটোয়া পথ ছাড়া অন্যপথ ছিল না—কারণ তখনো রেলপথ নির্মিত হয় নাই। অজয় হইতে সাঁইথিয়া রেল নির্মিত হয় ১৮৫৯ সালে ৩ অক্টোবর। সুতরাং রায়পুর আসিবার প্রশস্ত পথ ছিল কাটোয়া হইয়া। গুহুটিয়া-সুরুলের পথেই শান্তিনিকেতন অবস্থিত। সুরুলের দিকের কয়েক মাইল পথ নষ্ট হইয়া গিয়াছে ; কিন্তু পুরাতন ম্যাপ দেখিলে পথ কোথা দিয়া গিয়াছিল জানা যায়। এই পথের ধারেই ছিল ছাতিম গাছ ; সে গাছ এখনো আছে। এ সম্বন্ধে আরও গবেষণার প্রয়োজন।

পৃ ৩৭—শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথ পিতার সহিত প্রথমবার আসেন। সেই সময়ে চীপ্ সাহেবের কুঠির নিকট হরিশমালীর খরগোশ শিকারের কথা। বালকের স্মৃতি স্পষ্ট ছিল। দ্র প্রভাতচন্দ্র গুপ্ত, রবীন্দ্রপ্রসঙ্গ, মাসিক বসুমতী ১৩৬১ বৈশাখ পৃ ১৫-১৬। বড়ো হইয়া জমিদারিতে চরে কবি পাখিশিকার নিষেধ করিয়াছিলেন। কবির সহিত ১৯২৭ সালে ভরতপুর যাই। রাজ্যের নানা দর্শনীয় স্থান কবিকে দেখানো হয়। একটি প্রকাণ্ড বিলের কাছে আমাদের লইয়া যাওয়া হয়। সেখানে প্রস্তরফলকে কোন্ সাহেব কয় শত করিয়া পাখি মারিয়াছিলেন, তাহার তালিকা খোদিত ছিল। কবি দেখিয়া মনে মনে এমন বিরক্ত হইলেন যে, কালমাত্র সেখানে আর থাকিলেন না।

শান্তিনিকেতন অতিথিশালা। ব্রহ্মচর্যাশ্রম যুগে 'শান্তিনিকেতন' বলিতে ঐ বাড়িটি বুঝাইত। কালে সমস্ত আশ্রমই ঐ নামে অভিহিত হয়। বর্তমানে ঐ বাড়ি বিশ্বভারতী বিদ্যাভবনের অধ্যক্ষর আপিস।

পৃ ৪০—কুমারসম্ভব মহাকাব্যের প্রথম সর্গের স্থলে তৃতীয় সর্গ হইবে।

পাদটীকা—বালকের বয়স ১৩ বৎসর ৭ মাস হইবে।

পৃ ৪২—'প্রকৃতির খেদ' কবিতাটি 'রবীন্দ্রনাথকে দেখাইতেই তিনি ইহার কয়েক পংক্তি মুখস্থ বলিতে পারিলেন' (শনিবারের চিঠি, ১৩৪৬ অগ্রহায়ণ, 'রবীন্দ্র-রচনাপঞ্জী'—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস)। 'হিন্দুমেলায় উপহার' এবং 'প্রকৃতির খেদ' কবিতা দুইটির ভাবসাদৃশ্যও সংশয়াতীত (বিশ্বভারতী পত্রিকা, ১৩৫০ বৈশাখ, 'রবীন্দ্রনাথের বাল্যরচনা'—প্রবোধচন্দ্র সেন)। সুখের বিষয়, কবির স্মৃতি ও স্বীকৃতি তথা আভ্যন্তরীণ পরোক্ষ প্রমাণের উপরে একান্তভাবে নির্ভর করিবার প্রয়োজন আর নাই। 'প্রকৃতির খেদ' যে রবীন্দ্রনাথের রচনা তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। অক্ষয়চন্দ্র সরকারের সম্পাদিত সাপ্তাহিক 'সাধারণী' পত্রিকার এক সংখ্যায় (১২৮২ জ্যৈষ্ঠ ৩) ঠাকুরবাড়ির 'বিদ্বজ্জন-সমাগম' সম্বন্ধে একটি সংবাদ প্রকাশিত হয়। তাহা হইতে জানা যায় যে, বিদ্বজ্জন-সমাগমের বিগত অধিবেশনে (১২৮২ বৈশাখ)—"বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'প্রকৃতির খেদ' নামে স্বরচিত একটি পদ্যপ্রবন্ধ পাঠ করেন। ঐ পদ্য অতি মনোহর। পাঠকালে সকলের মনে ভারতভূমির বর্তমান হীনাবস্থা স্মরণ হওয়াতে নেত্র হইতে অশ্রুপাত হইয়াছিল। রবীন্দ্রবাবুর বয়স ১২।১৩ বৎসর"। তখন রবীন্দ্রনাথের বয়স আসলে চৌদ্দ বৎসর, বারো তেরো বৎসর নয়। 'অভিলাষ' প্রকাশের সময়েও (১২৮১) তিনি 'দ্বাদশবর্ষীয় বালক' ছিলেন না। 'অভিলাষ' কোনো সভায় পঠিত হইয়াছিল কিনা জানা যায় নাই। 'হিন্দুমেলায় উপহার' যদি সাধারণের সমক্ষে পঠিত (১৮৭৫ ফেব্রুয়ারি ১১) প্রথম কবিতা হয়, তাহা হইলে 'প্রকৃতির খেদ' হয়তো উক্তপ্রকার দ্বিতীয় কবিতা। দ্রষ্টব্য দেশ, ১৩৫২ চৈত্র ১৬, 'রবীন্দ্রনাথের বাল্যরচনা',—প্রবোধচন্দ্র সেন।

পৃ ৪৭—স্বর্ণকুমারী দেবীর 'স্নেহলতা' উপন্যাসে যে ইঙ্গিত আছে তাহা রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধেই মনে হয়।

পাদটীকা—ভারতী ও বালক ১২৯৬ কার্তিক পৃ ৩৬৫ হইবে।

'একসূত্রে বাঁধিয়াছি সহস্রটি মন'—সঙ্গীতপ্রকাশিকা ৫ম ভাগ ৩য় সংখ্যা ১৩১২ অগ্রহায়ণ সংখ্যায় গানটির রচয়িতা শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। দ্র শান্তিদেব ঘোষ, রবীন্দ্রনাথের একটি গান, দেশ ১৩৫৫ আষাঢ় ৫, পৃ ২৮৯-৯১।

পৃ ৫৬—হিন্দুমেলায় পঠিত দ্বিতীয় কবিতা। ১৯১০ সালে কোনো সময়ে অধ্যাপক জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সন্তোষকুমার বসু শান্তিনিকেতনে আসেন। কবির সহিত তাঁহাদের মোলাকাতের প্রতিবেদন শ্রীমতী কুমুদিনী মিত্র সম্পাদিত 'সুপ্রভাত' (৩য় বর্ষ ১৩১৭) পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। তাহাতে আছে, "সেটি দিল্লীর দরবার উপলক্ষে লিখিত হয়। বহু উৎকট রকমের অনেক কথা আছে বলিয়া উহা কখনো ছাপা হয় নাই।" (ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, রবীন্দ্র-গ্রন্থ পরিচয় ২য়সং পৃ ৭৮-৮০)

পৃ ৫৭—হিন্দুমেলায় রবীন্দ্রনাথের কবিতা পাঠ। নবীনচন্দ্র সেন উপস্থিত। নবীনচন্দ্র সেই সময়ে (১৮৭৬ ফেব্রু) চট্টগ্রামের কমিশনর সাহেবের পার্সোনাল অ্যাসিস্টেণ্ট। মনে হয় ঈস্টারের ছুটিতে হিন্দুমেলার সভায় উপস্থিত হন। তাঁহার জীবনী হইতে, এ সময়ে কোনো ছুটি লন বলিয়া জানা যায় না। অসুস্থতার জন্য ছুটি লন ১৮৭৭ সালের জুন মাসে। সুতরাং ১৮৭৬ সালের ঈস্টারের সময় ছুটিতে কলিকাতায় আসিয়াছিলেন।

পৃ ৬০—মেঘনাদ বধ কাব্য সম্বন্ধে বহুকাল পরে 'সাহিত্যসৃষ্টি' (১৩১৪) প্রবন্ধে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাই তাঁহার পরিপক্ব মত বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। দ্র র-র ৮ম, পৃ ৪১৩।

পৃ ৬৭—বান্ধব ১২৮৫, দশম সংখ্যা পৃ ৪৬৪-৬৭। কবিকাহিনীর সমালোচনা। দ্র জীবনস্মৃতি পৃ ২৫৪-৫৭।

পৃ ৬৯—সেণ্ট জেভিয়ার্স স্কুলে রবীন্দ্রনাথ ভর্তি হন। এতদ্‌সম্বন্ধে 'শনিবারের চিঠি' (১৩৪৮ আশ্বিন পৃ ৯০৩) তে এই তথ্য আছে,—"১৮৭৪ খ্রীস্টাব্দের খাতাপত্র কলেজ হইতে খোয়া গিয়াছে তবে ১৮৭৫ খ্রীস্টাব্দের খাতায় নূতন ভর্তি হওয়ার সংবাদ না থাকাতে মনে হয়, তিনি [রবীন্দ্রনাথ] ১৮৭৪ খ্রীস্টাব্দে ভর্তি হইয়াছিলেন। ১৮৭৫-৭৬ এই দুই বৎসরের রেকর্ডে সোমেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—এই উভয় ভ্রাতার নাম পাইতেছি। দুইজন ১৮৭৫ খ্রীস্টাব্দে একই শ্রেণীতে অধ্যয়ন করিতেন। তখনকার নাম ছিল ফিফ্‌থ ইয়ার বা প্রিপ্যারেটরি এণ্ট্রান্স ক্লাস। রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত 'ইর্‌রেগুলার' ছিলেন, প্রায়শই কামাই করিতেন। ১৮৭৬ খ্রীস্টাব্দের খাতায় দেখা যায়, রবীন্দ্রনাথ প্রোমোশন পান নাই, সোমেন্দ্রনাথ পাইয়াছেন। সম্ভবত ইহার পরই তিনি ক্ষান্ত দিয়াছেন। অল্পদিন পূর্বে পরলোকগত একজন বৃদ্ধ অধ্যাপক বলিতেন, দুই ভাইয়ে খুব সাজগোজ করিয়া গাড়িতে চাপিয়া স্কুলে আসিতেন।" আমাদের মনে হয় ১৮৭৪ ও ৭৫ সাল সেণ্ট জেভিয়ার্স স্কুলে কোনো প্রকারে টিঁকিয়া থাকেন। মাতৃবিয়োগের পর (১৮৭৫ মার্চ) হইতে বিদ্যালয়ে যাওয়া খুবই কমিয়া যায়।

পৃ ৭৩—'কাল্পনিক এবং বাস্তবিক দুই ভাবের দুই প্রকার লোক' শীর্ষক প্রবন্ধ রবীন্দ্রনাথের রচনা নহে; রচয়িতা দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর। দ্র প্রবন্ধাবলী।

পৃ ৮৪পা-টী ২—গানগুলি 'গীতবিতান' নূতন সংস্করণে আছে। কেবল ৭ম সংখ্যার গানটি নাই, কারণ এইটি কবির রচনা নহে।

পৃ ৭৫—'দামিনীর আঁখি' ইত্যাদি কবিতাটি Moore হইতে অনূদিত। ভারতী ১২৮৮ আষাঢ় পৃ ১৪৬-৪৮, সম্পাদকের বৈঠক। সুতরাং 'অপ্রকাশিত' নহে।

পৃ ৮২—'মানময়ী' জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখিত নাটিকা। ইহাতে রবীন্দ্রনাথ মদনের, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ইন্দ্রের, কাদম্বরী দেবী উর্বশীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হন বলিয়া শুনিয়াছি। 'মানময়ী'র গল্পাংশ এইরূপ: "উর্বশী ইন্দ্রের প্রতি

মান করিয়াছে ; অনেক সাধ্যসাধনাতেও সে মান ভাঙিল না। মান ভাঙাইবার জন্য মদনকে রতি অনুরোধ করেন। মদন উর্বশীর নিকট উপস্থিত হইয়া ফুলবাণ মারে, তাহাতে উর্বশীর মান ভাঙিয়া যায় ও সে ইন্দ্রের জন্য অধীর হয়। এদিকে বসন্ত মদনকে মদ খাওয়াইয়া তাহার ফুলবাণ চুরি করিয়া তাহাকেই মারে। মদন তাহাতে উর্বশীর প্রেমে মত্ত হইয়া তাহার সহিত প্রেমালাপ করিতেছে, বসন্ত এমন সময় দুষ্টুমি করিয়া উর্বশীর পদানত মদনের কাছে রতিকে ডাকিয়া আনে। রতি মদনকে তিরস্কার করিতে করিতে চলিয়া যায়, মদনও তাহাকে শান্ত করিবার জন্য তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যায়। পরে উর্বশীর মান ভঙ্গের জন্য তাহাকে উপহাসপূর্বক সকলে উল্লাস করিতে করিতে ইন্দ্রের সহিত মিলন করিতে লইয়া গেল।" মানময়ী গীতিকবিতা। কলিকাতা বাল্মীকি যন্ত্রে শ্রীকালিকিঙ্কর চক্রবর্তী দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত। ১৮০২ শক [১৮৮০]

পৃ ৮৭—'বিলাতি সুর সংযোগের ঢেউ' দ্র ইন্দিরাদেবী চৌধুরাণী, 'রবীন্দ্রসংগীতের ত্রিবেণীসঙ্গম'—বিশ্বভারতী পত্রিকা ১৩৫৬ মাঘ-চৈত্র সংখ্যা। 'রবীন্দ্রনাথের ভাঙা গান'—বি-ভা-প ১৩৫৯ শ্রাবণ-আশ্বিন সংখ্যা, পৃ ৪৬-৪৮। পূর্বোল্লিখিত প্রবন্ধে ভুল ত্রুটি সংশোধিত। রবীন্দ্রনাথের 'ভাঙা' গান—(সংযোজন ও সংশোধন)-বি-ভা-প ১৩৫৯ কার্তিক পৌষ, পৃ ৯৯।

পৃ ৮৯—রুদ্রচণ্ডের সমালোচনা। বান্ধব, ১২৮৮ তৃতীয় সংখ্যা পৃ ১৪২-৪। দ্র জীবনস্মৃতি পৃ ২৫৭।

পৃ ৯০পা-টী ১—গান দুইটি গীতবিতানে (নূতন সং পৃ ৭৭৩,৭৭৪) আছে।

পৃ ১০৪পা-টী ২—দয়ালু মাংসাশী—ভারতী ১২৮৮ শ্রাবণ। অচ-র-র ১ম পৃ ৩৪৯, পা-টী ৩। আদর্শ প্রেম, ভারতী১২৮৮ ফাল্গুন। অচ-র-র ১ম পৃ ৩৫৬-৬২।

পৃ ১০৫পা-টী—ভারতী ১২৮৮ মাঘ পৃ ৪৮৭, পা টী-৩। ভারতী ১২৮৮ চৈত্র পৃ ৫৮০।

পৃ ১২৫—পা-টী ১ বাউলের গান। ভারতী ১২৯০ বৈশাখ (পৌষ নহে) বাউলের গান। সঙ্গীত সংগ্রহ। বাউলের গাথা। প্রথম খণ্ড। দ্র সমালোচনা। র-র-অচ ২ পৃ ১৩১।

পৃ ১৩১—প্রভাতসংগীত। 'ভূদেববাবু এডুকেশন গেজেটে প্রভাত-সংগীতের সম্বন্ধে যে অনুকূল মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন' ইত্যাদি—এডুকেশন গেজেট ১২৯০ আষাঢ় ২। দ্র জীবনস্মৃতি পৃ ২৫৭।

পৃ ১৩৩ পা-টী—গীতবিতানের নূতন সংস্করণে রবীন্দ্রনাথের সকল গানই সংগৃহীত হইয়াছে।

পৃ ১৫৫ পা-টী ৩—ঘাটের কথা, ভারতী ১২৯১ কার্তিক পৃ ৩০০-০৯।

পৃ ১৫৯—আদিব্রাহ্মসমাজের সম্পাদকরূপে রবীন্দ্রনাথ ও তত্ত্ববোধিনী-পত্রিকার সম্পাদকরূপে দ্বিজেন্দ্রনাথ উভয়েই ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে নূতন প্রাণচেতনা আনিবার জন্য নানাভাবে চেষ্টান্বিত হন। ১২৯১ সালের মাঘোৎসব পর্বে ৯ই জোড়াসাঁকোর বাটীতে ব্রাহ্মসম্মিলন হয়। তিনটি সমাজের নেতৃস্থানীয়রা উপস্থিত ছিলেন। 'রবীন্দ্রনাথ সভার প্রারম্ভে ও শেষে গান করেন'। (ত-বো-প ১২৯১ মাঘ পৃ ২১১)

পর বৎসরে ১২৯২ সালের ৯ই মাঘ এই ব্রাহ্মসম্মিলন জোড়াসাঁকোর বাটীতে হয়। দ্বিজেন্দ্রনাথ ও সত্যেন্দ্রনাথ, প্রতাপচন্দ্র মজুমদার ও ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল, শিবনাথ শাস্ত্রী ও উমেশচন্দ্র দত্ত এবং রবীন্দ্রনাথ বেদির আসন গ্রহণ করেন। 'রবীন্দ্রনাথ কয়েকটি গীত স্বয়ং গাহিয়াছিলেন।' (ত-বো-প ১২৯২ ফাল্গুন পৃ ২১১)। রবীন্দ্রনাথ কোনো ভাষণাদি দেন নাই ; মনে হয় স্বাধ্যায় আদি পাঠে সহায়তা করিয়াছিলেন।

১২৯২ সালে বীরভূম জেলায় দুর্ভিক্ষ হয়। ত-বো-পত্রিকার পৌষ সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথ সমাজের সম্পাদক হিসাবে বোলপুরে ও তন্নিকটবর্তী রামনগর গ্রামে যে রিলীফ কার্য হয়, তাহার প্রতিবেদন প্রকাশ করেন। সমাজ হইতে ৭৪৬৲ টাকা সংগৃহীত হয় ; ৩ জ্যৈষ্ঠ হইতে ১২ কার্তিক (১২৯২) পর্যন্ত ৫২৬৩২ মুখে অন্ন দেওয়া হয়।

পৃ ১৫৯— ব্রহ্মসংগীত। রবীন্দ্রনাথ উনিশ বৎসর বয়স হইতে ব্রহ্মসংগীত রচনায় প্রবৃত্ত হন। উনিশ হইতে ৩৫ (পঁয়ত্রিশ) বৎসর বয়সের মধ্যে তিনি যে সব ব্রহ্মসংগীত রচনা করেন তাহার তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে; অধিকাংশ গান মাঘোৎসবের জন্য রচিত। আমরা গানগুলির পাশে 'গীতবিতান' নূতন সংস্করণের পত্রাঙ্ক দিলাম। রবীন্দ্রনাথ গানগুলি কি ভাবে ছড়াইয়া দিয়াছেন লক্ষ্য করিবার বিষয়। বর্তমান গীতবিতান সংস্করণ হইতে রবীন্দ্রনাথের গানের রচনা-ক্রম জানা যায় না। তত্ত্ববোধিনী-পত্রিকায় প্রকাশিত ব্রহ্মসংগীতের তালিকা দিলাম। আরও ব্রহ্মসংগীত এই পনেরো বৎসরের মধ্যে রচিত হইয়াছিল কিনা তাহা গবেষণা সাপেক্ষ।

১২৮৭ : বয়স ১৯ বৎসর (১৮৮০-৮১)

আমরা যে শিশুমতি ৮১৯
কোথা আছ প্রভু ৮২০
তোমারেই করিয়াছি জীবনের ধ্রুবতারা ৩১৮
তুমি কি গো পিতা আমাদের ৮২৩
একি এ সুন্দর শোভা ২১৪
মহাসিংহাসনে বসি শুনিছ ৮১৯
দিবানিশি করিয়া যতন ৮২০

১২৮৯ : বয়স ২১ বৎসর (১৮৮২-৮৩)

যাওরে অনন্তধামে মোহমায়া পাসরি ৬৩৩
আজি শুভ দিনে পিতার ভবনে ৮২২
দেখ্‌ চেয়ে দেখ্‌ তোরা জগতের উৎসব ৮২১
বর্ষ ওই গেল চলে ৮২২
কী করিলি মোহের ছলনে ৮২১
সখা তুমি আছ কোথা ৯৪৪
বড়ো আশা করে এসেছি ৮২২
প্রভু এলেম কোথায় ৮২৩

১২৯০ : বয়স ২২ বৎসর (১৮৮৩-৮৪)

শুভ্র আসনে বিরাজ অরুণ ছটামাঝে ১৭৮
তোমারেই প্রাণের আশা কহিব ৮২৭
সংসারের চারিধার করিয়াছে অন্ধকার ৮২৩
হাতে লয়ে দীপ অগণন ৮২৫
কেরে ওই ডাকিছে ১৮২
অনিমেষ আঁখি সেই কে দেখেছে ২০১
সকলেরে কাছে ডাকি ৯৪৩
সকাতরে ওই কাঁদিছে সকলে ৮২৫

১২৯১ : বয়স ২৩ বৎসর (১৮৮৪-৮৫)

রজনী পোহাইল চলেছে যাত্রীদল ৮২৬
বরিষ ধরামাঝে শান্তির বারি ৫৮
একি সুগন্ধ হিল্লোল বহিল ২১৩
চলিয়াছি গৃহ-পানে ৮২৭
আজি এনেছে তাঁহারি আশীর্বাদ ৮২৬
দুঃখ দিয়েছ, দিয়েছ ক্ষতি নাই ১০২

১২৯১ সালের আশ্বিন মাসে রবীন্দ্রনাথ আদি ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক নিযুক্ত হন। তাহার পর কার্তিক হইতে মাঘ মাসের মধ্যে রচিত গানের তালিকা।—

তাঁহারে আরতি করে চন্দ্রতপন ১৮৭
অসীম কালসাগরে ১৭৮
তাঁহার আনন্দধারা জগতে যেতেছে বয়ে ৮৩১
এখনো আঁধার রয়েছে হে নাথ ১৭৫
ওঠো ওঠোরে, বিফলে প্রভাত বহে যায় রে ১২১
দেখা যদি দিলে ছেড়ো না আর ৮২৮
ভবকোলাহল ছাড়িয়ে বিরলে ৮২৭
আমি জেনে শুনে তবু ভুলে আছি ৮০৯
আঁধার রজনী পোহাল ১৩৮
তুমি ছেড়ে ছিলে ভুলে ছিলে ব'লে ১৬৩
ডুবি অমৃত পাথারে ১৫৪
মাঝে মাঝে তব দেখা পাই ১৬২
আঁখিজল মুছাইলে জননী ১৯৭
ওহে দয়াময় নিখিল আশ্রয় ৯৪১

তাঁহার প্রেমে কে ডুবে আছে ৮২৭
তবে কি ফিরিব ম্লানমুখ ৮২৮
দুঃখ দূরে করিলে দরশন দিয়ে ৮২৮
দাও হে হৃদয় ভরে দাও ৮২৮
সখা মোদের বেঁধে রাখো ৯৪৪
একি অন্ধকার এ ভারতভূমি ৮০৯
ডাকি তোমারে কাতরে[১]
এসেছে সকলে কত আশে ১২৭
ডেকেছেন প্রিয়তম কে রহিবে ঘরে ৮২৯
চলেছে তরণী প্রসাদ পবনে ৮২৯
এ পরবাসে রবে কে হায় ১৭৫
তুমি ধন্য ধন্য হে ধন্য তব প্রেম ১৮৭
বেঁধেছ প্রেমের পাশে ওহে প্রেমময় ১৫৭
তোমায় যতনে রাখিব হে ৮৩০
সংশয় তিমির মাঝে না হেরি গতি হে ১৭১
পিতার দুয়ারে দাঁড়াইয়া সবে ৮২৯
আইল আজ প্রাণসখা, দেখোরে নিখিল জন ৮৩০
(আমার) হৃদয় সমুদ্রতীরে কে তুমি দাঁড়ায়ে ১৮৩
শোনো শোনো আমাদের ব্যথা ৮০৮

১২৯২ : বয়স ২৪ (১৮৮৫-৮৬)

দীর্ঘ জীবন পথ ১০৯
দুখের কথা তোমায় বলিব না ৮৩০
গাও বীণা, বীণা গাও ১৮১
একবার তোরা মা বলিয়া ডাক ৮১২
শান্তি সমুদ্র তুমি গভীর ১৫৪
ডাকিছ শুনি জাগিনু ৭৭
অন্ধজনে দেহ আলো ৫২
হেরি তব বিমল মুখভাতি ১৩৭
আমি দীন অতি দীন ১৯১
শুনেছে তোমার নাম ১৭৯
পেয়েছি অভয় পদ ১৭৮
মিটিল সব ক্ষুধা ৮৩৩
শোনো তাঁর সুধাবাণী ১২১
ডাকিছ কে তুমি তাপিত জনে ১৭২
এত আনন্দধ্বনি উঠিল কোথায় ১৩৮
আজি বহিছে বসন্ত পবন সুমন্দ ১২৯
কী গাবো আমি কী শুনাব আজি ১২৮
কেন জাগে না জাগে না অবশ পরান ১৬৫
যাদের চাহিয়া তোমারে ভুলেছি ১৬৬
তোমার কথা কেহ তো বলে না ১৬৩
তোমার দেখা পাব বলে ১৭৪
হায় কে দিবে সান্ত্বনা ১৬৯
তোমারি মধুর রূপে ভরেছ ভুবন ২০৮
তব প্রেম সুধারসে মেতেছি ৮৩৪

১২৯৩ : বয়স ২৫ (১৮৮৬-৮৭)

আমারেও করো মার্জনা ৮৩৪
বর্ষ গেল, বৃথা গেল ১৭৭
ফিরো না ফিরো না আজি ৮৩৪
প্রভাতে বিমল আনন্দে ২১৩
নিকটে দেখিব তোমারে ১৭৩
সবে মিলি গাওরে ৮৩৫
অনেক দিয়েছ নাথ আমায় ১৬৭
পেয়েছি সন্ধান তব অন্তর্যামী ১৮৩
নয়ন তোমারে পায় না দেখিতে (দ্র জীবনস্মৃতি পৃ ৬১) ৮৪২
তোমারে জানিনে হে তবু ৮৩৫
দেবাদিদেব মহাদেব ২০২
ভয় হয় পাছে তব নামে আমি ৫৭
এবার বুঝেছি সখা ৮৩৫
বসে আছি হে কবে শুনিব ৭৭

১ গীতবিতান নূতন সংস্করণে পাইলাম না। গী-বি ১ম সংস্করণে বাদ দেওয়া গানের তালিকা দ্রষ্টব্য পৃ ৮৬১। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের ব্রহ্মসংগীতে গানটি পাইলাম না।

সত্য মঙ্গল প্রেমময় তুমি ১৭৯
আনন্দ রয়েছে জাগি ভুবনে তোমার ১৯১
কী ভয় অভয় ধামে ১৯১
আমরা মিলেছি আজ মায়ের ডাকে ২৪৯
(কলিকাতায় দ্বিতীয় কন্‌গ্রেসের অধিবেশনে গীত)
তুমি জাগিছ কে ১৮৪
আমায় ছ জনায় মিলে পথ দেখায় বলে ৮৩২
তোমা লাগি নাথ জাগি ১৭৩
স্বামী, তুমি এস আজ ১৬৯
চাহি না সুখে থাকিতে হে ৮৩৬
চির দিবস নব মাধুরী ২১২
আমার যা আছে আমি ৮২
আজ বুঝি আইল প্রিয়তম ৮৩৬
তুমি বন্ধু, তুমি নাথ ৩৪

১২৯৪ : বয়স ২৬ (১৮৮৭-৮৮)

তুমি আপনি জাগাও মোরে ১২১
নূতন প্রাণ দাও, প্রাণসখা ১২১
সবে আনন্দ করো ১২০
হে মন তাঁরে দেখো ৮৩৬
আজি হেরি সংসার অমৃতময় ২১৩
তোমারই ইচ্ছা হউক পূর্ণ ৫২
শ্রান্ত কেন ওহে পান্থ ১৮১
পূর্ণ আনন্দ পূর্ণ মঙ্গলরূপে ১৭০
অসীম আকাশে অগণ্য কিরণ ১৬৪।৮৩২
আছ অন্তরে চিরদিন ১৭১
জগতে তুমি রাজা অসীম প্রতাপ ১৮৬
নাথহে প্রেমপথে সব বাধা ১৭০
হৃদয়বেদনা বহিয়া, প্রভু

১২৯৫, ১২৯৬ সালে নূতন ব্রহ্মসংগীত দেখি না।

১২৯৭ : বয়স ২৯ (১৮৯০-৯১)

নব আনন্দে জাগো আজি ১৩৭
ঐ পোহাইল তিমির রাতি ১২৯

১২৯৮ : বয়স ৩০ (১৮৯১-৯২)

শূন্য প্রাণ কাঁদে সদা ১৭৫

১২৯৯ : বয়স ৩১ (১৮৯২-৯৩)

জয় রাজরাজেশ্বর ৮৩৭
চিরবন্ধু, চির নির্ভর ১৭৯
একি লাবণ্যে পূর্ণ প্রাণ প্রাণেশ হে ২১২
আনন্দধ্বনি জাগাও ২৫৫
হৃদয়মন্দিরে প্রাণাধীশ ১৫৭
আনন্দলোকে মঙ্গলালোকে ১৮৭

১৩০০ : বয়স ৩২ (১৮৯৩-৯৪)

এ ভবন পুণ্য প্রভাবে করো পবিত্র
(এসো হে গৃহদেবতা। এসো হে আশ্রমদেবতা) ৬১২
হৃদয়নন্দনবনে নিভৃত এ নিকেতনে ৭৭
আনন্দধারা বহিছে ভুবনে ১৩৭
অন্তরে জাগিছে অন্তর্যামী ১০৮

১৩০১ : বয়স ৩৩ (১৮৯৪-৯৫)

নিত্য নব সত্য তব ১৬১

১৩০২ : বয়স ৩৪ (১৮৯৫-৯৬)

পাদপ্রান্তে রাখো সেবকে ৫৭

১৩০৩ : বয়স ৩৫ (১৮৯৬-৯৭)

সুন্দর বহে আনন্দ মন্দানিল ২১২
শীতল তব পদছায়া ১৮৬
আজি কোন্ ধন হতে ১০৯
আর কতদূরে আছে সে আনন্দধাম ১৭০

পৃ ১৬১—'পদরত্নাবলী' সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র শ্রীশচন্দ্র মজুমদারকে এক পত্রে ২৫ আশ্বিন [১২৯২] লেখেন, "তুমি এবং রবীন্দ্রনাথ যখন সংগ্রহকার, তখন সংগ্রহ যে উৎকৃষ্ট হইয়াছে, তাহা কেহই সন্দেহ করিবে না এবং আমার সার্টিফিকেট নিষ্প্রয়োজন।" বঙ্কিমচন্দ্রের রচনাবলী, পরিষৎ সংস্করণ, 'বিবিধ' খণ্ড, পৃ ৪১৩।

পৃ ১৬২—ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়। "গল্প পদ্য ভেদ ও সেই প্রভেদের আবশ্যকতা সম্বন্ধে অল্পকাল হল ঠা— [ঠাকুরদাস] মুখুয্যের সঙ্গে আমার আলোচনা চলছিল। তাঁর মতে ভবিষ্যতে গদ্য এতদূর পর্যন্ত সুন্দর হয়ে উঠবে যে পদ্যর বিশেষ প্রয়োজনীয়তা দূর হয়ে যাবে।··ভাবে বোধ হল তাঁর বিশ্বাস আমার গদ্যে আমার পদ্যের চেয়ে ঢের বেশি কবিত্ব পরিস্ফুটভাবে প্রকাশ পায় এবং সেইটেই তাঁর মতে স্বাভাবিক।" ছিন্নপত্র, কলিকাতা, মঙ্গলবার, ২০শে নভেম্বর [১৮৯৪]।

"এ পারে সন্ধের সময় আমার একটি বেড়াবার সঙ্গী পাওয়া গেছে। লোকটির নাম ঠা—[ঠাকুরদাস]। বেশ বুদ্ধিমান, প্রৌঢ়বয়স্ক, সাহিত্যানুরাগী, চিন্তাশীল, স্পষ্টবক্তা এবং জমিদারী কাজকর্মে বহুদর্শী। রোজ বেড়াবার সময় এঁর সঙ্গে আমার নানা ভাবের আলোচনা হয়ে থাকে।" ছিন্নপত্র, শিলাইদহ, ১লা ফাল্গুন [১৩০১॥১২ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৫]

"আজকাল আর আমার একলা বেড়ানো হয় না। সঙ্গে প্রায়ই শৈ— [শৈলেশ মজুমদার] এবং ঠা—[ঠাকুরদাস] বাবু থাকেন।···ঠা—[ঠাকুরদাস] বাবুর মুখ থেকে এখানকার সেরেস্তার রিপোর্ট শুনতে থাকি এবং সেই রিপোর্টের ফাঁকে ফাঁকে নক্ষত্রভরা আকাশ উঁকি মারতে থাকে···।" শিলাইদহ, ১০ই মার্চ [১৮৯৫॥২৭ ফাল্গুন ১৩০১]। তিনটি উক্তিই বিশ্বভারতী পত্রিকা ১৩৫২ শ্রাবণ-আশ্বিন (পৃ ৪-১৪) সংখ্যা হইতে গৃহীত।

ঠাকুরদাস কিছুকাল জোড়াসাঁকোর ঠাকুর এস্টেটে কাজ করিয়াছিলেন। দ্র ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সাহিত্যসাধক চরিতমালা ৮৪, ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়। ঠাকুরদাসকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের পত্রাবলী। দ্র 'কবি-প্রণাম' (১৩৪৮)।

পৃ ১৬৯—"বঙ্কিম প্রমুখ সকলেই চূড়ামণির আজগুবি ধর্ম ও বিজ্ঞানের বিরোধী ছিলেন।" রিপন [সুরেন্দ্রনাথ] কলেজের অধ্যাপক বিপিনবিহারী গুপ্ত লিখিতেছেন, "বঙ্কিম বাবুর কথা এই ছিন্নপত্র ও জীবনস্মৃতিতে এত অল্প বলা হইয়াছে যে, আমার diary হইতে আরও একটু উদ্ধৃত করিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিতেছি না।" একদিন কথা প্রসঙ্গে আমাকে বঙ্কিম বলিলেন, 'রবিবাবু আপনি (বঙ্কিমবাবু বরাবর আমাকে আপনি বলিয়া সম্বোধন করিতেন), শশধর তর্কচূড়ামণির বক্তৃতা শুনিয়াছেন?' আমি বলিলাম 'না'। তিনি বলিলেন, 'শুনিবেন। তাহাতে জিনিস আছে। আপনি আমার বাড়িতে আসিবেন, এই খানেই তাঁহার কথাবার্তা শুনিবার সুবিধা আপনার হইতে পারিবে।' কিন্তু শীঘ্রই এইখানেই দেখিতে পাইলাম যে, বঙ্কিমবাবুর admiration বড়ো বেশি দিন স্থায়ী হইল না। 'কৃষ্ণচরিত'-রচয়িতার সহিত তর্কচূড়ামণির মিলন স্থায়ী হইতে পারে না। একবার Albert Hall-এ আমি তাঁহার বক্তৃতা শুনিতে গিয়াছিলাম।···" দ্র দেশ ১৩৬০ বৈশাখ ২৩ পৃ ৭০।

পৃ ১৮১—কড়ি ও কোমলের সমালোচনা। কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ 'মিঠেকড়া' নামে ব্যঙ্গকাব্য বা প্যারডি লেখেন 'রাহু' নাম দিয়া। ১২৯৩ সালে কড়ি ও কোমল বাহির হইয়াছিল, তাহার প্রায় পাঁচ বৎসর পরে

'মিঠেকড়া' মুদ্রিত হয়। শ্রীকাকাতুয়া দেবশর্মা [দেবেন্দ্রনাথ সেন] 'রবিরাহু' নামে কবিতা লেখেন। দ্র সাহিত্য ১২৯৮ আষাঢ় পৃ ১৪৮।

পৃ ১৮২—বিদ্যাপতির পদাবলী। হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিতেছেন, "বঙ্গীয় শব্দকোষের নিমিত্ত মৈথিল শব্দ-সংকলনের সময়ে, আমি Grierson সাহেবের সংগৃহীত বিদ্যাপতির মৈথিল উৎকৃষ্টপদাবলী-সংগ্রহ (Maithil Chrestomathy) ও পদাবলীতে ব্যবহৃত 'মৈথিল শব্দমালা' (Maithil Chrestomathy Vocabulary) পড়িয়াছিলাম। রবীন্দ্রনাথ পূর্বে এ পদাবলী পড়িয়া পদাবলীর পাশে পাশে বাঙ্‌লায় গদ্যে ও পদ্যে অনেকগুলি পদের অনুবাদ করিয়াছিলেন। এই অনুবাদ সকল স্থানে সম্পূর্ণ পদের নাই—কোন পদের সম্পূর্ণ, কোন পদের আংশিক অনুবাদ আছে।" ৫২টি পদাবলীর অনুবাদ আছে। দ্র প্রবাসী ১৩৪৮ অগ্রহায়ণ, পৌষ, মাঘ, ফাল্গুন।

পৃ ১৯৬—গাজিপুর বিহারের মধ্যে নহে ; উহা উত্তরপ্রদেশের অন্তর্গত।

পৃ ২২৪—'য়ুরোপযাত্রীর ডায়ারি'র খসড়া। ইংলণ্ডের ঐশ্বর্য ও বিলাস দেখিয়া কবি যেমন মুগ্ধ, তেমনই তাহার পশ্চাতে যে দারুণ দুঃখ নিহিত রহিয়াছে, সেদিকেও তাঁহার মন ধাবিত হইতেছে। তিনি একদিনের ডায়ারিতে লিখিতেছেন [১৮৯০ সেপ্টেম্বর ১৯], "ভেবে দেখলে এর একটা অন্ধকার দিক আছে—SONG OF SHIRT[১] পড়লে তা টের পাওয়া যায়—এই সুখসমৃদ্ধির অন্তরালে কী অসহ্য দারিদ্র্য আপনার জীবনপাত করচে—সেটা আমাদের চোখে পড়ে না—কিন্তু প্রকৃতির খাতায় উত্তরোত্তর তার হিসেব জমা হচ্চে। প্রকৃতিতে উপেক্ষিত ক্রমে আপনার প্রতিশোধ নেবেই।...আমাদের ভারতবর্ষে অনাদৃত দুর্বল অজ্ঞান বহুযত্নলব্ধ জ্ঞানকে বিনাশ করেচে। যদি সভ্যতা আপনাকে রক্ষা করতে চায় ত প্রতিবেশীকে আপনার সমান করে তুলুক। দুটো শক্তি যত একসঙ্গে সাম্য রক্ষা করে কাজ করে ততই মঙ্গল—যেমন আকর্ষণ বিপ্রকর্ষণ—স্বার্থ এবং পরার্থ—আপনার উন্নতি ও চতুষ্পার্শ্বের উন্নতি—নইলে চতুষ্পার্শ্ব তার প্রতিশোধ তোলে—বর্বরতা সভ্যতাকে ধ্বংস করে। আমার ত সেইজন্যে মনে হয়—আশ্চর্য নেই যে ভবিষ্যতে কাফ্রিরা ইয়ুরোপ জয় করবে—কৃষ্ণ অমাবস্যা দিনের আলোকে গ্রাস করবে—আফ্রিকা থেকে রাত্রি এসে য়ুরোপের শুভ্র দিনকে আচ্ছন্ন করবে। য়ুরোপীয় সভ্যতার আদিজননী গ্রীসকে যে তুর্ক জাতি অভিভূত করবে এ কি পেরিক্লীসের সময়ে কেউ কল্পনা করতে পারত ? আলোকের মধ্যে ভয় নেই, কেননা তার উপরে সহস্র চক্ষু পড়ে আছে—কিন্তু যেখানে অন্ধকার জমা হচ্চে, বিপদ সেইখানেই গোপনে বল সঞ্চয় করচে—সেইখানেই প্রলয়ের গুপ্ত জন্মভূমি।" বিশ্বভারতী পত্রিকা ১৩৫৬ মাঘ-চৈত্র পৃ ১৫৮।

প্রায় ৬৫ বৎসর পূর্বে রবীন্দ্রনাথ যে কথা ভাবিয়াছিলেন, তাহা কি আজ আফ্রিকায় নূতনরূপে দেখা দিতেছে না ?

[১৮৯০ আগস্ট। জাহাজে]। "অভাব যত অধিক, জীবিকাসংগ্রাম যত দুরূহ, সভ্যতা যত জটিল, মানবমনের বিচিত্র বৃত্তির আলোড়ন ততই বেশি। দুর্বলের জন্য সুখ নয়—সুখ বলসাধ্য, সুখ দুঃখসাধ্য।... মানসিক জীবনে সুখ...আমাদের দাহ করে।" 'য়ুরোপযাত্রীর ডায়ারি'র খসড়া, বিশ্বভারতী পত্রিকা ১৩৫৬ শ্রাবণ-আশ্বিন, পৃ ১১।

তুলনীয় Toynbee-র মত—

"We have been led to reject the popular assumption that civilizations emerge when environments offer unusually easy conditions of life and to advance an argument in favour of exactly the opposite view."—Somervell, A study of history, p 80

ইতিহাসে এই মতবাদ গ্রীকযুগ হইতে চলিয়া আসিতেছে যে উর্বর নদীমাতৃক দেশই আদিম সভ্যতার উদ্ভব-

১ 'Song of shirt' : এই কবিতা—'Song of the shirt'—ইংরেজ কবি টমাস্ হুড (Thomas Hood ১৭৯৯-১৮৪৫) কর্তৃক রচিত। Punch কাগজের খ্রীষ্টমাস সংখ্যায় (১৮৪৩) প্রকাশিত হয়। দরিদ্রের ক্রন্দন আর্তনাদে ফাটিয়া পড়িয়াছে এই কবিতায়।

কেন্দ্র ; এখনকার ভৌগোলিক তথা ঐতিহাসিকগণ সে-বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করিতেছেন। আসলে the beautiful is difficult এবং high quality involves hard work এই দুইটি কথাই আছে সভ্যতার মূলে। রবীন্দ্রনাথ কি এই মতই এখানে অল্পকথায় বলিয়াছিলেন ?

পৃ ২৪৩—জীবনস্মৃতি। প্রকাশিত ১৩১৯ [১৯১২ জুলাই ২৪]। 'ছিন্নপত্র'ও সমকালীন প্রকাশিত গ্রন্থ। আদি ব্রাহ্মসমাজ প্রেসে মুদ্রিত হয়। এই উভয় গ্রন্থের প্রকাশক নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, শিলাইদহ, নদীয়া।

'ছিন্নপত্রে'র প্রথম আটখানি চিঠি শ্রীশচন্দ্র মজুমদারকে, অবশিষ্ট সকলগুলিই ইন্দিরা দেবীকে লিখিত। প্রথম পত্র ৩০ অক্টোবর ১৮৮৫ ও শেষ পত্র ১৬ ডিসেম্বর ১৮৯৫ তারিখে লিখিত [১৫ কার্তিক ১২৯২ হইতে ২ পৌষ ১৩০২]। ইন্দিরা দেবীকে লিখিত পত্রধারা ১৮৮৭ হইতে ১৮৯৫ সালের মধ্যে।

ছিন্নপত্রে প্রকাশিত হয় নাই, কিন্তু ঐ পত্রধারার অন্তর্গত, এরূপ চিঠি বিশ্বভারতী পত্রিকায় (কার্তিক-পৌষ ১৩৫১—শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৫৩) প্রকাশিত হইয়াছে।

ছিন্নপত্র গ্রন্থে মুদ্রিত পত্রগুলিতে, মূল পত্রের যে সকল অংশ নাই, তাহার অনেক অংশ শারদীয়া আনন্দবাজার পত্রিকায় (১৩৬১) সংকলিত হইয়াছে। এই সকল উপকরণ গ্রন্থাকারে একত্র প্রকাশিত হইলে রবীন্দ্র-মানসের এক পর্বের প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যাইবে।

বিশ্বভারতী পত্রিকায় 'ছিন্নপত্র'-সম্পাদকরা লিখিতেছেন, "১৮৮৭-১৮৯৫ সালে রবীন্দ্রনাথ শ্রীইন্দিরা দেবীকে যে সকল চিঠি লিখিয়াছিলেন, 'ছিন্নপত্র' গ্রন্থখানি প্রধানত তাহারই সংকলন, কেবলমাত্র ৮খানি শ্রীশচন্দ্র মজুমদারকে লেখা। এই সময়ে লিখিত যাবতীয় চিঠি শ্রীইন্দিরা দেবী দুটি খাতায় স্বহস্তে নকল করিয়া রবীন্দ্রনাথকে উপহার দিয়াছিলেন। এই খাতা দুটি অবলম্বন করিয়াই ১৩১৯ (১৯১২) সালে 'ছিন্নপত্র' প্রকাশিত হয়। সম্প্রতি এই খাতা দুইখানি পাওয়া গিয়াছে এবং শান্তিনিকেতন রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত হইয়াছে।"

১৯০৩ সালে (১৩১০ জ্যৈষ্ঠ ৩) আলমোড়া হইতে সতীশচন্দ্র রায়কে এক পত্রে কবি লেখেন, "চিঠির সেই দুইখানি খাতা মোমজাম দিয়া মজবুত করিয়া মুড়িয়া রেজেস্ট্রী করিয়া পাঠাইয়ো।" ছিন্নপত্র প্রকাশিত হইবার পূর্বে এই খাতা হইতে অংশ নির্বাচন করিয়া কবি 'বিচিত্র প্রবন্ধ' (১৩১৪ বৈশাখ) (জলেস্থলে গ্রন্থে) সন্নিবেশিত করেন।

শিলাইদহ হইতে ১১ মার্চ ১৮৯৫ [২৮ ফাল্গুন ১৩০১] তারিখে শ্রীইন্দিরা দেবীকে লিখিত একখানি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গক্রমে এই চিঠিগুলি সম্বন্ধে যে মন্তব্য করিয়াছিলেন তাহা উদ্ধৃত হইতেছে: "আমার বোধ হয় বহুকাল থেকে তোকে আমি এ সব জায়গা থেকে যে সকল চিঠি লিখেছি সকলেরই ভাবখানা এক। বারবার আমি একই কথা একই আগ্রহকে প্রায় একই ভাষায় প্রকাশ করেছি—আমার আর অন্য উপায় নেই—কারণ, আমি ঠিক একই ভাব প্রতিবারেই নতুন করে অনুভব করি। আমার অনেক সময় ইচ্ছা করে তোকে যে সমস্ত চিঠি লিখেছি সেইগুলো নিয়ে পড়তে পড়তে আমার অনেক দিনকার সঞ্চিত অনেক সকাল দুপুর সন্ধ্যার ভিতর দিয়ে আমার চিঠির সরু রাস্তা বেয়ে আমার পুরাতন পরিচিত দৃশ্যগুলির মাঝখান দিয়ে চলে যাই। কতদিন কত মুহূর্তকে আমি ধরে রাখবার চেষ্টা করেছি—সেগুলো বোধ হয় তোর চিঠির বাক্সর মধ্যে ধরা আছে—আমার চোখে পড়লেই আবার সেই সমস্ত দিন আমাকে ঘিরে দাঁড়াবে। ওর মধ্যে যা কিছু আমার ব্যক্তিগত জীবন সংক্রান্ত সেটা তেমন বহুমূল্য নয় কিন্তু যেটাকে আমি বাইরের থেকে সঞ্চয় করে এনেছি, যেটা এক-একটা দুর্লভ সৌন্দর্য, দুর্মূল্য সম্ভোগের সামগ্রী, যেগুলো আমার জীবনের অসামান্য উপার্জন—যা হয়ত আমি ছাড়া আর কেউ দেখেনি, যা কেবল আমার সেই চিঠির পাতার মধ্যে রয়েছে জগতের আর কোথাও নেই—তার মর্যাদা আমি যেমন বুঝব এমন বোধহয় আর কেউ বুঝবে না। আমাকে একবার তোর চিঠিগুলো দিস্, আমি কেবল ওর থেকে আমার সৌন্দর্যসম্ভোগগুলো একটা খাতায় টুকে নেব—কেননা যদি দীর্ঘকাল বাঁচি

তাহলে এক সময় নিশ্চয়ই বুড়ো হয়ে যাব—তখন এই সমস্ত দিনগুলো স্মরণের এবং সান্ত্বনার সামগ্রী হয়ে থাকবে—তখন পূর্বজীবনের সমস্ত সঞ্চিত সুন্দর দিনগুলির মধ্যে তখনকার সন্ধ্যার আলোকে ধীরে ধীরে বেড়াতে ইচ্ছা করবে। তখন আজকেকার এই পদ্মার চর এবং স্নিগ্ধ শান্ত বসন্ত জ্যোৎস্না ঠিক এমনি টাট্‌কাভাবে ফিরে পাব—আমার গদ্যে পদ্যে কোথাও আমার সুখদুঃখের দিনরাত্রিগুলি এরকম করে গাঁথা নেই।" বিশ্বভারতী পত্রিকা ১৩৫২ শ্রাবণ-আশ্বিন পৃ ১৪।

পৃ ২৬৩—ইন্দিরা দেবী বলেন যে তাঁহার যতদূর মনে আছে 'রাজা ও রাণী'র পারিবারিক অভিনয় বির্জিতলার বাড়িতে হয়, পার্কস্ট্রীটের বাসায় নহে।

পৃ ২৬৯ পা-টী ২— 'প্রতীক্ষা'। প্রথম খসড়া ১৬ অগ্রহায়ণ ১২৯৯, রাজসাহীতে। নাটোরে ২০ অগ্রহায়ণ পুনর্লিখিত। শিলাইদহে ২৭ অগ্রহায়ণ এই কবিতাটির শেষ রূপ দান করেন। দ্র সোনার তরী ১৩৫৭-সং, পৃ ৭৯।

পৃ ২৮১—'উড়িষ্যা হইতে কবি কলিকাতায় ফিরিয়াছিলেন ফাল্গুনের (১২৯৯) শেষাশেষি।' ইন্দিরা দেবীকে ৪ চৈত্র ১২৯৯ (১৮৯৩ মার্চ ১৬) লিখিতেছেন, "অনেকদিন পরে আজ একটুখানি রোদ্দুর দেখা দিয়েছে—···মনে কর্, চৈত্রমাস পড়েছে তবু এবার কিছু গরম পড়েনি—দিনের বেলায় চাপকান জোব্বা পরে থাকি এবং রাত্রিকালে শালকম্বল মুড়ি দিই—"। বিশ্বভারতী পত্রিকা, ১৩৫১ মাঘ-চৈত্র পৃ ১৫০। ইহার পর কবি শিলাইদহ ও সেখান হইতে রাজসাহী যান। দ্র রবীন্দ্র-জীবনী ১ম খণ্ড পৃ ২৮৪।

কলিকাতায় ফিরিয়া (১২৯৯ চৈত্র ২৫) ৬ এপ্রিল (১৮৯৩) ইন্দিরা দেবীকে লিখিতেছেন, "মোহিনীর সঙ্গে আজকাল আমার মাঝে মাঝে নানা বিষয়ে কথাবার্তা হয়, আমার বড়ো ভালো লাগে। এই রকম আলোচনা করবার জন্যে আমার মন অনুক্ষণ তৃষিত হয়ে থাকে। এই হতভাগ্য জনশূন্য দেশে মনটা যেন নিশিদিন উপবাসী হয়ে আছে—কেবল ভিতর থেকে আপনাকে আপনি আহার করচে।···আজ সকালে প্রিয়বাবুর ওখানে গিয়েছিলুম, অনেকটা যেন আহার পান করে আসা গেল।" বিশ্বভারতী পত্রিকা ১৩৫১ মাঘ-চৈত্র পৃ ১৫০-৫১। কবির জীবনে আমরা বরাবর লক্ষ্য করিয়া আসিয়াছি intellectual কথাবার্তা বলিতে তাঁহার অপার আনন্দ ছিল। মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায় দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জামাতা, শাস্ত্রবিৎ সুপণ্ডিত, ইনি শ্রীতপনমোহন চট্টোপাধ্যায়ের পিতা।

পৃ ৩০৩—বিদেশী অতিথি ও দেশীয় আতিথ্য। সাধনা ১৩০১ শ্রাবণ [১৮৯৪ অগস্ট] পৃ ২৫০-৬০। হামারগ্রেন ১৮৯৩ এর শেষ দিকে আসিয়া থাকিবেন।

পৃ ৩০৭—নবীনচন্দ্র সেন ও রবীন্দ্রনাথ। বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যুর (১৩০০ চৈত্র ২৬) পর কলিকাতায় যে শোকসভা হয়, সেখানে রবীন্দ্রনাথ একটি প্রবন্ধ পাঠ করিতে উদ্‌যোগী হইয়া নবীনচন্দ্রকে এই সভার অধিনায়কত্ব করিতে অনুরোধ করেন। সভা করিয়া শোক প্রকাশ করা ভারতীয় বিধি নহে বলিয়া নবীনচন্দ্র সেন (দ্র আমার জীবন, ৫ম খণ্ড) অস্বীকৃত হন। এই প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য, রবীন্দ্র-রচনাবলী নবম খণ্ডে মুদ্রিত 'শোকসভা' প্রবন্ধ, ও 'আধুনিক সাহিত্যে'র গ্রন্থপরিচয়।

তার তিন মাস পরে রবীন্দ্রনাথ (বয়স ৩৩) নবীনচন্দ্র সেনের নিকট হইতে এক পত্র পান। তখন নবীনচন্দ্র রাণাঘাট মহকুমার হাকিম (১২৯৯ ফাল্গুন ২৮ হইতে ১৩০২ বৈশাখ ১৭ । 1893 March 10—1896 April 29)। রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহে ছিলেন। ইতিমধ্যে ১৩০১ সালে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ প্রতিষ্ঠিত হইল—প্রথমে নবীনচন্দ্র ও পরে রবীন্দ্রনাথ এই দুইজনে সহকারী সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছিলেন। নবীনচন্দ্র রাণাঘাটে মহকুমার হাকিম থাকিতে থাকিতে কৃত্তিবাসের ভিটা ঘুরিয়া দেখিয়া আসেন এবং আদিকবির স্মৃতিরক্ষার জন্য হীরেন্দ্রনাথ দত্ত ও বঙ্গবাসী সাপ্তাহিকের সম্পাদকের নিকট পত্র দেন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ অগ্রণী হইয়া এ বিষয়ে বিজ্ঞাপনপত্র প্রকাশ করেন; সেই পত্রে স্বাক্ষরকারী হিসাবে নবীনচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের নাম যথাক্রমে ছিল। রবীন্দ্রনাথের নাম নিম্নে

নামের নিচে দেওয়া হইয়াছে বলিয়া নবীনচন্দ্র আক্ষেপ প্রকাশ করিয়া রবীন্দ্রনাথকে পত্র দেন। সেই পত্রের জবাবে রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহ হইতে ১৩০১ শ্রাবণ ২৫ (১৮৯৪ অগস্ট ৯) নবীনচন্দ্র সেনকে রাণাঘাটে লেখেন, "যদিও আমি বয়সে আপনার অপেক্ষা অনেক ছোটো হইব, তথাপি দৈবক্রমে বঙ্গসাহিত্যের ইতিহাসে আপনার নামের নিম্নে আমারই নাম পড়িয়াছে—আপনি নবীন কবি, আমি নবীনতর। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদেও ঐতিহাসিক পর্যায় রক্ষা করিয়া আপনার নিম্নে আমার নাম লিপিবদ্ধ হইয়াছে, অতএব সর্বসম্মতিক্রমে আপনার নামের নিম্নে নাম স্বাক্ষর করিবার অধিকার আমি প্রাপ্ত হইয়াছি— আশা করি ইতিহাসের শেষ অধ্যায় পর্যন্ত এই অধিকারটি আমি রক্ষা করিতে পারিব।"

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সহকারী সভাপতি রূপে উভয়ের মধ্যে দেখাসাক্ষাৎ এখনো হয় নাই। ১৪ শ্রাবণ পরিষদের অধিবেশনে রবীন্দ্রনাথ উপস্থিত হন; তিনি আশা করিয়া গিয়াছিলেন যে নবীনচন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ হইবে। শিলাইদহ হইতে (২৯ শ্রাবণ) ১৮৯৪ অগস্ট ১৩ এর পত্রে কবি বলেন যে তিনি একদিন নবীনচন্দ্রের আতিথ্য সৌভাগ্যস্বরূপে গ্রহণ করিবেন। ইহার পর ২২ অগস্ট (৭ ভাদ্র) তারিখে নবীনচন্দ্রকে কবি জানান যে কোনো এক রবিবারে তিনি রাণাঘাটে যাইবেন।

কবি কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন ১০ ভাদ্র। ১৪ ভাদ্র ইন্দিরা দেবীকে একপত্রে লিখিতেছেন যে তিনি একটি নূতন গানে সুর দিতেছেন 'কীর্তনের ধরনের ভৈরবী।' (ছিন্নপত্র, বিশ্বভারতী পত্রিকা, ৩য় বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা ১৩৫২ পৃ ২৩২)। এই গানটিকে 'মেঘ ও রৌদ্র' গল্পের অন্তর্গত করেন। মেঘ ও রৌদ্রের সূত্রপাত করেন কিছুকাল পূর্বে; ১৩০১ আষাঢ় ১৪ লিখিতেছেন, "আজ সকালবেলায়···গিরিবালা নাম্নী···একটি···মেয়েকে আমার কল্পনারাজ্যে অবতারণ করা গেছে। সবেমাত্র পাঁচ লাইন লিখেছি।" গল্পটি সাধনায় প্রকাশিত হয় ১৩০১ আশ্বিন-কার্তিক সংখ্যায়। এ গল্পের গান যেটির কথা ছিন্নপত্রে লিখিয়াছেন সেইটি হইতেছে—'এস এস ফিরে এস, বঁধুহে ফিরে এস।'

কবিকে ২১ ভাদ্র পুনরায় সাহাজাদপুরে দেখি। অর্থাৎ ১৪ ভাদ্র ও ২১ ভাদ্রের মধ্যে কবি রাণাঘাটে আসেন; ফিরিয়া গিয়া কয়েকদিন পরে ১৯ ভাদ্র নবীনচন্দ্রকে ধন্যবাদপূর্ণ পত্র দেন। আমাদের মনে হয় ১৩০১ ভাদ্র ১৮ (১৮৯৪ (সেপ্টেম্বর ২ রবিবার রবীন্দ্রনাথ রাণাঘাটে আসিয়া নবীনচন্দ্রের অতিথি হইয়াছিলেন, এবং যে 'একটি নূতন কীর্তনের গান রচনা করিয়া আনিয়াছেন' সেইটি গাহিয়া শোনান। (আমার জীবন ৪র্থ খণ্ড পৃ ২৬৮) এই গানটি রবীন্দ্রনাথ তাঁহাকে অনুলিপি করিয়া পাঠান; গানটি পূর্বোক্ত 'এস এস ফিরে এস, বঁধুহে ফিরে এস।'

সমসাময়িকের চোখে রবীন্দ্রনাথ (৩৩) কিরূপ ছিলেন, তাহা নবীনচন্দ্রের 'আমার জীবন' (৪র্থ খণ্ড) হইতে উদ্ধৃতি পাঠ করিলেই বুঝা যাইবে। রবীন্দ্রনাথ "তাঁহার জমিদারি কার্যে কুষ্টিয়া যাইবার পথে একদিন প্রাতে নিমন্ত্রিত হইয়া ১০টার ট্রেনে দয়া করিয়া রাণাঘাটে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন [১৮৯৪ সেপ ২]। আমার একজন আত্মীয় তাঁহাকে স্টেশন হইতে অভ্যর্থনা করিয়া আনিলে, তিনি যখন গাড়ী হইতে নামিলেন, দেখিলাম সেই ১৮৭৬ খৃস্টাব্দের নবযুবকের আজ পরিণত যৌবন। কি সুন্দর, কি শান্ত, কি প্রতিভান্বিত দীর্ঘাবয়ব। উজ্জ্বল গৌরবর্ণ, ফুটনোন্মুখ পদ্মকোরকের মত দীর্ঘমুখ, মস্তকের মধ্যভাগ বিভক্ত কুঞ্চিত ও সজ্জিত ভ্রমরকৃষ্ণ কেশশোভা; কুঞ্চিত অলকা-শ্রেণীতে সজ্জিত সুবর্ণ দর্পণোজ্জ্বল ললাট; ভ্রমরকৃষ্ণ গুম্ফ ও খর্ব শ্মশ্রুশোভান্বিত মুখমণ্ডল; কৃষ্ণপক্ষযুক্ত দীর্ঘ ও সমুজ্জ্বল চক্ষু; সুন্দর নাসিকায় মার্জিত সুবর্ণের চশমা। বর্ণ-গৌরব সুবর্ণের সহিত দ্বন্দ্ব উপস্থিত করিয়াছে। মুখাবয়ব দেখিলে চিত্রিত খৃস্টের মুখ মনে পড়ে। পরিধানে সাদা ধুতি, সাদা রেশমী পিরান ও রেশমী চাদর। চরণে কোমল পাদুকা, ইংরাজী পাদুকার কঠিনতার অসহতাব্যঞ্জক।" (পৃ ২৬৪-৭৪) বিশ্বভারতী-পত্রিকা ১৩৫৩ মাঘ-চৈত্র সংখ্যায় নবীনচন্দ্র সেনকে লিখিত কয়েকখানি পত্র ও পাদটীকায় 'আমার জীবন' হইতে উদ্ধৃতি আছে।

পৃ ৩১০—গাছের ছাপ Tree-daubing. দ্র L. S. S. O' Malley. Gaya District Gazetteer, 1919.

p 104 : for a fuller discussion of the subject he refers to an article in the Calcutta Review 1898 January.

পৃ ৩১৫ পা-টী-২—আব্দারের আইন। বিশ্বভারতী গ্রন্থাগারে রক্ষিত 'সাধনা' পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের রচনা বলিয়া দাগ দেওয়া আছে। উহা অস্বাক্ষরিত। কোনো রচনা-সংগ্রহে উহা গৃহীত হয় নাই।

পৃ ৩১৮ পা-টী ৩—'ব্রাহ্মণ' কবিতা। অধ্যাপক উমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য 'জবালা' প্রবন্ধে লিখিয়াছেন, "কবির ভাষায় জবালা পুত্রকে ঠিকই বলিয়াছিলেন, জন্মেছিস ভর্তৃহীনা জবালার ক্রোড়ে।" প্রবাসী ১৩৪২ পৌষ পৃ ৪১১-১৪।

পৃ ৩১৮—'নিশীথে' গল্প সম্বন্ধে লিখিতেছেন, "গল্পটা সাধনার অধিকাংশ পাঠকের বিশেষ ভালো লেগে গিয়েছিল, সেই কারণে সাহিত্যের [১৩০১ ফাল্গুন] সমালোচনা পড়ে অনেকে চটে গেছে।" ছিন্নপত্র ১৮ মার্চ [১৮৯৫], বিশ্বভারতী পত্রিকা ১৩৫২ পৃ ৭৫-৭৬।

পৃ ৩২০—ক্ষুধিত পাষাণ। ছিন্নপত্রের [১৫ আষাঢ় ১৩০১] সাজাদপুর ১৮৯৫ জুন ২৮ তারিখের রচনা হইতে যে অংশ উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা 'ক্ষুধিত পাষাণ' সম্বন্ধে প্রযুক্ত হইতে পারে না বলিয়া পুলিনবিহারী সেন পত্র দিয়াছেন। তিনি মনে করেন সাধনায় প্রকাশিত (১৩০২ ভাদ্র-কার্তিক) 'অতিথি' গল্পের সঙ্গেই উহা মেলে। দ্রষ্টব্য শ্রীপ্রমথনাথ বিশীর 'রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্প', 'তথ্যপঞ্জী' বিভাগ, পৃ ৬৩।

সতীশচন্দ্র রায়কে ১৩০৯ চৈত্র মাসে হাজারিবাগ হইতে লিখিতেছেন, "প্রবাসীতে যে সাহিবাগের ছবি বাহির হইয়াছে এই বাড়িতেই আমি বাস করিয়াছি এবং ইহাই 'ক্ষুধিত পাষাণে'র সেই বাড়ি।" বিশ্বভারতী পত্রিকা ১৩৫৫ মাঘ-চৈত্র পৃ ১২৫।

পৃ ৩২২—"সাধনা গেছে আপদ গেছে—এই চার বৎসরে আমাদের চার হাজার টাকার বেশি দণ্ড দিতে হয়েছে।" শ্রীশচন্দ্র মজুমদারকে লিখিত পত্র, বিশ্বভারতী পত্রিকা ১৩৭৮ ১ম সংখ্যা পৃ ২।

পৃ ৩২৪—'উর্বশী' কবিতা শিলাইদহের জলপথে নৌকায় রচিত, ১৮৯৫ ডিসেম্বর ৮ লেখা (১৩০২ অগ্রহায়ণ তারিখে)। বিশ্বভারতী পত্রিকা।

পৃ ৩২৬—'নদী' ১৩০২ মাঘ। অবনীন্দ্রনাথ 'নদী' বই-এর ছাপা পাতার উপর কতকগুলি ছবি আঁকেন। ছবিগুলি তখন মুদ্রিত হয় নাই। অবনীন্দ্রনাথের দৌহিত্র মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায় অবনীন্দ্রনাথের কাগজপত্রের মধ্যে এই চিত্রিত 'নদী' এক খণ্ড পান। উহা ২১ খানি ছবি সহ শারদীয়া আনন্দবাজার পত্রিকায় (১৩৬১) প্রকাশিত হইয়াছে।

পৃ ৩২৭—জীবনদেবতা সম্বন্ধে। কবি আলমোড়ায়। F. W. K. Myersএর Human Personality and its survival after death নামে গ্রন্থ খানি পড়িয়া সতীশচন্দ্র রায়কে শান্তিনিকেতনে লিখিতেছেন [১৩১০ জ্যৈষ্ঠ ৩], "মনস্তত্ত্বের অপরূপ রহস্যের মধ্যে তলাইয়া গেছি। আশ্চর্য এই যে, আমার কাব্যের মধ্যে কবিতার ভাষায় আভাসে ইঙ্গিতে নানাস্থানেই আমি এই সকল কথা বলিয়াছি। আমাদের গোচরাতীত চেতনাকে ও ইন্দ্রিয়াতীত জগৎকে আমি নানাভাবে স্পর্শ করিয়াছি এবং তাহাদের বার্তা নানা ছন্দে দিবার চেষ্টা করিয়াছি। অধিকাংশ সময়েই এই প্রয়াস আমার নিজের ইচ্ছাকৃত নহে—আমার অন্তঃপুরবাসিনী 'কৌতুকময়ী' আমাকে দিয়া কখন কী লিখাইয়া লইয়াছেন তাহা আমাকে তখন জানিতেও দেন নাই।" একখানি চিঠি, বিশ্বভারতী পত্রিকা ১৩৫৪ মাঘ-চৈত্র পৃ ২০৩।

পৃ ৩৩৫—কাব্যগ্রন্থাবলী। শ্রীসত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত। আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে শ্রীকালিদাস চক্রবর্তী দ্বারা মুদ্রিত। ১৫ই আশ্বিন ১৩০৩ পৃ ৪৭৬।

সূচী : কৈশোরক পৃ ১-১৮ [কবির 'পনেরো হইতে আঠারো বৎসর বয়সের মধ্যে রচিত' কবিতার চয়ন]। ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী ১৯-২৭ [ভানুসিংহের অনেকগুলি কবিতা লেখকের ১৫।১৬ বৎসর বয়সের লেখা…কতকগুলি পরবর্তী-

কালের লেখাও আছে]। বাল্মীকি-প্রতিভা (গীতি-নাট্য) ২৮-৩৬। সন্ধ্যাসঙ্গীত ৩৭-৫৬। প্রভাতসঙ্গীত ৫৭-৭৭। ছবি ও গান ৭৮-৯১। প্রকৃতির প্রতিশোধ ৯২-১০৯। কড়ি ও কোমল ১১০-৩৯। মায়ার খেলা (গীতি-নাট্য) ১৪০-৫১। মানসী ১৫২-২০০। রাজা ও রাণী ২০১-৪৬। বিসর্জন ২৪৭-৭৯। চিত্রাঙ্গদা ২৮০-৯৫। সোনার তরী ২৯৬-৩৪৭। বিদায় অভিশাপ ৩৪৮-৫২। চিত্রা ৩৫৩-৯০। মালিনী[১] ৩৯১-৪০৬। চৈতালি ৪০৭-২৮। গান ৪২৯-৪৭। ব্রহ্মসঙ্গীত ৪৪৭-৭০। অনুবাদ[২] ৪৭১-৭৬।

এই কাব্যগ্রন্থাবলীতে যেসব গ্রন্থ সন্নিবেশিত হয়, সেগুলি সবই প্রায় সম্পাদিত অর্থাৎ কবি যে কবিতা-গুলিকে ভালো বলিয়া পছন্দ করিয়াছিলেন সেইগুলিই ছাপা হয়। বিসর্জন তো পুনর্লিখিত হয়। অনুবাদ অংশ পৃথক করিয়া দেন। রবীন্দ্রনাথ এ পর্যন্ত সংস্কৃত, পালি, প্রাকৃত, মারাঠি, মৈথিলী ও ইংরেজি হইতে যে সব কবিতা বা গ্রন্থাংশ তর্জমা করিয়াছেন, তাহার একটি পৃথক খণ্ড প্রকাশিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। শোনা যাইতেছে এই ধরণের একখানি গ্রন্থ মুদ্রিত হইবে।

কাব্যগ্রন্থাবলীর আকার ছিল একখানি বড়ো টালির মতো। লৌকিকভাবে অনেকে এই সংস্করণকে 'টালি' এডিশন বলিত। এই সংস্করণ তিন প্রকারে প্রকাশিত হয়। একটি সংস্করণ সচিত্র, অপরটি সাধারণ। এ ছাড়া মূল ফোটোগ্রাফ সহ আর-একটি সংস্করণ প্রকাশিত হয় বলিয়া জানা যায়।

পৃ ৩৩৫—রবীন্দ্রনাথ কার্সিয়ঙে ছিলেন। সেখান হইতে ১৩০৩ কার্তিক ৭ তারিখে অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় সংগৃহীত 'মেয়েলি ব্রত' নামে ক্ষুদ্র গ্রন্থের একটি ভূমিকা লিখিয়া পাঠান। অঘোরনাথ কবির 'সাধনা'য় প্রকাশিত লোকসাহিত্য বিষয়ক প্রবন্ধ পাঠ করিয়া উৎসাহিত হন ও এই সংগ্রহকার্যে ব্রতী হন।

পৃ ৩৪৮—ঢাকায় বেঙ্গল প্রভিন্সিয়াল কন্‌ফারেন্স সম্বন্ধে নিম্নলিখিত সংবাদ শ্রীপ্রদ্যোতকুমার সেনগুপ্ত বিলাতে প্রকাশিত কংগ্রেসী পত্রিকা Indiaর ১৮৯৮ ১জুলাই'র সংখ্যা হইতে সংগ্রহ করিয়া পাঠাইয়াছেন :

"The fourth Provincial conference of Bengal held at Dacca on May 31 and June 1 and 2 appears to have been most successful. The number of people present was about fifteen hundred. About 20 European gentlemen, a dozen Mohammedan gentlemen and a number of Hindus took their seats on the dias. Mr. Kemp, Editor of Bengal Times and an uncompromising opponent of the Congress party is reported to have been lead away by the proceedings and to have made a very good speech on the plague, voting the popular views. The talented Rabindranath, one of the greatest of the living poets of Bengal, sang a national anthem in Bengali. Mr. Guru Parsad Sen welcomed the delegates and the Hon. Kalicharan Banerjee being voted to the chair gave an eloquent and stirring address repeatedly inturrupted by cheers." (পাটনার সিংহ লাইব্রেরি হইতে সংগৃহীত)।

পৃ ৩৫৪পা-টী ১—শুদ্ধ পাঠ—"রেশমের থান পাঠাইয়াছিলেন।"

পৃ ৩৫৫—'ঐতিহাসিক চিত্র', অক্ষয় কুমার মৈত্রেয় সম্পাদিত পত্রিকা। রবীন্দ্রনাথ ইহার সূচনা লিখিয়া দেন। দ্র রবীন্দ্র-রচনাবলী ৯ম খণ্ড পৃ ৫০৬-১২। এই রচনায় ইতিহাস রচনা সম্বন্ধে যে সকল মন্তব্য করেন, তাহা ভাবী

১ এই দুইটি প্রথম গ্রন্থাকারে মুদ্রিত হইল।

২ কড়ি ও কোমল এবং ছবি ও গানের অন্তর্ভুক্ত অনুবাদগুলি সংগৃহীত।

ইতিহাস-রচয়িতাদের পথনির্দেশে সহায়তা করিতে পারে। দ্র ধূর্জটি প্রসাদ মুখোপাধ্যায়, কবির নির্দেশ, শারদীয়া দেশ ১৩৬২ পৃ ৪১।

পৃ ৩১৬—লরেন্স। "এক পাগলা মেজাজের চালচুলোহীন ইংরেজ শিক্ষক হঠাৎ গেল জুটে। তার পড়াবার কায়দা খুবই ভালো, আরো ভালো এই যে কাজে ফাঁকি দেওয়া তার ধাতে ছিল না। মাঝে মাঝে মদ খাবার দুর্নিবার উত্তেজনায় সে পালিয়ে গেছে কলকাতায়, তার পর মাথা হেট করে ফিরে এসেছে, লজ্জিত অনুতপ্ত চিত্তে। কিন্তু কোনোদিন শিলাইদহে মত্ততায় আত্মবিস্মৃত হয়ে ছাত্রদের কাছে শ্রদ্ধা হারাবার কোনো কারণ ঘটায় নি।" আশ্রম-বিদ্যালয়ের সূচনা, প্রবাসী ১৩৪০ আশ্বিন। দ্র আশ্রমের রূপ ও বিকাশ ১৩৫৮ পৌষ সংস্করণ।

সংযোজন ও সংশোধন

দ্বিতীয় খণ্ড

পৃ ৭—স্বামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ। "আধুনিক কালের ভারতবর্ষে বিবেকানন্দই একটি মহৎ বাণী প্রচার করেছিলেন, সেটি কোনো আচারগত নয়। তিনি দেশের সকলকে ডেকে বলেছিলেন তোমাদের সকলের মধ্যে ব্রহ্মের শক্তি,—দরিদ্রের মধ্যে দেবতা তোমাদের সেবা চান। এই কথাটি যুবকদের চিত্তকে সমগ্রভাবে জাগিয়েচে। তাই এই বাণীর ফল দেশের সেবায় আজ বিচিত্রভাবে বিচিত্র ত্যাগে ফলেচে। তাঁর বাণী মানুষকে যখনি সম্মান দিয়েচে তখনি শক্তি দিয়েচে। সেই শক্তির পথ কেবল একঝোঁকা নয়, তা কোনো দৈহিক প্রক্রিয়ার পুনরাবৃত্তির মধ্যে পর্যবসিত নয়, তা মানুষের প্রাণমনকে বিচিত্রভাবে প্রাণবান করেচে। বাংলাদেশের যুবকদের মধ্যে যেসব দুঃসাহসিক অধ্যবসায়ের পরিচয় পাই তার মূলে আছে বিবেকানন্দের সেই বাণী যা মানুষের আত্মাকে ডেকেছে, আঙুলকে নয়।" ৯ এপ্রিল ১৯২৮ সালে ডাঃ নরসীলাল সরকারের কোনো পত্রের উত্তরে অমিয়চন্দ্র চক্রবর্তী যে পত্র দেন, তাহারই অনুক্রমণিকায় কবি স্বয়ং এইটি লেখেন। প্রবাসী ১৩৩৫ জ্যৈষ্ঠ পৃ ২৮৫-৮৬।

রোঁমা রোলার সহিত কবির সাক্ষাতের সময় কবি স্বামীজি সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন:

Tagore : I have never been able to love the God of the Old Testament. He is the Lord with the rod.

Rolland : But even in the New Testament the same motive occurs. Jesus is the Lamb and the Lord sacrificed for the sake of humanity. The emphasis is wrongly placed and the attitude is not spiritual in the large sense.. Do you think that Vivekananda in India tried to check the abuses in this line ?

Tagore : So far as I can make out, Vivekananda's idea was that we must accept the facts of life···We must rise higher in our spiritual experience in the domain where neither good nor evil exists. It was because Vivekananda tried to go beyond good and evil that he could tolerate many religious habits and customs which have nothing spiritual about them. My attitude toward truth is different. Truth cannot afford

to be tolerant where it faces positive evil, it is like sunlight which makes the existence of evil germs impossible. As a matter of fact, today Indian religious life suffers from the lack of a wholesome spirit of intolerance which is characteristic of creative religion. Even a vogue of atheism may do good to India to-day, for I know that my country will never accept atheism as her permanent faith. It will sweep away all obnoxious undergrowths and the tall trees will remain intact. At the present moment even a gift of negation from the West, will be of value to a large section of Indian people. —*Rolland and Tagore*, p 100.

পৃ ১৬—সঞ্জীবচন্দ্র বঙ্কিমচন্দ্রের কনিষ্ঠ নহেন,—মেজদাদা। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এই বিষয়ে লেখকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

পৃ ১৭—চন্দ্রনাথ বসুর সহায়তায় শ্রীশচন্দ্র ১২৯০ সালে বঙ্গদর্শনের মাত্র চারটি সংখ্যা (কার্তিক-মাঘ) প্রকাশ করিয়াছিলেন। "সেই বৎসরেই তিনি সাব্‌-ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের পদ পাইয়া বিহারে চলিয়া যান" বলিয়াই যে "পত্রিকা চালাইতে পারিলেন না"—একথা ঠিক নহে। অগ্রহায়ণ-পৌষ সংখ্যায় চন্দ্রনাথ বসুর 'পশুপতি সম্বাদ' স্থান পাওয়ায় বঙ্কিমচন্দ্র ক্ষুব্ধ হইয়াছিলেন। এই কারণে তিনি মাঘ সংখ্যার পর বঙ্গদর্শনের আর কোনো সংখ্যা প্রকাশ করিতে দেন নাই। ইহার প্রায় দুই বৎসর পরে ১২৯২ সাল বা ইং ১৮৮৫ সনের শরৎকালে শ্রীশচন্দ্র সাবডেপুটি রূপে প্রথমে নদীয়ায় পরে বিহারে প্রেরিত হন। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ছিন্নপত্রের ২য় সংখ্যক পত্র দ্রষ্টব্য।—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, লেখকের নিকট পত্র ১০-৭-৫১।

পৃ ১৭—গল্পগুচ্ছ। ১৯০১ সালে মজুমদার লাইব্রেরি হইতে ২ খণ্ডে প্রকাশিত গল্পগুচ্ছে ৫৩টি, ১৯০৮-০৯ সালে ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস হইতে ৫ খণ্ডে প্রকাশিত গল্পগুচ্ছে ৫৭টি, বিশ্বভারতী হইতে ৩ খণ্ডে প্রকাশিত গল্পগুচ্ছে ৮৪টি গল্প ছিল। অতঃপর 'তিন সঙ্গী'র ৩ টি গল্প, এবং গ্রন্থ মধ্যে সন্নিবেশিত হয় নাই অথচ সাময়িক পত্রিকাতে আছে সেরূপ গল্প মৃত্যুর পূর্বে মুদ্রিত 'বদনাম' (প্রবাসী), মৃত্যুর পর 'প্রগতি সংহার (আনন্দবাজার পত্রিকা) 'শেষ কথা' (বিশ্বভারতী পত্রিকা) বাহির হয়। দ্রষ্টব্য প্রমথনাথ বিশীর 'রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প' গ্রন্থের অন্তর্গত পুলিনবিহারী সেন-কর্তৃক সংকলিত 'তথ্যপঞ্জী'। শান্তিনিকেতন হইতে প্রকাশিত 'ঋতুপত্র' নামক দ্বিমাসিক পত্রিকায় (১৩৬২, ২য় সংখ্যা) রবীন্দ্রনাথের 'মুসলমানীর গল্প' নামে একটি গল্প প্রকাশিত হইয়াছে। দ্র দেশ ১৩৬২ ভাদ্র ৩১; 'নির্বাণ' গ্রন্থ।

পৃ ১৯—ঐতিহাসিক গিজো (Guizot)-র সভ্যতার ইতিহাস (*Historie de la civilisation en Europe* 1828) এই সময়ে সুপ্রসিদ্ধ ছিল; উহার ইংরেজি তর্জমা হইয়াছিল। ১৩১৮ সালে স্বর্গীয় অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার পাশ্চাত্য সাহিত্য হইতে বঙ্গভাষায় গ্রন্থাদি সংকলন ও অনুবাদ করিবার জন্য ধনভাণ্ডার স্থাপন করেন। রিপন কলেজের অধ্যক্ষ রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ এই ধনভাণ্ডারের শর্তানুযায়ী গিজো প্রণীত য়ুরোপীয় সভ্যতার ইতিহাস বাংলায় অনুবাদ করেন। উহা বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ হইতে প্রকাশিত হয় ১৩৩৩ সালে। ইংরেজি তর্জমা বিশ্বভারতী গ্রন্থাগারে আছে এবং কবি আমাদের এই বই পড়িবার জন্য উৎসাহিত করেন মনে আছে।

পৃ ২৭—বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'ব্রহ্মবিদ্যালয়' পরিকল্পনা। ১৩০৪ সালে পরিকল্পিত ব্রহ্মবিদ্যালয়ের তিনি যে নিয়মাবলীর খসড়া করেন তাহা হইতে উদ্ধৃত হইল: [বলেন্দ্রনাথের হাতে লেখা পাণ্ডুলিপি হইতে গৃহীত]

১। শান্তিনিকেতন ব্রহ্মবিদ্যালয়ে প্রবেশিকা পরীক্ষার উপযোগী করিয়া অধ্যাপন করা হইবে।

২। বিদ্যালয় ছয় শ্রেণীতে বিভক্ত হইবে।

৩। আপাততঃ দশজন ছাত্র বিনাব্যয়ে বিদ্যালয়ে থাকিয়া আহার ও শিক্ষালাভ করিতে পারিবেন।

৪। আহার্যের ব্যয়স্বরূপ মাসিক ১০৲ দিলে আরও ২০ জন ছাত্রকে বিদ্যালয়ে লওয়া যাইতে পারিবে।

৫। শান্তিনিকেতন আশ্রমের ট্রস্টীগণ ব্যতীত আরও চারজন সভ্যকে লইয়া বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ সমিতি গঠিত হইবে। প্রথম অধ্যক্ষ নির্বাচনে আশ্রমের ট্রস্টীগণের কর্তৃত্ব থাকিবে। তৎপরে কোনো অধ্যক্ষ অবসর গ্রহণ করিলে অবশিষ্ট অধ্যক্ষেরা মিলিয়া অধ্যক্ষ নির্বাচন করিয়া লইবেন।

৬। অধ্যক্ষ সমিতি ব্রাহ্মধর্মানুমোদিত শিক্ষাপ্রণালী এবং শান্তিনিকেতন আশ্রমের নিয়মাবলী সম্পূর্ণরূপে রক্ষা করিয়া বিদ্যালয়ের কার্য পরিচালনা করিবেন।

৭। শান্তিনিকেতন আশ্রমের ট্রস্টীগণের মধ্যে একজন এই বিদ্যালয়ের সম্পাদক হইবেন। সম্পাদক অধ্যক্ষ সভার অনুমতি লইয়া বিদ্যালয়ের কার্য পরিদর্শন হিসাব পরীক্ষা শিক্ষক ও কর্মচারী নিয়োগ ও পরিবর্তন ছাত্র নির্বাচন পুস্তক শিক্ষাপদ্ধতি নির্ধারণ করিবেন।

৮। বিদ্যালয়ের অন্যান্য পাঠ্যগ্রন্থের সঙ্গে তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে পদ্যে ব্রাহ্মধর্ম এবং চতুর্থ বার্ষিক হইতে প্রবেশিকা পর্যন্ত ব্রাহ্মধর্ম ও ব্যাখ্যান অধ্যাপন হইবে।

৯। ৩য় বার্ষিক শ্রেণী হইতে এণ্ট্রান্স পর্যন্ত সমুদয় ছাত্র অধ্যাপকগণ সহ আশ্রমের প্রতি সায়ং উপাসনায় যোগ দিবে। এবং নিম্ন শ্রেণীর বালকগণকে লইয়া অধ্যাপকগণ স্বতন্ত্র নির্দিষ্ট উপাসনা করিবেন।…

১২। সকল ছাত্রকেই বিদ্যালয়ভবনে বাস করিতে হইবে। এবং শিক্ষকগণ তাহাদিগকে লইয়া নিরূপিত সময়ে একত্র আহারাদি করিবেন। এবং যথাসম্ভব ছাত্রগণের সহিত ক্রীড়াকৌতুকেও যোগ দিবেন।

১৩। ছুটির সময় ব্যতীত মাসে ৩ দিন ছাত্রগণ অভিভাবকের সম্মতি থাকিলে অধ্যাপকের অনুমতি লইয়া বাটী যাইতে পারিবে।

১৪। অভিভাবকগণ প্রতি রবিবারে গিয়া বালকদিগকে দেখিয়া আসিতে পারিবেন।

পৃ ২৭—শান্তিনিকেতন সম্বন্ধে কয়েকটি তারিখ :

১২৬৫ আশ্বিন ২৮ (১৮৫৮ অক্টোবর ১৩) অজয়সেতু নির্মিত। অজয় হইতে সাঁইথিয়া রেলপথ ১৮৫৯ সেপ্টেম্বর ৩।

১২৬৯ ফাল্গুন ১৮ (১৮৬৩ মার্চ ১) বোলপুরের নিকট বিশবিঘা জমি পাঁচ টাকা খাজনায় মৌরসীপাট্টায় গৃহীত।

১২৯৪ ফাল্গুন ২৬ (১৮৮৮ মার্চ ৮) মহর্ষিকৃত শান্তিনিকেতন সম্বন্ধীয় ট্রাস্টডীড্ সম্পন্ন। ত-বো-প ১৮১০ শক। (১২৯৫) বৈশাখ। ট্রাস্টডীড্।—দ্র ব্রহ্মবিদ্যালয়, অজিতকুমার চক্রবর্তী, বিশ্বভারতী সং ১৩৫৮।

১২৯৫ কার্তিক ৪ (১৮৮৮ অক্টোবর ১৯) শান্তিনিকেতন আশ্রম প্রতিষ্ঠা। শান্তিনিকেতন-স্মৃতি পৃ ৫৭-৬০।

১২৯৮ পৌষ ৭ (১৮৯১ ডিসেম্বর ২১) শান্তিনিকেতন মন্দির প্রতিষ্ঠা।

১৩০৮ পৌষ ৭ (১৯০১ ডিসেম্বর ২২) শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রমের উদ্বোধন।

১৩২৮ পৌষ ৮ (১৯২১ ডিসেম্বর ২২) বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠানের উদ্বোধন।

১৩২৯ জ্যৈষ্ঠ ২ (১৯২২ মে ১৬) বিশ্বভারতীর নূতন সংবিধান (Constitution) ১৮৬৬ সালের ২১ নং অ্যাক্ট অনুসারে রেজিস্ট্রি করা হয়।

১৩৫৮ বৈশাখ ২৫ (১৯৫১ মে ৯) ভারতীয় পার্লামেণ্ট বা লোকসভায় বিশ্বভারতী অ্যাক্ট (নং ২৯, ১৯৫১ সাল) পাশ হয়। ১৯৫১ মে ১৪ হইতে এই অ্যাক্ট কার্যকরী হয়।

পৃ ২৮ ও ১৮৫—'ব্রহ্মোপনিষদ' নামক ভাষণ 'শান্তিনিকেতন নবম সাম্বৎসরিক ব্রহ্মোৎসব উপলক্ষ্যে, শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক পঠিত।' ১৩০৬ পৌষ ৭ (১৮৯৯ ডিসেম্বর)। ইহাই কবির প্রথম ধর্মদেশনা।

'ব্রহ্মমন্ত্র।' দশম সাম্বৎসরিক ১৩০৭ পৌষ [১৯০০ ডিসেম্বর] ব্রহ্মোৎসব উপলক্ষে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক পঠিত দ্বিতীয় দেশনা।

ব্রহ্মচর্যাশ্রম প্রতিষ্ঠা দিবসের উপদেশ [বিদ্যালয়ের ব্রহ্মচারীদের উদ্দেশ্যে] ১৩০৮ পৌষ [১৯০১ ডিসেম্বর ২২] দ্র শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রম ১৩৫৮। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ১৮২৩ শক মাঘ সংখ্যায় 'শান্তিনিকেতনে একাদশ সাম্বৎসরিক উৎসব' বিবরণের অন্তর্গত।

পৃ ২৯—১৩০৮ অগ্রহায়ণ মাসের কোনো-এক তারিখে শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মবিদ্যালয় আরম্ভ হইয়াছিল। বিদ্যালয়ের ছুটির দিন বুধবার,—রবিবার নহে। বুধবার কেন ছুটির দিন, এই প্রশ্ন অনেকেরই মনে উদিত হয়। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ 'ব্রাহ্মসমাজের পঞ্চবিংশতি বৎসরের পরীক্ষিত বৃত্তান্ত' (প্রথম প্রকাশ ১৭৮৬ শক ২৬ বৈশাখ শনিবার। ১২৭১ বঙ্গাব্দ। ১৮৬৪ মে ৭। পুনর্মুদ্রণ ১১ মাঘ ১৩৬০) বক্তৃতায় বলেন, "প্রথমে যখন সমাজ স্থাপিত হয়, তখন শনিবারে সমাজ হইত। রবিবারে সকলের অবকাশ ছিল, শনিবার রাত্রিতে অধিক কাল পর্য্যন্ত উপাসনা হইলেও কাহারো অসুবিধা হইবার সম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু রামমোহন রায়ের যাঁহারা সহযোগী তাঁহাদের পক্ষে আমোদের দিন শনিবার, সুতরাং সে দিন সমাজে আসিতে তাঁহারা অতিশয় অসন্তুষ্ট হইতেন; এই জন্য বুধবার সমাজের দিন স্থির হইল। আমরা যখন [ব্রাহ্ম] সমাজে আসি, তখন বুধবারেই সমাজ [উপাসনা] হইত। ক্রমে এই বারই পবিত্র হইয়াছে।" (পুনর্মুদ্রণ পৃ ১৭) আদি ব্রাহ্ম সমাজের এই রীতি অনুসারে শান্তিনিকেতনের মন্দিরে বুধবারেই উপাসনা হইয়া আসিতেছে। রবীন্দ্রনাথের অসংখ্য ভাষণ শান্তিনিকেতনে ঐ বারটিতে প্রদত্ত। শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মচর্যাশ্রম থাকা কালে 'বুধবার' নামে একখানি সাপ্তাহিক পত্র বিভূতিভূষণ গুপ্তের সম্পাদনায় প্রকাশিত হইত (১৩২৯)।

পৃ ২৯—ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়। "এমন সময়ে ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের সঙ্গে আমার পরিচয় ক্রমশ ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠল। আমার নৈবেদ্যের কবিতাগুলি প্রকাশ হচ্ছিল তার কিছুকাল পূর্বে। এই কবিতাগুলি তাঁর অত্যন্ত প্রিয় ছিল। তাঁর সম্পাদিত Twentieth Century পত্রিকায় এই রচনাগুলির যে প্রশংসা তিনি ব্যক্ত করেছিলেন সেকালে সেরকম উদার প্রশংসা আমি আর কোথাও পাই নি।"—আশ্রমের রূপ ও বিকাশ।

পৃ ৩০—মজঃফরপুর হইতে শান্তিনিকেতনে কয়েকদিন থাকিয়া কবি কলিকাতায় ফিরিয়া যান। সেখানে 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ' প্রতিষ্ঠার আয়োজন চলিতেছে। রবীন্দ্রনাথ আরম্ভ হইতেই ইহার সহিত যুক্ত ছিলেন। 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ' এই নাম হয় উমেশচন্দ্র বটব্যালের প্রস্তাবে; পূর্বে এই সভার নাম ছিল 'বেঙ্গল একাডেমি অব্ লিটারেচার' (১৮৯৩ জুলাই ২৩ [১৩০০ শ্রাবণ ৮] তারিখে প্রতিষ্ঠিত)। ১৩০১ সালের ১৭ বৈশাখ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ নাম গৃহীত হয়। এই দিনের অধিবেশনকেই পরিষদের প্রথম অধিবেশন বলা হয়। ইহার আট বৎসর পর পরিষদের নিজস্ব গৃহের জন্য কাশিমবাজারের মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর নিকট হইতে হালসিবাগানে কিছু জমি দানরূপে পাওয়া যায়। ১৯০১ অগস্ট ২০, বাংলা ১৩০৮ সালের ৪ভাদ্র তারিখে মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী যে দানপত্র সম্পাদন করেন, তাহাতে পরিষদের পক্ষ হইতে গ্রহীতা বা ট্রাস্টিদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের নামই ছিল প্রথম; অন্য ট্রাস্টি ছিলেন ময়মনসিংহ-সন্তোষের জমিদার প্রমথনাথ রায় চৌধুরী, দীঘাপতিয়ার কুমার শরৎকুমার রায়, টাকির রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী ও আটর্নি হীরেন্দ্রনাথ দত্ত।

ইহারও সাত বৎসর পর পরিষদের গৃহ নির্মিত হয়। উদ্বোধনদিনে রবীন্দ্রনাথ বক্তৃতা করেন ১৩১৫ অগ্রহায়ণ ২১ (দ্র র-জী ২য় খণ্ড পৃ ২৮৪)। রবীন্দ্রনাথের ভাষণ, পরিষৎ-পরিচয়—বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদ গ্রন্থমালা পৃ ২৮-২৯।

পৃ ৪১—কলিকাতায় কবিপত্নী মৃণালিনী দেবী তখন মৃত্যুশয্যায়—মৃত্যুর দশদিন পূর্বে কবি একখানি পত্রে 'বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য ও কার্যপ্রণালী সম্বন্ধে বিস্তারিত করিয়া' কুঞ্জলাল ঘোষকে লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন। ২৭ কার্তিক ১৩০৯ (১৯০২ নভেম্বর ১৩) অর্থাৎ ব্রহ্মচর্যাশ্রম প্রতিষ্ঠার ঠিক এক বৎসর পরে এইটি লিখিত হয়। দ্র বিশ্বভারতী

পত্রিকা ১৩১৮ বৈশাখ-আষাঢ় পৃ ২০৭-১৬। শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের পঞ্চাশবর্ষপূর্তি উপলক্ষে প্রকাশিত (৭ পৌষ ১৩১৮) 'শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রম' গ্রন্থভুক্ত। এই প্রসঙ্গে ক্ষিতিমোহন সেন লিখিয়াছেন যে ১৯০৮ সালে তিনি যখন আশ্রমের কার্যে যোগ দেন, সেই সময়ে কবি তাঁহাকে এই পত্রখানি দেন। পঞ্চাশ বৎসর এই দলীলখানি অপ্রকাশিত ছিল।

বিংশ শতকের গোড়ায় ইংরেজ তথা পশ্চিমের সকল প্রকার প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়ার সূত্রপাত হয়। কী বিবেকানন্দ, কী রবীন্দ্রনাথ—সকলেই অতীত ভারতের গৌরব গানে বিভোর ছিলেন। বলা বাহুল্য ইঁহারাই ভবিষৎ বাংলাকে গড়িয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ অতীত যুগের তপোবনের যে স্বপ্ন দেখিতেছেন, তাহা যে কেবল শিক্ষার দিক হইতে বরণীয় তাহা নহে, তাহা তাঁহার মতে, স্বদেশের দান বলিয়াই গ্রহণীয়। ব্রহ্মচর্যাশ্রমের ছাত্রদের জন্য যে নির্দেশ তিনি লিখিয়া পাঠান (১৩০৯ কার্তিক ২৭) তাহার একস্থলে স্বাদেশিকতা সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহা এক হিসাবে কিছুদিন পূর্বে রচিত 'নৈবেদ্য'রই প্রতিধ্বনি। তিনি ঐ পত্রে লিখিতেছেন—"ব্রহ্মবিদ্যালয়ের ছাত্রগণকে স্বদেশের প্রতি বিশেষরূপে ভক্তিশ্রদ্ধাবান্ করিতে চাই।...স্বদেশও দেবতা। স্বদেশকে লঘুচিত্ত অবজ্ঞা, উপহাস, ঘৃণা—এমনকি অন্যান্য দেশের তুলনায় ছাত্ররা যাহাতে খর্ব করিতে না শেখে সে দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে চাই। আমাদের স্বদেশীয় প্রকৃতির বিরুদ্ধে চলিয়া আমরা কখনও সার্থকতা-লাভ করিতে পারিব না। আমাদের দেশের যে বিশেষ মহত্ব ছিল সেই মহত্বের মধ্যে নিজের প্রকৃতিকে পূর্ণতা দান করিতে পারিলেই আমরা যথার্থভাবে বিশ্বজনীনতার মধ্যে উত্তীর্ণ হইতে পারিব—নিজেকে ধ্বংস করিয়া অন্যের সহিত মিলাইয়া দিয়া কিছুই হইতে পারিব না—অতএব, বরঞ্চ অতিরিক্তমাত্রায় স্বদেশাচারের অনুগত হওয়া ভালো তথাপি মুগ্ধভাবে বিদেশীর অনুকরণ করিয়া নিজেকে কৃতার্থ মনে করা কিছু নহে।" রবীন্দ্রনাথের জীবনে এক সময়ে কিছুকালের জন্য এই 'অতিরিক্ত মাত্রায় স্বদেশাচার' দেখা দিয়াছিল; তবে, রবীন্দ্রনাথের স্বদেশপ্রেম ও বিশ্বপ্রেম পরস্পর বিরুদ্ধ নহে।

পৃ ৪৬ পা-টী ১—'মাভৈঃ' প্রবন্ধ প্রকাশের তারিখ ১৩০৯ কার্তিক। ১৩০৮ নহে।

পৃ ৫০ পা-টী—বঙ্গদর্শন ১৩০৮ পৌষ পৃ ৪২৩-২৪।

পৃ ৫৫—"সেই সময়ে মোহিতচন্দ্রের সহিত তাঁহার পরিচয় হয়।" মোহিতচন্দ্র সেন নববিধান সমাজভুক্ত ব্রাহ্ম ছিলেন। বিনয়েন্দ্রনাথ সেন ইঁহার বন্ধু ও একই সমাজভুক্ত। কবির সহিত বিনয়েন্দ্রনাথের পরিচয় হয় মোহিতচন্দ্র মারফত। "তিনি আমাকে আপনাদের সকলের দিকেই আকর্ষণ করিয়া লইয়াছেন।" বিনয়েন্দ্রনাথের Intellectual Ideal নামে বইখানি কবি সযত্নে পড়েন ও এক পত্রে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন। কবি লিখিতেছেন, "আপনাদিগকে আমার প্রয়োজন আছে।...মাঝে মাঝে দয়া করিয়া আপনারা আমার নিকটে আসিবেন এবং আমার সঙ্গে কথা কহিবেন। অত্যন্ত লুব্ধ ক্ষুধিতের মতো আপনদিগকে চাহিতেছি—আপনাদের দ্বারা আমার এই শান্তিনিকেতনের নিভৃত উদার প্রান্তরকে সজীব ও শান্তিনিকেতনের উন্মুক্ত-অনাময় সমীরণের মধ্যে রসহিল্লোল সমীরিত করিতে ইচ্ছা করি। নব্যভারতে তপোবন আপনারা রচনা করিবেন...।" ১২ ফাল্গুন ১৩০৮। শান্তিনিকেতন। বোলপুর।—বিশ্বভারতী পত্রিকা ১৩৫৮ কার্তিক-পৌষ পৃ ৫৯-৬০।

পৃ ৯৪—অজিতকুমার চক্রবর্তী। ১৩১৭ বৈশাখ ১৫ তারিখে রবীন্দ্রনাথ ডক্টর প্রসন্নকুমার রায় (P. K. Roy)কে অজিতকুমার সম্বন্ধে পত্র দেন: "অজিত বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। ইহার দর্শন বিষয়ক প্রশ্নোত্তরে পরীক্ষকগণ বিশেষভাবে বিস্ময়বোধ করিয়াছিলেন। সেবার মোহিতবাবু চরিত্রনীতি সম্বন্ধে পরীক্ষাকর্তা ছিলেন, তিনি অজিতের কাগজ দেখিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছিলেন এবং ইহাকে বোলপুর বিদ্যালয়ের কাজে নিযুক্ত করিবার

জন্য আগ্রহের সহিত অনুরোধ করিয়াছিলেন। তাঁহার অনুরোধবশতই আমি অজিতকে আমার বিভালয়ে গ্রহণ করি।" কবিপ্রণাম পৃ ১০৫।

পৃ ১০০—এই সময়ে (১৩১২ মাঘ) ব্রহ্মচর্যাশ্রমে কাশী হইতে বিধুশেখর শাস্ত্রী নামে এক যুবক অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়া আসেন। বিধুশেখরের বয়স তখন ২৬ বৎসর। বিধুশেখর সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত; রবীন্দ্রনাথের ইচ্ছায় তিনি পালি ভাষা শিক্ষা ও বৌদ্ধ দর্শন অধ্যয়ন করেন। ১৩১৫ সালে তাঁহার অনুদিত 'মিলিন্দ-পঞ্‌হো' বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ হইতে প্রকাশিত হইল। বিধুশেখর বৈদিক সাহিত্য অধ্যয়ন করিয়া মাধ্যন্দিন শতপথ ব্রাহ্মণ অনুবাদ করিলে উহাও সাহিত্য পরিষদ হইতে প্রকাশিত হয় (১৩১৬, ১৩১৮)। বলা বাহুল্য বিধুশেখরের প্রয়োজনীয় গ্রন্থাদি ও অবসরের ব্যবস্থা রবীন্দ্রনাথ করিয়া দেন। অধ্যাপনের সহিত অধ্যয়ন ও গবেষণাদি করা বিষয়ে কবির যে কী উৎসাহ ছিল, তাহা সমসাময়িক কর্মীরা জানেন। গবেষণাকে বিত্তায়তনের কার্য বলিয়া মনে করা হইত, তাহা গবেষকের ব্যক্তিগত কার্য ছিল না; এই শ্রেণীর কার্যের জন্য কেহ নিন্দাভাগী হইতেন না।

পৃ ১১৯— চারুচন্দ্র বসুর 'ধম্মপদ' গ্রন্থের রবীন্দ্রনাথকৃত সমালোচনা বঙ্গদর্শনে ১৩১২ জ্যৈষ্ঠে বাহির হয়। রবীন্দ্রনাথ বহিখানি পাইয়া পালি মূলের পাশাপাশি চারিটি বর্গের বাংলা পত্তে অনুবাদ করিয়াছিলেন। বইখানি কবির কাছ হইতে তৎকালীন শিক্ষক সুবোধচন্দ্র মজুমদার পাইয়াছিলেন। সুবোধচন্দ্রের পুত্র ব্রহ্মচর্যাশ্রমের প্রাক্তন ছাত্র জয়পুর-নিবাসী সমীরচন্দ্র মজুমদার উক্ত পাণ্ডুলিপি বিশ্বভারতী রবীন্দ্রসদনে দান করিয়াছেন।—বিশ্বভারতী পত্রিকা ১৩৫৫ শ্রাবণ-আশ্বিন পৃ ১০।

পৃ ১৪১—খেয়া। খেয়ার কবিতাগুলি ১৩১২ আষাঢ় হইতে ১৩১৩ আষাঢ়ের মধ্যে লিখিত (পৃ ১২১, ১৪১, ১৪৩); ভুলক্রমে শেষটিকে জ্যৈষ্ঠ বলা হইয়াছে। খেয়ার 'লীলা' কবিতা ২০ পৌষ ১৩১২ লিখিত; ১৫ই পৌষ নহে (পৃ ১৩৫)।

পৃ ১৪১—'পল্লী সমিতি', এসম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ যে খসড়া প্রস্তুত করিয়াছিলেন, তাহা শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ লিখিত 'কংগ্রেস' গ্রন্থে আছে। তাহা হইতে নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল (দেশ ১৩৫৬, শ্রাবণ ২১):

পল্লীসমাজ

প্রতি জেলার প্রধান প্রধান গ্রাম, পল্লী বা পল্লীসমষ্টি লইয়া এক বা ততোধিক পল্লীসমাজ স্থাপন করিতে হইবে। শহর, গ্রাম কি পল্লীনিবাসী সকলেই স্ব স্ব পল্লী-সমাজভুক্ত হইবেন। গ্রাম কি পল্লীবাসীর অভিপ্রায়মত অন্যূন পাঁচজনের উপর প্রতি পল্লী-সমাজের কার্যনির্বাহের ভার থাকিবে। তাঁহারা পল্লীবাসীদিগের মতামত ও সহায়তা লইয়া পল্লী-সমাজের কার্য করিবেন। পল্লী-সমাজের প্রধান প্রধান উদ্দেশ্যগুলি নিম্নে বিবৃত হইল। প্রতি পল্লীর সমাজসাধ্য-মতে এই উদ্দেশ্যগুলি কার্যে পরিণত করিতে যত্নবান হইবেন।

উদ্দেশ্য

১। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে সাম্য সদ্ভাব ও সংবর্ধন এবং দেশের ও সমাজের অহিতকর বিষয়গুলি নির্ধারণ করিয়া তাহার প্রতীকারের চেষ্টা।

২। সর্বপ্রকার গ্রাম্য বিবাদ বিসম্বাদ সালিশের দ্বারা মীমাংসা।

৩। স্বদেশ-শিল্পজাত দ্রব্য প্রচলন এবং তাহা সুলভ ও সহজপ্রাপ্য করিবার জন্য ব্যবস্থা এবং সাধারণ ও স্থানীয় শিল্প-উন্নতির চেষ্টা।

৪। উপযুক্ত শিক্ষক নির্বাচন করিয়া পল্লী-সমাজের অধীনে বিদ্যালয় ও আবশ্যকমত নৈশ-বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া বালক-বালিকা সাধারণের সুশিক্ষার ব্যবস্থা।

৫। বিজ্ঞান, ইতিহাস বা মহাপুরুষদিগের জীবনী ব্যাখ্যা করিয়া সাধারণকে শিক্ষা প্রদান ও সর্বধর্মের সারনীতি সংগ্রহ করিয়া সাধারণের মধ্যে প্রচার ও সর্বতোভাবে সাধারণের মধ্যে সুনীতি, ধর্মভাব, একতা, স্বদেশানুরাগ বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা।

৬। প্রতি পল্লীতে একটি করিয়া চিকিৎসক ও ঔষধালয় স্থাপন করা এবং অপারগ, অনাথ ও অসহায় ব্যক্তি-দিগের নিমিত্ত ঔষধ, পথ্য, সেবা ও সৎকারের ব্যবস্থা করা।

৭। পানীয় জল, নদী, নালা, পথ, ঘাট, সৎকার-স্থান, ব্যায়ামশালা ও ক্রীড়াক্ষেত্র প্রভৃতির ব্যবস্থা করিয়া স্বাস্থ্যের উন্নতির চেষ্টা।

৮। আদর্শ কৃষিক্ষেত্র বা খামার স্থাপন ও তথায় যুবক বা অন্য পল্লীবাসীদিগকে কৃষিকার্যে বা গোমহিষাদির পাল দ্বারা জীবিকা উপার্জনোপযোগী শিক্ষা প্রদান ও কৃষিকার্যের উন্নতি সাধনের চেষ্টা।

৯। দুর্ভিক্ষ নিবারণার্থে ধর্মগোলা স্থাপন।

১০। গৃহস্থ স্ত্রীলোকেরা যাহাতে আপন আপন সংসারের আয় বৃদ্ধি করিতে পারেন এবং অসহায় হইলে সংসারের ভার গ্রহণ করিতে পারেন, তদনুরূপ শিল্পাদি শিক্ষা দেওয়া ও তদুপযোগী উপকরণ সংগ্রহ করা।

১১। সুরা-পান বা অনুরূপ মাদকদ্রব্য ব্যবহার করিতে লোককে নিবৃত্ত করা।

১২। মিলন-মন্দির ক্লাব স্থাপন ও তথায় সমবেত হইয়া পল্লীর ও স্বদেশের হিতার্থে সমস্ত বিষয়ের আলোচনা।

১৩। পল্লীর তত্ত্ব সংগ্রহ: অর্থাৎ জনসংখ্যা, স্ত্রী, পুরুষ, বালক-বালিকার সংখ্যা, বিভিন্ন জাতির সংখ্যা, জন্ম-মৃত্যুর সংখ্যা, অধিবাসীগণের স্থানত্যাগ ও নূতন বসতি। বিভিন্ন ফসলের অবস্থা, কৃষির ও বিভিন্ন ব্যবসায় উন্নতি, অবনতি বিদ্যালয়, পাঠশালা ও ছাত্র ও ছাত্রীসংখ্যা, ম্যালেরিয়া (জ্বর), ওলাউঠা, বসন্ত ও অন্যান্য মহামারীতে আক্রান্ত রোগীর ও ঐসব রোগে মৃত্যুর সংখ্যা ও পল্লীপুরাবৃত্ত ও বর্তমান উন্নতি ও অবনতির বিবরণ ও কারণ ধারাবাহিকরূপে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখা।

১৪। জেলায় জেলায়, পল্লীতে পল্লীতে, গ্রামে গ্রামে পরস্পরের মধ্যে সদ্ভাব সংস্থাপন ও ঐক্য-সংবর্ধন।

১৫। জেলা সমিতি, প্রাদেশিক সমিতি ও জাতীয় মহাসমিতির উদ্দেশ্যে [কন্‌গ্রেস] ও কার্যের সহায়তা করা।

অর্থের ব্যবস্থা

পল্লী-সমাজের কার্য স্বেচ্ছাদান ও ঈশ্বর-বৃত্তি দ্বারা চলিবে। যাঁহাদের বিবাদ-বিসংবাদ সালিশিতে মেটান হইবে তাঁহারা নিশ্চয়ই স্বেচ্ছাপূর্বক সমাজের মঙ্গলার্থ কিছু অর্থ সাহায্য করিবেন। বিবাহাদি শুভকার্যেও সকলেই স্বেচ্ছাপূর্বক এইরূপ বৃত্তি দিবেন। পল্লীবাসীমাত্রেই সপ্তাহে সপ্তাহে বা মাসে মাসে কিছু কিছু করিয়া সমাজের কার্যনির্বাহের জন্য যথাসাধ্য দান করিবেন। পল্লী-সমাজের অন্তর্গত সমস্ত হাট-বাজার হইতেও ঈশ্বরবৃত্তি সংগৃহীত হইতে পারিবে। প্রতি বৎসর গ্রামে গ্রামে বারোয়ারী পূজায় নাচ-তামাশায় যে অর্থ বৃথা নষ্ট হয়, ঐ সমস্ত অপব্যয় সংকোচ করিলে সেই অর্থ দ্বারা পল্লী-সমাজের কার্যের বিশেষ সহায়তা হইতে পারে। পল্লী-সমাজ কার্যে প্রবৃত্ত হইলে অর্থের অভাব হইবে না।

পৃ ১৫৫—১৩১৩ সালের শেষভাগে কবি গদ্যগ্রন্থাবলী সম্পাদনে মন দিয়াছেন। ১৩১৪ বৈশাখ মাসে গদ্যগ্রন্থাবলীর ১ম খণ্ড 'বিচিত্র প্রবন্ধ' মজুমদার লাইব্রেরি কর্তৃক প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক সম্পাদিত এই আদি সংস্করণের বহু পরিবর্তন হইয়াছে। দ্বিতীয় সংস্করণ পরিবর্তিত আকারে ১৩৩২ চৈত্র মাসে বিশ্বভারতী কর্তৃক

প্রকাশিত হয়। ইহার ভূমিকায় কবি লেখেন, "এই গ্রন্থের পরিচয় আছে 'বাজে কথা' প্রবন্ধে। অর্থাৎ ইহার যদি কোনো মূল্য থাকে তাহা বিষয়বস্তু গৌরবে নয়, রচনা-রস-সম্ভোগে।" প্রকাশকগণ পাঠপরিচয়ে লিখিলেন, "বিচিত্র প্রবন্ধের পূর্বের শৃঙ্খলা ভাঙিয়া এবারে রচনাগুলিকে কালানুক্রমিকভাবে সাজানো হইয়াছে।" এছাড়াও অনেক পরিবর্তন সাধিত হয়। (র-রচ ৫ম পৃ ৫৫৯-৬৪) কবির মৃত্যুর পর ১৩৫৫ আষাঢ় মাসে বিশ্বভারতী হইতে যে সংস্করণ প্রকাশিত হইল তাহারও কিছু রদবদল হয়। ইতিমধ্যে রবীন্দ্র-রচনাবলী ৫ম খণ্ডে (১৩৪৭ অগ্রহায়ণে প্রকাশিত) যে বিচিত্র প্রবন্ধ সন্নিবেশিত হয় তাহা ১৩৩২ সালের গ্রন্থের অনুরূপ হইলেও অবিকল নহে। বর্তমানে যে সংস্করণ চলিত আছে তাহা ১৩৪২ সালের প্রকাশিত গ্রন্থের অনুরূপ ও রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক অনুমোদিত সংস্করণ বলিয়া গ্রহণ করিতে পারা যায়।

পৃ ১৫৫—১৯০৬ সালে গিরিডিহিতে একটি শিশুবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। উদ্যোক্তাদের মধ্যে ছিলেন লেখকের পিতা গিরিডিহির উকীল নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, বিজয়চন্দ্র মজুমদারের ভ্রাতা বামনদাস মজুমদার ও হিমাংশু প্রকাশ রায়। রবীন্দ্রনাথ সেই সময়ে শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের বাড়িতে উঠিতেন। কবি এই বিদ্যালয়ের জন্য একটি বিজ্ঞপ্তি লিখিয়া দেন এবং স্বয়ং উহার পৃষ্ঠপোষক হন। ঐ প্রচারপত্র মুদ্রিত হইয়াছিল। ছোটোনাগপুরের স্বাস্থ্যকর স্থানে বিদ্যালয় স্থাপনের ইচ্ছা কবি অন্যত্রও প্রকাশ করিয়াছেন। এই বিদ্যালয়টি বড়ো হইয়া গিরিডিহি জাতীয় বিদ্যালয় হয় ও বৎসর দুই চলিয়া বন্ধ হইয়া যায়। ব্যক্তিগত সাক্ষ্য ছাড়া আর কোনো প্রমাণ নাই ; তবে যদি কখনো সেই মুদ্রিত প্রচার পাওয়া যায়, তবে এ বিষয়টি আরও পরিষ্কার হইবে।

পৃ ১৬০—'সুপ্রভাত' কবিতা রচনার তারিখ ৮ বৈশাখ ১৩১৪, বোলপুর।

পৃ ১৬৬—শিলাইদহ হইতে ২৯ পৌষ ১৩১৪ [১৯০৮ জানু ১৪] রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে অজিতকুমার চক্রবর্তীকে লিখিতেছেন, "তোমাদের গ্রামের কাজ ভালো চলছে শুনে আমি ভারি খুসী হয়েছি।" যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ছিলেন এই কর্মে উৎসাহী, ব্রহ্মবিদ্যালয়ের ছাত্ররা ছিল তাঁহার সহায়। ভুবনডাঙা গ্রামে হরিজন পল্লী ও মুসলমানদের মধ্যে কাজ শুরু হয়। কবি লিখিতেছেন যে শিলাইদহে "গ্রাম সম্বন্ধে আমি যেসব কথা ভাবচি তা এখনো কাজে লাগাবার সময় হয়নি, এখন কেবলমাত্র অবস্থাটা জানবার চেষ্টা করচি। ভূপেশ [রায়] প্রধানত তথ্য সংগ্রহ করচেন—সেইগুলো ভালো করে জমে উঠলে তখন প্ল্যান ঠিক করতে হবে। আমি গ্রামে গ্রামে যথার্থভাবে স্বরাজস্থাপন করতে চাই—সমস্ত দেশে যা হওয়া উচিত ঠিক তারই ছোটো প্রতিকৃতি—খুব শক্ত কাজ অথচ না হলে নয়। অনেক ত্যাগের আবশ্যক সেইজন্যে মনকে প্রস্তুত করছি—রথীকে আমি এই কাজেই লাগাব তাকেও ত্যাগের জন্য ও কর্মের জন্য প্রস্তুত করতে হবে। নিজের বন্ধন মোচন করতে না পারলে আর কাউকে মুক্ত করতে পারব না।"—প্রবাসী ১৩৩৫ ভাদ্র পৃ ৬৮৫।…১৩১৬ মাঘ ২০ তারিখে কবি তাঁহার কনিষ্ঠ জামাতা নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়কে আমেরিকায় লিখিতেছেন, "রথীর কাজেরও আয়োজন চলছে। যে ক্ষেত্রটি পেয়েছে সেখানে ইচ্ছা করলে অনেক উপকার করতে পারবে। দেশের নিম্নশ্রেণীর লোকদের উন্নতি বিধান করাই এখন যথার্থ আমাদের কাজ।"…দেশ ১৩৬২ কার্তিক পৃ ৯১।

পৃ ১৬৬ পা-টী—প্রাদেশিক কনফারেন্সের তালিকা: ১৯০৭ মার্চ ২৯ (চৈত্র ১৫ ১৩১৩) বহরমপুরে অধিবেশন হয় ; সভাপতি ছিলেন দীপনারায়ণ সিংহ। ভুলক্রমে ১৯০৭-এ পাবনা বলা হইয়াছে। পাবনা অধিবেশনের তারিখ ১৯০৮ ফেব্রুয়ারি ১১ (১৩১৪ মাঘ ২৮)। দ্র হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ কংগ্রেস ২য় সং পৃ ২৫২ ; যোগেশচন্দ্র দাসগুপ্ত লিখিত 'বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাজনৈতিক সম্মেলন' প্রবন্ধ, আনন্দবাজার পত্রিকা ১৯৫১ ফেব্রুয়ারি ১৭।

পৃ ১৮২—শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের মৃত্যুদিন ১৩১৫ কার্তিক ২৩।

পৃ ১৮৪—বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ ১৩০১ বৈশাখ ১৭ (১৮৯৪ এপ্রিল ২৯)। পরিষদের প্রথম অধিবেশনে রমেশচন্দ্র দত্ত প্রথম বৎসরের জন্য সভাপতি ও নবীনচন্দ্র সেন সহকারী সভাপতি মনোনীত হন।

দ্বিতীয় অধিবেশনে—১৩০১ আষাঢ় ৪ (১৮৯৪ জুন ১৭) দুইজন সহকারী সভাপতির পদ সৃষ্টির কথা হয়। ইতিপূর্বে নবীনচন্দ্র সেন নির্বাচিত হইয়াছিলেন। "অন্যজনের নির্বাচন সম্বন্ধে অনেক আলোচনা হইল। অবশেষে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়কে অন্যতর সহকারী সভাপতির পদে নির্বাচিত করা হইল।" সাহিত্যপরিষদ পত্রিকা কার্যবিবরণ পৃ ৫৫।

তৃতীয় অধিবেশন—১৩০১ শ্রাবণ ১৪ (১৮৯৪ জুলাই ২৯) 'পারিভাষিক শব্দ-প্রণয়ন' সমিতি গঠিত হয়। কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য সমিতির সভাপতি। রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ আরও ৭ জন সদস্য মনোনীত হন।

১৩০১—বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের প্রথম সভাপতি রমেশচন্দ্র দত্ত। সহকারী সভাপতি—নবীনচন্দ্র সেন, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

১৩০২ সহ-সভাপতি—চন্দ্রনাথ বসু, নবীনচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ।

১৩০৩ " নবীনচন্দ্র, মনোমোহন বসু, রবীন্দ্রনাথ।

১৩১২ " রবীন্দ্রনাথ, চন্দ্রকান্ত তর্কালংকার, আশুতোষ মুখোপাধ্যায়।

১৩১৩-১৫ " রবীন্দ্রনাথ ও অন্যান্য।

১৩১৬ রবীন্দ্রনাথ ও হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বিশিষ্ট সদস্য মনোনীত হন।

১৩২৪ রবীন্দ্রনাথ ৮ জনের মধ্যে অন্যতম সহ-সভাপতি।

পৃ ১৮৪—বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের গৃহদ্বার উন্মোচন সভা। দ্বিতল গৃহে সভাপতি হন পরিষদের সভাপতি সারদাচরণ মিত্র (সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ নহে)। একতলার সভায় সভাপতি হন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। (দ্র কান্তকবি রজনীকান্ত পৃ ৯১)। ১২শ পংক্তি—'সাক্ষাৎ পরিচয় হয় নাই'—একথা ভুল। "এই গান শুনে রবি ঠাকুর আমাকে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে বলেন, আমি দীনেশকে [সেন] সঙ্গে ক'রে রবি ঠাকুরের বাড়ী তার পরদিন [২২ অগ্র ১৩১৫] সকাল বেলা যাই। সেইখানে তিনি আবার ঐ গান শোনেন, শুনে বলেন যে 'বহির্জগৎ সম্বন্ধে বেশ হয়েছে, অন্তর্জগৎ সম্বন্ধে আর একটা করুন।'"—রজনীকান্তর রোজনামচা, কান্তকবি রজনীকান্ত পৃ ৯৪।

রজনীকান্ত সেন; জন্ম ১২৭২ শ্রাবণ ১২ (১৮৬৫ জুলাই ২৬)— মৃত্যু ১৩১৭ ভাদ্র ২৮ (১৯১০ সেপ্টেম্বর ১৩)। অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় ও রজনীকান্ত উভয়েই রাজসাহী-বারের উকিল ছিলেন। অক্ষয়কুমারের চেষ্টায় রজনীকান্ত সাহিত্যিক মহলে পরিচিত হন ও তাঁহার গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। ১৯০১ সালে বড়দিনের ছুটির সময়ে (ডিসেম্বর মাসে) অক্ষয়-কুমার ও রজনীকান্ত দুইজনে মিলিয়া কলিকাতায় আসেন ও সেখান হইতে বোলপুর যাইবার সময়ে রজনীকান্তকেও অক্ষয়-কুমার সঙ্গে লন। জগদানন্দ রায় আশ্রমের স্মৃতিকথায় (শান্তিনিকেতন পত্রিকা) এ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন। শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের ও তাঁহার আমন্ত্রিত সুধীবর্গের নিকট উৎসাহ পাইয়াও রজনীকান্তের আপনার গান প্রকাশ সম্বন্ধে ইতস্তত ভাব দূর হইল না। তাঁহার ভয় সুরেশচন্দ্র সমাজপতিকে। কলিকাতায় ফিরিয়া সুরেশচন্দ্রের সহিত পরিচিত হইলে, তাঁহার ভয় ভাঙিল এবং সমাজপতিরই রজনীকান্ত সম্বন্ধে উৎসাহ দেখা গেল বেশি।

১৩১৬ সালের জ্যৈষ্ঠমাস হইতে রজনীকান্ত ক্যান্সার রোগাক্রান্ত হন ও শেষ আটমাস মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে থাকেন, সেখানেই তাঁহার মৃত্যু হয়।

রবীন্দ্রনাথ ১৩১৭ জ্যৈষ্ঠ ২৮ তারিখে মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে গিয়া রজনীকান্তের সহিত দেখা করেন এবং শান্তিনিকেতনে ফিরিয়া ১৬ আষাঢ় নিম্নলিখিত পত্রখানি রজনীকান্তকে পাঠান :

"প্রীতিপূর্ণ নমস্কার পূর্বক নিবেদন—সেদিন আপনার রোগশয্যার পার্শ্বে বসিয়া মানবাত্মার একটি জ্যোতির্ময় প্রকাশ দেখিয়া আসিয়াছি। শরীর তাহাকে আপনার সমস্ত অস্থিমাংস, স্নায়ুপেশী দিয়া চারিদিকে বেষ্টন করিয়া ধরিয়াও কোনো মতে বন্দী করিতে পারিতেছে না, ইহাই আমি প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইলাম। মনে আছে, সেদিন আপনি আমার 'রাজা ও রাণী' নাটক হইতে প্রসঙ্গক্রমে নিম্নলিখিত অংশটি উদ্ধৃত করিয়াছিলেন,—

"—এ রাজ্যেতে
যত সৈন্য, যত দুর্গ, যত কারাগার,
যত লোহার শৃঙ্খল আছে, সব দিয়ে
পারে না কি বাঁধিয়া রাখিতে দৃঢ় বলে
ক্ষুদ্র এক নারীর হৃদয়?"

"ঐ কথা হইতে আমার মনে হইতেছিল, সুখ-দুঃখ বেদনায় পরিপূর্ণ এই সংসারের প্রভূত শক্তির দ্বারাও কি ছোটো এই মানুষটির আত্মাকে বাঁধিয়া রাখিতে পারিতেছে না? শরীর হার মানিয়াছে, কিন্তু চিত্তকে পরাভূত করিতে পারে নাই—কণ্ঠ বিদীর্ণ হইয়াছে, কিন্তু সংগীতকে নিবৃত্ত করিতে পারে নাই— পৃথিবীর সমস্ত আরাম ও আশা ধূলিসাৎ হইয়াছে, কিন্তু ভূমার প্রতি ভক্তি ও বিশ্বাসকে ম্লান করিতে পারে নাই। কাঠ যতই পুড়িতেছে, অগ্নি আরো তত বেশী করিয়াই জ্বলিতেছে। আত্মার এই মুক্ত স্বরূপ দেখিবার সুযোগ কি সহজে ঘটে! মানুষের আত্মার সত্য-প্রতিষ্ঠা যে কোথায় তাহা যে অস্থি-মাংস ও ক্ষুধা-তৃষ্ণার মধ্যে নহে, তাহা সেদিন সুস্পষ্ট উপলব্ধি করিয়া আমি ধন্য হইয়াছি। সছিদ্র বাঁশির ভিতর হইতে পরিপূর্ণ সংগীতের আবির্ভাব যেরূপ, আপনার রোগক্ষত বেদনাপূর্ণ শরীরের অন্তরাল হইতে অপরাজিত আনন্দের প্রকাশও সেইরূপ আশ্চর্য।

"যেদিন আপনার সহিত দেখা হইয়াছে, সেই দিনই আমি বোলপুর চলিয়া আসিয়াছি। ইতিমধ্যে আবার যদি কলিকাতায় যাওয়া ঘটে, তবে নিশ্চয় দেখা হইবে।

"আপনি যে গানটি[১] পাঠাইয়াছেন তাহা শিরোধার্য করিয়া লইলাম। সিদ্ধিদাতা তো আপনার কিছুই অবশিষ্ট রাখেন নাই, সমস্তই তো তিনি নিজের হাতে লইয়াছেন—আপনার প্রাণ, আপনার গান, আপনার আনন্দ সমস্ত তো তাঁহাকেই অবলম্বন করিয়া রহিয়াছে—অন্য সমস্ত আশ্রয় ও উপকরণ তো একেবারে তুচ্ছ হইয়া গিয়াছে। ঈশ্বর যাঁহাকে রিক্ত করেন তাঁহাকে কেমন গভীরভাবে পূর্ণ করিয়া থাকেন; আজ আপনার জীবন-সংগীতে তাহাই ধ্বনিত হইতেছে ও আপনার ভাষা-সংগীত তাহারই প্রতিধ্বনি বহন করিতেছে। ইতি আপনার শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। দ্র কান্তকবি রজনীকান্ত, পৃ ২৩৪-৩৬।

পৃ ১৯৭—'মন্ত্র জিনসটী একটি বাঁধবার উপায়। মন্ত্রকে অবলম্বন করে আমরা মননের বিষয়কে মনের সঙ্গে বেঁধে রাখি' (১৩১৫ চৈত্র ২৭)। যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়কে (১৩১৭ পৌষ ১৮) এক পত্রে কবি লেখেন, "আমি উপাসনাকালে এবং অন্য সময়েও 'পিতা নোঽসি' এবং 'অসতোমা' এই দুই মন্ত্র বারম্বার উচ্চারণ করিতে থাকি—করিতে করিতে যে পর্যন্ত আমার মন এই দুটি মন্ত্র সম্বন্ধে সজ্ঞান হইয়া না উঠে ততক্ষণ ছাড়ি না। 'শান্তং শিবমদ্বৈতম্' এ মন্ত্রও অনেক সময় আমার বিশেষ উপকারে আসিয়াছে, কোনো সাংসারিক কারণে মন ক্ষুব্ধ হইলে বা কোনো প্রকার ক্ষতি বা অনিষ্টের আশঙ্কায় মন উদ্বিগ্ন হইলে 'শান্তং শিবমদ্বৈতম্' মন্ত্র জপ করিয়া একটি গভীর শান্তি ও মঙ্গলের মধ্যে মন প্রবেশ করে। কখনো কখনো আমি গায়ত্রী মন্ত্রও ধ্যান করি।"

[১] "আমায় সকল রকমে কাঙাল করেছ, গর্ব করিতে চুর" ইত্যাদি।

১৩১৭ ফাল্গুন ৯ এক পত্রে লিখিতেছেন, "মনটিকে অনন্তের ধারণায় নিবিষ্ট করে রাখতে পারলে আপনিই সমস্ত সহজ হয়ে যায়—মন্ত্রসাধন ছাড়া তার অন্য কোনো পথ আমি তো জানিনে।" প্রবাসী ১৩৪৮ মাঘ পৃ ৪৬০।

পৃ ২০৮— শান্তিনিকেতনের উপদেশমালা। বিনয় সরকারের বৈঠক ১ম ভাগ পৃ ৪৪৩-৫৫— "উচ্চশিক্ষিত মুসলমানের সঙ্গে উচ্চশিক্ষিত হিন্দুর ধর্মমিলন—বিশেষভাবে আত্মিক সমঝৌতা—অনিবার্য।...যুক্তিনিষ্ঠার প্রভাবে মুসলমান নরনারী হিন্দুদের খুব কাছে এসে পড়বে। যুক্তিনিষ্ঠ হিন্দুরাও মুসলমানের কাছে যাবে।...হিন্দুমুসলমানের ধর্মমিলন অবশ্যম্ভাবী। জনসাধারণের ভেতরও যেমন অবশ্যম্ভাবী, উচ্চশিক্ষিতের ভেতরও তেমন অবশ্যম্ভাবী।... সমসাময়িক বঙ্গসংস্কৃতি আর বঙ্গসমাজ এই যৌথধর্ম মেনেই চলছে।...আমি রবীন্দ্রসাহিত্যের ধর্ম-গীতগুলার কথা বলছি। এই গানগুলা হিন্দু গানও নয়, মুসলমান গানও নয়, এসব হচ্ছে বাঙালি স্ত্রী-পুরুষ মাত্রের জন্য ঈশ্বর-বিষয়ক স্তোত্র। এ সবকে আমি হিন্দু-মুসলমানের যৌথ ভগবত্‌গীতা সমঝে থাকি। তাছাড়া আছে রবীন্দ্র-সাহিত্যের ধর্মোপদেশসমূহ। এই বাক্যগুলা হিন্দুর উপাসনাও নয়, মুসলমানদের উপাসনাও নয়। এই সবের ভেতর আমি পাই বাঙালি হিন্দু-মুসলমানের ঐক্যবদ্ধ আত্মবিশ্লেষণ ও পরমেশ্বর-ভক্তি। রাবীন্দ্রিক ভগবানকে ১৯৮০ সনের বহুসংখ্যক হিন্দু ও মুসলমান তাদের সার্বজনিক ভগবানরূপে পূজা করবে।" এইটি বিনয় সরকার বলেন ১৯৪২ সালে। দ্র—প্রবোধচন্দ্র সেন, রবীন্দ্রনাথের ধর্মচিন্তা, বিশ্বভারতী পত্রিকা ১৩৫৯ শ্রাবণ-আশ্বিন পৃ ২৮।

পৃ ২১১পা-টী ১— চয়নিকা। রবীন্দ্রনাথের প্রথম কাব্যসঙ্কলন। চয়নিকা, প্রকাশক শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বি. এ. এলাহাবাদ, ইণ্ডিয়ান প্রেস। কলিকাতা ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস, ২২ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট। এলাহাবাদ 'ইণ্ডিয়ান প্রেস' হইতে শ্রীপাঁচকড়ি মিত্র দ্বারা মুদ্রিত। পৃ ৪৫৯+৭ [মোট ১৩০টি কবিতা ১ম সংস্করণে সংকলিত হয়। রবীন্দ্রনাথের সহিত পরামর্শ করিয়া চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, অজিতকুমার চক্রবর্তী প্রভৃতি এই সম্পাদন কার্য করেন বলিয়া শোনা যায়]। চয়নিকার সাতখানি ছবি নন্দলাল বসুর দ্বারা অঙ্কিত। ইহার মধ্যে 'রুদ্র বৈশাখ' বা শিবের তাণ্ডবনৃত্য পূর্বে অঙ্কিত, অপরগুলি রবীন্দ্রনাথের কথামতো আঁকা। এই সময়ে অবনীন্দ্রনাথ নন্দলালকে কবির সহিত প্রথম পরিচিত করিয়া দেন। কবি তাঁহাকে কবিতা শোনাইতেন ও সেইভাব হইতে নন্দলাল ছবিগুলি আঁকিতেন (১৯০৯)। মুখপত্রে রবীন্দ্রনাথের ফোটো ছিল। গ্রন্থমধ্যে নিম্নলিখিত ছবিগুলি ছিল :

১. কেবল তব মুখের পানে চাহিয়া
২. ধূপ আপনারে মিলাইতে চাহে গন্ধে (ভূমিকা)
৩. যদি মরণ লভিতে চাও এস তবে ঝাঁপ দাও সলিল মাঝে
৪. খেপা খুঁজে খুঁজে ফিরে পরশ পাথর
৫. হে ভৈরব হে রুদ্র বৈশাখ (রঙিন)
৬. ভূমির পরে জানুপাতি তুলি ধনুঃশর
৭. আমায় নিয়ে যাবি কে রে দিনশেষের শেষ খেয়ায়

চয়নিকা এইভাবে ভাগ করা হয় : ভূমিকা। ও তৎপরে প্রবেশক কবিতা—'ধূপ আপনারে মিলাইতে চাহে গন্ধে।' গ্রন্থভাগ কবিমানস (পৃ ১-৮৮)। উতলা (পৃ ৮৯-১১৬)। রসরূপ (পৃ ১১৭-৪৮)। রূপক (পৃ ১৪৯-৮৪)। বিশ্বপ্রকৃতি (পৃ ১৮৫-২৩৪)। মানব (পৃ ২৩৫-৯৬)। কণিকা (পৃ ২৯৭-৩১০)। অতীত (পৃ ৩৩১-৩৬)। কথা (পৃ ৩৩৭-৮৬)। ভূমা (পৃ ৩৮৭-৪০২)। পরিণাম (পৃ ৪০৩-২৮)। গান (পৃ ৪২৯-৫৯)।

বিশ্বভারতী হইতে ১৩৩২ সালে যে 'চয়নিকা' প্রকাশিত হয়, তাহা সম্পূর্ণ পৃথক গ্রন্থ। কবির গ্রন্থ অনুযায়ী সঞ্চয়ন করা হয়। উহা আধুনিক 'সঞ্চয়িতা'র অগ্রদূত। বর্তমানে উহা অচলিত।

পৃ ২৩৪—সত্যজ্ঞান চট্টোপাধ্যায় হাসপাতালে। এই সময়ে (১৯১৩ সালের শেষ ভাগে) মেয়ো হাসপাতালে দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্র ছিলেন আবাসিক চিকিৎসক। বিলাতযাত্রার পূর্বে ও বিলাতে কবির সহিত ইঁহার ঘনিষ্ঠতা হয়। প্রত্যাবর্তনের পর মেয়ো হাসপাতালের 'খোলা ছাত'-এর উপর কয়েকজন তরুণ সাহিত্যিক মাঝে মাঝে জমায়েত হইতেন। রবীন্দ্রনাথ সেখানে কয়েকবার গিয়াছিলেন। যেদিন নোবেল-প্রাইজ পাইবার সংবাদ রাষ্ট্র হয়, সেইদিন কবি শান্তিনিকেতন হইতে লিখিয়াছিলেন, "আপনার খোলা ছাত আছে, খোলা প্রাণ আছে, আমরাও আছি, এই ত সভার মত সভা।"

আমাদের আলোচ্যপর্বে মেয়ো হাসপাতালে সত্যজ্ঞান চট্টোপাধ্যায় নামে শান্তিনিকেতনের এক শিক্ষক পীড়িত হইয়া কালাতিপাত করিতেছিলেন; রবীন্দ্রনাথ হাসপাতালের উপরতলায় গিয়াছিলেন, অথচ রোগীকে দেখিতে যান নাই; তজ্জন্য কথা উঠিয়াছিল। কবি শিলাইদহ হইতে ডাঃ দ্বিজেন্দ্রনাথকে নিম্নলিখিত পত্রখানি লেখেন (১৩২০ ফাল্গুন ॥ ১৯১৪ ফেব্রুয়ারি):

"পত্র পাইলাম সেদিন সত্যজ্ঞানবাবুকে দেখিতে যাই নাই বলিয়া আপনি এবং মেনার্ড সাহেব ক্ষোভ ও বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছেন।

"আমার স্বভাবে একটা গ্রন্থি আছে—একটা কেন, অনেকগুলা, ইহাও তাহার মধ্যে একটি—আমি হাঁসপাতালের রোগীশালায় যাইতে একান্ত কষ্ট বোধ করি। একবার মনোরঞ্জনবাবুকে দেখিতে জেনেরাল হাঁসপাতালে যাইতে হইয়াছিল তাহাতে অত্যন্ত পীড়া বোধ করিয়াছিলাম। সেখানে আমার যাওয়ার প্রয়োজন ছিল কারণ মনোরঞ্জনবাবু সেখানে আত্মীয়বান্ধবহীন ছিলেন এবং তাঁহাকে আমি কতকগুলি পড়িবার বই প্রভৃতি দিয়া আসিয়াছিলাম। নতুবা নিরর্থক লৌকিকতা আমার আসে না। আমি একলা রোগীর শুশ্রূষা অনেক করিয়াছি এবং মৃত্যু আমার কাছে সুপরিচিত। কিন্তু যেখানে হাঁসপাতাল ঘরে বহু রোগীকে এক ঘরে রাখিয়া দেয় সেখানে সেই দৃশ্য আমার কাছে কতই বেদনাজনক তাহা সহজে কেহ বুঝিবে না। এই কারণেই জেলখানায় আমি দর্শকরূপে যাইতে অত্যন্ত অনিচ্ছা ও ক্লেশ বোধ করি। স্কুলও আমার কাছে অনেকটা এই কারণেই কুৎসিত। মানুষের কষ্টের পশ্চাতে যেখানে আত্মীয়তার background নাই যেখানে কেবলমাত্র একটা ব্যবস্থার ঝাঁকার মধ্যে অনেকগুলা লোক একত্রে আবদ্ধ হইয়া থাকে সেখানকার অস্বাভাবিকতা আমার কাছে অত্যন্ত পীড়াকর। অথচ সমাজ যখন জটিল হইয়া উঠে তখন এরূপ প্রতিষ্ঠান-গুলি অত্যন্ত আবশ্যক। সুতরাং ইহার কল্যাণকরতা আমি কিছুমাত্র অস্বীকার করি না—কিন্তু এরূপ জায়গায় আমার উপস্থিতি যথার্থই প্রয়োজনীয় না হইলে আমি যাইতে পারি না। আপনাদের ওখানে যখন আমি যাই তখন আমি আপনাদের একতলার বড় ঘরটার আশে-পাশে দৃষ্টিপাতমাত্র করিতে পারি না। মানুষের রোগ ও কষ্টের একটা আব্রু আছে সেইটে ঘুচিয়া গেলে তাহার মত শোচনীয় আর কিছু নাই। বস্তুত এই দৃশ্যে আমার নিরতিশয় সঙ্কোচ হয়।… আমার এই সঙ্কোচকে আপনারা কবিত্ব বলিতে পারেন দুর্বলতা বলিতে পারেন কিন্তু ইহা আমার আছে তাহা কবুল করিলাম। যদিচ কবুল করিলেই দোষের ক্ষালন হয় না তবু কিছু লাঘব হয়—এ সম্বন্ধে আমি ঐ টুকুর বেশি আশা করি না।" বিশ্বভারতী পত্রিকা ১৩৫৫ শ্রাবণ-আশ্বিন পৃ ৫৭-৫৮।

পৃ ২৩৮—কুমারস্বামী। ৩০ ফাল্গুন ১৩১৭ নগেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলিকে কবি লিখিতেছেন: "কুমারস্বামীকে নিয়ে ব্যস্ত ছিলুম, তাঁর এখানকার সমস্ত ভাল লেগেছে—সমস্ত দিন আমার কাব্যগ্রন্থ নিয়ে আলোচনা করেছেন। তাঁর ভারি ইচ্ছা ওর থেকে উনি অনেকগুলো অনুবাদ করেন।" কুমারস্বামী, অজিতকুমার ও রবীন্দ্রনাথের সহযোগে কয়েকটি

কবিতা অনুবাদ করেন। সেগুলি তাঁহার Art and Swadeshi গ্রন্থে Poems of Rabindranath Tagore প্রবন্ধে সংকলিত আছে। দ্র দেশ ১৩৬২ অগ্রহায়ণ ৩ পৃ ১৭০।

পৃ ২৫৫—রবীন্দ্রনাথ জ্ঞানেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ব্যতীত নগেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলিকেও ইতিপূর্বে দীক্ষিত করেন। ৮ জ্যৈষ্ঠ ১৩১৪ বোলপুর হইতে নগেন্দ্রনাথকে লিখিতেছেন, "তোমাকে দীক্ষা দিয়া অবধি আমার মন তোমার এই নব জীবন ব্রতের প্রতি আবিষ্ট হইয়া আছে।" দেশ ১৩৬২ কার্তিক ১৮। নগেন্দ্রনাথ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজভুক্ত ছিলেন, বিবাহের জন্য তাঁহাকে আদিসমাজ মতে দীক্ষিত করা হয়। কিন্তু জ্ঞানেন্দ্রনাথ ছিলেন সাধারণ হিন্দু ঘরের ছেলে। কবির দ্বারা তিনি ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত হন। তবে তিনি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের নিষ্ঠাবান ব্রাহ্ম ছিলেন।

পৃ ২৫৮—তত্ত্ববোধিনী পর্ব :

১৮৩৯ অক্টোবর ৬ (১৭৬১ শক আশ্বিন ২১ কৃষ্ণপক্ষীয় চতুর্দশ তিথি) দ্বারকানাথ ঠাকুরের জোড়াসাঁকোর বাড়িতে 'তত্ত্ববোধিনী সভা' প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রথম নাম ছিল 'তত্ত্বরঞ্জনী সভা'; দ্বিতীয় অধিবেশনে 'তত্ত্ববোধিনী' নাম গৃহীত হয়। "ইহার উদ্দেশ্য আমাদিগের সমুদায় শাস্ত্রের নিগূঢ় তত্ত্ব এবং বেদান্ত প্রতিপাদ্য ব্রহ্মবিদ্যার প্রচার।" নিজ পরিবার ও আত্মীয়স্বজনের মধ্য হইতে মাত্র ১০ জনকে লইয়া দেবেন্দ্রনাথ এই সভা আরম্ভ করেন। তখন তাঁহার বয়স (জ. ১৮১৭) বাইশ বৎসর মাত্র।

তত্ত্ববোধিনী সভা হইতে ১৮৪০ জুন মাসে তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা স্থাপিত হয়। ১৮৪৩ সালটি দেবেন্দ্রনাথের জীবনের একটি বিশেষ বৎসর। এই বৎসরে তিনি (১) এপ্রিল মাসে বাঁশবেড়ের তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা প্রতিষ্ঠিত করেন, (২) ১৮৪৩ অগস্ট (১২৫০ সাল ভাদ্র) মাসে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা প্রবর্তন করেন, (৩) ডিসেম্বর মাসে (৭ পৌষ) ২০জন বন্ধুসহ প্রতিজ্ঞা পূর্বক বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ের নিকটে ব্রাহ্মধর্ম ব্রত গ্রহণ করেন। তখন দেবেন্দ্রনাথের বয়স ২৫ বৎসর।

পর বৎসর (১৮৪৪) তত্ত্ববোধিনী সভা হইতে চারিজন ব্রাহ্মণ ছাত্রকে কাশীতে চারি বেদ অধ্যয়নের জন্য পাঠানো হয়। ১৮৪৭-৪৮ এ তাঁহারা ফিরিয়া আসেন। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় রমানাথ ভট্টাচার্য (শাস্ত্রী) দীর্ঘকাল ধরিয়া বেদের বাংলা অনুবাদ প্রায় প্রতি মাসে প্রকাশ করেন। ইহাই বেদের প্রথম বঙ্গানুবাদ। ভারতের কোনো ভাষায় ইতিপূর্বে বেদের অনুবাদ হয় নাই।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদক—

১৮৪৩ অগস্ট ১৬। ১৭৬৫ শক ; ১২৫০ সাল ভাদ্র ১। প্রথম তিনমাস রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের নেতৃত্বে নানা লোকের রচনা সংগৃহীত হইয়া প্রকাশিত হয়। ১২৫০ অগ্রহায়ণ মাস হইতে অক্ষয়কুমার দত্ত তত্ত্ববোধিনীর সম্পাদন করেন।

১৮৪৪-১৮৫৬। ১৭৬৫-১৭৭৭ শক, ১২৫০ হইতে ১২৬২ পর্যন্ত—অক্ষয়কুমার দত্ত

১৮৫৬-৫৭। ১৭৭৮ শক, ১২৬৩ সাল—ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

১৮৫৭-৫৯। ১৭৭৯-৮০ শক, ১২৬৪-৬৫—নবীনকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

১৮৫৯-৬১। ১৭৮০-৮২ শক, ১২৬৬-৬৭ সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৮৬১-৬২। ১৭৮৩ শক, ১২৬৮—তারকনাথ দত্ত

১৮৬২-৬৩। ১৭৮৪ শক, ১২৬৯—আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ

১৮৬৩-৬৪। ১৭৮৫ শক, ১২৭০—প্রতাপচন্দ্র মজুমদার

১৮৬৪-৬৭। ১৭৮৬-৮৮ শক, ১২৭১-৭৩—অযোধ্যানাথ পাকড়াশী

১৮৬৭-৬৯। ১৭৮৯-৯০ শক, ১২৭৪-৭৫—হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন

১৮৬৯-৭০। ১৭৯১ শক, ১২৭৬—অযোধ্যানাথ পাকড়াশী

১৮৭০-৭১। ১৭৯২ শক, ১২৭৭—দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৮৭১-৭২। ১৭৯৩ শক, ১২৭৮—অযোধ্যানাথ পাকড়াশী ও আনন্দচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

১৮৭২-৭৮। ১৭৯৪-১৭৯৯ শক, ১২৭৯-১২৮৪—অযোধ্যানাথ পাকড়াশী

১৮৭৮-৮৪। ১৮০০-১৮০৫ শক, ১২৮৫-১২৯০—হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন

১৮৮৪-১৯০২। ১৮০৬-১৮২৩ শক, ১২৯১-১৩০৮—দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৯০২-০৩। ১৮২৪ শক, ১৩০৯—হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন

১৯০৩-০৬। ১৮২৫-১৮২৭ শক, ১৩১০-১৩১২—দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন

১৯০৬-০৭। ১৮২৮ শক, ১৩১৩—দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৯০৭-০৯। ১৮২৯-৩০ শক, ১৩১৪-১৩১৫—দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়

১৯০৯-১১। ১৮৩১-৩২ শক, ১৩১৬-১৩১৭—সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়

১৯১১-১২। ১৮ সংকল্প-১ম ভাগ, ১৮৩৩ শক, ১৩১৮— রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৯১২-১৩। ১৮ সংকল্প—২য় ভাগ, ১৮৩৪ শক, ১৩১৯— রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৯১৩-১৪। ১৮ সংকল্প—৩য় ভাগ, ১৮৩৫ শক, ১৩২০— রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৯১৪-১৫। ১৮ সংকল্প—৪র্থ ভাগ, ১৮৩৬ শক, ১৩২১— রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৯১৫-২২। ১৮৩৭-৪৩ শক, ১৩২২-১৩২৮—সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৯২২-২৬। ১৮৪৪-৪৭ শক, ১৩২৯-১৩৩২—ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৯২৬-৩০। ১৮৪৮-৫১ শক, ১৩৩৩-১৩৩৬—ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বনওয়ারিলাল চৌধুরী, ক্ষেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৯৩০-৩১। ১৮৫২ শক, ১৩৩৭— ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বনওয়ারিলাল চৌধুরী

১৯৩১-৩২। ১৮৫৩ শক, ১৩৩৮—ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৩১৮ সাল হইতে রবীন্দ্রনাথ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদক হন। শিলাইদহে মীরা দেবীকে ১৩১৮ সালের বৈশাখের গোড়ায় শান্তিনিকেতন হইতে লিখিতেছেন, 'তত্ত্ববোধিনীর সম্পাদক হয়ে আমার কাজ আরো বেড়ে গেছে।' ১৩২১ পর্যন্ত তিনি নামত সম্পাদক ছিলেন। কিন্তু কাজ চালাইতেন জ্ঞানেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ও নগেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলি। 'তত্ত্ববোধিনী সভা' পুনশ্চ প্রতিষ্ঠার জন্য কলিকাতায় চেষ্টা হয়, নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় আদিব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক ও সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর সহকারী সম্পাদক হন। কিন্তু ইহা কার্যকরী হয় নাই। দ্র যোগেশচন্দ্র বাগল প্রণীত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সাহিত্যসাধক চরিতমালা ৪৫ ; ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত অক্ষয়কুমার দত্ত দ্র সা-সা-চ ১২ ; সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী, তত্ত্ববোধিনী সভা, বিশ্বভারতী পত্রিকা ১৩৫০ পৃ ১৫-২২।

পৃ ২৫৯—রবীন্দ্রনাথের মতে আদি ব্রাহ্মসমাজ ছাড়া "অন্যান্য সকল ব্রাহ্মসমাজেই সাম্প্রদায়িকতার খোলাটা শক্ত হয়ে উঠেছে ; তাদের মতবাদের বেড়া ভেদ করে সকলের সঙ্গে সত্যভাবে তাদের এক করে মিলিয়ে নেওয়া অত্যন্ত শক্ত— তাদের ভাষা, তাদের চিন্তাপ্রণালী, তাদের আচার-ব্যবহার অনেকদিন থেকে এমন একটা পথ একেবারে অভ্যাস করে ফেলেছে, যার থেকে তাদের নড়ানো অসম্ভব বললেই হয়। তাদের এই পথটি এখানকার [আমেরিকার] য়ুনিটেরিয়ান খৃষ্টানদের গির্জার পথের যথাসম্ভব অনুকরণ। আমাদের দেশের আবিষ্কৃত পথ দিয়ে তারা সত্যকে অনুসরণ করতে একেবারেই নারাজ। তাদের দ্বারা আদি ব্রাহ্মসমাজের যথার্থ সৃষ্টিকার্য ঘটবে না।" নগেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলিকে লিখিত পত্র (পাণ্ডুলিপি হইতে)।

পৃ ২৫৯—আদিব্রাহ্ম সমাজ। আমেরিকার আর্বানা শহর হইতে রবীন্দ্রনাথ একখানি পত্রে জামাতা নগেন্দ্রনাথকে লিখিতেছেন, "ব্রাহ্মসমাজের উচ্চ আদর্শে হিন্দু সমাজ উৎকর্ষ লাভ করতে পারে।...আমি আমাদের সমাজের [আদি ব্রাহ্মসমাজ] গোঁড়া সভ্যদের ত্যাগ করেছি কারণ তাঁরা হিন্দুসমাজের দোষকে গ্রহণ ক'রে হিন্দুসমাজ ও সেই সঙ্গে ব্রাহ্মসমাজকে দুর্বল করেছিলেন। তেমনি আবার অন্য সমাজের [নববিধান ও সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ] যাঁরা গোঁড়া তাঁরা সাম্প্রদায়িক ঔদ্ধত্যবশত হিন্দুসমাজকে ঘৃণাভরে পরিত্যাগ ক'রে স্বজাতীয় সমাজের সুতরাং নিজের সম্প্রদায়ের মঙ্গলকে আঘাত করচেন—এও কোনো মতে চলবে না—এই জন্যেই আদি ব্রহ্মসমাজকে আমরা তাঁর বিশেষ স্বাতন্ত্র্য দিতে চাই···। এই জন্যেই আমি শান্তিনিকেতনের সঙ্গে এর যোগ রেখে এর মধ্যে একটি নূতন অথচ উদার প্রাণ সঞ্চার করতে চেয়েছিলুম—এই জন্যেই আমি একান্তভাবে কামনা করি শান্তিনিকেতনের দলের সঙ্গে তোমার যোগ কোনো কারণ বাধাগ্রস্ত না হয়। তাঁদের দ্বারাই আমি আদি ব্রাহ্মসমাজের যথার্থ উন্নতি প্রত্যাশা করি। আমরা অন্যান্য ব্রাহ্মসমাজের সঙ্কীর্ণ সীমার দ্বারা সীমাবদ্ধ হতে চাইনে—আমরা তাঁদের চেয়েও বড় হতে চাই।" নগেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলিকে লিখিত পত্র (পাণ্ডুলিপি হইতে)।

পৃ২৭১—৪ ফাল্গুন ১৩১৮ কবি কলিকাতায় গেলেন। সেখান হইতে শিলাইদহে যান ও চৈত্রের গোড়ায় কলিকাতায় আসিয়া (৩ চৈত্র) 'ভারতবর্ষের ইতিহাসের ধারা' প্রবন্ধ পাঠ করেন। ৬ চৈত্র বিলাত যাওয়ার প্রাক্‌কালে শরীর অসুস্থ হয়, যাওয়া হইল না (পৃ ২৭৩)। চৈত্রের মাঝামাঝি শিলাইদহে ফিরিয়া গেলেন। এই সময়ে গীতিমাল্যের গান ও ইংরেজি গীতাঞ্জলির তর্জমা করেন।

পৃ ২৭৫—১৩১৯ গ্রীষ্মাবকাশের পূর্বে ১০ই বৈশাখ 'রাজা' অভিনয় হয় নাই,—অভিনয় হয় 'রাজা ও রানী'। রবীন্দ্রনাথ কোনো অংশ গ্রহণ করেন নাই। এই অভিনয়ে কে কী ভূমিকা গ্রহণ করেন তাহার তালিকা :

বিক্রমদেব—অজিতকুমার, কুমার—সন্তোষচন্দ্র মজুমদার, দেবদত্ত—ক্ষিতিমোহন সেন, শঙ্কর—নেপালচন্দ্র রায়, রানী সুমিত্রা—সুধীরঞ্জন দাস, ইলা—সুশীল চক্রবর্তী। দ্র. পুণ্যস্মৃতি, সীতাদেবী, প্রবাসী ১৩৩৮ ফাল্গুন পৃ ৫০৩।

পৃ ৩০২—St. John of the Cross. সেণ্ট জন্ অব্ দি ক্রস (St. Jean de le Croix ১৫৪২-১৫৮১)। ইনি সাধ্বী থেরেসা (Teresa, Theresa ১৫১৫-৮২)-র শিষ্যা। থেরেসা কারমালাইট সাধিকা-আশ্রম (nunnery) পুনর্গঠন কালে সেণ্ট জনের সহায়তা লাভ করেন। ক্রুজেড যুগে ফিলিস্থানের (Palestine) কারমেল পর্বতের উপর এই আশ্রম প্রথম স্থাপিত হয়। পরে তুর্কী মুসলীমদের অভ্যুদয়ে উহা সেখান হইতে বিলুপ্ত হয়। ১৫৬২ অব্দে পোপের অনুমতি লইয়া থেরেসা কারমালাইট-সম্প্রদায় পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন। এই কার্যে সেণ্ট জন অব্ দি ক্রসের আধ্যাত্মিকতা বিশেষভাবে স্মরণীয়।

পৃ ৩০৮—রবার্ট ব্রিজেসের প্রস্তাব রবীন্দ্রনাথ গ্রহণ করেন নাই। কিন্তু কালের পরিবর্তনে রবীন্দ্রনাথ দেখিতেছেন যে ইংলন্ডে তাঁহার কাব্যের সমাদর বিশ বৎসরের মধ্যে প্রায় লুপ্ত হইয়া আসিয়াছে। ১৯৩১ সালের ৬ মে রামানন্দবাবুকে লিখিতেছেন :

"সাহিত্যিক অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে যে সম্মান—আমি তার স্থায়িত্বকে বিশ্বাস করি না। ইংলণ্ডে আমার রচনার ভাষা তাদের পরিচিত ভাষা। এইজন্য তার সমাদর প্রথম বিস্ময়ের পর ক্রমেই অনুজ্জ্বল হবার কথা। সেখানে সাহিত্যের ভাষা মূলতই তলিয়ে যাচ্ছে। আমার হাতের ইংরেজি ক্ষণকালের জন্য যতই বিস্ময়কর হোক চিরকালের বন্দরে তার নোঙর আঁকড়ে থাকতে পারবে না, সে আমার জানা কথা। সেই জন্য এই সস্তাপাতি সম্মান নিয়ে গর্ব করতে আমার লজ্জা করে।··· আমি যে তাঁদের সাহিত্যিক মণ্ডলের মধ্যে স্থান নিতে পারি তা আমি কল্পনাও করি নি প্রত্যাশাও করি নি। সুতরাং এ ব্যাপারটা সবশুদ্ধ একটা দৈবাগত অপঘাত বললেই হয়।" প্রবাসী ১৩৩৮ আষাঢ় পৃ ২৭৫।

১৯৩০ জানুয়ারি ৩ তারিখে সত্যভূষণ সেনকে লিখিয়াছিলেন : "ইংরেজি অনুবাদে আমার ছোটোগল্প ইংরেজি পাঠকের ঠিক রুচিকর হয় না তার প্রমাণ পেয়েছি। আধুনিক ইংরেজ সাহিত্যে গল্প লেখার যে ঠাট প্রচলিত হয়েছে তার সঙ্গে এ সব গল্পের একটুও মিল হয় না—তাই এগুলির ইংরেজি করবার চেষ্টা বৃথা বলে আমি মনে করি।" দ্র কবিপ্রণাম পৃ ১০৪।

পৃ ৩১১—Mr. Vail য়ুনিটেরিয়ান খ্রীস্টান। দ্রষ্টব্য *Heroic lives in Universal Religion*, a manual for religious instruction in junior grades by Albert R. Vail and Emily Mecleilan Vail—The Beacon Press, 25 Beacon Street, Boston, Mass. Chap. XXII. A saint and a poet from India [about Maharshi Debendranath Tagore and Rabindranath].

পৃ ৩১২—পাঠসঞ্চয় (১৩১৯) গ্রন্থে 'আমেরিকার একটি বিদ্যালয়' প্রবন্ধ (পৃ ৭৫-৮১)। মিস্ মার্থা বেরি (Berry ১৮৬৬-১৯৪২) জর্জিয়া স্টেটে ১৯০২ সালে একটি স্কুল স্থাপন করেন। রবীন্দ্রনাথ প্রবন্ধটিতে লেখেন, "এক্ষণে ছয় বৎসর হইয়া গেছে।" সুতরাং ১৯০৮।০৯ অব্দে লিখিত। বর্তমানে বেরির স্কুল বিরাট প্রতিষ্ঠান। ৫টি মাত্র ছাত্র লইয়া অতি দীনভাবে মিস্ বেরি স্কুল আরম্ভ করেন। রবীন্দ্রনাথ সাময়িক কোনো আমেরিকান পত্রিকা হইতে এই স্কুল সম্বন্ধে তথ্যগুলি জানিতে পারেন। দ্র Tracy Byers লিখিত Martha Berry, the Sunday Lady of Possorm Trot, 1932। এ বিষয়ে বিস্তারিত তথ্যাদি বিশ্বভারতী প্রকাশন বিভাগে দিয়াছি।

পৃ ৩১৩— আমেরিকায়। ১৩১৯ পৌষ ১০। ১৯১২ ডিসেম্বর ২৪। "আজ খৃষ্টমাস। এই মাত্র ভোরের বেলা আমরা আমাদের খৃষ্টোৎসব সমাধা করে উঠেছি। রথী. বৌমা শিকাগোতে গেছেন—কেবল বঙ্কিম, সোমেন্দ্র এবং আমি এইখানে আছি। আমরা তিনজনে আমাদের শোবার ঘরের একটি কোণে বসে আমাদের উৎসব করলুম—কিছু অভাব বোধ হল না—উৎসবের যিনি দেবতা তিনি যদি আসন গ্রহণ করেন তাহলে কোনো আয়োজনের ত্রুটি চোখে পড়েই না। তাঁকে আজ প্রণাম করেছি তাঁর আশীর্বাদ আমরা গ্রহণ করেছি। আমরা একান্ত মনে প্রার্থনা করেছি যদ্‌ভদ্রং তন্নআসুব।··· সত্যের পথে যাবার পক্ষে মানুষই মানুষের পক্ষে সকলের চেয়ে বড়ো বাধা, তেমনি মানুষই মানুষের পক্ষে পরম সহায়,—সেই মানুষটিই আজ জন্মেছিলেন, তিনিই আজ আমাদের জীবনের মধ্যে জন্মগ্রহণ করুন—নিষ্কলঙ্ক শুভ্র শিশুটি হয়ে, একেবারে নিরুপায় পিতার সন্তানটি হয়ে, একেবারে নিঃসম্বল নিষ্কিঞ্চন হয়ে।·· আজ সকালে তাঁর দরবারে আর একবার দাঁড়িয়েছি। সমস্ত মানুষের হয়ে মানুষের বড়ো ভাই এই প্রার্থনা করে গিয়েছেন—Thy Kingdom come! আমাদের ঋষিরাও সেই কথাই আর এক ভাষায় বলছিলেন—'অবিরাবীর্ম এধি।'" হেমলতা দেবীকে লিখিত পত্র।

পৃ ৩১৩—আমেরিকার আর্বানা হইতে শিকাগোতে। "Soon after New year's-Day (1913) Mr. Tagore arrived with his son and exquisite little daughter-in-law, and during the winter the visit was repeated three or four times." ১৯১২ ডিসেম্বর মাসে শিকাগোর Poetry নামে পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের Gitanjali-র ৬টি কবিতা প্রকাশিত হয়। ইংলনডে দুই মাস পূর্বে ইনডিয়া সোসাইটির নিজস্ব সংস্করণ বাহির হইয়াছিল বটে; কিন্তু পাবলিক্ এখনো রবীন্দ্রনাথের রচনার স্বাদ গ্রহণ করে নাই। এগুলি লনডনে সংগ্রহ করেন এজ্‌রা পাউন্ড।···শিকাগো ট্রিবিউন (Chicago Tribune) পোএট্রি-র এই সংখ্যায় প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের কবিতা সম্বন্ধে সম্পাদকীয় বীথিতে মন্তব্য লেখেন। এইভাবে আমেরিকার পাঠকগণ রবীন্দ্রনাথের নাম প্রথম জানিতে পারিল। দ্র Harriet Mouroe, Tagore in Chicago, The Golden Book of Tagore, p 169.

পৃ ৩১৪— রচেস্টার Race conflict সম্বন্ধে বক্তৃতার অনুবাদ 'জাতি সংঘাত', অজিতকুমার চক্রবর্তী কৃত, প্রবাসী ১৩২০ জ্যৈষ্ঠ ; 'জাতি বিরোধ', প্রিয়ম্বদা দেবীকৃত অনুবাদ, ভারতী ১৩২০ জ্যৈষ্ঠ।

পৃ ৩১৫ পা-টী ২— ১৯১০ সালে অধ্যাপক মুডি (W. V. Moody)-র মৃত্যু হয়। শ্রীমতী মুডির মৃত্যুর পর তাঁহার পত্রাদি রবীন্দ্রসদনে আসিয়াছে। এই সংগ্রহে বহু পত্র, টেলিগ্রাম প্রভৃতি আছে।

পৃ ৩৪১— "ফাল্গুনের গোড়ায় কবি শিলাইদহে আশ্রয় লইলেন।" শান্তিনিকেতন হইতে ফাল্গুনের প্রথম ভাগে কবি কলিকাতায় আসেন ; এই সময় রামমোহন-লাইব্রেরিতে ছোটো একটি সভা হয়। উদ্যোক্তারা ঘরোয়াভাবে সভাটি করিতে চান, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ আসিতেছেন এ সংবাদ রাষ্ট্র হইয়া গেলে সভায় অসম্ভব লোক সমাগম হয়। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী সভাপতি হইয়াছিলেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরও এই সভায় আসিয়াছিলেন। সীতাদেবী লিখিতেছেন, "বক্তৃতা না হইয়া কথোপকথন হয়, ইহাই ছিল কবির ইচ্ছা, কিন্তু তিনি উপস্থিত থাকিলে কথা বলিতে কেহই রাজী হইত না, সুতরাং ব্যাপারটা শেষ পর্যন্ত বক্তৃতাই হইয়া দাঁড়াইল। প্রথমে তিনি তাঁহার ইংরেজি গীতাঞ্জলি লেখার ইতিহাস খানিকটা দিলেন। তাহার পর ২৩শে নভেম্বর [১৯১৩। ১৩২০ অগ্রহায়ণ ৭] শান্তিনিকেতনে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহার কারণ সম্বন্ধে কিছু" বলিয়াছিলেন। ..."সভাপতি শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় উঠিয়া রবীন্দ্রনাথের মাথায় হাত দিয়া উচ্ছ্বসিত আশীর্বাদ করিলেন।" পুণ্যস্মৃতি, প্রবাসী ১৩৪৮ চৈত্র পৃ ৬৭৩।

পৃ ৩১৫—ওকাকুরা (Okakura) ১৯১১ ফেব্রুয়ারি মাসে রবীন্দ্রনাথ বস্টনে আসেন; সেই সময়ে ওকাকুরা বস্টন মিউজিয়ামের প্রাচ্যবিভাগের অধ্যক্ষ। কবি জাপানে প্রদত্ত বক্তৃতায় (১৯২৯ মে ১৫) ওকাকুরা সম্বন্ধে দীর্ঘ ভাষণ দান করিয়া বলেন :

"Then I had the privilege of meeting him once again in America in Boston,... and I found what profound admiration he inspired among those cultured Americans of Boston who came into contact with him. On this occasion of our last meeting he was almost mortally ill and intending to come back to his native soil. He asked me to visit China...He expressed very profound respect for China....According to him, China was a great country with endless possibilities ;...it was his wish that I should know and acknowledge this ; and that was another good help which he rendered me. It at once strengthened my interest for that ancient land, my faith in her future, because I could trust him when he expressed his admiration for those people, who are today [1929] living in comparative obscurity, whose lamps of culture are not completely lit up, but who were according to him, waiting for another opportunity to have the fullness of illumination, shedding fresh glory upon the history of Asia. When I first met him [1903], I neither knew Japan nor I had any experience of China. I came to know both of these countries from the personal relationship with this great man, whom I had the good fortune to meet and accept as one of my intimate friends." From Address delivered on the 15th of May, 1929, at the Kogya Kurbu (Industrial Club), Tokyo. V. B. News vol I. 1933 Feb. p 73.

রবীন্দ্র-জীবনী ২য় খণ্ডের ১ম পৃষ্ঠায় আছে ওকাকুরা স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে ভারতে আসেন। এ তথ্য ঠিক নহে ; স্বামীজিকে জাপানে লইয়া যাইবার জন্য তিনি আসিয়াছিলেন ; কিন্তু তখন স্বামীজির শরীর ভাঙিয়া গিয়াছে ; কয়েক মাস পরে তাঁহার মৃত্যু হয়।

পৃ ৩৪১—পাবনায় উত্তর-বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের ৭ম অধিবেশনে কবি-সংবর্ধনা হয়। কবির উত্তর. মানসী ৬ষ্ঠ বর্ষ ৩য় সংখ্যা ১৩২১ বৈশাখ মাসে প্রকাশিত হয় পৃ ৩২৫-২৬।

প্রথম দিন সভায় কবি নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির জন্য দেশবাসীর আনন্দ জ্ঞাপনের উত্তরে কিছু বলেন। দ্বিতীয় দিন অক্ষয় মৈত্রেয়ের অনুরোধে সাহিত্য সম্মেলনের সার্থকতা সম্বন্ধে ভাষণ দান করেন।—নলিনীকান্ত ভট্টশালী, ঢাকায় রবীন্দ্রনাথ, শনিবারের চিঠি ১৩৪৮ আশ্বিন পৃ ৮৪০-৪২।

পৃ ৩৫২—রামগড়ে বাড়ি ক্রয়। বাড়ির নাম দেন 'হৈমন্তী'। সবুজপত্রে প্রকাশিত 'হৈমন্তী' গল্প এখানে লেখা। রামগড়ে "আসার পর গুরুদেবের ডাক্তার বলে খ্যাতি পাহাড়ীদের গাঁয়ে ছড়িয়ে পড়ল। আমাদের বাগানে একটি পক্ষাঘাতগ্রস্ত রুগী প্রায়ই ভিক্ষে করতে আসত। বেচারার কষ্ট দেখে তিনি ওষুধ দিতে লাগলেন। এই রুগীটির জন্য তাঁর কত করুণাই দেখেছি। ক্রমে ক্রমে হোমিওপ্যাথিক ওষুধে তাকে সুস্থ করে তোলেন। সেই থেকে তাঁর ডাক্তারি সম্বন্ধে পাহাড়ীদের দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে গেল। গোমস্তা টীকারাম রোজ তাঁর কাছে রুগীদের ওষুধ নিয়ে যেত।" প্রতিমা দেবী, স্মৃতিচিত্র, বিশ্বভারতী পত্রিকা ১৩৫২ পৃ ৫২। কবির নামের পূর্বে Dr. (Doctor) লেখা থাকায় শুনিয়াছি স্থানীয় পোস্টমাস্টারের নিকট হইতে তাঁহার ডাক্তার-খ্যাতি চারিদিকে রটনা হয়।

ডাঃ পশুপতি ভট্টাচার্য 'ভারতীয় ব্যাধি' গ্রন্থের ভূমিকায় কবির সাঁওতালদের চিকিৎসার কথা লিখিয়াছিলেন। কবির চিকিৎসা সম্বন্ধে ডাক্তার পশুপতি ভট্টাচার্য প্রত্যক্ষদর্শী। তিনি একবার গান শিখিবার জন্য শান্তিনিকেতনে মাস দুই কাল বাস করেন। কবির তিরোধানের পর তিনি লেখেন, "তাঁর ঘরে দেখলাম হোমিওপ্যাথির কয়েকটা মোটা মোটা বই আছে। প্রত্যহ সকালে দেখতে পেতাম, অনেক রোগী তাঁর দরজায় এসে জড়ো হয় ওষুধ নিতে। একদিন দেখলাম, আশ্রমে একটি ছেলের ইরিসিপেলাস হয়েছে, রবীন্দ্রনাথ তাকে ওষুধ দিচ্ছেন। ব্যাপারটা নিতান্ত সামান্য হয়নি, কিন্তু কয়েকদিন বাদে দেখলাম ছেলেটি সেরেই গেল। [এই ছাত্রটি রবীন্দ্র-জীবনী-লেখকের কনিষ্ঠ ভ্রাতা সুহৃৎকুমার] আশ্রমের লোকেরা বললে, উনি চমৎকার ওষুধ দিতে পারেন, তাতেই তাদের অনেক রোগ সেরে যায়, অন্য ডাক্তার দেখাবার প্রায়ই দরকার হয় না।" চিকিৎসক রবীন্দ্রনাথ, শনিবারের চিঠি ২৪৮ পৃ ৮৫৭-৫৮।

রবীন্দ্রনাথের উৎসাহ ও আগ্রহে ডাক্তার পশুপতি 'ভারতীয় ব্যাধি' নামে গ্রন্থখানি লেখেন ; কবি গ্রন্থের নাম দেন এবং পাণ্ডুলিপি দেখিয়াই মস্ত বড়ো এক ভূমিকা লিখিয়া ডাক্তারকে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথের তাগিদে বই ছাপা হয়। বইখানি বাংলাভাষায় অমূল্য সম্পদ ; যাঁহারা সে বই পড়িয়াছেন তাহারাই ইহা স্বীকার করিবেন; সুতরাং রবীন্দ্রনাথ যে দীর্ঘ ভূমিকা লিখিয়া দেন তাহা লেখকের প্রাপ্য সম্মান। কবি ভূমিকায় লেখেন, "ডাক্তারি বইয়ের ভূমিকা কবির চেয়ে কবিরাজকে মানায় ভালো। এ কাজে আমার যদি সত্যিকারের কোনো তাগিদ থাকে তবে সে রোগীর তরফ থেকে। কিছুকাল থেকে গ্রামের কাজে নিযুক্ত আছি, দেখেছি এ দেশে সকলের চেয়ে গুরুতর অভাব আরোগ্যের। বিবিধ উপায়ে গ্রামে গ্রামে ঘরে ঘরে এদেশের লোককে বুঝিয়ে দেওয়া উচিত ছিল কী করে রোগ ঠেকানো যায়। রাশিয়াতে এই প্রচারকার্য কিরকম সম্যকভাবে ব্যাপকভাবে সমস্ত দেশ জুড়ে চলছে তা দেখে এসেছি। আমাদের দেশে এর প্রয়োজন দেখানো তার চেয়ে অনেক বেশি, অথচ আয়োজন নেই বললেই হয়।...

"রোগের পরিচয়ে শরীরের পরিচয় পাওয়া যায়। শরীরী মানুষ এ সম্বন্ধে উদাসীন থাকতে পারে না।...এদেশে রোগ যত সুলভ, ডাক্তার তত সুলভ নয়।

"গ্রামের যদি কোথাও এক-আধজন হৈতিষী শিক্ষিত লোক থাকেন তাঁরাও এই রকম বইয়ের সাহায্যে উপস্থিত অনেক উপকার করতে পারবেন, আমার মতো সাহিত্য-ডাক্তার যাকে দায়ে পড়ে ভিষক্-ডাক্তার হতে হয় তার তো কথাই নেই।...যাদের সাধ্যগোচরে কোথাও কোনো চিকিৎসার উপায় নেই তারা যখন কেঁদে এসে পায়ে ধরে

পড়ে, তাদের তাড়া করে ফিরিয়ে দিতে পারি এত বড়ো নিষ্ঠুর শক্তি আমার নেই। এদের সম্বন্ধে পণ করে বসতে পারিনে যে পুরো-চিকিৎসক নই বলে কোনো চেষ্টা করব না। আমাদের হতভাগ্য দেশে আধা-চিকিৎসকদেরও যমের সঙ্গে যুদ্ধে আড়কাটি দিয়ে সংগ্রহ করতে হয়।......ডাক্তার পশুপতিকে আশীর্বাদ করে আমি মাঝে মাঝে এই বইখানি পড়ব এবং সেই পড়া নিশ্চয়ই কাজে লাগবে।"

পৃ ৩৬২—'ছবি' কবিতা। প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ 'কবি কথা'য় লিখিতেছেন, "১৩২১ সালে কার্তিক মাসে কবি কিছুদিন তাঁর ভাগিনেয় সত্যপ্রসাদ গাঙ্গুলির বাড়িতে [এলাহাবাদে] ছিলেন। কবির কাছে শুনেছি এই বাড়িতে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের পত্নী, কবির নতুন বৌঠানের একখানা পুরানো ফটো তাঁর চোখে পড়ে, আর এই ছবি দেখেই বলাকার 'ছবি' নামে কবিতাটি লেখেন।" বিশ্বভারতী পত্রিকা ১৩৫০ কার্তিক-পৌষ সংখ্যা পৃ ১৪৭-৪৮।

প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ লিখিতেছেন, "প্রিয়জনের মৃত্যুর পরে কোনো স্মৃতিচিহ্ন আঁকড়িয়ে ধরে থাকা কবি পছন্দ করতেন না।" মহর্ষিও এ বিষয়ে কঠিন মত পোষণ করিতেন। সদর স্ট্রীটের বাড়িতে মহর্ষির একবার অসুখ হয়; বাঁচিবেন বলিয়া ভরসা ছিল না। এই সময়ে তিনি রবীন্দ্রনাথকে ডাকিয়া পাঠান ও বলেন " 'আমি তোমাকে ডেকেছি, আমার একটা বিশেষ কথা তোমাকে বলবার আছে। শান্তিনিকেতনে আমার কোনো ছবি বা মূর্তি বা ঐ রকম কিছু থাকে আমার তা ইচ্ছা নয়। তুমি নিজে রাখবে না। আর কাউকে রাখতেও দেবে না। আমি তোমাকে বলে যাচ্ছি এর যেন অন্যথা না হয়।' " এই ঘটনার উল্লেখ করিয়া কবি প্রশান্তচন্দ্রকে বলেন, " 'বুঝলুম মৃত্যুর পরে তাঁর কোনো স্মৃতিচিহ্ন নিয়ে পাছে কোনো রকম বাড়াবাড়ি কাণ্ড ঘটে এই আশঙ্কায় তাঁর মন উদ্‌বিগ্ন হয়ে উঠেছিল। বাবামশায় জানতেন এ বিষয়ে আমার উপরে তিনি নির্ভর করতে পারেন। তাই সেদিন আর কাউকে না ডেকে আমাকেই ডেকে পাঠিয়েছিলেন।' "

শান্তিনিকেতন আশ্রমে মহর্ষির কোনো ছবি বা মূর্তি কখনো রাখা হয় নাই এবং রাখা নিষিদ্ধ। জোড়াসাঁকোর বাড়ির তিনতলায় যে-ঘরে মহর্ষি দেহত্যাগ করেন, অনেকের ইচ্ছা ছিল সেই ঘরে তাঁহার স্মৃতিচিহ্ন দিয়া সাজাইয়া রাখা হয়। রবীন্দ্রনাথ এসব প্রস্তাবে কখনো রাজি হন নাই; তিনি ঐ ঘর অন্য সব ঘরের মতেই ব্যবহার করিয়াছিলেন।

কবির নিজের কাছেও কখনো কাহারও ছবি বা ফটো রাখিতে দেখা যায় নাই। ছবি সম্বন্ধে যে কবির কোনো আপত্তি ছিল তাহা নহে ; তাঁহার অসংখ্য ছবি তোলা হইয়াছে, নিজ ছবিতে যে-কেহ সহি চাহিয়াছে—দিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার কোনো আসক্তি ছিল না।

রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর শান্তিনিকেতনে দেখা যায় কবি যে-ঘরে থাকিতেন, বিশেষভাবে উদীচীতে—যেখানে প্রথমদিকে তাঁহার খাটচৌকি প্রভৃতি ছিল সেখানে বাহির হইতে লোকে আসিয়া প্রণামাদি আরম্ভ করে; বৈতালিক দল সেখানে গান করিয়া যায়। এই সব দেখিয়া রথীন্দ্রনাথ চিন্তিত হইয়া পড়েন ও আমাদের পুরাতন কয়েকজনকে ডাকাইয়া পরামর্শ করেন। স্থির হইল যে এইসব ভাঙিয়া দিতে হইবে। তাহার পর রবীন্দ্রনাথের এই সকল মর্ত্য চিহ্নাদি স্থানান্তরিত করা হয়।

পৃ ৩৭৫- ফাল্গুনী পর্ব। ১ ফাল্গুন ১৩২১ (১৩ ফেব্রুয়ারি ১৯১৫ হইবে, ১৯১৮ নহে)।

পৃ ৩৭৬—'স্রুলের নির্জনতার মধ্যে ফাল্গুনী নাটিকাটি লিখিতে প্রবৃত্ত।' কবি, ডাঃ দ্বিজেন্দ্র মৈত্রকে লিখিতেছেন (১৬ ফাল্গুন ১৩২১): "আশ্রমের ছেলেবুড়ো সবাই ধরেছে বসন্ত উৎসবের উপযোগী একটা ছোটো নাটক রচনা করে দিতে হবে।...গানের সুরগুলো মস্তিষ্কের মৌচাকটার মধ্যে গুন্‌গুন্ করতে লেগে গেছে।" ইতিমধ্যে ভারতের বড়লাট-ভাইসরয় লর্ড হার্ডিংজ দিল্লী হইতে কলিকাতায় আসিয়াছেন। বারাকপুরে ২০ ফাল্গুন তাঁহার কাছ হইতে নিমন্ত্রণ পাইয়াছেন। কবি সে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলেন না; হিতসাধন মণ্ডলীর সভার জন্য আহ্বান আসিয়াছে, তাহাও প্রত্যাখ্যান

করিয়া লিখিলেন, "একদিকে আমাকে সরস্বতী তাগিদ করচেন, তার উপরে রাজলক্ষ্মীও পেয়াদা পাঠিয়েছেন—তার উপরে আবার ভারতলক্ষ্মীও যদি দরজা ঠেলাঠেলি করেন তাহলে আমার আর আশা নেই। অতএব তিনটির মধ্যে প্রথমটিকেই মানতে হচ্ছে, তাঁকে এড়ানো আমার পক্ষে সোজা নয়। তাই···রইল বারাকপুর, রইল আপনার সভা। কবির অবস্থা এখন এমনতর যে ডাক্তারের আয়ত্তের বাইরে।" বিশ্বভারতী পত্রিকা ১৩৫৫ শ্রাবণ-আশ্বিন পৃ ৬০-৬১।

পৃ ৪০৩, ৪০৮—জমিদারিতে গ্রামোন্নয়নের চেষ্টা। "অতুলচন্দ্র সেনকে এই পল্লীসংস্কার সম্বন্ধে কবি যে পত্র দেন" (৪০৮) তৎসম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা :—

১৯০৪ সালে কবি 'স্বদেশী সমাজ'-এর পরিশিষ্টরূপে গ্রামের কাজের যে খসড়া প্রস্তুত করিয়াছিলেন, তাহার কথা আলোচিত হইয়াছে। স্বদেশী আন্দোলনের গোড়ার দিকে কালীমোহন ঘোষ প্রমুখ যুবকের দল প্রথম গ্রামোন্নয়ন কর্মে ব্রতী হন। পুলিসের উপদ্রবে সে কাজ বন্ধ হয়। তারপর রথীন্দ্রনাথ ও নগেন্দ্রনাথ আমেরিকা হইতে কৃষিবিৎ হইয়া আসিলেন ; শিলাইদহে তাঁহাদের কাজের সকল প্রকার আয়োজন করিয়া দেওয়া হইল। কিন্তু সেখানে সে কাজ ব্যর্থ হয়। তারপর সুরুল কুঠি ক্রয় করিয়া বহু সহস্র টাকা ব্যয়ে সেখানে লাইব্রেরি, ল্যাবরেটরি বিজলি বাতি প্রভৃতির ব্যবস্থা করিয়া রথীন্দ্রনাথকে গ্রামসংস্কারে ব্রতী করেন ; কিন্তু সে ব্যবস্থাও বেশি দিন চলে নাই। অথচ কবির প্রাণ গ্রামের কাজের জন্য উৎসুক। ১৯১৫ সালে ডাঃ দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্র 'হিতসাধন মণ্ডলী' নামে একটি প্রতিষ্ঠান গড়িলেন—রবীন্দ্রনাথই তাঁহার প্রেরণা দান করেন। 'কর্মযজ্ঞ' ও 'পল্লীর উন্নতি' শীর্ষক প্রবন্ধদ্বয়ে স্বদেশী সমাজের কথা পুনরায় আরও ব্যাপকভাবে বলিলেন। মণ্ডলীর কর্মপদ্ধতি কবি এইরূপ নির্ধারণ করিয়া দিয়াছিলেন :— ১. নিরক্ষরদিগকে অন্তত যৎসামান্য লেখাপড়া ও অঙ্ক শেখানো। ২. ছোটো ছোটো 'ক্লাস' ও পুস্তিকা প্রচারদ্বারা স্বাস্থ্যরক্ষা, সেবাশুশ্রূষাদি সম্বন্ধে শিক্ষাদান। ৩. ম্যালেরিয়া, যক্ষ্মা, নানাবিধ অজীর্ণ ও উদরাময় রোগ প্রভৃতির প্রতিষেধের জন্য সমবেত চেষ্টা। ৪. শিশুমৃত্যু নিবারণের উপায় নির্ধারণ ও অবলম্বন। ৫. গ্রামে উৎকৃষ্ট পানীয় জলের ব্যবস্থা। ৬. গ্রামে গ্রামে যৌথ ঋণদান সমিতি ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা ও দরিদ্র লোকদিগকে ইহার উপকারিতা প্রদর্শন। ৭. দুর্ভিক্ষ, বন্যা, মড়ক প্রভৃতির সময় দুঃস্থদিগকে বিবিধ প্রকারে সাহায্য।

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার ভাষণে নবযুবকদিগকে গ্রামের দিকে ফিরিতে বলিলেন। পৃথিবীব্যাপী প্রথম মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইয়া গিয়াছে ; দেশের স্বাধীনতা কিভাবে আনা যায় সে সম্বন্ধে বিভিন্ন দল ও দলপতিরা নানাভাবে চিন্তা করিতেছেন। তবে সকলেরই অন্তরের ইচ্ছা গণসংযোগ—অর্থাৎ দেশের লোকের মনকে জাগাইবার জন্য উপায় উদ্ভাবন। একথা অতি সত্য, গ্রামের লোক কেহ কাহাকে বিশ্বাস করে না, বাহিরের লোককেও তাহারা সন্দেহের চক্ষে দেখে। শহরের লোক হইতে গ্রামের লোক সরল-সোজা—একথা ভাবিবার কোনো কারণ নাই। গ্রামের মধ্যে কর্মকেন্দ্র স্থাপন করিবার জন্য অতুল সেন প্রমুখ কয়েকজন যুবক কবির কাছে আসেন ; কবি সানন্দে তাহাদিগকে তাঁহার জমিদারিতে 'কাজ' করিবার সকল প্রকার সুযোগ দান করিলেন ; অতুল সেনকে লিখিত পত্রগুলি পাঠ করিলে সেইটি স্পষ্ট হইবে। এ সম্বন্ধে বিশেশ্বর বসুকে লিখিত পত্র হয়তো তাঁহার পুত্রদের নিকটও থাকিতে পারে। উপেন্দ্র ভদ্র, বিদ্যুৎলতা দত্তের নিকটও হয়তো পত্র পাওয়া যাইতে পারে।

রবীন্দ্রনাথ উত্তরবঙ্গের কালিগ্রাম পরগনার জমিদার। এইখানে অতুল সেন প্রধান কর্মীরূপে আসিলেন ; সহকারী আছে উপেন্দ্র ভদ্র ও বিশেশ্বর বসু। উপেন্দ্র ভদ্র যৌবনের আরম্ভে পাশ্চাত্য সাহিত্য সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল ছিলেন বলিয়া আমরা জানিতাম ; কবিকেও আধুনিক বই পড়িবার জন্য পাঠাইতেন। ইনি কুমিল্লার অখিলচন্দ্র দত্তের আত্মীয়। বিশেশ্বর বসু শান্তিনিকেতনের ছাত্র—ইহারা তিন ভাই তথাকার ছাত্র। বিশেশ্বর মেডিক্যাল কলেজ হইতে পাশ করিয়া সাহেবগঞ্জে তাঁহাদের বাড়িতে বসিয়া প্র্যাকটিস করেন ; তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে।

কালিগ্রামের কর্মকেন্দ্রে অতুল সেন তাঁহার কর্মীসংঘ লইয়া উপস্থিত হইলেন। রবীন্দ্রনাথের নির্দিষ্ট কাজের পাঁচটি অঙ্গ ছিল :—১. চিকিৎসা বিধান, ২. প্রাথমিক শিক্ষা বিধান, ৩. পূর্ত কার্য বা কূপ খনন, রাস্তা প্রস্তুত ও মেরামতি, জঙ্গল সাফ বা বনোচ্ছেদ, ৪. ঋণদায় হইতে দরিদ্র চাষীকে রক্ষার ব্যবস্থা, ৫. সালিশীবিচারে বিবাদের নিষ্পত্তি।

চিকিৎসাদির কার্য আরম্ভ হয় তিনটি কেন্দ্রে—পতিসর, কামতা ও রাতোয়ালে। তিনটি হাসপাতাল ও ঔষধালয় স্থাপন করিয়া বিনামূল্যে ঔষধ বিতরণের ব্যবস্থা হয়; হাসপাতালে ডাক্তার নিযুক্ত হয় এবং দুই একটি রোগীকে রাখিবার ব্যবস্থাও করা হয়। জমিদার হিসাবে খাজনার টাকা-পিছু এক আনা রবীন্দ্রনাথ দিতেন, প্রজারা দিত এক আনা। আর এক উপায়ে অর্থ সংগৃহীত হইত: গ্রামে পঞ্চায়েতের সমাজ-শাসনে অনেক সময়ে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে মোটা রকমের খেসারত দিতে হইত; সে টাকা 'জাতে'র লোকে পানাহারে শেষ করিতেন। কবি ব্যবস্থা দিলেন যে ভবিষ্যতে ঐ জরিমানার টাকা সাধারণ তহবিলে আসিবে। "দুই শতাধিক অবৈতনিক নিম্ন প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া বিভিন্ন কেন্দ্রে নিরক্ষরতা দূরীকরণের কাজ আরম্ভ হয়। রাত্রির (নাইট স্কুল) এবং দিনের উভয়বিধ বিদ্যালয়েরই বন্দোবস্ত হয়; শিশু এবং বয়োবৃদ্ধ সকলেরই জন্য ব্যবস্থা করা হয়। নিরক্ষরতা দূর করার কাজ শেষ হইলেই পড়া, লেখা ও পাটীগণিত (3-R) শিক্ষার কাজে হাত দেওয়া হইত। এই শিক্ষা কিছুদূর অগ্রসর হইলেই বক্তৃতা দ্বারা ইতিহাস, ভূগোল প্রভৃতির পাঠ দেওয়া চলিত। প্রধান লক্ষ্য ভারতবর্ষের ইতিহাস ও ভূগোল, আনুষঙ্গিকভাবে পৃথিবীর ইতিহাস ভূগোলও তাহাদিগকে শেখানো হইত। ইহার সঙ্গে মুখে মুখে আকস্মিক বিপদে প্রাথমিক সাহায্য (first aid), কৃষিকর্মের সুবন্দোবস্ত, অগ্নি নির্বাপণ, বন্যার সময় কর্তব্য ইত্যাদি সম্পর্কেও তাহাদিগকে শিক্ষা দেওয়া হইত। অবসর সময়ে পৃথিবীর খবরাখবর শোনানোর ব্যবস্থা ছিল।"

তৃতীয় উদ্দেশ্য পূর্ত কার্য। কিন্তু পুকুর খনন, রাস্তা তৈয়ারি বা মেরামত প্রভৃতি ব্যয়সাধ্য কার্য; দরিদ্র গ্রামবাসীদের মধ্যে চাঁদা পাওয়া সম্ভব নয়। সেইজন্য অতুলবাবু অর্থের বিনিময়ে 'শ্রম' দান বা জন খাটার ব্যবস্থা করেন। এইরূপে সাত আট মাসের মধ্যে কালিগ্রাম পরগনায় বহু সহস্র টাকার কাজ সম্ভব হইয়াছিল। প্রজাদের সমবেত চেষ্টায় কাজ ইতিপূর্বে বাংলাদেশে কোথাও হইয়াছিল বলিয়া জানা নাই।

"চতুর্থ উদ্দেশ্য—ঋণদান হইতে বিপন্ন প্রজাদের রক্ষা; ইহাও কালিগ্রামে সম্ভব হইয়াছিল। এই পরিকল্পনা রবীন্দ্রনাথের। অথচ বাংলাদেশে একটা জনশ্রুতি আছে, রবীন্দ্রনাথ অতিশয় অত্যাচারী জবরদস্ত জমিদার ছিলেন, ঋণের দায়ে প্রজার ফসল পর্যন্ত গায়ের জোরে ঘরে তুলিতেন। এই মিথ্যা অপবাদ রটিবার একটা হেতু ছিল। তাহাই বলিতেছি। প্রজারা স্বভাবতই নিঃস্ব; এক বৎসরের ফসলে পর-বৎসর পর্যন্ত তাহাদের চলে না; কারণ মাঝখানে কাবুলী অথবা কাবুলী-প্রবৃত্তি সম্পন্ন মহাজন বসিয়া থাকে। শুধু সুদের দায়ে ফসল যায়, ঋণ যেমনকার তেমনিই রহিয়া যায়। চাষী প্রজা বৎসরের কয়েক মাসই প্রায় অনশনে কাটায়। ইহার প্রতিকারার্থে রবীন্দ্রনাথ এক উপায় উদ্‌ভাবন করেন। এস্টেট হইতে প্রজাদিগকে ঠিক প্রয়োজন মাফিক শতকরা নয় টাকা হারে ঋণ দেওয়া হইতে লাগিল। প্রয়োজন মাফিক এইজন্য যে, অনেক সময় তাহারা বুঝিতে না পারিয়া প্রয়োজনের অতিরিক্ত ঋণ লইয়া বিলাসে তাহা ব্যয় করিয়া বিপন্ন হইয়া পড়ে।...অতুল সেনের কর্মীসংঘ হিসাব করিয়া এই প্রয়োজন নির্ধারণ করিতে লাগিলেন।...ঋণ লইয়া চাষী চাষ করিল। ফসল কিন্তু তাহার ঘরে উঠিল না, ঋণশোধ বাবদ এস্টেট তাহা গ্রহণ করিল; এই সময়ে শতকরা তিন টাকা সুদ সর্বক্ষেত্রেই মাফ করা হইত, অর্থাৎ প্রজাকে শতকরা ছয় টাকা সুদ দিতে হইত। ফসলের দাম হিসাব করিয়া ঋণ শোধ করিয়া যাহা উদ্‌বৃত্ত থাকিত, প্রজা তাহা ঘরে লইয়া যাইতে পারিত। যদি টান পড়িত, তাহা হইলে তাহা প্রায়ই মাফ করা হইত। ইহার পর ঋণমুক্ত প্রজা পুনরায় প্রয়োজনমত ঋণ লইবার অধিকারী থাকিত।...এই ব্যবস্থার ফলে কালিগ্রাম পরগনার প্রজারা বহুদিনের দুঃসহ ঋণের বোঝা হইতে ধীরে ধীরে মুক্তি পাইতেছিল। রবীন্দ্রনাথের যে অপবাদ রটিয়াছিল তাহা জমিদারের বাড়িতে ওই ফসল উঠানো লইয়া।"

"পঞ্চম উদ্দেশ্য—সালিশীদ্বারা কলহের নিষ্পত্তি। এইরূপ সালিশীর ব্যবস্থা ঠাকুর এস্টেটে অল্পবিস্তর পূর্ব হইতেই ছিল। এবারে এই কার্যের ভার অতুলবাবু গ্রহণ করিলেন। প্রজাদের মধ্যে পরস্পর বিরোধ উপস্থিত হইলে ব্যাপারটা তাঁহার নিকট উপস্থাপিত করা হইত। তিনি বিচারবুদ্ধিমত সুরাহা করিয়া দিতেন। এই স্কীম যতদিন চলিয়াছিল, ততদিন এবং তাহার পরেও অনেক বৎসর এই পরগণা হইতে একটি মামলাও শহরে যাইতে পারে নাই। ১৯১৫-১৬ খ্রীষ্টাব্দের সরকারী কাগজপত্র হইতে ইহা প্রমাণিত হইবে।"

"রবীন্দ্রনাথ শুধু স্বপ্নই দেখেন নাই, সুবৃহৎ পরিসরে তাঁহার পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজও আরম্ভ করিয়াছিলেন—এই সংবাদ নানা কারণে তাঁহার স্বদেশবাসীর নিকট অজ্ঞাত রহিয়া গিয়াছে।…অজ্ঞাত থাকার কারণ, যাঁহারা রবীন্দ্রনাথের পরিকল্পনাকে রূপ দিবার জন্য আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন, বৎসরাধিক কালের মধ্যে নেতা অতুল সেনসহ তাঁহারা সকলেই রাজরোষে পতিত হইয়া অনির্দিষ্টকালের জন্য…অন্তরায়িত ও নজরবন্দী হইয়াছিলেন এবং দীর্ঘকাল তাঁহারা রবীন্দ্রনাথের এই কর্মযোগের দিকটা দেশের লোকের কাছে প্রচারের সুযোগ পান নাই।" শনিবারের চিঠি, ১৩৪৮ আশ্বিন। 'রবীন্দ্র-জীবনীর নূতন উপকরণ' প্রবন্ধ হইতে গৃহীত।

পৃ ৪২২—১৯১৬-এ কবি যখন জাপান যান, সেই সময়ে একটি ছবির প্রদর্শনী হয়। ভারত হইতে অনেক শিল্পের ছবি কবি লইয়া যান। ইহার Catalogue ছাপা হইয়াছিল; কলাভবনে সেইটি আছে। সংবাদ সরবরাহ করেন বিশ্বরূপ বসু (২৪-৫-১৯৫১)।

পৃ ৪৩৮—তারক পালিতের ঋণ শোধ :

দ্র. Second Trust Deed executed by Sir Taraknath Palit. Schedule C. Mortgages. Securities "All that piece or parcel of rent-free land together with the two several messuges tenements or dwelling house known as the premises No. 6-3 Dwarkanath Tagore's Lane in Calcutta and more particularly described in the schedule to the said indenture and delineated in the plan annexed thereto.

VI. Bengali mortgage deed between T. Palit of the one part and............on the other part dated 10 th day of May 1910 (27 Baisak, 1317 BS) registered etc......

Principal sum now due under the above deeds Rs. 40,000.

Interest due up to end of September 1912 nil

দ্র Calcutta University Calender 1934 p169.

পৃ ৪৫৭—'পাত্র ও পাত্রী' ছোটো গল্পে 'চলিত' বাংলা ব্যবহারের (স-প ১৩২৪ পৌষ) পূর্বে 'পয়লা নম্বর' গল্পে (স-প ১২২৪ আষাঢ়) সর্বপ্রথম চলিত বাংলা ব্যবহার করেন। ইহার পর হইতে সকল গল্পই এই ভাষায় লিখিত।

পৃ ৪৫৭—'ভাষার কথা'। কথিত ভাষা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের মত, ১৯০৮ [৬ ডিসেম্বর], ২১ অগ্রহায়ণ [১৩১৫]। কলিকাতা হইতে গিরিডিহিবাসী হিমাংশুপ্রকাশ রায়কে এক পত্রে লিখিয়াছিলেন, "নিতান্ত কথিত ভাষর লিখিবেন না—তাহার আর কোনো কারণ নাই, কেবল কথিত ভাষা বাংলাদেশের সকল জেলার ভাষা হইতেই পারে না ইহার কারণ। তাই বলিয়া উগ্র বইয়ের ভাষা হইলেও চলিবে না, যাহাতে কথিত ভাষার রসটুকু থাকে অথচ পুঁথির ভাষার সম্ভ্রমটুকু রক্ষা হয় এমন হওয়া চাই।"—রবীন্দ্রসদন, পাণ্ডুলিপির কপি হইতে গৃহীত।

সংযোজন ও সংশোধন

প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড (পুনশ্চ)

পৃ ৭১—গ্যেটে সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের উদ্ধৃতি অংশের মূল আছে Talks in China (১৯২৫) গ্রন্থে পৃ ৬৭-৬৮। পেকিং শহরে সাহিত্যিকদের এক ভোজসভায় মূল বক্তৃতাটি সর্বপ্রথম প্রদত্ত হয়। বিশ্বভারতী পত্রিকা ১৩৫৭ বৈশাখ-আষাঢ় পৃ ২৫৩।

পৃ ৩৫৮—বলেন্দ্রনাথের যখন পীড়া গুরুতর তখন কলিকাতায় বালক রথীন্দ্রনাথও অসুস্থ হইয়া পড়েন। রবীন্দ্রনাথ প্রায় একমাস তাহাদের সেবায় ব্যাপৃত থাকিয়া আষাঢ়ের (১৩০৬) গোড়ায় শিলাইদহে ফিরিয়া গেলেন ; তাঁহাদের শখের ব্যবসা ডুবুডুবু। কিন্তু ফিরিয়া আসিয়া একটি গল্পে হাত দিয়াছেন। ভারতী বা অন্য কোনো পত্রিকার তাগিদ নাই বলিয়া আপন মনে আস্তে আস্তে লিখিতেছেন। বোধ হয় এই গল্পটি 'বিনোদিনী' যা পরে 'চোখের বালি' রূপ গ্রহণ করে। দ্র জগদীশচন্দ্রকে পত্র ৪ঠা আষাঢ় ১৩০৬ [১৮৯৯ জুন ১৮], প্রবাসী ১৩৪৫ বৈশাখ পৃ ১।

পৃ ৩৬১—কর্ণ-কুন্তী সংবাদ। 'কথা' কাব্যখণ্ড জগদীশচন্দ্র বসুকে উৎসর্গীত ১৩০৬ অগ্রহায়ণ ; মুদ্রিত হয় ১৩০৬ মাঘ। কিছুকাল হইতে 'কতকগুলি পৌরাণিক গল্প' কবির 'মস্তিষ্কের মধ্যে আশ্রয় লইয়াছে' ; সেগুলি লিখিবার কথা ভাবিতেছেন। জগদীশচন্দ্র বসু দার্জিলিং হইতে ১৩০৬ জ্যৈষ্ঠ ৭ (১৮৯৯ মে ১৯) রবীন্দ্রনাথকে লিখিতেছেন, "আপনার পৌরাণিক কবিতাগুলি সর্বাংশে সুন্দর হইয়াছে। এগুলি কবে সম্পূর্ণ করিবেন ? এখন ভারতীর বোঝা গিয়াছে। মহাভারত হইতে আরও অনেকগুলি লিখিবেন।

"একবার কর্ণ সম্বন্ধে লিখিতে অনুরোধ করিয়াছিলাম। ভীষ্মের দেবচরিত্রে আমরা অভিভূত হই, কিন্তু কর্ণের দোষগুণমিশ্রিত অপরিপূর্ণ জীবনের সহিত আমাদের অনেকটা সহানুভূতি হয়। ঘটনাচক্রে যাঁহার জীবন পূর্ণ হইতে পারে নাই, যাহার জীবনে ক্ষুদ্রতা ও মহানুভাবের সংগ্রাম সর্বদা প্রজ্জ্বলিত ছিল, যে এক এক সময়ে মানুষ হইয়াও দেবতা হইতে পারিত এবং যাহার পরাজয় জয় অপেক্ষাও মহত্তর, তাহার দিকে মন সহজেই আকৃষ্ট হয়।"

কয়েকমাস পরে (১৩০৬ ফাল্গুন ১৫) রবীন্দ্রনাথ 'কর্ণ-কুন্তী সংবাদ' রচনা করেন ; পূর্বোক্ত চিঠির শেষাংশের সহিত কর্ণের শেষ উক্তি স্মরণীয়। কর্ণ কুন্তীকে বলিতেছেন :

যে পক্ষের পরাজয়
সে পক্ষ ত্যজিতে মোরে কোরো না আহ্বান,
জয়ী হোক, রাজা হোক পাণ্ডব সন্তান—
আমি রব নিষ্ফলের, হতাশের দলে।
শুধু এই আশীর্বাদ দিয়ে যাও মোরে
জয়লোভে যশোলোভে রাজ্যলোভে, অয়ি,
বীরের সদ্‌গতি হতে ভ্রষ্ট নাহি হই।"

রবীন্দ্রনাথের গল্প ও কবিতা পড়িয়া জগদীশচন্দ্র কী গভীরভাবে অভিভূত হইতেন তাহার দীর্ঘ আলোচনা পুলিনচন্দ্র সেন 'জগদীশচন্দ্র বসু প্রসঙ্গে' করিয়াছেন। দেশ ১৩৬২ অগ্রহায়ণ ১৭ পৃ ৩৩০-৩৪।

২য় খণ্ড পৃ ১২৭—ফেডারেশন হলের জায়গায় ব্রাহ্ম বালিকা বিদ্যালয় নির্মিত হয় নাই। পঞ্চাশ বৎসর পর 'ফেডারেশন হল নামে বাড়ি সার্কুলার রোডের উপর নির্মিত হইয়াছে (১৯৫৪)।

তৃতীয় খণ্ড

পৃ ৯—৫৭তম জন্মোৎসব স্থলে ৫৮ তম হইবে।

পৃ ৫—২৮ পংক্তি : মাদ্রাজে 'সমর্থক' স্থলে 'বিরোধী' হইবে।

পৃ ১৯—ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক কনভোকেশন উপলক্ষ্যে ভাষণের (১৯৫৪ ডিসেম্বর ২৪) একস্থলে বলেন যে, বঙ্গদেশে ১৯০৬ সালে জাতীয় শিক্ষাআন্দোলন প্রসঙ্গে সভায় রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছিলেন "আমরা এতকাল যেখানে নিভৃতে ছিলাম আজ সেখানে সমস্ত জগৎ আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, নানা জাতির ইতিহাস তাহার বিচিত্র অধ্যায় উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছে, দেশ-দেশান্তর হইতে যুগযুগান্তরের আলোক-তরঙ্গ আমাদের চিন্তাকে নানা দিকে আঘাত করিতেছে—জ্ঞান সামগ্রীর সীমা নাই, ভাবের পণ্য বোঝাই হইয়া উঠিল—এখন সময় আসিয়াছে, আমাদের দ্বারের সম্মুখবর্তী এই মেলায় আমরা বালকের মতো হতবুদ্ধি হইয়া কেবল পথ হারাইয়া ঘুরিয়া বেড়াইব না—সময় আসিয়াছে, যখন ভারতবর্ষের মন লইয়া এই সকল নানা স্থানের বিক্ষিপ্ত বিচিত্র উপকরণের উপর সাহসের সহিত গিয়া পড়িব, তাহাদিগকে সম্পূর্ণ আপনার করিয়া লইব, আমাদের চিত্ত তাহাদিগকে একটি অপূর্ব ঐক্যদান করিবে, আমাদের চিন্তাক্ষেত্রে তাহারা যথাযথ স্থানে বিভক্ত হইয়া একটি অপরূপ ব্যবস্থায় পরিণত হইবে; সেই ব্যবস্থার মধ্যে সত্য নূতন দীপ্তি নূতন ব্যাপ্তি লাভ করিবে এবং মানবের জ্ঞান-ভাণ্ডারে তাহা নূতন সম্পত্তির মধ্যে গণ্য হইয়া উঠিবে।"

পৃ ২৬—কবি শ্রীহট বা সিলেটে একবার যান। নিম্নলিখিত কবিতাটি ১৯৩২ এর পর লিখিত। 'কবিপ্রণাম' (১৯৪৮) গ্রন্থে হস্তলিপি মুদ্রিত হয়। 'মুখপত্র' নামে পত্রিকায় (১৩৬০) ইহা পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে।

মমতাবিহীন কালস্রোতে
বাঙলার রাষ্ট্রসীমা হোতে
নির্বাসিতা তুমি
সুন্দরী শ্রীভূমি।
ভারতী আপন পুণ্য হাতে
বাঙালীর হৃদয়ের সাথে
বাণীমাল্য দিয়া
বাঁধে তব হিয়া।
সে বাঁধনে চিরদিনতরে তব কাছে
বাঙলার আশীর্বাদ গাঁথা হয়ে আছে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শ্রীহট্টের উদ্দেশে রচিত এই কবিতাটি কবিগুরুর কোনো কাব্যগ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছে বলিয়া আমাদের জানা নাই।

পৃ ২৭—কবি শ্রীহট্টে যাইতেছেন, সঙ্গে আছেন ভাটেরা গ্রামের উমেশচন্দ্র চৌধুরী। "ইতিহাস প্রসিদ্ধ ভট্টপাঠক [ভাটেরা] নামক স্থানটি উমেশবাবু কবিকে ট্রেনে থেকে দেখিয়েছিলেন। বললে অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে উমেশচন্দ্র চৌধুরী মহাশয় ভাটেরার টিলার উপরিস্থিত তাঁর ভবনটি একটি বিশেষ শর্তে বিশ্বভারতীকে দান করেন। দানপত্রটি কবি দাতাকে ধন্যবাদ জানিয়ে স্বহস্তে স্বাক্ষর করেছিলেন।"—সুধীরেন্দ্রনারায়ণ সিংহ, শ্রীহট্টে রবীন্দ্রনাথ, কবিপ্রণাম, পরিশিষ্ট পৃ ৭।

এই সম্পত্তি কোথায় কী ভাবে কাহার কাছে আছে আমাদের জানা নাই। এই প্রসঙ্গে দিল্লীতে কবিকে প্রদত্ত অনুরূপ সম্পত্তির কথা স্মরণীয়। এ বিষয়ে তথ্যাদি সংগ্রহ বাঞ্ছনীয়।

পৃ ২৮—উত্তরায়ণের পর্ণকুটীর। 'রথীন্দ্রনাথ এই অট্টালিকা বিশ্বভারতীকে দান করিয়া দিয়াছেন' বলিয়া যে সংবাদ এখানে লিখিত হইয়াছে, তাহা তৎপরবর্তী ঘটনার আলোকে সংশোধনীয়। ১৯২৮ সালের সেট্‌ল্‌মেণ্টের সময় উত্তরায়ণের জমি বিশ্বভারতীর নামে লেখানো হইয়াছিল ; তারপর ঐ স্থান ও বাড়িঘর ৯৯ বৎসরের জন্য রথীন্দ্রনাথকে লীজ দেওয়া হয়। সেই হিসাবে রথীন্দ্রনাথ এইসবের মালিক। ১৯৩৭ সালের পর হইতে রথীন্দ্রনাথকে বিশ্বভারতীর কর্মসচিব রূপে ১২,০০০৲ টাকা বার্ষিক বেতন দেওয়া হইত, এবং তাছাড়া উত্তরায়ণের রক্ষণাবেক্ষণের যাবতীয় ব্যয় বিশ্বভারতী বহন করিত। ১৯৫১ সালে বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠান কেন্দ্রীয় সরকারের সাহায্যপুষ্ট বিশ্ববিদ্যালয় রূপে পরিগণিত হইলে রথীন্দ্রনাথকে উত্তরায়ণের রক্ষণাবেক্ষণের ভার গ্রহণ করিতে হয়। সেই সময় হইতে রবীন্দ্রসদনের জন্য যে কয়টি ঘর প্রদত্ত হইয়াছিল, তাহার জন্য বার্ষিক ভাড়ার ব্যবস্থা হয়। ১৯৫৩ সালের অগস্ট মাসে রথীন্দ্রনাথ উপাচার্যের পদ ত্যাগ করেন। অতঃপর ১৯৫৪ জুলাই মাস হইতে উত্তরায়ণের সমস্ত বাড়ি বিশ্বভারতীর অপিসের জন্য মাসিক ৫০০৲ টাকায় ভাড়া লওয়া হয়। শোনা যাইতেছে এই বাড়ি ও জমি বিশ্বভারতীর জন্য ক্রয় করা হইবে ; তখন উত্তরায়ণ রবীন্দ্র-মিউজিয়াম হইতে পারে।

উত্তরায়ণের হাতার মধ্যে আরও যে সব বাড়ি আছে, তাহা ভাড়া দেওয়া হইয়াছে শুনিয়াছি। কোনার্কে প্রতিমা দেবী বাস করেন। উদীচী নামে যে বাড়িতে এখন রথীন্দ্রনাথের পালিতা কন্যা নন্দিনী বাস করেন, তাহা বিশ্বভারতীর প্রেসিডেণ্টের জন্য নির্মিত হইয়াছিল।

পৃ ৩০—গুজরাট ভ্রমণ (১৯২০ মার্চ-এপ্রিল)। গুজরাটের সহিত ঠাকুর পরিবারের সম্বন্ধ অনেকদিনকার। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ আহমদাবাদ প্রার্থনা-সমাজে উপাসনা করেন। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর আহমদাবাদে দীর্ঘকাল জজিয়তি করেন। সেই সময়ে কিশোর রবীন্দ্রনাথ এখানে কয়েকমাস কাটান।

শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রমে প্রথম মহাযুদ্ধের শেষভাগে বহু গুজরাটী ছাত্র কলিকাতা ও ঝরিয়া-ধানবাদ অঞ্চল হইতে আসিয়াছিল। রবীন্দ্রনাথের গ্রন্থাদির অনুবাদ গুজরাটী ভাষায় হইয়াছিল। কিন্তু ইহার পূর্ব হইতে গুজরাটিরা বাংলাসাহিত্য সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হয়—নারায়ণ হেমচন্দ্র এ বিষয়ে ছিলেন অগ্রণী। তবে রবীন্দ্রনাথের জগৎখ্যাতি হইবার পর এই তাঁহার প্রথম গুজরাট সফর। রবীন্দ্রনাথ ও বোম্বাই-গুজরাট-কাথিবাড় সম্বন্ধে একটি সুষ্ঠু আলোচনা হইবার বিস্তৃত ক্ষেত্র আছে।[১] বিশ্বভারতীর পূর্বে এই অঞ্চল হইতে গুজরাটি ভাষীদের নিকট হইতে যে পরিমাণ অর্থ সাহায্য পাওয়া গিয়াছে তাহা আর-কোনো একটি প্রদেশ হইতে পাওয়া গিয়াছে কিনা সন্দেহ। আহমদাবাদ বড়োদা, কথিয়াড় ও বোম্বাই মুক্তহস্তে কবিকে দান করিয়াছিল।

পৃ ৩১—গুজরাট ভ্রমণ করিয়া কবি বোম্বাইএ ফেরেন ১৯২০ এপ্রিল ১৩। জালিনবালা দিবসের জন্য তাঁহার ভাষণ লিখিয়া দেন। ১৭ই বরোদা যান। এই আট নয় দিন কবি বোমানজি প্রভৃতির সাহায্যে বিশ্বভারতীর জন্য অর্থ সংগ্রহ করিতে সক্ষম হন। রথীন্দ্রনাথকে লিখিতেছেন, "এখান থেকে টাকা বোধ হয় মন্দ পাওয়া যাবে না।…টাকা ত হাতে আসবে। সে টাকা খরচ করবে কে ? ও কিসে ? সর্বাধ্যক্ষদের হতে দিলে কি রকম ব্যাপার হবে বলা শক্ত।" বোমানজি কবিকে বিলাত যাইবার জন্য খুবই পীড়াপীড়ি করিতেছিলেন, এমন কি ২৯ মে যে-জাহাজ আছে তাহাতে তিনি সমস্ত ব্যবস্থা করিতেও প্রস্তুত। কিন্তু কবি লিখিতেছেন, "শান্তিনিকেতন আজ সমস্ত ভারতের সামনে এসে পড়ল—এর মধ্যে কিছুই এমন রাখা চলবে না, যা কুনো, যাতে সমস্ত ভারতের মন পাওয়া যায় এমন একটি জিনিস গড়ে তুলতেই হবে।"

১ যদি কোনো গুজরাটী প্রাক্তন ছাত্র এবিষয়ে গবেষণা করেন তো ভালো হয়।

কিন্তু কবি এযাত্রা বিলাতে যাবেন কি যাবেন না সে সম্বন্ধে দ্বিধা একটু আছে। লিখিতেছেন, "অনেক জিনিস আরম্ভ করা হয়েছে ··· আমরা চলে গেলে পাছে সব পিছিয়ে যায় এবং কাজ নষ্ট হয় এই ভাবনা।" বোমানজির ইচ্ছা কবি, রথীন্দ্রনাথ, প্রতিমা দেবী সকলেই তাঁহার সঙ্গে বিলাত যান। তাই কবি লিখিতেছেন, "আমি আর তুই দুই জনেই যদি এক সঙ্গে অনুপস্থিত থাকি তাহলে খুবই অসুবিধা হবার আশঙ্কা আছে।" বোমানজি বলেন এনড্রুসের উপর ভার দিয়া আসিতে; কিন্তু 'এনড্রুসের উপর ত নির্ভর করা চলবে না।' চিঠিপত্র ২য় [এপ্রিল ১৯২০] পৃ ১০-১৩।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেই এনড্রুসের উপর নির্ভর করিয়াই তাঁহারা সকলে বিলাত চলিয়া গেলেন। মনে পড়ে এনড্রুস সমস্ত ঝুঁকি মাথায় তুলিয়া লন।

পৃ ৩৬—কেদারনাথ দাশগুপ্ত। জন্মস্থান—ভাটিখাইন, চট্টগ্রাম জিলা। ভাটিখাইন বা ভট্টখণ্ড শ্রীমতী নদীতীরস্থ গ্রাম। শ্রীমতী নদীতীরস্থ সাতটি গ্রামকে চক্রশালা বলিত, ভট্টখণ্ড এই চক্রশালার অন্যতম বিশিষ্ট হিন্দুপ্রধান গ্রাম। ১৮৭৮ অক্টোবর ১৯ কেদারনাথের জন্ম হয়; পিতা হরচন্দ্র দাশগুপ্ত মুন্সেফ ছিলেন। পিতার মৃত্যুর পর কেদারনাথ কলিকাতায় অধ্যয়ন করিতে আসেন ও স্বামী বিবেকানন্দের সংস্পর্শে আসিয়া জাতীয় আন্দোলনে আত্মনিয়োগ করেন। বঙ্গচ্ছেদ ও স্বদেশী আন্দোলন আরম্ভ হইলে কেদারনাথ তাঁহার ভ্রাতাকে চট্টগ্রাম হইতে আনাইয়া 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার' নামে স্বদেশী সামগ্রীর দোকান খোলেন। দেশের লোককে স্বদেশী ভাবাপন্ন করিবার জন্য তিনি 'ভাণ্ডার' নামে মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করিবার ইচ্ছা লইয়া রবীন্দ্রনাথের শরণাপন্ন হন; রবীন্দ্রনাথ তখন নবপর্যায় 'বঙ্গদর্শনে'র সম্পাদকত্ব করিতেছেন; তৎসত্ত্বেও এই নূতন পত্রিকার সম্পাদক-পদ গ্রহণ করিলেন।

অল্পকালের মধ্যে পুলিসের দৃষ্টি কেদারনাথের উপর পড়িল; তখন তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা তাঁহাকে বিলাতে পাঠাইয়া দিলেন। সেখানে কেদারনাথ ব্যারিস্টারি পাশ করিলেন বটে, কিন্তু দেশে ফিরিলেন না। বিদেশে ভারতীয় সংস্কৃতি প্রচারকল্পে মন দিলেন; তাঁহার মতে 'a nation is known by its stage; a country is known by its literature'। এই উদ্দেশ্যে তিনি ১৯১০-এ বিলাতে ও ১৯২০-এ আমেরিকায় Union of East and West নামে সমিতি স্থাপন করেন। এই সমিতিতে রবীন্দ্রনাথের সংবর্ধনা হয়। এ ছাড়া League of Neighbours (১৯১৮) ও Fellowship of Faiths নামে সভার (১৯২৪) তিনি প্রতিষ্ঠাতা। ইহার পর এই তিনটি প্রতিষ্ঠানকে মিলিত করিয়া নাম দেন The World Fellowship of Faiths (The Threefold Movement)। "The purpose of the Threefold Movement is the realisation of peace and brotherhood through understanding and neighbourliness. Its method is to unite people of all religions, races, countries and classes, by building bridges of appreciation across the chasm of prejudice". কেদারনাথ নিউইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক ডক্টর উপাধিতে ভূষিত হন। ১৯৪২ ডিসেম্বর ৬ নিউইয়র্কে তাঁহার মৃত্যু হয়। [এই তথ্যগুলি কেদারনাথের খুল্লপৌত্র অজিতেশ্বর দাশগুপ্ত ১৯৫৫ ডিসেম্বর ১৪ তারিখের পত্রযোগে জানান]

পৃ ৩৬—ভালো য়ুরোপীয় সংগীত শুনিবার সুযোগ পাইলে রবীন্দ্রনাথ তাহার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করিতেন; D' Aranyi নামে এক-হাঙ্গেরিয়ান মহিলা বেহালাবাদকের বাজনা শুনিয়াছিলেন; এই সংগীত তাঁহাকে খুবই মুগ্ধ করে। এই সময়ে লণ্ডনে Beggar's Opera-র[১] যাওয়াটা খুবই ফ্যাশানেবল্ হইয়া উঠিয়াছিল। শচীন সেন কবিকে ও রথীন্দ্রনাথকে

১ Early in the 18th century "Paris had cultivated a popular type of play with music called Vaudeville, in which the serious operas were often parodied and other popular songs of all kinds were introduced. On this model John Gay [1685—1732] produced *The Beggar's Opera* in London in 1728, an amusing comedy of low

সেখানে লইয়া যান। অভিনয়াদি কবির মোটেই ভালো লাগে নাই; পিয়ার্সনকে লইয়া কিছুক্ষণ পরে চলিয়া আসেন। রথীন্দ্রনাথ তাঁহার রোজনামচায় লিখিয়াছিলেন, প্রথম মহাযুদ্ধের পর ইংলন্ডে ইংরেজি সব কিছুকেই জোর করিয়া চলন করিবার একটা চেষ্টা দেখা দিয়াছিল। তিনি লিখিতেছেন, "We couldn't understand why this obsolete vulgar thing of the most decadent period of English literature should be suddenly revived and people go crazy over it." (V.B. News 1934 Aug. p 14. Diary of 7th August 1920)

রথীন্দ্রনাথ এই উন্মাদনার অতি সুন্দর বিশ্লেষণ করিয়াছেন, "Only one explanation offers itself. After the war [I] there has been a great effort at a strong nationalist revival. The English feel humiliated that they should always have to go to hear foreign operas, foreign theatres, foreign music etc. So they have brought forth this purely indigenous opera and to hide its shame they applaud in their loudest voices its great merits."

পৃ ৩৮—সিবিল থর্নডাইক। ১৯৫৫-এ শ্রীমতী থর্নডাইক ও তাঁহার স্বামী ভারত-ভ্রমণে আসেন; সে-সময়ে ভারতীয় থিএটরের আদর্শ কী তৎসম্বন্ধে কেহ প্রশ্ন করিলে, তিনি বলিয়াছিলেন যে রবীন্দ্রনাথ সে আদর্শ স্থাপন করিয়া গিয়াছেন।

১৯২০-এ লনডনে কবির হোটেলে থর্নডাইক দেখা করিতে যান; সে সময়ে ধর্ম ও নাটক সম্বন্ধে দীর্ঘ আলোচনা হয়। অভিনেত্রী লিখিয়াছেন, "It was an hour I shall never forget as long as I live, for he gave me a glimpse of the very things I had been striving to find and understand as a Christian through the eyes of a great mind of another race." The Golden Book of Tagore p 253.

পৃ ৪১—প্যারিসে। কবি ও রথীন্দ্রনাথ ১৯২০ অগস্ট ৬ প্যারিসে পৌছান; পরদিন (৭ই) Y M C A-এর চ্যাটার্জি ইহাদের Faust অভিনয় দেখাইবার জন্ম Grand Opera-য় লইয়া যান। রথীন্দ্রনাথ তাঁহার ইংরেজি ডায়েরিতে লিখিতেছেন, "Father greatly enjoyed it. It was better than any of the operas we had seen in America or London." V. B. N. 1934 Aug. p 14.

পৃ ৪২—গার্ডনারের ফরাসী তর্জমা। J. D. Anderson ১৯২০ সেপ্টেম্বর ৩ কেমব্রিজ হইতে রবীন্দ্রনাথকে যে দীর্ঘ পত্র দেন, তাহাতে আছে, "The other day a friend of mine in Strasbourg sent me a copy of the *Journal d' Alsace et de Lorraine* in which was a review of Mme Henriette

life, to some extent parodying the Handelian Italian opera and introducing a number of songs, some of them old playhouse songs, others tunes popular at the moment, and the majority folksongs of English, Scottish and Irish origin. The attractiveness of the tunes and still more that of the principal actress made *The Beggar's Opera* an unexpected success, and it maintained its popularity throughout the century besides being revived in later times."—Chamber's Encyclopedia Vol. X. p 210.

"The astonishing career of '*The Beggar's Opera*' eclipses everything in the history of the English stage. That this prose farce, written...as a burlesque of the Italian opera,...should not only have won instant success with the witty dialogue and dainty lyrics...but that after its revival on June 5, 1920, it should have drawn all London for three and a half years to a suburban Theatre, suggests that it is informed with some rare and individual charm."—Practical knowledge Vol. I. p 118

Mirabaud Thoren's translation of your 'Gardener'. It was rather a pleasant and cheerful review." আনডারসন এই সমালোচনার একটা বাংলা অনুবাদ রামানন্দবাবুকে কলিকাতায় পাঠাইয়া দেন। সমালোচকের নাম Georges Bergner। প্রবাসী ১৩২৭ কার্তিক সংখ্যায় 'ফরাসী রবীন্দ্র-প্রশস্তি' নামে লেখাটি প্রকাশিত হয়।

পৃ ৪৮—হার্ভাড্ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে কয়েকটি বক্তৃতা দিবার জন্য নিমন্ত্রণ আসিল (১৯২১ জানুয়ারি ২৫)। এখানে একদিন বক্তৃতার পর কবি বিশ্ববিদ্যালয়ের রাসায়নিক বিভাগের অধ্যাপক T. W. Richards (1868-1928) -এর নিকট হইতে যে পত্র পান ও কবি যে উত্তর প্রদান করেন নিম্নে উদ্ধৃত হইল। রিচার্ডস ১৯১৪ সালে রসায়নবিদ্যার জন্য নোবেল পুরস্কার পাইয়াছিলেন—রবীন্দ্রনাথ পান ১৯১৩ সালে। কবি ২৫ জানুয়ারি হার্ভাড বিশ্ববিদ্যালয়ে The Poet's Religion নামে ভাষণ পাঠ করেন (Letters from Abroad p 59)। এই সভায় রিচার্ডস ও তাঁহার কন্যা শ্রোতা ছিলেন। পত্রখানি বোধ হয় ২৬ জানুয়ারি লিখিত। অধ্যাপক কবিকে লিখিতেছেন:

"Although quite unknown to you, I am taking the liberty of writing to you for two reasons.

"In the first place I wish to thank you for your beautiful and inspiring address of yesterday [1921 Jan. 25] afternoon. It gave me (and my daughter who was with me)—very real pleasure and we feel that it could not but have been inspiration to many others also.

"In the next place I venture to call your attention to the fact, concerning which you doubtless agree with me, that in Science also great joy and a certain kind of imagination and poetry is to be found in the fundamental generalisations and basic truths underlying the structures of the Universe. These in their way seem to me no less beautiful than the highest images of poetry or art, even if they are more impersonal. Moreover, they combine with beauty the quality of oneness of which you spoke.

"You are doubtless familiar with Bertrand Rusell's new book Mysticism and Logic [1918]. In two of its Chapters 'Science and Culture' and 'Mathematics', he gives expression to a part of his feeling. Not being a scientific man himself he does not fully appreciate the scientific side of nature, but nevertheless his sympathy is remarkable under the circumstances. As regards the pure joy of mathematics, no one could go further than he.

"With assurances of high esteem sincerly…"

রবীন্দ্রনাথ-অধ্যাপক রিচার্ডস্‌কে নিম্নলিখিত পত্র দেন: "Thank you for your kind letter of appreciation. I fully agree with you in what you say about the fundamental generalisation and basic truths underlying the structure of the Universe. In their aspect of perfect untiy, they not only give information to our mind, but touch our imagination which is pure joy. In a mere reasoning analysis and gathering of facts we seem to wander in a kind of

No Man's Lands; in reaching truth we find our home, for unity of truth has the same quality as our own being." (V. B. News 1951 Aug. from notes of Suhrit K. Mukherji)

পৃ ৫২—পেট্রিক গেডিস। রবীন্দ্রনাথ The Indian College of the University of Montpellier (France) প্রতিষ্ঠানের সভাপতি-পদ গ্রহণ করেন। গেডিস লিখিয়াছেন (১৯৩১): "I have indeed high hope of our Indian College here—which you have honoured at its outset by your acceptance of its presidency, and which I trust you may be able some day to visit and thus re-inspire... .." The Golden Book of Tagore p 84.

পৃ ৫৬—সুইডিস একাডেমিতে বক্তৃতা (১৯২১) "......you came to Stockholm to deliver the public lecture that every receiver of a Noble prize has to give. Our Academy at that occasion gave a dinner in your honour. Several Swedes of fame were present. The Secretary of the Academy Dr. Erik Axel Karlfeldt, held the great speech to you. Our Archbishop Dr. Nathan Soderblom of Upsala also made a beautiful speech. Amongst those present were also the great historian Professor Harald Hjarne of Upsala and the famous archoeologist Dr. Oscar Montelius....I remember your speech......you mentioned my expeditions in Asia in the kindest and most encouraging words." Sven Hedin's letter 'To my dear Friend Rabindranath Tagore'. The Golden Book of Tagore p106.

পৃ ৫৭—কাইসারলিঙ রবীন্দ্রনাথকে কী চক্ষে দেখিতেন তাহা The Golden Book of Tagore-এর জন্য তিনি যে প্রশস্তি প্রেরণ করেন, তাহাতে স্পষ্ট হইয়াছে। "Rabindranath Tagore is the greatest man I have had the privilege to know. He is very much greater than his world reputation and above all, his position in India imply. There has been no one like him anywhere on our globe for many and many centuries. That is, Rabindranath is the creator of a nation.···He is the most Universal, the most encompassing, the most complete human being I have known." (p 127)

পৃ ৭৮— ভারত গবর্মেণ্ট ১৯২১ অক্টোবর মাস হইতে অসহযোগ আন্দোলন দমনের জন্য কঠোরনীতি অবলম্বন করেন। ১৯২২ মার্চ ১০ Young India-র চারিটি প্রবন্ধের জন্য গান্ধীজি ও শঙ্করলাল ব্যাংকারকে পুলিস আহমদাবাদে গ্রেপ্তার করিল। দায়রার বিচারে ১৮ মার্চ গান্ধীজির ছয় বৎসর কারাদণ্ড হইল। গান্ধীজি এজলাসে গবর্মেণ্টের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ প্রচারের অভিযোগ স্বীকার করিয়া বলিয়াছিলেন, "সব জানিয়া-শুনিয়াই আমি আমার কর্তব্য সম্পন্ন করিয়াছি। মাদ্রাজ-বোম্বাই-চৌরীচৌরার অপরাধের জন্য আমাকে দায়ী করা হইয়াছে, সে দায়িত্ব আমি অস্বীকার করিতেছি না। আজ যদি আমাকে মুক্তি দেওয়া হয় আমি আবার সেই আগুন লইয়া খেলা করিব। জনসাধারণ সর্বত্র সংযত হইয়া চলে নাই। তথাপি অহিংসাই যে আমার মূলমন্ত্র তাহাতেও কিছুমাত্র ভুল নাই।" প্রবাসী ১৩২৯ বৈশাখ পৃ ১২৯-৩০।

পৃ ৮০—দেশে প্রত্যাবর্তন ১৯২১ জুলাই। কবি যখন বিদেশে নানা সম্মানে ভূষিত হইতেছেন সেই সময়ে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের যুবকগণ সুকুমার রায় ও প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশের নেতৃত্বে রবীন্দ্রনাথকে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বিশিষ্ট সদস্য মনোনীত করিবার জন্য আন্দোলন করেন। প্রবীণ ও প্রাচীনপন্থী ব্রাহ্মগণ রবীন্দ্রনাথের এই নির্বাচনের

ঘোর বিরোধী ছিলেন। এই লইয়া উক্ত সমাজের মধ্যে খুবই অশান্তি হয়। অবশেষে তরুণদেরই জয় হয়। এই সময়ে প্রশান্তচন্দ্র যুবসমাজের নেতৃস্থানীয় ছিলেন; তিনি 'রবীন্দ্রনাথকে কেন চাই' এই শীর্ষক একটি পুস্তিকা (For private circulation only) মুদ্রিত করেন (৫২ পৃষ্ঠা)। গ্রন্থের শেষ দিকে তিনি বলেন, "রবীন্দ্রনাথ সমগ্র বিশ্বমানবকে লইয়া একটি বিরাট সার্বভৌমিকতার আদর্শ গড়িয়া তুলিতেছেন। রবীন্দ্রনাথের সার্বভৌমিকতা স্বাতন্ত্র্যকে পরিহার করে নাই, জাতীয়ত্বকে বর্জন করে নাই, বৈচিত্র্যকে বিসর্জন দেয় নাই। রবীন্দ্রনাথের সার্বভৌমিকতার মূল মন্ত্র—বহুর মধ্যে ঐক্য উপলব্ধি, বিচিত্রের মধ্যে ঐক্যস্থাপন। এই একমেবাদ্বিতীয়মের সাধনাকেই রবীন্দ্রনাথ ভারতবর্ষের অন্তর্নিহিত তপস্যা বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন।

"…ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসেও আমরা এই এক মূল আদর্শ দেখিতে পাই। রবীন্দ্রনাথ নিজে স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন যে ব্রহ্মসাধনার এই সার্বভৌমিক আদর্শটিকে বিশ্বজগতের মধ্যে প্রতিষ্ঠা করাই ব্রাহ্মসমাজের চরম সার্থকতা। তাই রবীন্দ্রনাথের বাণী ব্রাহ্মসমাজেরই বাণী।

"রবীন্দ্রনাথের সমগ্র কর্মচেষ্টায় ব্রাহ্মসমাজের সাধনা সত্য হইয়া উঠিতেছে। রবীন্দ্রনাথের জীবন্ত আদর্শের প্রভাবে ব্রাহ্মসমাজে নূতন প্রেরণা আসিয়াছে, এই জন্যই আমরা রবীন্দ্রনাথকে চাই"। (পৃ ৫১)

পৃ ৮০—আজকাল যেখানে টেনিস কোর্ট ইত্যাদি। বর্তমানে সে-স্থানে পাঠভবনের ছাত্রদের জন্য নূতন ব্যারাকগুলি নির্মিত হইয়াছে।

পৃ ৯১—বিশ্বভারতীর উদ্দেশ্য। ১৩৩৯ পৌষ ৯ বিশ্বভারতী বার্ষিক পরিষদে, কবির ভাষণ হইতে: "তখন [১৩২৮] এমন কোনো বিশ্ববিদ্যালয় ছিল না যেখানে সর্বদেশের বিদ্যাকে গৌরবের স্থান দেওয়া হয়েছে। সব য়ুনিভর্সিটিতে শুধু পরীক্ষাপাশের জন্যই পাঠ্যবিধি হয়েছে, সেই শিক্ষাব্যবস্থা স্বার্থসাধনের দীনতায় পীড়িত, বিদ্যাকে শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণের কোনো চেষ্টা নেই। তাই মনে হল এখানে মুক্তভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের শাসনের বাইরে এমন প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলব যেখানে সর্ববিদ্যার মিলনক্ষেত্র হবে।" V. B. N. 1933 Jan. p 62.

পৃ ৯১—বিশ্বভারতী ১৯২১। দশ বৎসর পূর্বে ১৯১১ সালে অজিতকুমার চক্রবর্তী 'ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম' নামে যে পুস্তক লেখেন তাহার উপসংহারে শান্তিনিকেতনের ভাবী কালের কল্পনা করিয়া লিখিয়াছিলেন:

"একদিন এমন হইবে যে এখানে দেশবিদেশের সকল জ্ঞানের বিষয় এই যজ্ঞক্ষেত্রে আহুত হইবে—যাহা বিরুদ্ধ তাহা মিলিবে, যাহা বিচিত্র তাহা ঐক্যলাভ করিবে। সাহিত্য চিত্র সংগীত শিল্প এইখানে বিকাশ পাইবে, এবং বিশ্বকলার নিগূঢ় তত্ত্ব এইখানে ব্যাখ্যাত হইবে। তত্ত্ববিদ্যায় যে সমন্বয়দৃষ্টি লাভের জন্য সকল জ্ঞানী এদেশে এবং বিদেশে ব্যস্ত—এইখানে সেই সমন্বয় প্রতিষ্ঠিত হইবে—এইখানে ছিদ্যন্তে সর্বসংশয়াঃ—সকল সংশয়ের ছেদন হইবে। এইখানে বিজ্ঞানবিৎ বিজ্ঞানের সত্য সকল উদ্ধার করিবেন, উদ্‌ভাবনীশক্তি এইখানে নূতন নূতন জিনিস উদ্‌ভাবন করিবেন। সেই মানসলোকের পরিপূর্ণ জ্ঞানতপস্যার সেই ব্রহ্মচর্যাশ্রমকে আজ দেখ।… সর্বভূতে আপনাকে দেখা আশ্রমের আদর্শ—এখানে এমন পরিবার সকল আসিবে যাহারা সহযোগী হইয়া একান্নবর্তী হইয়া কাজ করিবে—যাহাদের প্রীতি ও মঙ্গলভাব সকলের প্রতি, পশুর প্রতি, পক্ষীর প্রতি, কীটপতঙ্গের প্রতি প্রসারিত হইবে—যাহারা স্বাধীন হইবে, যাহারা কোন মিথ্যার হাতে ধরা দিবে না, কোন কদাচারকে প্রশ্রয় দিবে না, যাহা সকলের পক্ষে কল্যাণকর, যাহা নিত্য ও শাশ্বত ধর্ম তাহাই জীবনের প্রত্যেক কর্মে আচরণ করিবে।"

অজিতকুমার আরও বলিয়াছেন, "হোক কলকারখানা, কৃষিক্ষেত্র, গোমহিষশালা, আধুনিক যন্ত্রতন্ত্রের বিপুল আয়োজন—কখনই তাহারি মধ্যে তাহাকে [আশ্রমকে] শেষ করিয়া দেখিতেই পারিব না—তাহাকে ছাড়াইয়া বলিব নমঃ শিবায় চ শিবতরায় চ।"

পৃ ৯৬। ১৯২২ সালের গ্রীষ্মকালে (১৩২৯) রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে ছিলেন। এই সময়ে রুশিয়া জারের বিরুদ্ধে বিপ্লবান্তে অত্যন্ত দুর্দশাগ্রস্ত; খাদ্যাভাবে রোগে আত্মকলহে উদ্‌বেজিত। বাহির হইতে নানা দেশ নানা ভাবে সাহায্য করিতেছিল। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের (Corpus Professor of Jurisprudence) আইনশাস্ত্রের অধ্যাপক পল ভিনোগ্রাদোফ (Vinogradoff) ১৯ মে রবীন্দ্রনাথের নিকট পত্র লিখিয়া জানান যে, রুশের শিক্ষিত সমাজকে ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য তাঁহার সহায়তা প্রয়োজন। ১৯১৩ সালে অধ্যাপক ভিনো গ্রাদোফ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক রীডার রূপে বক্তৃতা দিবার জন্য আমন্ত্রিত হইয়া আসেন। রবীন্দ্রনাথের সহিত সেই সময়ে দেখা হয়। অধ্যাপক লিখিয়াছেন, "When I met you in Calcutta eight years ago, I little thought that I should have to appeal to you on behalf of my unfortunate countrymen in Russia.

"The impression I carried away after our interview was that I had met one who was fitted to represent the great Indian nation that has struggled for centuries with all kinds of hardships—physical and moral. It is to such humanitarians and idealists that I appeal in order to bring to their notice a particularly grievous and pressing need—the need of the intellectual leaders, the brain-workers of Russia who are threatened with destruction."

প্রবাসী (১৩২৯ আষাঢ়) লিখিতেছেন, "রবীন্দ্রনাথ বিনীতভাবে এই কার্যে নিজের অযোগ্যতা জানাইয়া, তাহা সত্ত্বেও দৈনিক কাগজগুলিতে অধ্যাপক ভিনোগ্রাডফের চিঠির সারাংশ সমেত নিজের আবেদন ছাপাইয়াছেন। তাঁহার নিকট শান্তিনিকেতন ডাকঘরের ঠিকানায় যিনি যত অর্থ পাঠাইবেন তিনি তাহার প্রাপ্তি স্বীকার করিয়া যথাস্থানে পাঠাইয়া দিবেন।" দ্র রবীন্দ্র-রচনাবলী ২০ পৃ ৪৫৫।

পৃ ৯৭— কলিকাতায় ইংরেজ কবি শেলি (Shelley)-র শতবার্ষিকী স্মরণোৎসবে রবীন্দ্রনাথ সভাপতি (১৯২২ জুলাই ৮।১৩২৯ আষাঢ় ২৩)। কবি মৌখিক ভাষণ দান করেন। কবি বলেন, "যাঁরা পৃথিবীতে কোনো একটা বড়ো সৃষ্টির কাজ করেছেন—তাঁরা কোনো বিশেষ দেশের অধিবাসী নন...তাঁরা সকল কালের লোক। তা যদি স্বীকার না করি তা হলে সমস্ত মনুষ্য সমাজের মধ্যে আমাদের যে স্থান আছে সেই স্থানকেই অস্বীকার করা হবে। তা হলে এই কথা বলতে হয় যে পৃথিবীতে আমরা জন্মগ্রহণ করিনি, আমরা কেবলমাত্র নিজেরই এই ক্ষুদ্রদেশের চতুঃসীমানার মধ্যে জন্মেছি—যা বেড়া দিয়ে আমাদের অন্তরায়ণের দণ্ডে দণ্ডিত করেছে।...

"পৃথিবীর অধিকাংশ মহাপুরুষই তো নির্বাসনের সিংহদ্বার দিয়ে পৃথিবীতে আপন অধিকার লাভ করেন।...তাঁদের সাময়িক লোকে তাঁদের নির্বাসনে দিয়েছে; তার কারণ, তাঁরা সংকীর্ণভাবে কোনো দেশের বা কোনো কালের মন জোগাতে পারেননি।...জীবিতকালে যশের দিক থেকে সম্মানের দিক থেকে প্রবাসী হয়ে থাকেন, উপবাসী হয়ে জন্ম কাটান।...

"শেলি সর্বাংশে...কবি ছিলেন.. তাঁর ব্যবহার, তাঁর যা কিছু আশা আকাঙ্ক্ষা, তাঁর সমস্তই এক কবিত্বের ছাঁচে ঢেলে তৈরি করেছিলেন—একথা বেশ উপলব্ধি করা যায়। অনেক কবিকে জানি, একটা বিশেষ সময়ে হয়তো কবিত্বের ভূত তাঁদের পেয়ে বসলে পর কাব্য রচনা করেন এবং বেশ ভালো কাব্যও রচনা করেন।...কিন্তু শেলির জীবনের আশৈশব গতি এবং প্রকৃতি সমস্তই কবির। Imagination-এর আবহাওয়ায় তাঁর মন নিমগ্ন ছিল। কেবল তাঁর মগজের এক অংশ নয়, তাঁর সমস্ত জীবন নিমগ্ন ছিল। এইজন্য তাঁকে লোকে খেপা বলে মনে করেছে অনেক সময়।

"অন্যান্য সাধারণ বা অসাধারণ ব্যক্তির মতো শেলিরও কতকগুলি মতামত ছিল। একথা আমরা সকলেই জানি

মতামত থাকাটা কবিত্বের পক্ষে একটা বালাই।...সেটা আমরা ওয়ার্ডসওয়ার্থে বিশেষ করে দেখেছি। যেখানে তিনি রসেতে খুব পূর্ণ হয়েছেন সেখানে তিনি মতকে চাপা দিতে পেরেছেন। কিন্তু সেই পূর্ণতার একটু খর্ব হবামাত্র তাঁর মতগুলো খাড়া হয়ে উঠে রসপ্রবাহের প্রতিবাদ করতে থাকে। শেলিরও মতামত ছিল স্বাধীনতা সম্বন্ধে, মানবজাতির জীবনের লক্ষ্য সম্বন্ধে, ধর্ম সম্বন্ধে, রাজনীতি সম্বন্ধে। কিন্তু সেই মতগুলি পাগলামির দ্বারা বেশ মজে গিয়েছিল। সে ছিল এক পাগলা কবির মতামত। সুবুদ্ধি জিনিসটা মর্ত্যের জিনিস, কিন্তু উচ্চ অঙ্গের খাঁটি যে পাগলামি সে দৈবী। তাই বুঝি সুবুদ্ধির গড়া জিনিস ভেঙে ভেঙে পড়ে, আর পাগলামির উড়িয়ে আনা জিনিস বীজের মতো অরণ্যের পর অরণ্য সৃষ্টি করে; তাই পাগলা শেলির বাণী আজও নবীন আছে।...অত্যন্ত উদ্দাম হৃদয়ের imagination-এর বেগের দ্বারা উতলা হয়ে উঠে তিনি এত বড়ো মানবজাতির দূর ভবিষ্যৎকে মহিমা-মণ্ডিত করে দেখতে পেয়েছিলেন।...তিনি বর্তমান কালের যা-কিছু দুর্গতি তাকে অত্যন্ত আঘাত দেবার চেষ্টা করেছিলেন।...দুই সংঘবদ্ধ শক্তিকে তিনি আঘাত করেছেন তাঁর কাব্যের ভিতর দিয়ে। রাজতন্ত্র এবং পুরোহিত তন্ত্র। তিনি বলেছেন মানুষ এই দুই তন্ত্রের দ্বারা শৃঙ্খলিত হয়ে একেবারে জর্জর হয়ে গেল; একদিক থেকে বাইরে তাকে দাসত্বে বদ্ধ করেছে রাজশক্তি, আর একদিকে ধর্মতন্ত্র তার আত্মাকে সংকীর্ণ করেছে, মুগ্ধ করে রেখে দিয়েছে। এই দাসত্বের বন্ধন আর মোহের বন্ধন তিনি সইতে পারেননি।...

"বিচিত্র সুখদুঃখময় মানুষের এই জীবনটাকেও শেলি যেন একটা পর্দার মতো করে দেখেছিলেন। এর খণ্ডতা এর স্থূলতা যেন সত্যকে আবৃত করে রয়েছে। এই কুহেলিকার পর্দাখানা ছিঁড়ে ফেলে সত্যের অখণ্ড নির্মল মূর্তি দেখবার জন্যে কবির ভারি একটা ব্যাকুলতা ছিল। কতবার সেইজন্য তিনি মৃত্যুর মধ্যে উঁকি মেরে দেখবার চেষ্টা করেছেন। এই মুক্তি-পিপাসু কবি যেমন রাজতন্ত্র ও ধর্মতন্ত্রের বাধা সইতে পারেননি, তেমনিই মানুষের জীবনের খণ্ড-চেতনা বিরাট সত্যের উপলব্ধি থেকে আমাদের চিত্তকে যে গণ্ডীবদ্ধ করে রেখেছে এও তিনি সহ্য করতে পারেন নি। এইখানে যেন শেলির মনের সঙ্গে আমাদের ভারতীয় মনের একটা মিল দেখতে পাওয়া যায়। ভারতবর্ষেও এই ব্যবহারিক জগৎকে এই স্থূল জগৎকে সম্পূর্ণ সত্য বলে বিশ্বাস করে না এবং এর ভিতরে অন্তরতম অন্তর্যামী যে সত্য আছে তাকেই সন্ধান করে বেড়ায়।...

"শেলিকে তাঁর জীবনকালে ও পরবর্তীকালে তাঁর দেশের লোকে নাস্তিক বলে অপবাদ দিয়েছে। তার কারণ এই যে প্রচলিত ধর্মতন্ত্র ও পুরোহিততন্ত্রকে তিনি আঘাত করেছেন। কিন্তু তাঁর মধ্যে যে গভীর একটা ধর্মের তৃষ্ণা ছিল, একটা আধ্যাত্মিক উপলব্ধি ছিল, সে সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ করা যেতে পারে না। তিনি তাঁর Alastor কাব্যের মধ্যে যে সন্ধানের বেদনা প্রকাশ করেছেন সে কিসের সন্ধান।...তার যে বেদনা, সেই যে সন্ধান, তারই দ্বারা প্রমাণ হয় যে পরম সৌন্দর্যময় একটি আত্মিক সত্তা বিশ্বের মধ্যে আছে, সে সম্বন্ধে শেলির চিত্তে গভীর বেদনাপূর্ণ একটি আকুতি ছিল।" (ভারতী ১৩২৯ আশ্বিন। প্রবাসী ১৩২৯ কার্তিক পৃ ১০৪-০৬) এই প্রসঙ্গে আমরা পাঠককে কবির 'ছিন্নপত্র' মধ্যে শেলি সম্বন্ধে মন্তব্যগুলির কথা স্মরণ করাইতে চাই। ইন্দিরা দেবীকে লিখিত কয়েকখানি পত্রেই তিনি শেলি সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। দ্র ছিন্নপত্র (কলকাতা, ১৬ মার্চ, ২০ মার্চ [১৮৯৫])—বিশ্বভারতী পত্রিকা ১৩৫২, ২য় সংখ্যা পৃ ৭৫, ৭৬।

পৃ ৯৮-৯৯—কবি ও লেডি দম্পতি ১৯২২ অগস্ট ১৯ (১৩২৯ শ্রাবণ ২৪) কলিকাতায় আসেন। পরদিন বিশ্বভারতীর সদস্য ও বন্ধুদের জন্য রামমোহন লাইব্রেরি হলে বর্ষামঙ্গল বিশেষভাবে অনুষ্ঠিত হয়। এইটি হয় বোধ হয় শনিবারে ২৭ শ্রাবণ (১২ অগস্ট)। ইহার পরদিন সেই হলে লেভি-সাহেবের বিদায়-সংবর্ধনা ও তৎপরে 'বিশ্বভারতী সম্মিলনী'র অধিবেশন হয়। বিশ্বভারতীর আদর্শ প্রচার-কল্পে কলিকাতায় এই সম্মিলনী স্থাপিত হয়। লেভি-সংবর্ধনায়

পর কবি যে ভাষণ দান করেন, তাহা শান্তিনিকেতন-পত্রিকার ১৩২৯ পৌষ সংখ্যায় বাহির হয়। আমাদের মতে এই ভাষণ প্রদত্ত হয় ১৩ অগস্ট (২৮ শ্রাবণ)। 'বিশ্বভারতী' নামে যে গ্রন্থ শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের পঞ্চাশবর্ষপূর্তি উপলক্ষে প্রকাশিত হয় (১৩৫৮ পৌষ ৭), তাহার ৫ম সংখ্যক রচনাটি এই ভাষণ। উহার তারিখ ১ ভাদ্র ১৩২৯ দেওয়া হইয়াছে। সম্পাদক ১ ভাদ্র-র পর প্রশ্ন চিহ্ন দিয়া ভালোই করিয়াছেন। অতঃপর বর্ষামঙ্গল অনুষ্ঠান হইল ম্যাডান ভ্যারাইটি থিএটরে (৩১ শ্রাবণ ১৬ অগস্ট) ও আলফ্রেড থিএটরে (২ ভাদ্র ১৯ অগস্ট)। এইবার সর্বপ্রথম পাবলিক রঙ্গমঞ্চে জলসা হইল।

কবি ৪ ভাদ্র (২১ অগস্ট) প্রেসিডেন্সি কলেজে ছাত্রসভায় বিশ্বভারতী সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। ইহার পর শান্তিনিকেতনে ফিরিয়া আসিয়া 'শারদোৎসব' অভিনয়ের ব্যবস্থায় প্রবৃত্ত হন। ইতিমধ্যে ১ ভাদ্র (১৮ অগস্ট) লেভিরা বোম্বাই যাত্রা করিয়াছিলেন। শান্তিনিকেতন-পত্রিকা ১৩২৯ ভাদ্র আশ্বিন সংখ্যায় (পৃ ১১১) আছে, "কলিকাতায় বিশ্বভারতী সম্মিলনী রামমোহন লাইব্রেরিতে অধ্যাপক মহাশয়ের বিদায় সম্বর্ধনা করিয়াছিলেন। ১লা ভাদ্র অধ্যাপক সপত্নীক কলিকাতা ত্যাগ করিয়া বোম্বে অভিমুখে যাত্রা করেন।"

এইখানে গ্রন্থমধ্যে তারিখের যে গড়বড় হইয়াছে তাহা বিশ্বভারতীর প্রাক্তন ছাত্র রথীন্দ্রকান্ত ঘটক চৌধুরী, বালুচর, পালং ফরিদপুর হইতে আমাকে পত্রযোগে (১৩৫৫ জ্যৈষ্ঠ ১৩) জানাইয়াছেন।

পৃ ১১২—এসিয়াটিক সোসাইটির স্যর উইলিয়ম জোন্‌স রিসার্চ ফেলো ম. ম. কমলকৃষ্ণ স্মৃতিতীর্থের পুত্র ভবতোষ ভট্টাচার্য ৮ মাঘ ১৩৫৭ পত্রযোগে জানান যে রবীন্দ্রনাথ ৮ আষাঢ় ১৩৩০ (১৯২৩ জুন ২৩) নীহাররঞ্জন রায়ের সহিত বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলন উপলক্ষে নৈহাটি যান ও বঙ্কিমের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেন।

পৃ ১১৭—পিয়ার্সনের মৃত্যু। ইতালির Pistoia [Pistola] শহর হইতে ২৬ সেপ. ১৯২৩ সি. এফ. এনড্রুসকে লিখিত এক পত্রে ঘটনার বর্ণনা পাওয়া যায়। (V. B. News Vol. X. No. 5. 1914 Nov. p 57-60, also p 73 FN.) এই শহরটি ফ্লোরেন্স হইতে ২০ মাইল উত্তর-পশ্চিম দিকে আপেনাইন পর্বতের একটি শাখার উপর অবস্থিত।

পৃ ১২০—সাতই পৌষ উৎসব ১৩৩০। প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ ১৩৫০এ লিখিতেছেন, "কুড়ি বছর আগে ৭ই পৌষের উৎসবের সময় কোনো পারিবারিক ব্যাপারে কবির মন অত্যন্ত পীড়িত। একটা ব্যবস্থা করার চেষ্টা করছিলেন কিন্তু কিছু হল না। ৬ই পৌষ সন্ধ্যেবেলা শান্তিনিকেতনে গিয়ে পৌঁচেছি। কবি তখন থাকেন ছোটো একটা নতুন বাড়িতে—পরে এ বাড়ির নাম হয় 'প্রান্তিক'। [তখন এই বাড়ি ৫৬ নং বাড়ি বলিয়া পরিচিত ছিল। এইটি নির্মিত হয় শ্রীনিকেতনের মিস্ গ্রীনের জন্য] শুধু দুখানা ছোটো ঘর। খাওয়ার পরে বললেন, "তুমি এখানেই থাকবে"। লেখবার টেবিল সরিয়ে আমার শোবার জায়গা হল। পাশেই কবির ঘর। মাঝে একটা দরজা; পর্দা টাঙানো। গভীর রাত্রে ঘুম ভেঙে গিয়ে শুনতে পেলুম গান করছেন, "অন্ধজনে দেহ আলো মৃতজনে দেহ প্রাণ"। বারবার ফিরে ফিরে গান চলল, সারা রাত ধরে। ফিরে ফিরে সেই কথা, "অন্ধজনে দেহ আলো।" বিকাল থেকে মেঘ করেছিল, ভোরের দিকে পরিষ্কার হল। সকালে মন্দিরের পরে বললুম, "কাল তো আপনি সারারাত ঘুমোননি।" একটু হেসে বললেন, "মন বড়ো পীড়িত ছিল তাই গান করছিলুম। ভোরের দিকে মন আকাশের মতোই প্রসন্ন হয়ে গেল।"—কবি-কথা, বিশ্বভারতী পত্রিকা ১৩৫০ ২য় বর্ষ ২য় সংখ্যা পৃ ১৪২।

পৃ ১২৬—চীনে যাইবার সময় (১৯২৪ মার্চ) জাহাজের ক্যাবিনে বসিয়া চীনের জন্য বক্তৃতা লিখিতেছেন। "জাহাজের ক্যাবিনের কোণে বিছানার উপর বসে লেখা কি কম কথা! বিশেষত অপরাহ্ণের রৌদ্রে যখন ক্যাবিনের কাঠের দেয়াল তেতে উঠে দেহটাকে পাঁউরুটি সেঁকা করে তুলতে চায়।" (চিঠিপত্র ৩য় পৃ ৩৮)

পৃ ১২৭—এলমহার্স্টের নিকট এই পত্রখানি ছিল : দ্র V. B. News Vol XVIII. No 6. 1949 Dec. p 50

Republic of China Government Headquarters, Canton

7th April, 1924

Dear Mr. Tagore,

I should greatly wish to have the privilege of personally welcoming you on your arrival in China. It is an ancient way of ours to show honour to the scholar. But in you I shall greet not only a writer who has added lustre to Indian letters but a rare worker in those fields of endeavour wherein lie the seeds of man's future welfare and spiritual triumphs.

May I then have the pleasure of inviting you to Canton ?

Yours sincerely,

(Sd.) Sun Yat-Sen

পৃ ১৩৫—চীনের পেকিং মহানগরীতে (১৯২৪ মে)। পেকিঙের বৌদ্ধমন্দির—Fe Yen-এর রেভা. তাও-কাই কবিকে অভ্যর্থনা করেন। সেই সময়ে Liu Yen Hon নামে চীনা কবি রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশ্যে এক কবিতা লেখেন। এই কবিতার শেষ পঙক্তিতে আছে—"The East has its re-brith through our Poet-seer. May he live for ever." The Golden Book of Tagore p 108.

পৃ ১৩৮—জাপানে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ১৯২৪ সালে ২৬ মে Immigration Bill পাশ হয়। "It limited the annual immigration from a given country to 2% of the nationals of the country in the U. S. in 1890......The bill provided for the total exclusion of the Japanese, thereby abrogating the gentleman's agreement." রবীন্দ্রনাথের জাপান পৌঁছিবার কয়েকদিন পূর্বে জাপানে সাধারণ নির্বাচনের ফলে নূতন মন্ত্রিপরিষদ গঠিত হয় ; তাহাতে Kato প্রধান মন্ত্রী ও ব্যারন শিদেহারা (Shidehara) বৈদেশিক মন্ত্রী হন। শিদেহারার কার্যকালে (জুন ১৯২৪—এপ্রিল ১৯২৭) চীনের প্রতি জাপানের ব্যবহার শান্তিপূর্ণ (conciliatory) ছিল।

পৃ ১৪৬—Simon Bolivar (1783-1830) হইবে।

পৃ ১৪০—পাদটীকা ১। পুলিনবিহারী সেন এই তথ্যগুলি প্রথমে Hindusthan Standard-এ প্রথম প্রকাশ করেন পরে V. B. News-এ প্রবন্ধাকারে মুদ্রিত হয়।

পৃ ১৪৮—'সাবিত্রী,' হারুনা মারু জাহাজে লিখিত কবিতা ১৯২৪ সেপ ২৬ [১৩৩১ আশ্বিন ৮। পূরবী]।

রবীন্দ্রনাথ গায়ত্রী মন্ত্র ধ্যান করিতেন—এ কথা তিনি বহুস্থানে বলিয়াছেন। রাজা রামমোহন রায় ও মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের ধ্যানের মন্ত্র ছিল গায়ত্রীমন্ত্র। আমরা লৌকিক ভাষায় যাহাকে 'গায়ত্রী' বলি তাহা বৈদিক ছন্দের নাম। 'সবিতৃ' দেবতার উদ্দেশে গায়ত্রী ছন্দে রচিত এইঋক ঋক্‌বেদের ৩য় মণ্ডলের (৬২।১০) অন্তর্গত। লৌকিক সংস্কৃতে গায়ত্রী ছন্দের ব্যবহার নাই। বহু যুগ হইতে এই মন্ত্রটি ব্রাহ্মণগণের নিকটে গায়ত্রীছন্দের একমাত্র পরিচায়ক। তাই এই মন্ত্রের প্রকৃত নাম 'সাবিত্রী ঋক্' প্রায় লুপ্ত হইয়া গিয়া, গায়ত্রী নামেই প্রসিদ্ধ হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ এই কবিতায় গায়ত্রী ছন্দে উদ্‌গীত সাবিত্রী মন্ত্রের কথা বলিয়াছেন। (দ্র মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মজীবনী,

সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী সম্পাদিত, পরিশিষ্ট ৩০ পৃ ৩৮৬-৮৮। তু ১৩০৮, সাতই পৌষ একাদশ সাম্বৎসরিক উৎসব; সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর বিদ্যালয় সম্বন্ধে কিছু বলেন ও তৎপরে রবীন্দ্রনাথ মানবকদিগকে ব্রহ্মচর্যে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। উপদেশান্তে বক্তা গায়ত্রী মন্ত্র ব্যাখ্যা করিয়া ছাত্রদিগকে বুঝাইয়া দিলেন। দ্র ১৮২৩ শ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা মাঘ (১৩০৮)। রবীন্দ্র-জীবনী ২য় পৃ ৩৩।

১৩০৯ কার্তিক ২৩ কলিকাতা হইতে কুঞ্জলাল ঘোষকে কবি যে পত্র দেন তাহার মধ্যে গায়ত্রী সম্বন্ধে দীর্ঘ ব্যাখ্যান আছে। দ্র শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রম ১৩৫৮ পৃ ২৪-২৬।

পৃ ১৭২—কলিকাতার দর্শন কন্‌গ্রেস ১৯২৫ সালে হয়, ১৯২৬ সালে নহে। পা-টী ২। প্রবাসী ১৩৩২ মাঘ,—১৩৩১ নহে।

পৃ ১৭৩—১৯২৫ সালের শেষ দিকে অথবা ১৯২৬এর গোড়ায় রবীন্দ্রনাথ দিলীপকুমার রায়ের নিকট হইতে একখানি পত্র পান। তার সঙ্গে সুভাষচন্দ্র বসুর লিখিত একখানি পত্র ছিল। সুভাষচন্দ্র তখন বর্মার মান্দালয় জেলে আবদ্ধ। পত্রখানি তিনি দিলীপকে লেখেন ১৯২৫ অক্টোবর ৯। কবি লিখিতেছেন, "তোমার চিঠিখানি কাল পেয়ে বড়ো খুসি হলুম। সুভাষের চিঠি বড়ো সুন্দর—এই লেখার ভিতর দিয়ে তাঁর বুদ্ধি ও হৃদয়ের পরিচয় পেয়ে তৃপ্তিলাভ করেছি। সুভাষ আর্ট সম্বন্ধে যা লিখেছেন তার বিরুদ্ধে বল্‌বার কিছুই নেই। যেখানে আর্টের উৎকর্ষ, সেখানে গুণী ও গুণজ্ঞদের ভাবের উচ্চশিখর। সেখানে সকলেই অনায়াসে পৌঁছবে এমন আশা করা যায় না—সেইখানে নানা রঙের রসের মেঘ জমে ওঠে—সেই দুর্গম উচ্চতায় মেঘ জমে বলেই তার বর্ষণের দ্বারা নীচের মাটি উর্বরা হয়ে ওঠে। অসাধারণের সঙ্গে সাধারণের যোগ এমনি করেই হয়, উপরকে নীচে বেঁধে রেখে দিলে হয় না। যারা রসের সৃষ্টিকর্তা তাদের উপর যদি হাটের ফরমাশ চালানো যায়, তাহলেই সর্বনাশ ঘটে। ফরমাশ তাদের অন্তর্যামীর কাছ থেকে। সেই ফরমাশ অনুসারে যদি তারা চিরকালের জিনিস তৈরি করতে পারে, তাহলেই আপনিই তার উপরে সর্বলোকের অধিকার হবে।…কবিকে আমরা যেন এই কথাই বলি তোমার যা সর্বশ্রেষ্ঠ তাই যেন তুমি নির্বিচারে রচনা করতে পারো; কবি যদি সফল হয়, তবে সাধারণকে বলব যে জিনিস শ্রেষ্ঠ তুমি যেন সেটি গ্রহণ করতে পারো। যারা রূপকার, যারা রসস্রষ্টা, তারা আর্টের সৃষ্টি সম্বন্ধে সত্য ও অসত্য, ভালো ও মন্দ এই দুটি মাত্র শ্রেণীভেদই জানে—বিশিষ্ট কতিপয়ের পথ্য ও ইতর-সাধারণের পথ্য বলে কোনো ভেদ তাদের সামনে নেই।…সর্বসাধারণকে আমরা মনে অশ্রদ্ধা করি বলেই রসের নিমন্ত্রণ সভায় আমরা বাইরের আঙিনায় তাদের জন্যে চিঁড়ে-দইয়ের ব্যবস্থা করি—সন্দেশগুলো বাঁচিয়ে রাখি যাদের বড়ো লোক বলি তাদের জন্যেই।" অনামী পৃ ৩৫৪-৫৫।

পৃ ১৭৯—সিউড়িতে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলন ১৩৩২ চৈত্র ২০-২১ (১৯২৬ এপ্রিল ৪-৫)। মূল সভাপতি অমৃতলাল বসু। শাখা সভাপতি: সাহিত্য—সরলা দেবী; দর্শন—ফণিভূষণ তর্কবাগীশ; ইতিহাস—কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়; বিজ্ঞান—হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত। কবি 'সাহিত্যসম্মেলন' নামে ভাষণ লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন।

পৃ ১৮৪। নটীর পূজা ভারতীর জন্য চাহিয়া সরলা দেবী একশত টাকার চেক পাঠান। কবি তাহা প্রত্যাখ্যান করেন। উহা 'মাসিক বসুমতী' ১৩৩৩ বৈশাখেতে প্রকাশিত হয়। কারণটি প্রমথ চৌধুরীকে লিখিত পত্রে ব্যক্ত। ১৩৪৭ নববর্ষের ভাষণে নটীর পূজার ব্যাখ্যা আছে। (দ্র প্রবাসী ১৩৪৭ জ্যৈষ্ঠ পৃ ১৪৭) ঐ—"তিনি কি কেবল নারীর দুঃখই দেখিলেন—পুরুষের না।" তুঃ 'ধর্মপ্রচার' কবিতায় মুক্তিফৌজ সন্ন্যাসীদের উক্তি (মানসী)।

পৃ ১৯২—রবীন্দ্রনাথ-মুসোলিনী সংবাদ। ঠিক দশবৎসর পরে ১৯৩৬এর মার্চ মাসের গোড়ায় জবহরলাল নেহেরুকে মুসোলিনী নিমন্ত্রণ করেন। জবহরলাল প্রত্যাখ্যান করেন—"The Abyssinian campaign was being carried on then and my meeting him [Mussolini] would inevitably lead to all manner of

inferences, and was bound to be used for fascist propaganda. No denial from me would go far....I sent a letter to Sig. Mussolini expressing my regret..." The Discovery of India p 28. রবীন্দ্রনাথের অভিজ্ঞতা হইতে জবহরলাল বোধ হয় এই শিক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন।

পৃ ১৯৬—রবীন্দ্রনাথ-আইনস্টাইন সংবাদ। রণজিৎকুমার সেন, যুগান্তর ১৩৬২ আষাঢ় ৪ (১৯৫৫ জুন ১৯)। Asia পত্রে উভয়ের কথোপকথনটি Rabindranath-Einstein News নামে প্রকাশিত হয়। 'বিচিত্রা' পত্রিকায় (১৩৩৮ আশ্বিন, উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় সম্পাদিত) ইহার অনুবাদ প্রকাশিত হয়। পুনরায় ইহার নূতন তর্জমা যুগান্তরে মুদ্রিত হইয়াছে।

পৃ ১৯৬—রবীন্দ্রনাথ ১৯২৬-এর ১১-১৫ সেপ্টেম্বর বার্লিনে ছিলেন ; সেই সময়ে অধ্যাপক আইনস্টাইনের সহিত সাক্ষাৎ হয়। পাদটীকায় 'বিচিত্রা'র যে নির্দেশ আছে তাহার সহিত এবারকার সাক্ষাৎকারের সম্বন্ধ নাই। এবারের মোলাকাতের কোনো প্রতিবেদন প্রকাশিত হয় নাই ; তবে কবির Religion of Man গ্রন্থের ২য় পরিশিষ্টের ভূমিকায় তিনি আইনস্টাইনের সহিত মোলাকাতের একটা চুম্বক দিয়াছেন। কবি লিখিতেছেন, "প্রথম মহাযুদ্ধের পর জার্মানিতে গিয়ে আইন্‌স্টাইনের সঙ্গে আমার দেখা।" এই দেখা ১৯২১-এ কি ১৯২৬-এ তা স্পষ্ট না ; আমাদের মতে ১৯২৬-এ।

কবির সহিত বিজ্ঞানীর দ্বিতীয় মোলাকাত হয় ১৯৩০ জুলাই ১৪ ; তারই প্রতিবেদন Religion of Man-এ আছে। (রবীন্দ্র-জীবনী ৩য় পৃ ২৭৯)

১৯৩০ সেপ্টেম্বর মাসে কবির সহিত আইনস্টাইনের আর একবার সাক্ষাৎ হয় ; সোভিয়েত রাশিয়া হইতে প্রত্যাবর্তনের পর যখন কবি মেন্‌ডেল (Mendel)-দের বাড়িতে আছেন সেই সময়ে। রথীন্দ্রনাথকে আমেরিকায় গিয়া যে পত্র লেখেন (১৯৩০ অক্টোবর ১৪, চিঠিপত্র ৩য় পৃ ৯৭) তাহাতে আছে, "সেখানে [রাশিয়া] থেকে ফিরে এসে মেণ্ডেলদের ঐশ্বর্যের মধ্যে যখন পৌঁছলুম একটুও ভালো লাগ্‌লো-না"...ইত্যাদি। আইনস্টাইনের সঙ্গে মোলাকাতের প্রথম বাক্য হইতেছে—"আজ ডাক্তার মেণ্ডেলের সঙ্গে কথা হচ্ছিল"—ইত্যাদি। এই মোলাকাতের বিবরণী Asia নামে মার্কিনী পত্রিকায় প্রকাশ হয় ১৯৩১-এ। তার থেকে তর্জমা প্রকাশিত হয় 'বিচিত্রা'র ১৩৩৮ আশ্বিন সংখ্যায়,—মোলাকাতের এক বৎসর পরে।

ইহার পর কবির সঙ্গে আইনস্টাইনের আর একবার দেখা হয় আমেরিকার নিউইয়র্ক মহানগরীতে ১৯৩০-এর শেষ দিকে—ডিসেম্বরে। এই সময়ে আইনস্টাইন California-র Institute of Technology-এ ভিজিটিং প্রোফেসার রূপে আমন্ত্রিত হইয়া যাইতেছেন। নিউইয়র্কে কবি তাঁহার এক পরিচিত মহিলা ভাস্করের গৃহে অবস্থান করিতেছিলেন ; সেই সময়ে আইনস্টাইন কবির সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসেন। শ্রীমতী Gertrude Emerson (পরে ডাঃ বশী সেনের স্ত্রী) The Golden Book of Tagore-এ যে প্রবন্ধ লেখেন, তাহাতে কবির সঙ্গে দেখা করিবার জন্য আইনস্টাইনের আগমনের কথা আছে। (পৃ ৮০)

রবীন্দ্রনাথ ও আইনস্টাইনের মধ্যে ১৯৩০ জুলাই তারিখে যে কথোপকথন হয়, তৎসম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের লিখিত মন্তব্য-সহ বাংলা অনুবাদ বিশ্বভারতী পত্রিকায় ১৩৭২ সালের শ্রাবণ-আশ্বিন সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। অনুবাদক কানাই সামন্ত। আমরা নিম্নে সেইটি উদ্ধৃত করিতেছি :

'প্রথম মহাযুদ্ধের পর জর্মানিতে গিয়ে আইনস্টাইনের সঙ্গে আমার দেখা। মনে পড়ে আমাদের আধুনিক জীবনযাত্রার মান-উন্নয়নে আধুনিক যান্ত্র শিল্পের উপযোগিতা সম্পর্কে আমাদের আলাপ হয়েছিল। তখন [১৯২৬]। আমি বলেছিলাম, আর আজও আমি বিশ্বাস করি, যন্ত্রবিদ্যার এই উন্নতি আসলে আমাদের শারীরিক কল্যাণ-বিধানের অনুকূল—বিশেষতঃ, এই উন্নতির প্রতিরোধ যখন অসম্ভব, তখন প্রয়োজনের তাগাদায় মানুষের বিদ্যাবুদ্ধি জীবনে যে

সু-বিধার সৃষ্টি করেছে তার সুচিন্তিত সদ্‌ব্যবহার করাই তো আমাদের কর্তব্য। সভ্যতার যে স্তরে মানুষ আজ উন্নীত, তাতে যেমন আঙুলে জমি আঁচড়ে চাষ করার কথা ভাবা যায় না, তেমনি হস্তপদ জ্ঞানেন্দ্রিয় কর্মেন্দ্রিয় যেখানে পরাজিত আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি যন্ত্র সৃজন ক'রে আমাদের অক্ষমতা ঘুচিয়ে চলেছে। আইনস্টাইন আর আমার মধ্যে এ বিষয়ে সম্পূর্ণ মতের মিল হল যে, নূতন নূতন যন্ত্রাবিষ্কারের সাহায্যে প্রকৃতির অফুরন্ত ভাণ্ডার থেকে আমাদের জীবনযাত্রার সম্পদ আহরণ করতে হবে।

'গত বৎসরের [১৯৩০] গ্রীষ্মে আবার যখন জর্মানিতে যাই, বর্লিনের অদূরে Kaputh-এ আইনস্টাইনের নিজের বাড়িতে গিয়ে দেখা করার আমন্ত্রণ পেলাম। 'দুদিন' আগে অক্সফোর্ডে হিবার্ট বক্তৃতামালায় যা বলেছিলাম, আর *The Religion of Man* নাম দিয়ে পুস্তকের আকারে গ্রথিত করতে তখন ব্যস্ত ছিলাম, সেই ভাবনায় আমার মন তখন ভরপুর। আইনস্টাইনের সঙ্গে আলাপের সূত্রপাতেই বুঝলাম যে তিনি ধরে নিয়েছেন, 'আমার বিশ্ব' মানবিক ধ্যানধারণা দিয়ে সীমাবদ্ধ বিশ্ব। এ দিকে তাঁর দৃঢ় প্রতীতি এই যে মনবুদ্ধির নাগালের বাইরেও আছে এক সত্য। আমার বিশ্বাস, ব্যষ্টিমানব ঐক্যসূত্রে বাঁধা সেই দিব্য মানবের সঙ্গে যিনি আমাদের অন্তরে, আবার বাইরেও। অনন্তের ভূমিকায় বিরাজিত মানুষ, সেই অনন্ত মূলতঃই মানবিক। আমাদের ধর্মসাধনা নয় বিশ্বভৌমিক, আমাদের যে সজীব ব্যষ্টিসত্তা নিয়ে তার কারণ কারণ তার আছে শুভাশুভের আদর্শভাবনা। স্বভাবের মধ্যে ঐপ্রকার শুভাশুভের নীতি বা নন্দনীয়তা বিজ্ঞানের স্বীকার্য নয়; নিরাবরণ নিরাভরণ 'অস্তি' নিয়েই তার কারবার। বিজ্ঞানে ব্যক্তিসত্তার কোনো উপযোগিতা নেই। অথচ, অধ্যাত্মপথে বা ধর্ম-সাধনায় নিছক বাস্তব তথ্য বা তৎসম্পর্কিত তত্ত্ব কোনো কাজে লাগে না।

'একক নিঃসঙ্গ মানুষ ব'লে আইনস্টাইনের খ্যাতি আছে। তুচ্ছাতিতুচ্ছের ভিড় থেকে গাণিতিক ভাবনা ও দৃষ্টি মানুষের মনকে মুক্তি দেয় যেখানে, সেখানে তিনি একক বৈকি। তাঁর জড়বাদকে তুরীয়ই বলা চলে, দার্শনিক ধ্যান-ধারণার সীমান্ত-চুম্বী, সীমাবদ্ধ অহমের জটিল জাল থেকে—জগৎ থেকে—নিঃসম্পর্ক মুক্তি হয়তো সেখানে সম্ভবপর। আমার কাছে, বিজ্ঞান এবং আর্ট দুটিই মানুষের স্বরূপ প্রকৃতির প্রকাশ, জৈবিক প্রয়োজন-অপ্রয়োজনের বাইরে, আর আপনাতেই আপনার তার অপরিসীম এক সার্থকতা আছে।"

পৃ ১২৬-১২৮—বালাতন। Balaton, a lake in Hungary 47 miles long and 7-10 miles broad, 266 sq. m. Many streams fall into the lake and the beauty of the place makes it a popular bathing and fishing resort. The lake has been thoroughly studied by the Hungarian Geographical Society.

এই বালাতন-এ থাকিবার সময় কবি রোমা রোঁলার নিকট হইতে এক পত্র পান (১৯২৬ নভেম্বর ১১)। এই পত্রে তিনি কবিকে কেন ইতালিতে মুসোলিনীর স্বৈরাচার সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল করিয়াছিলেন, তাহার কৈফিয়ত দেন। রোঁলা কবিকে লিখিয়াছিলেন (১৯২৬ নভেম্বর ১১): "Often I have accused myself for having disturbed your rest when I took away from you the confidence you had in your Italian hosts. However, I had no other interest in my mind but your glory, which I value more than your rest. I did not want devils misusing your sacred name in the annals of history. Forgive me if my intervention has caused you some restless hours. The future (the present already) will show you that I have acted as your faithful and vigilant guide". দ্র Rolland and Tagore. Edited by Alex Aronson and Krishna Kripalani, Visva-bharati 1945-Sep. p 67.

পৃ ১৯৯। ১৯২৬ সালের য়ুরোপ-সফর সম্বন্ধে—"আমার পাশ্চাত্য মহাদেশে ভ্রমণকালে যাঁরা আমার সঙ্গী ও সঙ্গিনী ছিলেন তাঁদের অনবধান বা ঔদাসীন্যবশত সাধারণের অবগতির জন্য আমার ভ্রমণবৃত্তান্ত সংগ্রহ ও রক্ষা করেন নি—এমন একটি অন্যায় অপবাদ প্রবাসীতে আমার দ্বারা প্রকাশিত হয়েছে (পত্রাবলী ১৩৩৪ জ্যৈষ্ঠ পৃ ২৩০,২৩১) এ আমার পক্ষে অত্যন্ত লজ্জা ও অনুতাপের বিষয়। আমি আবিষ্কার করলাম তাঁরা সমস্ত বিবরণ যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ করে বিশ্বভারতীতে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন, কিন্তু যে কোনো কারণে হোক এতদিন পর্যন্ত সেই বিস্তারিত রিপোর্ট অগোচরে রয়ে গেছে। আজ তার আবিষ্কার হওয়াতে আমি আমার ভ্রমণ-সহচরদের নিকটে আমার অজ্ঞানকৃত অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করছি। এখন তাঁদের এই সংগৃহীত বিবরণের যথোচিত ব্যবহার হোতে কোনো বাধা ঘটবে না।" রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে লিখিত পত্র, শান্তিনিকেতন ২৪ জুন ১৯৪১, প্রবাসী ১৩৪৮ শ্রাবণ পৃ ৪০৭।

এ অভিযোগ কবির নিকট আমাদেরও শোনা। ১৯৩৬-এ রবীন্দ্রজীবনীর প্রথম সংস্করণের দ্বিতীয় খণ্ডের ভূমিকায় আমরাও অনুরূপ অভিযোগ করি। তাহার কারণ ১৯২৬ সালের কবির সঙ্গী ও সঙ্গিনীদের সম্বন্ধে এই প্রকারের ধারণা প্রচার করা হইয়াছিল এবং আমিও তাহার প্রতিধ্বনি করিয়াছিলাম। কিন্তু পরে জানা যায় সঙ্গীদের কোনো দোষ ছিল না। আশ্চর্যের বিষয় রবীন্দ্রনাথের নিকট হইতে ১৯২৬ হইতে ১৯৪১ সালে তাঁহার মৃত্যুর দুই মাস পূর্ব পর্যন্ত এই ঘটনার সত্যটি কেহ বিবৃত করেন নাই এবং কবি অকারণ ক্ষোভ ও অভিমান মনের মধ্যে পোষণ করিয়া তাঁহাদের প্রতি অবিচার করিয়াছিলেন।

পৃ ২০৪—১৯২৭ সাল। এই সময়ে কবি ফরাসী-লেখক ও ভাবুক আঁরি বার্বুস (Barbusse)-এর নিকট হইতে এক পত্র পান। য়ুরোপে ফাসিজম তখন প্রবল ; তাহার বিরুদ্ধে জনমত সংগ্রহের জন্য বার্বুস চেষ্টান্বিত হন। (a protest of enlightened and respected persons is the only thing likely, if it is organised and continuous, to put a stop to an abominable state of things)। রবীন্দ্রনাথ তাহার উত্তরে লেখেন—"It is needless to say that your appeal has my sympathy, and I feel certain that it represents the voices of numerous others who are dismayed at the sudden outbursts of violence from the depth of civilisation......I rejoice at the fact that there are individuals who still believe in a higher destiny of man, proving in their suffering the deathless life of the human soul ever ready to fight its own aberrations". V. B. Q. 1927 July p 194-95.

পৃ ২০৪—শ্রীনিকেতনের বার্ষিক উৎসবের কয়েকদিন পূর্বে (১৯২৭ ফেব্রুয়ারি ২) কবি আমেরিকার য়ুনিটেরিয়ান অধ্যাপক জে. টি. সান্‌ডারল্যানড্‌কে এক পত্র লেখেন। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রাম সম্পর্কে একখানি বই সানডারল্যানড লিখিতেছেন ; সে বিষয়ে সহায়তা চাহিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। কবি ভারতের অধীনতার জন্য বিদেশী ইংরেজকেই একমাত্র দায়ী করিলেন না। তিনি লিখিলেন, দায়ী আমরা—" where the mind itself is smothered under a load of dead things, under the pressure of automatic habits inherited from a primitive past, all our powers must be directed towards rescuing it from the debris of a ruined antiquity. That means widespread education." V. B. Q. 1927 July p 191-92.

পৃ ২১১—১৩৩৪ সালের গ্রীষ্মাবকাশের সময় শান্তিনিকেতন গ্রন্থাগারের উপরতলার বারান্দায় প্রাচীর-চিত্র বা ফ্রেস্‌কো অঙ্কিত হয় (১৯২৭ এপ্রিল)। জয়পুর হইতে নরসিংলাল নামে এক কারুশিল্পীকে আনা হয় ; ইনি জয়পুর রীতিতে প্রাচীর চিত্র করেন। রবীন্দ্রনাথ এই সময়ে কয়েকটি (৪) কবিতা লিখিয়া দেন, সেগুলি দিতলে চিত্রিত আছে।

দ্র পরিশেষ, রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৫ পৃ ১৮৫-৮৬। হে ভুয়ার ইত্যাদি। নিচের তলার ছবিগুলি ১৯৩৩এর গ্রীষ্মকালে দ্বিতীয় দফায় করা হয়। দোতলার ছবিগুলি মিশরীয়, চৈনিক, ইসলামীয়, ভারতীয়, পারসিক চিত্র হইতে গৃহীত। প্রান্তের দুইটি আশ্রমের চিত্র নন্দলাল বসু ও সুরেন্দ্রনাথ কর কর্তৃক অঙ্কিত।

এই ছবির মূল আঁকিয়াছেন নন্দলাল বসু; সেগুলি আশ্রমের বাহিরের ও ভিতরের ছবি (V. B. News 1933 July.—Jayantlal Parekh, Fresco-Painting and Santiniketan. Also Annual Report. Visvabharati 1933 p 19.

পৃ ২১৩—কবি শিলং হইতে সপরিবারে ফিরিলেন জুন (১৯২৭) মাসের শেষভাগে। ১২ জুলাই (১৩৩৪ আষাঢ় ২৭) মাদ্রাসের পথে পূর্বদ্বীপালীর জন্য কলিকাতা ত্যাগ করেন। শিলঙ হইতে ফিরিয়া কবি কলিকাতায় থাকেন কয়েকদিন। সেই সময়ে ১ জুলাই ও ২ জুলাই 'মুক্তি' নামে দুইটি সনেট লিখিতে দেখি (পরিশেষ)। কবিতা দুইটি 'নৈবেদ্য' স্মরণ করাইয়া দেয়। শেষ দিন (২ জুলাই) আন্তর্জাতিক সমবায় উৎসবের দিনে কলিকাতায় আলবার্ট হলে সমবায় সংগঠনসমিতি কর্তৃক অনুষ্ঠিত উৎসবের সভাপতিরূপে রবীন্দ্রনাথ 'ভারতবর্ষে সমবায়ের বিশিষ্টতা' সম্বন্ধে এক দীর্ঘ ভাষণ দান করেন। হিরণকুমার সান্যাল ও সজনীকান্ত দাসের দ্বারা সেইটি অনুলিখিত হয় ও পরে কবি কর্তৃক সংশোধিত হইয়া 'ভাণ্ডার' পত্রে (১৩৩৪ শ্রাবণ) প্রকাশিত হয়। বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহের ১০০ তম গ্রন্থ 'সমবায়নীতি' গ্রন্থে এই ভাষণটি মুদ্রিত হইয়াছে।

পৃ ২১৪—শিলঙ হইতে কবি এক পত্রে (১৩৩৪ জ্যৈষ্ঠ ১৪) রামানন্দবাবুকে জানাইতেছেন যে বিড়লাদের নিকট অর্থ সাহায্য না পাইলেও যেমন করিয়া পারেন জাভা-বলীদ্বীপে যাইবেন। "সেখান থেকে ভারতীয় ইতিহাসের উপাদান সংগ্রহ এবং এ সম্বন্ধে গবেষণার স্থায়ী ব্যবস্থা করা ছাড়া আমার অন্য কোনো উদ্দেশ্যই নেই। আমি নিজে বোধ করি অতি অল্প দিনই থাকব এবং যদি সাধ্যে কুলোয় তবে কোনো উপযুক্ত ব্যক্তিকে ঐতিহাসিক অনুসন্ধানের জন্য রেখে দিয়ে আসব। কাজটাকে আমি গুরুতর প্রয়োজনীয় বলে মনে করি এবং এও জানি আমার দ্বারা কাজটি সহজসাধ্য হতেও পারে। জাভা গভর্মেণ্ট আমাকে নিমন্ত্রণ করেননি। সেখান থেকে যাঁদের উৎসাহ পেয়েছি তাঁরা পুরাতত্ত্ববিৎ—আমাদের দেশের পণ্ডিতের সহযোগিতা পেলে তাঁদের সন্ধানকার্যের সুবিধা হতে পারবে।" প্রবাসী ১৩৪৮ আশ্বিন পৃ ৬৬১।

পৃ ২১৪—রবীন্দ্রনাথের পূর্ব-দ্বীপালি ও বৃহত্তর ভারত ভ্রমণে যাইবার পূর্বে একদিন কলিকাতা য়ুনিভার্সিটি ইন্স্টিটিউটে বৃহত্তর ভারত পরিষদের উদ্যোগে কবিসংবর্ধনা হয় (১৩৩৪ আষাঢ়)। পরিষদের ও ইন্স্টিটিউটের সভাপতি অধ্যাপক যদুনাথ সরকার বলেন যে, দশ বৎসর পূর্বে (১৯১৭) রবীন্দ্রনাথ তাঁহাকে এমন একজন শিক্ষিত যুবক জুটাইয়া দিতে বলিয়াছিলেন যিনি যবদ্বীপ ও বলীদ্বীপের ভাষা শিখিয়া তথায় ভারতীয় সভ্যতা সম্বন্ধে উপকরণ সংগ্রহ ও তাহার ইতিহাস রচনায় সাহায্য করিতে পারিবেন।

সভারম্ভে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী কবির কপালে চন্দনের ফোঁটা দিয়া আশীর্বাদ করেন।...সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদের পক্ষ হইতে অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় কবির উদ্দেশ্যে সংস্কৃত-প্রশস্তি পাঠ করেন। গিরিজাপ্রসন্ন লাহিড়ীও স্বরচিত সংস্কৃত কবিতা পাঠ করেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক প্রবোধচন্দ্র বাগ্‌চী কুমারজীবের রচিত একটি চীনা কবিতা চীনা-অক্ষরে লিখিয়া ইংরেজি অনুবাদসহ কবিকে উপহার দেন।[১] যদুনাথ ইংরেজিতে তাঁহার ভাষণ পাঠ

১ বন্ধুবর প্রবোধচন্দ্র এই অনুবাদটি আমাকে স্বহস্তে লিখিয়া পাঠাইয়া দেন। তিনি এখন বিদেহী।

"Bright virtue nourished in the heart
spreads its fragrance to thousands of Yojanas;
As the lone Sphinx on the Tung tree
(Sends forth) clear crisp sound up to the Nine Heavens."

করেন ; তাহাতে তিনি কবিকে পূর্বতন ঋষিদের স্থানাভিষিক্ত অধুনাজীবিত একমাত্র ব্যক্তি বলিয়া অভিহিত করেন। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ও পরিশেষে বিপিনচন্দ্র পাল বক্তৃতা করেন।

রবীন্দ্রনাথ এই সভায় যে ভাষণ দান করেন তাহা প্রবাসীতে (১৩৩৪ শ্রাবণ, দ্র কালান্তর) প্রকাশিত হয়।, কবি ভাষণের মধ্যে বলেন, "আজ একটা আকাঙ্ক্ষা আমাদের মধ্যে জেগেছে, যে-আকাঙ্ক্ষা ভারতের বাইরেও ভারতকে বড়ো ক'রে সন্ধান করতে চায়। সেই আকাঙ্ক্ষাই বৃহত্তর ভারতের প্রতিষ্ঠানটির মধ্যে রূপ গ্রহণ করেছে।...

"ভারতবর্ষের যে বাণী আমরা পাই সে বাণী যে শুধু উপনিষদের শ্লোকের মধ্যে নিবদ্ধ তা নয়। ভারতবর্ষ বিশ্বের নিকট যে মহত্তম বাণী প্রচার করেছে, তা ত্যাগের দ্বারা, দুঃখের দ্বারা, মৈত্রীর দ্বারা, আত্মার দ্বারা ; সৈন্য দিয়ে অস্ত্র দিয়ে পীড়ন লুণ্ঠন দিয়ে নয়। গৌরবের সঙ্গে দস্যুবৃত্তির কাহিনীকে বড়োবড়ো অক্ষরে আপন ইতিহাসের পৃষ্ঠায় সে অঙ্কিত করেনি।...ঐতিহাসিক জপমালায় ভক্তির সঙ্গে তাঁদের [দস্যুদের] নাম স্মরণ করে না। বীর্যবান দস্যুদের নাম ভারতবর্ষের পুরাণে খ্যাত হয়নি।" ভারতবর্ষ স্বাধীন হইবার বিশ বৎসর পূর্বে এই ভাষণ প্রদত্ত হয় ও কবিই দূত রূপে সর্বপ্রথম বিদেশে গমন করেন ।

পৃ ২২২—ভবতোষ ভট্টাচার্য জানাইতেছেন (দ্র পৃ ১১২-র পরিচয়) ১৯২৭-এ কবি বলীদ্বীপ ভ্রমণকালে Miss Mayo-র Mother India পুস্তকের New Statesmanএর সমালোচকই কবিগুরু সম্বন্ধে অসত্য উক্তির আরোপ করেন। Miss Mayo নিজে কিছু করেন নাই। কবিগুরুর লিখিত প্রতিবাদ সমগ্রভাবে Manchester Guardian ও পরে Sunderland-এর Unhappy India-র ভূমিকারূপে, এবং আংশিকভাবে Statesman দৈনিকে (১৯২৭ অক্টোবর ৫।৬) প্রকাশিত হয়।

পৃ ২২৬—শ্যামের (সিয়াম) পথে 'সিঙ্গাপুর হইতে 'কিস্তা' জাহাজে করিয়া ইহারা পিনাঙ আসিলেন' ১৯২৭ অক্টোবর ৫। স্টীমারে বসিয়া ৪ অক্টোবর তারিখে 'বিচিত্রা'র সম্পাদককে লিখিলেন 'তিন পুরুষ' উপন্যাসের নাম বদলাইয়া 'যোগাযোগ' রাখা যেন হয়। "তিন পুরুষ নাম ধরে আমার যে গল্পটা 'বিচিত্রা'য় বের হচ্ছে তার নাম রক্ষা করতেই হবে এমন কোনো দায় নেই। কাঁচা থাকতে থাকতেই ও-নামটা বদল করব বলে স্থির করেছি।...

"সাহিত্যে যখন নামকরণের লগ্ন আসে দ্বিধার মধ্যে পড়ি। সাহিত্যরচনার স্বভাবটা বিষয়গত না ব্যক্তিগত এইটে হল গোড়াকার তর্ক। বিজ্ঞানশাস্ত্রে বিষয়টাই সর্বেসর্বা, সেখানে গুণধর্মের পরিচয়ই একমাত্র পরিচয়। মনস্তত্ত্ব-ঘটিত বইয়ের শিরোনামায় যখনি দেখব 'স্ত্রীর সম্বন্ধে স্বামীর ঈর্ষ্যা', বুঝব বিষয়টিকে ব্যাখ্যা দ্বারাই নামটি সার্থক হবে। কিন্তু 'ওথেলো' নাটকের যদি ঐ নাম হত পছন্দ করতুম না।...'বিষবৃক্ষ' নামটাতে আমি আপত্তি করি। 'কৃষ্ণকান্তের উইল' নামে দোষ নেই—কেননা ও-নামে গল্পের কোনো ব্যাখ্যাই করা হয় নি।" বিচিত্রা ১৩৩৪ অগ্রহায়ণ পৃ ৭৮৯-৯০, রবীন্দ্র-রচনাবলী ৯ পৃ ৫৪৪-৪৬।

পৃ ২৩০—কবি শান্তিনিকেতনে ১৩৩৪ পৌষ উৎসবের পর আছেন।...এই সময়ে সুধীরচন্দ্র কর শান্তিনিকেতনে নূতন আসিয়া গ্রন্থাগারে নিযুক্ত হন। সাহস করিয়া সুধীরচন্দ্র তাঁহার রচিত কতকগুলি কবিতা কবিকে দেখিতে দেন। কবি "পাণ্ডুলিপিটি আগাগোড়া পড়িয়া, তাতে একটি মনোজ্ঞ অভিমত লিখিয়া দিলেন।" (১৭ পৌষ ১৩৩৪) দ্র স্বরধনী [১৩৩৪ ফাল্গুন]।

পৃ ২৩০—"বঙ্গের স্বরাজদলের যে পত্রিকা-সম্পাদক রবীন্দ্রনাথের নিকট হইতে লেখা চাহিয়া তাহার পর তাহা ছাপেন নাই, তিনিই তৎপূর্বে সাতিশয় আগ্রহ সহকারে মালয় উপদ্বীপের ইংরেজদের কাগজ হইতে রবীন্দ্রনাথের সুদীর্ঘ নিন্দা উদ্ধৃত করিয়াছিলেন।" রবীন্দ্রনাথের অমনোনীত রচনাটি প্রবাসীর বিবিধ প্রসঙ্গে (১৩৩৪ মাঘ পৃ ৫৭৭) মুদ্রিত হয়।

কলিকাতায় ঋতুরঙ্গ অভিনয়ের পর কবি শান্তিনিকেতনে ফিরিয়াছেন, কয়েকদিন পরেই পৌষ-উৎসব। কবি ৩ পৌষ (১৩৩৪) নিম্নলিখিত পত্রখানি স্বরাজদলের পত্রিকা-সম্পাদককে পাঠাইয়াছিলেন।

"আপনাদের পত্রিকার জন্য আমার কাছ হইতে কিছু লেখা চাহিয়াছেন। আমার সময় অত্যন্ত অল্প, আমাদের কর্তব্য সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু বলিব।

"শাসনকর্তাদের সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধের মধ্যে যে-কিছু বিকৃতি স্বদেশকে উপলব্ধি করিবার পক্ষে বাধা, তাহাই দূর করিবার চেষ্টা বর্তমান ভারতবর্ষের পলিটিক্স্। এই উপলক্ষ্যে আমাদের শিক্ষিতমণ্ডলী কখনো বা কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগসাধন কখনো বা বিচ্ছেদ ঘোষণার ব্যাপারে নিরতিশয় প্রবৃত্ত। এই চেষ্টার প্রয়োজন যতই থাক্ ইহারই উত্তেজনা একান্ত হইয়া গুরুতর প্রয়োজন হইতে আমাদের কর্মোদ্যমকে দীর্ঘকাল বিক্ষিপ্ত করিয়াছে।

"আমাদের নিজেদের পরস্পর সম্বন্ধের মধ্যে যে সকল গভীর বাধা বর্তমান, যাহার জটিল মূল আমাদের সমাজে, আমাদের সংস্কারে, আমাদের বুদ্ধির বিকারে, শক্তির জড়তায়, চিত্তের ঔদাসীন্যে, পরনির্ভরশীল মনোবৃত্তিতে, বিচারহীন গতানুগতিকতার দীর্ঘকালীন অভ্যাসে, তাহাই স্বদেশকে অন্তরে বাহিরে সত্যভাবে লাভ করিবার সর্বাপেক্ষা প্রবল অন্তরায়। নিজেদের অন্তর্নিহিত এই অপূর্ণতা স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হই বলিয়াই চোরাবালিতে পলিটিক্সের ভিত্তি স্থাপন চেষ্টায় আমাদিগকে নানাপ্রকার অত্যুক্তি ও আত্মবঞ্চনায় প্রবৃত্ত করিয়াছে। মেকি টাকায় বিধাতার সঙ্গে কারবার চলে না; সিদ্ধির পথকে অবাস্তবের সাহায্যে সহজ ও সংক্ষিপ্ত করিবার কৌশল অবলম্বন করিলে নিজেকেই ফাঁকি দেওয়া হয়। দেশের প্রজাসাধারণ দেশকে আপন করিবে এই ইচ্ছাটি সাধারণের মধ্যে যখন সত্য হইবে, গভীর হইবে, ব্যাপক হইবে, এই ইচ্ছার বিচিত্র দুঃখসাধ্য ত্যাগপরায়ণ দায়িত্ববোধ যখন অগভীর আবেগ স্রোতে আন্দোলনের বিষয় না হইয়া সুসংযত বিচারবুদ্ধি ও সুশিক্ষিত সাধনার উপর দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হইবে, তখন বাহিরের প্রতিকূলতা আমরা উপেক্ষা করিতে পারিব। স্বদেশ সম্বন্ধে কল্যাণফল লাভের কথা যখন ওঠে তখন সাধনক্ষেত্রের মাটিতে নামিয়া ঢেলা-ভাঙার কথাই ভাবি, একথা মনেও করি না, মুখে বলিতে লজ্জা হয় যে, ফসল ফলিয়াই আছে, কেবল তাহা গোলাজাত করিবার বাহ্য বাধা সরিয়া গেলেই সদ্যই আমাদের পোলিটিক্যাল ভোজের আয়োজন পূরা হইবে।"

পৃ ২৩১—'সিটি-কলেজের ছাত্রাবাসে সরস্বতী পূজা' সম্পর্কে প্রবন্ধ—প্রবাসী ১৩৩৫ জ্যৈষ্ঠ পৃ ১৭৪-৭৭। পুনরায় ২৩ বৈশাখ ১৩৩৫ একখানি পত্রও লেখেন। কবি লিখিতেছেন, "যাঁরা ভারতে রাষ্ট্রিক ঐক্য ও মুক্তিসাধনকে তাঁদের সমস্ত চেষ্টার একমাত্র লক্ষ্যরূপে গ্রহণ করেছেন, তাঁরাও যখন প্রকাশ্যে এই ধর্মবিরোধকে পক্ষপাত দ্বারা উৎসাহই দিচ্ছেন, তাঁরাও যখন ছাত্রদের এই স্বরাজনীতিগর্হিত আচরণে লেশমাত্র আপত্তি প্রকাশ করতে কুণ্ঠিত, তখন স্পষ্টই দেখছি, আমাদের দেশের পলিটিক্স-সাধনার পদ্ধতি নিজের ভীরুতায়, দুর্বলতায় নিজেকে ব্যর্থ করবার পথেই দাঁড়িয়েছে।" (পৃ ৩০০) এই নেতার নাম অযুক্ত। তিনি কে?

পৃ ২৩৬—শ্রীঅরবিন্দ সম্বন্ধে ১৩৩৮ বৈশাখ ৫ দিলীপকুমার রায়কে কবি লিখিতেছেন, "শ্রীঅরবিন্দ আত্মসৃষ্টিতে নিবিষ্ট আছেন। তাঁর সম্বন্ধে সমাজের সাধারণ নিয়ম খাটবে না। তাঁকে সসম্ভ্রমে দূরেই স্থান দিতে হবে—সব সৃষ্টিকর্তাই একলা, তিনিও তাই। আমাদের অভিজ্ঞতা সেইখানেই যেখানে জন্মেছে সকলের সঙ্গ,—তাঁর উপলব্ধির ক্ষেত্র সকল জনতাকে উত্তীর্ণ হয়ে। কিন্তু আমরা সেটা সহ্য করি কেন?—যে জন্যে মেঘকে সহ্য করি দূর আকাশে জমতে—শেষকালে বৃষ্টি পাওয়া যাবে চাষের জন্যে তৃষার জন্যে।" (অনামী পৃ ৩৪৯)

কয়েক বৎসর পূর্বে (১৩৩৫ পৌষ ১৪।১৯২৮ ডিসেম্বর ২৯) দিলীপকুমার কবির আশীর্বাদ প্রার্থী হন; বোধ হয় সেই সময়ে তিনি শ্রীঅরবিন্দের আশ্রয় গ্রহণে কৃতসংকল্প হন। কবি যে সনেটটি লিখিয়া দেন, তাহার মধ্যে অরবিন্দের প্রতি তাঁহার গভীর শ্রদ্ধা প্রকাশ পাইয়াছে। কবিতাটি দিলীপকুমারের 'অনামী' গ্রন্থের আরম্ভে কবির

হস্তাক্ষরে মুদ্রিত হইয়াছে। অতঃপর 'পরিশেষ' কাব্যখণ্ডের অন্তর্গত হয়। পরিশেষের ভাষায় কিছু বদল করা আছে; আমরা মূলটি উদ্ধৃত করিলাম :

নিম্নে সরোবর স্তব্ধ হিমাদ্রির উপত্যকাতলে;
উর্ধ্বে গিরিশৃঙ্গ হতে শ্রান্তিহীন সাধনার বলে
তরুণ নির্ঝর ধায় সিন্ধুসনে মিলনের লাগি
অরুণোদয়ের পথে। সে কহিল "আশীর্বাদ মাগি,
হে প্রাচীন সরোবর।" সরোবর কহিল হাসিয়া,
"আশীষ তোমার তরে নীলাম্বরে উঠে উদ্ভাসিয়া,
প্রভাত সূর্যের করে; ধ্যানমগ্ন গিরি-তপস্বীর
নিরন্তর করুণার বিগলিত আশীর্বাদ নীর
তোমারে দিতেছে প্রাণধারা। আমি বনচ্ছায় হতে,
নির্জনে একান্তে বসি, দেখি তুমি নির্বারিত স্রোতে
সংগীত-উদ্বেল নৃত্যে প্রতিক্ষণে করিতেছ জয়
মসীকৃষ্ণবিঘ্নপুঞ্জ পথরোধী পাষাণ সঞ্চয়
গূঢ় জড় শত্রুদল। এই তব যাত্রার প্রবাহ
আপনার গতিবেগে আপনাতে জাগায় উৎসাহ।"

পৃ ২৩৭—বৃক্ষরোপণ। রবীন্দ্রনাথ কেবল ব্যবহারিক দিক হইতে বৃক্ষরোপণ উৎসব প্রবর্তন করিয়া নিবৃত্ত হন নাই; শান্তিনিকেতনকে পুষ্পোদ্যানে পরিণত করেন। তাঁহার সাহিত্যে বহুপ্রকার ফুলের নাম আছে; তাহার তালিকা কেহ প্রস্তুত করিতে পারেন। জীবনের সন্ধ্যায় মংপু হইতে লিখিত একখানি পত্র সদ্য প্রকাশিত হইয়াছে; তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল। পত্রখানি জগদানন্দ রায়ের ভ্রাতুষ্পুত্র ও ধীরানন্দ রায়ের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন ছাত্র ও কবির সেবক সচ্চিদানন্দ রায় বা 'আলু রায়'কে লিখিত :—"বাগানে বিশেষ করে মন দিস। কাছাকাছি গোটা দুই তিন চামেলির ঝোপ লাগিয়ে চামেলিয়া নাম সার্থক করতে হবে। আমি বড়ো গাছ ভালোবাসি, কিন্তু বাড়ির খুব কাছে নয়। সজনে গাছের কথা মনে রাখিস, শীতের সময় ফুল ঝরায়, অথচ বাড়তে সময় নেয় না। মহানীম, শিমুল, ওখানকার মাটিতে ধরে সহজে। পালতে মাদারের বেড়ায় কাঁটা এবং ফুল দুই পাওয়া যায়, বনজুঁইয়ের বেড়াও উত্তম। রক্তকরবী গোরুতে খায় না, তার ফুলের গৌরবও আছে, সাদা করবী লাল করবী দুই পাশাপাশি চলবে। নেবু ফুলের গন্ধ আমার প্রিয়, তার ব্যবস্থা রাখিস। ফুলের ঐশ্বর্য আছে চালতা গাছে—শিরীষ, জামরুল, গোলাপজামকে আমি ফুলের জন্য পছন্দ করি। সারা জষ্টি মাস জল লাগবে। কোনো একটা লাইন কেটে পর্যায়ক্রমে কুরচি ও কাঞ্চন লাগানো যেতে পারে। দুচারটে গন্ধরাজ লাগালে দোষ নেই। যে গাছ ভালোবাসিনে সে হচ্ছে ছাতিম কদম। আমার ও-জায়গাটাতে শিরীষ কেন জোর পায় না খবর নিস।" পত্রখানির তারিখ ২৭ এপ্রিল ১৯৪০। দ্র ঋতুপত্র হেমন্ত সংখ্যা ১৩৬২।

পৃ ২৪১—প্রেম সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের মত লইয়া বিজ্ঞানীরা আলোচনায় প্রবৃত্ত হন। ডাঃ সরসীলাল সরকার, রঙিন্ হালদার, অনিলকুমার বসু ও গিরীন্দ্রশেখর বসু এই সময়ে এতদ্ সম্পর্কে আলোচনা করিয়াছিলেন। এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ ১৩৩৮ আশ্বিন ২৪ ডাঃ সরসীলাল সরকারকে 'সাইকো-এনালিসিস' সম্বন্ধে পত্র দেন।—বিচিত্রা ১৩৩৮ পৌষ পৃ ৭৫৬।

ডাঃ সরসীলাল সরকার—রবীন্দ্র-কাব্যে পরিকল্পনার একটি বিশেষত্ব—মানসী ও মর্মবাণী ১৩৩৪ অগ্রহায়ণ।

অনিলকুমার বসু—রবীন্দ্রনাথ ও মনোবিশ্লেষণ [রবীন্দ্রনাথ ও সরসী বাবুর কথাবার্তা]—প্রবাসী ১৩৩৫ আষাঢ় পৃ ৩৪০-৪৩।

গিরীন্দ্রশেখর বসু—'রবীন্দ্রনাথ ও মনোবিশ্লেষণ' আলোচনা—প্রবাসী ১৩৩৫ শ্রাবণ পৃ ৫৮৩-৮৪ [ইহার মতে সরসীবাবুর ও রবীন্দ্রনাথের আলোচনা psychological]।

অনিলকুমার বসু—'রবীন্দ্রনাথ ও মনোবিশ্লেষণ' আলোচনা।—প্রবাসী ১৩৩৫ আশ্বিন পৃ ৮৬৩-৬৪ [গিরীন্দ্রশেখরের মন্তব্যের সমালোচনা]

পৃ ২৪২। Message to the World League for Peace (Mod. Rev. 1928 Oct.) Ligue Mondiale pour la Paix এর Director Georges Dejean নিম্নলিখিত পত্রখানি কবিকে পাঠান (ফরাসীর অনুবাদ দেওয়া গেল): "Be pleased to permit us to approach you through the esteemed personality of Monsieur Romain Rolland, to pray that you be gracious enough to grant us an autograph for *the Golden Book of Peace.*

The work will consist of reproductions of the thoughts on peace from the most illustrious personages and the most eminent writers of each country. We have received up to this day, for this book, over 270 documents, among which are the autographs of Messrs. Heriot, Briand, Paul-Boncour, Poincare, Brieux, Marcel Prevost, Chamberlain, Stressemann, Ador Henri Barbusse, Maurice Donnay, Vandervelde, Charles Richet, Quidde and others.

We pray that you believe, Honoured Sir, that we shall consider it a very great disappointment if you donot consent to honour *the Golden Book of Peace* with some reflextion emanating from your great heart.

We feel sure that you will undoubtedly approve of our effort and that you will contribute to its moral success by letting us have a few lines that we solicit from your generosity.

Be kind enough, honoured monsieur, to accept the expression of our great admiration and the assurance of our profound gratitude."

A piece of vellum was sent for an autographed message from the Poet and he wrote the following lines and signed it both in English and Bengali :—

"In our political ritualism, we still worship the tribal god of our own make and try to appease it with human blood. This fetishism is blindly primitive and angers truth that leads to death dealing conflicts. To many of us it seems that this blood-stained idolatory is a permanent part of human nature. But we know in our past history, there have been things born of dark unreason producing phantoms of fear in our mind and ferocity of suspicion. Within the bounderies of night they also had loomed large and appeared as everlasting. But a great many of them have already vanished, making the social life of a fruitful peace possible in civilised communities.

"Let us, today, by the strength of our own faith prove that the homicidal orgies of a cannibalistic politics are doomed, inspite of contradictions that seem overwhelmingly formidable,

Rabindranath Tagore"

পৃ ২৪২—৩০ সেপ্টেম্বর১৯২৮ [১৪ আশ্বিন ১৩৩৫], এ তারিখটি ভুলক্রমে ৩০-এর স্থলে ৩ হইয়া গিয়াছে।

পৃ ২৪৬—ভারতীয় লাইব্রেরি সমূহের কন্‌ফারেন্স। "ভারতীয় লাইব্রেরীসমূহের কন্‌ফারেন্সে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি হইবার কথা ছিল। তজ্জন্য তিনি একটি ছোট অভিভাষণও লিখিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি অসুস্থতাবশত কলিকাতায় আসিতে পারেন নাই। তাঁহার অভিভাষণটি শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় পাঠ করেন।" রবীন্দ্রজীবনীতে আছে কবি কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। প্রবাসী ১৩৩৫ মাঘ, বিবিধ প্রসঙ্গ পৃ ৬০৪।—লাইব্রেরীর মুখ্য কর্তব্য, প্রবাসী ১৩৩৫ পৌষ।

পৃ ২৪৭ পা-টী ১ V. B. Q. 1929. Vol. VII 1&2, Message to the Parliament of Religions. 1929। ব্রাহ্মসমাজের শতবার্ষিকী উৎসব উপলক্ষ্যে কলিকাতায় সকল ধর্মাবলম্বী লোকদিগের একটি সম্মেলন আহূত হয়। ইংরেজিতে ইহাকে পার্লামেণ্ট অব্‌ রিলিজন্‌স্ বলা হয়। ভারতবর্ষের নানা ধর্মাবলম্বী বিদ্বান ও চিন্তাশীল লোক এবং অন্যান্য দেশ হইতে নানা ধর্ম ও সম্প্রদায়ের অনুরূপ লোক যোগদান করেন। প্রথমদিন (১৯২৯ জানুয়ারি ২৭) সভাপতিরূপে রবীন্দ্রনাথ একটি ক্ষুদ্র অভিভাষণ পাঠ করেন। বঙ্গের প্রমথনাথ তর্কভূষণ, মৌলবী আবদুল করিম, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত প্রভৃতি প্রবন্ধ পাঠ করেন। (প্রবাসী ১৩৩৫ ফাল্গুন পৃ ৭৫৬)

পৃ ২৫৯—কুমু বা কুমুদিনী বা 'যোগাযোগ' সম্বন্ধে শ্রীমতী রাধারানী দেবী রবীন্দ্র-পরিষদে আলোচনা করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া রবীন্দ্রনাথের নিকট হইতে কুমুর বিস্তারিত পরিচয় জানিতে চান। রবীন্দ্রনাথ লিখিতেছেন :

"সেকালের বনেদীঘরের মধ্যে কুমুর জন্ম। বনেদীঘর সাধারণত আপন পাকা দেয়ালের মধ্যে আপন সাবেক কালকে বেষ্টন করে রাখে। সেই সাবেক কালের অনেক দোষ থাকতে পারে কিন্তু সে আপন আভিজাত্যরীতির দায়িত্ব প্রাণপণে স্বীকার করে, যে কোনো ব্যবহার তার কাছে ইতর বলে ঠেকে বা কুলগৌরবের অযোগ্য বলে সে মনে করে সর্বনাশ হলেও সেটাকে সে বর্জন করে। কিন্তু এই বেষ্টনের বাইরে যে সব পরিবর্তন দ্রুতবেগে ঘটছে তার মধ্যে আভিজাত্যের দায়িত্বগৌরব নেই—তাই তার ভাষায় ভাবে কামনায় কর্মে ভ্রষ্টতার, ইতরতার বাধা থাকে না। এই কারণেই এই রকম বংশের সঙ্গে বাইরের সমাজের একটা প্রভেদ অনেকদিন স্থায়ী থাকে। কুমু যে সময়ে জন্মেছে সেই সময়ে একাকার হবার পালা আরম্ভ হয়েছে কিন্তু তবু ওদের ঘরে আত্মসম্ভ্রমের একটা বাঁধা রীতি ছিল। কুমুর জন্ম তারই মধ্যে। বাইরের সমাজ যে কতই পৃথক তা ও কল্পনাও করতে পারত না। ছেলেবেলা থেকে ভাইয়ের স্নেহে পালিত কুমু নিঃসঙ্গিনী—এই নিঃসঙ্গ নির্জনতায় তার স্বাভাবিক ধ্যানপ্রবণতা কোনো বাধা না পেয়ে প্রবল হয়ে উঠেছে। যে-যৌবনের মুখে পুরুষের পূর্ণ আদর্শ তার মনকে অন্তরে অন্তরে নিজের অগোচরেও আকর্ষণ করেছে সেই বয়সে তার ঠাকুরের মধ্যে সেই আদর্শের সে প্রতিষ্ঠা করেছে, বস্তুত আপনার নারীর প্রেম পূজার ছলে সেই ঠাকুরকেই দিয়েছিল। সেই ঠাকুরকে সে আপন ধ্যানের সমস্ত সম্পদ দিয়ে রচনা করেছে। এমন কুমু আপন সংস্কারের মোহে কল্পনা করলে যে বিবাহের প্রস্তাবে তার ঠাকুরই তাকে ডেকেছেন—স্বামীর মধ্যে এই ঠাকুরের আহ্বান সার্থক হবে, এই ঠাকুরের পূজাই প্রত্যক্ষ হয়ে উঠবে। হয়তো ভক্তির জোরে তাই হতে পারত—হয়তো স্বামীকেও আপন ধ্যানের পরশপাথরে সে সোনা করে তুলত, কিন্তু মধুসূদনের স্থূল প্রকৃতি তাকে একান্তই বাধা দিলে—এইখানেই ট্রাজেডি। মধুসূদন অত্যন্ত হাল আমলের কৃতী পুরুষ—ধন ও বাহ্য মান উপার্জনে সিদ্ধিলাভেই তার একান্ত লক্ষ্য। তাদের বংশও একদিন সম্মানী ছিল কিন্তু দারিদ্র্যের তলার পাঁকে লিপ্ত হয়ে তাদের আত্মসম্ভ্রমের দায়িত্ববোধ একেবারে লুপ্ত হয়ে গেল। হাল আমলের প্রচলিত রীতি অনুসারে ধনের গৌরবকেই সে সব চেয়ে বড়ো বলে দাম্ভিকতায় স্ফীত হয়েছিল—এমন অবস্থায় কুমু তাকে আত্মসমর্পণ করতে পারলে না—তাতে তার আত্মসম্মানে নিরতিশয় ঘা দিলে—এতবড়ো অপমানকর সম্বন্ধ তার পক্ষে ব্যভিচারের সমতুল্য—এ যেন দেবতার অবমাননা—নিজের যা শ্রেষ্ঠ তাকে পঙ্কে বিলুণ্ঠিত

করা। কুমুর এই পরিচয়ের মধ্যেই গল্পের সমাধা হল। ওর পরিচয়ের পক্ষে আর বেশি কোনো ঘটনার প্রয়োজন নেই।"—১৪ ভাদ্র ১৩৩৫ ; দ্র বিশ্বভারতী পত্রিকা ১৩৬২ কার্তিক-পৌষ পৃ ৭৯-৮০।

পৃ ২৬৫—১৯২৯ সালে তপতীর অভিনয় হয়। এই বৎসর মধু বোস কবির মেঘ ও রৌদ্র আখ্যান লইয়া 'গিরিবালা' নামে নির্বাক চিত্র প্রস্তুত করেন। ম্যাডান কোম্পানির নির্দেশে এইটি করা হয়। মধু বোস লিখিতেছেন, "চিত্র-নাট্যটি সম্পূর্ণ হবার পর গুরুদেবের…শরণাপন্ন হই। তিনি পরম যত্নে ও পরম স্নেহে গিরিবালার সিনারিওটি আদ্যোপান্ত সংশোধন কোরে দেন।…পাতায় পাতায় কবির হস্তাক্ষর বিভূষিত সেই সংশোধিত সিনারিওটি আজও আমি পরম যত্নে ও গৌরবে রক্ষা কোরচি। ক্রাউন সিনেমায় 'গিরিবালা' চিত্রের উদ্বোধন দিবসে গুরুদেব স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন এবং ছবি দেখে খুশী হয়ে আমাকে আশীর্বাদ করেন।" (দীপালি ১৩৪৮ রবীন্দ্রজন্মোৎসব সংখ্যা দ্রষ্টব্য)

পরে ১৯৩০ সালে 'দালিয়া' গল্পটি রঙ্গমঞ্চে অভিনয়ের জন্য অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় নাটকাকার দান করেন। ১৯৩৩ মার্চ মাসে দালিয়ার পুনরভিনয় হয়। তৎপূর্বে 'দালিয়া'র কপি কবির কাছে পেশ করা হয়। "সেবার কবিগুরু মূল কাহিনীটিকে সম্পূর্ণ নূতন করে নাটকাকারে লিখে দেন। তৎকালীন এম্পায়ার রঙ্গমঞ্চে নাটকটি অভিনীত হয়। গুরুদেব অভিনয়রাত্রে উপস্থিত ছিলেন এবং অভিনয় দর্শনে বিশেষ আনন্দলাভ করেন।" অথচ প্রতিমা দেবীকে লিখিয়াছিলেন 'দালিয়াটা ভালো লাগল না।' (চিঠিপত্র ৩য়, ৪৮ নং)

মধু বোস লিখিতেছেন, "Harmony এবং melody-র সংমিশ্রণে প্রথম Harmonised Indian music এর যখন প্রবর্তন হয় তখন এই নব পরিকল্পনার প্রেরণা পাই আমি রবীন্দ্রনাথের সুর ও ভাব থেকে। 'আলিবাবা' গীতিনাট্যের প্রথম Harmonised music-এর স্বরলিপি পুস্তকখানি আমি গুরুদেবের নামে উৎসর্গ করি। তিনি আমার একখানি music-এর উৎসর্গ পত্রের নিম্নভাগে এই কথাকয়টি লিখে দিয়ে নাম স্বাক্ষর করেন: I hope this small begnning will grow into a great musical development."

মধু বোসের প্রতি কবির বিশেষ স্নেহ ছিল; ইঁহার পিতা প্রমথনাথ বসু ও জননী কমলা দেবী; কমলা দেবী রমেশচন্দ্র দত্তের কন্যা। ইঁহাদের বিবাহসভায় বঙ্কিমচন্দ্র যুবক রবীন্দ্রনাথকে একদিন অভিনন্দিত করেন। মধু বোস শান্তিনিকেতনে ছাত্র ছিলেন (১৯০৭-০৯)। আমাদের মনে হয় মধু বোস প্রভৃতির তাগিদেই কবি দালিয়া গল্পটি লইয়া নিজেই একটা খসড়া করিয়া দেন। সেই 'অরচিত নাটকের পরিকল্পনা'র খসড়া বিশ্বভারতী পত্রিকা ১৩৫০ বৈশাখ ১ম বর্ষ ১০ম সংখ্যায় প্রভাতচন্দ্র গুপ্ত প্রকাশ করেন। তাঁহারই এক খাতায় কবি এই খসড়াটি লিখিয়া রাখেন বলিয়া প্রকাশ। (পৃ ৬৭৪)

পৃ ২৭০—বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের ভাষণ সম্পর্কে কৈফিয়ত। ১৯৩০ ফেব্রুয়ারি ১১ শান্তিনিকেতন হইতে কবি একপত্রে রামানন্দবাবুকে জানাইতেছেন, "বড়োদার পথে আমেদাবাদে শরীর অত্যন্ত অসুস্থ হয়। যখন নিশ্চয় বুঝলুম কোনোমতে সাহিত্য সম্মেলনে এ শরীর নিয়ে পৌঁছতে পারব না তখন বহু কষ্টে ডাক্তারের নিষেধ অমান্য করে একটা লেখা [পঞ্চাশোর্ধ্বং] অবনের [অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর] মারফত সম্মেলনের কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠিয়েছিলেম। দেশের লোক আমাকে সহজে ক্ষমা করেন না জেনেই এই কষ্টসাধ্য কাজ করতে হয়েছিল। তাও ব্যর্থ হল—ক্ষমা পাই নি। শুনলুম ডাকপেয়াদার মারফতে না গিয়ে অবনের মারফতে লেখাটা যাওয়াতে তাঁরা অসম্মানের ক্ষোভে লেখাটার অস্তিত্ব স্বীকার করেননি। এ সকল বিষয়ে আমার বুদ্ধির ত্রুটি আছে কিন্তু কাউকে অসম্মান করবার কারণ ও ইচ্ছা আমার ছিল না। এত ক্লেশ করে আমার জীবনে আর কোনো দিন লিখিনি। এর থেকে প্রমাণ হয় স্বদেশবাসীকে আমি যমদূতের চেয়ে বেশি ভয় করতে আরম্ভ করেছি। যতটা সম্ভব দূরে থাকবারই চেষ্টা করব।" প্রবাসী ১৩৪৮ আষাঢ় পৃ ২৭৬।

পৃ ২৭৭—"The Poet...shared in the common life of our colleges at Selly Oak (for Woodbrooke is one of a family of eight colleges)....He was present on several occasions at the devotional meetings...At three of these he spoke briefly, and the words which he said and even more the spirit in which he said them made a very deep impression upon all his hearers." John S. Hoyland, The Poet at Woodbrooke, *The Golden Book of Tagore* p 113.

পৃ ২৮১—শান্তিনিকেতনের বিদেশী অধ্যাপকরা বিশ্বভারতী সম্বন্ধে আস্থাহীন। জেনিভা থেকে ২৫ অগস্ট ১৯৩০ রবীন্দ্রনাথ তাঁহার কন্যা মীরাদেবীকে লিখিতেছেন,—"তোর চিঠি থেকে শান্তিনিকেতনের পাশ্চাত্য পাড়ার খবর কিছু কিছু পাওয়া গেল। ঐ পাড়ার উপর বিশ্বভারতীর ঝাঁটা বোলাবার প্রস্তাব করে পাঠাতে হবে। কেননা এখন থেকে এখানকার অনেক ছেলে মেয়ে ওখানে প্রতিবৎসর যাবে তার ব্যবস্থা হচ্ছে; অতএব আবর্জনা যদি না এখনি সরানো যায় তাহলে ওদের সংসর্গে য়ুরোপের সম্বন্ধ বিষাক্ত হয়ে উঠবে।" (চিঠিপত্র ৪র্থ ৬২নং পত্র) পত্রে যে আবর্জনার ইঙ্গিত করিয়াছেন, তাঁহারা হইতেছেন অধ্যাপক বগদানভ ও ডক্টর কলিন্স।

পৃ ২৮১—কলিন্স (Dr. M. Collins)। আদৈয়ার-এ (মাদ্রাস) মৃত্যু হয় ১৯৩৩। ইনি ১৯২৫-৩১ পর্যন্ত বিশ্বভারতীর অধ্যাপক ছিলেন। (V. B. News 1933 March p 76.)

পৃ ২৮৯—ফিলাডেলফিয়া হইতে কবি ১৯৩০ অক্টোবর ২৮ হেমবালা সেনকে লিখিতেছেন, "অতলান্তিক পাড়ি দেবার আগে অনেক দ্বিধা করেছিলুম—শরীরও বিমুখ হয়েছিল মন ততোধিক। ভিতরে ভিতরে কেবল একটিমাত্র তাগিদ ছিল যার তাড়নায় আমাকে মরিয়া করেছিল। মেয়েদের বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করতে হবে এই সংকল্প আমাকে রাস্তায় বের করেছে।" (প্রবাসী ১৩৭৮ কার্তিক পৃ ১১৫)

পৃ ২৯০—হেলেন কেলার প্রসঙ্গ, শ্রীপুলিনবিহারী সেন, আনন্দবাজার পত্রিকা ১৩৬১ চৈত্র ১৩। ১৩৬১ সালে হেলেন কেলার ভারত ভ্রমণে আসেন।—

"ভারতবর্ষে পদার্পণ করে হেলেন কেলার "গীতাঞ্জলি"র কবি রবীন্দ্রনাথের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন। সকলের কাছে একথা সুবিদিত নয় যে, রবীন্দ্রনাথের মার্কিন প্রবাসকালে একদা তাঁর সঙ্গে হেলেন কেলারের সাক্ষাৎ আলাপ পরিচয় হয়েছিল, কবি তাঁকে নিজের কবিতা পাঠ করে শুনিয়েছিলেন। ১৯৩০ সালে পুনরায় মার্কিন প্রবাস-কালে New History Society রবীন্দ্রনাথকে যে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করেন (১৯৩০ ডিসেম্বর ৭) তাতে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে হেলেন কেলারও সম্মানিত অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন; সমসাময়িক পত্রিকা থেকে এই সভার বিবরণ মুদ্রিত করা গেল; এই প্রসঙ্গে আমেরিকায় রবীন্দ্র-সংবর্ধনার আংশিক বিবরণও পাঠকের গোচর হবে—

সভার বিজ্ঞপ্তি—

Rabindranath Tagore, Indian poet and teacher, and Helen Keller, blind and deaf writer, will be guests of honour at a meeting of the New History Society at the Ritz-Carlton Hotel tonight during the course of which Rabindranath will deliver what is described as his farewell message to America. A short address written by Miss Keller also will be delivered. Rabindranath will speak on "The First and last Prophets of Persia," while Miss Keller also will refer to the hope of a new idealism emerging out of competition and nationalism.—*New York Times*, December 7, 1930.

সভার বিবরণ—

American admirers of Rabindranath Tagore, Hindu poet and Nobel Prize winner, feted him last night at a reception in the grand ballroom of the Ritz-Carlton Hotel.

More than 3,000 persons gathered to pay homage to the great Indian philosopher, who sails for India on December 16. The reception was held under the auspices of the New History Society. Event of the evening was the receipt of a radiogram from Dr. Albert Einstein, who is en route to New York on the Belgenland. The message said :

"May Tagore work further with success in the service of our ideals for the union of all nations. Greetings to Tagore."

Tagore in a brief talk recalled the two great Persian prophets, Zoraster and Abdul-Baha, who, he said, were the first teachers to preach the unity of God with all mankind.

When he had finished, Helen Keller, famous blind woman, embraced him. She told the gathering that Tagore was the supreme prophet in a movement that would result in a world wide awakening of the brotherhood of all nations.—*New York American*, Dec. 8, 1930.

কবির আমেরিকা থেকে স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের নির্দিষ্ট সময়ের পূর্ব দিন হেলেন কেলার কবিকে উপহার ও পুষ্পার্ঘ্যর সহিত যে পত্র প্রেরণ করেন তাতেও রবীন্দ্র-প্রচারিত বিশ্বমানবিকতার আদর্শের প্রতি ও কবির প্রতি তাঁর গভীর শ্রদ্ধা প্রকাশ পেয়েছে—

Now is the time of your departure, dear Master. Will you graciously accept my offering of flowers ? I would have them please your senses, and breathe my heart's loving wish. A happy year to you for every noble word you have spoken !

O Master ! it is beautiful to know that nothing is finally wrong with the world. It is beautiful to know that when everything is in its place, it is good. O dear Master, it is beautiful to know that out of cruel things and great sorrows is finally wrought the Empire of Love.

The little bridge in the picture is a symbol of the bond of justice that shall unite East and West, North and South. Beautiful shall be the feet of those who cross and recross it with tidings of fellowship and peace !

Affectionately Yours.
Helen Keller.

Forest Hills
December Fifteenth

The World I Live in গ্রন্থে[১] হেলেন কেলার তাঁর অনেক বেদনা-ভাবনা অনুভূতির কথা লিপিবদ্ধ করেছেন। এই গ্রন্থ তিনি ১৯২১ সালে যখন কবিকে উপহার দেন, তখন তাঁর জীবনের মর্মবাণীর দ্যোতকরূপে রবীন্দ্র-

১ হেলেন কেলারের অন্য কয়েকখানি গ্রন্থ—Optimism ; Out of the Dark ; My Religion ; The Song of the Stone Wall ; The Story of My life.

নাথের "আমি চঞ্চল হে আমি সুদূরের পিয়াসী" কবিতার শেষ দুই ছত্রের অনুবাদ উপহারপত্রে উদ্ধৃত করে তাঁর শ্রদ্ধা নিবেদন করেন—

To Rabindranath Tagore

Yes, Master.

I forget, I ever forget, that the gates are shut everywhere in the house where, I dwell alone ![১]

Jan. 4, 1921. Helen Keller

ভাবতে ভালো লাগে, সম্ভবত এই কবিতাটিই রবীন্দ্রনাথ হেলেন কেলারকে পড়ে শুনিয়েছিলেন, এই কবিতাটির বিভিন্ন ব্যঞ্জনাসূত্রে উভয়ের মধ্যে ভাবৈক্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। পৃ ১২২—হেলেন কেলার The Golden Book of Tagore এর জন্য একখানি সুন্দর পত্র লিখিয়া পাঠান।

পৃ ২৯০—Will Durant-এর বই *The Case for India.* রবীন্দ্রনাথের সহিত উইল ডুরাণ্টের আমেরিকাতে ১৯৩০ সালে দেখা হয়। সেই সময় তিনি এক কবিপ্রশস্তি লেখেন, তাহা Golden Book of Tagore-এ মুদ্রিত হয় (p 75)। বোধ হয় তখনই তিনি কবিকে তাঁহার রচিত The Case for India গ্রন্থখানি উপহার দেন ও তাহাতে লিখিয়া দেন,"You alone are sufficient reason why India should be free"[২]। কবি দেশে ফেরেন ১৯৩১ জানুয়ারি ৩১ এবং ডুরাণ্টের বই-এর সমালোচনা লেখেন ১৯৩১ ফেব্রুয়ারি ১১। Mod. Rev. 1928 March)। এই বইখানি বাংলাদেশের বাজারে আসিতে পারে নাই—যদিও সেখানিকে সরকারীভাবে 'নিষিদ্ধ' বলিয়া ঘোষিত হয় নাই। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় এক বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন যে ডুরাণ্ট তাঁহাকে এই বইখানি পাঠান, কিন্তু তিনি পান নাই। কলিকাতার বিশিষ্ট এক 'পুস্তকবিক্রেতা পঞ্চাশখানি বই-এর অর্ডার দিয়া একখানি বই পান' নাই।—বঙ্গের পুস্তকালয় ও বঙ্গভাষা, প্রবাসী ১৩৩৮ শ্রাবণ পৃ ৫০৯।

দেশে ফিরিবার এগার দিন পরে তিনি যেদিন 'আমি' কবিতা (পরিশেষ) লেখেন, (রবীন্দ্রজীবনী ৩য় পৃ ২৯৩) সেইদিন ডুরাণ্টের বই-এর সমালোচনা লেখেন (১৯৩১ ফেব্রুয়ারি ১১)।

পৃ ২৯২—রবীন্দ্রনাথের ছবিআঁকা সম্বন্ধে। তিনি 'আলেখ্য' কবিতার (২৪ জুলাই ১৯৩২ পরিশেষ, রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৫ পৃ ২৬৮) লিখিতেছেন :

তোরে আমি রচিয়াছি রেখায় রেখায়
লেখনীর নটন লেখায়।
নির্বাকের গুহা হতে আনিয়াছি
নিখিলের কাছাকাছি,

যে সংসারে হতেছে বিচার
নিন্দাপ্রশংসার।
এই আস্পর্ধার তরে
আছে কি নালিশ তোর রচয়িতা আমার উপরে।

১ "কক্ষে আমার রুদ্ধ দুয়ার সে কথা যে যাই পাসরি।" অনুবাদটি রবীন্দ্রনাথের The Gardener গ্রন্থে আছে "I am restless. I am athirst for far-away things."

২ কবিপ্রশস্তিতেও Durant এক স্থলে লেখেন : "It is inconceivable to us that a nation capable of producing, even in the bitterest poverty and destitution, poets like yourself, scientists like Bose and Raman, and saints like Mahatma Gandhi, should not soon be welcomed into the fellowship of self-governing peoples".

অপেক্ষা করিয়া ছিলি শূন্যে শূন্যে, কবে কোন্ গুণী
নিঃশব্দ ক্রন্দন তোর শুনি'
সীমায় বাঁধিবে তোরে সাদায় কালোয়
আঁধারে আলোয়।…
অমূর্ত সাগরতীরে রেখার আলেখ্যলোকে
আনিয়াছি তোকে।…

সুষমার অন্যথায়
ছন্দ কি লজ্জিত হল অস্তিত্বের সত্য মর্যাদায়।
যদিও তাই-বা হয় নাই ভয়,
প্রকাশের ভ্রম কোনো
চিরদিন রবে না কখনো।
রূপের মরণক্রটি আপনিই যাবে টুটি
আপনারি ভারে,
আরবার মুক্ত হবি দেহহীন অব্যক্তের পারে।

এইদিন লেখেন 'জলপাত্র' কবিতা (পরিশেষ) এই কবিতাটির মধ্যে চণ্ডালিকার আখ্যানের প্রথমাংশ পাওয়া যায়। একবৎসর পরে নাটিকাটি লেখেন।

পৃ ২৯৮—রমা (নুটু) মজুমদারের সঙ্গে সুরেন্দ্রনাথ করের বিবাহ সম্বন্ধে অধ্যাপক ফণিভূষণ অধিকারী এক পত্রে কয়েকটি প্রশ্ন তোলেন। কবি বিবাহের কয়েকদিন পূর্বে (১৩৩৮ বৈশাখ ২০) উত্তরে লেখেন: "সুরেন মানুষ হিসাবে অধিকাংশ সৎকুলীনের চেয়ে বুদ্ধিমান ও প্রতিভাসম্পন্ন তথাপি নুটুকে তার ব্যক্তিগত প্রবৃত্তি ও অনুরাগ সংযত করতেই হবে অর্থাৎ বিনা কারণে নিজের ও সুরেনের ধর্মসঙ্গত ইচ্ছাকেই অপমানিত করতে হবে এটা হিন্দুসমাজসম্মত তা মানি, কিন্তু শ্রেয়স্কর তা কিছুতেই মানিনে। সামাজিক অসতীত্ব ও স্বাভাবিক অসতীত্বের মধ্যে প্রভেদ আছে—নুটু সমাজ-নির্বাচিত পাত্রকে বিবাহ করার দ্বারা মনে মনে অশুচি হলেও সমাজ সেই নিষ্ঠুর বীভৎসতাকে প্রশ্রয় দেয়—এটা একটা তথ্য মাত্র কিন্তু এটাকে শ্রেয় বলব কি করে? সংস্কারের দোহাই দাও, সামাজিক অসুবিধার দোহাই দাও—তার কোনো উত্তর নেই, কিন্তু শ্রেয়ের দোহাই দিলে কেমন করে মেনে নেব? অত্যাচারের অস্ত্র সমাজের হাতে, বিধাতৃবিহিত মানবধর্মকে অন্যায় নিপীড়ন করবার শক্তি আছে সমাজের, অক্ষমতাবশত সমাজের অযৌক্তিক অস্বাস্থ্যকর বিধান মেনে নিতে পারি, কিন্তু সমাজ কর্তৃক অনুমোদিত মূঢ়তা ও অধর্মকে শ্রেয় বলে মানতে পারব না।"—বিশ্বভারতী পত্রিকা ১৩৫৯ মাঘ-চৈত্র পৃ ১০২-০৮।

পৃ ৩০২—শিশুতীর্থ। সমসাময়িক অনেকগুলি ঘটনা বিচারণীয়। কানপুরের হিন্দুমুসলমান দাঙ্গা, কলিকাতায় পুস্তকপ্রকাশক ভোলানাথ সেন ও দোকানের একজন কর্মচারীর হত্যা, চট্টগ্রামে মুসলমানদের দ্বারা হিন্দুদের ধনসম্পত্তি লুণ্ঠন (১৩৩৮ আষাঢ়-শ্রাবণ)। ইহার মধ্যে শান্তিস্থাপনের জন্য মহাত্মা গান্ধীর চেষ্টা ও অবশেষে পরাভব নিশ্চিত জানিয়াও বিলাতে গোলটেবিল বৈঠকে যোগদানের জন্য ভাদ্র মাসে ইংলন্ড যাত্রা প্রভৃতি ঘটনা স্মরণীয়। বিদেশে জাপান চীনের নিকট হইতে মানচুরিয়া ছিনাইয়া লইয়া চীন আক্রমণের জন্য অস্ত্রে শান দিতেছে। নানা হিংসামূলক ঘটনা এবং তাহার বিরুদ্ধে গান্ধীজির অভিযান এই ঘটনাগুলির পরিপ্রেক্ষণীতে শিশুতীর্থ ও 'নরদেবতা' ভাষণ পরিলক্ষণীয়। 'নরদেবতা' শান্তিনিকেতনে মন্দিরে প্রদত্ত ভাষণ মনে হইতেছে—ভাদ্রমাসে প্রবাসীর আশ্বিন (১৩৩৮ পৃ ৭৪৯-৫৪) সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। এই বিশ্বব্যাপী ঘনায়মান হিংসাত্মক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার দিনে কবির স্মরণ হইতেছে খ্রীষ্টকে—যিনি শিশুরূপে মানবপুত্ররূপে, নরদেবতারূপে মানুষের মধ্যে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। আজিকার ভারতে মহাত্মাজি তাহারই প্রতীক। এই আলোকে 'নরদেবতা' ভাষণটি পাঠ করা যাইতে পারে। এই ভাষণের একস্থলে কবি পরমপুরুষকে 'মানবিক' বলিয়াছেন কেন তাহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। (পৃ ৭৫৩)

পৃ ৩০২—মানবপুত্র। শিশুতীর্থের পাদটীকায় লিখিয়াছিলাম যে উহা এক বৎসর পূর্বে ১৩৩৮ শ্রাবণ মাসে শিশুতীর্থ রচনার সমকালীন—ভাবসাম্যের জন্য ভাবিয়াছিলাম। ১৯৩২ অগস্ট ২ তারিখে এনড্রুস লিখিত What।

owe to Christ গ্রন্থখানি কবি পড়েন; উহা তাঁহাকে উৎসর্গীত হয়। আমাদের মনে হয় এই গ্রন্থ পাঠের পর (১৩৩৯ শ্রাবণ ১৭ তারিখের পর) কোনো সময়ে কবিতাটি লিখিত। 'মানবপুত্র'-এর তারিখ নাই, সন আছে ১৩৩৯ মাত্র।

পৃ ৩০৮—১৯৩১-এ রবীন্দ্রনাথের ৭০ তম জন্মোৎসব। ১৯৩২-এ গোটে (Goethe)-র দ্বিশতবার্ষিকী জন্মোৎসব। Welt-Goethe Ehrung (World-Goethe-Honouring) -এর উদ্যোক্তা অধ্যাপক Ch. H. Kleukens-এর নিকট হইতে গোটে স্মরণ-উৎসবের আয়োজন সভায় যোগ দিবার জন্য রবীন্দ্রনাথের নিমন্ত্রণ হয়। কবি ১১ অক্টোবর ১৯৩১ (২৪ আশ্বিন ১৩৩৮) এই পত্রখানি দেন: "Dear Sir, I gladly consent to become a patron of the World-Goethe-Honouring which you are organising in Germany. I feel proud to associate myself with your project and thus render my homage to the undying memory of Goethe". অধ্যাপক নির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 'গয়্‌টে ও রবীন্দ্রনাথ' শীর্ষক প্রবন্ধে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করিয়াছেন। দ্র গোটে দ্বিশত বার্ষিকী—বিশ্বভারতী পত্রিকা ১৩৫৭ বৈশাখ-আষাঢ় পৃ ২৩৯-৫৮।

গোটের সহিত রবীন্দ্রনাথের কতকগুলি বিষয় আশ্চর্য সাদৃশ্য আছে, কয়েকটি উদাহরণ উদ্ধৃত হইতেছে:

"He [Goethe] regarded his poems as something secret, almost sacred, or, to use favourite word of his, 'daemonic'; something produced unconsciously by that inner self, the true but unknown self."—Nevinson p 73.

"When I was eighteen all my country was eighteen too."—Goethe told Eckermann in 1824.—Nevinson p 51.

"Goethe, whose own experience coloured all his works was always afterwards desirous to obliterate any trace of this, and suffer no one to detect the links between his life and his publications. When to that was added the further necessity of concealing any incoherence caused by frequent re-writing, he took great pride in accomplishing the best." —Ludwig p 86.

পৃ ৩০৯—সোভিএট সম্বন্ধে। "এ কথা মানি, যন্ত্রের বিপদ আছে। দেবাসুরে সমুদ্র মন্থনের মত সে বিষও উদ্‌গার করে। পশ্চিম মহাদেশের কল-তলাতেও দুর্ভিক্ষ আজ গুঁড়ি মেরে আসচে।···কিন্তু এ জন্য প্রকৃতিদত্ত শক্তি-সম্পদকে দোষ দেবো না, দোষ দেবো মানুষের রিপুকে। খেজুরগাছ, তালগাছ বিধাতার দান, তাড়িখানা মানুষের সৃষ্টি। তালগাছকে মারলেই নেশার মূল মরে না। যন্ত্রের বিষদাঁত যদি কোথাও থাকে, তবে সে আছে আমাদের লোভের মধ্যে। রাশিয়া এই বিষদাঁতটাকে সজোরে ওপড়াতে লেগেচে, কিন্তু সেই সঙ্গে যন্ত্রকে শুদ্ধ টান মারেনি; উল্টো, যন্ত্রের সুযোগকে সর্বজনের পক্ষে সম্পূর্ণ সুগম ক'রে দিয়ে লোভের কারণটাকেই সে ঘুরিয়ে দিতে চায়।"—বাঙালীর কাপড়ের কারখানা ও হাতের তাঁত, প্রবাসী ১৩৩৮ কার্তিক পৃ ১১০।

পৃ ৩১০—রবীন্দ্রজয়ন্তী। বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেটহলে কলিকাতার ছাত্রসমাজ কর্তৃক কবি সংবর্ধনা হইল (১৫ পৌষ ১৩৩৮)।—রবীন্দ্র-জয়ন্তী ছাত্র-ছাত্রী উৎসব-পরিষদ্ হইতে 'কবিপ্রশস্তি' প্রতুলচন্দ্র গুপ্ত কর্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত।

পৃ ৩১৪—বিলাতের গোল টেবিল বৈঠক হইতে ফিরিয়া মহাত্মাজি দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি আলোচনার জন্য ভাইসরয় লর্ড উইলিংডনকে পত্র দেন। ভাইসরয় মহাত্মাজির সহিত সাক্ষাৎ করিতে রাজি হইলেন না। কয়েক-

দিনের মধ্যে গান্ধীজিকে কারাগারে প্রেরণ করা হইল (১৯৩২ জানুয়ারি ৪)। আমাদের মনে হয় রবীন্দ্রনাথ প্রেসে যেমন বিবৃতি দেন, তেমনই একটি কবিতার মধ্যেও ইংরেজকে ধিক্কৃত করেন। কবিতাটির নাম 'মানী' (পরিশেষ, রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৫ পৃ ২১১)।

উচ্চ প্রাচীরে রুদ্ধ তোমার ক্ষুদ্র ভুবনখানি,
হে মানী হে অভিমানী।
মন্দিরবাসী দেবতার মতো সম্মানশৃঙ্খলে
বন্দী রয়েছ পূজার আসনতলে।
সাধারণজন-পরশ এড়ায়ে নিজেরে পৃথক করি
আছ দিনরাত গৌরবগুরু কঠিন মূর্তি ধরি।
সবার যেথানে ঠাঁই
বিপুল তোমার মর্যাদা নিয়ে সেথায় প্রবেশ নাই।
অনেক উপাধি তব,
মানুষ-উপাধি হারায়েছ শুধু
সে ক্ষতি কাহারে কব।...

প্রাণহীন সম্মানে
উজ্জ্বল রঙে রঙ-করা তুমি ঢেলা,—
তোমার জীবন সাজানো পুতুল
স্থূল মিথ্যার খেলা।
আপনি রয়েছ আড়ষ্ট হয়ে আপনার অভিশাপে,
নিশ্চল তুমি নিজ গর্বের চাপে।
সহজ প্রাণের মান নিয়ে যারা
মুক্ত ভুবনে ফিরে
মরিবার আগে তাদের পরশ
লাগুক তোমার শিরে।

পৃ ৩১৬-১৭—'আমরা নিম্নে পারস্য যাত্রার পূর্ব পর্যন্ত···[২৯ চৈত্র ১৩৩৮] পারস্য যাত্রা।'—এই অংশ পাদটীকায় যাওয়া উচিত ছিল।

পৃ ৩১৭—ফেব্রুয়ারি (১৯৩১)র স্থলে ফেব্রুয়ারি (১৯৩২) হইবে।

পৃ ৩১৭-১৯— 'অগ্রদূত' পরিশেষ। এই কবিতাটি কবি ১৩৩৮ চৈত্র ১২ (১৯৩২ মার্চ ২৫) লিখিয়াছিলেন। আমাদের মনে হয় এইটি ও 'শান্ত' এবং 'প্রণাম' কবিতা মহাত্মা গান্ধীর উদ্দেশ্যে লিখিত। মহাত্মাজির গোলটেবিল বৈঠক হইতে ফিরিবার কয়েকদিনের মধ্যে (১৯৩২ জানুয়ারি ৪) ভারত গবর্মেণ্ট কর্তৃক তিনি কারাবরুদ্ধ হইয়াছিলেন। জেলে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহাকে সদ্য প্রকাশিত The Golden Book of Tagore ও Modern Review পত্রিকা পাঠান। মহাত্মাজি জেল হইতে রামানন্দবাবুকে যে তিন খানি পত্র দেন তাহা মডার্ন রিভিউ-এ ১৯৩২ মার্চ প্রকাশিত হইয়াছিল। একখানি চিঠিতে তিনি লেখেন, "My love to Gurudev when you meet him।" রামানন্দবাবু নিশ্চয়ই রবীন্দ্রনাথকে এই সংবাদটি দেন এবং সেই অভিঘাতে এই 'অগ্রদূত', 'শান্ত' (১৪ চৈত্র) ও 'প্রণাম' (১৭ চৈত্র) লিখিত হয়।—প্রবাসী ১৩৩৮ চৈত্র পৃ ৮৮৯।

পৃ ৩২১—পারস্য ও ইরাকে ১৯৩২। 'বুশেয়ারের সর্বসাধারণ ও বুশেয়ারের গবর্নরকর্তৃক অভিনন্দন' প্রভৃতি কয়েকটি বক্তৃতার রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক অনুমোদিত অনুবাদ ১৩৩৯ ভাদ্র ও চৈত্র সংখ্যা বিচিত্রায় প্রকাশিত হইয়াছিল। দ্র রবীন্দ্র-রচনাবলী ২২ পৃ ৫২০-২২ ; কবির উত্তর— ঐ পৃ ৫২২-২৩ ; কবির সংবর্ধনা-ভোজের অন্তে বুশেয়ারের গবর্নরের বক্তৃতা ও কবির উত্তর—ঐ পৃ ৫২৩-২৪। কবি কর্তৃক পারস্যসম্রাট রেজাশাহ পহ্লবীর নিকট প্রেরিত টেলিগ্রামের অনুবাদ—ঐ পৃ ৫২৪-২৫। পারস্য সম্রাটের উত্তর ঐ পৃ ৫২৫।

পৃ ৩২৭—বোগদাদ (ইরাক) ম্যুনিসিপালটি কর্তৃক ম্যুন্সিপাল উদ্যানে কবিসংবর্ধনা উপলক্ষে কবির বক্তৃতা ঐ পৃ ৫২৫-২৭।

পৃ ৩২৯—রবীন্দ্রনাথ ১৯৩২ অগস্ট ৫ শান্তিনিকেতন হইতে কলিকাতায় যান ; তার পূর্বে তিনি বিলাত হইতে

এন্‌ড্রুসের সদ্যপ্রকাশিত গ্রন্থ What I owe to Christ পাইয়াছিলেন। ২ অগস্ট এই গ্রন্থ সম্বন্ধে কবি তাঁহার মন্তব্য লিখিয়াছিলেন। দ্র V. B. News 1933 March p 81.

পৃ ৩৩৭—খড়দহে। কবি পুনা হইতে ফিরিয়া খড়দহে আসেন ১৩৩৯ কার্তিক ৮ (১৯৩৩ অক্টোবর ২৬)। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে পত্র, প্রবাসী ১৩৪৮ আষাঢ় পৃ ২৮১।

পৃ ৩৪০—মানুষের ধর্ম। Religion of Man প্রকাশিত হইলে J. C. Smuts গ্রন্থখানি পাঠ করেন। স্মাটসের নিজস্ব দার্শনিক মতবাদ আছে; তাহাকে বলা হয় Holism (Holism and Evolution 1926)। স্মাটস Religion of Man সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, "It is in every way a fine achievement— perhaps the best work Tagore has yet written."

পৃ ৩৫০—কলিকাতায় বক্তৃতাদি শেষ করিয়া কবি মার্চ (১৯৩৩) মাসের প্রথমভাগে শান্তিনিকেতনে ফিরিয়া আসিলেন। কবি ছিলেন বরাহনগরে প্রশান্তচন্দ্রের বাসায়। এই সময়ে মধু বোসের তত্ত্বাবধানে 'দালিয়া'র অভিনয় দেখিতে যান। 'মায়ার খেলা'র অভিনয়ও দুইদিন দেখিতে গিয়াছিলেন। এ অভিনয় শান্তিনিকেতনের ব্যাবস্থায় হয় নাই। প্রশান্তচন্দ্র ও রানী মহলানবীশের বিবাহের প্রথম সাম্বৎসরিক তিথিতে (রবিবার ২১ ফাল্গুন ১৩৩৯ ॥ ৫ মার্চ ১৯৩৩) কবিকে উপস্থিত থাকিতে হয় (দ্র চিঠিপত্র ৩য় পত্র নং ৪৮)। বোধ হয় ৭ মার্চ কবি শান্তিনিকেতনে ফিরিয়া আসেন। এম্পায়ার থিএটরে 'শাপমোচন' অভিনয়ের সময় পুনরায় কলিকাতায় গিয়া বরাহনগরে উঠেন।

পৃ ৩৬২—'তাসের দেশ' লিখিত হয় ১৩৪০ এর আষাঢ়-শ্রাবণ মাসে। তু 'বিচিত্রিতার' একাকিনী (রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৭ পৃ ২১) ও 'পরিশেষে'র রাজপুত্র (র-র ১৫ পৃ ২১৩)। উভয়ই ২৮ ফাল্গুন ১৩৩৮ (১২ মার্চ ১৯৩২) লিখিত। কবিতা দুটি পরস্পরের পরিপূরক। এখানে অজানা দেশ হইতে রাজপুত্র আসিয়া নূতন প্রাণ সঞ্চার করিল।

'চণ্ডালিকা' প্রায় এই সময়েই লিখিত। এক বৎসর পূর্বে (১৩৩৯ শ্রাবণ ৮) রচিত 'জলপাত্র' শীর্ষক কবিতার (পরিশেষ) মধ্যে নাটিকার প্রথমাংশের কাহিনীটুকু আছে। সেখানে নারীর উক্তি:

চাহিলে তৃষ্ণার বারি, আমি হীন নারী
তোমারে করিব হেয়, সে কি মোর শ্রেয়।

প্রভুর উক্তি: সুন্দরের কোনো জাত নাই, মুক্ত সে সদাই।…
মোর কথা শোনো, শতদল পঙ্কজের জাতি নেই কোনো।

এই কবিতাটি পাঠের পর চণ্ডালিকা পড়িলেই ভাবসাম্য স্পষ্ট হইবে।

পৃ ৩৬৪—১৯৩৩ অগস্ট ১২ কলিকাতাস্থ অস্থায়ী জারমান কন্সাল-জেনারেল ডক্টর হার্বার্ট রিখটার (Richter) শান্তিনিকেতনে আসেন ও কবির সহিত দেখা করেন; সন্ধ্যায় কন্সাল-জেনারেল ছাত্রদের নিকট যে বক্তৃতা দেন, তাহাতে রবীন্দ্রনাথ সভাপতিত্ব করেন। বক্তা যুদ্ধোত্তর জারমেনির দুর্দশার কারণ বিশ্লেষণ করিয়া বলেন যে জারমেনিতে গণতন্ত্রমূলক পার্টিপ্রথার গবমেণ্ট কার্যকরী হয় নাই। ১৯৩২-এ হিটলারের নেতৃত্ব গ্রহণের পর হইতে দেশের মধ্যে আশ্চর্য পরিবর্তন হইয়াছে। তিনি হিটলারের প্রশস্তি করেন। লোকে হিটলারের শাসনে জারমেনির পুনরভ্যুত্থানের আশা তখন করিত। জানি না এই বক্তৃতা শুনিয়া রবীন্দ্রনাথের মনে কী প্রতিক্রিয়া হইয়াছিল। দ্র V. B. N. 1933 Sep. p 19-20.

পৃ ৩৬৮—জবহরলাল নেহেরু ও কমলা নেহেরু ১৯৩৪ জানুয়ারি ১৯-এ আসেন। ১০ জানুয়ারি ছাপার ভুল। দ্র V. B. News 1934 Jan. p 51.

পৃ ৩৭৫—শ্রীপল্লী দ্র Sripali, V. B. N. 1936 Oct. p 28-31. Quoted from Ceylon Observer.

পৃ ৩৭৮—শ্রাবণ-গাথা অভিনয়ের তিনদিন পরে ১৯৩৫ অগস্ট ১৫ "A letter to an English friend" লিখিত। (V. B. N 1935 December p 43-44) কোনো ইংরেজ মহিলা শান্তিনিকেতনে আসেন; তিনি অধ্যাপক ও ছাত্রদের সঙ্গে কথাবার্তা বলেন ও তাহাদের মধ্যে intellectual pessimism, political bitternes প্রভৃতি লক্ষ্য করেন। সেই সম্বন্ধে কবির মত এই পত্রমধ্যে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

পৃ ৩৮০—মাদ্রাস। দ্র V. B. News 1934 Oct. p 34. Rabindranath's reply to the Madras Corporation address p 35-37.

পৃ ৩৮২—পৌষ উৎসবে (১৩৪১॥১৯৩৪)। ৮ই শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন ছাত্রদের সভায় কবি এক ভাষণ দান করেন। বিধুশেখর ও দিনেন্দ্রনাথ আশ্রম ত্যাগ করিয়া যাওয়াতে যে পরিস্থিতি হয়, তাহা আদৌ সুখকর নহে। কবি বলিতেছেন "আমার আজ বিপদের দিন।··বিচিত্র আঘাতে ও বিরুদ্ধতায় আজ আমার মন ক্লান্ত, ক্লিষ্ট।" এই ভাষণেই তিনি বলেন, "ভাবীকালের জন্য এই আশ্রমে আমি প্রচুর স্বাধীনক্ষেত্র প্রসারিত রেখেছি—এখানে কোনো বিশেষ ধর্মকে প্রতিষ্ঠিত করিনি। কালে কালে মানুষের পরিবর্তন ঘটে থাকে—যারা একই কালকে জীবনে স্থায়ী করতে চায় তারা মৃত্যুর সঙ্গে রফা করে। তাই এটা আমি কখনো আশা করিনি যে এখানে যারা বয়স্ক ছাত্র ও অধ্যাপক আছেন তাঁদের মনকে আমি একটা ছাঁচেফেলা রীতিতে চালনা করব। ভাবীকালের বিকাশের জন্য প্রশস্ত পথ আমি রেখেছি। ···আমি সবাইকেই স্থান দিয়েছি।"—প্রাক্তনী পৃ ১-৯।

পৃ ৩৮৭—প্রকাশিত গ্রন্থ-তালিকার মধ্যে বসন্ত ১৩২৩ স্থলে ১৩২৯ (১৯২৩) হইবে।

চতুর্থ খণ্ড

পৃ ১—২য় পংক্তি "শান্তিনিকেতন ফিরিলেন।" ইহার কয়েকদিন পরে ১৩৪১ পৌষ সংক্রান্তি [১৯৩৫ জানুয়ারি] শান্তিনিকেতন হইতে রবীন্দ্রনাথ অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ সম্পাদিত 'মহাকোষ' সম্বন্ধে অভিমত দেন। (দ্র বঙ্গীয় মহাকোষ ১২শ সংখ্যার শেষ পৃষ্ঠা।)

পৃ ৬—রবীন্দ্রনাথ ৪ মার্চ হইতে ১২ মে ১৯৩৫ শান্তিনিকেতনে ছিলেন। ২০ মার্চ (১৩৪১ চৈত্র ৬) বসন্তোৎসব হইল। সকালে আম্রকুঞ্জের উৎসবে কবি 'ফাল্গুনী' নাটিকা হইতে কিয়দংশ পাঠ করিয়া শোনান ও তৎপূর্বে বসন্তের ব্যাখ্যা করেন। সন্ধ্যার পরে সেই আম্রকুঞ্জে নৃত্যগীতাদির আয়োজন হয়। সেখানে কবি উপস্থিত ছিলেন; 'বসন্ত' নামে কবিতা আবৃত্তি করিলেন ও পরে দুইটি সদ্য রচিত গান স্বয়ং গাহিলেন। গান দুইটি 'আমার বনে বনে ধরল মুকুল' ও 'ওগো বধূ সুন্দরী, তুমি মধুমঞ্জরী' (দ্র গীতবিতান পৃ ৫০৫-০৬)। শেষোক্ত গানটি পূর্বে কবিতা ছিল; 'সাতভাই চম্পা' নাম দিয়া গগনেন্দ্রনাথের ছবিকে অবলম্বন করিয়া ১৩৩১ সালে কোনো বিবাহ উপলক্ষে রচিত। সেই কবিতাটির ভাষার সামান্য পরিবর্তন করিয়া এবার সুর সংযোগ করিলেন। (দ্র শান্তিদেব, রবীন্দ্রসংগীত পৃ ২৩১। এখানে তারিখ ১৩৪০ চৈত্র; উহা ১৩৪১ চৈত্র হইবে)। প্রথম গানটি এই সময়ের রচনা (দ্র কবিকথা পৃ ১৬৯। এখানে তারিখ আছে ১৩৪২। উহা ১৩৪১ হইবে। গীতবিতানে দুইটি গান পরপর আছে)। এই দিনকার উৎসবে বহু অতিথি উপস্থিত ছিলেন। শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত ও তাঁহার স্বামী, শ্রীমতী কুমারস্বামী প্রভৃতি (V. B. News 1935 April p 79)।

পৃ ১৬—'আবর্জনা' নহে; 'অবর্জিত' হইবে। দ্র নবজাতক।

পৃ ১৯—'আশ্রমের শিক্ষা'। প্রবাসী ১৩৩৩ আষাঢ় (১৩৪২ নহে) নিউ এডুকেশন ফেলোশিপের (NEF) বঙ্গীয় শাখার উদ্যোগে অনুষ্ঠিত সম্মেলনীতে (১৯৩৬ ফেব্রুয়ারি) যেকয়টি প্রবন্ধ পঠিত হয়, সেগুলি 'শিক্ষার ধারা' নামে প্রকাশিত হয় (১৩৪৩ ভাদ্র)। এই সংগ্রহ-গ্রন্থে 'আশ্রমের শিক্ষা' প্রথম মুদ্রিত হয়। অতঃপর ১৩৫১ সালে 'শিক্ষা' গ্রন্থের যে নূতন সংস্করণ বিশ্বভারতী হইতে প্রকাশিত হয় তাহাতে ইহা সন্নিবেশিত হয়। 'আশ্রমের রূপ ও বিকাশ' বিশ্বভারতী বুলেটিন আকারে প্রকাশিত হয় ১৩৪৮ আষাঢ় মাসে।

পৃ ২১—শিক্ষা-সমস্যা। ব্রহ্মচর্যাশ্রমে ছাত্রদের কখনো 'প্রাইজ' দেওয়ার রীতি ছিল না। বোধ হয় ক্রীড়াপ্রতিযোগিতায় প্রথম প্রাইজ দেওয়া হয় রথীন্দ্রনাথের বিবাহের পর উৎসবান্তে—নূতন বধূ প্রতিমা দেবী পারিতোষিকগুলি বিতরণ করেন। কিন্তু পড়াশুনায় 'ভালো' ছেলেদের পুরস্কৃত করা হইত না। কবি একখানি পত্রে (২৮ ভাদ্র ১৩১৪॥১৪ সেপ ১৯০৭) মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়কে লিখিতেছেন, "ভাল ছেলেকে তার ভালত্বের জন্য পুরস্কার দেওয়াটা কি শ্রেয়? সংসারে পুরস্কার হতে বঞ্চিত হওয়াতেই যথার্থ ভালর পরীক্ষা ও পরিচয়; 'আমি ভাল' একথা কেউ যেন প্রাইজ দেখিয়ে প্রচার করবার অবকাশ না পায়। (স্মৃতি পৃ ৬৪-৬৫)

কিন্তু কালান্তর হইয়াছে। এখন বিশ্বভারতীতেই নানা ভাবের পুরস্কার ছাত্রছাত্রীরা পাইতেছে, যেমন জগদানন্দ পুরস্কার,নেপালচন্দ্র পুরস্কার, দিনেন্দ্রনাথ পুরস্কার, অজিতকুমার পুরস্কার। বাংলাভাষায় পারদর্শিতার জন্য অবাঙালী ছাত্রদের ভারত-সরকার পুরস্কৃত করিতেছেন। শিক্ষাবিশেষজ্ঞরা বলিতে পারেন রবীন্দ্রনাথের এই মত মনস্তত্ত্বসম্মত কিনা।

পৃ ৪২—'বাংলা শব্দতত্ত্ব', 'শব্দতত্ত্ব'। ১৯১৪ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে মাট্রিকুলেশন হইতে বি. এ. পর্যন্ত কোথাও রবীন্দ্রনাথের কোনো বই পাঠ্য ছিল না। কেবল এম-এ Comparative Philology 1915-16 সালের জন্য 'শব্দতত্ত্ব'র নাম দেখা যায়। দ্র Calendar 1915-16 p 445.

পৃ ৪৮ পা-টী ৪—দেবীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় হইবে।

পঞ্চভূতের ডায়ারি বা পঞ্চভূত। ১৩০৪ সালে বৈশাখ মাসে গ্রন্থাকারে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। গ্রন্থখানি উৎসর্গ করেন নাটোরের মহারাজ জগদিন্দ্রনাথ রায়কে। অতঃপর ১৩১৪ সালে গদ্যগ্রন্থাবলীর ১ম খণ্ড 'বিচিত্র প্রবন্ধ' মধ্যে পঞ্চভূত স্থানলাভ করে; কিন্তু স্থানে স্থানে পরিবর্জিত ও পরিবর্ধিত হইয়াছিল। ১৩১৪ হইতে ১৩৪২ পর্যন্ত পঞ্চভূতের গ্রন্থরূপে পৃথক অস্তিত্ব ছিল না। এই শেষ বৎসরে কবি গ্রন্থখানি ভালো করিয়া দেখিয়া দেন। প্রথম সংস্করণের বর্জিত অংশগুলি 'সাধনা' হইতে প্রায় সবই এই নবতম সংস্করণে যোজিত হয়; এছাড়া রবীন্দ্রনাথ কোনো কোনো অংশ এই সময়ে নূতন করিয়া লিখিয়া দেন। তুলনামূলক ভাবে পাঠ করিলেই বুঝা যাইবে। এতৎসম্পর্কে সুধীরচন্দ্র কর লিখিতেছেন, "পঞ্চভূত ছাপা হচ্ছে; অনেকদিন পরে নূতন সংস্করণ হবে। কবি নিজে একটি প্রুফ দেখতে চাইলেন। মেয়েদের আলোচনার অংশে এসে দাঁড়ালো এক বিপর্যয়। তাঁরই জানা উচ্চ শিক্ষিতা একটি মেয়ে বাইরে কাজ করতে গিয়েছিলেন, ভালোবেসেছিলেন একজনকে। তাঁর ভালোবাসার দায়ে পুরুষটির উন্নতির পথ ব্যাহত হয়। অথচ শেষ পর্যন্ত মেয়েটি তাঁকে বিয়ে করলেন না। কবি ঘটনা জেনে মর্মাহত হয়েছিলেন। রেগে গিয়ে বলেছিলেন, সংসারে পুরুষদেরই অপবাদ—মেয়েদের তারা ডোবায়। কিন্তু কত মেয়ে যে পুরুষদের ভালোমানুষির সুযোগ নিয়েছে, ভালোবাসার উৎপীড়নে শেষ পর্যন্ত জীবন ব্যর্থ করে দিয়েছে, তার খবর কে রাখে! এই বলে আটকে রাখলেন প্রুফ। তাতে যোগ হল নূতন এক অধ্যায়, মেয়েদের উপর কড়া মন্তব্য নিয়ে।"—(কবিকথা পৃ ৬৪-৬৫) পঞ্চভূতের এই অংশটি হইতেছে 'নরনারী' শীর্ষক প্রবন্ধের শেষাংশ। দ্র রবীন্দ্র-রচনাবলী ২ পৃ ৫৬৬ (অনুচ্ছেদ ৪ হইবে)—৬৮।

পৃ ৫০—কমলা নেহেরু। ১৯৩৬ ফেব্রুয়ারি ২৮ তারিখে সুইটজারল্যান্ডের Lausanne শহরে কমলা নেহেরুর মৃত্যু হয়। দ্র The discovery of India p 27.

পৃ ৫০—কমলা নেহেরু সম্বন্ধে কবির ভাষণ রিপোর্টারদের লিখিত ও প্রকাশিত; মূল ভাষণ বাংলায় প্রদত্ত। 'an abridged English rendering of the Poet's talk in Bengali'—দ্র V. B. N. 1936 April p 75 76.

পৃ ৭০ পংক্তি ৭—বই-এর নাম 'গড্ডলিকা'।

পৃ ৭৩—যোগীন্দ্রনাথ সরকার সম্পাদিত বার্ষিকী গল্পসঞ্চয়ন ১৩৪৩ আশ্বিনে প্রকাশিত হয় পূজার পূর্বে। বাংলাভাষায় প্রথম 'বার্ষিকী' প্রকাশ করেন নগেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী-'পার্বণী' নামে ১৩২৫ সালের আশ্বিন মাসে। প্রথমে নামকরণ হয় 'পূজার ছুটি' তারপর হয় 'পার্বণী'। রবীন্দ্রনাথ পার্বণী পাঠ করিয়া 'বিশেষ আনন্দ' পান; লিখিতেছেন (৯ই আশ্বিন ১৩২৫), "প্রথম খণ্ড পার্বণীতে যে আদর্শে ডালি সাজাইয়াছ বৎসরে বৎসরে তাহা রক্ষা করিতে পারিলে মা ষষ্ঠী ও মা সরস্বতী উভয়েরই তুমি প্রসাদ লাভ করিবে।"—দেশ ১৩৬২ অগ্রহায়ণ ১৭ পৃ ৩২৩। ইহার পর বাংলা ভাষায় বহু বার্ষিকীর আবির্ভাব হইয়াছে।

পৃ ৭৩—'ভাদ্র মাসের (১৩৪৩) শেষে কবি কলিকাতায় আসিয়াছেন'। ১৩৪৩ ভাদ্র ২০ (১৯৩৬ সেপ. ৫) ফণিভূষণ অধিকারীকে লিখিতেছেন, 'আজ অপরাহ্ণে কলিকাতায় যাচ্ছি'। বিশ্বভারতী পত্রিকা ১৩৫৯ মাঘ-চৈত্র পৃ ১০৮।

পৃ ৭৩—যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত ইত্যাদি ভুল। উহা যোগীন্দ্রনাথ সরকার হইবে। তাঁহার গ্রন্থের নাম 'গল্পসঞ্চয়ন'। তাঁহার 'হাসিখুসি' প্রভৃতি শিশুগ্রন্থ তাঁহাকে বাংলা সাহিত্যে অমর করিয়াছে। ইনি সিটিবুক সোসাইটি নামে পুস্তক প্রকাশনীর সত্বাধিকারী ছিলেন।

পৃ ৭৬—মহিলা-কর্মীসম্মেলনের জন্য কবি 'নারী' নামে প্রবন্ধ লেখেন (১৩৪৩ আশ্বিন ১৬)। প্রথমে কবি সম্মেলনের উদ্বোধন করিতে স্বীকৃত হন; কিন্তু 'পরিশোধ' নৃত্যনাট্যের জন্য খুবই ব্যস্ত বলিয়া তাঁহার আশঙ্কা হয় যে হয়তো উপস্থিত হইতে পারিবেন না; তাই 'নারী' নামে প্রবন্ধটি লেখেন ও রামানন্দবাবুকে পত্রে বলেন যে শান্তা দেবী যেন সেইটি সভায় পড়িয়া দেন। আশুতোষ কলেজ হলে 'পরিশোধ' অভিনয় হইল ১১ অক্টোবর। কলিকাতায় উপস্থিত আছেন অথচ সভায় যাইবেন না এরূপ হওয়া সম্ভব নহে; সভায় যাইতেই হইল এবং বক্তৃতাও করিতে হইল। রামানন্দবাবুকে কয়দিন পূর্বে লেখেন, "ভেবেছিলুম মুখেমুখেই বলব—কারণ রিহর্সল প্রভৃতি নানা ব্যাপার নিয়ে সময়ের অত্যন্ত টানাটানি। কিন্তু সভায় যখন উপস্থিত থাকতে পারব না, তখন না লিখে উপায় নেই।··· আমার অভিভাষণ লিখতে আরম্ভ করলেম।" প্রবাসী ১৩৪৮ আশ্বিন পৃ ৬৬৩। কিন্তু সভায় মুখে-মুখেই বলেন।

পৃ ৯০ পা-টী—রথীন্দ্রকান্ত ঘটকচৌধুরী।

পৃ ৯১ পা-টী—দেবপ্রসাদ ঘোষ লিখিত 'বাঙ্গালা ভাষা ও বানান' শীর্ষক গ্রন্থে তাঁহার সকল প্রবন্ধ ও এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ ও তাঁহার মধ্যে যে-পত্র বিনিময় হয় তাহা মুদ্রিত আছে।

পৃ ৯৫—পতিসর হইতে ফিরিয়াই কবি শান্তিনিকেতনে প্রতিমা দেবীকে বর্ষামঙ্গলের জন্য প্রস্তুত হইতে লিখিলেন। "সঙ্গীত বিভাগের এই কাজটা তোমার, দায়িত্ব তোমারই। গান, নাচ এবং যন্ত্রসঙ্গীতের প্রোগ্রাম তোমাকেই তৈরি করতে হবে।···সঙ্গীত বিভাগের দুঃসাধ্য কাজ তোমারই পরে নির্ভর করচে। তিন পক্ষকে তোমার সামনে একত্রে বসিয়ে কর্মসূচি যদি বানিয়ে তোলো তাহলে জিনিসটা মানানসই হতে পারবে।" (চিঠিপত্র ৩য় পত্রসংখ্যা ৫৪)। এই পত্র হইতে সঙ্গীত ভবনের আভ্যন্তরীণ অবস্থার আভাস পাওয়া যাইবে। কবির যত আনন্দের উৎস এইখানে, সমস্যার কণ্টকও এইখানে ছিল।

পৃ ১৩২—রাখালচন্দ্র সেনের 'সপ্তপর্ণ' নামে ছোটগল্পের বই বিশ্বভারতী গ্রন্থন-বিভাগ হইতে প্রকাশিত হয় (১৩৪৫ বৈশাখ)। 'সহযাত্রী' নামে গল্প সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেন, "এ ধারার গল্প আমাদের সাহিত্যে দেখি নি। কেবল যে বিষয়টি য়ুরোপীয় তা নয়, রসের তীব্রতা এবং আখ্যানের চমকলাগানো নাট্যবিকাশের মধ্যে য়ুরোপীয় আধুনিক সাহিত্যের স্বাদ পাওয়া যায়। আরো যেটি লক্ষ্য করেছিলুম সে হচ্চে ঘটনার যাথার্থ্য, অপরিচয় বশত বাঙালীর হাতে যে ত্রুটি ঘটতে পারত তা এতে কিছু ঘটে নি। পড়ে আমি বিস্মিত হয়েছিলুম।" প্রবাসী ১৩৪৫ আষাঢ় পৃ ৪২৪।

পৃ ১৩২—চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। জন্মদিনে কবির আশীর্বাদ। ১৮ আশ্বিন শুক্লপঞ্চমী ১৩৩৯ [৪ অক্টোবর ১৯৩২] পরিশেষ—সংযোজন, রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৫ খণ্ড পৃ ৩০৬-০৭।

পৃ ১৫৫—"কবি যে দিন কলিকাতায় পৌঁছিলেন" ইত্যাদির স্থলে কবি ১৯৩৯ ফেব্রুয়ারি ৭ কলিকাতায় গেলেন ; প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশদের বাড়িতে উঠেন। ১২ ফেব্রুয়ারি (রবিবার) বিশ্বভারতী অপিস ও দোকানের উপর-তলায় 'বিশ্বভারতী সম্মিলনী' প্রতিষ্ঠা সভার উদ্বোধন করিলেন। চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য ইহার সম্পাদক হইলেন। স্থির হইল এইখানে একটি ছোট পাঠাগার স্থাপিত হইবে, সদস্যসংখ্যা ২০০-এর অধিক হইবে না। তু সাধনা কর, জাতীয় নাট্যশালা ও রবীন্দ্র-পরিকল্পনা, যুগান্তর ১৯.৬.৫৫, ২৬.৯.৫১ ; কবিকথা পৃ ৯৮-৯৯।

শ্যামা ও চণ্ডালিকার অভিনয় দেখিয়া কবি ১৩ ফেব্রুয়ারি শান্তিনিকেতনে ফিরিয়া আসেন। "কবির এত তাড়াহুড়া করিয়া কলিকাতা হইতে ফিরিবার কারণ" ইত্যাদি।

পৃ ১৬৩—*Vallathol* (ভাল্লাথল) "The unique example of this influence of Tagore in a Southern language is the case of the great Malayalam poet Vallathol ··Vallathol was till 1914 a blind votary of the classical tradition who wrote verses as acrobatic feats in words.···In 1913 the new light of Tagore dawned on him....Vallathol's poetry also underwent a fundamental transformation ;...the Malayalam language today is being directed by the unseen hand of Tagore and the forces he has set in motion."—K. M. Panikkar, Tagore and the literature of the south, The Golden Book of Tagore (1932) p 194.

দ্র কে. এম. পাণিক্কর, রবীন্দ্রনাথ ও দক্ষিণ ভারতের সাহিত্য (অনুবাদক-আনন্দ দে)—মাসিক বসুমতী ১৩৬১ আষাঢ় পৃ ৩৯৯-৪০০।

পৃ ১৭৭—আওয়াগড়ের মহারাজা সূর্যপাল সিংহের সমগ্রদানের তালিকা দেওয়া হয় নাই ; মাত্র ১৯৩৯-এর দেওয়া হইয়াছে।

পৃ ১৮৭—নিম্নের ঘটনাটি বাদ গিয়াছে ; মংপু হইতে ফিরিবার পর দিন কবি ১৯৩৯ নভেম্বর ১০ নগেন্দ্রভূষণ বিদের নেপিয়ার পেণ্ট ওয়ার্কস দেখিতে যান ও প্রশংসাপত্র লিখিয়া দেন।

পৃ ১৯৪—মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইলে কোয়েকার (Society of Friends) খ্রীষ্টানরা মধ্যপ্রদেশের হোসঙ্গাবাদে এক কনফারেন্স হইতে যুদ্ধ সম্বন্ধে বিবৃতি প্রকাশ করেন ; রবীন্দ্রনাথ সেইটি পাইয়া লিখিলেন (১৯৪০ জানুয়ারি ?) : "When history sudddenly goes wrong with an appalling immensity of human sacrifice we claim from all great religions to send abroad their warning and their call. Unfortunately in such a crisis of collective moral aberration the spiritual man in us is too often persuaded to form either passively or in active agreement an unholy cooperation with the power that blindly runs amuck spreading devastation.

"There are frenzied occasions when bombs are hurled from the air upon priceless heritages of man shattering them into dust, but the worst of all havocs done to humanity happens when sacred vehicles of life's noble ideals are injured and made inactive by the virulent passion that poisons the atmosphere. And therefore it gives us an assurance of hope as we meet with an unwavering assertion of faith in humanity such as we find in this paper, the challenge of the Christian ideal so bravely and beautifully uttered urging for peace and justice and resistance to evil force. During a world-wide contamination of violence and hatred we badly need some signs of the triumph of the Divine Spirit dwelling in man, defying the congregated might of malignity." V. B. News VIII 1940 March p 70-71.

পৃ ২১৪—মৃত্যুসংবাদ : সি. এফ. এনড্রুস ১৯৪০ এপ্রিল ৫, সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৯৪০ মে ৮, কালীমোহন ঘোষ ১৯৪০ মে ১২, অমিতা সেন (খুকু) ১৯৪০ মে ২৪, কিশোরীমোহন সাঁতরা ১৯৪০ অক্টোবর ২০, গৌরগোপাল ঘোষ ১৯৪০ নভেম্বর ৯, ডাঃ হ্যারি টিম্বার্স।

পৃ ২২৮—চিত্রলিপি সম্বন্ধে মতের পর। রবীন্দ্রনাথের ছবি সম্বন্ধে যামিনী রায়ের মূলপ্রবন্ধের চুম্বক : (১) রবীন্দ্রনাথ ছবি এঁকেছেন খাঁটি ইউরোপীয় পদ্ধতিতে, সুতরাং তাঁর ছবি বোঝবার যাঁরা চেষ্টা করবেন, তাঁদের পাশ্চাত্য চিত্রশিল্পের ক্রমবিকাশ জানতে হবে। (২) ইউরোপীয় পদ্ধতি অনুসরণ করলেও তাঁর সম্বন্ধে একটি অদ্ভুত ব্যাপার এই যে, শিল্প ইতিহাসের পর পর স্তরগুলি সম্বন্ধে তাঁর অভিজ্ঞতা ছিল না অথচ ছবিগুলি দেখলে বোঝবার উপায় নেই যে, তিনি অনভিজ্ঞ ছিলেন। তাঁর কল্পনার অসামান্য ছন্দোময় শক্তিতে তিনি রেখা ও রঙের ব্যবহার আশ্চর্য রকমে আয়ত্ত করেছিলেন। এই নিয়ম-মাফিক শিক্ষার অভাব হেতু কোন কোন ক্ষেত্রে পতন ঘটেছিল তাঁর। যাঁরা তাঁর চিত্র-সংগ্রহ প্রকাশ করেছেন, এই দিকে তাঁরা সজাগ থাকলে ভাল হ'ত। আশ্চর্য সক্ষমতার সঙ্গে অক্ষমতার মিলন দৃষ্টিকটু। সম্পূর্ণ কল্পনা থেকে আঁকা অবাস্তব ছবির মধ্যে এখানে ওখানে রিয়ালিস্টিক ছোঁয়াচ লাগাতে রসাভাস হয়েছে। (৩) রবীন্দ্রনাথের ছবি বড় তাঁর সবলতার জন্যে ছন্দোবোধের জন্যে, যে বস্তু দুটির অভাব বাংলা দেশের আজকালকার ছবিতে প্রত্যক্ষ করি। ছবি দেখলেই বোঝা যায় যে, তিনি সতেজ শক্ত শিরদাঁড়া নিয়ে কারবার করেছেন। (৪) রবীন্দ্রনাথের ছবিতে সব চাইতে বিস্ময়কর তাঁর কল্পনার বিরাটত্ব। সর্বত্রই দেখি, তিনি বৃহৎকে প্রকাশ করার চেষ্টা করেছেন।

মূল প্রবন্ধ পড়িয়া রবীন্দ্রনাথ তাঁহার মৃত্যুর তিন মাস পূর্বে ২৫ মে ১৯৭১ শান্তিনিকেতন হইতে একখানি পত্র দেন :

"এখনো আমি শয্যাতলশায়ী। এই অবস্থায় আমার ছবি সম্বন্ধে তোমার লেখাটি পড়ে আমি বড় আনন্দ পেয়েছি। আমার আনন্দের বিশেষ কারণ এই যে আমার ছবি আঁকা সম্বন্ধে আমি কিছুমাত্র নিঃসংশয় নই, আজ সুদীর্ঘকাল ভাষার সাধনা করে এসেছি, সেই ভাষার ব্যবহারে আমার অধিকার জন্মেছে এ আমার মন জানে এবং এই নিয়ে আমি কখনো কোনো দ্বিধা করিনে। কিন্তু আমার ছবির তুলি আমাকে কথায় কথায় ফাঁকি দিচ্ছে কিনা আমি নিজে তা জানিনে। সেইজন্যে তোমাদের মতো গুণীর সাক্ষ্য আমার পক্ষে পরম আশ্বাসের বিষয়। যখন প্যারিসের আর্টিস্টরা আমাকে অভিনন্দন করেছিলেন, তখন আমি বিস্মিত হয়েছিলুম এবং কোন্‌খানে আমার কৃতিত্ব তা আমি স্পষ্ট বুঝতে পারিনি। বোধ করি শেষ পর্যন্তই তুলির সৃষ্টি সম্বন্ধে আমার দ্বিধা দূর হবে না। আমার স্বদেশের

লোকেরা আমার চিত্রশিল্পকে যে ক্ষীণভাবে প্রশংসার আভাস দিয়ে থাকেন আমি সেজন্য তাঁদের দোষ দেইনে। আমি জানি চিত্রদর্শনের যে অভিজ্ঞতা থাকলে নিজের দৃষ্টির বিচারশক্তিকে কর্তৃত্বের সঙ্গে প্রচার করা যায়, আমাদের দেশে তার কোনো ভূমিকাই হয় নি। সুতরাং চিত্রসৃষ্টির গূঢ় তাৎপর্য বুঝতে পারেন না বলেই মুরুব্বিয়ানা করে সমালোচকের আসন বিনা বিতর্কে অধিকার করে বসেন। সেজন্য এদেশে আমাদের রচনা অনেকদিন পর্যন্ত অপরিচিত থাকবে। আমাদের পরিচয় জনতার বাহিরে তোমাদের নিভৃত অন্তরের মধ্যে। আমার সৌভাগ্য এই বিদায় নেবার পূর্বেই নানা সংশয় এবং অবজ্ঞার ভিতরে আমি তোমাদের সেই স্বীকৃতি লাভ করে যেতে পারলুম এর চেয়ে পুরস্কার এই আবৃত দৃষ্টির দেশে আর কিছু হতে পারে না, এই জন্যে তোমাকে অন্তরের সঙ্গে আশীর্বাদ করি এবং কামনা করি তোমার কীর্তির পথ জয়যুক্ত হোক।" শনিবারের চিঠি ১৩৪৮ আশ্বিন পৃ ৯৯৯-৫০। যামিনী রায় উপরিউক্ত পত্র লিখিবার বারোদিন পরে (১৯৪১ জুন ৭) কবি পুনরায় তাঁহাকে 'ছবি' সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন :

"ইন্দ্রিয়ের ব্যবহারে আমাদের জীবনের উপলব্ধি। এই জন্য তার একটি অহৈতুক আনন্দ আছে। চোখে দেখি, সে যে কেবল সুন্দর দেখে বলি, খুশী হই—তা নয়। দৃষ্টির উপর দেখার ধারা আমাদের চেতনাকে উদ্রেক করে রাখে। ছেলেবেলায় নির্জন ঘরে বন্দী হয়ে থাকতুম কেবল খড়খড়ির ভিতর থেকে নানা কিছু চোখে পড়ত, তার ঔৎসুক্য মনকে জাগিয়ে রাখত। এই হোলো ছবির জগৎ। যে দেখায় মনটাকে টানে না, যা একঘেয়ে, যার বিশেষ রূপের বৈচিত্র্য নাই তার মধ্যে যেন মন নির্বাসিত হয়ে থাকে। সে আপন পুরো খোরাক পায় না। ছবির তত্ত্ব এর থেকেই বুঝব। দেখবার জিনিসকে সে আমাদের দেয়, না দেখে থাকতে পারি নে, তাতে খুশী হই। মানুষ আদিকাল থেকে এই দেখবার উপহার নিজেকে দিয়ে এসেছে, নানা রকম ছাপ পড়ছে মনে। যে রূপের রেখা এড়াবার জো নেই, যা মর্মকে অধিকার করে নেয়, তাতে তার চারিদিকের দৃষ্টির ক্ষেত্রকে পরিপূর্ণ করতে থাকে। আমরা দেখতে চাই, দেখতে ভালোবাসি। সেই উৎসাহে সৃষ্টিলোকে নানা দেখবার জিনিস জেগে উঠছে। সে কোনো তত্ত্বকথার বাহন নয়, তার মধ্যে জীবনযাত্রার প্রয়োজন বা ভালোমন্দ বিচারের কোনো উদ্যোগ নেই। আমি আছি আমি নিশ্চিত আছি, এই কথাটা সে আমাদের কাছে বহন করে আনে। তাতে আমি আছি এই অনুভূতিকেও কোনও একটা বিশেষভাবে চেতিয়ে তোলে। ছবি কি, এ প্রশ্নের উত্তর এই যে, সে একটি নিশ্চিত প্রত্যক্ষ অস্তিত্বের সাক্ষী। তার ঘোষণা যতই স্পষ্ট হয়, যতই সে হয় একান্ত, ততই সে হয় ভালো। তার ভালোমন্দের আর কোনও রকম যাচাই হতে পারে না। আর যা কিছু সে অবান্তর অর্থাৎ যদি সে কোনও নৈতিক বাণী আনে, তা উপরি দান। যখন ছবি আঁকতুম না, তখন বিশ্বদৃশ্যে গানের সুর লাগত কানে, ভাবের রস আসত মনে। কিন্তু যখন ছবি আঁকায় আমার মনকে টানল, তখন দৃষ্টির মহাযাত্রার মধ্যে মন স্থান পেলো। গাছপালা, জীবজন্তু, সকলই আপন আপন রূপ নিয়ে চারিদিকে প্রত্যক্ষ হয়ে উঠতে লাগল। তখন রেখায় রঙে সৃষ্টি করতে লাগল যা প্রকাশ হয়ে উঠছে। এ ছাড়া অন্য কোনো ব্যাখ্যার দরকার নেই। এই দৃষ্টির জগতে একান্ত দ্রষ্টারূপে আপন চিত্রকরের সত্তা আবিষ্কার করল। এই যে নিছক দেখবার জগৎ ও দেখাবার আনন্দ, এর মর্মকথা বুঝবেন তিনি যিনি যথার্থ চিত্রশিল্পী। অন্যেরা এর থেকে নানা বাজে অর্থ খুঁজতে গিয়ে অনর্থের মধ্যে ঘুরে বেড়াবে।—ছবি সম্বন্ধে আমার বলবার কথা আমি আজ তোমার কাছে বললুম তুমি গুণী, তুমি এর মর্ম বুঝবে। পৃথিবীর অধিকাংশ লোক ভালো করে দেখে না, দেখতে পারে না। তারা অন্যমনস্ক হয়ে আপনার নানা কাজে ঘোরাফেরা করে। তাদের প্রত্যক্ষ দেখবার আনন্দ দেবার জন্যই জগতে এই চিত্রকরদের আহ্বান। চিত্রকর গান করে না, ধর্মকথা বলে না, চিত্রকরের চিত্র বলে, 'অয়ম্ অহম্ ভো'—এই যে আমি এই।"

কবি এই পত্রখানি যামিনী রায়কে লেখেন ৭ জুন ১৯৪১—মৃত্যুর ঠিক দুই মাস পূর্বে। ছবি সম্বন্ধে ইহাই কবির শেষ মন্তব্য। দ্র প্রবাসী ১৩৪৮ শ্রাবণ পৃ ৪০৬।

রবীন্দ্রনাথের চিত্রকলা সম্বন্ধে নানারূপ সমালোচনা হইয়াছে ও হইবে ; এ পর্যন্ত যে সব রচনা প্রকাশিত হইয়াছে তন্মধ্যে মনোরঞ্জন গুপ্ত লিখিত 'রবীন্দ্রচিত্রকলা' একখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ। এই গ্রন্থ ও তৎসঙ্গে বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়ের এই গ্রন্থের সমালোচনা পর পর পাঠ করিলে পাঠকদের কবির চিত্রকলা সম্বন্ধে ধারণা হইতে পারে। কবির উক্তি : "The world of sound is a tiny bubble in the silence of the infinite. The universe has its only language of gesture, it talks in the voice of pictures and dance." দ্র বিশ্বভারতী পত্রিকা ১৩৫৮ বৈশাখ-আষাঢ় পৃ ২৮১-৮৬।

২ রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে বাংলা গ্রন্থের তালিকা[১]

অজিতকুমার চক্রবর্তী। রবীন্দ্রনাথ (কাব্যগ্রন্থপাঠের ভূমিকা)। ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস। লেখকের নিবেদনের তারিখ ৮ পৌষ ১৩১৯। পৃ ১০৫।

বিশ্বভারতী সংস্করণ আশ্বিন ১৩৫৩। মূল্য এক টাকা।

অজিতকুমার চক্রবর্তী। কাব্যপরিক্রমা। সাধনা লাইব্রেরি ঢাকা। পৃ ১২৩। মূল্য দশ আনা।

বিশ্বভারতী সংস্করণ, কার্তিক ১৩৫১। পুনর্মুদ্রণ আশ্বিন ১৩৬০। মূল্য দুই টাকা।

অজিতকুমার চক্রবর্তী। ব্রহ্মবিদ্যালয়। 'শান্তিনিকেতন, বিশ্বভারতী ও রবীন্দ্রনাথ' বিভাগ দ্রষ্টব্য।

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও রানী চন্দ। ঘরোয়া। বিশ্বভারতী। আশ্বিন ১৩৭৮। পৃ ১৭১। মূল্য দুই টাকা।

অমরেন্দ্রনাথ রায়। রবিয়ানা। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় অ্যাণ্ড সন্স। 'ভূমিকা'র তারিখ ২৬ শ্রাবণ ১৩২৩। পৃ ৮৭। মূল্য বারো আনা।

অমল হোম। পুরুষোত্তম রবীন্দ্রনাথ। কলিকাতা। ২২শে শ্রাবণ ১৩৬২। এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স। পৃ ৭৮। মূল্য দুই টাকা।

অমলেন্দু দাশগুপ্ত। ঋষি রবীন্দ্রনাথ। জেনারেল প্রিণ্টার্স অ্যাণ্ড পাবলিশার্স। অক্ষয় তৃতীয়া ১৩৬১। পৃ ১১০। মূল্য তিন টাকা।

অমিয়কুমার সেন। প্রকৃতির কবি রবীন্দ্রনাথ। বিশ্বভারতী। ৭ পৌষ ১৩৫৪। পৃ ২৪৪। মূল্য তিন টাকা।

অমিয়রতন মুখোপাধ্যায়। রবীন্দ্রনাথের সোনার তরী। শান্তি লাইব্রেরি। আশ্বিন ১৩৬২। পৃ ১১২। মূল্য দুই টাকা।

অমূল্যধন মুখোপাধ্যায়। কবিগুরু। ওরিয়েন্ট প্রিন্টিং অ্যাণ্ড পাবলিশিং হাউস। ১৩৫৮। পৃ ১৭৪। মূল্য তিন টাকা বারো আনা।

অশোক সেন। রবীন্দ্রনাথ, প্রথম পর্ব। এইচ. সরকার অ্যাণ্ড সন্স। ২৫ বৈশাখ ১৩৫৬। পৃ ১৩৮। মূল্য তিন টাকা।

অশোক সেন। রবীন্দ্রনাথ। দ্বিতীয় পর্ব। এ. মুখার্জি অ্যাণ্ড কোং। পৃ ২১৯। মূল্য চার টাকা।

অশোক সেন। কল্পনা (রবীন্দ্রনাথ)। জুলিয়া পাবলিশিং হাউস। অগ্রহায়ণ ১৩৫৬। পৃ ৫৮। মূল্য পাঁচ সিকা।

কাজী আবদুল ওদুদ। রবীন্দ্রকাব্যপাঠ: মনোবিকাশের ধারার অনুসরণ। মোসলেম পাবলিশিং হাউস। ১৩৩৪। পৃ ১২৮। মূল্য পাঁচ সিকা।

ইন্দুপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়। কবি রবীন্দ্রনাথের ঋষিত্ব। লোটাস লাইব্রেরি, ৫০ কর্নওয়ালিস স্ট্রীট। [১৯১৪ ?]। পৃ ২২। মূল্য দুই আনা।

উপেন্দ্রকুমার কর। "গীতাঞ্জলি"-সমালোচনা (প্রতিবাদ)। মৌলবীবাজার, শ্রীহট্ট, চন্দ্রনাথ প্রেসে মুদ্রিত। 'কৈফিয়ৎ'-এর তারিখ ১ আশ্বিন ১৩২১। পৃ ১০৪। মূল্য ছয় আনা।

উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য। রবীন্দ্র-সাহিত্য-পরিক্রমা। প্রথম খণ্ড, কাব্য। বুক হাউস। ১৩৫৪। প্রথম অধ্যায় পৃ ৩১২, দ্বিতীয় অধ্যায় পৃ ২১৬। মূল্য বারো টাকা।

উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য। রবীন্দ্র-কাব্য-পরিক্রমা। ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি। শ্রাবণ ১৩৬০। পৃ ৬৭১। মূল্য বারো টাকা।

উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য। রবীন্দ্র-নাট্য-পরিক্রমা। ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি। বৈশাখ ১৩৬১। পৃ ৫৬২। মূল্য দশ টাকা।

মৌলবী একরামদ্দীন। রবীন্দ্র-প্রতিভা। প্রাপ্তিস্থান গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় অ্যাণ্ড সন্স। ভূমিকার তারিখ ১৪ জুলাই ১৯১৪। পৃ ১২৯। মূল্য এক টাকা।

কনক বন্দ্যোপাধ্যায়। রবি-পরিক্রমা। এ. মুখার্জি

১ দেশ পত্রিকার ২৩ বৈশাখ ১৩৭২ সংখ্যায় বর্তমান সংকলয়িতা-প্রণীত যে বিস্তারিত গ্রন্থ-তালিকা প্রকাশিত হয়, তাহার সংক্ষিপ্ত রূপ। ঐ তারিখের পর যে-সকল গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে সেগুলির নামও এই তালিকায় যোগ করা হইয়াছে।

অ্যাণ্ড কোং। ২৫ বৈশাখ ১৩৬০। পৃ ১৩২। মূল্য দুই টাকা।

কাননবিহারী মুখোপাধ্যায়। মানুষ রবীন্দ্রনাথ। কোলকাতা প্রকাশনা নিকেতন। জানুয়ারি ১৯৩৯। পৃ ১২২। মূল্য দেড় টাকা।

ক্ষিতিমোহন সেন। বলাকা-কাব্য-পরিক্রমা। এ. মুখার্জি অ্যাণ্ড কোং। জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৯। পৃ ২১৮। মূল্য সাড়ে চার টাকা।

ক্ষুদিরাম দাস। রবীন্দ্র-প্রতিভার পরিচয়। পুথিঘর। আশ্বিন ১৩৬০। পৃ ৪৭৯। মূল্য দশ টাকা।

খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। রবীন্দ্র-কথা। জয়শ্রী পুস্তকালয়। ১৩৪৮। পৃ ৪৮২। মূল্য পাঁচ টাকা।

খগেন্দ্রনাথ বসু। রবীন্দ্র কাব্য। প্রাপ্তিস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড বুক কোম্পানি। ১৯৪৮। পৃ ৬১। মূল্য দেড় টাকা।

গিরিজাপতি ভট্টাচার্য। নৌকাডুবির প্লট। ডিসেম্বর ১৯৫৪। পৃ ৫।

গুণময় মান্না। রবীন্দ্রনাথ। বেঙ্গল পাবলিশার্স। চৈত্র ১৩৬২। পৃ ২০৬। মূল্য সাড়ে চার টাকা।

গোপালচন্দ্র রায়। রবীন্দ্রনাথের হাস্য-পরিহাস। ডি. এম. লাইব্রেরি। ভাদ্র ১৩৬২, আগস্ট ১৯৫৫। পৃ ১০০। মূল্য দুই টাকা।

চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। রবি-রশ্মি। পূর্বভাগে—কবিত্ব-উন্মেষ হইতে কল্পনা পর্যন্ত। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। ১৯৩৮। পৃ ৪২৩।

'পরিবর্ধিত চতুর্থ সংস্করণ'। এ. মুখার্জি অ্যাণ্ড কোং। লেখকের পুত্র কনক বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক 'সম্পাদিত ও পুনর্বিবৃত।' পৃ ৫০০। মূল্য ৭।৹।

রবি-রশ্মি। পশ্চিম ভাগে—ক্ষণিকা হইতে তাসের দেশ পর্যন্ত। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। ১৩৩৯। পৃ ৬৭২।

পরিবর্ধিত চতুর্থ সংস্করণ। কনক বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক সম্পাদিত। এ. মুখার্জি অ্যাণ্ড কোং। পৃ ৩৯৪। মূল্য সাত টাকা।

চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। রবীন্দ্রসাহিত্য-পরিচিতি। বোস মুখার্জি অ্যাণ্ড কোং। ভূমিকার তারিখ আশ্বিন ১৩৪৯। পৃ ১৩৪। মূল্য দেড় টাকা।

জগদীশ ভট্টাচার্য। রবীন্দ্রকাব্য-গোধূলি। বঙ্গবাসী কলেজ বাঙলা সাহিত্য সমিতি। পৃ ৩০। মূল্য চারি আনা।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ চৌধুরী। রবীন্দ্র-মানস। জেনারেল প্রিণ্টার্স অ্যাণ্ড পাবলিশার্স। আষাঢ় ১৩৫৯। পৃ ১৬৬। মূল্য তিন টাকা।

জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ। বিশ্বভ্রমণে রবীন্দ্রনাথ। শ্রীগুরু লাইব্রেরি। 'নিবেদন'এর তারিখ আশ্বিন ১৩৪৯। পৃ ২৪০। মূল্য আড়াই টাকা।

তপনকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। কবিগুরুর রক্তকরবী। সাধনা-মন্দির, কলিকাতা। ভূমিকার তারিখ ফাল্গুন ১৩৫৯। পৃ ১৫০। মূল্য তিন টাকা।

তপনকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। রবীন্দ্র-জিজ্ঞাসা। শান্তি লাইব্রেরি। শ্রাবণ ১৩৬২। পৃ ১০৪। মূল্য দুই টাকা চার আনা।

দক্ষিণারঞ্জন বসু। শতাব্দীর সূর্য। এ. মুখার্জি অ্যাণ্ড কোং। পৃ ১৯২। মূল্য দুই টাকা।

দেবজ্যোতি বর্মণ। রবীন্দ্রনাথ। কুলজা সাহিত্য-মন্দির। শ্রীপঞ্চমী ১৩৪৮। পৃ ১২৩+৩। মূল্য পাঁচ সিকা।

নগেন্দ্রচন্দ্র শ্যাম। কবি রবীন্দ্রনাথের কবিতার রূপ ও রস। সরস্বতী লাইব্রেরি, শিলচর। ভূমিকার তারিখ ৭ পৌষ ১৩৩৮। পৃ ১১১। মূল্য বারো আনা।

ননীলাল ভট্টাচার্য। রবীন্দ্রনাথের কাব্য। দাস অ্যাণ্ড কোং। ১৬ সেপ্টেম্বর ১৯৩২। পৃ ৪০। মূল্য আট আনা।

নন্দগোপাল সেনগুপ্ত। কাছের মানুষ রবীন্দ্রনাথ। বেঙ্গল পাবলিশার্স। মাঘ ১৩৫০। পৃ ১২৯। মূল্য দেড় টাকা।

নন্দগোপাল সেনগুপ্ত। অধিনায়ক রবীন্দ্রনাথ। জেনারেল প্রিণ্টার্স অ্যাণ্ড পাবলিশার্স। পৌষ ১৩৫২। পৃ ১৮৪। মূল্য আড়াই টাকা।

নন্দগোপাল সেনগুপ্ত ও সুধাংশুশেখর সেনগুপ্ত। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ। ব্যানার্জি ব্রাদার্স। অগ্রহায়ণ ১৩৪৮। পৃ ২০৭। মূল্য দেড় টাকা।

নলিনীকান্ত গুপ্ত। রবীন্দ্রনাথ। রামেশ্বর অ্যাণ্ড কোং, চন্দননগর। শ্রাবণ ১৩৪৯। পৃ ১২৮। পুনর্মুদ্রণ কালচার পাবলিশার্স। অগ্রহায়ণ ১৩৫৮। মূল্য দুই টাকা।

নীহাররঞ্জন রায়। রবীন্দ্রসাহিত্যের ভূমিকা। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। ২৫ বৈশাখ ১৩৪৮। পৃ ৪৭৯। মূল্য সাড়ে সাত টাকা।

দুই খণ্ডে দ্বিতীয় সংস্করণ ২২ শ্রাবণ ১৩৫১।

তৃতীয় মুদ্রণ ২২ শ্রাবণ ১৩৫৩। বুক এম্পরিঅম। প্রথম খণ্ড পৃ ৪৯৫; দ্বিতীয় খণ্ড পৃ ৪২৪। দুই খণ্ডের মূল্য দশ টাকা।

নৃপেন্দ্রকুমার বসু। আমাদের বিশ্বকবি। কো-অপারেটিভ বুক ডিপো। অগ্রহায়ণ ১৩৪৮। পৃ ১১২। মূল্য বারো আনা।

পৃথ্বীশচন্দ্র রায়। স্বদেশী সমাজ—ব্যাধি ও চিকিৎসা। চেরী প্রেস। ভূমিকার তারিখ ৫ ভাদ্র ১৩১১। পৃ ৪৮।

প্রতিমা ঠাকুর। নির্বাণ। বিশ্বভারতী। ১ বৈশাখ ১৩৪৯। পৃ ৭৬। মূল্য এক টাকা।

প্রফুল্লকুমার সরকার। জাতীয় আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথ। আনন্দ-হিন্দুস্থান প্রকাশনী। ২৫ বৈশাখ ১৩৫২। পৃ ১১৪। মূল্য দুই টাকা।

প্রবাসজীবন চৌধুরী। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যাদর্শ। সংস্কৃতি বৈঠক। ভূমিকার তারিখ ১৪ বৈশাখ ১৩৫৬। পৃ ৮২। মূল্য দেড় টাকা।

প্রবাসজীবন চৌধুরী। রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্য-দর্শন। এ. মুখার্জি অ্যাণ্ড কোং। ২৫ বৈশাখ ১৩৬৩। পৃ ১৫৬। মূল্য আড়াই টাকা।

প্রবোধচন্দ্র সেন। বাংলা ছন্দে রবীন্দ্রনাথের দান। চক্রবর্তী চ্যাটার্জি অ্যাণ্ড কোং। রচনাশেষে মুদ্রিত তারিখ ৯ অগ্রহায়ণ ১৩৩৮। পৃ ২৮। মূল্য চারি আনা।

প্রবোধচন্দ্র সেন। ছন্দোগুরু রবীন্দ্রনাথ। বিশ্বভারতী। ১ আষাঢ় ১৩৫২। পৃ ২১৫। মূল্য আড়াই টাকা।

প্রবোধচন্দ্র সেন। ভারতবর্ষের জাতীয় সংগীত। শান্তিনিকেতন আশ্রমিক সংঘের পক্ষে পূর্বাশা কর্তৃক প্রকাশিত। ২৫ বৈশাখ ১৩৫৬। পৃ ৭০। মূল্য আট আনা।

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়। রবীন্দ্রজীবনী ও রবীন্দ্র-সাহিত্য-প্রবেশক। প্রথম খণ্ড ১২৬৮-১৩১৮। লেখক কর্তৃক প্রকাশিত। ১৩৪০। পৃ ৫০৫। মূল্য চার টাকা ও পাঁচ টাকা।

দ্বিতীয় খণ্ড। ১৩১৯-১৩৪৩। লেখক কর্তৃক প্রকাশিত। ১৩৪৩। পৃ ৪৭৬। মূল্য তিন টাকা।

দ্বিতীয় সংস্করণ। বস্তুতঃ বহু-পরিবর্ধিত পুনর্লিখিত বা নূতন গ্রন্থ :

প্রথম খণ্ড ১২৬৮-১৩০৮। বিশ্বভারতী। বৈশাখ ১৩৫৩। পৃ ৩৮২। মূল্য সাড়ে আট টাকা।

দ্বিতীয় খণ্ড ১৩০৮-১৩২৫। মাঘ ১৩৫৫। পৃ ৪৯৯। মূল্য দশ টাকা।

তৃতীয় খণ্ড ১৩২৫-১৩৪১। ১৩৫৯। পৃ ৩৮৭। মূল্য দশ টাকা।

চতুর্থ খণ্ড ১৩৪১-১৩৪৮। শ্রাবণ ১৩৬৩।

প্রমথনাথ বিশী। রবীন্দ্র-কাব্যপ্রবাহ। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। এপ্রিল ১৯৩৯। পৃ ২৭০।

দ্বিতীয় সংস্করণে গ্রন্থ পরিবর্ধিত ও দুই খণ্ডে বিভক্ত :

প্রথম খণ্ড। সন্ধ্যাসংগীত হইতে নৈবেদ্য। মিত্রালয়। আষাঢ় ১৩৫৫। পৃ ১৯০। মূল্য চার টাকা।

দ্বিতীয় খণ্ড। স্মরণ হইতে বলাকা। মিত্রালয়। ২২ শ্রাবণ ১৩৫৬। পৃ ১২২। মূল্য সাড়ে তিন টাকা।

প্রমথনাথ বিশী। রবীন্দ্রকাব্যনির্ঝর। জেনারেল প্রিণ্টার্স অ্যাণ্ড পাবলিশার্স। আষাঢ় ১৩৫৩। পৃ ১১০। মূল্য তিন টাকা।

প্রমথনাথ বিশী। রবীন্দ্রনাট্যপ্রবাহ। প্রথম খণ্ড এ. মুখার্জি অ্যাণ্ড কোং। পৌষ ১৩৫৫। পৃ ১৭২। মূল সাড়ে তিন টাকা।

দ্বিতীয় সংস্করণ। ওরিয়েণ্ট বুক কোম্পানি। রথযাত্রা ১৩৬০। পৃ ১৭৭। মূল্য চার টাকা।

প্রমথনাথ বিশী। রবীন্দ্রনাট্যপ্রবাহ। দ্বিতীয় খণ্ড তত্ত্বনাট্য। মিত্রালয়। সেপ্টেম্বর ১৯৫১। পৃ ২৩৭ মূল্য চার টাকা।

প্রমথনাথ বিশী। রবীন্দ্র-বিচিত্রা। ওরিয়েণ্ট বু

কোম্পানি। ২২ শ্রাবণ ১৩৬১। পৃ ২০৮। মূল্য চার টাকা।

প্রমথনাথ বিশী। রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্প। মিত্র ও ঘোষ। ভাদ্র ১৩৬১। পৃ ১২৯+তথ্যপঞ্জী পৃ ৭২। মূল্য চার টাকা।

প্রমথনাথ বিশী। রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন। দ্রষ্টব্য 'শান্তিনিকেতন, বিশ্বভারতী ও রবীন্দ্রনাথ' বিভাগ।

প্রমথনাথ রায় চৌধুরী। কথা বনাম কাজ। প্রকাশক অনুকূলচন্দ্র বসু। পৃ ২১। মূল্য দুই আনা।

প্রিয়লাল দাস। রবীন্দ্রনাথ। সেন ব্রাদার্স। ১৪ বৈশাখ ১৩৪০। পৃ ২১৭। মূল্য ১॥০।

বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়। রবীন্দ্রনাথের ছন্দ। মানসী প্রেস, কলিকাতা। ১৩২৯। পৃ ৬৩।

বাসুদেব মাইতি। রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ-সাহিত্য। বাণী-নিকেতন। রবীন্দ্র জন্মপক্ষ, ১৩৬৩। পৃ ৮৭। মূল্য দুই টাকা।

বিজনবিহারী ভট্টাচার্য। প্রভাতরবি। প্রকাশনী। 'নিবেদন'-এর তারিখ ভাদ্র ১৩৫০। পৃ ২৪৬। মূল্য আড়াই টাকা। গ্রন্থের একখানি 'প্রবেশিকা-পাঠ্য' সংস্করণ পরে (কার্তিক ১৩৫১) প্রকাশিত হয়।

বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়। বিদ্রোহী রবীন্দ্রনাথ। নব্য সাহিত্যভবন। ভূমিকার তারিখ ২৬ সেপ্টেম্বর ১৯৩১। পৃ ১০৫। মূল্য পাঁচ সিকা।

এই পুস্তক ইংরেজ-সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত হয়। শ্রীসজনীকান্ত দাস এই গ্রন্থ দেখিতে দিয়াছেন। স্বাধীনতা লাভের পর 'দ্বিতীয় সংস্করণ' মুদ্রিত হয়।

দ্বিতীয় সংস্করণ। বেঙ্গল পাবলিশার্স। চৈত্র ১৩৫৫। পৃ ১৯৯। মূল্য দুই টাকা।

বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়। রিয়লিস্ট রবীন্দ্রনাথ। নবজীবন সংঘ। ১৩৪৩। পৃ ৯৬। মূল্য এক টাকা।

বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়। রবীন্দ্রসাহিত্যে পল্লী-চিত্র। নবজীবন পাবলিশিং হাউস। আষাঢ় ১৩৪৫। পৃ ৭৪। মূল্য বারো আনা।

[বিনয়কুমার সরকার]। রবীন্দ্রসাহিত্যে ভারতের বাণী। স্টুডেন্টস লাইব্রেরি। ফাল্গুন ১৩২০। পৃ ১৫০। মূল্য দশ আনা।

বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। রবীন্দ্র কথা। 'রত্নসাগর গ্রন্থমালা'। প্রকাশক দেবকুমার বসু, ৭ জে পণ্ডিতিয়া রোড, কলিকাতা। ৩১ শ্রাবণ ১৩৬২। পৃ ৩৬। মূল্য এক টাকা।

বিশ্বপতি চৌধুরী। কাব্যে রবীন্দ্রনাথ। শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী অ্যাণ্ড সন্স। ভূমিকার তারিখ শ্রীপঞ্চমী ১৩৩৭। পৃ ২১৮। মূল্য দুই টাকা। 'দ্বিতীয় সংস্করণ', মিত্র ও ঘোষ। মূল্য সাড়ে তিন টাকা।

বিশ্বপতি চৌধুরী। কথাসাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ। মিত্র ও ঘোষ। পৃ ১১৫। মূল্য তিন টাকা।

বীরেন নাথ। রবীন্দ্র-বাণী। সমাজবাদী সাহিত্য পরিষৎ। মাঘ ১৩৬১। পৃ ২২। মূল্য চার আনা।

বুদ্ধদেব বসু। রবীন্দ্রনাথ: কথাসাহিত্য। নিউ এজ পাবলিশার্স। বৈশাখ ১৩৬২। পৃ ২০৪। মূল্য তিন টাকা আট আনা।

বুদ্ধদেব বসু। সব পেয়েছির দেশে। কবিতা-ভবন। আগস্ট ১৯৪১। পৃ ১০৬। মূল্য দেড় টাকা।

তৃতীয় মুদ্রণ বৈশাখ ১৩৬০। নাভানা। পৃ ১৪১। মূল্য আড়াই টাকা।

ভোলানাথ সেনগুপ্ত কাব্যভূষণ। রক্তকরবীর মর্মকথা। ইণ্ডিয়ান প্রেস, এলাহাবাদ। ১৩৩৩। পৃ ৫৩। মূল্য আট আনা।

মনোরঞ্জন জানা। রবীন্দ্রনাথ (কবি ও কাব্য)। এন. জি. ব্যানার্জি। প্রথম খণ্ড। পৃ ৩০১। মূল্য সাত টাকা। দ্বিতীয় খণ্ড। পৃ ২৯৮। মূল্য সাত টাকা।

মৈত্রেয়ী দেবী। মংপুতে রবীন্দ্রনাথ। ডি. এম. লাইব্রেরি। 'নিবেদন'-এর তারিখ এপ্রিল ১৯৪৩। পৃ ২৯৯। মূল্য সাড়ে তিন টাকা।

তৃতীয় মুদ্রণ। অভিযান পাবলিশিং হাউস। মূল্য চার টাকা।

মৈত্রেয়ী দেবী। কবি সার্বভৌম। অমিয়কুমার মুখোপাধ্যায়, ৯৩।১-এ বহুবাজার স্ট্রীট। ১৩৫৮। পৃ ১৮৫। মূল্য তিন টাকা।

মোহিতলাল মজুমদার। রবি-প্রদক্ষিণ। বঙ্গভারতী

গ্রন্থালয়, কুলগাছিয়া, মহিষরেখা, হাওড়া। পৌষ ১৩৫৬। পৃ ১৯১। মূল্য ছয় টাকা।

মোহিতলাল মজুমদার। কবি রবীন্দ্র ও রবীন্দ্র-কাব্য। কমলা বুক ডিপো। প্রথম খণ্ড। ১৩৫৯। পৃ ১৮২। মূল্য সাড়ে পাঁচ টাকা। দ্বিতীয় খণ্ড। ১৩৬০। পৃ ২২১। মূল্য ছয় টাকা।

যতীন্দ্রমোহন বাগচী। রবীন্দ্রনাথ ও যুগ-সাহিত্য। আশুতোষ লাইব্রেরি। দ্বিতীয় সংস্করণ। ১৩৫৬। পৃ ১০৭। মূল্য এক টাকা বারো আনা।

যোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ। দেব সাহিত্য কুটীর। ভূমিকার তারিখ ১ আষাঢ়, ১৩৫৫। পৃ ৯৪। মূল্য এক টাকা।

যোগেশচন্দ্র বর্মণ রায়। কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথের আদর্শ। প্রথম খণ্ড, পরম তত্ত্ব ও কর্মতত্ত্ব। কিশোরগঞ্জ ময়মনসিংহ হইতে লেখক কর্তৃক প্রকাশিত। ১৩৩৯। পৃ ২০৪। মূল্য দুই টাকা।

রবীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়। অরবিন্দ-রবীন্দ্র। প্রবর্তক পাবলিশার্স। লক্ষ্মীপূর্ণিমা ১৩৬২। পৃ ১২৩। মূল্য চার টাকা।

রাইহরণ চক্রবর্তী। কাব্য-সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ। প্রেসিডেন্সি লাইব্রেরি। ১৩৫০। পৃ ৪০।

রাইহরণ চক্রবর্তী। মর্ত্যের রবীন্দ্রনাথ। আদিল ব্রাদার্স, পটুয়াটুলি, ঢাকা। ১৩৫৩। পৃ ৬০। মূল্য এক টাকা।

রাধাচরণ দাস। কবির স্বপ্ন। পাবনা রজনীকান্ত পুস্তকাগার। আশ্বিন ১৩২৯। মূল্য চারি আনা।

দ্বিতীয় সংস্করণ, আষাঢ় ১৩৫৭। প্রকাশক সন্তোষ-কুমার রায়, ৮-এ রাসবিহারী অ্যাভিনিউ। পৃ ৪৮। মূল্য দশ আনা।

রামকানাই দেবশর্মা। রবীন্দ্র-গীতা। প্রথম অর্ঘ্য। শ্রীমন্দির, ১৯১। ১, বহুবাজার স্ট্রীট। আশ্বিন ১৩৫৯। পৃ ১২৪। মূল্য দুই টাকা। দ্বিতীয় অর্ঘ্য। শিবচতুর্দশী ১৩৬০। পৃ ৮৬। মূল্য এক টাকা।

রামনজ [রামানুজ ?] মিশ্র। স্বর্গীয় রবীন্দ্রনাথের জীবনচরিত। ৪০।১।৭, অপার চিৎপুর রোড। পৃ ১৬। মূল্য এক আনা।

রামনারায়ণ কর। কাব্য-সাহিত্যে 'আমি'র কথা। ইউ. এন. দাস অ্যাণ্ড কোং। ১৩২৬। পৃ ৮১।

রেণু মিত্র। রবীন্দ্রনাথের ঘরে-বাইরে। জেনারেল প্রিণ্টার্স অ্যাণ্ড পাবলিশার্স। ১৩৫১। পৃ ১০৪। মূল্য দুই টাকা।

শচীন সেন। রবীন্দ্র-সাহিত্যের পরিচয়। এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স্। আশ্বিন ১৩৪৬। পৃ ২৪৫। মূল্য তিন টাকা।

তৃতীয় সংস্করণ, রীডার্স কর্নার। বৈশাখ ১৩৬২। পৃ ৩০৪। মূল্য সাত টাকা।

শচীন্দ্রনাথ অধিকারী। সহজ মানুষ রবীন্দ্রনাথ। আশুতোষ লাইব্রেরি। ২২ শ্রাবণ ১৩৪৯। পৃ ১২৪। মূল্য এক টাকা। তৃতীয় মুদ্রণে নূতন কাহিনী এবং নন্দলাল বসু অঙ্কিত কয়েকখানি সমসাময়িক চিত্র যুক্ত হয়। পঞ্চম মুদ্রণ। ১৩৬০। মূল্য দুই টাকা।

শচীন্দ্রনাথ অধিকারী। পল্লীর মানুষ রবীন্দ্রনাথ। আশুতোষ লাইব্রেরি। ১৩৫২। পৃ ১২০। মূল্য এক টাকা বারো আনা। চতুর্থ মুদ্রণ, আষাঢ় ১৩৫৬। মূল্য দুই টাকা।

শচীন্দ্রনাথ অধিকারী। সেকালের রবীন্দ্র-তীর্থ। পূরবী পাবলিশার্স। বর্তমানে গুপ্তপ্রেস। আশ্বিন ১৩৫৩। পৃ ১১৪। মূল্য দুই টাকা।

শশিভূষণ দাস। রবি অস্তমিত (মহাকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মহাপ্রয়াণ)। সরস্বতী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস। ২৩৩, মানিকতলা মেন রোড। পৃ ১৬। মূল্য এক আনা।

শিবকৃষ্ণ দত্ত। রবীন্দ্র-সাধনা (কাব্য-গ্রন্থের সমালোচনা)। প্রাপ্তিস্থান, বরেন্দ্র লাইব্রেরি ও গুরুদাস লাইব্রেরি। আষাঢ় ১৩৩৬। পৃ ১২৪। মূল্য এক টাকা।

শিরীষচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। রবি-সভাজন। প্রকাশক, ইন্দিবর মুখোপাধ্যায়, 'ভুবন-ভবন', খড়দহ। ভূমিকা, আশ্বিন ১৩৪৮। পৃ ৩১।

শিশির সেনগুপ্ত ও জয়ন্তকুমার ভাদুড়ী। বাহির বিশ্বে রবীন্দ্রনাথ। দেশবন্ধু বুক ডিপো। কোজাগরী পূর্ণিমা ১৩৫২। পৃ ১২৮। মূল্য আড়াই টাকা।

শীলানন্দ ব্রহ্মচারী। অন্তর্লোকযাত্রী রবীন্দ্রনাথ। প্রকাশক,

সৌম্যেন্দ্রভূষণ রায়, ৩৩ হিন্দুস্থান রোড। আশ্বিন ১৩৫৫। পৃ ৬০। মূল্য এক টাকা।

শৈলেশ বসু। জাতীয় জীবনে রবীন্দ্রনাথ। ওরিয়েণ্ট বুক কোম্পানি। ১৯৪৭। পৃ ৭৫। মূল্য বারো আনা।

সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার। গান্ধী ও রবীন্দ্রনাথ। প্রকাশক, প্রভাতকুমার মিত্র, ৩৬।১ বেনেটোলা লেন। ভাদ্র ১৩২৮। পৃ ৩৬। মূল্য চারি আনা।

সরসীলাল সরকার। রবীন্দ্র-কাব্যে ত্রয়ী-পরিকল্পনা। বিশ্বভারতী। আশ্বিন ১৩৪৮। পৃ ১২৮। মূল্য এক টাকা।

সরোজকুমার বসু। রবীন্দ্র-সাহিত্যে হাস্যরস। হিন্দুস্থান বুক ডিপো। আষাঢ় ১৩৫৭। পৃ ১০০। মূল্য দুই টাকা।

সাধনা কর ও সুধীর কর। আমাদের গুরুদেব। ৩২ শ্রাবণ ১৩৪৮। পৃ ১৯।

ʼসীতা দেবী। পুণ্যস্মৃতি। প্রবাসী কার্যালয়। শ্রাবণ ১৩৪৯। পৃ ৫২৮। মূল্য দুই টাকা বারো আনা।

সুকুমার সেন। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, তৃতীয় খণ্ড: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। মডার্ন বুক এজেন্সি। সংস্করণ ১৩৫৯, ১৯৫২। পৃ ৩৯০। মূল্য সাড়ে সাত টাকা।

সুধীরচন্দ্র কর। জনগণের রবীন্দ্রনাথ। সিগনেট প্রেস। আশ্বিন ১৩৫৫। পৃ ১৫২। মূল্য আড়াই টাকা।

সুধীরচন্দ্র কর। কবিকথা। সুপ্রকাশন। ১৯৫১। পৃ ২০৩। মূল্য সাড়ে তিন টাকা।

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়। দ্বীপময় ভারত। বুক কোম্পানি। আশ্বিন ১৩৪৭। পৃ ৩৬৯। মূল্য চারি টাকা।

সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত। রবীন্দ্রনাথ। পি ঘোষ অ্যাণ্ড কোং। নিবেদনের তারিখ ২৫ মাঘ ১৩৪১। পৃ ৩৯৯। মূল্য তিন টাকা।

সুমথনাথ ঘোষ। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ। বুক ইনডাস্ট্রিজ। ডিসেম্বর ১৯৪১। পৃ ১১০। মূল্য চৌদ্দ আনা।

সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত। রবি-দীপিতা। মিত্র অ্যাণ্ড ঘোষ। [অক্টোবর ১৯৩৪]। পৃ ২৪৮। মূল্য আড়াই টাকা।

ʼস্বদেশরঞ্জন দাস। সর্বহারার দৃষ্টিতে রবীন্দ্রনাথের ʼরাশিয়ার চিঠি। প্রকাশক নৃপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ২৪ বি কলেজ রো। পৃ ২২। মূল্য চারি আনা।

হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। রবীন্দ্রনাথের কথা। সান্যাল অ্যাণ্ড কোং। [১৩৫৩]। পৃ ১৫৪। মূল্য তিন টাকা আট আনা।

হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। কবির কথা। কাহিনী, ১৬।১ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট। আশ্বিন ১৩৬১। পৃ ৭৬। মূল্য আড়াই টাকা।

হরিপদ কেরানি [কানাই সামন্ত] শাজাহান। প্রকাশক রামেশ্বর দে, চন্দননগর। অ-বিক্রেয়। মুদ্রণসংখ্যা ২০০। রবীন্দ্রপক্ষ ১৩৬০। পৃ ৪৬।

হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়। রবীন্দ্র-দর্শন। দাশগুপ্ত অ্যাণ্ড কোং। আশ্বিন ১৩৫৭। পৃ ৮২। মূল্য দুই টাকা।

দ্বিতীয় সংস্করণ। বৈশাখ ১৩৬১। সাহিত্যসংসদ। পৃ ৯৭। মূল্য দুই টাকা।

[হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ]। কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বসুমতী। পৃ ৮৪।

শ্রীসুকুমার সেন এই দুষ্প্রাপ্য পুস্তকখানি দেখিতে দিয়াছেন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদেও এক কপি আছে।

হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ। রবীন্দ্রনাথ। বুক কোম্পানি। ১৩৪৮। পৃ ৮৯। মূল্য বারো আনা।

রবীন্দ্র-সংগীত ও নৃত্য

ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী। রবীন্দ্র-সংগীতের ত্রিবেণী-সংগম। বিশ্বভারতী। ১৫ পৌষ ১৩৬১। পৃ ৩২। মূল্য বারো আনা।

কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষ বেদান্তচিন্তামণি। হিন্দু-সঙ্গীত ও কবিবর স্যার শ্রীরবীন্দ্রনাথ। সঙ্গীত পরিষদ বিদ্যালয়। ৬৭।৯ বলরাম দে স্ট্রীট। ১৩২৫। পৃ ৬০।

জয়দেব রায়। রবীন্দ্র-গীতি। বুক হাউস। ২৫ বৈশাখ ১৩৬০। পৃ ২৪০। মূল্য তিন টাকা।

ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। কথা ও সুর। বিশ্বভারতী। ভাদ্র ১৩৪৫। পৃ ৮৮। মূল্য দুই টাকা।

নীহারবিন্দু সেন। রবীন্দ্র সঙ্গীতের ক্রমপর্যায়। জাতীয় নাট্য পরিষদ। [২৪ জুলাই ১৯৫০]। পৃ ২০।

প্রতিমা দেবী। নৃত্য। বিশ্বভারতী। ২৫ বৈশাখ ১৩৫৬। পৃ ৩১। রবীন্দ্রনাথ-অঙ্কিত নৃত্যচ্ছন্দের ছয়খানি চিত্র সম্বলিত। মূল্য তিন টাকা।

শান্তিদেব ঘোষ। রবীন্দ্র-সঙ্গীত। বিশ্বভারতী। ৭ পৌষ ১৩৪৯। পৃ ১৬৩। সংস্করণ আশ্বিন ১৩৫৬। বিশ্বভারতী। পৃ ২৮৮। মূল্য চার টাকা।

শুভ গুহ ঠাকুরতা। রবীন্দ্র-সঙ্গীতের ধারা। দক্ষিণী প্রকাশন বিভাগ। বৈশাখ ১৩৫৯। পৃ ২১৩। মূল্য পাঁচ টাকা।

শেফালিকা শেঠ সংকলিত। রবীন্দ্র-সঙ্গীতপ্রসঙ্গ। প্রকাশক বারীন্দ্রনাথ শেঠ, ২১৫ পার্ক স্ট্রীট। পৃ ২৮।

সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর। রবীন্দ্রনাথের গান। অভিযান পাবলিশিং হাউস। ২৫ বৈশাখ ১৩৫৯। পৃ ৫৬। মূল্য দেড় টাকা।

সংগীত-প্রসঙ্গে নিম্নলিখিত গ্রন্থখানিও উল্লেখযোগ্য—

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। সুর ও সঙ্গতি। ভারতী ভবন। ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় লিখিত 'পত্রাবলীর ইতিহাস'-এর তারিখ ১ শ্রাবণ ১৩৪২। পৃ ১০২। মূল্য এক টাকা। সংগীত সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ ও ধূর্জটিপ্রসাদের পত্রাবলী।

রবীন্দ্র-চিত্রকলা

মনোরঞ্জন গুপ্ত। রবীন্দ্র-চিত্রকলা। সরস্বতী লাইব্রেরি। ১৯৪৯। পৃ ৬২+রবীন্দ্রনাথ অঙ্কিত কুড়িখানি চিত্র। মূল্য ছয় টাকা।

শ্রীহরি গঙ্গোপাধ্যায়। রবীন্দ্রনাথের রেখায় কাব্য। এসিয়া প্রেস অ্যাণ্ড পাবলিকেশনস সিণ্ডিকেট। পৌষ ১৩৫৯। পৃ ১৫। মূল্য এক টাকা।

সম্মিলিত শ্রদ্ধাঞ্জলি

কবি-পরিচিতি। কান্ত পাবলিশিং হাউস। সপ্ততিতম রবীন্দ্র-জন্মতিথি। ২৫ বৈশাখ ১৩৩৮। পৃ ২৩৪। মূল্য দুই টাকা।

কবি-প্রণাম। সম্পাদক নলিনীকুমার ভদ্র, অমিয়াংশু এন্দ, মৃণালকান্তি দাশ, সুধীরেন্দ্রনারায়ণ সিংহ। বাণীচক্র-ভবন, শ্রীহট্ট। অগ্রহায়ণ ১৩৪৮। পৃ ১১২+পরিশিষ্ট পৃ ৩২। মূল্য দেড় টাকা।

কবি-প্রশস্তি। রবীন্দ্র-জয়ন্তী ছাত্র-ছাত্রী উৎসব-পরিষদ্। উৎসব-পরিষদ পক্ষে প্রতুলচন্দ্র গুপ্ত কর্তৃক প্রকাশিত। ১৩৩৮। পৃ ৮৫। মূল্য এক টাকা।

গীতবিতান বার্ষিকী। সম্পাদক প্রভাতচন্দ্র গুপ্ত গীতবিতান। মাঘ ১৩৫০। পৃ ২১৪। মূল্য তিন টাকা।

জয়ন্তী-উৎসর্গ। রবীন্দ্র-পরিচয়সভা কর্তৃক প্রকাশিত। বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়। ১১ পৌষ ১৩৩৮। পৃ ৪৯৯। মূল্য সাড়ে তিন টাকা।

পঁচিশে বৈশাখ। সম্পাদিকা মৈত্রেয়ী দেবী। বুক হাউস। পৃ ১৩০। মূল্য তিন টাকা।

পঁচিশে বৈশাখ। সন্তোষ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত। খড়্গপুর, অতুলমণি উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়। ২৫ বৈশাখ ১৩৫৭। পৃ ১২।

বাইশে শ্রাবণ। হিতেন ঘোষ সম্পাদিত। খড়্গপুর অতুলমণি উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়। ২২ শ্রাবণ ১৩৫৭। পৃ ১৪। মূল্য আট আনা।

রবীন্দ্র-বিয়োগে রবি-সভাজন। মহীয়াড়ি কুণ্ডু চৌধুরী ইনস্টিটিউশন। ১ ভাদ্র ১৩৪৮।

রবীন্দ্র-স্মৃতি পূর্বাশা। সম্পাদক সঞ্জয় ভট্টাচার্য। পূর্বাশা প্রেস। [১৩৪৮] পৃ ১২০। মূল্য দেড় টাকা।

সমসাময়িক কবির চোখে রবীন্দ্রনাথ। মিত্র ও ঘোষ। পৃ ১০৫। মূল্য এক টাকা চার আনা।

কবিতা ও নাট্য

অনিলরঞ্জন বিশ্বাস। বিদায়-গোধূলি। বি. সরকার অ্যাণ্ড কোম্পানি। পৃ ১৬। মূল্য চার আনা।

অমরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। রবীন্দ্র-প্রতিভা। কমলা বুক ডিপো। 'কয়েকটি কথা'র তারিখ ১৪ এপ্রিল ১৯৫০। পৃ ৪৪। মূল্য পাঁচ সিকা।

কালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত। রবীন্দ্রবৈজয়ন্তী। প্রকাশক ইন্দুমাধব সেনগুপ্ত, ৪৫।১ বি বিডন স্ট্রীট। ৩ আশ্বিন ১৩৪৮। পৃ ১৬।

[কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ]। ইহা কড়িও নহে,

কোমলও নহে, পূরো সুরে মিঠেকড়া। রাহু-রচিত। দ্বিতীয় সংস্করণ। কলিকাতা, ভবানীপুর পার্থিব যন্ত্রে, কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ কর্তৃক মুদ্রিত। সন ১৩০১। মূল্য এক আনা মাত্র। ষষ্ঠ সংস্করণ। ১৩২২। হিতবাদী পুস্তকালয়। পৃ ২৪। মূল্য এক আনা।

জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র সম্পাদিত। পঁচিশে বৈশাখ। রবীন্দ্র সংসদ, পাবনা। পৃ ২২। মূল্য চারি আনা।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়। আনন্দ-বিদায় (প্যারডি)। বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরি। [১৬ নভেম্বর ১৯১২]। পৃ ৬৭। মূল্য আট আনা।

প্রভাত বসু সম্পাদিত। রবীন্দ্রনামা। বুক্‌ম্যান। মাঘ ১৩৫৩। পৃ ৭৭। মূল্য দেড় টাকা।

রবীন্দ্র-সংসদ, উলুবেড়িয়া। অর্ঘ্য। রবীন্দ্র-সংসদ, উলুবেড়িয়া। ২২ শ্রাবণ ১৩৫০। পৃ ১৬।

সজনীকান্ত দাস। পঁচিশে বৈশাখ। রঞ্জন পাবলিশিং হাউস। বৈশাখ ১৩৪৯। পৃ ৬১। মূল্য এক টাকা চারি আনা।

দ্বিতীয় সংস্করণ। অগ্রহায়ণ ১৩৪৯। এই সংস্করণে 'মারণ' বর্জিত ও 'রবিচক্র' ও 'রবীন্দ্রকাব্যপাঠে' নূতন মুদ্রিত। পৃ ৬৪।

তৃতীয় সংস্করণ। কার্তিক ১৩৫০। "বাইশে শ্রাবণ কবিতাটি বর্তমান সংস্করণে নূতন সংযোজন।" মূল্য দেড় টাকা।

সত্যেন্দ্রনাথ জানা। রবি-তর্পণ। প্রবর্তক। শ্রাবণ ১৩৫১। পৃ ৭৭। মূল্য দেড় টাকা।

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ও অন্যান্য। রবীন্দ্র-মঙ্গল। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ। ১৩২৮। পৃ ২১।

সুধীরচন্দ্র কর। চিত্রভানু। প্রাপ্তিস্থান কবিতা-ভবন ও শান্তিনিকেতনে লেখকের নিকট। ২২ শ্রাবণ ১৩৪৯। পৃ ১৪। মূল্য চার আনা।

শান্তিনিকেতন, বিশ্বভারতী ও রবীন্দ্রনাথ

অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় ও জ্ঞানেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। শান্তিনিকেতন আশ্রম। থ্যাকার স্পিঙ্ক। ১৩৫৭। পৃ ১১৬। মূল্য এক টাকা।

অজিতকুমার চক্রবর্তী। ব্রহ্মবিদ্যালয়। প্রকাশক জ্ঞানেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, আদি ব্রাহ্মসমাজ। ১৩১৮। পৃ ৫৯। মূল্য।৵০ আনা।

বিশ্বভারতী সংস্করণ। ৭ পৌষ ১৩৫৮। মূল্য এক টাকা বারো আনা।

প্রমথনাথ বিশী। রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন। বিশ্বভারতী। ১৫ আষাঢ় ১৩৫১। পৃ ১৯০। মূল্য আড়াই টাকা।

দ্বিতীয় সংস্করণে দুইটি অধ্যায় নূতন যুক্ত হইয়াছে।

তৃতীয় মুদ্রণ জ্যৈষ্ঠ ১৩৬০। মূল্য চার টাকা।

ভারতপরিব্রাজক। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ॥ ব্রহ্মযজ্ঞ-শান্তিনিকেতন। ধর্ম ও কর্ম কার্যালয়। ১৩২১। পৃ ৪২। মূল্য ছয় আনা।

সাধনা কর। শান্তিনিকেতনের অপ্রকাশিত অধ্যায়। সুপ্রকাশন। ১ পৌষ ১৩৬০। পৃ ৩৪। মূল্য আট আনা।

সাধনা কর। ৭ই পৌষের ইতিহাস। প্রকাশক সুধীরচন্দ্র কর, শান্তিনিকেতন। পৃ ৮। মূল্য দুই আনা।

সুধীরচন্দ্র কর। শান্তিনিকেতনে ৭ই পৌষ। প্রকাশক জগদানন্দ রায়, শান্তিনিকেতন প্রেস। ১৩৩৬। পৃ ২৭। মূল্য দুই আনা।

দ্বিতীয় সংস্করণ, 'সাতই পৌষে রবীন্দ্রনাথ' নামে প্রকাশিত। পৃ ৩১। মূল্য চার আনা।

সুধীরচন্দ্র কর। শান্তিনিকেতনের শিক্ষা ও সাধনা। ওরিয়েণ্ট বুক কোম্পানি। আশ্বিন ১৩৬০। পৃ ২৮৪। মূল্য সাড়ে তিন টাকা।

সুধীরঞ্জন দাস। বিশ্বভারতী-প্রসঙ্গ। শান্তিনিকেতন আশ্রমিক সংঘ। পৃ ৮।

বিশ্বভারতী বার্ষিক সমাবর্তন উৎসবের অভিভাষণ। ৮ পৌষ ১৩৬০।

শান্তিনিকেতন-প্রসঙ্গে সমাবর্তন-উৎসবের অন্যান্য অভিভাষণগুলিরও উল্লেখ করা যাইতে পারে— ১৩৫৯, রাজেন্দ্রপ্রসাদের অভিভাষণ; ১৯৫৪ (১৩৬১), বিধানচন্দ্র রায়ের অভিভাষণ ইত্যাদি।

শান্তিনিকেতন ও বিশ্বভারতী প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের

এই পুস্তক-পুস্তিকাগুলি দ্রষ্টব্য—প্রাক্তনী; আশ্রমের রূপ ও বিকাশ; বিশ্বভারতী; শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রম।

এই বিভাগে উল্লিখিত সকল গ্রন্থে রবীন্দ্র-প্রসঙ্গ না থাকিলেও, রবীন্দ্র-বিদ্যায়তনের পরিচায়ক বলিয়া এই তালিকায় উল্লিখিত হইল।

বিবৃতি, অভিভাষণ ইত্যাদি

অমল হোম। কেরাণী রবীন্দ্রনাথ। কলিকাতা কর্পোরেশন কর্মচারী সংঘ কর্তৃক অনুষ্ঠিত রবীন্দ্র-জয়ন্তী-উৎসব-সভার সভাপতির অভিভাষণ। প্রকাশক রাধারমণ রায় চৌধুরী, সম্পাদক, কলিকাতা কর্পোরেশন কর্মচারী সংঘ। শ্রাবণ ১৩৪৮। পৃ ২৪।

নরেন্দ্রনাথ লাহা। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের ৮৯তম জন্মোৎসবে সভাপতি ডক্টর নরেন্দ্রনাথ লাহার অভিভাষণ। নিখিল-ভারত রবীন্দ্র-স্মৃতি-সমিতি। কলিকাতা ১৩৫৬। পৃ ২২।

নির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। রবীন্দ্র-জন্মোৎসব। সভাপতির অভিভাষণ। ২৫ বৈশাখ ১৩৫১। ডায়মণ্ড হারবার। পৃ ৭।

প্রবোধচন্দ্র সেন। হবিগঞ্জ দ্ব্যশীতিতম রবীন্দ্র-জন্মোৎসব উপলক্ষে সভাপতির অভিভাষণ। রবীন্দ্র-জন্মোৎসব সমিতির পক্ষে রণেন্দ্রমোহন পালিত কর্তৃক প্রকাশিত। হবিগঞ্জ, ২৫ বৈশাখ ১৩৪৯। পৃ ১১।

প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ। কেন রবীন্দ্রনাথকে চাই। For private circulation only। রচনাশেষে তারিখ ১৫ মার্চ ১৯২১। পৃ ৫২।

মোহাম্মদ আজিজুল হক। রবীন্দ্র-স্মরণে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। [অগস্ট] ১৯৪১। পৃ ৩৪।

শরৎকুমার রায় (দীঘাপতিয়া)। রবীন্দ্র-স্মৃতি। প্রকাশ প্রেস। ৬১ বহুবাজার স্ট্রীট। পৃ ১৩।

শরৎচন্দ্র বসু। পঁচিশে বৈশাখ। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ষড়শীতিতম জন্মদিবসে সভাপতির অভিভাষণ। [নিখিল-ভারত রবীন্দ্র-স্মৃতি-সমিতি, কলিকাতা]। ২৫ বৈশাখ ১৩৫৩। পৃ ৬।

[শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়]। রবীন্দ্র-জন্মোৎসব। সভাপতি ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের অভিভাষণ। [নিখিল-ভারত রবীন্দ্র-স্মৃতি-সমিতি। কলিকাতা, ১৩৫৭] ২৫ বৈশাখ ১৩৫৭। পৃ ৭।

নিখিল-বঙ্গ রবীন্দ্র-সাহিত্য-সম্মেলন, দক্ষিণী কর্তৃক অনুষ্ঠিত রবীন্দ্রসংগীত-সম্মেলন, গীতবিতান প্রভৃতির প্রচারিত বিবরণ-পুস্তক, প্রতিবেদন প্রভৃতির কোনো-কোনোটিতে রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে উল্লেখযোগ্য রচনা মুদ্রিত হইয়াছে।

পঞ্জী

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়। বর্ষপঞ্জী। রবীন্দ্র-জয়ন্তী, ২৫ বৈশাখ ১৩৩৮। প্রকাশক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়। পৃ ১৭। মূল্য চারি আনা।

"রবীন্দ্রনাথের জীবনের সত্তর বৎসরের প্রধান প্রধান ঘটনা ও প্রকাশিত সকল গ্রন্থের কালানুক্রমিক তালিকা।"

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়। রবীন্দ্র-গ্রন্থপঞ্জী। বিশ্বভারতী। পৃ ৫৬। মূল্য আট আনা।

সঞ্চয়িতা (পৌষ ১৩৩৮) পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন গ্রন্থের প্রথম সংস্করণের কালানুক্রমিক সূচী।

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। রবীন্দ্র-গ্রন্থ-পরিচয়। সাহিত্যনিকেতন। ২ পৌষ ১৩৪৯। পৃ ৭১। মূল্য আট আনা।

১৮৭৮ হইতে ১৯৪২-এর মধ্যে প্রকাশিত, রবীন্দ্রনাথ-রচিত বাংলা পুস্তকের তালিকা ও সংক্ষিপ্ত পরিচয়। পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ, ১০ মাঘ ১৩৫০। পৃ ৯২। মূল্য দশ আনা। এই সংস্করণে ১৯৪৩ পর্যন্ত প্রকাশিত গ্রন্থতালিকা সংকলিত হইয়াছে।—প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য যে, অতঃপর রবীন্দ্রনাথের আরও কয়েকখানি গ্রন্থ সংকলিত ও প্রকাশিত হইয়াছে।

আত্মকথা

জীবন-স্মৃতি। প্রকাশক নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, শিলাইদহ। ১৩১৯। পৃ ১৯৫।

নূতন সংস্করণ। বিশ্বভারতী। অগ্রহায়ণ ১৩৫০। পৃ ২১৪। মূল্য সাড়ে তিন টাকা।

এই নূতন সংস্করণে বহু পাদটীকা ও সুদীর্ঘ গ্রন্থপরিচয়ে রবীন্দ্র-জীবনীর বহু উপকরণ যোগ করা হইয়াছে, বহু অপরিজ্ঞাত বা বিচ্ছিন্ন তথ্য দুর্লভ সাময়িক পত্র ও গ্রন্থ হইতে একত্র সমাহরণ করিয়া রবীন্দ্র-জীবনের আলোচ্য যুগের চিত্র সুপরিস্ফুট করা হইয়াছে। এই সংস্করণ নির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক সম্পাদিত।

১৩৫৪ জ্যৈষ্ঠে প্রকাশিত সংস্করণে (বিশ্বভারতী, পৃ ২৯৩। মূল্য পাঁচ টাকা।) গ্রন্থ-পরিচয় (পৃ ১৯১-২৯১) বহুল পরিমাণে বর্ধিত হইয়াছে।

ছেলেবেলা। বিশ্বভারতী। ভাদ্র ১৩৪৭। পৃ ৮৭। মূল্য দেড় টাকা, দুই টাকা।

"ছেলেমানুষ রবীন্দ্রনাথের কথা।...এই বিবরণটিকে ছেলেবেলাকার সীমা অতিক্রম করতে দেওয়া হয়নি—কিন্তু শেষকালে এই স্মৃতি কিশোর বয়সের মুখোমুখি এসে পৌঁছিয়েছে।...এই বইটির বিষয়বস্তুর কিছু কিছু অংশ পাওয়া যাবে জীবনস্মৃতিতে, কিন্তু তার স্বাদ আলাদা। সরোবরের সঙ্গে ঝরনার তফাতের মতো। সে হোলো কাহিনী, এ হোলো কাকলি, সেটা দেখা দিচ্ছে ঝুড়িতে, এটা দেখা দিচ্ছে গাছে।"...ভূমিকা

আত্মপরিচয়। বিশ্বভারতী। ১ বৈশাখ ১৩৫০। পৃ ১২৭। মূল্য দেড় টাকা।

"এই গ্রন্থের প্রথম প্রবন্ধটি 'বঙ্গভাষার লেখক' গ্রন্থে (১৩১১) প্রথম মুদ্রিত হয়। রবীন্দ্রনাথের সহিত দ্বিজেন্দ্র-লালের যে বিরোধ একসময় বাংলা সাময়িক সাহিত্যকে বিক্ষুব্ধ করিয়া তুলিয়াছিল, এই প্রবন্ধ হইতেই একরূপ তাহার সূচনা হয়।...রবীন্দ্রনাথের পঞ্চাশত্তম বর্ষ পূর্ণ হওয়া উপলক্ষে · বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ ১৩১৮ সালের ১৪ মাঘ কলিকাতা টাউন হলে কবিসংবর্ধনা করেন। এই অনুষ্ঠানের অনুষঙ্গরূপে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-মন্দিরে একটি আনন্দসম্মেলন (২০ মাঘ ১৩১৮) অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, এই গ্রন্থের দ্বিতীয় প্রবন্ধটি সেখানে পঠিত হয়। ··রবীন্দ্রনাথের ধর্মমতের কোনো একটি সমালোচনার উত্তরে এই গ্রন্থের প্রবন্ধটি লিখিত হয়।...সপ্ততিতম জন্মোৎসবে শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের অভিভাষণের...অনুলিপি এই গ্রন্থের চতুর্থ প্রবন্ধ।...সপ্ততিবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে কলিকাতা টাউন হলে যে রবীন্দ্রজয়ন্তী (১১ পৌষ ১৩৩৮) অনুষ্ঠিত হয়, সেই উৎসবে পাঠ করিবার জন্য এই গ্রন্থের পঞ্চম প্রবন্ধটি ["প্রতিভাষণ"] লিখিত...।

"আশি বছরের আয়ুঃক্ষেত্রে" প্রবেশ উপলক্ষে এই গ্রন্থের ষষ্ঠ প্রবন্ধটি ["জন্মদিনে"] রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছিলেন। ...১৩১৭ সালে...রবীন্দ্রনাথ একটি চিঠিতে তাঁহার যে সংক্ষিপ্ত জীবনকথা লিপিবদ্ধ করেন...তাহা গ্রন্থ-পরিশেষে মুদ্রিত হইল।"

শিশু ও কিশোর-পাঠ্য

অনাথ রায়। আমার দেশের মানুষ। ২য় খণ্ড। নিউ বুক হাউস। ভূমিকার তারিখ ১৪-১২-৫৩। পৃ ১৬২। মূল্য আড়াই টাকা।

অনিলচন্দ্র ঘোষ। রবীন্দ্রনাথ। প্রেসিডেন্সি লাইব্রেরি। ১৯৪০। পৃ ২৪। মূল্য তিন আনা।

কাননবিহারী মুখোপাধ্যায়। রবীন্দ্র জীবনকথা। ইণ্টারন্যাশানাল পাবলিশরস। ২৫ বৈশাখ ১৩৫০। পৃ ১৬৬।

কাননবিহারী মুখোপাধ্যায়। ছোটদের রবীন্দ্রনাথ। কোলকাতা প্রকাশনা নিকেতন। অক্টোবর ১৯৫০। পৃ ৪৯। মূল্য দশ আনা।

চন্দ্রকান্ত দত্ত। কিশোরদের বিশ্বকবি। নালন্দা প্রেস। পৃ ১৬৮। মূল্য দুই টাকা।

দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার। বাংলার সোনার ছেলে। কিং হাফটোন কোং। পৃ ৫২। মূল্য আট আনা।

দীনেশ মুখোপাধ্যায়। ছোটদের রবীন্দ্রনাথ। শ্রীগুরু লাইব্রেরি। ভাদ্র ১৩৪৮। পৃ ১০৭। মূল্য দশ আনা।

দেবনারায়ণ গুপ্ত। তোমাদের রবীন্দ্রনাথ। এইচ. চ্যাটার্জি অ্যাণ্ড কোং। 'নিবেদন'-এর তারিখ মহালয়া ১৩৪৮। পৃ ৪২। মূল্য আট আনা। 'পরিবর্ধিত চতুর্থ সংস্করণ' মূল্য এক টাকা।

নির্মলেন্দু ঘোষ। কিশোর কবি রবীন্দ্রনাথ। গ্রন্থবিতান। পৃ ৮৯। মূল্য এক টাকা চার আনা।

পরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত। রবীন্দ্রনাথ। দেব সাহিত্য কুটীর। ১৩৪৯। পৃ ৪৮। মূল্য তিন আনা।

বিমল ঘোষ। শিশু রবি। মধুচক্র। 'নিবেদন'-এর তারিখ ২৫ বৈশাখ ১৩৪৮। পৃ ৪২। মূল্য ছয় আনা।

বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য। কিশোর রবি। চারু সাহিত্য কুটীর। ভূমিকার তারিখ ২৫।১।৫৪। পৃ ৬৮। মূল্য এক টাকা।

বীরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস ও ফণীন্দ্রভূষণ সরকার। অন্তরালে রবীন্দ্রনাথ। মিলন পাঠাগার, বগুড়া। পাঠাগারের সভ্যবৃন্দ কর্তৃক প্রথম অভিনয়ের তারিখ ২২ শ্রাবণ ১৩৫০। পৃ ১৮।

মনোরম গুহ ঠাকুরতা। আমাদের কবি। দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৩৫৭। বৃন্দাবন ধর বুক হাউস। পৃ ১২০। মূল্য দেড় টাকা।

যামিনীকান্ত সোম। ছেলেদের রবীন্দ্রনাথ। ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস। ১৯২৬। পৃ ১২৭। বারো আনা।

যামিনীকান্ত সোম। ছোট্ট রবি। রীডার্স কর্নার। অগ্রহায়ণ ১৩৫৭। পুনর্মুদ্রণ মাঘ ১৩৫৭। পৃ ৮৪। মূল্য এক টাকা চার আনা।

সতীকুমার নাগ। হাজার বছর পরে আমাদের কবি। অশোক লাইবেরি। পৃ ১৬। মূল্য পাঁচ আনা।

সুধীন্দ্রনাথ রাহা। রবীন্দ্রনাথ। প্রকাশক সুবোধচন্দ্র সুর, ২৫ ভূপেন্দ্র বসু অ্যাভিনিউ। ১৩৫৩। পৃ ৫৫। মূল্য বারো আনা।

সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য। বাংলার রবি। দেশপ্রিয় গ্রন্থালয়। ভূমিকার তারিখ ২০ অগ্রহায়ণ ১৩৫২। পৃ ৭৯। রবীন্দ্রকুঞ্চিকা ৵০। মূল্য পাঁচ সিকা।

স্বপনবুড়ো [অখিল নিয়োগী]। গগনে উদিল রবি। মেয়েদের নৃত্য-গীতিমুখর নাটিকা। সত্যব্রত লাইব্রেরি। উৎসর্গের তারিখ ২৫ বৈশাখ ১৩৫৭। পৃ ৪০। মূল্য দশ আনা।

হরিমোহন দে (প্রকাশক), রবীন্দ্রনাথ। এম. এল. দে অ্যাণ্ড কোং। লেখকের উল্লেখ নাই। পৃ ১৬। মূল্য আট আনা।

রবীন্দ্র-রচনা-সংকলন

নিম্নোক্ত পুস্তক-পুস্তিকাগুলি রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে লিখিত নহে, প্রধানতঃ রবীন্দ্র-রচনা-সংকলন, সেই হিসাবে রবীন্দ্রনাথের গ্রন্থসূচীরও অন্তর্গত করা যাইতে পারে। তবুও কোনো কোনো গ্রন্থে সংকলয়িতার মন্তব্য দ্বারা রবীন্দ্র-রচনা ও রবীন্দ্র-উক্তি শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়াছে; সংকলন দ্বারা অধিকাংশ ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের বিশেষ একটি দিক উজ্জ্বল করিয়া তুলিবার চেষ্টা করা হইয়াছে; এই কারণে বর্তমান তালিকাভুক্ত করা হইল।

চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য কর্তৃক সংকলিত। বৈশাখ। বিশ্বভারতী। [১৩ বৈশাখ ১৩৬২] পৃ ৩১। বিতরণার্থ।

আত্মোদ্বোধক রবীন্দ্রবাণী-চয়ন। বৈশাখ মাসের প্রত্যেক দিনে একটি করিয়া রচনাংশ উদ্ধৃত।

চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য কর্তৃক সংকলিত। শিক্ষা। বিশ্বভারতী। ১৫ অগ্রহায়ণ ১৩৬২। পৃ ২৫। বিতরণার্থ।

চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য কর্তৃক সংকলিত। করুণাঘন, ধরণীতল কর' কলঙ্কশূন্য। বিশ্বভারতী। [বৈশাখ ১৩৬৩]। পৃ ৩০। বুদ্ধ-জয়ন্তীতে বিতরণার্থ।

বুদ্ধদেব সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের কবিতা ও গদ্য রচনাংশের সংগ্রহ।

তারাপদ চক্রবর্তী (প্রকাশক)। কবির বাণী। পশ্চিমবঙ্গরাজ্য-পুনর্গঠন-সংযুক্ত পরিষদ। ফাল্গুন ১৩৬২। পৃ ১৫। বিতরণার্থ।

বঙ্গ-বিহার-সংযুক্তি প্রস্তাব-প্রসঙ্গে সংকলিত ও প্রকাশিত। "যে ধরনের প্রশ্ন এই প্রসঙ্গে উঠেছে সে সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের সুস্পষ্ট মতামত পূর্ব পূর্ব উপলক্ষ্যে ঘোষিত হয়েছে।...রচনাগুলি বর্তমান উপলক্ষ্যে লেখা না হলেও এগুলি হতে পথের সন্ধান পাওয়া যেতে পারে।"

প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ কর্তৃক সংকলিত। রবীন্দ্র-বাণী। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ। ৭ ভাদ্র ১৩৪৮। রবীন্দ্রনাথের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য বিশেষ উপাসনায় বিতরিত। পৃ ৩২।

সংকলনটিতে এই কয়টি বিভাগ—ভারতবর্ষের সাধনা: মানবধর্ম; বিশ্বানি দুরিতানি পরাসুব; ধর্মের নবযুগ। ব্রহ্মোৎসব। যস্য ছায়ামৃতং যস্য মৃত্যুঃ। গান। কবিতা।

ভবানী সাহা অঙ্কিত ও সংকলিত, রবীন্দ্রনাথের কাব্যকণায় অলংকৃত। শোভা। [বসুমতী সাহিত্য মন্দির]। ভূমিকার তারিখ 'বড়দিন ১৯২৬'। প্লেট ৫৯।

ভারতচন্দ্র মজুমদার। জাতিগঠনে রবীন্দ্রনাথ। প্রবাসী কার্যালয়। পৌষ ১৩৩৮। পৃ ৯৪। মূল্য এক টাকা।

"রবীন্দ্রনাথের জাতীয় ভাবধারা তাঁর নিজস্ব ভাষায় পাঠকসমাজে পৌছিয়ে দেওয়াই···প্রধান উদ্দেশ্য"; উদ্ধৃতিগুলি লেখকের ভূমিকার দ্বারা পরস্পর গ্রথিত। এই কয়টি ভাগ আছে—দেশ-বিদেশে রবীন্দ্রনাথ; সমাজ ও সভ্যতায় রবীন্দ্রনাথ; শিক্ষাবিস্তারে রবীন্দ্রনাথ; উপসংহার। গ্রন্থাকারে অপ্রচলিত বহু দুষ্প্রাপ্য রচনা হইতেও উদ্ধৃতি সংগৃহীত হইয়াছে।

রানী চন্দ। আলাপচারী রবীন্দ্রনাথ। বিশ্বভারতী। ২২ শ্রাবণ ১৩৪৯। পৃ ১৭৬। মূল্য দুই টাকা।

"নিজের খেয়ালখুশিমতো ব্যক্তিগত আলাপ-আলোচনা [৭ জুলাই ১৯৩৪-১২ জুলাই ১৯৪১] খাতার পাতায় কখনো কখনো রেখে দিতুম। এ শুধু আমার ব্যক্তিগত কথা বা প্রশ্নের উত্তর নয়, এর মধ্যে অনেকেই অনেক কিছু পাবেন এই ভেবেই এ যেমন ছিল তেমনিই সবার সামনে এনে দিলুম।"—ভূমিকা। সাহিত্য, শিল্প, জীবন, সমাজ প্রভৃতি বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের বহু উক্তি এই গ্রন্থে বিধৃত হইয়াছে।

সুনীতি দেবী কর্তৃক সংকলিত। রবীন্দ্র জন্মতিথি। প্রকাশক বিজয়চন্দ্র মজুমদার, ৩৩।১-সি ল্যান্সডাউন রোড, কলিকাতা। মূল্য আড়াই টাকা।

ইংরেজি Birthday Book-এর অনুসরণে বৎসরের প্রত্যেক দিনের তারিখ; তন্নিম্নে কবিতার অংশ (স্বাক্ষরের স্থান সহ) মুদ্রিত হইয়াছে।

নিম্নলিখিত তিনখানি গ্রন্থ দেখিবার সুযোগ পাই নাই। অন্যত্র উল্লিখিত দেখিয়াছি।

১. গায়ত্রী দেবী। রবীন্দ্রনাথ। প্রেসিডেন্সি বুক ডিপো। মূল্য দশ আনা।

অনিলচন্দ্র ঘোষ। রবীন্দ্রনাথ। প্রেসিডেন্সি লাইব্রেরি। পরিবর্তিত ২য় সংস্করণ। শ্রাবণ ১৩৬০।—এই পুস্তকের ভূমিকায় অনিলচন্দ্র ঘোষ লিখিয়াছেন—"১৩৩৮ সাল, দেশব্যাপী চল্‌ছে রবীন্দ্রজয়ন্তী।···দুই বন্ধু মিলে লিখলাম এই জীবন-আলেখ্য—আমি আর অনিল দাস। অনিল ঢাকা জেলে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে—সে অমানুষিক নির্যাতনের কথা আজও অনেকের স্মরণ আছে। 'গায়ত্রী দেবী' ছদ্মনামে বইটি বের হয়।"

২. যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত। রবীন্দ্রনাথ।

৩. হেমচন্দ্র চক্রবর্তী। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ। রংপুর।

করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত রবীন্দ্র-আরতি। রবীন্দ্রনাথের প্রতি কবির শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন, রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে কবিতার সমষ্টি নহে।

প্রেসিডেন্সি কলেজ রবীন্দ্র-পরিষদে পঠিত কোনো কোনো প্রবন্ধ পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হইয়াছিল, দেখিবার সুযোগ হয় নাই। সেগুলি এই তালিকায় উল্লিখিত কবি-পরিচিতি গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে বলিয়া অনুমান হয়।

রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে বাংলা গ্রন্থের তালিকা

এই-সকল গ্রন্থ হইতে বিশেষ মূল্যবান পুস্তকগুলি নির্বাচন করিয়া একটি স্বতন্ত্র তালিকা রচনার প্রয়োজন আছে। বর্তমান সূচীপ্রণেতার উদ্দেশ্য অন্যবিধ, রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে যাবতীয় পুস্তক-পুস্তিকার সূচী সংকলন।—এরূপ তালিকা সম্পূর্ণ হইবার বাধা বহু, সংকলয়িতার পরিজ্ঞাত কোনো গ্রন্থাগারেরই এই বিষয়ক সংগ্রহ সম্পূর্ণ নয়; অপরপক্ষে কতকগুলি পুস্তক দীর্ঘকাল ছাপা নাই। বর্তমান তালিকার অধিকাংশ গ্রন্থ, বিশ্বভারতীর কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, রবীন্দ্রসদন ও গ্রন্থনবিভাগের সংগ্রহে প্রাপ্তব্য—পুরাতন দুষ্প্রাপ্য বই ও পুস্তিকাগুলি অধিকাংশ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ গ্রন্থাগারে আছে। শ্রীসজনীকান্ত দাস ও শ্রীসুকুমার সেন কোনো কোনো বই দেখিতে দিয়াছেন, তাহা যথাস্থানে উল্লিখিত হইয়াছে। যে স্থলে প্রথম সংস্করণের বই সংগ্রহ করা যায় নাই সে স্থলে যে-সংস্করণ পাওয়া গিয়াছে তাহাই উল্লিখিত হইয়াছে। গ্রন্থের নামের পরে প্রকাশক বা প্রাপ্তিস্থানের উল্লেখ করা হইয়াছে, তদভাবে দুই-এক স্থানে যে-প্রেসে মুদ্রিত তাহার নাম দেওয়া হইয়াছে, বিস্তারিত ঠিকানা না থাকিলে 'কলিকাতা' বুঝিতে হইবে। রবীন্দ্রসদনের শ্রীশোভনলাল গঙ্গোপাধ্যায় ও শ্রীচিত্তরঞ্জন দেব এবং বিশ্বভারতী কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের শ্রীবিমলকুমার দত্ত পুস্তকসন্ধানে বিশেষ আনুকূল্য করিয়াছেন। এই তালিকা যাহাতে যথাসাধ্য সুষ্ঠুভাবে মুদ্রিত হয় শ্রীজগদিন্দ্র ভৌমিক ও শ্রীসুধীরচন্দ্র কর সেজন্য বিশেষ শ্রমস্বীকার করিয়াছেন।

তালিকাটি কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। তাহার এক বিভাগের কোনো কোনো বই অন্য বিভাগেরও অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে। তবে এইরূপ অসম্পূর্ণ বিভাগেও পাঠকের কিছু সুবিধা হইতে পারে।

আরও কয়েকটি গ্রন্থশ্রেণী উল্লেখ করিলে এই তালিকা সুসম্পূর্ণ হয়—

১। যে-সকল গ্রন্থ সম্পূর্ণতঃ রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে নয়, কিন্তু এক বা একাধিক অধ্যায়ে বা প্রবন্ধে রবীন্দ্রপ্রসঙ্গ আলোচিত; দৃষ্টান্তস্থল—অন্নদাশঙ্কর রায়, "জীবনশিল্পী"; কাজী আবদুল ওদুদ, "শাশ্বত বঙ্গ"; কৃষ্ণবিহারী গুপ্ত, "গীতাঞ্জলির ভাবধারা"; প্রমথনাথ বিশী, "বাংলা সাহিত্যের নরনারী"; প্রিয়নাথ সেন, "প্রিয়-পুষ্পাঞ্জলি"; বুদ্ধদেব বসু, "সাহিত্যচর্চা"; শশিভূষণ দাশগুপ্ত, "ত্রয়ী"; শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, "বাংলা সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা"; হুমায়ুন কবীর, "বাঙলার কাব্য"; K. R. Kripalani, *Tagore, Gandhi and Nehru*।

২। বঙ্গেতর ভাষায়, বিশেষতঃ ইংরেজি ভাষায় লিখিত গ্রন্থরাজি; দৃষ্টান্তস্থল—Edward Thompson, ***Rabindranath Tagore, Poet and Dramatist***; Ramananda Chatterjee (Ed), ***The Golden Book af Tagore;*** Sachin Sen, ***Political Thought of Tagore;*** Sarvapalli Radhakrishnan, ***Philosophy of Rabindranath.***

৩। মাসিক পত্রাদির বিশেষ রবীন্দ্র-সংখ্যা; দৃষ্টান্তস্থল—***The Visva-Bharati Quarterly***, Tagore Birthday Number, May-October 1941, Edited by Krishna Kripalani; ***The Calcutta Municipal Gazette***, Tagore Memorial Special Supplement, September 13, 1941, Edited by Amal Home; পরিচয়, রবীন্দ্র-সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৮, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ও হিরণকুমার সান্যাল সম্পাদিত; কবিতা, রবীন্দ্র-সংখ্যা, আষাঢ় ১৩৪৮, বুদ্ধদেব বসু সম্পাদিত; শনিবারের চিঠি 'রবীন্দ্র-সংখ্যা' আশ্বিন ১৩৪৮, সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত।

আষাঢ়, ১৩৬৩ শ্রীপুলিনবিহারী সেন

১৮৮৭

আগে চল্, আগে চল্, ভাই।
পড়ে থাকা পিছে, মরে থাকা মিছে,
বেঁচে মরে কিবা ফল, ভাই।
আগে চল্, আগে চল্ ভাই।

১৯৩৭

চলো যাই চলো, যাই চলো, যাই—
চলো পদে পদে সত্যের ছন্দে,
চলো দুর্জয় প্রাণের আনন্দে॥
চলো মুক্তিপথে,
চলো বিঘ্নবিপদজয়ী মনোরথে,
...
চলো দুর্গম দূরপথযাত্রী
চলো দিবারাত্রি,
করো জয়যাত্রা,
চলো বহি নির্ভয় বীর্যের বার্তা,
...
দূর করো সংশয়শঙ্কার ভার,
যাও চলি তিমির দিগন্তের পার।
...
চলো জ্যোতির্লোকে
জাগ্রত চোখে,
...
চলো অভয় অমৃতময় লোকে,
অজর অশোকে,
বলো জয় বলো, জয় বলো, জয়-
অমৃতের জয় বলো ভাই॥

১৯৩৫ হইতে অদ্যাবধি রবীন্দ্রনাথের নব-প্রকাশিত গ্রন্থ

১. শান্তিনিকেতন প্রথম খণ্ড ১৩৪১ মাঘ [১৯৩৫]।

২. শান্তিনিকেতন। দ্বিতীয় খণ্ড। ১৩৪২ বৈশাখ। কবিকর্তৃক মার্জিত, বর্জিত ও নূতন সংযোজন-যুক্ত।

৩. শেষ সপ্তক। গদ্যকাব্য। ১৩৪২ বৈশাখ ২৫। ১৯৩৫

৪. সুর ও সঙ্গতি। ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের সহিত পত্রালাপ। [১৯৩৫ অগস্ট]। 'অতুলপ্রসাদের স্মরণে'।

৫. বীথিকা। কাব্য। ১৩৪২ ভাদ্র [১৯৩৫]

৬. নৃত্যনাট্য চিত্রাঙ্গদা। ১৩৪২ ফাল্গুন [১৯৩৬]

৭. পত্রপুট (গদ্যকাব্য) ১৩৪৩ বৈশাখ ২৫ 'কল্যাণীয় শ্রীমান কৃষ্ণ কৃপালানি ও কল্যাণীয়া শ্রীমতী নন্দিতার শুভ পরিণয় উপলক্ষ্যে আশীর্বাদ'। [১৯৩৬]।

৮. ছন্দ। প্রবন্ধ। ১৩৪৩ আষাঢ়। [১৯৩৬]। 'কল্যাণীয় শ্রীমান দিলীপকুমার রায়কে'।

৯. জাপানে-পারস্যে। ১৩৪৩ শ্রাবণ। [১৯৩৬]। পূর্বতন 'জাপান-যাত্রী' ও নূতন 'পারস্যভ্রমণ' একত্রে 'জাপানে -পারস্যে' প্রকাশিত হয়। 'শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় শ্রদ্ধাস্পদেষু'।

১০. শ্যামলী। গদ্যকাব্য। ১৩৪৩ ভাদ্র [১৯৩৬]। 'কল্যাণীয়া শ্রীমতী রানী মহলানবীশ'।

১১. শিক্ষার ধারা। ১৩৪৩ ভাদ্র [১৯৩৬]। নিউ এডুকেশন ফেলোশিপের বঙ্গীয় শাখার (১৯৩৬ ফেব্রুয়ারি) সম্মেলনউপলক্ষ্যে রচিত তিনটি প্রবন্ধ। এতদ্‌ব্যতীত শ্রীক্ষিতিমোহন সেন ও শ্রীনন্দলাল বসুর এক-একটি প্রবন্ধ আছে।

১২. সাহিত্যের পথে। প্রবন্ধ। ১৩৪৩ আশ্বিন [১৯৩৬]। 'কল্যাণীয় শ্রীমান অমিয়চন্দ্র চক্রবর্তীকে'।

১৩. পাশ্চাত্য ভ্রমণ। ১৩৪৩ আশ্বিন [১৯৩৬]। য়ুরোপ -প্রবাসীর পত্র [১৮৮১ অক্টোবর] পরিবর্তিত আকারে ও য়ুরোপযাত্রীর ডায়ারি, দ্বিতীয় খণ্ড [১৮৯৩ অক্টোবর] পুনর্মুদ্রিত।

১৪. প্রাক্তনী। অভিভাষণাবলীর সংগ্রহ। ১৩৪৩ পৌষ [১৯৩৬]। প্রাক্তন ছাত্রদের সভায় কথিত।

১৫. খাপছাড়া। ছড়া। ১৩৪৩ মাঘ [১৯৩৭]। কবি কর্তৃক অঙ্কিত বহু চিত্র ও স্কেচসহ। 'শ্রীযুক্ত রাজশেখর বসু বন্ধুবরেষু।...' ৩ ভাদ্র ১৩৪৩।

১৬. কালান্তর। প্রবন্ধ। ১৩৪৪ বৈশাখ [১৯৩৭]।

১৭. সে। গল্প। ১৩৪৪ বৈশাখ [১৯৩৭]। কবিকর্তৃক অঙ্কিত বহু চিত্র ও স্কেচসহ 'সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য করতলযুগলেষু'।

১৮. ছড়ার ছবি। কাব্য। ১৩৪৪ আশ্বিন [১৯৩৭]। নন্দলাল বসু কর্তৃক অঙ্কিত চিত্র-সহ। 'বৌমাকে' [প্রতিমা দেবী]।

১৯. বিশ্ব-পরিচয়। ১৩৪৪ আশ্বিন [১৯৩৭]। 'শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ বসু প্রীতিভাজনেষু'।

২০. প্রান্তিক। কাব্য। ১৩৪৪ পৌষ [১৯৩৮]।

২১. চণ্ডালিকা নৃত্যনাট্য। ১৩৪৪ ফাল্গুন [১৯৩৮]।

২২. পথে ও পথের প্রান্তে। ১৩৪৫ জ্যৈষ্ঠ [১৯৩৮]। শ্রীমতী রানী মহলানবীশকে লিখিত পত্রাবলী।

২৩. সেঁজুতি। কাব্য। ১৩৪৫ ভাদ্র [১৯৩৮]। 'ডাক্তার সার্ নীলরতন সরকার বন্ধুবরেষু'।... ১ শ্রাবণ ১৩৪৫।

২৪. বাংলাভাষা পরিচয়। ১৯৩৮

২৫. প্রহাসিনী। কাব্য। ১৩৪৫ পৌষ [১৯৩৯]।

২৬. আকাশ-প্রদীপ। কাব্য। ১৩৪৬ বৈশাখ [১৯৩৯]। 'শ্রীযুক্ত সুধীন্দ্রনাথ দত্ত কল্যাণীয়েষু'।

২৭. শ্যামা। নৃত্যনাট্য। স্বরলিপি সমেত। ১৩৪৬ ভাদ্র [১৯৩৯]।

২৮. পথের সঞ্চয়। লোকশিক্ষা গ্রন্থমালা ১। ১৩৪৬ ভাদ্র [১৯৩৯]। ১৯১১-১২ সালে য়ুরোপ ও আমেরিকা হইতে লিখিত পত্রাবলী।

২৯. নবজাতক। কাব্য। ১৩৪৭ বৈশাখ [১৯৪০]।

৩০. সানাই। কাব্য। ১৩৪৭ আষাঢ় [১৯৪০]।

৩১. ছেলেবেলা। ১৩৪৭ ভাদ্র [১৯৪০]।

৩২. চিত্রলিপি। রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক অঙ্কিত চিত্র-সংগ্রহ। কবিতা ও তাহার ইংরেজি অনুবাদসহ। [১৩৪৭]। ১৯৪০ সেপ্টেম্বর।

৩৩. তিনসঙ্গী। গল্প। ১৩৪৭ পৌষ [১৯৪০]।

৩৪. রোগশয্যায়। কাব্য। ১৩৪৭ পৌষ [১৯৪০]।

৩৫. আরোগ্য। কাব্য। ১৩৪৭ ফাল্গুন [১৯৪১]। 'কল্যাণীয় শ্রীসুরেন্দ্রনাথ কর'।

৩৬. জন্মদিনে। কাব্য। ১৩৪৮ বৈশাখ ১ [১৯৪১]।

৩৭. সভ্যতার সংকট। অভিভাষণ। ১৩৪৮ বৈশাখ ১ [১৯৪১]।

৩৮. গল্পসল্প। ১৩৪৮ বৈশাখ [১৯৪১]। 'নন্দিতাকে'।

৩৯. আশ্রমের রূপ ও বিকাশ। প্রবন্ধ। ১৩৪৮ আষাঢ় [১৯৪১]।

কবির মৃত্যুর পর প্রকাশিত

৪০. স্মৃতি। ১৩৪৮ শ্রাবণ [১৯৪১]। মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়কে লিখিত পত্র।

৪১. ছড়া। কাব্য। ১৩৪৮ ভাদ্র [১৯৪১]।

৪২. শেষ লেখা। কাব্য। ১৩৪৮ ভাদ্র [১৯৪১]।

৪৩. চিঠিপত্র ১। ১৩৪৯ বৈশাখ ২৫ [১৯৪২]। মৃণালিনী দেবীকে লিখিত পত্র।

৪৪. চিঠিপত্র ২। ১৩৪৯ আষাঢ় [১৯৪২]। রথীন্দ্রনাথকে লিখিত পত্র।

৪৫. চিঠিপত্র ৩। ১৩৪৯ অগ্রহায়ণ [১৯৪২]। প্রতিমা দেবীকে লিখিত পত্র।

৪৬. আত্মপরিচয়। ১৩৫০ বৈশাখ ১ [১৯৪৩]।

৪৭. সাহিত্যের স্বরূপ। প্রবন্ধ। ১৩৫০ বৈশাখ [১৯৪৩]।

৪৮. চিঠিপত্র ৪। ১৩৫০ পৌষ [১৯৪৩]। মাধুরীলতা, মীরা, নন্দিতা, নীতু ও নন্দিনীকে লিখিত পত্র।

৪৯. স্ফুলিঙ্গ। কাব্য। ১৩৫২ বৈশাখ ২৫ [১৯৪৫]।

৫০. চিঠিপত্র ৫। ১৩৫২ পৌষ [১৯৪৫]। সত্যেন্দ্রনাথ, জ্ঞানদানন্দিনী দেবী, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, ইন্দিরা দেবী ও প্রমথ চৌধুরীকে লিখিত পত্র।

৫১. সঞ্চয়ন। কবিতা-সংকলন। ১৩৫৪ বৈশাখ ২৫ [১৯৪৭]।

৫২. মহাত্মা গান্ধী। প্রবন্ধ ও অভিভাষণ। ১৩৫৪ মাঘ ২৯ [১৯৪৮]।

৫৩. মুক্তির উপায়। নাটক। ১৩৫৪ শ্রাবণ [১৯৪৮]।

৫৪. গীতবিতান। তৃতীয় খণ্ড। গান। ১৩৫৭ আশ্বিন [১৯৫০]। এই খণ্ডে বহু অপ্রচলিত ও অপ্রকাশিত গান সংকলিত হইয়াছে।

৫৫. লাইব্রেরির মুখ্য কর্তব্য। অভিভাষণ, ১৩২৮।১৩৫৮ ভাদ্র [১৯৫১]।

৫৬. বিশ্বভারতী। প্রবন্ধ। ১৩৫৮ পৌষ ৭ [১৯৫১]

৫৭. শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রম। প্রতিষ্ঠা দিবসের উপদেশ ও প্রথম কার্যপ্রণালী। ১৩৫৮ পৌষ ৭ [১৯৫১]

৫৮. বৈকালী। গান ও কবিতা। কবির হস্তাক্ষরে মুদ্রিত। ১৩৫৮ পৌষ ৭ [১৯৫১]। ১৩৩৩ সালে মুদ্রিত, কিন্তু তখন প্রচারিত হয় নাই।

৫৯. চিত্রলিপি। দ্বিতীয় খণ্ড। রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক অঙ্কিত চিত্র-সংগ্রহ। ১৩৫৮ পৌষ ৭ [১৯৫১]।

৬০. সমবায়নীতি। প্রবন্ধ। বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ, শততম সংখ্যা। ১৩৬০ [১৯৫৪]।

৬১. চিত্রবিচিত্র। কবিতা। ১৩৬১ শ্রাবণ [১৯৫৪]।

৬২. সংকলিতা। প্রথম ভাগ। কবিতা সংকলন। আশ্বিন ১৩৬১ [১৯৫৪ সেপ্টেম্বর ১৫]।

৬৩. সংকলিতা। দ্বিতীয় ভাগ। কবিতা-সংকলন। [আশ্বিন ১৩৬১ ; ১৯৫৪ সেপ্টেম্বর ১৫]।

৬৪. সংকলিতা। তৃতীয় ভাগ। কবিতা-সংকলন [আষাঢ় ১৩৬২ ; ১৯৫৫ জুন ২৮]।

৬৫. ইতিহাস। প্রবন্ধ। ১৩৬২ শ্রাবণ ২২ [১৯৫৫]।

৬৬. বুদ্ধদেব। কবিতা ও প্রবন্ধ। বুদ্ধ সম্বন্ধীয় রচনা-সংকলন। বুদ্ধপূর্ণিমা। ১৩৬৩ জ্যৈষ্ঠ [১৯৫৬]।

৩১ অগস্ট ১৯৬৬

রচনাবলী	কবিতা, গান	নাটক, প্রহসন	উপন্যাস, গল্প	প্রবন্ধ
প্রথম খণ্ড ১৩৪৬ আশ্বিন [১৯৩৯] পৃ ৬৪৫	সন্ধ্যাসঙ্গীত ১২৮৮ [১৮৮২ জুলাই] প্রভাতসঙ্গীত ১৮০৫ শক বৈশাখ [১৮৮৩] ছবি ও গান ১৮০৫ শক ফাল্গুন [১৮৮৪]	বাল্মীকি প্রতিভা ১৮০২ শক ফাল্গুন [১৮৮১] প্রকৃতির প্রতিশোধ ১২৯১ [১৮৮৪ এপ্রিল] মায়ার খেলা ১৮১০ শক অগ্রহায়ণ [১৮৮৮] রাজা ও রাণী ১২৯৬ শ্রাবণ ২৫ [১৮৮৯]	বউঠাকুরাণীর হাট ১৮০৪ শক পৌষ [১৮৮৩]	য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র ১৮০৩ শক [১৮৮১ অক্টোবর] য়ুরোপযাত্রীর ডায়ারি (ভূমিকা) ১২৯৮ বৈশাখ [১৮৯১] —২য় খণ্ড, ১৩০০ আশ্বিন [১৮৯৩]
দ্বিতীয় খণ্ড ১৩৪৬ পৌষ [১৯৩৯] পৃ ৬৫২	ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী, ১২৯১ [১৮৮৪ জুলাই] কড়ি ও কোমল ১২৯৩ [১৮৮৬ নভেম্বর] মানসী, ১২৯৭ পৌষ ১০ [১৮৯০]	বিসর্জন ১২৯৭ জ্যৈষ্ঠ ২ [১৮৯০]	রাজর্ষি ১২৯৩ [১৮৮৭ ফেব্রু]	চিঠিপত্র ৩ ১৮৮৭ [জুলাই । ১২৯৪] পঞ্চভূত, ১৩০৪ [১৮৯৭ মে]
তৃতীয় খণ্ড ১৩৪৭ বৈশাখ ২৫ [১৯৪০] পৃ ৬৬৪	সোনার তরী, ১৩০০ [১৮৯৪ জানু]	চিত্রাঙ্গদা ১২৯৯ ভাদ্র ২৮ [১৮৯২ সেপ] গোড়ায় গলদ ১২৯৯ ভাদ্র ৩১ [১৮৯২]	চোখের বালি ১৩০৯ [১৯০৩ এপ্রিল]	আত্মশক্তি ১৩১২ [আশ্বিন । ১৯০৫]

রচনাবলী	কবিতা, গান	নাটক, প্রহসন	উপন্যাস, গল্প	প্রবন্ধ
চতুর্থ খণ্ড ১৩৪৭ শ্রাবণ [১৯৪০] পৃ ৫৬৭	নদী ১৩০২, মাঘ ২২ [১৮৯৬] চিত্রা ১৩০২ ফাল্গুন [১৮৯৬]	বিদায় অভিশাপ ১৩০০ [১৮৯৪ জুলাই] মালিনী [১৮৯৬] ১৩০৩ আশ্বিন বৈকুণ্ঠের খাতা ১৩০৩ চৈত্র [১৮৯৭ এপ্রিল]	প্রজাপতির নির্বন্ধ [১৯০৮ ফেব্রু । ১৩১৪ ফাল্গুন ১৬]	ভারতবর্ষ ১৩১২ [১৯০৬ ফেব্রু] চারিত্রপূজা [১৯০৭ ১৩১৪ জ্যৈষ্ঠ]
পঞ্চম খণ্ড ১৩৪৭ অগ্রহায়ণ [১৯৪০] পৃ ৫৭১	চৈতালি [১৮৯৬] ১৩০৩ আশ্বিন	কাহিনী ১৩০৬ ফাল্গুন ২৪ [১৯০০]	নৌকাডুবি ১৩১৩ [১৯০৬ সেপ]	বিচিত্র প্রবন্ধ ১৩১৪ বৈশাখ [১৯০৭ এপ্রিল প্রাচীন সাহিত্য [১৩১৪ । ১৯০৭ জুলাই]
ষষ্ঠ খণ্ড ১৩৪৭ ফাল্গুন [১৯৪১] পৃ ৬৭২	কণিকা ১৩০৬ অগ্রহায়ণ [১৮৯৯]	হাস্যকৌতুক [১৩১৪ অগ্র] [১৯০৭]	গোরা [১৩১৬ মাঘ । ১৯১০]	লোকসাহিত্য [১৩১৪ শ্রাবণ । ১৯০৭]
সপ্তম খণ্ড ১৩৪৮ আষাঢ় [১৯৪১] পৃ ৫৬৩	কথা, ১৩০৬, মাঘ ১ [১৯০০] কাহিনী ১৩০৬ ফাল্গুন [১৯০০] কল্পনা ১৩০৭ বৈশাখ [১৯০০] ক্ষণিকা [১৩০৭ শ্রাবণ । ১৯০০]	ব্যঙ্গকৌতুক [১৩১৪ পৌষ । ১৯০৭] শারদোৎসব [১৩১৫ আশ্বিন । ১৯০৮ সেপ]	চতুরঙ্গ ১৯১৬ [১৩২৩ ভাদ্র]	ব্যঙ্গকৌতুক
অষ্টম খণ্ড ১৩৪৮ ভাদ্র [১৯৪১] পৃ ৫৪৭	নৈবেদ্য ১৩০৮ আষাঢ় [১৯০১] স্মরণ ১৩০৯	মুকুট [১৩১৫ পৌষ ।] ১৯০৮]	ঘরে-বাইরে ১৯১৬ [১৩২৩ জ্যৈষ্ঠ]	সাহিত্য [১৩১৪ আশ্বিন ১৯০৭]

চনাবলী	কবিতা, গান	নাটক, প্রহসন	উপন্যাস, গল্প	প্রবন্ধ
বম খণ্ড ৩৪৮ পৌষ ১৯৪১] পৃ ৫৭১	শিশু [১৯০৩]	প্রায়শ্চিত্ত [১৩১৬ বৈশাখ ১৯০৯]	যোগাযোগ ১৩৩৬ আষাঢ় [১৯২৯]	আধুনিক সাহিত্য [১৩১৪ আশ্বিন ১৯০৭]
শম খণ্ড ,৩৪৮ চৈত্র ১৯৪২] পৃ ৬৭৫	উৎসর্গ [১৯৪১ মে] খেয়া ১৩১৩ আষাঢ় [১৯০৬]	রাজা ১৩১৭ [১৯১০ ডিসে]	শেষের কবিতা ১৩৩৬ ভাদ্র [১৯২৯]	রাজা ও প্রজা [১৩১৫ আষাঢ় ১৯০৮] সমূহ [১৩১৫ শ্রাবণ ১৯০৮]
একাদশ খণ্ড ১৩৪৯ আষাঢ় [১৯৪২] পৃ ৫৩০	গীতাঞ্জলি ১৩১৭ শ্রাবণ ৩১ [১৯১০ অগস্ট ১৬] গীতিমাল্য [১৯১৪ জুলাই] গীতালি [১৯১৪ নভেম্বর ১৩২১]	অচলায়তন [১৯১২ অগস্ট ১৩১৯] ডাকঘর [১৯১২ জানুয়ারি ১৩১৮]	দুই বোন ১৩৩৯ ফাল্গুন [১৯৩৩]	স্বদেশ [১৩১৫ শ্রাবণ ১৯০৮]
দ্বাদশ খণ্ড ১৩৪৯ আশ্বিন [১৯৪২] পৃ ৬৪৪	বলাকা ১৯১৬ [১৩২২]	ফাল্গুনী ১৯১৬ [১৩২২ ফাল্গুন]	মালঞ্চ ১৩৪০ চৈত্র [১৯৩৪]	সমাজ [১৩১৫ শ্রাবণ ১৯০৮] শিক্ষা [১৩১৫ অগ্র ১৯০৮] শব্দতত্ত্ব [১৯০৯ ১৩১৫ মাঘ]
ত্রয়োদশ খণ্ড ১৩৪৯ কার্ত্তিক [১৯৪২] পৃ ৫৫২	পলাতকা ১৯১৮ অক্টোবর [১৩২৫] শিশু ভোলানাথ ১৯২২ [১৩২৯ শ্রাবণ]	গুরু ১৩২৪ ফাল্গুন [১৯১৮] অরূপরতন ১৩২৬ মাঘ [১৯২০] ঋণশোধ ১৯২১ [১৩২৮ আশ্বিন]	চার অধ্যায় [১৩৪১ অগ্রহায়ণ ১৯৩৪]	ধর্ম [১৩১৫ মাঘ ১৯০৯] শান্তিনিকেতন ১—৩ খণ্ড [১৯০৯]
চতুর্দশ খণ্ড ১৩৪৯ চৈত্র [১৯৪৩] পৃ ৫৫৪	পূরবী ১৩৩২ শ্রাবণ [১৯২৫] লেখন [১৩৩৪ কার্তিক ১৯২৭]	মুক্তধারা ১৩২৯ বৈশাখ [১৯২৫]	গল্পগুচ্ছ [মুকুট]	শান্তিনিকেতন ৪-১০ [১৯০৯-১০]

রচনাবলী	কবিতা, গান	নাটক, প্রহসন	উপন্যাস, গল্প	প্রবন্ধ
পঞ্চদশ খণ্ড ১৩৪৯ চৈত্র [১৯৪৩] পৃ ৫৬৬	মহুয়া ১৩৩৬ আশ্বিন [১৯২৯] বনবাণী ১৩৩৮ আশ্বিন [১৯৩১] পরিশোধ ১৩৩৯ ভাদ্র [১৯৩২]	বসন্ত ১৩২৯ ফাল্গুন [১৯২৩] রক্তকরবী ১৩৩৩ [১৯২৬ ডিসেম্বর]	গল্পগুচ্ছ	শান্তিনিকেতন ৪-১০ ১১-১২ [১৯১০-১২]
ষোড়শ খণ্ড ১৩৫০ শ্রাবণ ২২ [১৯৪৩] পৃ ৫২৪	পুনশ্চ ১৩৩৯ আশ্বিন [১৯৩২]	চিরকুমার সভা ১৩৩২ ফাল্গুন [১৯২৬]	গল্পগুচ্ছ	শান্তিনিকেতন ১৩-১৭ [১৯১১-১৬]
সপ্তদশ খণ্ড ১৩৫০ ফাল্গুন ১ [১৯৪৪ পৃ ৫০৬	বিচিত্রিতা ১৩৪০ শ্রাবণ [১৯৩৩]	শোধবোধ [১৯২৬ জুন ১৩৩৩ আষাঢ়] গৃহপ্রবেশ ১৩৩২ আশ্বিন [১৯২৫]	গল্পগুচ্ছ	জীবনস্মৃতি ১৩১৯ [১৯১২]
অষ্টাদশ খণ্ড ১৩৫১ শ্রাবণ [১৯৪৪] পৃ ৬০০	শেষসপ্তক ১৩৪২ বৈশাখ ২৫ [১৯৩৫]	শেষবর্ষণ [১৯২৬] নটীর পূজা ১৩৩৩ [১৯২৬ সেপ্টেম্বর] নটরাজ ১৩৩৪ অগ্র ২২ [১৯২৭]	গল্পগুচ্ছ	সঞ্চয় ১৯১৬ [১৩২৩ জ্যৈষ্ঠ] পরিচয় ১৯১৬ [১৩২৩ আষাঢ়] কর্তার ইচ্ছায় কর্ম [১৯১৭ অগস্ট ১৩২৪ ভাদ্র]
উনবিংশ খণ্ড ১৩৫২ বৈশাখ ২৫ [১৯৪৫] পৃ ৪৪০	বীথিকা ১৩৪২ ভাদ্র [১৯৩৫]	শেষরক্ষা ১৯২৮ জুলাই [১৩৩৫]	গল্পগুচ্ছ	জাপানযাত্রী ১৩২৬ শ্রাবণ [১৯১৯] যাত্রী ১৩৩৬ জ্যৈষ্ঠ [১৯২৯]
বিংশ খণ্ড ১৩৫২ পৌষ ৭ [১৯৪৫] পৃ ৪৬০	পত্রপুট ১৩৪৩ বৈশাখ ২৫ [১৯৩৬] শ্যামলী ১৩৪৩ ভাদ্র [১৯৩৬]	পরিত্রাণ ১৩৩৬ জ্যৈষ্ঠ [১৯২৯]	গল্পগুচ্ছ	রাশিয়ার চিঠি ১৩৩৮ বৈশাখ [১৯৩১] মানুষের ধর্ম ১৯৩৩ মে [১৩৪০]

রচনাবলী	কবিতা, গান	নাটক, প্রহসন	উপন্যাস, গল্প	প্রবন্ধ
একবিংশ খণ্ড ১৩৫৩ শ্রাবণ ২২ [১৯৪৬] পৃ ৪৫০	খাপছাড়া ১৩৪৩ মাঘ [১৯৩৭] ছড়ার ছবি ১৩৪৪ আশ্বিন [১৯৩৭]	তপতী ১৩৩৫ ভাদ্র [১৯২৯]	গল্পগুচ্ছ	ছন্দ ১৩৪৩ আষাঢ় [১৯৩৬]
দ্বাবিংশ খণ্ড ১৩৫৩ আশ্বিন [১৯৪৬] পৃ ৫৩৬	প্রান্তিক ১৩৪৪ পৌষ [১৯৩৮] সেঁজুতি ১৩৪৫ ভাদ্র [১৯৩৮]	নবীন ১৩৩৭ ফাল্গুন [১৯৩১] শাপমোচন ১৩৩৮ পৌষ [১৯৩১] কালের যাত্রা ১৩৩৯ ভাদ্র [১৯৩২]	গল্পগুচ্ছ [নষ্টনীড়]	পারস্যে ১৩৪৩ শ্রাবণ [১৯৩৬]
ত্রয়োবিংশ খণ্ড ১৩৫৪ আশ্বিন [১৯৪৭] পৃ ৫৬৫	প্রহাসিনী ১৩৪৪ পৌষ [১৯৩৯] আকাশপ্রদীপ [১৩৪৬] বৈশাখ [১৯৩৯]	চণ্ডালিকা ১৩৪০ ভাদ্র [১৯৩৩] তাসের দেশ ১৩৪০ ভাদ্র [১৯৩৩]	গল্পগুচ্ছ	সাহিত্যের পথে ১৩৪৩ আশ্বিন [১৯৩৬]
চতুর্বিংশ খণ্ড ১৩৫৪ পৌষ ৭ [১৯৪৭] পৃ ৫১২	নবজাতক ১৩৪৭ বৈশাখ [১৯৪০ মে] সানাই ১৩৪৭ আষাঢ় [১৯৪০]	বাঁশরী ১৩৪০ অগ্রহায়ণ [১৯৩৩]	গল্পগুচ্ছ	কালান্তর ১৩৪৪ বৈশাখ [১৯৩৭]
পঞ্চবিংশ খণ্ড ১৩৫৫ বৈশাখ ২৫ [১৯৪৮] পৃ ৪৪৯	রোগশয্যায় ১৩৪৭ পৌষ [১৯৪০] আরোগ্য ১৩৪৭ ফাল্গুন [১৯৪১] জন্মদিনে ১৩৪৮ বৈশাখ [১৯৪১ মে]	শ্রাবণগাথা ১৩৪১ শ্রাবণ [১৯৩৪] নৃত্যনাট্য চিত্রাঙ্গদা ১৩৪২ ফাল্গুন [১৯৩৬] নৃত্যনাট্য চণ্ডালিকা ১৩৪৪ ফাল্গুন [১৯৩৮] শ্যামা ১৩৪৬ ভাদ্র [১৯৩৯]	তিনসঙ্গী ১৯৪০ ডিসেম্বর [১৩৪৭]	বিশ্বপরিচয় ১৩৪৪ আশ্বিন [১৯৩৭]

রচনাবলী	কবিতা, গান	নাটক, প্রহসন	উপন্যাস, গল্প	প্রবন্ধ
ষড়বিংশ খণ্ড ১৩৫৫ পৌষ [১৯৪৮] পৃ ৬৬৯	ছড়া ১৩৪৮ ভাদ্র [১৯৪১] শেষ লেখা ১৩৪৮ ভাদ্র [১৯৪১]	মুক্তির উপায় [১৩৪৫ আশ্বিন]	লিপিকা ১৯২২ [১৩২৯ শ্রাবণ] সে ১৯৩৭ [১৩৪৪ বৈশাখ] গল্পসল্প ১৩৪৮ বৈশাখ [১৯৪১]	বাংলাভাষা পরিচয় ১৯৩৮ [১৩৪৫ কার্তিক] পথের সঞ্চয় ১৩৪৬ ভাদ্র [১৯৩৯] ছেলেবেলা ১৩৪৭ ভাদ্র [১৯৪০] সভ্যতার সংকট ১৩৪৮ বৈশাখ [১৯৪১]

রবীন্দ্র-রচনাবলী—অচলিত সংগ্রহ

প্রথম খণ্ড ১৩৪৭ আশ্বিন : কবিকাহিনী (১৮৭৮ নভেম্বর) —বনফুল (১৮৮০ মার্চ)—ভগ্নহৃদয় (১৮৮১ জুন)—রুদ্রচণ্ড (১৮৮১ জুন)—কালমৃগয়া (১৮৮২ জুলাই)—বিবিধ প্রসঙ্গ (১৮৮৩ অগস্ট)—নলিনী (১৮৮৪ মে)—শৈশব সঙ্গীত (১৮৮৪ মে)—পরিশিষ্ট—বাল্মীকি-প্রতিভা (১৮৮১ মার্চ)।
পৃ ৫৫২

দ্বিতীয় খণ্ড ১৩৪৮ অগ্রহায়ণ—আলোচনা (১৮৮৫ এপ্রিল)—সমালোচনা (১৮৮৮ মার্চ)—মন্ত্রীঅভিষেক (১৮৯০ মে)—ব্রহ্মমন্ত্র (১৯০১ জানুয়ারি)—ঔপনিষদ ব্রহ্ম (১৯০০ জানুয়ারি)—পাঠ্যপুস্তক : সংস্কৃতশিক্ষা (২য় ভাগ), ইংরেজি সোপান, ইংরেজি শ্রুতিশিক্ষা ১ম ও ২য় ভাগ, ইংরেজি সহজশিক্ষা ১ম ও ২য় ভাগ, অনুবাদ চর্চা, সহজপাঠ ১ম ও ২য় ভাগ, ইংরেজি পাঠ ১ম, আদর্শ প্রশ্ন।
পৃ ৭২২

রবীন্দ্ররচনাবলী ২৮ খণ্ডের পৃষ্ঠাসংখ্যা ১৫,৯৫৮ [গ্রন্থপরিচয় ও বর্ণানুক্রমিক সূচী সমেত]। রবীন্দ্রনাথের রচনাপ্রকাশ এখনো শেষ হয় নাই ; প্রকাশকরা আশা করেন যে আনুমানিক ত্রিশ খণ্ডে রবীন্দ্রনাথের প্রকাশিত অপ্রকাশিত সমুদায় রচনার সংকলন সম্পূর্ণ হইতে পারিবে।

নির্দেশিকা

[এই নির্দেশিকার মধ্যে ১-৪ খণ্ডের সংযোজন ও সংশোধনের নির্দেশিকা এই ভাবে করা হইয়াছে : প্রথমে খণ্ড-সংখ্যা ও পরে পৃষ্ঠাঙ্ক এবং শেষে সংযোজনের পৃষ্ঠাঙ্ক দেওয়া হইয়াছে। যথা ১-৫০। সং ২৯০ অর্থাৎ ১ম খণ্ডের পৃষ্ঠা ৫০-এর সংযোজন এই ৪র্থ খণ্ডের পৃ ২৯০-এ প্রদত্ত হইয়াছে।]

অ

আ







খ

গ

ট

ঠ

ড

ঢ

ত

প

ফ

ব





ল

স

হ